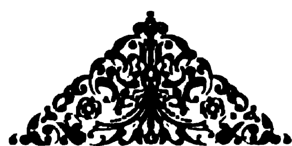

উপন্যাস সমগ্র



উপন্যাস সমগ্র

রমাপদ চৌধুরী



২



সপ্তর্ষি প্রকাশন

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৬

স্বাতী রায়চৌধুরী কর্তৃক সপ্তর্ষি প্রকাশন , ৪৪এ চক্রবর্তী লেন , শ্রীরামপুর হুগলী থেকে
প্রকাশিত এবং কালি প্রেস, ৬৭ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট থেকে মুদ্রিত ।

সূচী



প্রথম প্রহর



পহেলা প্রহরমে সবকোই জাগে
দোসরা প্রহরমে ভোগী।
তিসরা প্রহরমে তস্কর জাগে
চৌঠা প্রহরমে যোগী ॥

—তুলসীদাস

সূত্রপাত

আজ থেকে ঠিক এক বছর আগেকার ঘটনা। কনকনে শীতের রাত। জানালা দিয়ে হু হু করে এসে ঢুকছে ঠাণ্ডা হাওয়া, ছুঁচের মতো শরীরে বিঁধছে।

তবু জানালা খুলে রেখেছিলাম। ঘুম আসছিল, তবু চোখ টেনে টেনে জেগে থাকবার চেষ্টা করছিলাম। গায়ে র‍্যাপার জড়িয়ে, মাফলারে কান ঢেকে, গরম কম্বলের উষ্ণ আরামে পা ঢুকিয়ে।

আলো-ঝলমল স্টেশনে এসে ট্রেন থামলো। পানিপাঁড়েটা বোধ হয় চিৎকার করে স্টেশনের নাম ঘোষণা করলো।

সেই অনেক-চেনা নাম!

সুদীর্ঘ একটি যুগ পার হয়ে গেছে, এ নাম শুনিনি বহুদিন, এ বাতাসে নিশ্বাস নিইনি কতকাল।

জানালায় মুখ বাড়িয়ে যেন শৈশবের, প্রথম যৌবনের স্পর্শ নিতে চাইলো মন। তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজলাম। না, সব বদলে গেছে। পুরোনো দিনের স্মৃতিকে বিদায় দিয়ে যেন নতুন ফুল ফোটাতে উন্মুখ হয়ে উঠেছে সেই ছোট্ট শহর।

একটি সুবেশ সৌন্দর্য অপেক্ষা করছিল অদূরের ল্যাম্পপোস্টের ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নার নীচে। সঙ্গে দুটি ফুটফুটে মেয়ে, একরাশ জিনিসপত্র।

তাকিয়ে ছিলাম সেদিকেই।

একজন ভদ্রলোক ছুটে এলেন ব্যস্তত্রস্ত হয়ে, কুলির মাথায় জিনিসপত্র তুলে দিয়ে এসে দাঁড়ালেন আমারই কামরার দরজায়।

সেই সুবেশ সৌন্দর্য এসে উঠল কামরায়, বাচ্চা মেয়ে দুটিকে তুলে দিলেন ভদ্রলোক। বিপরীত দিকের বার্থে জিনিসপত্র গোছগাছ করায় মন দিল সে, হাঁটু-ঝোলা গরম কোটটা খুলে রেখে, ঘোমটা খাটো করে।

ট্রেনের ঘণ্টা পড়লো, গার্ডের হুইস্‌ল বাজলো। ট্রেন ছেড়ে দিল আবার।

লাফিয়ে নেমে পড়লেন ভদ্রলোক। একরাশ উপদেশের শেষে জিজ্ঞেস করলেন, পাসটা নিয়েছো তো ?

—হ্যাঁ। উত্তর দিল সে। জানালায় মুখ গলিয়ে স্বামীর উদ্দেশে হাত নাড়লো।

তারপর এসে বসলো নিজের আসনে।

আর আমি চোখ ফেরালাম ইংরেজি পত্রিকাটার ছবির পাতায়।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ কেটে গেল।

হঠাৎ।—তিমুদা না ?

চমকে ফিরে তাকালাম তার দিকে। তিমু! নিজের এই অনেক্ক-চেনা ডাক-নামটা যেন ভুলেই গিয়েছিলাম। এতদিন বাদে সে নাম এক অপরিচিতার মুখে উচ্চারিত হতে শুনে বিস্মিত হলাম।

চোখ ফেরাতেই দেখলাম তার মুখে উজ্জ্বল কৌতুকের হাসি।

—কি, চিনতে পারছো না বুঝি ? আবার হেসে উঠল সে।

—কি খবর ? মৃদু হেসে উত্তর দিলাম।

হাসির মতো সংক্রামক বোধ হয় আর কিছু নেই। একজনের হাসি দেখে অন্যজনকে হাসতে হয়। কিন্তু তাকে চিনতে না পেরেও কেন প্রশ্নের উত্তর দিলাম, কেন যে চিনতে পারার ভাণ করলাম, নিজের কাছেও তা রহস্য।

তৃপ্তির হাসি ফুটলো তার মুখে চোখে।—যাক্ চিনতে পেরেছো তা হলে। উঃ কতকাল পরে দেখা বলো তো।

ভুল ভেঙে যাওয়ার ভয়ে চুপ করে রইলাম।

কিন্তু সে যেন চুপ করতে রাজি নয়। অনর্গল কথা বলে চললো সে।

বললে, আমি তো ভেবেছিলাম আর কোনদিন বুঝি দেখাই হবে না। আশ্চর্য মানুষ তোমরা, এটা তোমার জন্মস্থান, মাঝে মাঝে এলে তো পারো।

মুখে বললাম, সময় পাই না। কিন্তু মনে মনে তখনও অন্বেষণ করে চলেছি স্মৃতির মণিকোঠা।

—সময় পাবে কি করে ? এখন তুমি মস্ত বড় লেখক হয়েছো, এখন তো আর আমাদের তিমুদা নও। কি, চোখ কপালে তুলছো যে, কোনো খবরই রাখি না ভেবেছিলে ?

লজ্জায় হাসি হাসতে হল। বলতে হল, আমিই কোন খবর রাখি না বলে লজ্জিত।

খিলখিল করে হেসে উঠল সে।—বাব্বা, কি ঘষামাজা কথা বলো আজকাল। কিন্তু আমাদের আর কি খবর রাখবে বলো। আমরা যেমন ছিলাম তেমনি আছি।

বললাম, শহরটা নাকি অনেক বেড়ে গেছে ?

—বেড়ে গেছে! প্রতিবাদের সুর ফুটলো।—বদলে গেছে বলো। বাঙালী মেয়েদের সাইকেল চড়তে দেখেছো তখন ? একটা কলেজ হয়েছে, ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে। আর হিজলী বলতে তোমরা জানতে জেলখানা, এখন টেকনিক্যাল কলেজ।

বললাম, শুনেছি।

—বিয়ে করেছো তো ? ছেলেমেয়ে ক-টি ? হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলো সে।

বললাম, সুযোগ ঘটেনি।

খিলখিল করে হেসে উঠল আবার।—জানতাম। সুযোগ এলেও তুমি বিয়ে করবে না,

জানতাম আমি। আচ্ছা আমার মেয়ে দুটির মধ্যে কোনটি সুন্দর বলো তো? এর নাম রেখা, আর এর নাম রেবা। আচ্ছা বড়টি বেশি সুন্দর নয়? উনি কিন্তু বলেন, রেবা...

বললাম, দু-জনেই।

—ও তোমার মন রাখা কথা। আচ্ছা, সদাশিব জ্যাঠা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন, শুনেছো?

সন্ন্যাসী? সদাশিব জ্যাঠা? বিস্মিত এবং আহত হলাম। কিন্তু সন্ন্যাসীই তো ছিলেন তিনি। ভোর বেলায় তাঁর তুলসীদাস আবৃত্তি যেন কানের কাছে ভেসে এল।

—হ্যাঁ। তোমরা চলে যাওয়ার বছরখানেক পরেই।

মুহূর্তে বিষাদ হয়ে গেল সমস্ত মন। কিন্তু কেন?

উত্তর এল, কি জানি। আর নিমাইদার খবর জানো?

—নিমাইদা? না তো।

—নিমাইদা এখন লক্ষপতি। ঠিকাদারি করে বড়লোক হয়ে গেছে।

নিমাইদা বড়লোক হয়ে গেছে? আর অঞ্জলিদি? ইচ্ছে হল জিজ্ঞেস করি। কিন্তু সাহস হল না। স্মৃতির সূত্র ধরে অন্বেষণ করলাম, কে এই অপরিচিতা? কে এই শৈশবসঙ্গিনী?

তবু বলতে পারলাম না তোমাকে চিনতে পারিনি, স্পষ্ট করে বলো, কে তুমি।

কথা, কথা, কথা। হঠাৎ সে হেসে উঠল। বললে, তিমুদা এত তো লেখো, আমাদের কথা নিয়ে লেখো না একটা বই।

কি যেন বলতে গেলাম, তার আগেই ছোট্ট একটি স্টেশনে এসে ট্রেন থামলো।

উঠে দাঁড়াল সে।—চলি। এখানেই নামবো। ও এখন এই সেকশনেই রিলিভিং করছে।

জিনিসপত্র এবং কন্যাদুটিকে প্লাটফর্মে নামিয়ে ফিরে তাকালো।—তিমুদা, এসো না একদিন সময় করে। সত্যি, কত কথা ছিল, কিছুই বলা হল না। আসবে একদিন? যে-কোনো শনিবারে এসে সোমবারে চলো যেয়ো। কথা দিচ্ছি ছেড়ে দেবো।

ট্রেন চলতে শুরু করেছে তখন।

বললাম, আসবো। আসবো একদিন।

হাত নেড়ে বিদায় জানালো সে; অদৃশ্য হয়ে গেল ক্রমে ক্রমে। আর অদৃশ্য হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দেখলাম, তাকিয়ে আছে সে, হাত নাড়ছে।

নির্জন কামরায় বসে বিরক্তিতে মন ভরে গেল। নিজের স্মরণশক্তিকে অভিসম্পাত দিতে ইচ্ছে হল। একটি মাত্র প্রশ্ন—সমস্ত শরীর জুড়ে যেন বোলতার হুল ফুটিয়ে চলেছে। কে এই অপরিচিতা? কে এই শৈশবের সঙ্গিনী?

কোন চেহারার সঙ্গেই যেন মিল খুঁজে পেলাম না। মনে হল, রাত্রির আবছা আলোয় যেন এক রহস্যময়ী নারী হাতছানি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মনে হল, ভুল করেছি। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকেই বঞ্চিত করেছি।

কি প্রয়োজন ছিল এই মিথ্যাচারের। স্পষ্ট ভাষায় কেন প্রকাশ করে বললাম না, চিনতে পারিনি তোমাকে, কে তুমি বলো, কে তুমি আজো আমাকে বিস্মৃত হওনি?

হাজারো প্রশ্ন গুনগুন করলো কানের পাশে।

মীরা? নিরু? পান্না?

তন্ময় হয়ে ভাবতে চেষ্টা করি। স্মৃতিসমুদ্র থেকে এই একটি অচেনা মুক্তোকে কি তুলে আনতে পারবো না? চিন্তার জালে নিজেরই অজান্তে কখন জড়িয়ে পড়ি।

কত ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত ঘটনা মনে পড়ে। কত বিচিত্র চরিত্র।

এই চলন্ত ট্রেনের মতোই খাপছাড়া। গন্তব্য ভুলে যাওয়া লক্ষ লক্ষ তুচ্ছ মুহূর্ত।

মানুষের জীবনটা যেন এই ট্রেনেরই মতো। কত যাত্রী ওঠে নামে, কত কাহিনী, হাসি কান্না, কত বৈচিত্র্য। হঠাৎ যেন একটি মুখ মনের পটে ভেসে উঠেই মিলিয়ে যায়, মনে পড়ে অন্য কিছু, একটি দৃশ্য টেনে আনে অন্য ছবি। সব যেন অসংলগ্ন, তবু কোথায় যেন একজনের সঙ্গে আরেকজনের যোগসূত্র রয়েছে। খাপছাড়া হয়েও নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেবার আশ্বাস। ভুলে গিয়েও কোথায় যেন ব্যথা বাজে।

আবিদ হোসেনকে মনে পড়ে। মক্কায় গিয়ে হাজী হয়ে কি ফুলজান বিবিকে ভুলতে পেরেছিল আবিদ হোসেন? আর ফুলজান বিবি? জুতাপালিশ সাহেব স্টুয়ার্টের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে সুখী হয়েছিল সে?

কে জানে!

কিন্তু কে এই অপরিচিতা? ট্রেনের কামরায় হঠাৎ-দেখা-হওয়া কে এই অনন্তরঙ্গিনী? চিরকালের জন্যে যে আমার কাছে অজ্ঞাত রয়ে গেল।

কতদিন নিঃশব্দ রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনে পড়ে গেছে, স্মৃতির গ্রন্থি খুলে খুলে তন্ন তন্ন করে খুঁজেছি তাকে। কে এই রহস্যময়ী?

মীরা?

বিকাশবাবুর খিড়কিঘরের গরমে অঙ্ক কষতে কষতে উঠে এসে কপাটের কড়া নাড়তাম।—এক গ্লাস জল দাও মীরা।

—আবার পড়ায় ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, না?

হাসতাম ওর শাসন দেখে।—বড় হয়ে আর যাই হও ইস্কুলের মাস্টারনী হয়ো না মীরা। যা কড়া শাসন তোমার।

কড়া শাসন ছিল মীরার নয়, আন্নামাসীর। চেলা কাঠ নিয়ে তাড়া করছে আন্নামাসী, আর ঘরের এক কোণ থেকে আরেক কোণে ছুটে বেড়াচ্ছে রামাই পণ্ডিত। অথচ রামাই পণ্ডিত সম্পর্কে কত বড় ধারণাই না ছিল। পরী তার পিছনে পিছনে ঘুরতো, প্রেতাত্মা নামানোর মন্ত্র শেখবার জন্যে।

আর আমি ভেবেছিলাম আলোবৌয়ের জন্যে বশীকরণ মাদুলী চাইবো। মনে পড়লে হাসি পায়।

বেচারী। মাতাল স্বামীর হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল, কিন্তু ধরা পড়েছিল প্রবৃত্তির হাতে। মঙ্গলের সঙ্গে চলে গিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু সে ঘরও ভাঙলো তার।

আর অঞ্জলিদি? দুঃখ হয়, অঞ্জলিদি জানতেও পারলো না, নিমাইদা সত্যিই ফিরে এসেছিল।

—আমাকে একটু বিষ এনে দিতে পারিস তিমু?

এনে দিয়েছিলাম। হাসপাতাল থেকে চুরি করে।

অঞ্জলিদির কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে অবনীদাকে। আর বিলাইতিকে।

ছত্রিশগড়িয়া মেয়ে বিলাইতি। দোতলার জাফরিতে চোখ রেখে দেখতাম, কাজ সেরে উঠোনের কলে স্নান করতো সে। সারা শরীরে যৌবনের জোয়ার, শক্ত সমর্থ দেহের লুব্ধতা।

কিন্তু পান্নার কাছে সকলের স্মৃতিই ম্লান হয়ে গেছে। জীবনের প্রথম প্রেমের স্পর্শ দিয়েছিল সে।

শীতের রাতে গায়ে চাদর জড়িয়ে পা টিপে টিপে এসে দাঁড়াতাম বাগানের শিউলি গাছটার নীচে। তারপর অপেক্ষা করতাম। একসময় কপাট খুলে বেরিয়ে আসতো পান্নার ছায়াশরীর। ভীতত্রস্ত পায়ে ছুটে আসতো সে।

—এ কি, এই শীতে, চাদর গায়ে দিয়ে এলে না কেন? জিজ্ঞেস করেছিলাম।

তারপর আমার চাদরের অর্ধাংশ ওর গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বুকের কাছে টেনে নিয়েছিলাম ওকে।

এমনি কত দিনের কত তুচ্ছ মুহূর্ত মনে পড়ে। আর সেই শেষ বিদায়ের লগ্ন। প্রতিবেশীদের ভিড়ের এক ফাঁকে দাঁড়িয়ে আছে পান্না, করুণ দুটি চোখ মেলে। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

কানে আসছে সদাশিব জ্যাঠার মন্ত্রপাঠ। মন্দিরের কুয়োর জলে স্নান করতে করতে তুলসীদাস আবৃত্তি করছেন।

কত কথাই মনে পড়ে। দীর্ঘ এক যুগ পরে ট্রেনের কামরায় হঠাৎ-দেখা-হওয়া এই অপরিচিতাকে স্মৃতির সমুদ্রে অন্বেষণ করতে করতে মন ডুবে যায় অতীতের অন্ধকারে।

ছোটবেলার রোমাঞ্চময় জীবনে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু···

১

ছোটবেলার সব কথা তো কই মনে পড়ে না। শুধু মনে পড়ে, রবিবার বিকেল হলেই আমরা রাস্তার দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতাম। দু-ঘোড়ার ফিটনটা এসে থামতো নিরুদের খিড়কির সামনে। কোচোয়ানটা যেখানে বসতো আর বাঁ-পাশেই ছিল ফুলদানির মতো একটা লম্বা চোঙা। তার ভেতর হাতের চাবুকটা গেঁথে রেখে নামতো সে, নেমে এসে সেলাম করতো দাদুকে।

সেদিনও যথারীতি এসে দাঁড়াল ফিটনটা। ধুপ-পর্দা খোলাই ছিল, দূর থেকেই দেখা যাচ্ছিল সাদা সাদা দাড়িতে ঢাকা ফরসা মুখখানা। আমরা ক-জন অন্যদিনের মতোই ছুটে এলাম। কিন্তু অন্য অন্য রবিবারের বিকেলের মতো দাদু এক-মুখ হাসি নিয়ে আমাদের মধ্যে থেকে একজনকে কোলে তুলে নিলেন না।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম সবাই। দেখলাম, দাদুর দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

কে যেন ছুটে গিয়ে খবর দিলো মাসীমাকে। মাসীমা ছুটতে ছুটতে এলেন, উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায় জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে বাবা? কাঁদছো কেন, কি হয়েছে কি?

দাদু কি বললেন স্পষ্ট শোনা গেল না, বুঝতে পারলাম না আমরা কেউই। শুধু পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। কিন্তু ততক্ষণে মাসীমার চোখ বেয়েও জল নেমেছে। চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন মাসীমা, কান্নার স্বরে কি যেন বলতে বলতে বাসায় ঢুকলেন। আর নিরুর দিদিরা ধরাধরি করে নিয়ে এল দাদুকে।

ঘরে ঢুকে মাটির ওপর বসে পড়লেন তিনি, দেখে মনে হলো যেন অজ্ঞান হয়ে গেছেন। বড়রা সকলেই তখন কান্নাকাটি করছে, দু-একজন জল আর পাখা নিয়ে এসে দাদুর মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে, বাতাস করছে।

কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম, কান্নাকাটি শুনে নিজেও কেঁদে উঠলাম আমি। অথচ ব্যাপারটা তখন বুঝতে পারিনি।

রবিবারের বিকেলটা এমন একটা দুঃসংবাদ বয়ে আনতে পারে কোনোদিন কল্পনাও করিনি। সারা সপ্তাহে আমাদের কাছে তখন এই সময়টুকুই ছিল সবচেয়ে আনন্দের।

দাদুকে, নিরুর দাদুকে আমরা দেখতে পেতাম অবশ্য অন্য দিনেও। দুপুরে এক সময় হঠাৎ এ রাস্তায় দু-ঘোড়ার ফিটনটা দেখা দিত। আর আমাদের চোখে পড়তো চাপকান পরা দাদুর মুখখানা, মাথায় কালো পাগড়ির মত শামলা, তা থেকে একটা ঝুঁটি দুলতো। কালো

চাপকানের বুকের প্রত্যেকটি বোতাম আঁটা থাকতো গলা অবধি। আর তার ওপর ফর্সা মুখে এক মুখ সাদা দাড়ি, বজ্রগম্ভীর চোখ, মাথায় সাদা ফিকে চুলের রাশি। সে-সব দিনে দাদুর কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হতো না, কেমন ভয়-ভয় করতো আমাদের।

আসলে নিরুর দাদু, তা থেকে আমাদের সকলেরই। পাড়ার ছোট বয়সের সকলেরই দাদু ছিলেন তিনি। রেলের হাই স্কুলের হেডমাস্টার এবং তার সঙ্গে অন্যান্য ছোটখাটো ইস্কুলগুলো তদারক করার ভারও ছিল তাঁর ওপর। তাই দুপুর বেলায় কোনোদিন যেতেন খরিদা বা মালঞ্চর ইস্কুল দেখতে, কোনদিন নিউ সেটেলমেন্ট অথবা সাহেবপাড়ার ইস্কুলে।

কিন্তু রবিবার বিকেলে এই মানুষই একেবারে বদলে যেতেন। চোগাচাপকান নয়, ধুতি পাঞ্জাবি পরে হাসতে হাসতে ফিটন থেকে নামতেন, যাকে সামনে পেতেন কোলে তুলে নিয়ে এসে বসতেন নিরুদের বাসায়।

নিরুর মা অর্থাৎ আমাদের 'মাসীমা' ছিলেন তাঁর বড় মেয়ে। মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে দেখা করার নাম করে আসতেন বটে, আসলে কিন্তু, বেশ বুঝতে পারতাম, আমাদের সঙ্গে বসে গল্পগুজব করতেই তিনি ভালবাসতেন। তেমনি সমান ভাল লাগতো আমাদেরও, নিরুর দাদুকে, দাদুর মুখে গল্প শুনতে।

বড়রা সবাই দাদুকে শ্রদ্ধা করতো, এমন বিদ্বান লোক নাকি আমাদের ঐ রেল কলোনিটায় আর একজনও ছিল না। বাবাও একদিন বলেছিলেন, উনি হলেন ঋষি মানুষ। কত দেশে বিদেশে ঘুরেছেন, কত পড়াশোনা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আর এই যে শহরটা, এ শহরে প্রথম ইট গাঁথার দিন থেকে দেখে আসছেন সব। খাস বিলেতী সাহেব ছিলেন আমাদের সি এম ই রবার্সন, সেও আমাদের মতোই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতো মল্লিক মশাইকে, বিপদে পড়লেই বুদ্ধি নিতে ছুটে আসতো ওঁর কাছে।

শুনে শুনে গর্বে বুক ফুলে উঠতো আমাদের। এমন লোকের সঙ্গে গা ঘেঁষে বসতে পাই আমরা। এমন মানুষ কিনা ফিটন থেকে নেমে নিজেই কোলে তুলে নেন আমাদের।

দাদুর গল্প শুনতেও উৎসাহ কম ছিল না।

একদিন বলেছিলাম, ও দাদু, এই সব ঘর বাড়ি পৃথিবী মানুষ সবই তো ভগবান তৈরি করেছেন অনেক দিন আগে। তবে যে বাবা বলছিল এই শহর তৈরি হবার আগে থেকেই আছো তুমি!

শুনে হাসলেন দাদু। বললেন, এই যে মাদুরটায় বসে রয়েছি, কে এনেছে এটা?

নিরু বোকা-বোকা চোখ মেলে বললে, ওটা তো বাবা এনেছে। গত রবিবারে গোলবাজার থেকে কিনে এনেছে।

দাদু হেসে বললেন, মিথ্যে কথা। আমি তো দেখলাম রতন বয়ে আনছিল ওটা।

রতন নিরুদের বাড়ির একটা বাচ্চা চাকর। তাই নিরু বলে উঠল, বাঃ রে,ও তো শুধু বয়ে এনেছে, এনেছে তো বাবা।

দাদু আবার তেমনি প্রশান্ত হাসি হাসলেন, বললেন, ভগবানও তাই। এই সব ঘর বাড়ি মানুষই করেছে, কিন্তু করাচ্ছেন ভগবান।

আমি বলে উঠলাম, এ সবই মানুষ করেছে? আমাদের ঐ কারখানাটাও মানুষ করেছে? মানুষকে করতে দেখেছো তুমি?

দাদু আমাকে কাছে টেনে নিলেন। বললেন, হ্যাঁ রে দাদু হ্যাঁ। ও-কারখানা আমার চোখের সামনে গড়ে তুলতে দেখেছি। এই শহর, রেল লাইন, ট্রেন, সব আমার সামনে হয়েছে।

দাদু গল্প বলে যেতেন আর আমরা যেন চোখের সামনে দেখতে পেতাম সে-সব ছবি।

বলতেন, তখন এ জায়গাটা ছিল একেবারে জঙ্গল। আর বনের মাঝখানে. ঐ যেখানটার

নাম ইঁদা, ঐখানে ছিল একটা মন্দির। খড়্গেশ্বরের মন্দির ছিল ওখানে, একজন কাপালিক একটা মড়ার উপর বসে তন্ত্র সাধনা করতো আর মড়ার খুলিতে করে কারণ পান করতো।

—কারণ কি দাদু? আমরা কেউ একজন প্রশ্ন করে বসতাম।

দাদু বলতেন, কারণ হল মন্ত্রপূত সুধা। অমৃত।

'কারণ' কথাটার সহজ মানে যে 'মদ' তা বলতেন না।

তারপর আবার গল্প শুরু করতেন। সাত সমুদ্রের ওপারে যে পরীর দেশ সেখান থেকে খাস ইংরেজরা নাকি প্রথম এদেশে এসে রেলের লাইন পাতলে। রেলের লাইন দিয়ে দেশটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে মানুষগুলোকে পোষ মানালে। তারা ছিল ইংরেজ, অথচ এদেশের লোকগুলো কথা বলতো বাংলায়। ইংরেজি জানতো না কেউ। তাই সাহেবের দল দাদুকে চাকরি দিল। বললে, তুমি হবে আমাদের 'ডুবাশ' অর্থাৎ তর্জমাদার, আমাদের কথা বাংলা করে বুঝিয়ে দেবে বাঙালীদের, আর বাঙালীদের কথাগুলো ইংরেজি করে বলবে আমাদের।

চাকরি পেয়ে দাদু তো মহা খুশি। কে জানতো যে সাহেবের দলের সঙ্গে বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে হবে। কখনো নৌকায়, কখনো ঘোড়ার পিঠে চেপে, কখনও হাঁটুজল হেঁটে—শেষে এইখানে এসে একদিন তাঁবু ফেললো সাহেবের দল। বন জঙ্গল সাফ করলো। তারপর, দিনের পর দিন চললো মাপজোখ।

হাতি এল, হাতির পিঠে এল মালপত্র লোহালক্কড়। আর একটা উটের গাড়ি।

—উটের গাড়ি? বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করলাম।

দাদু হাসলেন। বললেন, হ্যাঁ, উটের গাড়ি তোরা দেখিস নি। একটা উটের পেছনে দুটো চাকার উপর বসানো গাড়ি ছিল, তার আবার একতলা আর দোতলা। একতলায় থাকতো মালপত্র, আর দোতলায় মানুষ বসতো। গাড়িটাও যেমন নড়বড় করে চলতো তেমনি গাড়ির পেছনে পেছনে আসতো আরেকটা উট। এক ক্রোশ পার হলেই পিছনের উটটা সামনে জুড়ে দেওয়া হতো, সামনের উটটা বিশ্রাম পেতো পিছনে গিয়ে। সে-সব কি আজকের দিনের কথা রে, তখন সবে শালবনী পর্যন্ত রেলের লাইন এসেছে।

নিরু আশ্চর্য হয়ে বলে উঠতো, সে কি দাদু, হাওড়া ছিল না তখন? কোলকাতায় ট্রেন যেতো না?

—কোলকাতা? দাদু হেসে বলতেন, শালবনী থেকে এখান অবধি রেল পাততে আট মাস লেগেছিল, রেল পাতা হল অমনি বৃষ্টিতে বানে ধুয়ে গেল লাইন। এমনি করে দু-বছরে পৌঁছলো কোলাঘাট অবধি। কোলকাতার লোক রূপনারায়ণ পার হয়ে তবে এদিকের রেলে চাপতো। রূপনারাণের পুল হতেই কি কম দিন লেগেছিল।

—তারপর?

'তারপর পত্তন শুরু হল এখানে। প্রথমে তাঁবু আর হোগলার ছাউনি। ভাল ভাল তাঁবুগুলোয় থাকতো সাহেবরা, বাবুরাও পেতো দু-একটা। পুরোনো ছেঁড়াখোঁড়া হলেও তাঁবু তো! কুলিকামিনরা অবশ্য থাকতো হোগলার ছাউনিতে।

'সে একদিনের কথা তা হলে বলি শোন। তখনও কারখানা শুরু হয়নি এখানে। সবে রেল লাইন এসে পৌঁছেছে, স্তূপীকৃত করে রাখা হয়েছে ঐ এখন যেখানটায় ইঞ্জিন-শেড ঐখানটায়। রেললাইন? হ্যাঁ, যন্ত্রপাতি, টুকরো টুকরো রেললাইন, ভারী জিনিসপত্র সব আনতো তখন হাতিতে টেনে টেনে, আর কিছু কিছু জিনিস আসতো উটের গাড়িতে।'

নিরুর জোড়া-বেণী মাথাটা কাছে টেনে নিয়ে দাদু বললেন, এই যে দেখছিস নিরুর কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি, ঠিক এমনি দু-পাশে জঙ্গল আর মাঝখান দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে তখন। সি এম ই-র বাংলোর পিছন দিয়ে যেখানে লাইন গেছে ঐখানে

ছিল দুটো উঁচু পাহাড়। সেই পাহাড়টা কাটতে বাকি তখন। এদিকে যেটুকু পথ পরিষ্কার করা হয়েছে তার উপর মাটি ফেলে উঁচু করা হচ্ছে। শুনলাম, বিলেত থেকে কোম্পানি খাস সাহেব ইঞ্জিনিয়ার পাঠাচ্ছে, তার চোখের সামনে পাহাড় কাটা হবে নতুন কি একটা যন্ত্র দিয়ে। আর রেল লাইনও পাতা হবে তার তদারকিতে। কিন্তু কে জানতো কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ এসে হাজির হবে সেই সাহেব। রাত্তিরে সব তাঁবুতে ঘুমিয়ে আছি, জ্যোৎস্না রাত, হঠাৎ কানে এল বেশ একটা মিষ্টি আওয়াজ। ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম····ঠিক যেন ঘুঙুর পরে কেউ নাচছে। অনেকক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইলাম, আর ভাবলাম কে হতে পারে। এতো রাত্তিরে নাচার শখ হল কার। অথচ অনেক দূর থেকে যেন ক্রমশই কাছে আসছে শব্দটা। হঠাৎ ভয় হল। কাপালিকটা নয় তো? আমাদের পত্তনদার দলটায় সিপাই সাস্ত্রী টোটা বন্দুকের অভাব ছিল না। বাঘ ভাল্লুক কি কম দেখেছি তখন। তবে হ্যাঁ ভয় ছিল বইকি। ভয় পেতাম ঐ কাপালিকটাকে। দেখেছিলামও একদিন। আমি আর ওয়াট্‌সন সাহেব, দু-জনে বন্দুক হাতে নিয়ে বেরিয়েছিলাম সন্ধের দিকে। দূর থেকে মন্দিরের ভাঙা চূড়াটা দেখা যেতো তাই ইচ্ছে হতো ভেতরে কি আছে দেখবার।

অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করতাম, কাপালিক দেখেছো দাদু?

দাদু হাসতেন আমার কথা শুনে।

বলতেন, দেখেছি। আমি আর ওয়াটস্‌ন সাহেব, আমরাই প্রথম দেখি। ইঁদা পর্যন্ত যেতে যেতে বেশ রাত হয়ে গেল সেদিন। তবু বন্দুক হাতে নিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা—দেখতে হবে মন্দিরটা কিসের। জঙ্গলের মধ্যে, যেখানে মানুষের চিহ্ন নেই কোথাও, সেখানে মন্দির এল কোত্থেকে। অথচ মন্দিরটায় কেউ একজন যে থাকে বেশ বুঝতে পারতাম। প্রায়ই দূর থেকে দেখতে পেতাম মন্দিরের কাছ থেকে ধোঁয়া উঠছে। আর কোনো কোনোদিন রাত্তিরে আগুন জ্বলতেও দেখতে পেতাম।

মন্ত্রে-তন্ত্রে দাদুর বিশ্বাস ছিল না মোটেই। কিন্তু যখন কাপালিকের বর্ণনা দিতেন, ভয়ে শিউরে উঠতাম আমরা, আরো ঘন হয়ে বসতাম দাদুর কাছে, দাদুকে ছুঁয়ে।

গনগনে আগুন জ্বলছে সামনে, একটা মড়ার ওপর কাপালিক বসে রয়েছে, আগুনের ভাঁটার মতো দুটো লাল চোখ অন্ধকারেও যেন জ্বলছে।

দাদুর গল্প শুনতে শুনতে আমরাও ঠিক যেন দেখতে পেতাম কাপালিককে। শুধু কাপালিকই নয়, যা কিছু বলতেন তিনি, বর্ণনা দিতেন, তা যেন চোখে দেখতে পেতাম।

আর তাই হয়তো এত ভাল লাগত নিরুর দাদুকে, নিরুর দাদুর মুখে গল্প শুনতে। আর তাঁর হাসি-হাসি মুখের সঙ্গে আমাদের পরিচয় এতো ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিল যে কোনোদিন তাঁর কান্নাভরা চোখ দেখতে হবে কল্পনাও করিনি।

নিরুর দাদু আর নিরুর মার কান্না দেখে আমি কেঁদে উঠেছিলাম প্রথমটা, অথচ বুঝতে পারিনি কি ঘটেছে, কেন এমন বিপদের ছায়া নেমেছে নিরুদের বাড়িতে।

শুনলাম ক্রমশ। সব কথা অবশ্য কেউই স্পষ্ট করে বলতে পারেনি। তবু কিছুটা বাবা-মার আলোচনা শুনে ব্যাপারটা বুঝলাম।

কিন্তু এও কি সম্ভব! স্বপ্ন কি তাহলে সত্যি হয়? তবে যে দাদু বলতেন, স্বপ্ন স্বপ্নই, স্বপ্ন সত্যি নয়!

নিরুর মামাকে মনে পড়লো। মনে পড়লো তাঁর বিয়ের দিনে মাসীমা আমাদের সামনে বসে খাইয়েছিলেন কত কী। সারিবন্দী হয়ে সবাই বসেছিল—পল্টু, দিদি, নিভার মা, আঁটুলের ছোট কাকী, মন্টু, মানী, আলো, কুসুম সবাই। আর মার পাশেই বসেছিলাম আমি। নিরুর মা আমার সামনে বসে যত রকমের মিষ্টি সব দুটো দুটো করে দিয়েছিলেন আমাকে। আর মা যত বলে, খেতে পারবো না, মাসীমা তত হাতা ভরে ভরে মাছ ঢেলে

দিয়েছিলেন মা'র পাতে। এত লোক তো এসেছিল নেমন্তন্ন খেতে, এমনকি ইঞ্জিনিয়ারবাবুর মেয়েরাও এসেছিল ও-পাড়া থেকে, কিন্তু অত আদর-যত্ন কাউকে করেনি মাসীমা। সেদিন এত ভাল লেগেছিল তাই মাসীমাকে।

কি সুন্দর বৌ হয়েছিল নিরুর মামার। মা শিখিয়ে দিয়েছিল, তাই মা যখন তাঁর হাতে দুটো রুপোর টাকা দিল আর মামীমা মাকে প্রণাম করে উঠল, তখন আমিও চট্‌ করে মামীমাকে প্রণাম করে নিলাম।

আমার চিবুকে হাত দিয়ে নাম জিজ্ঞেস করেছিলেন মামীমা হাসতে হাসতে। কি সুন্দর যে হাসি ছিল রাঙামামীমার। হ্যাঁ, নিরুদের দেখাদেখি আমরাও রাঙামামীমা বলতাম তাঁকে।

সিঁদুরের কৌটোয় হাত দিলেই মেজদি ঠাস-ঠাস করে চড় বসিয়ে দিতো গালে, মা বকুনি দিত, অথচ নিরুর রাঙামামীমা কেমন আদর করে কাছে ডাকতেন, কাচের শিশিটা হাতে নিয়ে সবুজ দূর্বাঘাসের ওপর সিঁদুর ছড়িয়ে দিতেন, আমাদের মতোই সুর টেনে টেনে বলতেন, 'বীরবাবটি চটিমটি খোলো তোমার চোখ'।

বীরবাবটি! কে যে এমন অদ্ভুত নাম দিয়েছিল। চাঁদমারির ময়দানে চলে যেতাম আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে, বর্ষাকালে নতুন-গজানো ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে খুঁজে বেড়াতাম বীরবাবটি। সিঁদুরের মতো লাল টুকটুকে আর ভেলভেটের মতো নরম ছোট ছোট পোকাগুলো ঘাসের আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াতো। হালকা হাতে তুলে নিয়ে পুরে রাখতাম শিশির ভেতর। ঘাস আর সিঁদুর বিছিয়ে দিতাম শিশিতে, তা নইলে বীরবাবটি বাঁচে না।

কতো দিন যে বীরবাবটির খোঁজে চাঁদমারির ময়দানে চলে গিয়েছি, ফিরে এসে বকুনিও খেয়েছি বাবার কাছে। কিন্তু হিজলির দিকটায় কোনদিনই যেতে সাহস হয়নি। অন্যমনস্ক ভাবে গল্প করতে করতে সেদিন তাই হঠাৎ যখন খেয়াল হল অতদূর চলে গেছি, কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম। কিন্তু…

পাথরের থামটার ওপর চোখ পড়তেই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। এই সেই পত্তনি-নিশানা! যার গল্প এতবার শুনেছি দাদুর মুখে?

রেল বসাতে এসে সাহেবের দল নাকি এখানেই প্রথম তাঁবু ফেলেছিল।

বেঁটেখাটো থামটার গায়ে ইংরেজিতে কতো কি লেখা। কে জানে, হয়তো দাদুর মুখে যে-সব গল্প শুনতাম তারই একটা!

তন্ময় হয়ে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল আমার কানেও যেন ভেসে আসছে ঝুমুর ঝুম ঝুমুর ঝুম ঘুঙুরের শব্দ। জ্যোৎস্না রাত যেন, গাছের পাতা নড়ছে আর তার ছায়ায় লুকিয়ে লুকিয়ে কারা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে চতুর্দিকে। আর দূর থেকে ভেসে আসছে কয়েকজোড়া ঘুঙুরের শব্দ। দাদু আর ওয়াটস্‌ন সাহেব বন্দুক কাঁধে নিয়ে ঝুমুরের শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন খড়্গেশ্বরের মন্দিরের দিকে। হঠাৎ দেখতে পেলেন দূর থেকে কয়েকটা মশাল এগিয়ে আসছে, আর ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে ঘুঙুরের শব্দ।

তারপর এক সময় দেখতে পেলেন সামনে জনকয়েক সান্ত্রী, দু-জনের হাতে জ্বলন্ত মশাল, একজন সাহেব ঘোড়ার পিঠে আসছে আগে আগে, আর পিছনে বারো বেহারার ঝলমলে ঝালর-দোলানো পালকি।

ওয়াট্‌সন সাহেবের পিছনে পিছনে দাদুও এগিয়ে গেলেন। পালকিতে বসে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব, দাদু সেলাম জানিয়ে তাঁবুর দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁদের।

মাপজোখ জরিপ নক্সা শুরু হল।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেব বললেন, মল্লিক, এসেছি পালকিতে, কিন্তু ফিরবো রেলগাড়িতে। তোমার দেশের নদীতে যতোই বান ডাকুক আমার কাছে সে বন্দী হবেই।

বন্দী সত্যিই হয়েছিল—শুধু নদীই নয়, মাটি, মানুষ, সবাই।

দাদু সখেদে বলতেন, রেলের লাইন তো নয়, ইস্পাতের বন্ধন। সারা দেশটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধবার জন্যেই এসেছিল সাহেবের দল, তখন কি ছাই বুঝতাম।

বাঁধবার জন্যে ? বন্দী করবার জন্যে ? এই রেলের গাড়িতে চড়ে কত দেশ বিদেশ ঘুরে আসছে মানুষ, রাঙামামীমা যেদিন চলে গেলেন রেলগাড়ি করে, জানালায় বসেছিলেন, চোখ ছলছল করছিল তাঁর, কিন্তু কি সুন্দরই না লাগছিল। এই রেল নাকি বন্দী করে ফেলেছে সবাইকে—কেন যে একথা বলেন দাদু!

—এই তিমু ; কি, দেখছিস কি! চিৎকার করে ধমক দিলে নিরু।

তন্ময়তা ঘুচে গেল। কি আশ্চর্য! বীরবাবটির কথা ভুলে এতক্ষণ তা হলে পত্তনি-নিশানার দিকে তাকিয়ে ছিলাম!

বললাম, পেয়েছিস কিছু ?

—না রে! বিষ্টির ভয়ে সব গর্তে লুকিয়েছে। চল্ চল্ সন্দে হয়ে এল।

মেঘ হয়ে এল তাই, না সত্যি সন্ধে হয়ে গিয়েছিল, আকাশের দিকে তাকিয়ে ঠাওর করতে পারলাম না।

বললাম, চল ভাই, দেরি হলে সেজদি আবার বাবার কাছে চুকলি কাটবে।

নিরু কি যেন উত্তর দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আমরা প্রাণপণে দৌড়তে শুরু করেছি। ঝিরঝির ঝিরঝির করে গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল সারাটা দিন, কিন্তু হঠাৎ এক দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ বড়-বড় ফোঁটা পড়তে শুরু হল। ঝড় আর বৃষ্টি এল এক সঙ্গে!

রেল লাইন পার হয়ে ধোবি-ঘাটের দিকে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ খেয়াল হল নিরু, পরী, বাঁটুল কেউই সঙ্গে নেই। কে কোথায় ছিটকে গেছে। এদিকে বৃষ্টিতে তখন সারা শরীর ভিজে জবজব করছে। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লাম সাহেবপাড়ার শেষ প্রান্তে রেল লাইনের ধার ঘেঁষে যে বাংলোটা, তারই ভেতর। এ বাড়িটায় যে কেউ থাকে না, এমন কি মালীও নেই বাগানের, তা জানতাম। কাছে পিঠে অন্য কোন বাংলোও ছিল না, পোড়ো বাড়ির মতো কেমন যেন দলছাড়া। তাই যখন রাস্তায় কোন সাহেব-সুবো থাকতো না তখন চট্ করে বাংলোর বাগানে ঢুকে পড়ে ফুল চুরি করতাম আমরা। কিন্তু বাড়িটার ভিতরে ঢোকার সাহস হয় নি কোনদিন।

সেদিনও, বাড়িটা ফাঁকা জেনেও ভিতরে ঢুকতে পারলাম না, এসে দাঁড়ালাম টালির ছাদের কার্নিসটার নীচে। এদিক ওদিক ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে দেখলাম কেউ কাছে পিঠে আছে কিনা। তারপর একটু একটু করে বারান্দাটায় উঠে দাঁড়ালাম। কার্নিসের নীচেও বৃষ্টির ছাঁট আসছিল বলেই নয়, বারান্দা থেকে হয়তো নিরু, পরী, বাঁটুলদের দেখতে পাওয়া যাবে কোথাও না কোথাও, এই ভরসায়।

হঠাৎ একটা মেয়েলী গলার চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম। সারা গা শিউরে উঠল যেন। বেশ ভয়ে ভয়েই বাংলোর জানালার দিকে তাকালাম। হ্যাঁ, স্পষ্ট মনে হল যেন বাংলোর ভেতর থেকেই চিৎকারটা ভেসে এল। মেয়েলী গলারই চিৎকার যেন। শব্দটাই শুনতে পেলাম, কিন্তু কথাটা বোঝা গেল না। তীব্র চিৎকারে কে যেন বললে, বাঁচাও। সে কণ্ঠস্বরে ভয় আর কান্না মেশানো ছিল। কিন্তু এই নির্জন বাড়ির ভেতর থেকে কে চিৎকার করলো ? কে আছে বাড়ির মধ্যে ?

বেশ কিছুক্ষণ নিশ্বাস রোধ করে অপেক্ষা করলাম। পরীটাই কোথাও লুকিয়ে থেকে ভয় দেখাচ্ছে না তো ?

আবার সেই কান্নাকণ্ঠের চিৎকার ভেসে এল। আর্তস্বরে কে যেন বাঁচাতে বলছে তাকে।

না, এ গলা কখনও পরীর নয়।

হঠাৎ সারা গা ছমছম করে উঠল। ধীরে ধীরে পা টিপে হলটার দিকে এগিয়ে গেলাম। না, কপাটে একটা বড় তালা ঝুলছে। মরচে পড়ে গেছে তালাটায়। বহু দিন বোধ হয় খোলাই হয়নি।

তবে ?

হঠাৎ প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলাম বৃষ্টির মধ্যেই। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে, ফিরে তাকাতেও সাহস হচ্ছে না তখন।

কিন্তু বাড়ি ফিরে সে-কথা কাউকে বলিনি। বলতে সাহস হয়নি। চাঁদমারির ময়দানে বীরবাবটি খুঁজতে গিয়েছিলাম এ-কথা জানলে কি মেজদি আস্ত রাখবে !

আর বাবা শুনলে তো আপিস যাবার সময় ঘরে তালাবন্ধ করে রেখে যাবেন। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল। ও ভুতুড়ে বাংলোটায় না হয় আর কোনদিন যাবো না।

কিন্তু মন থেকে ভয় গেল না।

বেশ কয়েকদিন পরে হঠাৎ মাঝরাত্তিরে স্বপ্ন দেখলাম। ফুটফুটে সাদা কাপড় পরে একটি মেয়ে, গলা টিপে ধরেছে আমার।

স্বপ্নেই ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলাম।

মা ঠেলে ঘুম ভাঙিয়ে দিল। কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললে, কি হয়েছে তিমু ? কাঁদছিস কেন ? স্বপ্ন দেখছিলি ?

ঘুম ভাঙতেই টের পেলাম, সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। সব তা হলে স্বপ্ন ! সত্যি নয় ? স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

মা বার বার জিজ্ঞেস করলে, কি দেখছিলি কি ? কি হয়েছে তিমু ?

উত্তর দিলাম না। নিঃশব্দে মাকে আরও আঁকড়ে ধরলাম।

শুধু দাদুকে একদিন চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা দাদু, সত্যিই ভূত আছে, না ?

দাদু হেসে উত্তর দিলেন, দূর পাগল। ভূত বলে কিছু নেই, ও-সব ভয় দেখাবার জন্যে বলে।

ভূত নেই ? কি আশ্চর্য, দাদু এত জানে, এত বিদ্যেবুদ্ধি, আর এই খবরটুকু জানে না দাদু ? আমি যে শুনেছি, নিজের কানে শুনেছি ! কিন্তু সে-কথা দাদুকে বলবো কি করে ? এমনকি নিরু পরী বাঁটুল ওদেরও বলা যায় না। ওরা হয়তো গল্প করবে দাদুর কাছে, তারপর সে-কথা হয়তো বাবার কানে পৌঁছে যাবে।

উঃ, বাবাকে কি ভয়টাই না করতাম। আমাদের সঙ্গে কথাবার্তাও খুব কম বলতেন বাবা। দশটার সময় আপিসে যখন বেরিয়ে যেতেন সবাই যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচতাম। আর সন্ধের সময় যখন ফিরতেন আপিস থেকে, তখন তটস্থ থাকতো মেজদি সেজদিরাও। শুধু আশ্চর্য হতাম দেখে যে মা একটুও ভয় পেতো না বাবাকে। তবে কোনোদিনই রয়েবসে মা-র সঙ্গে গল্প করতে দেখতাম না বাবাকে। মাকে কেমন যেন এড়িয়ে এড়িয়েই চলতেন।

তাই সে-রাত্রে সত্যিই আশ্চর্য লেগেছিল। মাঝ রাত্রে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল কিসের শব্দে। তবু যেমন চোখ বুজে শুয়েছিলাম তেমনি শুয়ে রইলাম।

কানে এল, কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। গলাও চিনতে পারলাম একটু পরেই। মা আর বাবা।

—আর একটা মাস তো, দেখি চেষ্টা করে।

বাবা বললেন ফিসফিস করে।

মাও তেমনি চাপা গলায় বললে, কিন্তু এমন টানাটানিতে এ মাসটাই বা চালাই কি করে ? বিম্‌লার বিয়ের চেষ্টাও তো করছো না। সেটাও তো ভাবতে হবে।

—ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, বিম্‌লাকে আর একা একা ইস্কুলে যেতে দিও না।

—কেন ? একা না গেলে লোক পাব কোথায় পৌঁছে দিয়ে আসবার !

—শুনলাম, আমাদের আপিসের উমেশবাবুর মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না।

মা-র গলায় যেন বিস্ময় ফুটলো।—সে কি ! উমেশবাবুর মেয়ে সুধা ? পাওয়া যাচ্ছে না ? সেবারে পুজোয় যে দেখলাম মেয়েটিকে—খুব সুন্দর দেখতে।

বাবা সায় দিলেন, হ্যাঁ সত্যিই খুব সুন্দর দেখতে। বয়সই বা কত হবে, ষোলো সতেরোর বেশি নয়।

—মেয়েটি কিন্তু খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির। ও মেয়ে নিজে—না, আমার মনে হয় কেউ জোর করে....।

সে রাত্রে অনেকক্ষণ ঘুম আসেনি আমার চোখে। সুধাদি ? সুধাদিকে কেউ জোর করে ধরে নিয়ে গেছে ?

২

আমার জন্মের পরই বছরখানেক নাকি মা শয্যাশায়ী ছিলেন। স্বাস্থ্যও খারাপ হয়ে গিয়েছিল খুব, তাছাড়া রোগও একটা নয়। নানা রকম। ডাক্তারের নিষেধ ছিল রুগ্ন মার দুধ খাওয়ায়। এর ফলে মা এবং ছেলে দু-জনেরই নাকি স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। তাই 'আলোবৌ'কে গ্রাম থেকে আনানো হয়েছিল। প্রযোজন ফুরিয়ে যাওযার পরও সে আমাদের পরিবারের একজন হয়ে গিয়েছিল।

এ সবই আমি পরে শুনেছি। এবং এও শুনেছিলাম যে মঙ্গলের মতো আলোবৌকেও মাসে মাসে মাইনে দিতে হতো।

তা সত্ত্বেও কিন্তু আলোবৌকে আমরা সকলেই বাড়ির লোকের মতোই মনে করতাম, আর মা বাবার মতো আমিও ডাকতাম 'আলোবৌ' বলেই।

মা কখনো-সখনো দুপুরে বা সন্ধ্যায় বেড়াতে যেতো এর ওর বাড়ি, দিদিরাও হয়তো যেতো, আর তখন আমি থাকতাম আলোবৌয়ের কাছেই।

খুব ফরসা ধবধবে রঙ ছিল তার, আর গোলগাল চেহারা। বাড়ির রান্না থেকে শুরু করে সব কাজ করেও মুখের হাসি নিভতো না। ঠিক আমার বয়সের একটা মেয়ে ছিল আলোবৌয়ের, কিন্তু লক্ষ্মীর চেয়ে আমাকেই যেন বেশি পছন্দ করতো সে।

যেদিন বাড়িরে মা-বাবা কোথাও যেত, আমি থাকতাম তার কাছেই। রাত্রে আলোবৌকে আঁকড়ে ধরেই ঘুমোতাম, টের পেতাম না কখন মা ফিরে এসে আমাকে পাশের ঘরে খাটের বিছানায় তুলে শুইয়েছে।

কিন্তু সেই ভুতুড়ে বাংলোয় মেয়েলী গলায় চিৎকার শোনার পর থেকে আমি ভয়ে চমকে উঠতাম কোনো কোনোদিন। তাই একা থাকতে সাহস হতো না।

অথচ সেদিন যে কেন আলোবৌ অমন ব্যবহার করলো ! কাদের বাড়িতে যেন বিয়ের নেমন্তন্ন ছিল। সকলেই বিয়ে বাড়িতে চলে গেল সেজেগুজে। ক-দিন থেকেই আমার জ্বর-জ্বর হচ্ছিল, পেটও ভাল ছিল না, তাই কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও মা আমাকে নিয়ে গেল না। বললে আলোবৌয়ের কাছে শুয়ে থাকিস, আমি সন্দেশ নিয়ে আসবো তোর জন্যে।

কিন্তু, কি আশ্চর্য ! আলোবৌ এত আদর যত্ন করতো আমাকে, অথচ সেদিন তার কাছে কিছুতেই শুতে দিল না। এমন কি লক্ষ্মীকেও আমাদের ঘরে শুইয়ে দিল আমার পাশে।

আমি চোখ বুজে পড়ে রইলাম। আর যেই বুঝতে পারলাম আলোবৌ আস্তে আস্তে উঠে যাচ্ছে, অমনি বলে উঠলাম, তুমি শোও আলোবৌ, আমার ভয় করছে।

অন্যদিন হলে আমাকে জড়িয়ে ধরে ও হয়তো শুয়ে পড়তো তখনই, কিন্তু সেদিন হঠাৎ যেন রেগে গেল আমার ওপর।

বললে, ঘুমো ঘুমো। ভয় আবার কি, আমি পাশের ঘরেই আছি।

বলে আলোবৌ চলে গেল।

আমি অনেকক্ষণ চোখ বুজে পড়ে রইলাম, আর অভিমানে দু-চোখে জল এল।

অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে থেকে হঠাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম আমি। কেমন যেন ভয়-ভয় করছিল, পা টিপে টিপে পাশের ঘরে চলে এলাম।

দেখলাম লণ্ঠনের ফিতেটা কমিয়ে দিয়ে আলোবৌ শুয়ে আছে, আর···মঙ্গল না ?

পা টিপে টিপেই ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম আমি। আর মনে মনে হাসলাম খুব। তবে যে আলোবৌ আমাকে ভীতু বলে ! একা থাকতে কি শুধু আমিই ভয় পাই ? আলোবৌও তো একা শুতে ভয় পায়, তা না হলে—

সে-কথা আমি একদিন রাঙামামীমাকে বলেছিলাম। নিরুর রাঙামামীমাকে।

শুনে রাঙামামীমা খিলখিল করে হেসে উঠে বলেছিলেন, তিমু, এ-কথা আর কাউকে বোলো না, কেমন ?

—কেন রাঙামামীমা ? বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করেছিলাম।

রাঙামামীমা এপাশ ওপাশ দেখে নিয়ে চাপা গলায় বলেছিলেন, আলোবৌ চলে গেলে তোমার কষ্ট হবে না ?

—হ্যাঁ হবে। খুব কষ্ট হবে ! ঘাড় কাত করে বলেছিলাম আমি।

রাঙামামীমা বলেছিলেন, কিন্তু ও-কথা শুনলে তোমার বাবা আলোবৌকে তাড়িয়ে দেবে।

—কেন, তাড়িয়ে দেবে কেন রাঙামামীমা ? বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

রাঙামামীমা হেসে ফেলে বলেছিলেন, বাঃ রে, ভীতু মানুষকে কেউ বাড়িতে রাখে নাকি ? তা হলে সে বাড়ি পাহারা দেবে কি করে ?

ভীতু লোকদের তা হলে কেউ পছন্দ করে না ? অথচ কি ভয়ই না পেতাম। রাণা মাস্টারকেও।

সেদিন আমি প্রথম ইস্কুলে ভরতি হতে গিয়েছি।

ইস্কুলে যেতে আমার একেবারেই ইচ্ছে হতো না। আমার ধারণা ছিল ইস্কুলে গেলেই মাস্টারদের কাছে মার খেতে হয়।

তবু জোর করে বাবা নিয়ে গেলেন, মা কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে বললে, যাও বাবা, অমন করতে নেই। ইস্কুলে তো নিরুর দাদুই হেডমাস্টার। দেখবে কত গল্প বলবেন উনি।

এত অনিচ্ছার মধ্যেও ঐ একটি আনন্দ জেগেছিল, দাদুর গল্প শুনতে পাবো।

বাবার হাত ধরে তো ইস্কুলবাড়িতে ঢুকলাম। আপিস ঘরের সামনে বসা একটি লোককে কি যেন জিজ্ঞেস করলেন বাবা, তারপর ঘরের ভিতর ঢুকতেই দাদুকে দেখতে পেলাম।

কিন্তু সেই মুহূর্তেই সব আনন্দ উবে গেল। নিরুদের বাড়িতে রবিবারের বিকেলে ধুতি পাঞ্জাবি পরা দাদুর সঙ্গে হেডমাস্টার লোকটির যেন আকাশ পাতাল তফাত।

মাথায় কালো শামলা, গায়ে কালো রঙের চাপকান, আর এক মুখ দাড়ির ওপর বজ্রগম্ভীর চোখ। যেন রেগে টং হয়ে আছেন।

মস্ত বড় একটা টেবিলের ওপাশে চেয়ারে বসেছিলেন দাদু। তাঁর ডান পাশে একটা ছোট টেবিলের ওপর কি একটা যন্ত্র, রাঙামামীমা যেমন দু-হাতে অর্গ্যান বাজিয়েছিলেন একদিন,

তেমনি করে দু-হাতে দশ আঙ্গুলে যন্ত্রটায় খটাখট করছিল লোকটা, আর যন্ত্রটা থেকে একটা কাগজ বেরিয়ে আসছিল।

দাদু অর্থাৎ হেডমাস্টারমশাই বাবাকে বসতে বললেন সামনের চেয়ারটায়। তারপর ঘণ্টি বাজিয়ে চাপরাসীটাকে কি যেন বললেন। কিছুক্ষণ পরে চাপরাসীর পিছনে পিছনে এলেন একজন মাস্টারমশাই। কাগজপত্তরে কি সব লেখালিখি হল, হেডমাস্টারমশাই বোধ হয় নাম সই করলেন। তারপর বাবা আমাকে নিয়ে ফিরে এলেন, পরের দিন থেকে যথারীতি ইস্কুলে আসবো এ-কথা জানিয়ে।

বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, চাপরাসীর সঙ্গে যে এল ও কে বাবা?

বাবা হাসলেন।—ঐ তো রাণা মাস্টার। ওর ক্লাসেই ভরতি হলে তুমি।

রাণা মাস্টার! উপাধি রাণা, তা থেকে রাণা মাস্টার। না, ভুলে যাইনি, আসলে তাঁর পুরো নামটা কোনদিন শুনিইনি আমরা। সকলেই চিনতাম শুধু ঐ এক নামে।

বেঁটেখাটো চেহারা, কালো রং, খোঁচা-খোঁচা গোঁফ। সব মিলে কেমন একটা রুক্ষতা ছিল তাঁর সারা শরীরে।

সেদিন বইয়ের থলেটা কাঁধ থেকে নামিয়ে ডেস্কের ওপর রাখলাম, বাবা আর হেডমাস্টারমশাই চলে গেলেন, তার পরমুহূর্তেই রাণা মাস্টার আমার দিকে ক্ষ্যাপা বেড়ালের মতো কট্‌কটে চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি নাম তোর?

নাম বললাম, যথারীতি প্রথমে শ্রী এবং শেষে পদবীটুকু যোগ করে।

রাণা মাস্টার হঠাৎ যেন খেঁকিয়ে উঠলেন।

—বলি উজবুকচন্দ্র, ও নাম তোমার রেজেস্ট্রি খাতাতেই দেখতে পাচ্ছি। এখানে ওসব শ্রী-ট্রি চলবে না, ডাক নাম বলো।

বললাম, মা তিমু বলে ডাকে।

—তিমু? তা বেশ, বসো।

রাণা মাস্টার পড়াতে শুরু করলেন। কিন্তু সেদিকে কান গেল না আমার, চোখ তুলে তাকাতেও লজ্জা হচ্ছিল। প্রথম দিনেই এমন সম্ভাষণ! তা ছাড়া এতগুলো পুরোনো ছেলের মধ্যে আমি এক নবাগত। কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলাম। লক্ষ্য করলাম, ছেলেগুলোও সব আমার দিকে তাকাচ্ছে আড়চোখে। দু-একজন আবার ফিসফিস করে কি যেন বলাবলি করে হাসছিল।

ঘাড় টনটন করছিল ডেস্কের ওপর খুলে রাখা বইটার পাতায় ঝুঁকে থাকতে থাকতে, তবু চোখ তুলতে সাহস হচ্ছিল না।

হঠাৎ পাশেই কে চাপা গলায় প্রশ্ন করলে, কি করে রে তোর বাবা?

চাকরির মধ্যেও যে ইতরবিশেষ আছে, কারখানার চাকরি যে অসম্মানের তা তো জানতাম না।

বললাম, চাকরি করেন।

—চাকরি তো সবাই করে। কারখানায় না আপিসে?

উত্তর দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই রাণা মাস্টারের হুঙ্কার শুনতে পেলাম।—অ্যাই নতুন ছোকরা! এদিকে আয়।

—আয় এখানে! আবার চিৎকার করে উঠলেন রাণা মাস্টার।

ভয়ে ভয়ে এগিয়ে গেলাম, তাঁর কাছে। টেবিলের পাশ ঘেঁষে চুপ করে দাঁড়ালাম।

রাণা মাস্টার চেয়ারের ওপর আসনপিঁড়ি হয়ে বসেছিলেন এতক্ষণ, এবার পা নামালেন। তারপর দেরাজ টেনে ছোট্ট সুটকেসের মতো একটা রুপোরঙের বাক্স খুললেন। শ-খানেক সাজা পান আর এক পাশে এক ডেলা চুন—দুটো পান বের করে মুখে পুরলেন তিনি,

ঠোঁটের দু-কোণ থেকে পানের পিক মুছলেন ময়লা রুমালটায়, তারপর একটা কাগজের বাক্স বের করে বললেন, খোল্ এটা।

খুললাম।

—কি এগুলো ?

আরেকটু হলেই হয়তো কেঁদে ফেলতাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, আলপিন।

—হাঁ।

ঐ একটি মাত্র শব্দ নাকের ফাঁক দিয়ে কোনক্রমে বের করে দিয়ে পান চিবোতে লাগলেন।

আর আমার মনে হল একটা ক্ষুধার্ত বাঘ যেন আমাকে সামনে ধরে রেখে আরেকজনের হাড় চিবোচ্ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে পান দুটোকে রপ্ত করে রাণা মাস্টার বললেন, ক্লাসে বসে এক একটি কথা বলবে আর আঙুলে এক একটা করে আলপিন ঢুকিয়ে দেবো। মনে থাকে যেন। যা, বসবি যা এবার।

ফিরে এসে বসলাম বেঞ্চিতে, আর সারাদিন একটা কথাও বললাম না কারো সঙ্গে।

ছুটির ঘণ্টা পড়তেই বইয়ের থলেটা কাঁধে নিয়ে ক্লাসের বাইরে এসে দাঁড়ালাম, মনে হল এ জেলখানায় আর একটা দিনও যদি আসতে হয় তা হলে আমি আর বাঁচবো না। তাই ক্লাসে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করার স্পৃহাও ছিল না।

হঠাৎ কাঁধের ওপর একটা হাতের স্পর্শে ফিরে তাকালাম। দেখি, পরী হাসছে ফিক্-ফিক্ করে।

বললে, খুব ভয় পেয়ে গেছিস, না ? দূর বোকা, সামনের বেঞ্চিতে বসতে গেলি কেন ? ব্যাক্ বেঞ্চিতে বসবি আমার মতো।

বললাম, তুই এই ক্লাসেই পড়িস, দেখিনি তো এতক্ষণ ?

—দেখবি কি করে। হুঁঃ, আমি বাবা একেবারে লাস্ট বেঞ্চির গুড্ বয়।

লাস্ট বেঞ্চি। পরীর কথায় মনে হল এই পাতাল রাজ্যেও লাস্ট বেঞ্চিটা একেবারে স্বর্গ। ফেরার পথে পরীর সঙ্গে গল্প করতে করতে এক সময় ঠিক করে ফেললাম এবার থেকে লাস্ট বেঞ্চিতেই বসবো। ভুলেও আর সামনের বেঞ্চিতে নয়।

কিন্তু আমি যে সামনের বেঞ্চিতে বসি না, এ খবর কেমন করে যেন হেডমাস্টারমশাই অর্থাৎ নিরুর দাদুর কানে পৌঁছলো। না, রাণা মাস্টার এ-সব দিকে মাথা ঘামাতেন না। তাঁর ক্লাসে বসে কথা না বললেই হল। হয়তো পরীই দাদুর কানে তুলেছিল কথাটা, কিংবা অন্য কেউ।

পরের রবিবারেই দাদু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, তিমু। তুমি নাকি ইস্কুলে পিছনের বেঞ্চিতে বসো ?

এ সময়টায় দাদুকে মোটেই হেডমাস্টার মনে হতো না। তাই সাহস করে অনেক কথাই বলতে পারতাম।

বললাম, রাণা মাস্টার একেবারে সাক্ষাৎ যম, কার সাহস আছে যে সামনে বসবে দাদু ?

—ছি ! দাদু যেন বিরক্ত হলেন।—মাস্টারমশাই হলেন গুরু, তাঁর সম্পর্কে এমন কথা বলতে নেই তিমু। আমরাও তো ছোটবেলায় মাস্টারমশাইদের কাছে কত মার খেয়েছি বকুনি খেয়েছি, তবু তো তাঁদের ভক্তি করি মনে মনে, জানি আমাদের ভালর জন্যেই তাঁরা শাসন করতেন। আমাদের ইংরেজি পড়াতেন সুরেনবাবু—সুরেনবাবুকে তো তোমরা দেখোনি এই লম্বা চওড়া চেহারা···

দাদু হয়তো নতুন একটা গল্প শুরু করতেন, তার আগেই নিরু বাধা দিল।

বললে, না দাদু সেই কাপালিকের গল্পটা বলো।

দাদু হাসলেন।—কাপালিকের গল্প ? গল্প আবার কি ? সত্যি ঘটনা। তখন তো সারা দেশময় কাপালিক, যেখানেই বনজঙ্গলের মধ্যে মন্দির সেখানেই কাপালিক। রেল বসলো তাইতো মন্ত্র-তন্ত্র শেষ হয়ে গেল দেশ থেকে। সে হল গিয়ে ১৮৫৩ সালে, প্রথম রেলের লাইন পাতা হল আমাদের দেশে। আর ১৮৮৮ সালে জন্ম হল আমাদের এই রেল কোম্পানির। তবে লাইন পাততে সময় লেগেছিল অনেক। তখনও নোবেল সাহেবের নামই শুনিনি আমরা।

—নোবেল সাহেব কে দাদু ? নিরু প্রশ্ন করলে।

দাদু পাঞ্জাবির বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, নোবেল প্রাইজ শুনেছিস ?

বললাম, হ্যাঁ. রবি ঠাকুর পেয়েছেন, রাঙামামীমা ঠাকুরের গান জানেন।

এখন মনে পড়লেও হাসি পায়। ঠাকুরের গান আর রবি ঠাকুরের গানে যে আকাশ-পাতাল তফাত কে জানতো।

দাদু হেসে বললেন, সেই পুরস্কার নোবেল সাহেব দিয়ে গেছেন—তিনিই ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন। আগে তো পাহাড় কাটতে সময় লাগতো অনেক, কুলি লাগিয়ে কাটতে হতো। তারপর এক রকম যন্ত্রও হয়েছিল, তা সেও চাব পাঁচটা কুলিতে চাকা ঘোরাতো আর যন্ত্রের গাঁইতিতে মাটি পাথর কাটা হতো। তারপর নোবেল সাহেব ডিনামাইট আবিষ্কার করলেন। ঐ যে ধোবি-ঘাটের দিকে রেল লাইনটা পাথর কেটে নীচে নেমে গেছে—ওটা আগে ছিল পাহাড়। ডিনামাইট দিয়ে ভাঙা হয়েছিল ওটা। প্রথম যেদিন ডিনামাইট দেওয়া হল, ছিলাম সেদিন ওখানে।

—তারপর ?

—বিলেত থেকে কোম্পানি তো নতুন ইঞ্জিনিয়ার পাঠালেন রিচার্ডস সাহেবকে। আমবা শুনেছিলাম, কি একটা নতুন যন্ত্র আনছেন তিনি। রিচার্ডস সাহেব এসে বললেন. ওসব কিছু নয়, বজ্র এনেছি সঙ্গে করে। পাহাড়ে গর্ত করে কি একটা যন্ত্রে ডিনামাইট রেখে দূরে থেকে লম্বা পলতেতে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে। ঘোড়া তৈরি থাকবে পাশেই, পলতে ধরিয়ে ঘোড়ায় চেপে ছুটে পালাতে হবে অনেক দূরে। পলতের আগুন গর্তের কাছে পৌঁছনোর আগে না পালাতে পারলে যে আগুন লাগাবে সেও শেষ হয়ে যাবে। ডিনামাইট তখন নতুন জিনিস, কেউ জানেই না কি করে ব্যবহার করতে হয়, কতো দূর পালাতে হয়—তাই রিচার্ডস সাহেব নিজেই পলতেতে আগুন লাগাবে ঠিক হল।

বললাম, তার আগে বুঝি কেউ লাগায় নি?

দাদু একটু চুপ করে থেকে বললেন, না, নামটা মনে নেই, আবেকজন সাহেব জানতো, নাগপুরের দিক থেকে যখন লাইন আসছিল তখন সে-ই লাগাতো। তারপর বিলাসপুরের কাছে কোথায় যেন পা পিছলে পড়ে গিয়ে জখম হয়েছিল সে। সঙ্গে সঙ্গে বিলেতে খবর দেওয়া হল অন্য লোক পাঠাতে, কিন্তু তখন তো চিঠি যেতে কতো সময় লেগে যেতো, লোক আসতে আরো সময় লাগতো। তা রিচার্ডস সাহেব ঠিক করলো শনিবার সকালে প্রথম ডিনামাইট লাগাবে। বাদ সাধলো ওয়াট্‌সন।

—কেন ?

দাদু হাসলেন।—কেন আবার ? ওয়াট্‌সনও অবশ্য খাস বিলিতি সাহেব ছিল, কিন্তু আমাদের দেশে থেকে থেকে আমাদের মতো পাঁজিপুঁথিতে ওরও বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল। তাই বলে বসলো, আগে পণ্ডিতকে ডাকো, সে দিন ঠিক করুক, তারপর।

আমরা আশ্চর্য হয়ে বললাম, সে কি দাদু, সাহেবরা পাঁজি দেখে ?

—দেখে দেখে সবাই বিশ্বাস করে। সেই জন্যেই তো দশ টাকা মাইনে দিয়ে কোম্পানি

নিজের পণ্ডিত রেখেছিল। হারাধন চক্রবর্তী ছিল কোম্পানির পণ্ডিত। তাই ওয়াট্‌সন পণ্ডিতকে ডেকে সব বুঝিয়ে দিতে বললে আমাকে। কাজটা কি তা মোটামুটি বুঝিয়ে পণ্ডিতকে বললাম দিনক্ষণ দেখে দিতে। পাঁজিটাজি দেখে পণ্ডিত বললে, রবিবার বিকেলে সময় ভাল, কিন্তু রিচার্ডস সাহেবের কোষ্ঠী না করে নাকি জ্যোতিষ গণনা হবে না।

রিচার্ডস তো শুনে হেসেই উড়িয়ে দিলে। গালাগালি দিলে ইণ্ডিয়ানদের, কিন্তু ওয়াট্‌সন নাছোড়বান্দা।

—কি হল তা হলে ?

—হবে আর কি। শেষ পর্যন্ত রিচার্ডস দিলে তার জন্ম তারিখ-টারিখ। পণ্ডিত সব শুনেটুনে বললে, রবিবার বিকালেই সব চেয়ে প্রশস্ত সময়। কিন্তু চুপিচুপি আমাকে বললে, রিচার্ডস নাকি দু-এক বছরের মধ্যে পাগল হয়ে যাবে।

শঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলাম, সত্যি পাগল হয়ে গিয়েছিল নাকি দাদু ?

দাদু উত্তর দিলেন না। হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

নিরুর মা অর্থাৎ মাসীমা এক কাপ চা নিয়ে এসে দাঁড়ালেন ঠিক সেই সময়। দাদুকে অমন অন্যমনস্ক হয়ে চুপ করে থাকতে দেখে বললেন, কি ভাবছো বাবা ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দাদু।

বললেন, ভাবছি হারাধন পণ্ডিতের কথা। আমার সম্পর্কেও বড় ভীষণ কথা বলেছিল পণ্ডিত—কি যে হবে !

মাসীমা চায়েব কাপটা নামিয়ে বেখে বসে পড়লেন।—কেন তুমি ওসব ভাবো বলো তো বাবা ? সব কথাই যদি তার সত্যি হতো, তা হলে আর দশ টাকা মাইনের চাকরি করতো না সে।

—হুঁ। আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন দাদু। বললেন, যত বয়স হচ্ছে ততই ভয় হচ্ছে, শেষ জীবনে না জানি কি দুঃখ আছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করে রইলাম আমরা। তাবপর একে একে উঠে এলাম। বেশ বুঝতে পাবলাম আর কোনো গল্প বলবেন না দাদু।

বাসায় ফিরে এলাম সন্ধের আগেই। যেদিন এমনি ভাবে গল্প বলতে বলতে দাদু হঠাৎ চুপ করে যেতেন, সেদিন আমাদের কারোরই মন ভাল থাকতো না। পড়ায় মন বসতো না একেবারে।

বাসায় আসতেই বাবার সামনে পড়ে গেলাম। বোধহয় আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

আমাকে দেখতে পেয়েই বললেন, তিমু শুনে যাও এখানে।

কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

বাবা ফিসফিস করে বললেন, সাহেব পাড়ায় কোনো বাড়িতে চিৎকার শুনেছিলে ?

এমন আকস্মিক প্রশ্নে থমকে বসে পড়লাম বেতের চেয়ারটায়। কি উত্তর দেবো এ প্রশ্নের। মনে মনে শুধু রাগ হলো রাঙামামীমার ওপর। রাঙামামীমা এত বিশ্বাসঘাতক ?

'বিশ্বাসঘাতক' শব্দটা তখন নতুন শিখেছি। রাণা মাস্টার বুঝিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও সঠিক অর্থ যে কি তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু কেন জানি না, বাবার প্রশ্নটা শুনে মনে হল রাঙামামীমার বিশ্বাসঘাতকতা।

মুখ নীচু করে বললাম, সাহেবপাড়ায় তো যাইনি আমি।

বাবা হাসলেন, আর টের পেলাম মা কখন এসে দাঁড়িয়েছে আমার পিছনে।

আমার পিঠে হাত দিয়ে মা বললে, কোনো ভয় নেই তোর। বল, কোন বাড়িতে চিৎকার শুনেছিলি ?

উত্তর দেবার আগেই বাবা বললেন, মেয়েলী গলার চিৎকার ? ঠিক বুঝতে পেরেছিলি ?

বললাম, হ্যাঁ। লাইনের ধারে ধোবি-ঘাটের পুবে যে বাংলোটায় কোনো লোক থাকে না, সেই বাংলোতে। কপাটে তালা দেওয়া ছিল।

—বাইরে থেকে ?

বললাম, হ্যাঁ, বাইরে থেকে বন্ধ ছিল।

বাবা হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, যাস না কোথাও, আমি আসছি এখনই।

বাবা চলে যেতেই মা বললেন, এতদিন বলিসনি কেন আমাদের ? উমেশবাবুর মেয়ে সুধা, তাকেই বোধহয় আটকে রেখেছে ওখানে।

—আটকে রেখেছে সুধাদিকে ? কে ? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, গুণ্ডারা। ওকে যে পাওয়া যাচ্ছে না অনেকদিন থেকে, ধরে নিয়ে গেছে।

ধরে নিয়ে গেছে গুণ্ডারা ? কেমন যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল না। ছেলেধরাদের কথাই শুনে এসেছি। নদীর ওপর পুল তৈরি করার জন্যে একশো আটটা নরমুণ্ড দিয়ে পুজো করতে হয়, তাই ছোট ছোট ছেলেদের ধরে নিয়ে যায় বলি দেবার জন্যে। এইটুকু জানতাম। কাপালিকরাও মাঝে মাঝে সন্ন্যাসী সেজে আসে, থলির ভেতর লুকিয়ে নিয়ে পালায় ছোট ছেলে দেখলেই। তাও জানতাম। কিন্তু মেয়েধরাও আছে নাকি ? তাদের ধরে নিয়ে যাবে কেন, কি লাভ তাতে ? মেয়েদের কি বলি দেওয়া যায় ? বরং হাঁড়ি হাঁড়ি টাকা খরচ করে বিয়ে দিতে হয় তাদেব। রোজ নতুন নতুন লোক আসে, টাকা খরচ করে লুচি সন্দেশ খাওয়াতে হয় তাদের, তারপর কনে দেখে চলে যায় তারা। আবার নতুন লোক আসে, আবার টাকা খরচ করে খাওয়াতে হয়। তারপর বিয়ে যখন ঠিক হয় তখন অনেক টাকাকড়ি গয়না বাসনকোসন কত কি দিতে হয়। তবে ? তবে মেয়ে কেন ধরে নিয়ে যাবে গুণ্ডারা। আর সুধাদি ? হ্যাঁ পুজোর সময় দেখেছিলাম সুধাদিকে। মেজদির সঙ্গে গল্প করছিল আর খিলখিল করে হাসছিল।

কিন্তু অতো বড় মেয়েকে কি কেউ ধরে নিয়ে যায় নাকি ? সুধাদির তখন কত বয়স তা বোঝাবার মতো বয়স আমার তখনও হয় নি। আমার চেয়ে যারা অনেক বড় ছিল তাদের অনেকের চুল পাকেনি, আর অনেকের চুলে পাক ধরেছিল, এইটুকু বুঝতাম।

আমার মনের সব প্রশ্নের উত্তর জানবার জন্যে ছুটে যেতাম রাঙামামীমার কাছে। কিন্তু তাঁকে গোপনে যে-কথা বলে ফেলেছিলাম, যে-কথা অন্য কাউকে বলতে নিষেধ করেছিলাম বার বার, রাঙামামীমা সেই কথাই মাকে বলে দেওয়াতে মনে রাগ হয়েছিল। তাই ইচ্ছে সত্ত্বেও দু-দিন আর যাইনি রাঙামামীমার কাছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর রাগ পুষে রাখতে পারলাম না।

রাঙামামীমা বড় আয়নাটার সামনে বসে সাজ করছিলেন। পিছন থেকে হঠাৎ তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে বললাম, বিশ্বাসঘাতক!

রাঙামামীমা খিলখিল করে হেসে উঠলেন।

এক কোণে নিরুর বড়মামা বসেছিলেন দেখতে পাই নি। তিনিও হেসে উঠে বললেন, কি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তিমু ?

লজ্জায় মাটিতে মিশে গেলাম আমি।

রাঙামামীমা আমাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন।

তারপর বললেন, বললেই যখন আমাকে, আর দুটো দিন আগে বলতে পারতে তিমু। তোমার সুধাদিকে তাহলে পাওয়া যেতো।

তারপর বড়মামা একসময় উঠে যেতেই প্রশ্ন করলাম, ওখানে সুধাদি ছিল ? ভূত নয় ?

—না তিমু ও ভূত নয়। অনেক দিন কোন লোক ছিল না বলে ধুলো জমেছিল, তা সেই মেঝের ধুলোয় পায়ের ছাপ দেখেছে পুলিস।

—পুলিস ? আশঙ্কায় মন দুলে উঠল।

রাঙামামীমা হেসে বললেন, ভয নেই, পুলিসকে তোমার নাম বলে নি কেউ।

বললাম কিন্তু অত বড় মেয়েকে ধরে নিয়ে গেছে কেন ? কি করবে গুণ্ডারা ?

আমার কথা শুনে ঠোঁট টিপে হাসলেন রাঙামামীমা।

বললেন, বড় হও, তখন আর জিজ্ঞেস করবে না।

কি কথার কি উত্তর। এই জন্যেই মাঝে মাঝে রাগ হতো রাঙামামীমার ওপর। কিছু জিজ্ঞেস করলে, কখনো কখনো রাঙামামীমার কান লাল হয়ে উঠতো। আর নয়তো আজবাজে কথা বলে দূরে সরিয়ে দিতেন আমাকে। আর কখনো কখনো বলতেন, বড় হও, তখন বুঝতে পারবে।

যেন বড় হতে আমার তখন অনেক বাকি।

বললাম, আসছে মাসের প্রথম রবিবারেই আমার জন্মদিন, আট বছরে পড়বো আমি তখন। সেজদির মতো পনেরো বছর বয়স হতে আমার আর দেরি নেই।

—তাই নাকি ? ওমা দেখতে দেখতে এত বড় হয়ে গেছ তুমি ?

আট বছর কেন, পনেরো বছরেও যে বড় হওয়া যায় না তা তখনও জানতাম না।

৩

রাঙামামীমা বলেছিলেন, বড় হও, তখন বুঝবে।

কিন্তু সে ধৈর্য তখন ছিল না। মনে হয়েছিল, সুধাদিকে ধরে নিয়ে যাওয়াব পিছনে নিশ্চয় কোনো রহস্য কাছে। আর সে রহস্যের পিছনে কাপালিক ছাড়া আর কিছু কল্পনাই করতে পারি নি।

আমাদের পাড়াতেই থাকতেন নববাবু। সবাই বলতো, তাঁকে নাকি ছোটবেলায় কাপালিকরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছিল পাঁচবছর পরে।

দিব্যি আপিস করতেন নববাবু, কোটপ্যান্টও পরতেন। কিন্তু সকালে বিকেলে লাল-পাড় মটকার শাড়ি পরে পুজো-আর্চা করতেন। লোকে বলতো, তন্ত্র-সাধনা।

অমাবস্যার রাতে শ্মশানে গিয়ে সাধনা করতেন নববাবু। সে-সময় নাকি মুখ দিয়ে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী বের হতো। বর দিতে পারতেন, গায়ে হাত ছুঁইয়ে রোগ সারিয়ে দিতেন। এমনি অনেক কথা শুনতে পেতাম নববাবুর সম্বন্ধে।

পরী বলতো, কাপালিকরা যেমন নরবলি দেবার জন্য নিয়ে যায়, তেমনি আবার ভাল মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়ে দেয় কাউকে কাউকে।

এসব কথা বিশ্বাস করতাম বলেই মনে হয়েছিল, সুধাদিকেও কাপালিকরা নিয়ে গেছে।

পান্নাকে সেদিন তাই চুপিচুপি বললাম, সুধাদিকে নিশ্চয়ই ভাল লাগবে কাপালিকদের, না রে পান্না ?

পান্না প্রথমটা থমকে গিয়েছিল, তারপর আমার চোখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, অসভ্য। এতটুকু মায়াদয়াও নেই তোর ?

বললাম, বাঃ রে মেয়েছেলেকে কি বলি দেয় নাকি ? সুধাদি নির্ঘাত তন্ত্র শিখে ভৈরবী হয়ে ফিরে আসবে।

শুনে হেসে ফেললে পান্না। তারপর বললে, আমিও ভৈরবী সাজতে পারি, দেখবি ?

বলে চুপিচুপি আলনা থেকে ওর পিসীমার গরদের শাড়িটা নামিয়ে আনলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুলটা বাঁধলো মাথার ওপর ঝুঁটির মতো করে।

ঘরে তখন শুধু আমি আর পান্না।

এগারো হাত গরদের শাড়িটা কিছুতেই যেন ফ্রকের ওপর বাগ মানাতে পারে না ও। একে এগারো হাত শাড়ি, তার ওপর ভয়, কে কখন এসে পড়ে।

পা টিপে টিপে পাশের ঘরে উঁকি দিয়ে এসে বললাম, পর না, সব ঘুমুচ্ছে মাদুর বিছিয়ে।

—মানু ? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলে পান্না।

বললাম, ও বোধ হয় পোর্টারখুলির মাঠে। তেলেঙ্গীদের ছেলেদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলছে।

পান্না শাড়ির সঙ্গে কসরত করতে করতে বললে, মানুটাকেই যত ভয়। কখন দেখে ফেলবে, তারপর....

সত্যি, মানু আব পান্না ভাইবোন হলে কি হবে, মিনিটে মিনিটে ভাব আর ঝগড়া। আর পান্নাকে জব্দ করার জন্যে কত রকমের ফন্দি যে আঁটতো তার ইয়ত্তা নেই।

মা পিসীমার মেজাজ ভাল থাকলে কিছু বলতো না মানু। পান্না কখন জল খেতে গিয়ে কাঁচের গ্লাস ভেঙেছে, কিংবা দুধে ঢাকা দিতে ভুলে গেছে সে-সব খবর জমিয়ে রাখতো মানু। আর যখনই দেখতো মা পিসীমা রেগে আছে, ঠিক সেই সময়...

পান্না শাড়িটা কুঁচিয়ে পরবার চেষ্টা করতে কবতে বললে, মানুটা এত চুকলি খায় ভাই, কি বলবো।

আঁচলটা এবার কাঁধে ফেলবার চেষ্টা করে আয়নার দিকে চেয়ে হঠাৎ মুখ ভেংচে উঠল পান্না।—জানো মা, দিদি পিসীমার কাপড় ছুঁয়েছিল আবার ! এদিকে সারা দুপুর যে নিজে কুলিমিস্তিরীদের ছেলেদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলেছে, যদি বলে দিই তো...

জানতাম, পান্নার সাহস ঐ পর্যন্তই। সত্যিই মানুর বিরুদ্ধে মা পিসীমাকে কিছু বলতে ভয় পেতো ও। দিদি হলে কি হবে, চুলের ঝুঁটি ধরে এমন মারতো মানু, পান্না কেঁদে তবে রেহাই পেতো। ছোট ভাই হলেও মানুকে রীতিমত ভয় পেতো পান্না। আর যেখানেই বাঘের ভয়...

—দিদি !

হকচকিয়ে ফিরে তাকালাম দু-জনেই। পিসীমার গরদটা কি করে লুকোবে ভেবে পেল না পান্না !

মানু হেসে বললো, পর না। বলবো না রে, কাউকে বলবো না। জানিস দিদি, তুই শাড়ি পরলে না, মনে হয় অ-নে-ক বড় হয়ে গেছিস। সত্যি, মাইরি বলছি !

পান্না ভয়ে ভয়ে অবিশ্বাসের চোখে বললে, সত্যি বলছিস ? বলবি না মাকে ?

—না রে না ! এত্তো ভীতু ! বলে হেসে ফেললে মানু। তারপর ফিসফিস করে বললে, দিদি ! একটা জায়গায় যাবি ? একটা জিনিস দেখাবো।

বললাম—কি রে, কি জিনিস ?

—উঁহু, বলবো না, যাবি কি না বল্।

—কোথায় বল্ আগে।

—না, আগে আমার কথার উত্তর দে, তারপর বলবো।

পান্না দু-সেকেণ্ড কপাল কুঁচকে ভুরু উঁচিয়ে হেসে ফেলে বললে, বুঝেছি বীরবাবটি বুঝি।

—দূর, এই গরমে বীরবাবটি বেরোয় ঘাস থেকে ?

—তবে ? মন্দিরের গাছে জামরুল ধরেছে, না ?

—দূর, তা নয়। চল্ না তুই।

—কোথায় বলবি তো, তা নইলে মা যদি বকে ?

মানু নাক সিঁটকে তাচ্ছিল্যের স্বরে বললে, বা-রে বকবেই তো, তা নইলে বলছি কেন তোকে ?

—না, তা হলে যাবো না।

—যাবি না তো ? যেতে হবে না তোকে, চল্ রে তিমু ! বলে মানু আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে বললে, ঝিঝিপোকা !

—ঝিঝিপোকা ! এসেছে ঝিঝিপোকা ? ফিরতে দেখেছিস তুই ?

—হ্যাঁ। দেখলাম গরুর গাড়ি করে এল। কপালে ভাই এইসা লম্বা তেলক কেটেছে।

—তাই নাকি। হেসে লুটিয়ে পড়ি দু-জনেই।—চল্ যাই। নিমাইদা জানে ? নিমাইদা দেখেছে ?

—না বোধ হয়। নিমাইদা তো কারখানায় গেছে, সন্ধেবেলা ফিরবে যখন, বলে দেবো।

বলে দিতে হল না। ঝিঝিপোকা তীর্থ সেরে ফিরে এসেছে এ খবর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই রাষ্ট্র হয়ে গেল। ফিরে আসা তো বড় খবর, ঝিঝিপোকার কবে শরীর ভাল নেই, কখন তার জ্বর বেড়েছে, কখন কার সঙ্গে হেসে কথা বলেছে, কিংবা নালার জল নিয়ে ছিটিয়ে দিয়েছে কার গায়ে, সে খবর মিনিটে মিনিটে মুখে মুখে প্রচার হয়ে যেতো তখন। অতএব এত বড় একটা ঘটনা—

দিন কয়েকের জন্যে চিরাচরিত নিয়মের যে চিৎকারটা বন্ধ ছিল সন্ধের আগে থেকেই তা শুরু হয়ে গেল সেদিন।

শহরের পশ্চিম প্রান্তে রেলের কারখানা ভোঁ বাজিয়ে ছুটি হতেই প্রতিদিনের মতো হাজার হাজার সাইকেলের ভিড় দেখা দিল। থানার সামনে দিয়ে, ডাকঘরের পাশ দিয়ে, তিনপটিয়া ক্রিশ্চানদের গির্জা পার হয়ে তিন নম্বরের কোয়ার্টারের লাইন ধরে একে একে হাজার দুই সাইকেলের ভিড় ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল, শুরু হল পদাতিক শ্রমিকদের ঘরফেরা-মিছিল। আর তারই ফাঁকে একে পাশ কাটিয়ে ওর কাঁধে হাত দিয়ে, কারো সঙ্গে হিন্দীতে, কাউকে বা তেলেগুতে দু-এক কথার হাস্যালাপ শোনাতে শোনাতে এগিয়ে আসতো নিমাইদা, আর তার সাইকেলেব বিরক্তিকর হর্ন—করর্-কর্। করর্-কর।

ছেলেছোকরারা যে যেখানে ছিল ছুটে এসে লুকোতো এ বাড়ির আড়ালে, ও বাড়ির বাগানে।

করর্-কর্, করর্-কর্ করতে করতে রাম-মন্দিরের আগেই তিন নম্বরের একটা বিশেষ কোয়ার্টারের সামনে এসে নিমাইদা হাঁক ছাড়তো। 'ইনক্লাব জিন্দাবাদ' বলবার সময় যেমন একজন চিৎকার করে ইনক্লাব, ঠিক তেমনি ভাবেই টেনে টেনে হাঁক ছাড়তো নিমাইদা।—ঝি-ঝি-পো-কা !

আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা সকলে সমস্বরে চিৎকার করতাম : কু-পো-কাৎ। ঝিঝিপোকা—কুপোকাৎ, ঝিঝিপোকা কুপোকাৎ। একটানা চিৎকার চলতো শুধু, যতক্ষণ না ঝিঝিপোকার দেখা মিলতো। আর সে চিৎকার একবার শুনতে পেলেই হাতের কাছে যা পেতো, ছাতা লাঠি, নিদেন পক্ষে জলের মগ হাতে নিয়ে তাড়া করে আসতো ঝিঝিপোকা। শুরু করতো অশ্রাব্য গালিগালাজ।

—হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা, কে রে, কে বললে ?

কিন্তু যে যার চম্পট দিয়েছে তখন।

ঝিঝিপোকা বেরিয়ে এসে দেখতো সারা রাস্তা জনমানবহীন। আর আমরাও হঠাৎ কেউ সামনে পড়ে গেলে এমন ভাব দেখাতাম যেন কিছু জানি না।

সেদিন বিকেলেও এমনি বার কয়েক চিৎকারের পর যখন ঝিঝিপোকা ছুটে এল তখন আমরা সব সরে পড়েছি। সামনে পড়ে গেল বেচারী মানু। আর সঙ্গে সঙ্গে নিরপরাধ কাঁচুমাচু মুখ করে মানু প্রশ্ন করে বসলো—কি বলেছে দাদু ?

আমিও এসে দাঁড়ালাম তার পিছনে।

বুড়ো ক্ষেপে গেল।—কেন রে শালা, শুনতে পাসনি, কে যেন ঝিঝিপোকা বললে ? কে বললে, কে, কোন হারামজাদা বললে ?

—এ্যাঁ ? বিস্ময়ে আকাশ থেকে পড়ল মানু।—ঝিঝিপোকা বলেছে তোমাকে, ঝিঝিপোকা বলেছে ? নিশ্চয়ই নিমাইদা।

—কই সে, কই সে হারামজাদা, মুখপোড়ার আজ আমি নিকুচি করে ছাড়বো। রাগ আর কমতে চায় না ঝিঝিপোকার।

মানু ঠোঁট উল্টে বললে, নিমাইা কখন পিট্টান দিয়েছে।

—পালিয়েছে, পালিয়েছে সে ছোঁড়া ? মুয়ে আগুন হারামজাদার। ঝিঝিপোকা ! তোর বাবা ঝিঝিপোকা। আর যদি কেউ কোনোদিন তোরা বলেছিস তো তোদেরই একদিন কি আমারই—

বুড়োর কথা শেষ হবার আগেই মানু চিৎকার করে ওঠে, ঝি-ঝি-পো-কা।

আর সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে ওখান থেকে আবার এক সঙ্গে চিৎকার, কু-পো-কা-ৎ।

ঘাড় ফিরিয়েই মানুকে তাড়া করতে গেল বুড়ো। কিন্তু মানু তার আগেই ছুট্। অবশ্য তারও আগে আমি।

পান্না তো দূর থেকে হেসেই লুটোপুটি।—ঝিঝিপোকা যদি ধরে ফেলতো ঠিক হতো। কি দুষ্টু ছেলে বাবা তুই। ভয় করলো না ?

মানু বীরত্ব দেখিয়ে বললে, ভয় পাবো কেন, আমি কি মেয়েছেলে নাকি ? কেমন জব্দ করেছি বল্‌তো। বলেই মানুও হেসে গড়িয়ে পড়ে।

শুধু কি মানু ? বাঁটুল আর পরীও এসে যোগ দিতো কোন কোন দিন। পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। কেউ দোষ চাপাতো ঝিঝিপোকার ঘাড়ে, কেউ গালাগালি দিতো আমাদের। ছেলেগুলোরই তো দোষ, সত্তর বছরের নির্বিরোধ শান্তশিষ্ট মানুষ, সে বেচারার পেছনে লাগা কেন ? আর বুড়োই বা চটে কেন ঝিঝিপোকা বললে ?

সত্যি। ইতিহাসটা কেউই খুঁজে পাইনি। কে কবে শুরু করেছিল, আর কেনই বা এই একটা কথার ওপর বুড়োর সব বিদ্বেষ তাও জানতাম না।

বয়সে আর দুঃসাহসে সব চাইতে বড় বলেই দলের পাণ্ডা হয়েছিল নিমাইদা। বছর আঠারো উনিশ বয়স, শক্ত সমর্থ শরীর, আর দু-চোখে যত রাজ্যের বদ মতলব। ঝিঝিপোকাকে রাগানোর ব্যাপারে ওর চাইতে বেশি বুদ্ধি কারো ছিল না। ভোর পৌনে ছ-টায় ভোঁ বাজলেই একদফা। করর্-কর্ করর্-কর্ করে ওঠে ওর সাইকেলের হর্ন। আর তারপরই, ঝিঝিপোকা কুপোকাৎ ! আবার সেই সাড়ে এগারোটায় কারখানার খাবার ছুটির সময় ঝিঝিপোকা। আর পরমুহূর্তে সমস্বরে চিৎকার : কুপোকাৎ। একটার ভোঁ বাজলে কারখানা ফেরবার মুখে আরেক দফা। আর সেই বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ছুটির ভোঁ বাজলে শেষ।

সারাটা দিন এভাবে কেউ যদি পেছনে লেগে থাকে তা হলে মাথা ঠিক রাখা যায় ? মনে হতো মানুষটা যতই বুড়ো হচ্ছে, মৃত্যু এগিয়ে আসছে চোখের সামনে, ততই যেন বাঁচবার সাধ বাড়ছে তার। জলজ্যান্ত মানুষটাকে কুপোকাৎ করতে চাইলে রাগ হবে না তা হলে ? কিন্তু ঝিঝিপোকা বললেই রাগে কেন বুড়ো ?

ঝিঝিপোকা কি করতো, কখনো কিছু করতো কিনা, তার আসল নামটাই বা কি, কেউ

খবর রাখিনি। লোকটার চলেই বা কি করে? শুধু ছাগলের দুধ বিক্রি করে? ভেবে পেতাম না। শুধু এইটুকুই দেখতাম যে, সারাদিন সে একপাল ছাগলকে নিয়ে মেতে থাকে।

লম্বা রোগা কাঠকাঠ চেহারা, একমুখ দাড়ি, পরনে একটা ডোরাকাটা লুঙি, পায়ে খড়ম। মেজাজ সব সময়ে সপ্তমে চড়ে আছে, মুখে আঠার মতো এঁটে আছে হতচ্ছাড়া, হারামজাদা, মুখপোড়া, মুয়ে আগুন! কাজ? একটা না একটা ছাগলের সামনে বট নয়তো অশ্বত্থ পাতা ধরে থাকা, এটার পিঠে হাত বোলানো, নয়তো ওটার দুধ দোয়ানো। এক কথায় ছাগলগত প্রাণ।

এই ছাগল নিয়েই হল ঝামেলা।

ছোটখাট রেলের কলোনি, দু-পাশে একই ধরনের দু-সারি কোয়ার্টার্স সারা পথ জুড়ে। লালচে ধুলোর রাস্তা, যেমন পদে পদে তার বাঁক, তেমনি সরু। রাস্তাই আছে, রাস্তার নিয়ম নেই। থাকলেও মানে না কেউ। গরু মোষ ছাগল হয়তো রাস্তা জুড়ে ছড়িয়ে আছে, আর তারই ফাঁকে এ-বাড়ির বাচ্চা ছেলেটা হয়তো ও-বাড়িতে ছুটছে, নাক অবধি ঘোমটায় ঢেকে ও-বাড়ির বৌ হয়তো এ-বাড়ি আসছে।

এমন রাস্তায় কেউ সাইকেল চড়তে শেখে?

ফল যা হবার তাই হল। সাইকেল চড়া শিখতে গিয়ে টাল সামলাতে পারলো না মানু। ঝিঝিপোকার আদরের সাত দিনের বাচ্চা পাঁঠাটা চাপা পড়ল, সাইকেলের চাকায় ছাগলের বাচ্চাটার পা আটকে গিয়ে দু-জনেই জখম।

পড়ে গিয়ে কপাল থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো মানুর, বলির পাঁঠার মতো ছটফট করতে শুরু করলো সাত দিনের ছাগল বাচ্চাটা।

ছুটে এল ঝিঝিপোকা। আহা-হা! এমন কচি পাঁঠাকে মেরে ফেললে হারামজাদা? আচ্ছা নচ্ছার ছেলের পাল্লায় পড়েছি বটে! বলেই হাতের ছড়িটা বার কয়েক বসিয়ে দিলে মানুর পিঠে। এতোটুকু একটা ছেলে, কপাল কেটে এমনিতেই রক্ত ঝরছে, তবু সেসব দিকে চোখই নেই যেন।

পান্না, বাঁটুল, পরী সবাই দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে, সাহস করে কেউ এগিয়ে এল না।

ঝিঝিপোকা ছাগলের বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিতেই সাইকেলটা নিয়ে সুরুৎ করে পালিয়ে এল মানু।

বাঁটুল আর পরীকে ভেঙচি কেটে বললে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা হচ্ছে, ছড়িটা কেড়ে নিতে পারলি না?

ঝিঝিপোকার তাড়া খেয়ে পালিয়ে আসতাম আমরা, আর মনে মনে ঠিক করে রাখতাম ব্যাপারটাকে কিভাবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিমাইদার কাছে বলতে হবে।

সে বয়সে আমাদের সকলের কাছেই নিমাইদা ছিল একমাত্র হিরো। অন্য পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে তর্কে হেরে গেলে বলতাম, নিমাইদা থাকলে কেমন মুখের মতো জবাব দিত দেখতিস। ঘুড়ি ওড়ানোয় নিমাইদার নাকি জুড়ি নেই। মার্বেল খেলায়, নিমাইদার কি টিপ ভাই! আর দুপুরের ভোঁ বাজার পর যখন হাজার হাজার কর্মীর দল এক ঝাঁক মৌমাছির মতো সাইকেলের চাকার গুনগুনুনি তুলে ধুলো উড়িয়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়, যখন যে-কোনো একজন একটু বে-টাল হলেই হুড়মুড় করে এ ওর ঘাড়ে পড়তে পারে, সেই সময়—নিমাইদা কেমন দু-হাত ছেড়ে সাইকেল চালায় দেখেছিস?

পাড়ায় নিমাইদা ছিল আমাদের গর্বের বস্তু। আর তার প্রশংসা আমরা যত না করতাম, অঞ্জলিদি বলতেন তার দশগুণ।

অঞ্জলিদির বাবাকে আমরা বলতাম নলিনীকাকা, আর তাঁর মাকে বলতাম নিভামাসী।

শুধু আমিই নই, পাড়ার আরও অনেকে এই নামেই ডাকতো ওঁদের। কারণটা আর কিছুই নয়, নলিনীকাকা ছিলেন বাবার সহকর্মী, আর নিভামাসীর দুপুরের আড্ডার সঙ্গী ছিলেন মা। বাবা এবং মা দু-জনেরই সম্পর্ক যাতে সমান মর্যাদা পায় তাই একজন হয়েছিলেন কাকা, আর একজন মাসী—যদিও তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কটা ছিল স্বামী-স্ত্রীর।

শুধু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই হয়তো ছিল। কারণ, নলিনীকাকাকে কখনও বড় একটা পারিবারিক সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখতাম না। সংসারের কাজের মাঝখানে তিনি যেন হাঁপিয়ে উঠতেন। তাই সন্ধের সময় যেটুকু সময় পেতেন বিশ্রামের জন্যে, সেটুকু কাটাতেন বাঙালী ক্লাবের তাসের আড্ডায়।

আমাদের ঐ রেল কলোনিটায় তখন যে ক-জন বাঙালী ছিল তাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যেতো। তাদেরই চেষ্টায় একটা দুর্গা মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। মন্দিরটা ছোট ছিল না। অগুন্তি সিঁড়ির ধাপ, যেমন উঁচু তেমনি দৈর্ঘ্যে আর প্রস্থে। রাজবাড়ি বলে ভুল করবার মতো। এক সারি মোটা মোটা থাম, লাল সিমেন্টের লম্বা বারান্দা। মন্দিরের পশ্চিমে ছিল একটা অর্ধসমাপ্ত নাটমণ্ডপ। ভাড়া করা সাজ আব সিন নিয়ে এসে পাড়ার সকলে মিলে পুজোর সময় থিয়েটার করতাম সেই নাটমণ্ডপে। করতাম ? করতো বড়রা, আমরা ফাইফরমাশ খাটতাম। এছাড়া বছরের অন্য ক-টা মাস মন্দিরটা ব্যবহার হতো ক্লাবঘর হিসেবে। কারণ মন্দির-বাড়িটাই ছিল, প্রতিষ্ঠা করা কোনো দেবদেবী ছিল না।

মন্দিরের একপাশে ছিল একটুকরো ফুলের বাগান, আরেক পাশে একটা কুয়ো। দুপুরের দিকে লোকজন কেউ থাকতো না। একেবারে নির্জন আর নিস্তব্ধ—ঠিক যেমনটি আব কি অঞ্জলিদি পছন্দ করতেন। পছন্দ করতেন অবশ্য অন্য কারণে। নিমাইদার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার মতো এমন নিবাপদ জায়গা তো আর ছিল না সারা কলোনিটায়!

সেজদির সঙ্গে একই স্কুলে, একই ক্লাসে পড়তেন অঞ্জলিদি। আর খুব ছোটবেলা থেকেই দেখেছি, আমাকে একটু বেশি স্নেহ করতেন। ঘুড়ি লাটাই, মার্বেল, লাট্টু আর লেত্তি কেনবার জন্যে যখন মার কাছ থেকে কোন রকমে পয়সা আদায় করতে পাবতাম না, তখন সটান চলে আসতাম অঞ্জলিদিব কাছে। কিছুক্ষণ মুখ ভার করে ঘোরাঘুরি করলেই অঞ্জলিদি বলতেন, কি হয়েছে তিমু ? মুখ ভাব করে রয়েছো কেন ?

প্রশ্ন করাব অপেক্ষা শুধু। সঙ্গে সঙ্গে মা-র বিরুদ্ধে অভিযোগটা প্রকাশ করে ফেলতাম, আর অঞ্জলিদি হেসে বলতেন, এই কথা, আগে বললেই হতো।

বলে শাড়ির খুঁট খুলে, কোনোদিন বা খুঁটে-বাঁধা চাবির গোছা থেকে চাবিটা খুঁজতে খুঁজতে দেরাজ-ওয়ালা আলমারিটাব সামনে এসে বলতেন, কত দাম লাগবে তিমু ?

দু-আনা চার আনা যা বলতাম সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিতেন অঞ্জলিদি।

সত্যি, এত মিষ্টি ব্যবহার, এত ভাল লাগতো। যখন যা কিছু আব্দার ধরতাম, অঞ্জলিদি হাসি মুখে মেনে নিতেন। অথচ তার জন্যে সেজদির মত হুকুম করতেন না, দু-মাইল হেঁটে গিয়ে ধনীরামের দোকান থেকে গরম গরম পকৌড়ি কিংবা গুজরাটী হোটেল থেকে চানাচুর আর গাঠিয়া আনতে।

হ্যাঁ, শুধু একটা কাজ করে দিলেই অঞ্জলিদি খুশি হতেন। ওঁদেব কোয়ার্টারের একপাশে ছিল একটা ছোট্ট কুঠরি। সেই কুঠরিটায় পড়াশুনো করতেন অঞ্জলিদি। আর প্রতিদিন দুপুরের ভোঁ বাজার আগে, আমার যখন ইস্কুলেব টিফিনের ছুটি হত সেই সময় এসে দেখা করতে হত অঞ্জলিদির সঙ্গে।

খিড়কির সামনে এসে অপেক্ষা করতেন অঞ্জলিদি, তাবপর আমাকে চোখের ইশারায় ডেকে নিয়ে যেতেন তাঁর পড়ার ঘবে। ভেতরে ঢুকেই কপাটে খিল দিয়ে দিতেন, তারপর খসখস করে এক টুকরো কাগজে কি সব লিখতেন। কি সুন্দর নীল রঙের কাগজে লিখতেন

অঞ্জলিদি, সেন্টের শিশি থেকে একটু সেন্ট নিয়ে লাগাতেন কাগজটায়, আর নীল রঙেরই সুন্দর একটা খামে ভরে দিয়ে লাল টুকটুকে ঠোঁটে ভিজিয়ে এঁটে দিতেন খামের মুখ। কোন কোনদিন আগে থেকেই লিখে রাখতেন, আর সে-সব দিনে খামটা অন্য দিনের চেয়ে ভারী মনে হতো।

অঞ্জলিদি কি যে লিখতেন প্রতিদিন, বুঝতাম না। জানতে ইচ্ছে হত, অথচ জিজ্ঞেস করলে শুধু হাসতেন অঞ্জলিদি। বলতেন, বড় হও, তখন আর জিজ্ঞেস করতে হবে না, ঠিক বুঝতে পারবে।

তবু বড় হওয়ার জন্যে অপেক্ষা করার মতো ধৈর্যও ছিল না আমার। কোন কোনদিন রাগ হতো, ভাবতাম রাঙামামীমাকে জিজ্ঞেস করবো।

কিন্তু কড়া নিষেধ ছিল অঞ্জলিদির। এ-সব যেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানতে না পারে।

চিঠিটা হাতে দিয়ে বলতেন, সে-দিনের মত কোরো না যেন, আরো সাবধানে, লুকিয়ে লুকিয়ে দেবে তিমু। আর বিকেলে নিমাইদার উত্তরটা এনে দেবে, কেউ যেন জানতে না পারে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাতাম। এসে অপেক্ষা করতাম গোলবাজারের মোড়টায়, হাফপ্যান্টের পকেটে লুকোনো চিঠিটা ঠিক আছে কিনা বার বার পরীক্ষা করে দেখতাম পকেটে হাত ভরে, আর নিমাইদার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে মনে মনে বিরক্ত হতাম।

এক সময়ে ভোঁ বাজতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেক দূর থেকে ভেসে আসতো গুনগুন গুনগুন শব্দ।

কাঁসাই অর্থাৎ কংসাবতী নদীর ধারে একবার চড়ুইভাতি করেছিল নিরুদের বাড়ির সকলে। রাঙামামীমাও গিয়েছিলেন, আর রাঙামামীমার সঙ্গে আমিও।

সেই প্রথম আমি নদী দেখলাম। অ্যানিকাটের ওপার থেকে তুমুল বেগে জল গড়িয়ে পড়তে দেখেছিলাম সেদিন। তেমনি ভাবেই ঠিক যেন স্রোতের মতো গড়িয়ে আসতো হাজার হাজার সাইকেলের ঝাঁক। অতগুলো চাকা একসঙ্গে ঘুরতো, ধুলো উড়তো পিছনে, আর কি চমৎকার একটা শব্দ ভেসে আসতো—গুনগুন—যেন মৌমাছির গুঞ্জন।

ঠিক এমনি ধারা, আরো মিষ্টি শব্দ শুনেছিলাম কংসাবতীর পারে। অ্যানিকাটের ফাঁক দিয়ে জলের বেগ উছলে-পড়ার শব্দ। চারিদিক নিশ্চুপ, নির্জন। কোথাও কোনো লোক নেই, শুধু রোদ-চিক্‌চিক্ বালি আর জল।

নদীর পারে বসে গল্পগুজব, গান গেয়েছিলেন রাঙামামীমা, আমি আর নিরু বালির ঘর বানিয়েছিলাম অনেকগুলো।

বালির ভেতর পা ঢুকিয়ে তার ওপর চাপ চাপ ভিজে বালি রেখে এক সময় সুরুৎ করে পা বের করে নিলেই কি চমৎকার ঘর তৈরি হয়ে যেতো।

আর নদীতে স্নান করায় যে এত আনন্দ তার আগে জানতাম না। রাঙামামীমার ওপর যে কত খুশি হয়েছিলাম সেদিন। রাঙামামীমা নিজে মাকে গিয়ে বলেছিলেন বলেই না ওঁদের সঙ্গে আসতে মত দিয়েছিলেন বাবা আর মা।

ভাগ্যিস এসেছিলাম আমি।

উঃ, নদীর জলকে কি ভয়ই না হয়েছিল প্রথমটা। রাঙামামীমা জোর করে টেনে নামিয়েছিলেন আমাকে। আর আমার ভয় দেখে কি হাসাহাসি সকলের।

রাঙামামীমা যে এত ভাল সাঁতার কাটতে পারতেন তা জানতাম না। কোমরে শাড়ির আঁচলটা জড়িয়ে কি হুটোপুটিই না করছিলেন। যখন সেজেগুজে থাকতেন তখন মনে হতো এমন সুন্দর আর কেউ হয় না। কিন্তু সেদিন মনে হল রাঙামামীমা আরো অনেক সুন্দর। জলে ভিজে গেছে তাঁর শাড়ি, চুল ভিজে, মুখে বিন্দু বিন্দু জল তো নয়, যেন

মুক্তো। তাঁর ভিজে শাড়ির ভেতর থেকে ফুটে বের হচ্ছিল তাঁর গায়ের রঙ।

স্নান আর সাঁতার সেরে এসে কাপড় ছাড়লেন রাঙামামীমা, নিরুর মা-র সঙ্গে রান্নার তদারকি করতে এলেন। বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজব চলল, তারপর হঠাৎ রাঙামামীমা চিৎকার করে উঠলেন, আমার হার ? গলার হার ?

তন্ন তন্ন করে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু হল।

আমি বললাম, রাঙামামীমা, হার বোধ হয় সাঁতার কাটার সময়েই পড়ে গেছে।

আমরা সকলেই আবার জলে নামলাম। মনে মনে ভগবানকে ডাকলাম। হে মা কালী, * রাঙামামীমার হারটা যেন খুঁজে পাওয়া যায়। সোনার-হারের দাম অনেক মা কালী, না পেলে রাঙামামীমা খুব কষ্ট পাবেন। তাছাড়া আমাদের চড়ুইভাতিটাও নষ্ট হবে, ফিরে দাও মা।

মা কালী সত্যিই ফিরিয়ে দিলেন।

স্বচ্ছ জল ভেদ করে, বালির ওপর হারটা কোথাও পড়ে আছি কি না, খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ কি একটা চক্‌চক্ করছে দেখতে পেলাম। এক হাঁটু জল সেখানটায়, একেবারে নদীর পার ঘেঁষে। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম সেটার ওপর।

—পেয়েছি, হার পেয়েছি রাঙামামীমা। ছুটতে ছুটতে ঘাটে উঠলাম হারটা নিয়ে।

আনন্দে খুশিতে আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলেন রাঙামামীমা। বললেন, ফিরে গিয়েই এক হাঁড়ি রসগোল্লা খাওয়াবো তোমাকে। যত খেতে পারো।

কি ভুলই করেছিলাম। রসগোল্লা খাওয়ার লোভ না থাকলেই ভাল হতো।

দিন কয়েক পরে, রাঙামামীমা নিরুদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন সেদিন। ফিসফিস করে বললাম. রসগোল্লা তো খাওয়ালেন না এখনো ?

খিলখিল করে হেসে উঠলেন রাঙামামীমা।

দুটো টাকা দিয়ে বললেন, তাইতো। যাও নিয়ে এসো লক্ষ্মী ভাই, আমরা সকলে মিলে খাবো। কেমন ?

ঘর থেকে বেরিয়ে সবে চোখের আড়াল হয়েছি, শুনতে পেলাম, নিরুর মা বলছেন, বৌ তুমি কি বলো তো ? হার ও খুঁজে পেয়েছিল, বিশ্বাস করলে তুমি ? ও-ই কখন হুটোপুটি করতে করতে খুলে নিয়েছিল। লুকিয়ে রেখে, পরে ধরা পড়ার ভয়ে দিয়ে দিয়েছে।

নিরুর মা-র কথা শুনে থমকে থেমে পড়লাম। সমস্ত আনন্দ যেন মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। অপেক্ষা করলাম কিছুক্ষণ। কি করবো ভেবে পেলাম না। ইচ্ছে হল, ফিরে গিয়ে টাকা দুটো নিরুর মা-র মুখের ওপর ছুঁড়ে দিই।

লুকিয়ে রেখেছিলাম ? চুরি ! রাঙামামীমার হার কেউ চুরি করতে পারে ? রাঙামামীমা কষ্ট পাবে জেনেও কেউ কখনো সে-হার লুকিয়ে রাখতে পারে ?

রাঙামামীমার গলা শুনলাম এবার।

শুধু বললেন, ছি ছি, দিদি, এ কি বললেন আপনি ? ছি ছি !

সত্যি রাঙামামীমা কত ভাল ! কই নিরুর মা-র কথা তো বিশ্বাস করলেন না একটুও।

অঞ্জলিদি ঠিকই বলেছিলেন সেদিন। যারা সুন্দর হয় তাদের মনও সুন্দর। নিমাইদা দেখতে সুন্দর বলেই তো এত ভাল। রাঙামামীমার এমন রূপ আছে বলেই তো এত মিষ্টি লাগে তাঁকে, এত ভাল মন তাঁর।

৪

পর পর দু-ক্লাসেই থার্ড বয় থাকবার পর সেইবারেই আমি প্রথম ফার্স্ট হলাম।

পরীক্ষার আগে মা বলেছিল, এবার যদি ভাল করে পড়াশুনা করে ফার্স্ট হতে পারিস তিমু তা হলে তোকে একটা সাইকেল কিনে দেবো।

সত্যি দেবে ? তাহলে দেখো আমি ঠিক ফার্স্ট হবো। আমি কথা দিয়েছিলাম।

তার আগে যে দু-দুবার মা বলেছিল, প্রাইজ পেলেই একটা সাইকেল কিনে দেবে, এবং থার্ড প্রাইজ পাওয়া সত্ত্বেও যে সংসারের টানাটানির দোহাই দিয়ে মা প্রতিশ্রুতি রাখে নি, সে কথা তখনকার মত ভুলে গিয়েছিলাম।

কিন্তু যে-বারে ফার্স্ট হলাম, বেশ মনে আছে মা নিজে থেকেই বাবাকে বলেছিল, তিমুর জন্যে একটা সাইকেল কিনে দাও এবার।

বাবাও রাজি হয়েছিলেন। কারণ সেই মাসেই চাকরিতে উন্নতি হল বাবার।

খবরটা ছুটে গিয়ে জানিয়ে এসেছিলাম অঞ্জলিদিকে।

—জানো অঞ্জলিদি, বাবা এস এ হয়েছেন। এ বাসা ছেড়ে দিয়ে বড় বাড়িতে যাবো আমরা।

অঞ্জলিদি বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এস এ কিরে ?

—বাঃ রে এস এ জানো না ? সিনিয়র একাউন্টেন্ট। এতদিন তো জুনিয়র ছিলেন, এবার সিনিয়র হলেন। আচ্ছা অঞ্জলিদি, অডিটার ইমার্সন সাহেব বাবাকে খুব ভালবাসে, না ?

অঞ্জলিদি সে কথার উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করলেন, তোরা এখানেই থাকবি তো তিমু ?

বললাম, হ্যাঁ, এখানে থাকবো না তো কোথায় যাবো ? তবে অডিটার তো বাবাকে খুব ভালবাসে, তাই বলেছে, চার নম্বর কোয়ার্টার ছেড়ে দিয়ে ঐ দোতলা বাংলোটায় যেতে।

—দোতলাটায় তোরা যাবি ? কেমন যেন অবিশ্বাসের সুরে বললেন অঞ্জলিদি।

অঞ্জলিদির আর দোষ কি। আমিও যখন শুনেছিলাম, বিশ্বাস হয়নি একেবারে।

আমাদের উত্তরপাড়ায় দোতলা বাংলো ঐ একটাই ছিল। আর তার সঙ্গে কত বড় বাগান। কাউল সাহেব থাকতো ঐ বাড়িটায়। শুনেছিলাম কাউলরা নাকি কাশ্মীরী। আর নিরু বলেছিল, কাশ্মীরীরা খুব ফরসা তো সাহেবদের মতই, তাই ঐ দোতলা বাংলোয় থাকে ওরা। গায়ের রং কালো হলে নাকি কাউল সাহেবও বাংলোতে থাকতে পেতো না।

তাই আমার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল নিরু, ওর মাকে বলেছিল, শুনছো মা ? তিমুরা নাকি দোতলা বাংলোটায় বদলি হয়ে যাচ্ছে।

নিরুর মা এ-কথার জবাব না দিয়ে হেসে বলেছিলেন, সাহেবদের মতই তো চেহারা তিমুর, যাবে না কেন ?

কথাটা শুনে এত খারাপ লেগেছিল ! গায়ের রঙটাই নয় কালো, তা বলে বিদ্যে বুদ্ধির কি কোনো দাম নেই নাকি ? বাবা তো কালোও নন। বাবা যে অত অত বই পড়েন অরোরা সাহেবের ছেলেও তো বাবার কাছে কাজ শিখতে আসে....

নিরুর মা-র ওপর যত রাগ সব পুষে রেখে বলেছিলাম, দেখিস নিরু, বড় হলে আমি সাহেবদের চেয়েও বড় হবো। মাদুরার জ্ঞানাচার্য তো সাক্ষাৎ দেবতা, তিনি বলে গেছেন।

নিরু হয়তো আমার বড় হওয়ার বাসনাটাও হেসে উড়িয়ে দিত। কিন্তু জ্ঞানাচার্যকে সাক্ষী খাড়া করায় ওকে চুপ করতে হল।

মাদুরার কোনো এক বিখ্যাত মঠের মোহান্ত ছিলেন জ্ঞানাচার্য। মাদুরা নামটা ভূগোল বইয়ের মানচিত্রে খুঁজে দেখেছিলাম, তারপর যেদিন এসে উপস্থিত হলেন সেদিন স্বচক্ষে দেখলাম তাঁকে।

দুটো হাতি আর সঙ্গে কত লোকজন, জিনিসপত্র। কাশী যাবার পথে দু-দিনের জন্যে বিশ্রাম নিয়েছিলেন দুর্গা মন্দিরের চত্বরে।

দাক্ষিণাত্যের সকলকেই আমরা তখন তেলেঙ্গী বলতাম, আর আমাদের ঐ কলোনিটায় অর্ধেক লোক ছিল দাক্ষিণাত্যের। তাদেরই অনুরোধে বোধ হয় দু-দিনের দর্শন দিতে রাজি হয়েছিলেন জ্ঞানাচার্য মহারাজ।

হিন্দি বা ইংরেজি কোনো ভাষাতেই তিনি কথা বলতে জানতেন না। শুধু সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতেন। দুর্গা মন্দিরের চত্বরে একটা রুপোর সিংহাসনে বসে অনর্গল সংস্কৃত বলতে দেখেছিলাম তাঁকে। ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই আর বাবা—দু-জনে শুধু সংস্কৃত ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সকলে বলেছিল, সদাশিব জ্যাঠা নাকি আরো ভাল সংস্কৃত জানেন। কিন্তু তিনি কেন কে জানে, একদিনের জন্যেও আসেননি।

দ্বিতীয় দিনে আমাকেও নিয়ে গেলেন বাবা। জ্ঞানাচার্যকে প্রণাম করতেই তিনি হাতের ছড়িটা আমার মাথায় ঠেকিয়ে কি যেন আশীর্বাদ করলেন। তারপর একে একে অনেকের করকোষ্ঠী বিচার করলেন। ছেলেবুড়ো অনেকেই এসে প্রণাম করছিল তাঁকে। তারপর হাত বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

সকলের দেখাদেখি আমিও একসময় হাত বাড়িয়ে দিলাম।

প্রথমে আমার মুখের দিকেও তাকাননি জ্ঞানাচার্য মহারাজ। হাত দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তাকালেন। তারপর বাবাকে কি যেন প্রশ্ন করলেন। বাবা উত্তর দিলেন। তারপর সংস্কৃত ভাষাতেই অনর্গল কি সব বলে গেলেন জ্ঞানাচার্য মহারাজ।

এক বর্ণও বুঝতে পারলাম না।

বাড়ি ফেরার পথে পণ্ডিতমশাই আর বাবা গল্প করতে করতে ফিরছিলেন। আর আমি তাঁদের গল্প শুনেই বুঝলাম, জ্ঞানাচার্য মহারাজ কি বলেছেন।

পণ্ডিতমশাই বললেন, জন্ম তারিখটা হুবহু মিলে গেছে বললেন?

বাবা বললেন, হ্যাঁ। সময় পর্যন্ত।

—তা হলে, উনি যা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তাও মিলবে।

বাবা যেন খুশি হলেন না। বললেন, খুব বড় হবে ও, খুব বিখ্যাত হবে, না হয় মানলাম সে কথা পণ্ডিতমশাই। কিন্তু সে তো পঞ্চাশ বছর বয়সে।

—হ্যাঁ, আর দেশের চেয়ে বিদেশে বেশি খ্যাতি হবে।

বাবা হাসলেন, যেন বিষণ্ণ হাসি!—মৃত্যুর পর নাকি ক্রমশই সে খ্যাতি বাড়বে। কিন্তু তাতে জাতকের কি লাভ পণ্ডিতমশাই? তার জীবন তো দুঃখকষ্টের মধ্যে কাটবে বললেন উনি।

পণ্ডিতমশাই দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—হ্যাঁ, জীবনে নাকি সুখের মুখ দেখবে না। বন্ধু ভেবে যার উপকার করতে যাবে সেও ছুরি বসাবে পিছন থেকে। ঈর্ষা দ্বেষ অপবাদ সহ্য করতে হবে সারা জীবন। তবে হ্যাঁ, হাজারো দুঃখকষ্টের মধ্যেও প্রফুল্ল থাকবে, মুখে হাসি থাকবে, এ-কথাও বলেছেন।

দুঃখকষ্ট! ঈর্ষা, দ্বেষ, অপবাদ সহ্য করতে হবে? ওসবকে আমি বুড়ো আঙুল দেখাবো, মনে মনে ভেবেছিলাম।

আর নিরুকে বলেছিলাম, দেখিস বড় হব আমি, বিখ্যাত হব।

—কি করে হবি রে?

—কেন ব্যারিস্টারি পড়বো। এক মুহূর্তও না ভেবে বলেছিলাম।

সি আর দাশ ব্যারিস্টার—নিমাইদার কাছে শুনেছিলাম। নিমাইদার কাছেই শুনতে পেতাম সি আর দাশের গল্প। বিখ্যাত লোক বলতে ঐ একটা নামই মনে পড়ত।

তখন পর্যন্ত 'দেশবন্ধু' বলতে শুরু করেনি নিমাইদা।

বাবার কাছে যে কত লোকজন আনাগোনা করতো—হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী,

মারাঠী, মুসলমান—কিন্তু কেউই দেশবন্ধু বলতো না। কি আশ্চর্য, মুসলমান হলেও যে বাঙালী হয়, পাঞ্জাবী হয়, হিন্দুস্থানী হয়, তখন বুঝতাম না।

আমাদের ক্লাসেই পড়তো মুস্তাফা—আমাদের মতোই বাংলায় কথাবার্তা বলতো। অথচ বাবা একদিন যখন জিজ্ঞেস করলেন, তোদের ক্লাসের সবাই বাঙালী নাকি রে ? তখন উত্তর দিয়েছিলাম, না, একজন শুধু মুসলমান।

তারপর যখন বললাম যে সেও বাংলাতেই কথাবার্তা বলে, তখন কি বকুনিটাই না দিয়েছিলেন।

বাবার কাছে সব জাতের লোকই আসতো। কিন্তু মুসলমান এলেই মা বিরক্ত হতো। টেবিল চেয়ার ধোয়া হতো, টেবিলক্লথ কাচতে হতো সেদিন। আর তাই ঝগড়া হতো বাবা আর মা-র মধ্যে।

প্রথম প্রথম আমি বুঝতাম না, ওরা কেন আসে বাবার কাছে, কি আলোচনা হয়। ক্রমশ ইস্কুলের অবাঙালী বন্ধুদের সঙ্গে মিশতে মিশতে হিন্দীটা রপ্ত হতেই জানতে পারলাম, রেল কারখানার বিরুদ্ধে যার যত কিছু অভিযোগ সে সম্পর্কেই বাবার সঙ্গে আলোচনা করতে আসে ওরা।

কোলকাতা থেকে ছিপছিপে চেহারার এক ভদ্রলোক, নিশীথবাবু না কি নাম যেন, আর বোম্বে থেকে যিনি আসতেন তাঁর নাম ছিল গিরিসাহেব, দু-জনেই এসে থাকতেন দু-একদিন আমাদের বাসায়। সে-সময় একটা কথা শুনতে পেতাম প্রায়ই—লেবার ইউনিয়ন। একদিন বেশ জোর মিটিং বসেছিল মনে আছে। দুর্গা মন্দিরের চত্বরে অনেকে জড়ো হয়েছিল। গিরিসাহেবও এসেছিলেন।

বাবা সকলকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন লেবার ইউনিয়ন ব্যাপারটা কি। বিলেতে কোথায় কি ইউনিয়ন হয়েছে, তারা কি কাজ করছে ইত্যাদি।

একজন কে বললে, কিন্তু ভারতবর্ষে ও ইউনিয়ন হতে পারে না। হওয়া উচিতও নয়। আমাদের ঐতিহ্য, আমাদের দর্শন···

সকলেই বাধা দিয়েছিল। বলেছিল, সম্ভব নয় এ দেশে।

তাদের কথা শুনে রেগে গিয়েছিলেন গিরিসাহেব। বলেছিলেন, ভারতবর্ষের প্রথম লেবার ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা করবো আমরা, আপনাদের মত থাক বা না থাক। দশ বছর সবুর করুন, দেখবেন সারা দেশ ছেয়ে যাবে লেবার ইউনিয়নে।

অনেকে হেসেছিল সে-কথা শুনে।

দিন কয়েক পরেই আমাদের চার নম্বর কোয়ার্টারের ফটকে একটা কাঠের ফলক আঁটা হয়েছিল। তার ওপর ইংরেজিতে লেখা ছিল বি এন রেলওয়ে লেবার ইউনিয়ন অফিস। নীচে জেনারেল সেক্রেটারি হিসেবে বাবার নাম।

এই ব্যাপারের মাসখানেক পরেই শুনলাম চাকরিতে উন্নতি হয়েছে বাবার। দোতলা বাংলোটায় বদলি হবো আমরা।

সে-খবর শুনে মা বলেছিল, ঐ সব ইউনিয়ন-টিউনিয়ন বন্ধ করো। সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় তোমাকে ! দেখলে তো সাহেবরা কত ভাল ; কোথায় চাকরি যাবার কথা, তা নয় প্রোমোশন পেয়ে গেলে।

বাবা হেসে বললেন, প্রোমোশন নয় গো প্রোমোশন নয়, ঘুষ। কাজের দাম যদি দিত তা হলে এতদিন অডিটার হয়ে যেতাম।

দোতলা বাংলোটায় যেদিন মালপত্র নিয়ে উঠে এলাম আমরা, সেদিন বাবা কাঠের ফলকটা নিতে ভুললেন না।

নতুন বাসার সামনেও সেটা ঝুলিয়ে দেওয়া হল।

সেই সপ্তাহেই কোলকাতা গেলেন বাবা। বলে গেলেন, নিমাইদার কাছ থেকে সাইকেল চড়াটা শিখে নে তিমু, কোলকাতা থেকে ফেরবার সময় তোর সাইকেল নিয়ে আসবো।

অনেক দিন পরে বুঝতে পেরেছিলাম, ফার্স্ট হবার জন্যে নয়, বাবার চিঠিপত্র এপাড়া ওপাড়া পৌঁছে দেবার জন্যেই এত তাড়াতাড়ি সাইকেলটা কিনে দিলেন।

তা হোক্। সাইকেল পাওয়ার পর শিখতে লেগেছিল দু-দিন। আর সাতদিন না যেতেই সারা শহরটা সেই প্রথম নিজের চোখে দেখতে পেলাম।

এত বড় শহরটা, ওদিকে ইঁদা, পুরোনো বাজার, ট্রাফিক সেটেলমেন্ট, আর এদিকে খরিদা, নিউ সেটেলমেন্ট, কলাইকুণ্ডা, মালঞ্চ। রেললাইন পার হয়ে সাহেবপাড়া, সাহেবপাড়ার শেষে চাঁদমারির ময়দান, হিজলীর জেলখানা। সব যেন মুঠোর মধ্যে।

পুবের নগরতলী হল ইঁদা। তারপর নীচের জমি থেকে বেশ খানিকটা উঁচু রাস্তা। দু-পাশের ধেনো জমির মাঝ দিয়ে চলে গেছে লাল ধুলোর রাস্তাটা। সেই কংসবতীর ফেরিঘাট অবধি। সেখান থেকে ফেরি নৌকোয় নদী পার হতে লাগে দু-পয়সা, আর নদী পার হলে মহকুমা শহর।

নিরুদের সঙ্গে এই ফেরিঘাটে চড়ুইভাতি করতে আসার দিন সময় লেগেছিল ঘণ্টা তিনেক। ফিটন গাড়িতে রাস্তা যেন আর শেষ হয় না। অথচ সাইকেলে এক ঘণ্টাও লাগতো না। বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই চলে যেতাম বেড়াতে।

পশ্চিমের আকর্ষণটা ছিল আরও বেশি। কলাইকুণ্ডা—ছোট একটা পল্লী আর চার পাশে তার ধানজমি নয়, ঘন বন।

শাল তাল তমাল বনরাজিনীলা···

পাঠ্যপুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার একটা অংশ ছিল। সেই বইয়ে পড়া লাইনটা মনে পড়ে যেতো কলাইকুণ্ডায় গেলেই। আর মনে পড়তো নিরুর দাদুর মুখে শোনা এই রেল কলোনিটার গোড়া-পত্তনের ইতিহাস।

কলাইকুণ্ডার মতই এ শহরটাও যে এক সময়ে রীতিমতো বনজঙ্গল ছিল তা বিশ্বাস হতো।

ইচ্ছে হতো অতীতের সেই সব দিনগুলোয় ফিরে গিয়ে নিজের চোখে দেখে আসতে।

কল্পনার চোখে যেন দেখতেও পেতাম সে-সব দিনের ছবি।

কাঁধে টাঙি নিয়ে এল তিনশো কুলি। রায়পুর ছত্তিশগড় থেকে কুলি রিক্রুট করে পাঠাতো কোম্পানির নাগপুর আপিস। সিনি অবধি এসে ট্রেন বাঁক ঘুরতো আদরার দিকে। আর ছোট ছোট ঠেলা-ট্রলিতে এদিকে আসতো কোম্পানির লোকজন, কুলিকামিন। কখনো বা হেঁটেই মেরে দিত তারা।

তখনও ইঞ্জিনিয়ার এসে এদিকের লাইন পরীক্ষা করে যায়নি। মাঝ পথের দু-দুটো বড় পুল তৈরিই হয়েছে তখন, কিন্তু সকলেরই মনে ভয়, ওর ওপর দিয়ে ট্রেন চালালেই সব ভেঙে পড়বে হুড়মুড় করে। তাই নাগপুর থেকে পাঠানো তিনশো কুলিকামিনও সাহস করে পুলের ওপর দিয়ে ট্রলি চালিয়ে আসেনি। ট্রলিতে লম্বা একটা দড়ি বেঁধে দু-জন দু-জন করে পার হয়ে ট্রলিটাকে টেনে পার করেছিল। পাছে বেশি লোক একসঙ্গে পার হতে গেলে পুল ভেঙে পড়ে, তাই।

সে-গল্প বলতে বলতে দাদু হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন।—কুলির ইংরিজি কি বলো তো?

বলতে পারি নি।

দাদু হেসে বলেছিলেন, ঐ যে মন্দিরের পেছনে ছোট ছোট এক কুঠুরির অন্ধকূপগুলো, কি নাম ও পাড়ার?

—পোর্টারখোলি।

দাদু হেসে বলেছিলেন, কুলির ইংরিজি পোর্টার, ওদের খোলি-অর্থাৎ ঘর, তাই নাম হয়েছে পোর্টারখোলি। কিন্তু কুলিটা কি ভাষা?

—হিন্দি।

দাদু হেসে বললেন, না। কুলি আজ সব ভাষাতেই চলছে, সারা ভারতবর্ষেই ঐ এক কথা। কিন্তু ওর পিছনেও ইতিহাস আছে। রেল কোম্পানি প্রথম যে একদল সাহেব পাঠিয়েছিল, তারা এসে প্রথমে ঘাঁটি গেড়েছিল পুনায়। আর কাজের জন্যে লোকজন নিত তারা আশেপাশের গ্রাম থেকে। তখন আর কে সাহেবদের কাজ করে জাত দেবে? জাত যাবার ভয়ে সাহেবদের ছায়া মাড়াতো না কেউ। কিন্তু তা ভাবলে তো পেট ভরবে না। যাদের জমিজমা নেই, বামুনরা অস্পৃশ্য করে রেখেছে বলে যারা কোনো কাজও করতে পায় না, এমন এক জাতের লোক বাস করতো ঐ বোম্বাই প্রদেশে। তাদের জাতের নাম ছিলো ক্যোলি। কোথাও কোথাও তাদের কাউলি বলে। এই ক্যোলিদের নাম থেকে 'কুলি' হয়েছে। তারাই ভারতবর্ষে যন্ত্রসভ্যতার গোড়াপত্তন করেছে।

শেষের কথাটা বেশ জোর দিয়ে বলতেন। কিন্তু আমাদের মন থাকতো সাহেবদের দিকে। মনে হতো তারা যেন অনেক উঁচুদরের মানুষ, অনেক বেশি বিদ্বান, বুদ্ধিমান, অনেক বেশি শক্তি তাদের।

দোতলা বাংলোয় উঠে আসার পর প্রতি রবিবার সকালে দেখতাম দলে দলে খ্রীস্টানরা সেজেগুজে সামনের রাস্তা দিয়ে গির্জায় যেত। কালোকুলো রঙ, কথা বলতো তেলেগুতে, অথচ রবিবার সকাল হলেই ছেলেবুড়ো মেয়েপুরুষ সবাই ধোপদুরস্ত কোট প্যান্ট, কিংবা গাউন পরে গির্জায় যেতো ওরা। পুবে গোলবাজার পার হয়ে ওপাশে ছিল কয়েক সারি কোয়ার্টার। ইলেকট্রিক আলো আর জলের কল ছিল ওদের কোয়ার্টারে। অথচ আমাদের আগের সেই চার নম্বর কোয়ার্টারেও ও-দুটোর মধ্যে কলের জলটাই ছিল. ইলেকট্রিক ছিল না। দোতলা বাংলোয় এসে প্রথম বোতাম টিপতেই ইলেকট্রিকের আলো জ্বলতে দেখলাম।

দোতলা বাংলোয় উঠে আসার পর হঠাৎ সারা কলোনির বুকে আমরা যে নতুন সম্মান পেতে শুরু করলাম তার পিছনে এই ইলেকট্রিক আলোটাও একটা কারণ। অথচ ঐ খ্রীস্টানদের সকলের বাড়িতেই এ আলো জ্বলতো।

তবু ওদের যেন ঠিক ভাল চোখে দেখতো না কেউ। ওদের খ্রীস্টান বলতাম না আমরা, বলতাম তিনপটিয়া। তিনপটিয়া কথাটার কি যে মানে কেনই বা শুধু ঐ খ্রীস্টানদের বলা হতো জানতাম না। কিন্তু ঐ শব্দটার মধ্যে যেন বেশ একটা ঘৃণার ভাব ছিল।

তবু ওদের ভয় পেতাম আমরা। আর পশ্চিমের ছোট গির্জার পাশ দিয়ে যাবার সময় সাইকেলের বেল বাজাতে সাহস হতো না। শুধু দেখতাম সারি সারি মেয়ে পুরুষ ডেস্কের মতো বেঞ্চির সামনে চুপচাপ হাঁটু গেড়ে আছে, আর বেদীর মতো উঁচু একটা জায়গা থেকে সাদা আলখাল্লা পরা একটা লোক কি যেন আউড়ে যাচ্ছে। ক্লাসের সব ছেলেগুলোকে নীল-ডাউন করিয়ে যতীনবাবু যেন ইংরেজি পড়াচ্ছেন।

শুধু একটা ঘটনার পর ধারণা হল যে ওরাও রাজার জাত। যেদিন ব্যায়ামচর্চার আখড়াটা ভেঙে দিয়ে গেল পুলিস।

সাহেব পাড়াটা ছিল ছবির মতো। চমৎকার পীচের রাস্তা, দু-পাশে শাল, শিরীষ, কৃষ্ণচূড়ার গাছ। আর রাস্তার ধারে ধারে বড় বড় বাগান, সুন্দর এক একটি বাংলো। আর সেই সব বাংলোয় থাকতো আরো সুন্দর সাহেব মেমের দল। তাদের বাড়িতে ইলেকট্রিকের আলো জ্বলতো, রেডিও বাজতো, ফুলে ফুলে ভরা থাকতো বাগান। তবু রাগ হতো না।

রাগ হতো শুধু তিনপটিয়াদের ওপর।

রাস্তায় বের হতে হলেই সাহেবদের পোশাক পরিচ্ছদ পরতো তারা, ইংরিজিতে কথা বলতে চেষ্টা করতো, আর গির্জায় যেতো রবিবারে। শুধু এই গুণেই মাইনে বেশি পেতো ওরা, কোয়ার্টারও পেতো ভাল।

দাদুকে একদিন প্রশ্ন করেছিলাম, ঐ কালোকুলো তিনপটিয়াগুলোও নাকি রাজার জাত, দাদু ?

দাদু বলেছিলেন, সে এক ইতিহাস। ওরা কি করে খ্রীস্টান হল বলি তা হলে, শোনো।

আর দাদুর কাছে শোনা গল্পটা হঠাৎ মনে পড়ে যেতো কলাইকুণ্ডার দিকে বেড়াতে গেলে।

চতুর্দিকে বন জঙ্গল, আর দূরে দূরে দু-চারটে ছোট ছোট গ্রাম। শ-পাঁচেক কুলি মজুর এসে জুটেছে তখন একে একে। জনকয়েক সাহেব, দু-জন বাঙালী, পাঞ্জাবী ঠিকাদার একজন—বলবন্ত সিং, আর জনকয়েক হিন্দুস্থানী আর মাদ্রাজী। গোটাকয়েক কোয়ার্টার, আর কুলিদের জন্যে এক সারি ঘরও তৈরি হয়ে গেছে তখন। এ-দিকে রেললাইনও এগিয়ে গেছে কোলাঘাটের দিকে। ছোটখাট একটা স্টেশন, একটা ইঞ্জিন শেড, আর টুকিটাকি মেরামতের একটা কারখানা চালু হয়েছে। এমন সময় প্রথম যেদিন একটা ইঞ্জিন শান্টিং করতে করতে এল, সেদিন আশপাশের গাঁ থেকে গাড়ি দেখবে বলে লোক জড়ো হয়েছিল অনেক। তারপর ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে হুইসল্ দিয়ে যখন এল ইঞ্জিনটা, ভয়ে সব এদিক ওদিক ছুটে পালালো। গাঁয়ে গাঁয়ে লোক পাঠানো হল ভয় ভাঙাবার জন্যে। কিন্তু তাতেই কি ভয় ভাঙে ! প্রথম যেদিন ট্রেন এসে থামলো সে-দিন একটা লোকও এল না দেখতে।

'শুধু আমাদের কন্স্ট্রাক্শন গ্রুপের লোকেরা হাত তুলে চিৎকার করে গার্ড আর ড্রাইভারকে হুর্‌রে দিলাম।' দাদু বলেছিলেন।

আর আমরা সে-কথা শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। আমাদের দেশের লোক এতো বোকা ছিল ? ট্রেন দেখে ভয় পেতো তারা ?

শুধু ভয় ? ট্রেনকে ভেবেছিল তারা যন্ত্রের অজগর। সাপের মতোই লম্বা শরীর, সাপের মতোই বুকে হেঁটে চলে, বিষের ধোঁয়া ছাড়ে নাক দিয়ে আর শিস দেয় সাপের মতো। এমন জিনিস যখন মাটির ওপর দিয়ে চলেছে তখন নির্ঘাত অভিশাপ নামবে গ্রামে গ্রামে। আর ও গাড়িতে উঠলে জাত যাবে সকলের। বামুন বাগ্‌দীর তফাত নেই, সব গায়ে গা দিয়ে নাকি বসতে হয়। মালঞ্চ গাঁয়ে তাই রীতিমতো যাগযজ্ঞ শুরু হল। সেবারে কলেরায় মরলো অনেক লোক, বামুনরা বললে রেলের গাড়ি আসার জন্যেই নাকি মড়ক লেগেছে। আর গাঁয়ের ছোকরারা ঠিক করলে রাতারাতি লাইন তুলে ফেলবে। কন্স্ট্রাক্শনের পণ্ডিত মশাইয়ের আনাগোনা ছিল কাছাকাছি গ্রামগুলোয়, তিনিই এসে খবর দিলেন। পরের দিনই তাই এক গাড়ি পল্টন আনানো হল লাইন পাহারা দেবার জন্যে।

দাদু হেসে বলেছিলেন, কিন্তু পেটে ভাত না পড়লে ধর্মের কুসংস্কার কোথায় উড়ে যায়। সে-বছর হলো অনাবৃষ্টি, এক মুঠো ধান নেই সারা গাঁয়ে।

কোম্পানি সুযোগ দেখে বললে, যে চাও চাকরি পাবে, ধান চাল আনিয়ে দেবো অন্য দেশ থেকে। খাওয়া-পরার ভাবনা ঘুচবে তোমাদের। দলে দলে লোক এসে জুটলো ; জঙ্গল সাফ করে নতুন ঘরবাড়ি তৈরি হল, কারখানা বাড়তে লাগলো দিনে দিনে।

তবু রেলের গাড়িতে চড়তে চায় না কেউ। সকলেরই ভয় জাত যাবে। মুখে বলে, পুল ভেঙে নদীতে ডুবে মরতে হবে, তাই রেলে চাপি না।

কোম্পানি বললে, রেলে চেপে যে যেখানে খুশি যেতে পারে, আবার বিনা পয়সায় ফিরেও আসতে পারে। আর রেলে চাপলেই সবাইকে একটা করে ভাল কম্বল দেওয়া

হবে। তিন মাসে দেড় লক্ষ কম্বল বিলিয়েছিল কোম্পানি। আর কম্বলের লোভে যখন সকলের ভয় কেটে গেল, দেখলে যাতায়াতের অনেক সুবিধে হয়েছে, জাত যাওয়ার প্রশ্ন তুলছে না কেউই, তখন রেলে চড়ার জন্যে সবাই পাগল হয়ে উঠল।

অনেক দূর থেকে রেলের গাড়ি এসে থামতো স্টেশনে। লোকে লোকারণ্য হয়ে যেতো প্লাটফর্ম। তারপর ক্রমশ দেখা গেল গ্রামের মেয়েরা রেলগাড়ির পুজো করে ঘরে ঘরে। রেলের দৌলতেই নাকি দুর্ভিক্ষ গেছে দেশ থেকে, খেয়ে পরে বাঁচছে তারা।

দাদুর চোখ ছলছল করে উঠেছিল সে-কাহিনী বলতে বলতে। বলেছিলেন, একদিন দেখি কি, দল বেঁধে সব গাঁয়ের মেয়েরা চলেছে স্টেশনের দিকে। স্নান করে এলোচুলে মটকার শাড়ি পরে চলেছে তারা, হাতে কুলোর ওপর তেল সিঁদুর আর ফলমূল নিয়ে।

ট্রেন এসে থামতেই ইঞ্জিনের সামনে এসে সারি বেঁধে দাঁড়াল তারা, সুর করে করে গান ধরলে! কেউ শাঁক বাজালে, কেউ উলু দিল।

রেল রেল রেল
তোমার পায়ে দিই তেল।

গান গায় তারা আর ইঞ্জিনের চাকায় তেল সিঁদুর দেয়। বিজয়ার দিনে যেমন করে মা দুর্গার প্রতিমাকে বরণ করে, তেমনি ভাবে কেউ ইঞ্জিনের মুখের কাছে ফল আর বাতাসা তুলে ধরে, কেউ গান গায়:

রেলের কুঠি কতদূর
ব্যথার পায়ে তেল সিঁদুর।

যেন মানুষের মতোই এতখানি পথ হেঁটে এসে রেলেরও পায়ে ব্যথা হয়েছে, ভাবতো তারা। বলে হাসতেন দাদু।

জিজ্ঞেস করতাম, সব গানটা মনে আছে দাদু?

যতটা মনে ছিল বলেছিলেন। আর বার বার বলে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল আমাদের। আমরাও মাঝে মাঝে সুর করে গাইতাম গানটা:

রেল রেল রেল
তোমাব পায়ে দিই তেল
রেলের কুঠি কতদূর,
ব্যথার পায়ে তেল সিঁদুর।
এসো রেল বোসো রেল
মুখে জল বাতাসা
চালে ডালে রেখো তুমি
আমার কাছারে বাছারে....
রেল রেল রেল
আমার ভাতারে দিও মুড়ি তেল।

এ গান গাইতে গাইতে হেসে লুটিয়ে পড়তাম আমরা। আর মনে মনে ভাবতাম, গাঁয়ের লোকগুলো ছিল পুরোদস্তুর জংলী।

সেইজন্যেই বোধহয় কাছাকাছি গ্রাম থেকে যারা শাক সবজি মাছ ডিম বিক্রি করতে আসতো গোলবাজারে, তাদের 'জংলী' বলতো সকলে।

একদিন বাছারে মাছের দরদস্তুর করতে গিয়ে মেছুনীকে বলে ফেলেছিলাম, এত দাম কিসের রে, ফড়েরা তো এর চেয়ে সস্তা দেয়। তা হলে আর জংলীদের কাছে কিনবো কেন ?

সামনাসামনি না হলেও সকলেই ওদের জংলী বলতো, কিন্তু ঐ নাম শুনে মেছুনী বঁটি দিয়ে কাটতে আসে আর কি !

—জংলী, আমরা জংলী, তোদের মতো হিন্দু আছি বলেই জংলী, না রে খোকা ? আর পাদ্রীর জল নিয়ে খিস্টান হলেই তো মেমসাহেব বলবি। বলে হেসেছিল মেছুনী।

তাকে হাসতে দেখে সাহস করে বলেছিলাম, যাঃ খিস্টান হলেই কি সাহেব হয় নাকি, তিনপটিয়া হয়।

দাদু শুনে বলেছিলেন, তিনপটিয়ারা এই জন্যেই খ্রীস্টান হয়েছে তিমু। আমাদের জাত-বিচার ছোঁয়াছুঁয়ি এমনি সব অত্যাচার চলতো অস্পৃশ্যদের ওপর। মাদ্রাজের ওদিকে পারিয়া বলে একটা জাত আছে। তাদের ছায়া মাড়ালেও নাকি বামুনদের পাপ হয়, দূর থেকে কোনো পারিয়ার মুখ দেখাও অশুভ। তাই নিজেদের পাড়া ছেড়ে বের হতে পায় না তারা, কাজকর্মও বিশেষ কিছু করতে পায় না, জমিজমাও নেই যে চাষবাস করে চালাবে। অথচ পেটের ক্ষিদেয় যদি রাস্তায় যায় তো কোনো বামুনের চোখ পড়লেই তার ওপর অকথ্য অত্যাচার করবে। তাই রেল কোম্পানির চাকরিতে তারাই ছুটে এসেছিল সকলের আগে।

এদিকে রেল কোম্পানিতে সাহেবসুবোও তখন অনেক। তাদের জন্যে একটা ছোট্ট গির্জা তৈরি হয়েছিল চাঁদমারির ময়দানের কাছে, একজন পাদ্রীও এসেছিল। সেই পাদ্রীর সঙ্গে যোগসাজশ ছিল বড় সাহেবদের। তাই হঠাৎ একদিন জানা গেল, যে যে-চাকরিই করুক, খ্রীস্টান হলেই তাদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হবে। কাগজ কলমে অবশ্য আইন হল না, কিন্তু পাদ্রী নিজেই তাদের বলতো। আর ওরাও দেখলে, যে খ্রীস্টান হচ্ছে তারই মাইনে বাড়ছে। এমনি করে ঐ তিনপটিয়া পাড়াটাই খ্রীস্টান হয়ে গেল। দাদু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, তাই ওদের কোয়ার্টারেই কলের জল, ইলেকট্রিকের আলো, আর আমাদের পাড়ায় চার নম্বরেও লণ্ঠন জ্বালাতে হয়, তিন নম্বরের লোককেও রাস্তার কল থেকে জল নিতে হয়।

নিমাইদার কথাতেও এমনি ক্ষোভ প্রকাশ পেতো। বলতো চোখের সামনে এত অত্যাচার দেখেও আমরা চুপ করে আছি তিমু, আর আমাদের এখানকারই বারো তেরো বছরের ছেলে প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরাম....কতখানি সাহস বল তো তাদের ?

শুনতাম আর কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠতাম মনে মনে। ইচ্ছে হতো প্রফুল্ল চাকীর মতোই বোমা হাতে নিয়ে ছুটে যাই, সমস্ত সাহেব পাড়াটাকে উড়িয়ে দিয়ে আসি।

৫

ঝিঝিপোকা লোকটাকে আমরা পাগল ভাবতাম। পরনে একটা রঙিন লুঙি, খালি গা, আর সারাদিন একরাশ ছাগলের তদারকিতেই পাগল।

ভোরবেলাতেই বুড়ো হাঁটতে হাঁটতে যেতো গোলবাজারে। ছাগলের জন্যে বট অশত্থের

পাতা বিক্রি করতে আসতো আশপাশের গ্রামবাসীরা, সেখানে পয়সায় আট আঁটি পাতাকে দরদস্তুর করে বারো আঁটিতে বাড়িয়ে নিজেই বোঝাটা বয়ে আনতো ঝিঝিপোকা। দুধও দোয়াতো নিজেই। ছাগল-দুধের দরকাব পড়লেই হাতে অ্যালুমিনিয়মের বাটি আর নগদ পয়সা নিয়ে হাজির হতে হতো সকলকে।

তারপর সারাদিন বিশ্রাম। কাবখানার লোক কারখানায় চলে যেতো, আপিসের বাবুরা যেতো আপিসে, শুরু হতো আমাদের রাজত্ব। কারণ টিফিনে বাড়ি থেকে জলখাবার খেয়ে আসার জন্যে আমাদের ছুটি ছিল এক ঘণ্টা।

এই সময়টায় ঝিঝিপোকা কোনো কোনোদিন গান গাইতো। যে গান পাগলের প্রলাপ বলেই জানতাম আমরা।

দাদুর কাছে যেদিন শুনলাম যে ঝিঝিপোকা নিজে গান বাঁধতো, যখন বয়স কম ছিল স্টেশনে যাত্রীদের কাছে একতারা বাজিয়ে গান শোনাতো, সেদিন থেকে ঠিক করলাম, বুড়ো কি গায় শুনতে হবে।

একদিন তাই সকালে দুধ আনতে গিয়ে বললাম, হ্যাঁ গো, তুমি নাকি গান বাঁধতে পারো।

ঝিঝিপোকা দুধ দোয়াতে দোয়াতে বললে, সে কি আর এখন পারি বে ভাই। আগে সাহেবরাও খুশি হয়ে পয়সা দিত আমার গান শুনে।

—তাই নাকি ? বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করলাম। বললাম, একটা গান শোনাও না আমাদের।

—শুনবি তোরা ? শুনবি আমার গান ? হঠাৎ ঘুরে বসলো ঝিঝিপোকা, দুধ দোয়াতে ভুলে গেল।

তারপর মৃদু হেসে বললে, ইস্কুলে কার গান পড়িস তোরা ? মহাকবি মহানন্দর গান পড়িস ?

মহাকবি মহানন্দ ! অনেক ভেবেও মনে পড়লো না ও-নামের কোনো কবি পড়ার বইয়ে আছে কি না।

মুখ কাচুমাচু করে বললাম, কই না তো ?

ঝিঝিপোকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, তবে আর তোদের লেখাপড়া হবে কি করে ! শুনবি তার গান···

বলেই সুর ভাঁজতে শুরু করে দিলো—

কলেতে চলেছে গাড়ী নাম বাষ্পরথ
ছয় দণ্ডে চলে যায় ছ'দিনের পথ ॥
কি আশ্চর্য্য দেখি আঁখি মেলিতে মেলিতে।
কতদূর গিয়ে পড়ে পবন গতিতে ॥

দুপুর বেলায় মা যেমন সুর করে রামায়ণ পড়তো ঠিক তেমনি সুর করে গান গাইতে শুরু করে ঝিঝিপোকা।

গান শুনে হেসে বাঁচি নে। রেলের গাড়ি চলেছে কিনা পবনগতিতে ! ঝিঝিপোকা তো জানে না, সত্যিকার পুষ্পক রথ তৈরি হয়েছে বিলেতে। পাখির মতো ডানা মেলে আরও অনেক দ্রুতগতিতে উড়ে যায় উড়োজাহাজ, তা আমরা শুনেছিলাম। কি একটা পত্রিকায় তার ছবিও দেখিয়েছিলেন নিমাইদা। তাই ঝিঝিপোকার গান শুনে ভাবলাম, আমাদের দেশেও যদি ঐ উড়োজাহাজ আসে তা হলে না জানি কি গান ফাঁদবে বুড়ো।

কিন্তু উড়োজাহাজের কথা বিশ্বাসই করলো না ঝিঝিপোকা। বললে, আমাকে বোকা

পেয়েছিস তোরা ? উড়োজাহাজ ? আকাশে উড়ে যায় সে-গাড়ি ? মহাভারতে এক পুষ্পক রথের কথা পড়েছি বটে, কিন্তু সে হল দেবতার ব্যাপার, হাজার হাজার বছর আগে ছিল। তা বলে এই ঘোর কলিকালে কিনা পুষ্পক রথ। বলে অবিশ্বাসের হাসি হাসলে।

কি অদ্ভুত মানুষের মন ! এই ইঞ্জিন-রেলগাড়িও তো একদিন অবিশ্বাস্য ছিল। এক জোড়া লাইনের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে একটা ইঞ্জিন ছুটে চলেছে একসারি কম্পার্টমেন্ট টানতে টানতে, মাঝে মাঝে চোঙা দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে আর সিটি দিচ্ছে—এ ছবিও তো একদিন কেউ কল্পনা করতে পারেনি। প্রথম দেখে ভয় পেয়েছে, কম্বলের লোভ দেখিয়ে যাত্রী জোটাতে হয়েছে কোম্পানিকে, অথচ যেদিন নিজেদের সুখ সুবিধে বুঝেছে সেদিন টিকিট কেটেই গাড়িতে চড়েছে। উড়োজাহাজ তখন আমরাও চোখে দেখিনি, পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য মনে হতো, তবুও বিশ্বাস করতে বাধতো না। বিনা তারে যদি রেডিওতে গান শোনা সম্ভব হয়, বি এস অর্থাৎ ব্লক সুপারভাইজার বিজয়বাবুর হেডফোন না কি বলে সেটা কানে লাগিয়ে আমরাও শুনেছি, তা হলে উড়োজাহাজই বা অসম্ভব হবে কেন ?

ঝিঝিপোকা বললে, বেশ বাপু, বেশ। না হয় উড়োজাহাজ বানিয়েছে ইংরেজরা, তা রেলগাড়ি যখন বানিয়েছে তখন সব পারে তারা। কিন্তু রেলগাড়ির জন্যে যেমন লোকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতো ইস্টিশানে, তোদের উড়োজাহাজের জন্যে তেমন বসে থাকবে না কেউ, সে আমি বলে দিলাম।

ঝিঝিপোকার মন রাখার জন্যে বললাম, নাঃ, তা থাকবে না ঠিকই। কিন্তু ট্রেনের জন্যে লোক কতক্ষণই বা অপেক্ষা করে, তা বলো ?

—কতক্ষণ ? চোখ কপালে তুললো ঝিঝিপোকা। তারপর জাপানী পুতুলের মতো মাথাটা বারকয়েক দুলিয়ে বললে, ওরে গোকুলপুর ইস্টিশান হয়নি তখন। গোকুলপুরেব লোক তখন সন্ধের সময় যাত্রা করতো গরুর গাড়িতে আর দুপুর রাতে এখানে পৌঁছে পুরো পাঁচ ঘণ্টা অপেক্ষা করতো ইস্টিশনে। মহানন্দ চক্কোত্তি তার 'রেলযাত্রা ভ্রমণে' লিখেছিল :

দশঘণ্টা রাত্রিকালে ছাড়িয়া বসতি।
ইস্টিশনে শক্তিপীঠে করিল বসতি ॥
ধ্যানযোগে বসিয়া থাকিল সর্বজনা।
একচিত্তে সবে করে বরের প্রার্থনা ॥

সুর করে করে গেয়ে চলে ঝিঝিপোকা :

ঘণ্টা শুনি তবে য়েকে য়েকে গিয়া।
বরপত্র লইলাম প্রণামি সপিয়া ॥

হাসি চাপতে হয় গান শুনে। টিকিট নয়, বরপত্র। কিন্তু কে হাসছে না হাসছে সেদিকে চোখ নেই ঝিঝিপোকার, ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে নিজের মনেই গেয়ে চলে :

ইত্তমধ্যে জয়ঘণ্টা বাজিতে লাগিল।
উত্তরদিকে মহাশব্দ শুনিতে পাইল ॥
শব্দ শুনি বোধ হয় কৈলাস হইতে।
শঙ্করী করিয়া দ্বন্দ্ব যান পৃথিবীতে ॥

একমনে গান গেয়ে চলেছিল ঝিঝিপোকা, হঠাৎ ফেন্সিংয়ের ওপার থেকে চিৎকার—ঝিঝি-পো-কা !

আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে : কু-পো-কাৎ !

কোথায় কি ! একটা অ্যালুমিনিয়মের প্যানে করে দুধ দোয়াচ্ছিল ঝিঝিপোকা, রাগের

মাথায় সেটাকেই হাতিয়ার বানিয়ে ছুটে গেল। ছলাৎ ছলাৎ করে বেশ খানিকটা দুধ পড়ে গেল, তবু হুঁশ নেই। রাস্তার দিকে ছুটে গেল গালাগালি দিতে।

—হারামজাদা, নচ্ছার, বদমাশ, হতভাগা ! কে রে, কে বললি ঝিঝিপোকা। শুয়োরের বাচ্চা, তোর বাবা ঝিঝিপোকা। আয়, সামনে আয় দেখি নচ্ছার ব্যাটা, দেখি কে বললে ঝিঝিপোকা।

কিন্তু কারও টিকি দেখা গেল না। রাগে গজগজ করতে করতে ফিরে এল ঝিঝিপোকা।

বললে, যা তোরা সব বেরিয়ে যা এখান থেকে, দুধ দেবো না আমি। দেবো না দুধ। গরুর দুধ খেয়ে পেটের অসুখ হয়ে মরবি যা তোরা, আমি দেবো না দুধ, যদি এক বাপের ব্যাটা হই তো দুধ বেচবো না আমি তোদের।

আমরা জনকয়েক ভয়ে গুটিসুটি মেরে বসেছিলাম। ঝিঝিপোকার স্বর ক্রমশই পঞ্চমে উঠছে দেখে কাচুমাচু মুখে বললাম, পয়সাটা ফিরে নিয়ে যাবো ?

—পয়সা ? ও পয়সা ? আচ্ছা দাঁড়া, ঐ পাঁঠিটা দোয়ানো বাকি আছে। বলে আবার দুধ দোয়াতে শুরু করলে।

কে যেন পাশ থেকে বললে, বেশ চমৎকার গান হচ্ছিল, দিলে মাটি করে।

বেশ বুঝলাম ঝিঝিপোকাকে খুশি করার জন্যেই বললে সে. কিন্তু কাল হল এতেই।

অনেকক্ষণ একটা কথাও বললে না ঝিঝিপোকা। দুধ দোয়ানো শেষ করে একটা ছোট কাঁসার গ্লাসে মেপে মেপে দুধ দিয়ে পয়সা গুনে গুনে লুঙির ট্যাঁকে গুঁজলো সব, তারপর আমরা সব উঠে আসছি দেখে হঠাৎ বললে, গান শুনবি নাকি ?

বললাম, শুনবো বলেই তো বসেছিলাম। তা বদমাশ ছেলেগুলো দিলে সব মাটি করে।

—হুঁ। নাক দিয়ে কেমন একটা শব্দ করলো ঝিঝিপোকা। বললে, আমার গান মাটি করবে ওরা। সাহেবরা পর্যন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শুনতো তা জানিস।

বললাম, সাহেবরা সত্যিই গুণের আদর জানে। গাও না একটা গান···

ঝিঝিপোকা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সখেদে বললে, সে-সব দিনই নেই ; সে-গানের এখন মানে বলে দিতে হয়। কালে কালে কতই দেখবো।

বললাম, কেন ? মানে তো বেশ বোঝা যায়, তুমি গেয়ে যাও তা হলেই হবে।

—তা হলেই হবে, সব বিদ্যাদিগ্‌গজ এক একটি। বল তো মানে কি এর !

ভক্তগণ সবে উঠে জয় জয় দিয়া।
শিষ্যগণ যার যত আয়োজন লয়া ॥
কেহ কেহ আসি করে চরণ মর্দন।
কেহ পদে তৈল দিয়া শান্তি করে শ্রম ॥
কেহ যজ্ঞকাষ্ঠ আনি যোগায় ত্বরিতে।
কেহ শান্তিজল আনি রাখে কলসেতে ॥

নিরুর দাদুর কাছে যে এ গল্প আমরা আগেই শুনেছি সে কথা না জানিয়ে শুধু বললাম, না, মানে তো বুঝলাম না কিছু।

ঝিঝিপোকা খুশি হল।—তোরা বুঝবি কি, তোদের বাবারাই বোঝে না। বুঝলে কি আর রোজ একটা করে লোক কাটা পড়ে !

মাথা নাড়লাম, অর্থাৎ তা তো বটেই।

ঝিঝিপোকা আরও খুশি হল। বললে, রেল হল সাক্ষাৎ শঙ্করী। কৈলাস থেকে নেমে এসেছে। তা শঙ্করীর পুজো করতে হবে না ? তখনকার দিনে তো এমন অনাচার ছিল না, লোকগুলো সব নাস্তিক হয়ে ওঠে নি। রেলগাড়ি এলে মেয়েরা তখন শাঁক বাজাতো, উলু

দিত। শঙ্করী যে এতখানি হেঁটে এসেছে তার পায়ে তেল মালিশ করে না দিলে পায়ের ব্যথা যাবে কেন : পুজো দিত সবাই। আর প্রার্থনা জানাতো।

চরণের ধ্বনি যেন সদা কর্ণে পড়ে।
পাদপদ্মতলে যেন কেহ নাহি পড়ে ॥
তব পদ প্রাপ্তি মাত্র মোক্ষ সেই জন।
একবারে ঘুচে তার পৃথিবী ভ্রমণ ॥
মোক্ষ হইলে পুন কী আর হেরিব চরণ।
অতএব পাদপদ্মে নাহি প্রয়োজন ॥

সুর করে করে গেয়ে চলে ঝিঝিপোকা, আর থেমে থেমে মানে বুঝিয়ে দেয়।

এমনি করে প্রতিদিন প্রায় শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

একদিন সমস্ত গানটা নিরুর দাদুকে শুনিয়েছিলাম, আর মানেটাও।

শুনে দাদু হেসেছিলেন। বলেছিলেন, হ্যাঁ মেয়েরা এসে পুজো করতো ঠিকই, কিন্তু ও গানটার মানে তো তা নয়।

—এই মানে নয় ?

দাদু হেসে বলেছিলেন, স্যাটায়ার কাকে বলে জানো ? বিদ্রূপাত্মক সাহিত্যকে বলে স্যাটায়ার। এ গানটাও তাই। বরপত্র, প্রণামী, এ সবই ঠাট্টা করে লেখা। তখন তো এত উন্নতি হয় নি ইঞ্জিনের, তাই প্রত্যেক স্টেশনেই চাকা পরিষ্কার করা হতো, চাকায় তেল দিতে হতো। কয়লার সঙ্গে কাঠও দেওয়া হতো প্রত্যেক স্টেশনে, ইঞ্জিনকে জলও নিতে হতো। যজ্ঞকাষ্ঠ আর শান্তিজল—ও দুটো বিদ্রূপ করে লিখেছিল মহানন্দ চক্রবর্তী। পাকুড় থেকে যেবার প্রথম কলকাতা যান চক্রবর্তী মশাই সেবার ফিরতি পথে এখানে নেমেছিলেন, তাঁর মুখে শুনেছি এ গান।

দাদুর মুখে শুনে মনে হল, সত্যিই তো, এ তো ঠাট্টাই। এ গানের কেউ মানে বোঝে না বলে কিনা বড়াই করে ঝিঝিপোকা ? নিজেই তো মানে বোঝে নি।

সন্ধের সময় নিরুদের বাড়ি থেকে ফেরবার সময় তাই হঠাৎ চিৎকার করে উঠলাম, ঝি-ঝি-পো-কা !

পরী পাশেই ছিল, সে হাঁক ছাড়লো : কু-পো-কাৎ।

৬

যে-শহরের পিছনে যত দীর্ঘ ইতিহাস সে-শহর তত বেশি নোংরা। কোনো বাধানিষেধ মানে না, নিয়মকানুন তার কাছে তুচ্ছ। তাই কোথাও আগাছার মতো বস্তি, কোথাও বা বনস্পতির মতো অট্টালিকার সারি দেখা দেয়। তারপর হঠাৎ এক সময় দেখা যায় শহরটা যত বড় হয়েছে, কুৎসিতও হয়েছে ততখানি।

দাদু যাই বলুন না কেন, ঝিঝিপোকা গান গেয়ে যতই না এ উপনগরের প্রাচীনত্ব জাহির করুক, আসলে যে একশো বছরও বয়স হয় নি রেল কলোনিটার তা বোঝবার মতো বয়স হয়েছে তখন।

যারা দু-দিনের জন্যে বেড়াতে আসতো, তারা বলতো, শহরটা চমৎকার, ছবির মতো।

আমরা জানতাম, ছবির মতোই। প্রাণ নেই, শুধুই ছবি।

রাস্তার দু-পাশে সারি সারি কোয়ার্টার। এক ইটের পাতলা দেয়াল, পেটা ছাদ কোনো

সারির, কোনোটা বা টালির। বাইরের দেয়ালে প্লাস্টারের বালাই নেই। পয়েন্টিংয়ের নামে দাঁত বের করে আছে যেন ইটগুলো। এই এক পাড়ায় এক এক নম্বরের কোয়ার্টার্স। উত্তর পশ্চিম কোণের পল্লীটা সব চেয়ে নোংরা—এক নম্বর কোয়ার্টারের সারি। অর্থাৎ শুধুই একখানা করে ঘর এক একজনের, দশখানা কুঠরি গায়ে গায়ে গা লাগিয়ে এক একটা ইউনিট। না আছে জলের কল, না পায়খানা। সেখানে থাকতো কারখানার কুলিরা। কয়েকঘর শুধু বাঙালী ; আর বেশির ভাগই মাদ্রাজী।

দু-নম্বর তিন নম্বরে অবশ্য বাঙালীর সংখ্যা নেহাত নগণ্য ছিল না। তাদের যদিও জল আনতে হতো রাস্তার কল থেকে, তবু রাস্তার ধারে ধারে দুর্গন্ধময় বারোয়ারি পায়খানার সামনে লোটা হাতে ভিড় করতে হতো না তাদের, এক নম্বরের কুলিমজুরদের মতো।

রাত্তিরে রাস্তায় যদিও ইলেকট্রকের আলো জ্বলতো, বাড়িতে প্রায় সকলকেই জ্বালাতে হতো হারিকেনের লণ্ঠন।

তিন নম্বর আর চার নম্বর কোয়ার্টার্সগুলোর সামনে ছিল এক ফালি করে বাগান।

কোয়ার্টারের সারি আর কারখানার ভোঁ। একটা জমকালো বাজার, দুটো সিনেমা হাউস। কর্মীদের জন্যে একটা লাইব্রেরী আর ইনস্টিটিউট। পাকাপোক্ত স্টেজ ছিল ইনস্টিটিউটে—মাঝে মাঝে নিমাইদার দল 'বিল্বমঙ্গল' নয়তো 'দেবলাদেবী' অভিনয় করতো সেখানে।

হ্যাঁ, এ ছাড়া ছিল একটা হাই স্কুল আর দুটো মিড্‌ল। একটা দেশী গির্জা, তিনপটিয়া খ্রীস্টানদের জন্যে। একটা হাসপাতাল।

দেড় লক্ষ লোকের পৃথিবী ছিল এইটুকুই। অথচ দেড় হাজার সাহেবসুবো আর উঁচু-কেদারার ভারতীয়দের জন্যে দক্ষিণ পাড়ায় এক বিঘে জমির ওপর এক একখানা বাংলো, ফুলে ভরা চমৎকার বাগান, ইলেকট্রিকের পাখা ছাড়াও সবুজ চিকে ঘেরা চওড়া বারান্দায় ছিল টানা-পাখার ব্যবস্থা। আর বাংলোর বাগানের এক প্রান্তে চাকরবাকর, আয়া, চাপরাসী, মেথরদের জন্যে যে কোয়ার্টার্সগুলো ছিল সেগুলোও যেন উত্তর পাড়ার বাবুদের কোয়ার্টারের চেয়ে ভাল।

দু-দুটো গির্জে ছিল ওদের। একটা রোমান ক্যাথলিক, একটা প্রোটেস্টান্ট। একটা হাসপাতাল, ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা কনভেন্ট, একটা পাবলিক ইস্কুল।

নামেই সাহেবপাড়া, বেশির ভাগই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। কিন্তু একটা ব্যাপারে দু-পাড়াতেই বাঙালীরা ছিল একচেটে।

ডাক্তার।

আমাদের ধারণা ছিল, ঐ একটা কাজে বুঝিবা সাহেবরা পিছিয়ে আছে, তাই অত বড় চাকরিও বাঙালীদেরই দিতে বাধ্য হয় কোম্পানি।

এই ডাক্তারের চাকরি পেলেন নিরুর মামা, শুনে খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু তারপরই শুনলাম, কনস্ট্রাক্‌শনের ডাক্তার হয়েছেন তিনি, নতুন কোথায় লাইন খোলা হচ্ছে চিরিমিরির কাছে, সেখানেই চলে যাচ্ছেন। আর, কোয়ার্টার্স পেলেই রাঙামামীকেও নাকি সেখানে নিয়ে যাবেন।

চোখ ছলছল করে অভিমানের স্বরে বলেছিলাম, তুমি যেও না রাঙামামীমা।

রাঙামামীমা মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, তুমিও চলো না তিমু, আমার কাছেই থাকবে।

—বাঃ রে, আমার যে ইস্কুল রয়েছে। আর বাবা যেতে দেবে নাকি আমাকে!

রাঙামামীমা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিলেন, আমাকেও যে তোমার মামা থাকতে দেবে না তিমু। আমি তো যেতে চাই না।

মাস তিনেক পরে হঠাৎ যেদিন নিরুর মামা ফিরে এলেন রাঙামামীমাকে নিয়ে যাবার জন্যে, সেদিন ছুটে গেলাম।

বললাম, তুমি সত্যি চলে যাবে রাঙামামীমা ?

বললেন, আবার তো আসবো তিমু, দিন কয়েক পরেই ফিরে আসবো। ভুলে যাবে না তো আমাকে ?

ভুলে যাবো ? এমন অদ্ভুত কথাও কেউ বলে ! রাঙামামীমাকে কেউ ভুলতে পারে নাকি ?

সেবার আমার যখন খুব অসুখ হল, পরীক্ষা দিতে পারলাম না, কে অসুখ থেকে সারিয়ে তুলেছিল আমাকে ?

রোজ দুপুর বেলায় এসে কাছে বসতেন, কত গল্প করতেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন, আর ওঁর হাতের ছোঁয়া লেগে মনে হত যেন জ্বর ছেড়ে গেছে।

শুধু জল আর বার্লি। কিছু খেতে দিত না মা। যা চাইতাম বলতো জ্বর ছেড়ে যাক্ বাবা, তখন যা চাইবে এনে দেবো।

রাঙামামীমা কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে একটা পেয়ারা এনেছিলেন একদিন। মা উঠে যেতেই বলেছিলেন. রেখে দাও তিমু, পরে লুকিয়ে লুকিয়ে খাবে। তোমার মা দেখলে বকবে আমায়।

লোভ সংবরণ করতে পারি নি। তখনই কামড়ে দিয়েছিলাম। আর মা এসে দেখতে পেযেই বকুনি দিয়েছিলেন—ছি ছি, পেয়ারা দিয়েছো ওকে ? ডাক্তারের বৌ হয়ে তুমি শেষকালে পেয়ারা খেতে দিলে ওকে ?

রাঙামামীমা হেসে বলেছিলেন, তা খাক্। খেতে বারণ করে ঐ বুড়ো হাতুড়েগুলো। আজকাল খাওয়া-দাওয়ার অত নিষেধ নেই।

মা অবশ্য আর কিছু বলে নি, শুধু আমাকে বলেছিল, হ্যাঁ রে, তুই কোন্ আক্কেলে খেলি বল্ তো ?

—বাঃ রে রাঙামামীমা দিল, খাবো না !

সত্যি, রাঙামামীমার ওপর অগাধ বিশ্বাস ছিল আমার। তাই সেদিন যখন বলেছিলেন, আমার তো যাবার ইচ্ছে নেই, তখন বিশ্বাস করেছিলাম সে-কথা।

অথচ যাবার দিনে কেমন হাসিহাসি মুখে বিছানা বাক্স গুছোতে দেখলাম। মনে হল রাঙামামীমা মিথ্যে কথা বলেছেন। ইচ্ছে না থাকলে কেউ এত তাড়াহুড়ো করে, এমন হাসিখুশি মুখে বাক্স গোছায় ? সারাদিন তাঁর কাছে কাছে ঘুরলাম, একবারও মনে হল না, আমাদের ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর।

কিন্তু সন্ধের সময় যখন ফিটনটা এসে দাঁড়াল, মালপত্র তোলা হল, লাল সিল্কের শাড়ি পরে সেজেগুজে মাথায় ঘোমটা টেনে বেরিয়ে এলেন রাঙামামীমা, নিরুর দাদুকে দিদিমাকে, নিরুর মাকে প্রণাম করে, তখন হঠাৎ দেখলাম, তাঁর দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

আমার চিবুকে হাত দিয়ে কি যেন বলতে গেলেন, কান্নায় কথা আটকে গেল তাঁর।

ধীরে ধীরে ফিটনে উঠে বসলেন। আরো কে কে যেন উঠল। সে-দিকে চোখই ছিল না আমার।

শুধু এক সময় বুঝতে পারলাম, আমারও দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আর আনমনে ফিটনের পিছনে পিছনে আমিও হেঁটে চলেছি।

লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে এসে দেখলাম, ঘোড়ায় টানা ফিটনটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। ট্রেন আসছে বলে গেট পড়ে গেছে।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ ঠিক করলাম, স্টেশনে যাবো, ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবো

রাঙামামীমাকে।

রেল লাইন পার হয়ে স্টেশনের দিকে পা বাড়ালাম। কোন দিক থেকে ট্রেন আসছে, কোথায় হুইস্‌ল বাজলো, কোনোদিকেই লক্ষ্য ছিল না

প্লাটফর্মে আমাকে দেখতে পেয়ে চোখ কপালে উঠল রাঙামামীমার।

—সে কি তিমু! তুমি স্টেশনে আসবে তা তো বলো নি। তা হলে তো গাড়িতেই আসতে পারতে। এতখানি হেঁটে হেঁটে···

মাথা নীচু করে রইলাম। জবাব দিতে পারলাম না কথার।

ট্রেন এসে পড়ল ইতিমধ্যে। জিনিসপত্তর তুলে দেওয়ায় যতটা পারলাম সাহায্য করলাম।

তারপর রাঙামামীমা স্থির হয়ে বসলেন জানলায় মুখ রেখে।

বললেন, এক মাসের মধ্যেই ফিরে আসবো, দেখো তুমি।

বললাম, সত্যি আসবে তো?

—আসবো, আসবো, আসবো। খিলখিল করে হেসে উঠলেন রাঙামামীমা।

কি যেন আবার বলতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই ঘণ্টা পড়ে গেল, হুইস্‌ল্ বাজলো। চট্ করে প্রণাম সেরে নেমে এলাম।

ধীরে ধীরে চলতে শুরু করলো ট্রেনটা। রাঙামামীমার জানালার পাশে পাশে হাঁটতে শুরু করলাম। ক্রমশ দূরে সরে যেতে লাগলো জানালাটা, দূরে—অনেক দূরে।

মনে হল চোখ ছলছল করছে রাঙামামীমার।

হাত নেড়ে বিদায় জানালাম হঠাৎ, কিন্তু একটা ফেরিওয়ালার মাথার খাবারের বাক্সতে ঢাকা পড়ে গেল সব।

সব, সব আলো যেন ঢাকা পড়ে গেল। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে টের পেলাম, অনেক রাত হয়ে গেছে। অন্ধকার, চারিদিক অন্ধকার।

রাস্তায় রাস্তায় অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করলাম, বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল না।

কি যেন শেষ হয়ে গেছে। কি যেন নেই।

ফাঁকা ফাঁকা। শরীরে যেন এক ফোঁটা শক্তি নেই, বুকের ভেতর কেমন একটা অবোধ্য ব্যথা।

রামমন্দিরে সিঁদুর-মাখা হনুমানজীর মূর্তিটার সামনেই ছিল একটা বজরঙ্। আখড়ায় কুস্তি লড়ছিল দু-জন, আর মুগুর ভাঁজছিল জনকয়েক। এক পাশে গিয়ে বসে রইলাম। কিন্তু কুস্তির দিকে চোখই রইলো, মন নয়। মন তখন ছিলই না।

কিছুক্ষণ পরেই কেমন যেন বিরক্তি লাগল। উঠে পড়লাম।

অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটতে হাঁটতে কখন অঞ্জলিদির পড়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি টের পাই নি।

কপাট বন্ধ করে ইতিহাস মুখস্থ করছিলেন অঞ্জলিদি।

ধীরে ধীরে টোকা দিলাম কপাটে।

পড়া বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ। খসখস শব্দ। খিল খুলতে এতটুকুও শব্দ করলেন না অঞ্জলিদি।

তারপর কপাট খুলেই এক মুখ হেসে বললেন, তুই? আমি ভাবলাম—

অঞ্জলিদি কি ভেবেছিলেন তা আমার বুঝতে বাকি থাকে না। নিশ্চয় ভেবেছিলেন আবার সেই সেদিনের মতো নিমাইদা এসেছে লুকিয়ে লুকিয়ে।

ঘরে ঢুকে বললাম, ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, এক গ্লাস জল দাও অঞ্জলিদি।

—বোস্‌। বলেই জল আনতে গেলেন। ফিরলেন এক হাতে কাঁসার গ্লাসে এক গ্লাস জল আর ছোট্ট একটা রেকাবিতে দুটো নারকোল নাড়ু নিয়ে।

বললাম, জল তেষ্টা পেয়েছে বললাম, ও-সব কেন আনলে ?

অঞ্জলিদি হেসে বললেন, বেশ করেছি, খেয়ে নে। গেরস্থ ঘরে শুধু জল দিতেও নেই, খেতেও নেই!

তারপর রেকাবিটা নামিয়ে রেখে বললেন, কোথায় ছিলি বল তো এ দু-দিন, তোর তো টিকিই দেখতে পাইনি।

কোনো উত্তর দিলাম না।

কিছুক্ষণ উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে থেকে অঞ্জলিদি হঠাৎ বললেন, কাল দুপুরে আসবি তো ?

—আসবো।

—নিমাইদাকেও বলে রাখিস।

—আচ্ছা।

—ইস্কুলের দেরি হয়ে যাবে না তো তোর ?

হেসে বললাম, ইস্কুলের দেরি হলে আমি চলে যাবো তোমাকে না জানিয়েই। অতক্ষণ ধরে কি করো বলো তো।

—কি আবার, গল্প করি বসে বসে।

—তা হলে আমাকে থাকতে দাও না কেন ? মিথ্যে কথা, বলো কি করো তোমরা ? আমি বুঝি উঁকি মেরে দেখি নি, নিমাইদা তোমাকে···বলেই হেসে ফেললাম। তোমরা ভারী অসভ্য।

হঠাৎ কেমন একটা আতঙ্কের ছায়া নামলো অঞ্জলিদির চোখে।

—কি দেখেছিস ? কবে ?

বললাম, চুমু তো খায় ছোটরা!

অঞ্জলিদিও হাসলেন। বললেন, ওঃ এই। সে বড় হলে বুঝবি।

কি আশ্চর্য। রাঙামামীমার মতোই অঞ্জলিদিও বলতেন, বড় হলে বুঝবি ?

কিছুই কি বুঝতাম না ? তা হলে রাঙামামীমাকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন, অঞ্জলিদির সঙ্গে নিমাইদার বিয়ে হবে কি না!

মনে মনে সন্দেহ হতো, হয়তো বিয়ের গল্পই করেন অঞ্জলিদি। তা না হলে এতক্ষণ ধরে কি কথা হয়।

টিফিনের ছুটির সময় কোন কোনদিন এসে দাঁড়াতাম অঞ্জলিদির ঘরের সামনে। মেঝের ওপর আঁচল বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে ঘুমোতেন তখন অঞ্জলিদির মা। সেই ফাঁকে বেরিয়ে পড়তেন অঞ্জলিদি। ওঁদের কোয়ার্টারের পরই আরেক সারি তিন নম্বর কোয়ার্টার, তারপর পাঁচিলে ঘেরা দুর্গা মন্দির।

মন্দিরের হিন্দুস্থানী দারোয়ানটা যেদিন দেখতে পেতো, মুচকি মুচকি হাসতো সে।

আমি আর অঞ্জলিদি চলে যেতাম একেবারে মন্দিরের পিছনে

একবার মন্দিরে কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা হবে বলে সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল। একজন ঠিকাদার মন্দিরের পিছনে ফাঁকা জায়গাটায় খানকয়েক ঘরও তৈরি করিয়ে দিয়েছিল পুরুত ঠাকুরের জন্যে। ঝগড়াঝাঁটি হয়ে মূর্তি প্রতিষ্ঠাও হয়নি, পুরুত ঠাকুরও আসেনি। ফাঁকাই পড়ে থাকতো ঘরগুলো। শুধু ব্যবহার হতো দুর্গা পুজোর সময়, ভোগ রান্নার জন্যে। সেখানেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে না করতে নিমাইদা এসে হাজির হতেন।

অঞ্জলিদি বলতেন, তুমি ওদিকে গিয়ে বসবে যাও তিমু। যাবার সময় ডেকে নিয়ে

যাবো।

সামনের দিকের সিঁড়িতে এসে বসে থাকতাম আমি। সময় যেন আর কাটতে চাইতো না। এত রাগ হতো এক একদিন।

অঞ্জলিদির নিষেধ সত্ত্বেও কোনো কোনোদিন লুকিয়ে দেখে আসতাম।

একদিন দেখি কি পুরুত ঠাকুরের জন্যে তৈরি সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন দু-জনে।

কেন জানি না, সেদিন খুব রাগ হয়েছিল অঞ্জলিদির ওপর। ফেরার পথে একটাও কথা বলি নি।

জাফরির বাইরে টাঙানো তারে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলেন অঞ্জলিদির মা।

অঞ্জলিদিকে দেখতে পেয়ে বললেন, কোথায় গিয়েছিলি, কাপড়গুলো কেচে শুকোতে দিতে হবে না?

অঞ্জলিদি হেসে বললেন, তিমুকে নিয়ে মন্দিরে গিয়েছিলাম, বাবার ওষুধের জন্যে দুর্বো আনতে। বলে হাতের দুর্বা ঘাসের গোছাটা দেখালেন।

ইস্কুলে যাবার সময় সেদিন বার বার মনে হয়েছিল, অঞ্জলিদি কত বুদ্ধিমতী। আব কি চমৎকার মিথ্যে কথা বললেন। নিমাইদাকে বলতে হবে, পুজোর সময় যখন থিয়েটার হবে তখন অঞ্জলিদিকেও যেন একটা পার্ট দেওয়া হয়।

৭

চোখ বুজে যতই নিজের ছোটবেলাকার কথা ভাববার চেষ্টা করছি ততই বিস্মিত হচ্ছি এই দেখে যে, কেবলই বুড়োদের মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠছে। সত্যি কথা বলতে কি, তখনকার জীবনটা যেন আষ্টেপৃষ্ঠে ঘিরে রেখেছিল শুধু বুড়োরা।

বুড়োদের মধ্যে নিরুর দাদু, ঝিঝিপোকা, আর আরেকজন সদাশিব জ্যাঠা।

মানুষের নামের সঙ্গে চরিত্রের এমন মিল খুব কম দেখা যায়।

ভোর বেলায় ঘুম ভাঙলেই সদাশিব জ্যাঠার মন্ত্রপাঠ শুনতে পেতাম। আর গানের সঙ্গে যেমন সঙ্গত তেমনি তাঁর মন্ত্রপাঠের তালে তালে খড়মের শব্দ আসতো।

আমাদের কোয়ার্টারের একপাশে ছিল হিন্দুস্থানীদের রামমন্দিব, আর আরেকদিকে বাঙালীদের দুর্গামন্দির। সংস্কৃত মন্ত্রের জলদ গম্ভীর উচ্চারণে সমস্ত পাড়াটা যেন ভোর বেলাতেই গমগম করে উঠতো। বেরিয়ে এসে দেখতাম, খড়ম পায়ে সদাশিব জ্যাঠা হেঁটে চলেছেন দুর্গামন্দিরের দিকে। বাঙালী কেন, পাঞ্জাবী পেশোয়ারীও তো কয়েক ঘর ছিল কাছে-পিঠে, কিন্তু অত দীর্ঘ শরীর আর এক জনেরও দেখি নি। এই লম্বা চওড়া সুস্থ সবল চেহারা, ফরসা ধবধবে রঙ, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ—দেখলেই আপনা থেকে মাথা নুয়ে পড়ে শ্রদ্ধায়। ওঁর মুখে সংস্কৃত স্তোত্রের উচ্চারণ শুনেও।

একবার মনে আছে, সরস্বতী পুজোর সময় সদাশিব জ্যাঠা কি হুলস্থুলটাই না বাধিয়েছিলেন। সরস্বতী পুজোয় আমরা অঞ্জলি দিচ্ছিলাম, মন্ত্র বলে দিচ্ছিলেন পুরুতমশাই। কাছেই কোথায় যে সদাশিব জ্যাঠা বসেছিলেন দেখি নি। হঠাৎ চিৎকার শুনে চমকে উঠলাম আমরা।

সদাশিব জ্যাঠা রক্তবর্ণ চোখে চিৎকার করে উঠলেন, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও পূজামণ্ডপ থেকে। পুরোহিত তুমি? তুমি পাষণ্ড পাপী নীচাধম—চণ্ডালের মতো অসংস্কৃত উচ্চারণে পুষ্পাঞ্জলির নামে বিদ্যাদায়িনীর সঙ্গে রসিকতা করছো কুলাঙ্গার।

চিৎকার শুনে গণ্যমান্য লোকেরাও এসে জমা হল। কিন্তু কেউ প্রতিবাদ করলো না, বরং পুরুত ঠাকুরের ওপরই সকলে যেন চটে গেল। লজ্জায় ভয়ে মাথা নিচু করে রইলেন পুরুত ঠাকুর। আর সদাশিব জ্যাঠা এগিয়ে এসে সামনের আসনে বসলেন। গঙ্গোদক, পুষ্প, বিল্বপত্র দিলেন প্রত্যেকের হাতে, কি ভাবে আসন করতে হবে দেখিয়ে দিলেন, তারপর ভক্তিমিশ্রিত সুরে গম্ভীর উচ্চারণে মন্ত্রপাঠ করলেন। প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছিলেন—যেন মনের ওপর কেটে কেটে লিখে দিচ্ছেলেন প্রত্যেকটি মন্ত্র।

তারপর সরে এসে পুরুতকে বললেন, দেখিয়ে দিলাম, এবার ওভাবেই করুন।

অঞ্জলি শেষ হওয়ার পর পরিষ্কার বাংলায় মন্ত্রের অর্থ বলে দিলেন সদাশিব জ্যাঠা।

তারপর থেকেই আমরা সকলে তাঁর ভক্ত হয়ে গেলাম।

ভোর বেলায় মন্ত্র পড়তে পড়তে খালি পায়ে খড়ম পায়ে হেঁটে যেতেন দুর্গামন্দির পর্যন্ত। দুর্গামন্দিরের নাটমণ্ডপের একপাশে ছিল একটা বাঁধানো কুয়ো। কুয়োর জলে স্নান সেরে আবার মন্ত্রপাঠ করতে করতে ফিরতেন তিনি।

তারপর নিজের বাসাতেই পুজো করতেন গরদের ধুতি পরে। পুজোর শেষে আমরা যারা গিয়ে হাজির হতাম, তাদের হাতে প্রসাদ দিতেন—সস্তার বাতাসা আর পচা কলা নয়—রীতিমত ক্ষীরের সন্দেশ, আঙুর, বাদাম।

প্রসাদ পাওয়ার পর সদাশিব জ্যাঠা শুরু করতেন আলোচনা—বেদ বেদান্ত ধর্ম দর্শন ইতিহাস।

বলতেন, সেদিন অত ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম কেন বলতে পারো ? ভুল সংস্কৃত উচ্চারণের জন্যে। সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ ভুল হলে অর্থ বিকৃত হয়ে যায়। মন্ত্র কি ? একাগ্র মনের প্রার্থনা। সংস্কৃত উচ্চারণ যদি না জানো, বাংলায় করো, আপত্তি করবো না।

তবু সব ব্যাপারেই তিনি আপত্তিও তুলতেন। আমাদের সব বিশ্বাসকেই বলতেন অন্ধ বিশ্বাস।

—স্বর্গ ? আমাদের প্রশ্নের জবাবে হেসেছিলেন একদিন। বলেছিলেন স্বর্গ নরক বলে আলাদা কোনো জগৎ নেই। সব কল্পনা। দেবদেবী মনের কল্পনা ? আর ধর্ম ? ধর্ম হল বাসস্থান। তার চারপাশে যেমন নিয়মকানুনের প্রাচীর আছে তেমনি আছে মুক্তির গবাক্ষ, আগমন নির্গমনের দ্বারপথ। যতদূর খুশি, যেখানে খুশি তুমি যেতে পারো, কিন্তু গৃহে ফিরে স্নান করে নিজেকে পরিচ্ছন্ন করে নিয়ে যেমন বিশ্রাম তোমাকে নিতেই হবে, তেমনি জীবনের বিশ্রামকক্ষ এই ধর্ম।

এমনি অনেক কথাই বলতেন। বেশির ভাগই আমরা বুঝতাম না, যেটুকু বুঝতাম, মন সেটুকুও বিশ্বাস করতে রাজি হতো না।

সদাশিব জ্যাঠা পণ্ডিত, তা তাঁর কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারতাম। মনে হতো মানুষ নন, দেবতা। সকলেই ভয় পেতো তাঁকে, ভক্তি করতো। কিন্তু একটা বিষয়ে আমার মন নিঃসন্দেহ ছিল। আমি জানতাম, সদাশিব জ্যাঠা ঘোর নাস্তিক। যতই পুজো-আর্চা করুন, মন্ত্রপাঠ করুন, ধর্মের উপর তাঁর কোনো আস্থা ছিল না।

জ্ঞানাচার্য মহারাজ যখন এসেছিলেন, দেখা করতে যান নি। ঘৃণার স্বরে বলেছিলেন, ভণ্ড। সব ভণ্ড সন্ন্যাসীর দল।

আর বামুনদের দু-চোখে দেখতে পারতেন না, বলতেন, কলির ব্রাহ্মণদের পাকশালাতেও প্রবেশ করতে দেওয়া উচিত নয়। বেদ ওদের চেয়ে বেদেরা বেশি বোঝে।

একা একা থাকতেন, স্বপাক খেতেন। অসুখ-বিসুখের সময় যে-কোনো ছোট জাতের রান্নাও খেতেন তিনি, কিন্তু ব্রাহ্মণ ছিল তাঁর কাছে অস্পৃশ্য।

বলতেন, যে-ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞ নয়, সদাচারী নয়, সে জাতিভ্রষ্ট। তার স্পর্শে অন্ন বিষাক্ত

হয়। সে ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য।

ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে তাঁর এত আক্রোশের কারণ বুঝতাম না। আমাদের সংস্কারে বাধতো, অস্বস্তি বোধ করতাম তাঁর কথায়।

রামায়ণ মহাভারত আর পুরাণের গল্প শুনে শুনে বিশ্বাস জন্মেছিল, ব্রাহ্মণরা সাক্ষাৎ দেবতার জাত। প্রাচীনকালে দেবতারাও নাকি ভয় পেতেন তাঁদের।

অথচ সদাশিব জ্যাঠা হেসে উড়িয়ে দিতেন সব। বলতেন, রামায়ণ মহাভারত সব গল্প। আর ওসব তিরিশ বছর বয়সের আগে শোনা পাপ, হিন্দু-মনকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার জন্যেই ও-সবের সৃষ্টি।

বিশ্বাস হতো না তাঁর কথা। জিজ্ঞেস করতাম, ভগবান তা হলে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বানালেন কেন?

—বর্ণসৃষ্টি ভগবানের? কোথায় থাকেন সে ভাগবান?

—ভগবান তো সব জায়গাতেই আছেন। সরল বিশ্বাসে বলতাম।

—সর্বস্থানে? আমার তোমার সকলের মধ্যে? বিশ্ববিচরাচরে সর্বত্র? জল মাটি বাতাস সকলের মধ্যে

—হ্যাঁ, সব জায়গায়।

—তা হলে তোমার জুতোর মধ্যেও আছেন? হাসতে হাসতে বলতেন সদাশিব জ্যাঠা।

আর সে-হাসি অসহ্য লাগতো আমার। রেগে উঠে চলে আসতাম। প্রতিজ্ঞা করতাম, এমন নাস্তিকের কাছে আর আসবো না। ভগবানকে যে তাচ্ছিল্য করে সে কি মানুষ?

তবু দিন কয়েক পরেই রাগ পড়ে যেতো, ফিরে আসতে হতো আবার। কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল তাঁর!

যেমন ঝিঝিপোকাকে একদিন ক্ষ্যাপাতে না পারলে মনে হতো সারাটা দিন বুঝি বৃথাই কাটলো। অথচ রাত্তিরে ঘুমোতে যাবার সময় লোকটার জন্যে মায়া হতো, দুঃখ হতো। অনুশোচনায় ভরে যেতো মন। হয়তো অজান্তে ভালবেসে ফেলেছিলাম ঝিঝিপোকাকেও।

তাই প্রথমটা রাজি হই নি পরীর কথা শুনে। কিন্তু নিমাইদা যখন বললো—

অনেকদিন থেকেই দুর্গামন্দিরের সামনের অসমাপ্ত নাটমঞ্চের দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে একটা চড়ুইভাতি করবো ঠিক ছিল, কিন্তু কিছুতেই পাকা বন্দোবস্ত হচ্ছিল না।

হঠাৎ সেদিন ধরে বসলাম, না নিমাইদা, হবে হবে করে পিছিয়ে যাচ্ছে। চড়ুইভাতিটার ব্যবস্থা করতে হবে এবার।

নিমাইদা বললেন, ঠিক আছে, কাল মাইনে পাবো, পাঁচটা টাকা আমি দেবো, বাকিটা তোরা যোগাড় কর।

—মানু পান্না হেনা ভক্তি সবাইকে ডাকতে হবে তো? জিজ্ঞেস করলাম।

নিমাইদা শুধু হেসে বললেন, তোদের অঞ্জলিদিকে ডাকবি না? তা না হলে রান্না করবে কে? অঞ্জলি কিন্তু মাংস রান্না করতে ওস্তাদ।

বললাম, তা হলে তো পাঁচ টাকায় হবে না।

নিমাইদা হেসে বললেন, চাল ডাল আলু পটল সব লুকিয়ে বাড়ি থেকে যোগাড় করে আনবে পান্নারাণী। কি গো পান্না, পারবে না?

ঘাড় দুলিয়ে পান্না বললে, খু-উ-ব। কিন্তু মাংস?

—সে ভার পরীর। নিমাইদা আর পরীর মধ্যে কি যেন ইশারা হল। প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারি নি।

আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিল পরী!

বললে, ঝিঝিপোকার আদরের বড় পাঁঠাটা বেশ তেল-চুকচুকে নাদুস-নুদুস হয়েছে

কিন্তু।

বললাম, সেকি। সেটাকে যে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখলাম আজ।

পরী চোখ টিপে বললে, সেইজন্যেই তো সুবিধে আরও।

নিমাইদার কাছ থেকে ছ-আনা পয়সা চেয়ে নিয়ে এল পরী। বললে, আয় আমার সঙ্গে।

স্টেশনের দক্ষিণে খোঁয়াড়, সেখানে গিয়ে হাজির হলাম।

পরী হাসতে হাসতে বললে, ঝিঝিপোকা খবর পাওয়ার আগেই কাজ সাফ করতে হবে কিন্তু।

হেসে বললাম, বুঝেছি।

তারপর খোঁয়াড়ের বাবুকে সামনে পেয়ে মুখ কাচুমাচু করে পরী বললে, আমার পাঁঠাটা ধরে নিয়ে এসেছে। ছেড়ে দিন না আজ, আর কোনোদিন রাস্তায় বেরুতে দেবো না, সত্যি বলছি। কান্না-কান্না গলায় জলে চোখ ভিজিয়ে পরী বললে।

খোঁয়াড়ের বাবু রেগে বললে।—ছেড়ে দেবো মানে! সরকারী খোঁয়াড়! একি আমার বাপুতি সম্পত্তি নাকি যে ইচ্ছে হলেই ছেড়ে দেবো।

—না, বলছিলাম কি, এখনো তো খাতায় লেখা হয় নি, আপনি যদি দয়া করে ছেড়ে দেন। সবই তো আপনার ওপর, আপনি ইচ্ছে করলে—

—না, না। খাতায় চোখ রেখে খোঁয়াড়বাবু হাত পাতলেন।—ছ-আনা ফাইন দিয়ে নিয়ে যেতে পারো। কিন্তু আর কোনোদিন যেন···

—তাই নিন স্যার। ছ-আনা পয়সা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এপাশে-ওপাশে তাকাতে তাকাতে দিয়ে দিল পরী।

সঙ্গে সঙ্গে, খাতার পাতায় দু-আনা পয়সা জমা করে বাকি চার আনা পকেটে রেখে খোঁয়াড়বাবু উঠলেন।

—কই চলো কোনটা দেখিয়ে দেবে।

পরী তখনও নাকিকান্না কাঁদছে।—আজ্ঞে, দেখাবো আর কি, ঐ কালোর ওপর সাদা ছিটে, ঐ ঐটে। বলে দেখিয়ে দিল পরী, তারপর খাতায় টিপসই করে পাঁঠাটা সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল।

বাঁটুল গার্ড দিচ্ছিল, পরী ফিরে আসতেই বললে, চল একেবারে পুরোনো বাজারের কসাইখানায়।

কসাইখানায় পাঁঠাটা জমা রেখে গাছে উঠে অশ্বত্থের পাতা ভেঙে এনে খাইয়ে বাড়ি ফিরলাম। পাঁঠাটাকে বেশ তাজা আর চাঙ্গা রাখতে হবে তো! বললাম, কাল ভোর বেলায় একে কেটে রেখো। খাঁড়ায় বলি দিও কিন্তু, জবাই করতে পাবে না। মা কালীর নামে উচ্ছুগ্‌গু করা পাঁঠা আমার। মাথাটা আর চামড়াটা তুমি পাবে না, এক সের মাংস নিও বরং।

কসাই ব্যাটা খুব খুশি। বললে, কিছু ভেবো না খোকাবাবু, সব রেডি রাখবো।

পরের দিন যথারীতি কাজও হল। মাংসটা যা চমৎকার রেঁধেছিল অঞ্জলিদি, মুখে লেগে আছে আজও। আর রান্না করতে গিয়ে ধোঁয়ায় আগুনে চমৎকার দেখাচ্ছিল অঞ্জলিদিকে। নিমাইদার ঠাট্টা শুনে এমন রেগে উঠছিল মাঝে মাঝে! তবু তো জানতো না মাংস কোত্থেকে এল। চড়ুইভাতি সাঙ্গ হওয়ার পর পাঁঠার চামড়াটা যখন ঝিঝিপোকার বাড়িতে ফেলে দিয়ে গেলাম, তখনই অঞ্জলিদি বুঝতে পারলো। উঃ, কি রেগে গিয়েছিল শুনে। তার চেয়ে বেশি রেগেছিল অবশ্য ঝিঝিপোকা।

ফলে সন্ধে থেকেই শুরু হল গালাগাল। গালাগালি দিতে দিতে ঝিঝিপোকা ক্লান্ত হয়ে পড়ে কান্না শুরু করলে। কেউ মরলে মেয়েরা যেমন ইনিয়ে-বিনিয়ে সুর করে কাঁদে তেমনি

ভাবে পাঁঠাটার গুণগান আরম্ভ করলো বুড়ো, চোখের জল মুছতে মুছতে।

নিমাইদা দূর থেকে লক্ষ্য করছিল, কাছে এসে একবারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বসলেন বুড়োকে।—কাঁদছো কেন দাদু? দিদিমার কথা মনে পড়েছে বুঝি?

—কে? অ, নিমাই। না রে ভাই, আমার পাঁঠাটা কোন শালা—কথা শেষ করার আগেই আবার কান্নায় ভেঙে পড়লো ঝিঝিপোকা।

নিমাইদা গম্ভীর হয়ে বললো, তা দাদু তুমি একা আর কতদিক সামলাবে বলো, দিদিমা থাকলে নয় কথা ছিল। তোমার আরেকটা বিয়ে করা উচিত ছিল দাদু, বুড়ো বয়সে অন্তত সেবাযত্নটা পেতে, আমরা সব দূরে দূরে থাকি, ইচ্ছে থাকলেও—

—আবার বিয়ে? তোদের দিদিমা তা হলে ঘাড় মটকে দিয়ে যাবে না? আর তার মতো ভাল মেয়েমানুষ আছে নাকি যে বিয়ে করবো?

—তা আছে দাদু, আমাদের পাড়ার হরেন চাটুজ্যের শালী, যেমন উর্বশীর মতো চেহারা, তেমনি গুণের মেয়ে। পুজোর সময় তোমাকে দেখেছিল, তারপর থেকে জিদ্ ধরেছে, তোমাকে বিয়ে করবে। পুরুষমানুষ বলতে নাকি তুমিই। নিমাইদা বেশ শান্তশিষ্টের মতো বললে।

সঙ্গে সঙ্গে ঝিঝিপোকার ফোকলা মুখে হাসি উঁকি দিল।—তা তোদের চেহারা দেখে কি কেউ পুরুষমানুষ বলবে নাকি?

—তা তো বলেই না। নিমাইদা ঢোক গিলে বললো, তা হলে টেঁপিকে কি বলবো বলো? হরেন চাটুজ্যেও বলছিল, তোমার মত নিতে। জোর করে অন্য জায়গায় বিয়ে দিয়ে তো আর নারীহত্যা করতে পারে না বেচারী।

শুনে ঝিঝিপোকার চোখ ঢুলুঢুলু হয়ে এল, ফিক্ ফিক্ করে হেসে বললে, দূর, এই বয়সে আবার বিয়ে! লোকে বলবে কি?

—বয়েস আবার কি? স্বাস্থ্য থাকলে আবার বয়স? তুমি এখনো একটা কি দাদু, একশোটা বিয়ে করতে পারো। তাছাড়া, দেখাশোনার লোক তো একটা চাই। এই ধরো তোমার অমন তেলচুকচুকে পাঁঠাটা টেঁপি থাকলে কি…

ঝিঝিপোকা একটা ছাগলের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, কেমন দেখতে মেয়েটা, বলছিস খুব সুন্দর?

উর্বশী!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো ঝিঝিপোকা।—যা ভাল বুঝিস কর, বলছিস যখন মেয়েটা আত্মঘাতী হতে পারে, শেষে বুড়ো বয়সে কি পাপ কুড়োবো। আমার কিন্তু একেবারেই ইচ্ছে নেই, তোর দিদিমাকে তো দেখিসনি…

—সে দিদিমাকে না দেখলেও নতুন দিদিমা দেখতে দোষ কি? কিন্তু ভাল করে ভোজ দিতে হবে দাদু, রোশনচৌকি বসাতে হবে। গান বাজনা না হলে কি বিয়ে হয়?

—হ্যাঁ, তা তো বটেই, হ্যাঁ তা তো বটেই। ঝিঝিপোকার মুখে হাসি আর ধরে না। বললে, তা টাকাটা নিয়ে বন্দোবস্ত যা করার তোরাই করিস। বুড়ো বয়সে আমি তো আর পাঁচ জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে পারবো না।

নিমাইদা বাধা দিলো—কি যে বলো দাদু, আমরা থাকতে তোমার ঘাড়ে ঝক্কি ফেলবো? তা হলে পাঁজিটা দেখাই পণ্ডিতমশাইকে, কেমন? টাকাটা তুমি ব্যবস্থা করে রাখো।

টাকা ছাড়া বাদবাকি ব্যবস্থাটা নিমাইদা নিজেই করলো। শহরের লোক তো হেসে বাঁচে না। ঝিঝিপোকা বিয়ে করবে? সত্তর আশি বছরের বুড়ো, হাঁটতে গেলে পায়ে পায়ে ঠোক্কর খায়, সেও বিয়ে করবে? আবার কনে নাকি ষোড়শী, রূপবতী। যাকে বলে, বৃদ্ধস্য তরুণী

ভার্যা। তা হোক্, খাওয়ার নেমন্তন্নটা যখন জুটেছে তখন আপত্তি করবার কিছু নেই। কোনো গরীবের মেয়ের তো তবু সিঁথিতে সিঁদুর উঠবে। কিন্তু কার মেয়ে ? কোথাকার মেয়ে ? কেউ ভাঙচি দেবে এই ভয়ে ঝিঝিপোকা হরেন চাটুজ্যের নামও মুখে আনলো না। তাই কনেপক্ষের খোঁজখবর কেউ জানতে পারলো না।

তা না জানুক, যথারীতি ঝিঝিপোকার বাড়ির সামনে ফুল পাতা রঙিন কাগজ দিয়ে সাজানো হল, সানাই শুরু হল একদিন আগে থেকেই। আর খাওয়াদাওয়ার সে কী বিরাট ব্যবস্থা।

নিমাইদা নিজে ঝিঝিপোকাকে সাজিয়ে দিলো, বুড়োর কালচে শুকনো খট্‌খটে মুখে স্নো মাখালে, পাউডার ঘষলে, চোখে পরালো কাজল, মাথায় টোপর। ঠোঁটে একটু আলতাও লাগিয়ে দিলে জোর করে। বললে, এ হল আজকালকার ফ্যাশন। তা ছাড়া টেঁপি নাকি লাল টুক্‌টুকে ঠোঁট পছন্দ করে, ওর নিজের ঠোঁটও তাই কিনা!

তারপর ঝিঝিপোকাকে মাইলখানেক দূরে 'কনের বাড়িতে' পৌঁছে দিয়েই নিমাইদা ছুটলো অন্দর-মহলে।

—কই গো পান্নারাণী, কনে সাজানো হয়েছে ? লগ্নর যে দেরি নেই।

পান্না হেসে চোখ পাকিয়ে বললে, হুঁঃ, অত তাড়াহুড়ো কিসের! এমন সুন্দর মেয়ে আমাদের, অত গরজ নেই। এ লগ্নে না হয় পরের লগ্নে হবে।

সবাই হেসে উঠলাম আমরা পান্নার চোখ পাকানো দেখে।

সত্যি, ঝিঝিপোকার বিয়ের দিনটা ভুলবো না কোনোদিন। হ্যাঁ আরেকটা বিয়ের ছবি মনে পড়ে—এলা আর বেলার সঙ্গে ডাবুদা আর টাবুদার বিয়ে।

একজনের নাম ছিল এলা আরেকজনের নাম বেলা। দুই যমজ বোন। বিয়ে হল যাদের সঙ্গে তারাও যমজ।

বিয়েটাও যে খুব ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় চুকে গেল তা নয়। কার কারসাজি কে জানে, সম্প্রদানের সময়ে সারা কলোনির যেখানে যতো ইঞ্জিন ছিলো একসঙ্গে হুইস্‌ল্ দিয়ে উঠল। শেডের ইঞ্জিনগুলো না হয় ঠিক সময়ে বাঁশী বাজালো, কিন্তু যেগুলো শান্টিং করছিল, সেগুলোও কি ঘড়ির কাঁটায় চোখ রেখেছিল ?

সবাই বললে, এ রসিকতা নিশ্চয়ই গুপ্ত সাহেবের। কারণ একমাত্র গুপ্ত সাহেবই সাহেব-কর্মী থেকে শুরু করে ছোকরাদের সঙ্গেও হাসিঠাট্টা করতেন, আর সর্বোপরি গুপ্ত সাহেবই একমাত্র সাহেব অর্থাৎ অফিসার যাঁর কথা ইঞ্জিনের ড্রাইভাররা মানতো। গুপ্ত সাহেব ছিলেন লোকোর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।

আর তাঁর রসিকতাটা উপভোগ করলো কলোনির ছেলেবুড়ো সকলেই।

তিনপটিয়া ক্রিশ্চানদের গির্জার পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা মেয়েদের ইস্কুল অবধি লাল ধুলো উড়িয়ে গোলবাজারের হট্টগোলে মিশে গেছে, সে রাস্তায় এলা আর বেলাকে আমরা প্রতিদিনই দেখতে পেতাম সকালে বিকেলে।

একরাশ বই বুকে চেপে দুই যমজ বোন ইস্কুলে যেত, ইস্কুল থেকে ফিরতো। বয়সে ওরা আমার চেয়ে কিছুটা বড় ছিল, তবু কেন জানি না, ওদের দেখলেই কেমন যেন হাসি পেতো, আর সেইজন্যই চেষ্টা করেও কোনোদিন এলাদি বা বেলাদি বলে ডাকতে পারি নি। সত্যি কথা বলতে কি নাম ধরে ডাকতেও সাহস হতো না ; কারণ, দু-জনের চেহারায় এত মিল ছিল যে এলাকে বেলা এবং বেলাকে এলা মনে হওয়াটাই ছিল স্বাভাবিক।

ইস্কুলের টিচাররাও নাকি প্রায়ই ভুল করতেন।

আমাদের বাংলোটা ছিল রাস্তার একপাশে, আর ঠিক তার বিপরীত দিকে ছিল ইস্কুলের দিদিমণিদের কোয়ার্টারের রেঞ্জ। দিদিমণিদের সঙ্গে কেউই বড় একটা মেলামেশা করতো

না। দেখে একটু অবাকই হতাম। সাইকেল রিকশা ভাড়া করে কতদিন মা, নিভামাসী, নিরুর মাকে বেড়াতে যেতে দেখেছি দূরে দূরে, অথচ ঘরের কাছেই আট দশজন দিদিমণি থাকা সত্ত্বেও ওঁদের বাড়িতে কেউই বেড়াতে যেতো না। কেমন যেন এড়িয়ে চলতো সবাই।

ওদের কাছে আসতো শুধু আমাদের ইস্কুলের ড্রয়িং মাস্টার মণিবাবু, জিমনাশিয়ামের কালীদা আর ট্রাফিক সেট্‌লমেণ্টের ওধার থেকে দু-একজন ছোকরা টি টি আই। আর যেতাম আমরা, অর্থাৎ ছোটরা।

এলা আর বেলা সন্ধের সময় ছোট দিদিমণির বাসায় পড়তে আসতো আর সে সময় লক্ষ্য করতাম, ওদের কাউকে কোনো কথা বলবার আগে ছোট দিদিমণি হাসতে হাসতে নাম জিজ্ঞেস করে নিতেন।

অন্য দিদিমণিরা কেউ হয়তো ডাকলেন, 'বেলা শুনে যাও', অমনি যাকে ডাকলেন সে হেসে এগিয়ে এসে বললে, 'আমি বেলা নই দিদিমণি, আমি এলা'।

নিভামাসীও একদিন এমনি ভুল করেছিলেন, আর এলা ভুল শুধরে দিতেই তিনি বলেছিলেন, তোমরা বাপু একজন সাদা কাপড় পোরো, আরেকজন রঙিন। আর নয় তো কপালে একটা ছাপ মেরে নাও, তা নইলে বিয়ের পর দেখবে মজা।

শুনে এলার কান লাল হয়ে উঠেছিল, আর নিভামাসীর মেয়ে অঞ্জলিদি হেসে লুটোপুটি। এলার অবশ্য কান লাল হয়ে ওঠারই বয়স সেটা, আর আমি ওদের চেয়ে বয়সে ছোট হলেও কিছু কিছু বুঝতে শিখেছি তখন। এলা বেলা দুই যমজ বোন কেন হঠাৎ ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পরতে শুরু করলো তাও জানতে বাকি থাকে নি।

সেইজনাই হয়তো রাস্তায় ঘাটে যখন ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো, নিভামাসীর ঠাট্টাটা মনে পড়তেই আমিও হেসে ফেলতাম আর সে হাসি দেখে কটমট করে আমার দিকে এমন ভাবে তাকাতো ওরা, যেন পারলে ভস্ম করে দেয়।

সত্যি, হাসি পাবারই কথা। শুধু যে চেহারায় মিল ছিল তাই নয়। গলার স্বর, চলনবলন, সব যেন হুবহু এক।

ওদের চটাবার জন্যে ছড়াও বেঁধেছিলাম আমরা—

এলা বেলা দুই বোন রেলায় চড়ে যায়।
শাঁখ বাজিয়ে বর এল গো, বলছে, চেনা দায়॥

সুর করে করে টেনে টেনে গাইতাম আমরা। তা শুনে অনুযোগ করতো ওরা ছোট দিদিমণির কাছে।

ছোট দিদিমণি অনুযোগ শুনে হাসতেন, আবার বকুনিও দিতেন আমাদের।

কিন্তু যেদিন নতুন গুড্‌স ক্লার্ক দ্বিজেনবাবু বদলি হয়ে এসে উঠলেন আমাদের পাড়ায়, আর আমরা নতুন একটা ছড়া বাঁধলাম, সেদিন, গান শুনে ছোট দিদিমণিও হেসে লুটোপুটি।

যেমন যমজ বোন এলা আর বেলা, তেমনি দ্বিজেনবাবুর দুই যমজ ছেলে ডাবু আর টাবু।

আমরা বলতাম, ডাবুদা আর টাবুদা। কিন্তু ও দুটো নাম আমরা একসঙ্গেই বলতাম, কারণ ওঁদের দু-জনের চেহারাতেও এমন মিল ছিল যে কে ডাবু আর কে টাবু তা বোঝা যেতো না।

ডাবুদা আর টাবুদা দু-জনে একই সঙ্গে কারখানায় চাকরিতে অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে ঢুকেছিল। আর চাকরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শুনলাম এলা আর বেলার সঙ্গে ওদের দু-জনের বিয়ের

কথা হচ্ছে।

দুই যমজ ভাই হবে বর, আর দুই যমজ বোন হবে কনে!

গুপ্ত সাহেবও শুনেছিলেন গুজব, তাই সাইকেল থেকে নেমে পড়ে দু-ভাইকে কাছে ডেকে বললেন, কি সাংঘাতিক কথা, দেখো বাপু সাবধান!

আর নিভামাসী একদিন উল বুনতে বুনতে হঠাৎ থেমে পড়ে দু-বোনকে বললেন, আর যাই করো, কেলেঙ্কারী কোরো না যেন।

দু-একজন অবশ্য বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। দ্বিজেনবাবুকে বললেন, এমন ভাবে যমজে যমজে বিয়ে দেয়া কি উচিত?

কিন্তু জন্ম মৃত্যু বিবাহ—অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাবে কে?

শেষ অবধি সত্যিই বিয়ে হয়ে গেল ওদের। আর গুপ্ত সাহেবই হয়তো কারসাজি করে সম্প্রদানের সময় সারা কলোনি কাঁপিয়ে যেখানে যত ইঞ্জিন ছিল সব কটার হুইস্‌ল এক সঙ্গে বাজিয়ে দিলেন।

বিয়ে তো হল। ফুলশয্যা?

এলা বেলার বাবা ছিলেন স্টেশন কমিটি অফিসের ক্লার্ক। তিন নম্বরের কোয়ার্টার্র পেয়েছিলেন তিনি। সন্ধে না হতে যে কোয়ার্টারের বাসিন্দাদের লণ্ঠন জ্বালাতে হতো, আর সকাল না হতেই গিয়ে দাঁড়াতে হতো রাস্তার কলে। ঘরও মাত্র দু-খানা, যার একখানা জিনিসপত্রের ঠাসাঠসিতে হয়ে থাকতো গুদাম ঘর। কাঠের জাফরি দিয়ে ঘেরা বারান্দাটা অবশ্য গরমের দিনে ব্যবহার করা যেতো। কিন্তু বিয়েটা হল একেবারে মাঘমাসের হাড়-কাঁপানো শীতে।

আমরা তখন সদ্য সদ্য দোতলা বাংলোটায় উঠে এসেছি। আর আমাদের বাংলোয় শুধু যে ইলেকট্রিক আলো বা কলের জলের অভাব ছিল না—তাই নয়, ঘরেব সংখ্যাও ছিল অনেক।

তাই এলা বেলার বাবা বিয়েটা অমাদের বাসাতেই দিতে চেয়েছিলেন। কেন জানি না, মা কিছুতেই মত দেয় নি।

অথচ দ্বিজেনবাবু যখন এসে বললেন যে, ফুলশয্যার জন্যে দু-খানা ঘর দিতে হবে একরাত্রির জন্যে, তখন মা আপত্তি করলো না!

আর সত্যিই তো, দ্বিজেনবাবু থাকতেন তিন নম্বর কোয়ার্টারে, ফুলশয্যার জন্যে দু-খানা ঘর পাবেন কোথায়? শেষ পর্যন্ত তাই সম্পূর্ণ দোতলাটাই ছেড়ে দেওয়া হল।

এরকম ব্যবস্থা অবশ্য এমন কিছু নতুন নয়। এ বাড়ির জামাই এলে পাশের কোয়ার্টারকে ঘর ধার দিতে হতো, পাশের কোয়ার্টারে ছেলের বৌ এলে ও-বাড়ির কর্তাকে শুতে হতো বাইরের বাগানে। আর যেবারে এ এস এম অধীরবাবুর মেয়ে-জামাই এবং ছেলে-ছেলের বৌ একসঙ্গে হাজির হল, সেবারে তো ভদ্রলোক রেল কোম্পানির চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে করতে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে গিয়ে রাত কাটিয়ে এলেন।

দোতলা বাংলোটায় এতদিন ছিলেন এক কাশ্মীরী ভদ্রলোক। আমরা আসার পর থেকেই তাই সমস্যা দূর হল।

কিন্তু ফুলশয্যা ব্যাপারটা যে কি, তখনও জানতাম না।

সদাশিব জ্যাঠা পণ্ডিত মানুষ, তাই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

সদাশিব জ্যাঠা বলেছিলেন, ফুলশয্যা নয় রে, ফুলসজ্জা। বিয়ের পর বর এবং কন্যা ফুলে সজ্জিত হবে এই হল সামাজিক রীতি।

শুনে বিশ্বাস হয় নি। তাই যদি হবে, তা হলে নিভামাসীর মেয়ে অঞ্জলিদি, আলোবৌ, এলা-বেলার বৌদি—সবাই আড়ি পাতবার জন্যে লুকিয়ে ছিলেনকেন? কেনই বা এত

হাসাহাসি, এত লুকোচুরি !

ওদের ফিসফিস কথাবার্তা শুনে বেশ বুঝতে পারলাম কোন একটা রসিকতার জন্যেই যেন সবাই একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করছে।

পাশাপাশি দু-খানা ঘর। ঘোমটার আড়ালে থাকলেও এলা বেলার মুখ দেখে বুঝলাম লজ্জায় মাথা তুলতে পারছে না ওরা। আর এলা বেলার বৌদি হাসতে হাসতে দু-জনকে নিজের নিজের ঘরে পৌঁছে দিলেন।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় বললেন, শুভদৃষ্টির সময় ভাল করে চিনে নিয়েছো তো ঠাকুরঝি ?

আমার মুখে এসে গিয়েছিল সেই ছড়াটা, নিজেই নিজের মুখে হাত চাপা দিলাম।

তারপর একটু পরেই কাঠের সিঁড়িটায় শব্দ হল।

টাবুদা এসে হাজির হল। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, জামায় এসেন্সের গন্ধ।

অঞ্জলিদি, আলোবৌ সকলে অমনি দুড়দাড় করে নেমে পালালো। আর এলা বেলার বৌদি যাবার সময় বলে গেলেন, শুভদৃষ্টির সময় তো খুব গিলছিলে ভাই, এবার নিজের নিজের চিনে নাও, আমরা চললাম।

নীচের ঘরে এসে হাসিঠাট্টা শুরু করলো ওরা। তারপর একসময় কাঠের সিঁড়িতে আওয়াজ হল আবার।

এলা-বেলার বৌদি বললেন, আর এক মহাপ্রভু এলেন বোধ হয়।

শুনে অঞ্জলিদি হেসে উঠলেন খিলখিল করে।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে অঞ্জলিদি বললেন, চলো এবার যাই।

পা টিপে টিপে সবাই ওপরে উঠে এল। আর পিছনে পিছনে আমি।

এসে দেখি বারান্দায় দেয়ালে ঠেস দিয়ে ডাবুদা আর টাবুদা, দু-জনে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। একটু পরেই বুঝতে পারলাম, ঘুম নয়, ঘুমের ভান।

নির্দোষ রসিকতাও যে কি ভয়ঙ্কর হতে পারে তখন তো বুঝতে পারি নি। বড়রা যখন এলা আর বেলার বিয়েতে অমন কাণ্ড করতে পারলো, তখন ঝিঝিপোকার বিয়েতে আমরাই বা রসিকতা করবো না কেন। কে জানতো এমন বিশ্রী ব্যাপার ঘটবে। সে দিনটিব কথা কোনোদিন কি ভুলতে পারবো ?

ঝিঝিপোকার বিয়ে তো ঠিক হয়ে গেল। টেঁপিকে একদিন দেখেও গেল বুড়ো। আর বিয়ের যোগাড়যন্তর করবার জন্যে বেশ কিছু টাকাও দিয়েছিল ঝিঝিপোকা। তারপর সেই বিয়ের দিন ! ছবিটা এখনও যেন চোখের সামনে ভাসে।

কনে সাজানো শেষ করে পান্না গম্ভীর হয়ে বললে ; মা টেঁপি, এসো তো ইদিকপানে, বরপক্ষের লোক একবারটি দেখতে চায়।

কনে ভয়ে ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে মাথা হেঁট করে এগিয়ে এল।

নিমাইদা সেদিকে তাকিয়ে রইলে স্থিরদৃষ্টিতে।—ও পান্নারাণী, ও বুড়োর সঙ্গে এমন সুন্দরীর বিয়ে দেবে ? আমার নিজেরই বিয়ে করতে ইচ্ছে হচ্ছে যে। বলেই হেসে ফেললেন নিমাইদা।

পান্নাও হেসে গড়িয়ে পড়লো কনের গায়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে কনের মুখ থেকে পরীর গলার স্বর বেরিয়ে এল, না নিমাইদা, ও কাজটি কোরো না, তা হলে পান্না কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলাবে।

—কেন রে ? নিমাইদা হেসে উঠল।

—জান না বুঝি ? পান্না পিতিজ্ঞে করেছে, নিমাইদা ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।

পান্না প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি।—না নিমাইদা, মিছে কথা।

—মিছে কথা ? মানুও জানে, ডাকবো মানুকে ? কেমন ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে বলছিল সেদিন, মা বলেছে আসছে বছর আমার বিয়ে দেবে। আমি কিন্তু নিমাইদা ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবো না। মেয়েলী পোশাকে সাজানো পরী হাস্তে হাস্তে বললে।

—বলেছি ? বলেছি আমি ? পান্নার চোখ ঠিক্‌রে রাগ ঝরে পড়ে। শেষে একটা রফা করে দিল নিমাইদা। কিন্তু কে জানতো যে পান্নার চাপা আক্রোশ এমন হঠাৎ ফেটে পড়বে।

বিয়ের মন্ত্র আওড়াচ্ছে পুরুত, ঝিঝিপোকার হাতের ওপর কনের হাত, চারিদিকে লোকে লোকারণ্য ; হঠাৎ পান্না ডেকে বসলো, এই পরী, শাড়ি পরেছিস কেন রে ? কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে কনে সেজেছিস কেন রে ?

পরীটাও এমন বোকা, বিয়ের পিঁড়িতে বসেই বলে বসলো, আমি কি পরী নাকি ? মিছে কথা, মিছে কথা বলছে ও, শোধ নেবার জন্যে। আমি তো টেঁপি, পরী নাকি আমি ?

আর যায় কোথা, হুলস্থূল ব্যাপার। চতুর্দিকে নিমন্ত্রিত সবাই হেসে উঠল হো-হো করে, আর ঝিঝিপোকা রাগে লজ্জায় উঠে দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বললে নিমাইদার উদ্দেশে, তারপর হন্‌হন্‌ করে বাড়ির পথ ধরলে।

অন্ধকার রাত, রাস্তার আলোগুলোও নিভে গেছে তখন। তবু লোক ছুটলো চারিদিকে, ঝিঝিপোকার রাগ থামাবার জন্যে। খুঁজে বের করার জন্যে। তাছাড়া, এত যে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন, বিয়ে ব্যর্থ হোক, কিন্তু ঝিঝিপোকা নিজে যদি দলে বসে না খায় তা হলে যে আনন্দটাই মাঠে মারা যাবে। ঝিঝিপোকার বাড়ি অবধি এলাম দু-চারজন, অপেক্ষা করলাম। কিন্তু কোথায় ঝিঝিপোকা ? কেউ কোথাও সে রাত্রে তাকে খুঁজে পেলাম না।

পাওয়া গেল পরের দিন সকালে। মাঝ পথের সুইমিং ট্যাঙ্কের জলে ভাসছে ঝিঝিপোকা।

খবর শুনে প্রথমটা চমকে উঠেছিলাম। বুকের ভেতর কেমন একটা মোচড় অনুভব করলাম।

আত্মহত্যা ? না অন্ধকারে পথ ভুল করে পড়ে গেছে ঝিঝিপোকা ? কেউ সঠিক বলতে পারলো না। খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শহর ভেঙে পড়লো সুইমিং ট্যাঙ্কের ধারে। আমরাও গিয়ে জড়ো হলাম ! চোখ ঠেলে জল এল। মনে হল, আমাদেরই দোষ, আমরাই খুন করেছি ঝিঝিপোকাকে।

দামী খাটে প্রচুর ফুল দিয়ে সাজানো হল ঝিঝিপোকাকে, নিয়ে যাওয়া হল শ্মশানে। কোনো শবযাত্রার পিছনে এমনভাবে শহর ভেঙে পড়ে নি কখনো। সবাই চুপচাপ, শোকে মুহ্যমান যেন সকলেই ; শান্ত নিঃশব্দ পায়ে শ্মশানে গিয়ে পৌঁছলাম সকলে। চিতায় তুলে দেয়া হল ঝিঝিপোকাকে। আশ্চর্য। এতদিন সকলেই যাকে অশান্তির মূল মনে করতাম, যাকে ভয় পেতাম, রাগাতাম, প্রতিদিন একটা না একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটিয়ে ছাড়তো যে, সমস্ত শহরটাই কি তাকে ভালবাসতো ?

কেউ তো 'ঝিঝিপোকা' বলে চিৎকার করে উঠল না, কেউ খুশি হল না তার মৃত্যুতে। কুপোকাৎ, কুপোকাৎ চিৎকার করে যার মৃত্যু কামনা করেছি, তার মৃত্যু এতই অসহ্য ? এ যেন আমাদের একজন, আপনজন, মারা গেছে, যেন প্রাণ হারিয়ে ফেলেছে শহরটা। সেই যে রূপকথার গল্প আছে, সাগরের তলায় ছোট একটা রূপোর কৌটোয় কালো ভ্রমর, যার মধ্যে রাক্ষসের জীবন লুকিয়ে, এও যেন তেমনি কোনো সত্যিকার রূপকথা। কালো ভোমরা নয়, সামান্য একটা ঝিঝিপোকা। ঝিঝিপোকার বুকের ভেতরেই যেন লুকিয়ে ছিল সারা শহরের প্রাণ।

বহুদিন আগে অন্য কার মৃত্যুতে শ্মশানবন্ধু হয়েছিলেন নিমাইদা, আর সেদিন ফেরবার আগে শ্মশানের দেওয়ালে কাঠকয়লা দিয়ে লিখেছিলেন, 'ঝিঝিপোকা কুপোকাৎ'। আবার সেই লেখাটার দিকে চোখ গেল আমার। তেমনি আছে, মুছে যায় নি এতটুকু। শুধু আরও-অনেকগুলো নাম লেখা হয়েছে দেয়ালের গায়ে। আর কোনো পরিবর্তন হয় নি।

জল নিয়ে এসে কাঠকয়লার দাগটা ঘষে ঘষে মুছে ফেললাম।

কিন্তু চোখে যতদিন জল থাকবে, মন থেকে ও-দাগ কি মুছে ফেলতে পারবো ?

৮

এলা আর বেলার বিয়ের গোলমাল মিটে গেল, নিজেদের কোয়ার্টারে ফিরে গেল ওরা, আর সেই সময়েই আলোবৌকে নিয়ে বেশ খানিকটা হৈ-চৈ হল একদিন।

মা-র চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল ভোরবেলাতেই। দোতলা থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। কিন্তু নীচের বারান্দাতেও কাউকে দেখলাম না। কাঠের জাফরি দিয়ে ঘেরা বারান্দার একটা দরজা ছিল লোহার পাত দিয়ে তৈরি। সেই দরজা খুললেই বেশ খানিকটা ফাঁকা উঠোন, সিমেন্টে বাঁধানো। তার পুব পাশে ছোট-খাট দু-খানা ঘর ছিল পাশাপাশি—রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর। পশ্চিম দিকে, বেশ খানিকটা দূরে ছিল পায়খানা আর চাকরের ঘর। আর মাঝখানে খোলা উঠোনে ছিল জলের কল।

তাই মেয়েদের স্নান করার জন্যে চাকরের ঘরটাকে করা হয়েছিল কলঘর, কলের পাইপ টেনে নিয়ে গিয়ে। আর বাংলোর বাইরের দিকে যেটা ছিল চাপরাসীর ঘর, সেটা দেওয়া হয়েছিল মঙ্গলকে।

বিহারী হিন্দুস্থানী হলেও অনেক দিন আমাদের বাড়িতে থেকে থেকে বেশ বাংলা বলতে শিখে গিয়েছিল মঙ্গল। বাবা কাবখানায় চাকরি করে দিয়েছিলেন ওর। কিন্তু থাকতো আমাদের চাপরাসীর ঘরটায়। ভোরবেলায় কারখানায় বেরিয়ে যেতো, দুপুরে খেতে আসতো, আর পাঁচটার ছুটির পর ফাইফরমাশ খাটতো। রবিবার বাজার করা থেকে বাড়ির সব কাজই করে দিত।

বেশ কিছুদিন ধরেই শুনছিলাম, একটা চাকর দরকার। মঙ্গল নাকি কারখানা থেকে ফিরে এসে ক্লান্ত থাকে, কাজ করতে পারে না। মা বলছিল, তার চেয়ে মাইনে দিয়ে একটা চাকর রাখো। মঙ্গলকে শুধু খাওয়া পরা দিয়ে রাখলেও খরচকে খরচ, অথচ কাজ পাওয়া যায় না।

তখন অবশ্য ঝি চাকরের মাইনে কমই ছিল। অবাঙালী ঠাকুর চাকরদের মাইনে ছিল তিন চার টাকা।

বাবাও রাজি হয়েছিলেন। চাকর রাখলে নাকি আমাকে আর টিফিনের সময় বাড়ি ফিরতে হবে না। ইস্কুলে টিফিন পৌঁছে দিয়ে আসবে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মঙ্গলকে কিছু বলতে পারছিলেন না বাবা। সেদিনের সেই ঘটনার পর কিন্তু দেখলাম, মঙ্গলের ওপর এত যে মায়াদয়া, এত ভালবাসতেন বাবা, সব এক মুহূর্তে যেন উবে গেল।

উঠোনের কলে মুখ ধুতে এলাম ঘুম-চোখে, আর আমাকে দেখে গলার স্বর নামালো মা। দেখলাম, এক পাশে মাথায় ঘোমটা দিয়ে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আলোবৌ।

কোনো কথা বলছে না, দাঁড়িয়ে আছে পুতুলের মতো।

মা-র কথা যেটুকু কানে এসেছিল, তারপর সেজদি আর অঞ্জলিদির ফিস্‌ফিস্—সব

মিলিয়ে কিছুটা বুঝতে পারলাম।

ছোটবেলার একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেল। সেদিন ভেবেছিলাম আলোবৌ একা থাকতে ভয় পায়। কিন্তু স্বামী স্ত্রী ছাড়া ওভাবে একসঙ্গে শুয়ে থাকা যে অন্যায়, পাপ হয়, সেটুকু বোঝবার মতো বয়স হয়েছে তখন। কেন পাপ হয়, কেন অন্যায়, কেনই বা ওরা সেদিন পাশাপাশি শুয়ে ছিল তা অবশ্য স্পষ্ট বুঝতে শিখি নি তখনও।

দেখলাম, মা রাগে কাঁপছে। আলোবৌকে বললেন, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও বাড়ি থেকে।

বাবা বাধা দিলেন—হরেনকে চিঠি লিখছি, সে আসুক, বৌকে নিয়ে যেতে চায় নিয়ে যাক, তাড়াতে চায় তাড়িয়ে দিক। আমার দায়িত্ব তাকে খবর দেয়া। তবে, মঙ্গল আজই বিদেয় হোক।

চিঠি লেখা নিশ্চয়ই হয়েছিল, কিন্তু এল না কেউ।

মা বললে, আমি জানতাম। হরেন গাঁজাগুলি খেয়ে কোথায় পড়ে আছে তার ঠিক কি। কিন্তু আলোবৌকে আর রাখা চলবে না, ও দেশে যেতে চায় যাক, আর নয় তো যেখানে খুশি গিয়ে মরুকগে।

দিনকয়েক পরে, আমাদের ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে আলোবৌ কাঁদলো খুব, তারপর কাপড়-চোপড়ের মোট বেঁধে চলে গেল লক্ষ্মীকে সঙ্গে নিয়ে।

যাবার সময় বলে গেল, মাঝে মাঝে এসে দেখা করতে দেবে তো দিদি?

—না। শক্ত হয়ে জবাব দিল মা।

আর আলোবৌ চলে যাবার পর দেখলাম, মা-র দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

যাবার সময় শেষবারের মতো আমার দিকে তাকিয়েছিল আলোবৌ আর লক্ষ্মী। চোখ ছলছল করে উঠেছিল আমারও।

সে-রাত্রে ঘুমোতে পারলাম না। ঘুমোতে চাইলাম না। চোখ বুজে পড়ে রইলাম।

ঠিক জানতাম, সব কাজ শেষ করে মা যখন আসবে, তখন নিশ্চয় আলোবৌকে নিয়ে কোনো কথা হবে বাবার সঙ্গে।

কিন্তু কাজ যেন আর শেষ হয় না। সপ্‌সপ্ শব্দ হচ্ছিল ঝাঁটার, কখনও বাসনের ঠুংঠাং। এঁটো বাসনকোসন রান্নাঘরে তুলে রেখে, বারান্দা ধুয়ে মা যখন এল তখন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে আমার।

হয়তো ঘুমিয়েও পড়েছিলাম।

হঠাৎ শুনলাম মা বলছে, দোষই বা দেবো কি আলোবৌয়ের।

বাবা বললেন, আমি সেই কথাই তো বলি! বিয়ে হল একটা মাতাল গেঁজেলের সঙ্গে। এক বছর যেতেই একটা মেয়ে হল, অথচ এক মুঠো ভাত পেতো না।

মা বললেন, শুধু কি তাই, লোকের বাড়িতে কাজ করে তবু হয়তো পেট ভরাতে পারতো। কিন্তু, তুমি তো দেখো নি, সেবারে যখন একমাস ছিলাম, মাতালটা কি মার মারতো মাঝরাতে ফিরে এসে! পাড়ার লোক ঘুমোতে পারতো না।

দূর! এ তো সব পুরোনো কথা। সব শুনেছি। কান পেতে ওসব শোনবার কোনো ঔৎসুক্যই রইলো না।

কিন্তু কোথায় গেল আলোবৌ?

সাইকেলে টো টো করে চতুর্দিকে খুঁজে বেড়ালাম দিনকয়েক। কোথাও খুঁজে পেলাম না।

এমনি ব্যর্থ খোঁজে দিন কাটিয়ে সেদিন ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসতেই মা বললে, তিমু শুনেছিস, তোর সেই সুধাদিকে পাওয়া গেছে।

—কে সুধাদি? প্রথমটা বুঝতে পারিনি।

মা বললে, সেই যে সাহেব বাংলোয় চিৎকার শুনেছিলি? দু-জন পাঞ্জাবী গুণ্ডাকেও

ধরেছে পুলিস।

—ও। বলে বই নিয়ে দোতলায় উঠে গেলাম।

সুধাদির খবর জানবার জন্যে যেন ঘুম হচ্ছে না আমার। কবে কতদিন আগে চিৎকার শুনেছিলাম, সে আমি ভুলেই গিয়েছিলাম একরকম।

কিন্তু আলোবৌ কোথায় গেল? ওকে যদি গুণ্ডারা ধরে নিয়ে যায়?

গুণ্ডা নয়, হঠাৎ একদিন ধরপাকড় শুরু করলো লাল পাগড়ি পুলিস। কেন কে জানে।

শুনলাম কারখানায় ধর্মঘট হবে।

—ধর্মঘট কি দাদু?

প্রশ্ন শুনে হেসেছিলেন দাদু।—সে কি রে। এখানে ধর্মঘট আনলো তোর বাবা, আর তুই জানিস না ধর্মঘট কি?

লজ্জায় মাথা নীচু করে বললাম, না তো।

দাদু তখন একে একে বললেন সব ব্যাপারটা।—কারখানার বাইরের চেহারাটাই তো দেখতে পাস তোরা, ভেতরটা দেখতে পাস না। রেল কোম্পানি লাখ লাখ টাকা লাভ করছে। কিন্তু কি করে করছে?

—কেন, টিকিট বিক্রি করে?

দাদু হেসে বলেছিলেন, অধর্ম করে। সেবার প্রথম যখন ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট হল কোলাঘাটে, আমিও গিয়েছিলাম রিলিফ ট্রেনে। এক-ট্রেন গুর্খা সিপাই, জনকয়েক ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের সঙ্গে আমাকেও যেতে হয়েছিল।

বললাম, হ্যাঁ, বাবার কাছেও শুনেছি সে গল্প। আর সেই অ্যাকসিডেন্ট নিয়ে হৈ-চৈ করেছিল বলেই তো সদাশিব জ্যাঠার চাকরি গিয়েছিল, তাই না?

—হ্যাঁ, সাক্ষি দিয়েছিলেন, নরবলির। দাদু বললেন। কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক থেকে নিজের মনেই যেন বললেন, নরবলিই তো, এও এক ধরনের নরবলি।

ছোটবেলা থেকে কতবার শুনেছি, ছেলে-ধরারা আসে ছোট ছেলেদের নিয়ে গিয়ে বলি দেবার জন্যে। নদীর ওপর পুল তৈরি করতে হলে একশো আটটা শিশুকে বলি না দিলে মা কালী সন্তুষ্ট হন না, পুলের বাঁধ তৈরি হয় আর ভেঙে যায়। তাই রেল কোম্পানির ঠিকাদাররা নাকি টাকা দেয়, প্রত্যেকটি শিশুর জন্যে চার টাকা। কাপালিকেরা সেই টাকার লোভে শহরে আসে, মন্ত্র পড়ে ছেলেদের ঘুম পাড়িয়ে ঝোলায় ভরে নিয়ে যায়, নদীর পারে বলি দিয়ে বাঁধ শক্ত করে।

বাবাকে তাই একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম সত্যি কিনা।

বাবা বলেছিলেন, আজকাল ওসব কুসংস্কার নেই ঠিকাদারদের। কিন্তু একসময় হতো, শুনেছি।

—হতো? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম, হতো অথচ লোকে কিছু বলতো না?

বাবা হেসে বলেছিলেন, ও তো লুকিয়ে লুকিয়ে দু-একটা ছোট ছেলেকে বলি দেয়া। রেল কোম্পানিই তো কত লোক বলি দিয়েছে, এখনও দিচ্ছে। সেবারে যখন কোলাঘাটে অ্যাকসিডেন্ট হল···

বলতে বলতে কথা শেষ না করেই বাবা জিজ্ঞেস করেছিলেন, প্যারীচরণ সরকারের নাম মনে আছে?

—হ্যাঁ, 'ফার্স্ট বুক' বই লিখেছিলেন, আমরা পড়েছি।

বাবা বললেন, সেই প্যারীচরণ সরকার ছিলেন এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক! সম্পাদকের চাকরি ছাড়তে হয়েছিল তাঁকে, এই ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট সম্বন্ধে কাগজে লিখেছিলেন বলেই। কত হাঙ্গামা হয়েছিল। ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ছিল কয়েকখানা বগি।

লোকে তখন যন্ত্রণায় চিৎকার করছে, কিছু লোক মারা গেলেও, অনেকে তখনও বেঁচে ছিল। কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে, যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। খবর পেয়ে রিলিফ ট্রেন গেল এক-গাড়ি গুর্খা সিপাই নিয়ে।

—তারপর ?

—তারপর কাছাকাছি গ্রাম থেকে যারা খবর পেয়ে এসেছিল তাদের তাড়িয়ে দিয়ে সমস্ত জায়গাটা ঘিরে ফেললো গুর্খা সিপাইরা। আর দু-একজন সাহেব আর ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীকে স্ট্রেচারে করে নিয়ে এসে ডাক্তার কম্পাউণ্ডাররা সেবা-শুশ্রূষা করলে।

—আর অন্য প্যাসেঞ্জাররা ? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম।

বাবা হাসলেন।—যারা আধমরা ছিল তাদেরও পিটিয়ে পিটিয়ে মারলে গুর্খা সিপাইরা। রেলের কর্মচারী যে পনেরো বিশজন গিয়েছিল তারা যা পেলো, ঘড়ি আংটি টাকা লুট করলে। লোকে চিৎকার করছে যন্ত্রণায়, কেউ 'জল জল' বলে গোঙাচ্ছে—সেই সময় কিনা তাদের পকেট হাতড়ে যা পেলো চুরি করলো কর্মচারীরা ; অথচ এ সবই করলো ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনিয়ার আর ট্রাফিক সুপারিন্টেডেন্টের চোখের সামনে।

—কিছু বললো না তারা ?

বাবা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন সে প্রশ্ন শুনে। বলেছিলেন, কি বলবে ? তাদের মুখও যে বন্ধ। তারা রিলিফ ট্রেন নিয়ে গেল, কিন্তু বড় সাহেব হুকুম দিল সব যাত্রীদের মাল-গাড়িতে ঠেসে নিয়ে গিয়ে নদীতে ফেলে দিতে। ট্রেনে যাত্রী ছিল পাঁচশো, ফিরে এলে আশী জন, রেল কোম্পানি বললে, মারা গেছে মাত্র দু-শো। সব কাগজে কাগজে লেখা হল, বাকি তিনশো লোক কোথায় গেল, প্রশ্ন করলো সকলে। তাছাড়া সব সাহেবের তো এক রা নয়। দু-একজন সাহেবযাত্রী চোখের সামনে যা দেখেছিল তা বললে, আর প্যারীচরণবাবু তাই লিখলেন এডুকেশন গেজেটে।

দাদুকে সে গল্প বললাম।

দাদু বললেন, এ রকম তো কতবার হয়েছে। সব মৃত আর আহত যাত্রীদের এক জায়গায় স্তূপীকৃত করে ট্রেনে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল কোলাঘাটে। যাতে কোনো চিহ্ন না থাকে। সদাশিববাবু নিজের চোখে দেখেছিলেন সে-দৃশ্য। আর লুকিয়ে পালিয়ে এসে হৈ-চৈ শুরু করেছিলেন বলেই ওঁর চাকরি গেল।

—কিন্তু এরকম কেন করে দাদু। সাহেবদের মনে কি এতটুকু মায়াদয়া নেই !

দাদু হেসে বলেছিলেন, সাহেবদের তবু দয়ামায়া আছে তিমু, নেই আমাদের দেশের লোকদের।

দেশের লোকদের !

নিমাইদার কাছেও এ কথাটা বহুবার শুনেছিলাম।

একদিন হিন্দুস্থানী মিস্ত্রী একজন এসে কেঁদে পড়েছিল বাবার কাছে। জামা খুলে দেখিয়েছিল বাবাকে। কাস্টিং ডিপার্টমেন্টের ফোরম্যান কর্ক সাহেব নাকি রেগে গিয়ে একটা জ্বলন্ত রড তুলে নিয়ে ছ্যাঁকা দিয়েছে তার পিঠে।

মিস্ত্রীটার পিঠে দগদগে ঘা দেখে শিউরে উঠেছিলাম সেদিন।

আরেকদিন একজন মুসলমান ফায়ারম্যান মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে এসে দেখিয়ে গিয়েছিল। কোন অফিসারের হুকুমে নাকি অন্য ফায়ারম্যানবা তাকে মেরেছে।

আর বিশনদয়াল ! বিশনদয়ালের সে কি কান্না ! বেচারীর বৌকে নাকি জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ওয়ার্কস ম্যানেজার।

এ-সব শুনে বাবা রেগে গিয়ে বলতেন, সাহস থাকে তো ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে খুন করবি, নয় তো খুন হবি। আমার কাছে এসে কি হবে ? আমার কথা শুনেছিস কোনদিন ?

—শুনবো হুজুর। কি করতে হবে বলুন।

বাবার কপালের শিরাটা ফুলে উঠতো রাগে আর ঘৃণায়। কথা বলতে পারতেন না।

তারপর একসময় বলতেন, আমরা একা একা কিছুই করতে পারবো না বিশনদয়াল। তোরা সব একজোট হলে তবেই হতে পারে। কারখানার সকলকে বলে বেড়া তোর কথা, বোঝা তাদের যে তোর মতোই তাদেরও এ-দশা হতে পারে।

হিন্দুস্থানী মিস্ত্রীটাকে বলেছিলেন, জামা গায়ে দিবি না, পিঠ খুলে কারখানায় যাবি। যাকে কাছে পাবি, বলবি কে তোর এমন হাল করেছে। আর বলবি তাদেরও একদিন এমন অবস্থা হবে, এখন থেকে একজোট না হলে।

এই একজোট হবার মন্ত্র বাবা কেন দিনের পর দিন সকলের কানে ঢালতেন তা বুঝতে পারলাম, যেদিন শুনলাম সমস্ত কারখানায় ধর্মঘট হবে।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন। অতীতকে ভুলতে সময় লাগে না তার।

বড় হয়ে স্বচক্ষে দেখা এই সব ঘটনার কথা যাকেই বলেছি, সে-ই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। যেন কত বড় একটা অবিশ্বাস্য কথা বলেছি।

৯

ধর্মঘট পিছিয়ে গেল একটা ঘটনায়।

ব্যাপারটা কি, বুঝতে সময় লেগেছিল সেদিন। মনে আছে অনেক রাত অবধি লোকজন যাতায়াত কবেছিল বাবার কাছে। ফিসফিস কাথাবার্তা। কেমন যেন আতঙ্কের বাতাস বয়ে গিয়েছিল সারা উপনগরের বুকে।

ভোরবেলাতেও কয়েকজন এল গেল। দু-এক কথা বলেই তাদের বিদেয় দিলেন বাবা। আর কারখানায় যাবার সময়ে বাবাকে কি একটা চিঠি দিয়ে গেল নিমাইদা, তাও লুকিয়ে।

কিছুই বুঝতে পারলাম না। অথচ ইস্কুলে যাবার সময় দেখলাম সমস্ত শহর যেন লালে লাল। লাল পাগড়ি পুলিস প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে। আর মাঝে মাঝে টহল দিচ্ছিল বন্দুকধারী গুর্খা সৈন্য। রাস্তায় লোকজন খুবই কম।

ইস্কুলে পৌঁছেও দেখলাম, কেমন একটা চুপচাপ ভাব।

সিক্সথ্ মাস্টার আমাদের ক্লাস মাস্টার ছিলেন, নাম ডাকতেন তিনিই।

নাম ডাকার পরেই তিনি ছুটি দিয়ে দিলেন।—তোমরা সব বাড়ি চলে যাও। রাস্তায় খেলা করো না যেন, সব বাড়িতে থেকো।

—কেন স্যার?

প্রশ্ন শুনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করেলন সিক্সথ্ মাস্টার। তারপর ক্লাসঘরের দরজা অবধি গিয়ে চারপাশ দেখে এসে চাপা গলায় বললেন, আমাদের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে কাল গুলি করে মেরেছে স্বদেশীরা। আর—

অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললেন, আমাদের রাণাবাবুকেও ধরে নিয়ে গেছে পুলিস।

রাণা মাস্টার? স্বদেশীর দলে ছিল রাণা মাস্টার? আমরা সবাই বিস্মিত হলাম। বিস্মিত হবারই কথা। স্বদেশী দলের নাম শুনলেই কেমন একটা রোমাঞ্চ জাগতো আমাদের মনে। তাদের সম্বন্ধে কত গল্প যে শুনতাম—বাবার কাছে, নিমাইদার কাছে, নিরুর দাদার কাছে। কল্পনার চোখে অপরূপ কত ছবি আঁকা হয়ে গিয়েছিল। রাজপুত্রের মতো চেহারা,

বিদ্যাসাগরের মতো বিদ্বান, কুমারী *ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের মতো সেবাপরায়ণ, রবিনহুডের* মতো দুঃসাহসী।

আর সেই স্বদেশী দলে ধরা পড়েছে কিনা রাণা মাস্টার ? ছাত্রদের ওপর যে অমানুষিক অত্যাচার করতো, সামান্য টুঁ শব্দ করলে হাঁটুতে ডাস্টার ঠুক্‌তো, অনবরত পান চিবোনোর জন্যে একটা কথাও যার বোঝা যেতো না। প্রথম যেদিন ভর্তি হতে আসি, সেদিন যে আলপিন দেখিয়ে ভয় দেখিয়েছিল, গোলমাল করলে আঙুলে ফুটিয়ে দেবো বলে, সেই রাণা মাস্টার স্বদেশী ?

এত রাগ, এত ঘৃণা—মুহূর্তে উবে গেল সব। রাণা মাস্টার রাতারাতি আমাদের কাছে রাণা প্রতাপের মতো বীর হয়ে উঠল।

ক্রমে অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে না উঠতে আবার গোলমাল।

মাসখানেক পরে শনিচারীর মাঠে একটা বিরাট মিটিং হল, আর উঁচু একটা জায়গা থেকে এক ঘণ্টা ধরে বক্তৃতা দিয়ে গিরিসাহেব হাত তুলে ইংরেজিতে বললেন, রেল কোম্পানি আমাদের কথা না শুনলে আমরা যারা মানুষ, ধর্মঘট করবো। আমাদের মধ্যে যারা জানোয়ার, তারাই কোম্পানির সাহেবদের খুশি করবার জন্যে কাজে যোগ দেবে।

একজন ঠিক তাঁর মতোই ভাবভঙ্গি করে হিন্দি করে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার লোক হাত তুলে চিৎকার করলো, আদমি হামলোগ—জানবার নাহি।

তারপর গিরিসাহেবকে কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়েছিল কয়েকজন লোক, আর সে কি উল্লাস!

সেদিনও এমনি রাণা মাস্টারের মতো বীর হয়ে উঠেছিলেন বাবা, শহরের প্রত্যেকটি লোকের কাছে। আর দিন দুই পরেই শুনলাম বাবার চাকরি গেছে।

তিন চারজন সাহেব—সি এম ই, ডি সি এ, গির্জার বড় পাদ্রী এবং সেই সুবাদে ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট রেভারেণ্ড ব্রাউন বার বার এসে দেখা করলো, বাবাকে নাকি বোঝালো যে ক্ষমা চাইলে, ধর্মঘটে যোগ না দিলে, চাকরিও থাকবে, উন্নতিও হবে।

এমন কি পুলিসের ভয়ও দেখালো তারা। অথচ নিজেরা মারধোরের ভয়ে পুলিস সঙ্গে নিয়ে এসে দেখা করে গেল।

মা কান্নাকাটি করলো।

আর বাবা হাসতে হাসতে বললেন, চাকরি যায়নি আমার, যেতে পারে না। ধর্মঘটে আমরাই জিতবো, আর চাকরিও থাকবে সকলের।

শুনে মোটেই সান্ত্বনা পেলো না মা।—জিতলেও তোমার কি লাভ ? মাইনে বাড়বে তো কুলিমজুরদের।

বাবা শুধু হেসেছিলেন, উত্তর দেননি।

ঠিক দাদু যেমন হেসেছিলেন আমার প্রশ্ন শুনে—কেন পারবে না ওরা সাহেবদের সঙ্গে। ওদের হাতে যত শক্তিই থাক, সব লোক একজোট হলে তাদের শক্তিকে কেউ হার মানাতে পারে ? একতা হল মত্ত হস্তীর মতো শক্তিশালী।

মত্ত হস্তীর সঙ্গে রেল কোম্পানির নয়, রেলগাড়ির যুদ্ধের গল্প বলেছিলেন দাদু। স্টেশন প্লাটফর্ম থেকে বের হবার জন্যে মাটির নীচে দিয়ে যে আণ্ডারওয়ে ছিল সেই সুড়ঙ্গটার নীচেই ছিল হাতির মাথাটা। শুঁড় তুলে যেন রুখে দাঁড়িয়েছে এক পাগলা হাতি।

যতবার স্টেশনে গেছি ঐ শুঁড় তোলা মাথাটা দেখলেই গল্পটা মনে পড়ে যেতো।

তখনও নাকি অতিকায় চেহারার এম ক্লাস ইঞ্জিনগুলো আসেনি। চতুর্দিকে বনজঙ্গল, পঁচিশ তিরিশ মাইল দূরে দূরে স্টেশন।

অমাবস্যার অন্ধকারে হেড লাইট জ্বালিয়ে চলেছে প্যাসেঞ্জার ট্রেন, আর সেই হেড লাইটের আলো দেখে, ইঞ্জিনের শব্দ শুনে হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছিল একটি বুনো হাতি। ট্রেন যত কাছে আসে হাতিটাও শুঁড় তুলে ততই ছুটে যায়।

ড্রাইভার ফায়ারম্যান সকলেই সে দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেল। একটা বুনো হাতি রেল লাইন বরাবর ছুটে আসছে ইঞ্জিন লক্ষ্য করে। কি করবে, কি করা উচিত, কিছুই ঠিক করতে পারে না ড্রাইভার। বেশ বুঝতে পারলো ট্রেন থামিয়ে দিলে তাদের আস্ত রাখবে না হাতিটা, শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় দেবে। অথচ ইঞ্জিন না থামালে বুনো হাতির দাপাদাপিতে সমস্ত ট্রেনটাই লাইন থেকে নীচের জল-ডোবা জমিতে গড়িয়ে পড়বে।

মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য ঠিক করে নিল ড্রাইভার। গাড়ির স্পীড খুব কমিয়ে দিয়ে ফায়ারম্যান দু-জনকে বললে, পিছনের কয়লার স্তূপটার উপর দিয়ে গিয়ে যে-কোন উপায়ে পিছনের গাড়ির বাম্পারে বাম্পারে যেখানে জোড়া লাগানো আছে সেটা খুলে দিতে। প্রাণপণ চেষ্টায় ফায়ারম্যান দু-জন সেটা খুলে দিল, অমনি ফুল স্পীডে ইঞ্জিন চালিয়ে দিল ড্রাইভার। ইঞ্জিনটা হুড়মুড় করে এসে পড়লো হাতিটার ওপর। লাইন থেকে টাল খেয়ে পড়ে গেল ইঞ্জিনটা। ড্রাইভার আহত হল, আর রক্তাক্ত দেহে গোঙাতে গোঙাতে শুয়ে পড়লো হাতিটা।

কিন্তু পিছনের কামরাগুলো বেঁচে গেল, দুর্ঘটনা ঘটলো না। ধীরে ধীরে গড়িয়ে এসে থেমে গেল সেগুলো।

ড্রাইভারের একটা পা কেটে বাদ দিতে হল তার জন্যে।

দাদু বলছিলেন পা কাটা গেল বলে, আর উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে একশো কুড়ি টাকা পুরস্কার পেয়েছিল সে কোম্পানির কাছ থেকে।

—মাত্র ? নিরু বিস্মিত হয়ে বলেছিল।

—হ্যাঁ। দাদু হেসেছিলেন।—মাত্র। তখন ফায়াবম্যান মাইনে পেতো সাত টাকা আর ড্রাইভার মাইনে পেতো বারো টাকা।

—মাসে ?

—হ্যাঁ মাসে। আর আমি ছিলাম ডুবাশ—তর্জমাদার, মাইনে বেড়ে বেড়ে তখন বাইশ টাকা হয়েছে। সে কি আজকের কথা, তখন এক একজন সাহেবের ষাট সত্তরজন চাকর থাকতো।

আশ্চর্য হয়েছিলাম বইকি। ষাট সত্তরজন চাকর ? এক একজন সাহেবের ?

দাদু হেসে বলেছিলেন, তখন সাহেবরা ছিল এক একটি ক্ষুদে নবাব, আর কোলম্যান সাহেব তো ধুতি চাদর পরতো আমাদের মতোই। বামুনের মেয়ে বিয়ে করেছিল। চোখের সামনে কত পরিবর্তন যে দেখলাম। আমি নিজেই তো বদলে গেছি একেবারে। আর এই কলোনিটা ? সাহেবপাড়ায় তখন মাত্র বারোটা বাংলো ছিল, আব গোলবাজার বলতে শুধু এক নম্বরগুলো।

ঐ এক নম্বরের কোয়ার্টারেই খুঁজে পেলাম আলোবৌকে।

হঠাৎ সাইকেল ঘুরিয়ে নিলাম। আলোবৌ না ? দেওয়ালে ঘুঁটে দিচ্ছে একমনে।

আমাদের পল্লী থেকে সোজা পশ্চিমে এসে তিনপটিয়াদের গির্জা, গির্জার পাশ দিয়ে উত্তরে বাঁক নিলেই শহরের সবচেয়ে নোংরা পল্লী। কুলিদের বস্তি।

সরু সরু অসংখ্য রাস্তা আর দু-দিকে তার এক নম্বর কোয়ার্টারের সারি। এক এক সারিতে বিশ পঁচিশটা করে ঘর। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন এক সারি পিপে গায়ে গা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পিপের মতই গোল গোল ছাদ। আর কোয়ার্টারের সামনের দিকে

ঘেরা উঠোন। আলকাতরা মাখানো চিক কিংবা বাঁশ আর চট দিয়ে ঘিরে আরেকখানা করে ঘর তৈরি করে নিয়েছে সকলে। দু-দশটা কোয়ার্টারের মাঝখানেএক'টা করে বারোয়ারী পায়খানার সারি। ভোর বেলায় সে এক দৃশ্য। একদিকে মেয়েরা, অন্যদিকে পুরুষ। ভারতবর্ষের ছত্রিশ জাতের লোক লোটা কিংবা মগ হাতে ঘন্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে আছে, পুজোর সময় স্টেশনের টিকিট-ঘরে যেমন ভিড় হয় তেমনি।

আর বাড়ির কোনো কাজের জন্য যে-সব কুলিদের ডাকতে হতো তাদের দেখা পাওয়ার একমাত্র সময় ছিল ঐ রবিবারের ভোরবেলা। অন্যান্য দিনে ভোর না হতেই কারখানায় বেরিয়ে যেতো সব ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে। রাত্তিরে যখন মদ খেয়ে মাতলামি করতে করতে ফিরতো তখন ও-পাড়া দিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য।

বাঙালী অবশ্য খুব কমই ছিল ও-পাড়ায়। তাই হঠাৎ বাঙালীদের মতো শাড়ি পরা একজনকে দেয়ালে ঘুঁটে দিতে দেখেই সাইকেল ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে এলাম।

হ্যাঁ, আলোবৌ।

একেবারে পিছনে গিয়ে ক্রিং-ক্রিং করতে আলোবৌ চমকে ফিরে তাকালো। তারপর এক মুখ হেসে বললে কে রে, তিমু ? কি খবর ? ঘরে আয়, ঘরে আয়। বলে ঘরে নিয়ে গেল আমাকে।

দেখে কষ্ট হল। এমন সুন্দর রূপ আলোবৌয়ের, ফরসা ধবধপে রঙ, চমৎকার স্বাস্থ্য, আর দুর্গা প্রতিমার মতো মুখ। অথচ ঘরটা এত নোংরা, চতুর্দিকে বাক্স বিছানা, হাত-পা ছড়িয়ে বসবার উপায়ও নেই।

বললাম, লক্ষ্মী কোথায় আলোবৌ ?

—লক্ষ্মী ? একটু যেন অস্বস্তি বোধ করলো আলোবৌ, তারপর খানিক চুপ করে থেকে বললে, পেটে খেতে হবে তো তিমু, তাই ওভারসিয়ারবাবুর বাড়িতে কাজ করে লক্ষ্মী।

—ঐটুকু মেয়ে কাজ করে ? মাইনে পায় ? আর তুমি ?

শুনে হাসল আলোবৌ।—ঘুঁটে বিক্রি করে কিছু হয়, দু-পয়সা শ। তোমাদের দরকার থাকলে বোলো তিমু। আমার ছোঁয়া খেতেই নয় তোমার মায়ের যত আপত্তি, আমার ছোঁয়া ঘুঁটে কিনলে দোষ হবে না।

বেশ বুঝতে পারলাম মা-র বিরুদ্ধে যেন অনেক অভিযোগ জড়ো হয়ে আছে আলোবৌয়ের মনে।

বললাম, সত্যি আলোবৌ তুমি চলে এলে, এত দুঃখ হয়। কিন্তু মা তোমাকে কেন তাড়িয়ে দিল আলোবৌ ?

—আমি যে মঙ্গলকে বিয়ে করেছি, তাই। আচ্ছা তিমু, পুরুষমানুষ যখন মদ গাঁজা খায়, পাঁচটা মেয়েমানুষের বাড়ি যায়, এমনকি ভদ্দরলোকরাও যখন তিন চারটে বিয়ে করে, তখন তো কেউ দোষ দেয় না!

বললাম, বাঃ রে, বেটাছেলেরা তো আর দেবতা নয়, কিন্তু মেয়েরা যে দেবী। ভগবান কি যা খুশি করতে পারে ? তারা শুধু পুণ্যি করে।

শুনে হেসে ফেললো আলোবৌ। বললে ভগবান তো ছিলাম, মানুষ হয়ে দেখ্‌ছি অনেক বেশি সুখ, অনেক শান্তি।

কথাটা সেদিন বুঝতে পারি নি ভাল করে। আর বুঝতে পারিনি মঙ্গলকে বিয়ে করার জন্যে আলোবৌকে কেন তাড়িয়ে দিল মা। কিন্তু আলোবৌ তো আগেই একবার বিয়ে করেছিল, তা না হলে লক্ষ্মী হল কি করে ? হিন্দু মেয়েদের কি দু-বার বিয়ে হয় নাকি ? হয় না। তাই বোধ হয় আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হল তাকে, কিংবা কে জানে, হয়তো মঙ্গল হিন্দুস্থানী বলেই—অন্য জাত যে।

সদাশিব জ্যাঠা জাত মানতেন না। বলতেন, ভগবান-টগবান মিথ্যে কথা। আগেকার দিনের রাজরাজড়া আর তাদের ধুরন্ধর মন্ত্রীরা জাত বানিয়েছিল নিজেদের সুবিধের জন্য। যারা একদিন খুব উঁচু জাত ছিল সময়ের ফেরে পড়ে আজ তারাই হয়ে গেছে নীচু জাত, আর যারা ন্যায় অন্যায় মানে না, একটা সংস্কৃত শ্লোকের মানে বলতে পারে না, অ্যাং-ব্যাং বলে প্রতিমার দিকে শুধু ফুল ছুঁড়তে পারে, তারাই কিনা বামুন। অতীতে যারা বর্ণাশ্রম মানে নি, মানুষকে মানুষ বলেই ধরেছে, তারা আজ নিম্নবর্ণ। একদিন দেখবি এই নিম্নবর্ণরাই পৃথিবী জয় করবে।

আমরা কিন্তু এর এক বর্ণও বুঝতে পারতাম না। শুধু এইটুকুই বুঝতাম, আমরা যাকে ছোট বলি, সদাশিব জ্যাঠা তাদেরই বড় বলেন।

সদাশিব জ্যাঠার কাছ থেকে শুনে এসে দাদুকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিপর্যস্ত করে তুলতাম। আর দাদু সহাস্য মুখে বলতেন, আমরা দু-পাতা ইংরেজিই পড়েছি, কতটুকু জ্ঞানই বা আছে আমাদের।

—সদাশিব জ্যাঠা তোমার চেয়েও বেশি জানে দাদু?

দাদু হাসতেন।—কি রকম স্মরণশক্তি ওঁর, জানো? সেবার যখন কোলাঘাটে ট্রেন অ্যাকসিডেণ্ট হল, সামান্য আহত হয়ে পড়ে ছিলেন উনি। আর ওঁর কাছে দাঁড়িয়ে সি এম ই সাহেব, ট্রাফিক সুপারিণ্টেন্ডেন্ট আর চিফ মেডিক্যাল অফিসার ইংরেজিতে কথাবার্তা বলেছিল, যুক্তি করেছিল কি করে মৃত অর্ধমৃত সকলকে নদীতে ফেলে দেয়া যায় বা পুড়িয়ে ফেলা যায়।

—তারপর?

—সদাশিববাবু ইংরেজি জানতেন না এক বর্ণ, কিন্তু যা যা শুনেছিলেন হুবহু তাই বললেন, ইংরেজিতে, ঠিক সাহেবদের মতো উচ্চারণ করে। আর তদন্তের সময় ঐ সাক্ষি দেয়ার পরই চাকরি গেল ওঁর।

চাকরি যাওয়াটা যেন মস্ত বড় বীরত্বের কাজ—ধারণা হয়েছিল আমার। কিন্তু সত্যিই বাবার চাকরি গেল না। ধর্মঘটে জিতে গেল লেবার ইউনিয়ন, আর অন্য যাদের চাকরি গিয়েছিল তাদের সঙ্গে বাবাও চাকরি ফিরে পেলেন।

শুনলাম, লেবার ইউনিয়নের শক্তি দেখে বিস্মিত হয়েছে সারা ভারত। বড় বড় রাজনৈতিক নেতারাও নাকি খোঁজ খবর নিচ্ছে।

বাবা শুধু দুঃখ করে একবার বলেছিলেন, দু-দিন আগে রেজিস্ট্রি করালে আমাদের ইউনিয়নটাই হতো ভারতবর্ষের প্রথম লেবার ইউনিয়ন।

কোনো একটা জ্ঞানবিজ্ঞানের বইয়ে দেখেছিলাম, আমাদের ঐ স্টেশন-প্লাটফর্ম নাকি দৈর্ঘ্যে ভারতবর্ষে দ্বিতীয়। তার জন্য মনে মনে গর্ব অনুভব করতাম আমরা। কিন্তু লেবার ইউনিয়ন স্থাপনেও দ্বিতীয় হয়ে যাওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলাম আমি।

কোনো ক্ষেত্রেই কি আমরা প্রথম হতে পারবো না?

আর কিছুতেই না হোক পরীক্ষায় প্রথম হতেই হবে, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

সেকেণ্ড মাস্টার আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। তিনি বলেছিলেন, ফার্স্ট হবার সহজ রাস্তা হল ডিকশনারি মুখস্থ করা।

আমরা অনেকেই তখন ডিকশনারি মুখস্থ করতাম। কিন্তু বাবাকে লুকিয়ে লুকিয়ে। ডিকশনারি মুখস্থ করতে দেখলেই বাবা চটে যেতেন।

তাই ছোট ডিকশনারিটা নিয়ে লাইনের ধারে গিয়ে ব্যালাস্ট ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করতাম।

ব্যালাস্ট ট্রেনটা আসলে ছিল কুলিদের গাড়ি। কোনো টিকিট লাগতো না। কারখানা

থেকে বেরিয়ে সোজা পুব মুখে পুরোনো বাজার পর্যন্ত যেতো সেটা, আবার ফিরে এসে ঢুকতো কারখানায়। ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে লাইনের ধারে ধারে এসে জমা হতো কুলিরা। ট্রেনটা থেমে থেমে তুলে নিত তাদের, পৌঁছে দিত কারখানায়।

কিন্তু বিকেলে ছুটির সময় কারখানা থেকে বোঝাই হয়ে বেরিয়ে আসতো, পুরোনো বাজারে যখন পৌঁছতো তখন একেবারে ফাঁকা। সেই সময় গাড়িতে উঠে পড়তাম আমরা। ডিকশনারি খুলে বসতাম।

তারপর কারখানায় ঢোকার আগে ট্রেনটা যেই হুইসল্ বাজিয়ে এক মিনিট দাঁড়াত অমনি টুপ করে নেমে পড়তাম আমরা।

এমনি ভাবে নামতে গিয়েই কাটা পড়েছিল মানু।

১০

গোলবাজার বলতে শুধু বাজার নয়। সমস্ত পাড়াটাকেই বলতো গোলবাজার।

স্টেশনের ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে যতদূর চোখ যায়, পুব থেকে পশ্চিমে চলে গেছে রেলের লাইন। একজোড়া নয়, অসংখ্য। এক সঙ্গে তিরিশ চল্লিশটা ট্রেন পাশাপাশি যাতায়াত করতে পারত ওভারব্রিজের তলা দিয়ে। দোতলা স্টেশন বিল্ডিংটা যেন এক বিরাট বনস্পতি, চতুর্দিকে রেল লাইনের অসংখ্য শিকড় ছড়িয়ে হা-পিত্যেশ করছে রসদের জন্যে। অতো বড়ো জংশনও নাকি আর নেই বাংলাদেশে, শুনতাম টি টি সি গুপ্তবাবুর কাছে। 'গার্ড সাহেব' বলতাম যাঁকে তিনিও এই কথায় সায় দিতেন।

তিরিশ কি চল্লিশ জোড়া রেল লাইন, কোনোটায় মেল ট্রেন ছাড়ল, কোনোটায় প্যাসেঞ্জার, আবার কোনোটায় এক্সপ্রেস নয়তো লোকাল এসে দাঁড়াল। আর ট্রাফিক সেট্‌লমেন্টের দিকটায় ছিল মালগুদাম, মালগাড়ির ভিড় লেগে থাকতো সেদিকটায় সদাসর্বদা। বাকি লাইনগুলোও বিশ্রাম পেতো না, শান্টিং লেগেই থাকতো।

স্টেশন থেকে সেই এক ঝাঁক রেললাইন সোজা পশ্চিমে চলে গেছে লেভেল ক্রসিং, ওয়েস্ট কেবিন, লোকো শেড পার হয়ে কারখানা অবধি। তারপর হঠাৎ বাঁক নিয়েছে বাঁ দিকে—হিজলীর দিকে। সেখান থেকে কোনোটা গেছে পুরী, ওয়াল্টেয়ার, মাদ্রাজ; কোনোটা টাটা, বিলাসপুর, বোম্বাই; আবার কোনোটা আসানসোল, আর নয়তো বাঁকুড়ার দিকে।

এক ঝাঁক রেললাইনই যেন দু-ভাগ করে দিয়েছিল শহরটাকে। উত্তর আর দক্ষিণ। দক্ষিণে সাহেবপাড়া, উত্তরে গোলবাজার। গোলবাজারটা আসলে ছিল হিন্দুদের বসতি। কেন জানি না, একজন মুসলমানও কোয়ার্টার পায়নি গোলবাজারে। কিংবা ওরা নিজেরাই বোধ হয় আসতে চাইতো না। গোলবাজারের উত্তরের বাড়িগুলোর শেষে প্রকাণ্ড একটা মাঠ, চারপাশে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা রিক্রিয়েশন ক্লাব, প্রতি বছর বড়দিনে যেখানে স্পোর্টস হতো। তারও উত্তরে ছিল, মুলসমান পাড়া।

ও-পাড়ায় মহরমের সময় প্রায়ই বেড়াতে যেতাম। সে-সময় একটা আকর্ষণ আমাদের সকলকে টেনে আনতো।

বাঘের লড়াই। বাঘ-পাঞ্জার।

দু-দিক থেকে দুটো দল আসতো মহরমের বাজনা বাজাতে বাজাতে। সামনে বাজনদার জনকয়েক, তারপর জনকয়েক লোক পাশাপাশি দুটো বাঁশ বয়ে আনতো, আব তার ওপর

নানা অঙ্গভঙ্গি করে নাচতো যে, তাকে ঠিক বাঘের মতোই দেখাতো। বাঘের মতো মুখোশ পরতো সে, সারা গায়ে হলদে রঙ—হলদের ওপর ডোরা কাটা।

অন্যদিক থেকেও নানা অঙ্গ-ভঙ্গি করতে করতে আরেকটা বাঘ আসতো। তারপর দুপক্ষই মুখোমুখি বাঁশের ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুরু করতো পাঞ্জা লড়া।

পাঞ্জা লড়ায় ইদ্রিস ছিল সবচেয়ে বিখ্যাত। থাকতো আমাদের বাসার দক্ষিণের মাঠ পেরিয়ে পোর্টারিখুলিতে। কি চমৎকার ঘুড়ি বানাতো ইদ্রিস—আর বৌটা কয়লা চুরি করে এনে বিক্রি করতো। মহরমের সময় বাঘ নাচ দেখাতে আসতো ইদ্রিস আমাদের পাড়াতেও। বকশিশ নিয়ে যেতো বাবার কাছ থেকে। বকশিশ না দিলে নড়তো না।

ছোটবেলাকার একটা ঘটনা মনে পড়ে।

ইদ্রিসের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার জন্যে সেবার নতুন 'বাঘ' এসেছিল আগ্রা থেকে।

আমাদের ক্লাসের মুস্তাফা বলেছিল, এবার দেখিস ইদ্রিস হেরে যাবে। ইদ্রিস হেরে যাবে? বাইরের লোক এসে হারিয়ে দিয়ে যাবে আমাদের ইদ্রিসকে? ইদ্রিস তো আমাদেরই। আমাদের শহরের লোক অন্য শহরের কাছে ছোট হয়ে যাবে?

—কক্ষনো না। মুস্তাফাকে বলেছিলাম, দেখিস ইদ্রিস কক্ষনো হারবে না।

মুস্তাফা একটা আনি বের করে বলেছিল, এক আনা বাজি।

বাজি রেখে আমিই জিতেছিলাম। কিন্তু মুস্তাফা যখন আনিটা দিয়ে দিল, হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম। লজ্জায়, আত্মধিক্কারে মাটিতে মিশে গেলাম। বললাম, না, না ফেরত নে তুই।

বাজি! বাজি রাখা মানে তো জুয়া খেলা। ছি ছি জুয়া খেললাম আমি।

আনিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে চলে এসেছিলাম। এসে, মা-র বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলাম, মা আর কখনো করবো না, কখনো না। তুমি বলো আমার পাপ হবে না।

—পাপ? কেন কি করেছিস তিমু?

বললাম।

শুনে মা হেসে উঠল। আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে কপালে চুমু খেয়ে বললে, আর কখনো বাজি রাখিস না, কেমন?

—বলো, পাপ হবে না আমার?

—পাপ? মা হেসে উঠল। বললে, আমি বললেই পাপ হবে না, কে বললে তোকে?

—বাঃ রে, তুমি তো মা। মা তো ভগবানের চেয়েও বড়, তুমি বললেই হবে।

মা আরো জড়িয়ে ধরে বললে, বেশ, বলছি আমি, তোর কোনো পাপ হবে না।

খুশিতে হাসতে হাসতে চোখ তুলে তাকালাম। দেখলাম মা-র দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

দু-হাতে ঝাঁকানি দিয়ে বললাম, মা কাঁদছ, কাঁদছ তুমি?

মা হাসল, উত্তর দিল না কথার।

শুধু বললে, ওদের সঙ্গে মেলামেশা করিস না তিমু, ওরা সব বদ ছেলে।

তবু মুস্তাফার সঙ্গে না মিশে থাকতে পারতাম না। কেন জানি না, মুস্তাফাকে আমার ভাল লাগতো।

ওর কাছেই শুনতাম বাব্বা সাহেবের গল্প।

মুস্তাফাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বাব্বা সাহেবের বাড়িতে। মসজিদের পাশেই বড় দোতলা বাড়িটা ছিল বাব্বা সাহেবের, আসল নাম ছিলো যাঁর আবিদ হোসেন।

চিফ বোটানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, অর্থাৎ সি এম ই ছিলেন শহরের একচ্ছত্র অধিপতি।

তাঁকে সবাই শুধু ভয় পেতো।

কিন্তু ভয় আর ভক্তি দু-ই একজনের জন্যে। আবিদ হোসেন। লোকে বলতো, আবিদ হোসেন এত বড়লোক যে, সমস্ত রেল কোম্পানিটাও নাকি কিনে নিতে পারে।

তখনকার দিনে মাত্র তিন চারজন অফিসারের মোটর গাড়ি ছিল, আর একা আবিদ হোসেনের কত যে গাড়ি ছিল তার হিসেব জানতো না কেউ।

মুস্তাফা বলেছিল, যত বাড়ি এ শহরের, সব তৈরি করেছে বাব্বা সাহেব। রেলের যেখানে যতো ব্রীজ তৈরি হয়, সব কন্ট্রাক্ট তার।

একবার নাকি মাইনের দিনে কোলকাতা থেকে টাকা এসে পৌঁছয়নি, তাই নগদ এক লক্ষ টাকা ধার দিয়ে এসেছিল বাব্বা সাহেব, সি এম ই-র হাতে।

সেই আবিদ হোসেনের গল্পই শুনতাম, চোখে দেখিনি তার আগে, মনে মনে কল্পনার তুলি দিয়ে তার একটা ছবি এঁকে রেখেছিলাম। আর সে ছবির সঙ্গে বেশ খানিকটা মিল ছিল আরব্য রজনীর সেই বাদশার।

মুস্তাফা একদিন বললে, চলো বাব্বা সাহেবের বাড়ি যাই, পেস্তা বাদাম খাওয়াবে গেলেই।

পেস্তা বাদামের লোভে নয়, বাব্বা সাহেবকে স্বচক্ষে দেখতে পাবো এই লোভেই রাজি হলাম।

এত কাছ থেকে বাড়িটা কোনোদিন দেখিনি তার আগে। ধারণা ছিল সাহেব পাড়ায় সি এম ই-র বাংলোটাই বুঝি সবচেয়ে বড়। কিন্তু আবিদ হোসেনের বাড়িটা দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। আর সেই প্রথম বুঝেছিলাম, আমাদের ঐ রেল কলোনিটার একচ্ছত্র অধিপতি সি এম ই সাহেব নয়, বাব্বা সাহেব।

প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি, নানা কারুকার্য তার কার্নিসে, থামে দেয়ালের গায়ে। আর বাড়ির সামনে নকশা করা লোহার ফটক।

লোহার ফটকের কাছেই একটা দড়ির খাটিয়ায় বসে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছিল একটা থুত্থুরে বুড়ো। একটা বিরাট জালাব মতো শরীর, খালি গায়ে বসে তামাক খাচ্ছিল সে।

ভেবেছিলাম, দারোয়ান হয়তো।

কিন্তু মুস্তাফা গিয়ে তাকেই সেলাম করে দাঁড়াল।

সেলামালেকাম।

আশ্চর্য না হয়ে পারিনি। এই লোকটাই বাব্বা সাহেব? কিছুতেই যেন বিশ্বাস হল না।

আবিদ হোসেন হাত তুলে কি যেন বললে মুস্তাফাকে, খাটিয়ার একপাশে বসতে বললে আমাকে। তারপর আমার নাম জিজ্ঞেস করলে, বাবার নামও।

একটা চাকরকে ডেকে পেস্তা বাদাম আনতে হুকুম দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, শরবত ছোটাসাব?

—না, না। ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালাম।

তারপর পেস্তা বাদাম চিবোতে চিবোতে গল্পে জমে গেলাম কখন।

আবিদ হোসেন ছিল পাঞ্জাবী মুসলমান। ওর ঠাকুর্দা নাকি প্রথম ঠিকাদারী ব্যবসা শুরু করে। বোম্বাই থেকে মাত্র কুড়ি মাইল লম্বা রেল লাইন পাতা হয়েছিল তখন। আর তার লোক সংগ্রহ করে দেওয়ার জন্যে আড়কাঠির কাজ করে কিছু টাকা জমিয়েছিল আবিদ হোসেনের ঠাকুর্দা। সে হলো গিয়ে ১৮৫৪ সালের কথা।

তারপর বংশানুক্রমিকভাবে ওরা রেলের ঠিকাদার।

আবিদ হোসেন আমার পিঠে হাত রেখে বললে, লিখা-পড়া করে যেন নোকরি কোরো না ছোটাসাব। বিজনেস কোরো, নোকর রাখতে পারবে।

ব্যবসা ? ব্যবসার কথা কেউই ভাবতাম না আমরা। ব্যবসা বললেই, মনে হতো গোলবাজারে ভড়দের কাপড়ের দোকান, বেরাদের স্টেশনারি কিংবা পূজারার সাহেবী দোকান। দোকানদার হওয়ার চেয়ে রেলের কারখানায় অ্যাপ্রেন্টিস হওয়া অনেক ভাল, ভাবতাম আমরা সকলেই। কিন্তু তার চেয়েও বড় ইচ্ছা ছিল—সি আর দাসের মতো ব্যারিস্টার হওয়া।

আবিদ হোসেন বলল, হাঁ ব্যারিস্টারিতে আজাদী আছে। কিন্তু কোট পান্তলুন পরতে হয় আদালতে।

বললাম, বড় হতে গেলেই তো কোট প্যান্ট পরতে হয়।

শুনে হো-হো করে হাসল আবিদ হোসেন। হাসতে হাসতে যে গল্পটা বললে, বিশ্বাস হল না।

বুলডোজার! নামটা সেই প্রথম শুনলাম।

বোম্বাই থেকে নাকি দু-জন খাস বিলিতী সাহেব এসেছিল একবার আবিদ হোসেনের চিঠি পেয়ে। বুলডোজার বিক্রি করবার জন্যে! না, আসবার জন্যে চিঠি লেখে নি ও, শুধু জানিয়েছিল নতুন মডেলের কি বুলডোজার বেরিয়েছে তার কিতাব পাঠাও। আর চিঠি পেয়েই ছুটে এসেছিল তারা।

আবিদ হোসেন গড়গড়ায় টান দিতে দিতে বলেছিল, তামাম দুনিয়া জানে আবিদ হোসেনের নাম। কলকাত্তা জানে, বোম্বাই জানে, রাঙ্গুন জানে।

সাহেব দুটো যেদিন এল, সেদিন ঠিক এমনি ভাবেই খাটিয়ায় বসে তামাক খাচ্ছিল ও। সাহেব দুটো এসে ওকে ডেকে বললে, এই বুড্ডা, হোসেন সাব আছে?

আবিদ হোসেন প্রশ্ন করলে, কেন?

সাহেব চটে গেল, বললে, কেন তা হোসেন সাহেবকে বলবো, তুমি চাকর তোমাকে বলতে যাবো কেন? যা বলছি তার উত্তর দাও।

তখন আবিদ হোসেন সেলাম করে বললে, হুজুর, নফর আবিদ হোসেন আপনার সামনেই হাজির রয়েছে।

প্রথমটা বিশ্বাস করলে না তারা।

আশেপাশে যারা কাজ করছিল তাদের দেখিয়ে আবিদ হোসেন বললে, সাহেব, বিশ্বাস না হয় এদের জিজ্ঞেস করো।

সাহেবরা যখন বুঝতে পারল, তখন কুর্নিশ করে ক্ষমা চেয়ে একেবারে কাদা।

শেষে আসল কথাটা পাড়ল তারা। আর আবিদ হোসেন বললে, যারা ভদ্রতা শেখেনি তাদের সঙ্গে আমি ব্যবসা করি না।

সাহেবরা মুখ কাচুমাচু করে বললে, হোসেন সাহেব, চিনতে পারলে কি আর এমন হতো!

—কিন্তু আমার নফরের সঙ্গে তুমি তো ঐ রকমই ব্যবহার করতে?

বলেই আবিদ হোসেন ডাকল তার সেক্রেটারি অমিয়বাবুকে। বললে এ সাহেবের অর্ডার ক্যানসেল করে ব্রিটানিয়া কোম্পানিকে পনেরোটা বুলডোজারের অর্ডার দাও। আর হ্যাঁ, এক লাখ টাকার চেক অ্যাডভান্স পাঠিয়ে দাও।

সাহেবদের সামনেই নাকি চেক সই করেছিল আবিদ হোসেন।

মুস্তাফা বলেছিল, ও আর কি! বাব্বা সাহেবের জুতো পালিশ করে একজন সাহেব, তা জানিস?

—জুতো পালিশ করে? সাহেব? জুতো পরে নাকি আবিদ হোসেন? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তারপর জেনেছিলাম যে আবিদ হোসেনের দপ্তরের কেরাণীবাবু, দারোয়ান

আর চাপরাসীদের জুতো পালিশ করবার জন্যে একজন ফিরিঙ্গি সাহেব রেখেছিল সে মোটা মাইনে দিয়ে।

বিস্মিত হয়ে একদিন আবিদ হোসেনকে তাই প্রশ্ন করলাম, সত্যি ?

আবিদ হোসেন হাসলে।—রুপেয়ায় সব কেনা যায় ছোটাসাব হাতে তালি বাজিয়ে মালীকে ডেকে বললে, জুতাপালিশ সাহেবকে পাঠিয়ে দাও।

মিনিট কয়েক পরেই কোটপ্যান্ট পরা ফিটফাট চেহারার একজন ফিরিঙ্গি সাহেব এসে দাঁড়াল।

আবিদ হোসেন বললে, স্টুয়ার্ট, ছোটা সাহেবের জুতোটা পালিশ করে দাও।

আমার স্যাণ্ডেল জোড়াটা নিয়ে যাচ্ছিল স্টুয়ার্ট, আবিদ হোসেন হঠাৎ রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠল অশ্লীল ভাষায়।

বললে, এখানে বুরুশ এনে পালিশ করো।

ক্ষমা চেয়ে বুরুশ আনতে ছুটল স্টুয়ার্ট।

সেদিন রাত্রে এক মিনিটের জন্যেও ঘুমোতে পারিনি। জীবনের ওপর দিয়ে এতো বড় একটা ঝড় আর কখনো বয়ে যায়নি। আমার সমস্ত বিশ্বাস, সমস্ত ধারণা যেন রাতারাতি পাল্টে গেল।

কিন্তু তখন পর্যন্ত আবিদ হোসেনের চরিত্রের কতটুকুই বা দেখেছি। শুধু এইটুকুই বুঝেছিলাম যে শহরের প্রত্যেকটি লোককে স্নেহের চোখে দেখে আবিদ হোসেন, আর যত শত্রুতা তার একজনের সঙ্গে। সে হলো নতুন চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার রবার্সন সাহেব।

দাদুর কাছে একদিন আবিদ হোসেনের কথা তুলেছিলাম।—দাদু, সি এম ই নাকি আবিদ হোসেনকে ভয় করে ?

দাদু হেসে বলেছিলেন, ভয় ? না, তবে রেষারেষি দু-জনের মধ্যে কম নেই। অথচ সেই প্রথম যখন বাব্বা সাহেব এসেছিল ঠিকাদার হয়ে, কি খাতিরটাই না করতো সাহেবদের। এখন বড় হয়ে গেছে, ব্রিজ তৈরি বা মেরামত করতে হলে, কিংবা বড়দরের কাজ করতে হলে আবিদ হোসেন যা টেণ্ডার দেবে অন্য কোনো ঠিকাদারের পক্ষে তা সম্ভবই নয়। তাই এখন আর সি এম ই-র ধার ধারে না ও।

অর্থাৎ রবার্সন মনে করতো সে-ই শহরটার সম্রাট, আর আবিদ হোসেন ভাবতো, সে। রেল কোম্পানির কোলকাতার দপ্তর ছিল আবিদ হোসেনের হাতের মুঠোয়, বিলেতের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের কয়েকজন মেম্বারও ছিল আবিদ হোসেনের পরিচিত। আর তার চেয়েও বড় কথা, জেলার থানাপুলিস, জজ ম্যাজিস্ট্রেট সকলেই আবিদ হোসেনকে ভয় করতো, সম্ভ্রম করে চলতো।

যেদিন সি এম ই-র গাড়ি আর আবিদ হোসেনের গাড়ি একই রাস্তায় এসে পড়তো, সে এক দৃশ্য।

কার গাড়ি আগে যাবে এই নিয়ে রেষারেষি। শেষ পর্যন্ত আবিদ হোসেনের গাড়িকে পথ ছেড়ে দিতে বাধ্য হতো রবার্সন সাহেব।

রাস্তার টহলদার পুলিস আবিদ হোসেনকে সেলাম করতো, কিন্তু রবার্সন সাহেবকে দেখে শুধু খাড়া হয়ে দাঁড়াত, এই যা।

আসলে আমাদের ঐ শহরটাই ছিল অদ্ভুত এক রাজত্ব। কোম্পানির কর্মচারীদের কাছে রবার্সন সাহেবই ছিল একমাত্র রাজা ! কিন্তু সরকারী দপ্তরের লোক, দারোগা পুলিস, এরা ভয় পেতো একমাত্র জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে। আর এই ম্যাজিস্ট্রেটও নাকি আবিদ হোসেনকে সম্ভ্রম করে চলতো।

সুতরাং এ-হেন আবিদ হোসেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে মনে মনে গর্ব অনুভব করতাম।

আর কি আশ্চর্য, এত বড় একটা মানুষ, এত ধনী, সে আমাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতো, যেন সেও ছেলেমানুষটি।

একদিন বলেছিলাম, বাব্বা সাহেব, তোমার ছেলেপুলে নেই ?

—ছেলেপুলে ? হেসেছিল আবিদ হোসেন !—তুমি তো রয়েচো ছোটাসাব, মুস্তাফা রয়েচে, তামাম শহরের বাচ্চারাই তো আমার অভাব মিটিয়ে দিয়েচে। আবার লেড়কালেড়কি কি হবে ?

শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম।

পান্নার পিসীমার ছেলে হয়নি বলে কতো তাগা তাবিজ পরতো, কত ধর্না দিতো মন্দিরে। কেন ? ছেলেপুলে না থাকলে মানুষের কষ্ট হয় বলে তো ? আর আবিদ হোসেনের কোন দুঃখই নেই ?

মুস্তাফাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আবিদ হোসেন বিয়ে করে নি কেন রে ?

—বিয়ে করেনি ? আবিদ হোসেন ?

—করেছে ? তবে ছেলেপুলে নেই কেন ? জিজ্ঞেস করেছিলাম মুস্তাফাকে।

মুস্তাফা হেসে বলেছিল, আবিদ হোসেনের কতগুলো বিবি আছে জানিস ?

—অনেক ? স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম শুনে।

পান্নার পিসীমার ছেলে হয়নি বলে নাকি ওর পিসেমশাই আবাব বিয়ে করবে বলেছিল। আর তা শুনে কত কান্নাকাটি হৈ-চৈ ! বাবাও তো শুনে গালাগাল দিয়েছিলেন পান্নার পিসেমশাইকে, বলেছিলেন লজ্জা করে না এক বৌ থাকতে আবার বিয়ে করার কথা বলতে ?

আমারও মনে হয়েছিল, পান্নার পিসেমশাই একটা পাষণ্ড। আর আবিদ হোসেনের কিনা অনেক বিবি।

লোকটার ওপর যতো শ্রদ্ধা জমা হয়েছিল সব নষ্ট হয়ে গেল ঐ একটি খবরে। মনে মনে বললাম, আবিদ হোসেন লোকটা এক নম্বরের শয়তান !

১১

পুজোর সময় নিমাইদা ভলান্টিয়ার ইন-চার্জ।

আমরা ছোটরা থাকতাম মেয়েদের গ্যেটে—আমি, পল্টু, পরী, বাঁটুল, করুণা, আরো অনেকে।

মন্দিরের দালান আর অর্ধসমাপ্ত নাটমঞ্চের মাঝখানে ছিল বেশ খানিকটা ফাঁকা মাঠ। সেই মাঠের ওপর প্যাণ্ডাল হতো রেলের স্টোর থেকে ত্রিপল নিয়ে এসে। ইলেক্‌ট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে তার আর লাল নীল বাল্‌ব নিয়ে এসে সাজানো হতো প্যাণ্ডালটা।

মন্দিরে পুজো-আর্চা থেকে কাঙালী-ভোজন পর্যন্ত সব কিছু তদারক করতেন ব্রজেনবাবু। তাঁর কথা সবাই মান্য করতো, শ্রদ্ধা করতো সকলেই। বাবা যেমন ছিলেন লোকো ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র অ্যাকাউণ্টেন্ট, ব্রজেনবাবু ছিলেন তেমনি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের অ্যাকাউণ্টেন্ট। আবিদ হোসেন হয়তো ব্রজেনবাবুর তোয়াক্কা রাখতো না, কিন্তু ছোটখাট অন্যান্য ঠিকাদাররা তাঁকে সন্তুষ্ট রাখত তাড়াতাড়ি বিল পাশ করিয়ে নেবার জন্যে।

করুণা ছিল ব্রজেনবাবুর ছেলে, আমারই সমবয়সী। তার কাছেই শুনতাম, ঈদের সময় তাদের ডালি পাঠাত মুসলমান ঠিকাদাররা, পুজোর সময় বাঙালীরা, আর হিন্দুস্থানীরা পাঠাত দেওয়ালীর সময়। কিন্তু সারা বছরে একবার ক্রিস্টমাসের সময় ইঞ্জিনিয়ার সাহেবদের ডালি পাঠাতেন ব্রজেনবাবু স্বয়ং।

ডালি জিনিসটা যে ঘুষ তা জানতাম না।

করুণা বলেছিল, ডালি জানিস না ? আঙুর বাদাম, আপেল, মদের বোতল, রেডিও গ্রামোফোন, কতো কি দামী জিনিস পাঠাতে হয় ঝুড়িতে করে। নগদ টাকাও দিতে হয় অনেক সময়, আর সঙ্গে একটা রাজারাণীর ছবি।

করুণাদের বাড়িতেও একটা বড় রঙিন ছবি টাঙানো দেখেছিলাম—

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পাশে অ্যালবার্টের অদ্ভুত ধরনের কোঁকড়ানো চুলের টেরী কাটা দেখে সেই প্রথম বুঝেছিলাম 'এলবার্ট করা' কাকে বলে। অথচ ভেবে পেতাম না, ও-ভাবে চুল আঁচড়ালে সবাই ঠাট্টা করে কেন, কেনই বা বকুনি দেন ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা। তেমনি বুঝতে পারতাম না ব্রজেনবাবু নিজেই যখন ঠিকাদারদের কাছে ডালি ভেট পান, তখন সাহেবদের আবার কেন ডালি দেন বড়দিনে।

করুণা সে-প্রশ্ন শুনে হেসেছিল।—বাঃ রে, ডালি না দিলে তো চাকরিই থাকবে না।

চাকরি থাকবে না ? কই, বাবা তো ব্রজেনবাবুর মতো ডালি পান না ! দেনও না। তবে।

পরী ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে চালাক চতুর। বয়সে ও হয়তো আমার চেয়ে সামান্য বড় ছিল, কিন্তু আমার চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধি ছিল ওর। অনেক কথা ও বুঝতে পারত।

ও বলেছিল, আসল ব্যাপার বুঝিস না ? ব্রজেনবাবু যা ঘুষ পান তার বখরা দিতে হয় সাহেবদের !

ঘুষ ! কথাটা শুনে ব্রজেনবাবুর ওপর, করুণাদের ওপর মনটা বিষিয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু পুজোর সময় এলেই কেমন যেন ভক্তি হতো ব্রজেনবাবুর ওপর।

বাঙালীরা সবাই মিলে মন্দিরটা গড়েছিল ঠিকই, কিন্তু ব্রজেনবাবু না থাকলে দুর্গামন্দির হতো না—মন্দিরটা তো একরকম তারই দান। ঠিকাদারদের দিয়ে বিনা পয়সায় মন্দিরটা তৈরি করিয়েছিলেন তিনি।

পুজোর সময় চাঁদা দিতেন সব চেয়ে বেশি। আর কাঙালীদের খাওয়াতেন নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। নিজের হাতে কাপড় বিলি করতেন তাদের। সে-দৃশ্য দেখতে দেখতে সত্যিই ভাল লাগতো। হাজার হাজার কাঙালী খেতে বসেছে, ব্রজেনবাবু ছড়ি হাতে পরিবেশন দেখছেন। তারপর একে একে কাপড় বিলি করতেন ব্রজেনবাবু গ্যেটের কাছে দাঁড়িয়ে। কাপড় নিয়ে সেলাম করতে করতে বেরিয়ে যেত তারা।

সেদিন এমনিভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম কাঙালী-বিদায়।

হঠাৎ পরী এসে ডাকল—তিমু চট করে শুনে যা।

ওর পিছনে পিছনে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছলাম মেয়েদের গ্যেটে।

পাড়ার সব মেয়েরা রঙিন কাপড়-চোপড় পরে সেজেগুজে মন্দিরে ঢুকছিল।

আরতির সময় হয়ে গিয়েছিল তখন।

পরী ফিসফিস করে বললে, সুধাদি আসছে। চুপ করে বসে থাক্। এক্ষুনি আসবে সুধাদি।

সুধাদি ফিরে এসেছে ? কিছুতেই যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। সেই যে কারা জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর শুনেছিলাম পুলিস নাকি উদ্ধার করে এনেছিল সুধাদিকে ! মা বলেছিল। কিন্তু চোখে দেখিনি। কে যেন বলেছিল, সেজদি বোধ হয়, সে সুধাদি আর

লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছে না, তাই তাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সেই সুধাদি ফিরে এসেছে এত দিন বাদে ?

কিছুক্ষণের মধ্যে সত্যিই এসে হাজির হল সুধাদি। ফটক পার হয়ে মন্দিরের ভেতরে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

আগের চেয়ে আরো যেন সুন্দর হয়েছে, আরো বড় হয়েছে। লাল পাড় গরদের শাড়িতে কি সুন্দর মানিয়েছিল !

পরী ফিসফিস করে বললে, সুধাদির বিয়ে ঠিক হয়েছে, জানিস ?

—সত্যি ?

—সত্যি নয়তো কি ? সুধাদির বাবা তো স্রেফ চেপে গেছে সব, পাত্রপক্ষ জানেও না। জানলে কি আর বিয়ে করতো ?

—কেন, জানলে বিয়ে করবে না কেন ? পরীর কথাটা কেমন যেন দুর্বোধ্য লেগেছিল।

আর আমাব কথা শুনে হেসেছিল পরী।—কি বোকা-রে তুই। গুণ্ডারা নিয়ে গিয়ে বুঝি ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করেছে, না ?

বিস্মিত হয়ে বলেছিলুম, কি আবার করবে ?

পরী হো-হো করে হেসেছিল, তারপর ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কতো কি রহস্য উদ্ঘাটন করেছিল। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারিনি ; স্পষ্ট কোন ধারণা হয়নি।

শুধু মনে হয়েছিল, ছি ছি, পরীটা কি নোংরা কথা বলে, কি অসভ্য।

আর সুধাদি কত সুন্দর, কত শান্তশিষ্ট লাজুক নম্র চেহারা সুধাদির।

মনে হয়েছিল, পরীর সব কথা ষোলো আনা মিথ্যে।

আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিল পরী, আর ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেবার জন্যে হাত তুলেছিলাম।

হঠাৎ মন্দিরের ভেতর থেকে সেই মুহূর্তে একটা চিৎকার শুনতে পেলাম।

ছুটে গেলাম আমরা সকলেই।

তখনও চিৎকার থামেনি।

প্রথমটা আমরাও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

প্যাণ্ডেলে বাল্‌ব টাঙাবার জন্যে একটা তার টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তারটার কাটা জায়গায় হাত পড়তেই নিমাইদা চিৎকার করে উঠেছে। নিমাইদাকে টেনে সরাতে গিয়ে আরো দু-জন লোক ক্রমশ কুঁকড়ে নীল হয়ে যাচ্ছে তখন।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সেন সাহেব, চোখেলাল মিস্ত্রী, আরো অনেকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কি করবে না করবে ঠিক করতে পারছে না যেন।

হঠাৎ দেখি সুধাদি এসে এক চোখ দেখে নিয়েই ছুটতে ছুটতে গিয়ে প্লাগটা খুলে দিল।

এ সি কারেণ্ট যে কি বস্তু সেই প্রথম বুঝতে পারলাম।

আর সুধাদি কি ধমকটাই না দিল নিমাইদাকে।—প্লাগ লাগিয়ে কেউ ও-ভাবে তার নিয়ে যায় ?

নিমাইদার তিনটে আঙুল তখন পুড়ে কালো হয়ে গেছে, তাড়াতাড়ি ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া হল নিমাইদাকে।

আর সকলেই সুধাদির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠল। বললে, তিনটি লোকের জীবন দিয়েছে সুধা।

সেন সাহেব ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হয়েও কিনা তাঁর মাথায় ঢুকলো না কি করা উচিত, আর এক ফোঁটা মেয়ে সুধা…

হঠাৎ দেখি এক কোণে অঞ্জলিদি দাঁড়িয়ে আছেন। পাথরের মূর্তির মতো একদৃষ্টে

তাকিয়ে আছেন সুধাদির দিকে।

—অঞ্জলিদি ! কাছে গিয়ে ডাকলাম।

অঞ্জলিদি চমকে উঠে তাড়াতাড়ি চোখ মুছলেন আঁচলে, তারপর হাসতে হাসতে বললেন, কি রে তিমু ?

বললাম, সুধাদি ছিল কি ভাগ্যি, না অঞ্জলিদি ?

—হ্যাঁ। কি ঠাণ্ডা মাথা দেখেছিস. অন্য কারো তো মাথায় আসেনি যে ওটা খুলে দিতে হবে। জানিস্, আমিও ছুটে যাচ্ছিলাম টেনে সরিয়ে আনবার জন্যে, কে যেন ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল আমাকে।

অঞ্জলিদির কথায় যেন কৃতজ্ঞতা ঝরে পড়ল সুধাদির ওপর।

অথচ পরে যখনই নিমাইদা বলতো, সুধার জন্যেই তো বেঁচে গেছি, তখনই কেমন যেন করুণ দেখাত অঞ্জলিদিকে। নিমাইদা যতো সুধাদির নাম করত, অঞ্জলিদি ততোই যেন অস্বস্তি বোধ করতো।

একদিন আড়ালে আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁ রে তিমু, সুধা কি আমার চেয়েও সুন্দর ?

—সুন্দর ? তুমি অনেক বেশি সুন্দর সুধাদির চেয়ে।

অঞ্জলিদির মুখে হাসি ফুটতো এ-কথা শুনে।

অঞ্জলিদিকে মুখে যদিও সুন্দর বলতাম, মন মানতো না। কাকে সুন্দর বলা যায় ? চোখ যাকে ভাল বলে সে, না মন যাকে ভালবাসে ?

রাঙামামীমার কথা মনে পড়ে যেতো। সেই হাসি-হাসি সুন্দর মুখ। চোখে দেখতেই সুন্দর নয়, মনও তাঁকে ভালবাসতো।

যেদিন তাঁর কথা মনে পড়তো সেদিন হাজারো কথার ফাঁকে হাজারো কাজের মধ্যে বার বার সেই মুখ মনের চোখে ভেসে উঠতো ! সারা রাত বিছানায় ছটফট করতাম, ঘুম আসতো না চোখে।

এমনি নির্ঘুম রাত কেটেছিল সেদিন, তারপর ভোরের দিকে কখন যেন চোখ জুড়ে এসেছিল।

স্বপ্নে দেখা পেয়েছিলাম রাঙামামীমার। স্বপ্ন তো নয়, দুঃস্বপ্ন।

জাফরির কপাট খুলে যেন রাঙামামীমা এসে দাঁড়ালেন। চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ। তারপর হঠাৎ যেন কে কেঁদে উঠল। কে যেন আর্তনাদ করে উঠল যন্ত্রণায়। অন্ধকারে তন্নতন্ন করে খুঁজলাম কে আর্তনাদ করছে। হঠাৎ দেখলাম, নিরুর মামা শুয়ে রয়েছেন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে তাঁর সারা শরীর। মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছেন যেন। আর তা দেখে হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন রাঙামামীমা। কেঁদে উঠলেন ডুকরে ডুকরে। তা দেখে আমি যেন ভয়ে চিৎকার করে ডাকলাম রাঙামামীমাকে।

আর ডাক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম ভেঙে গেল ! সারা শরীরে ঘাম ঝরছে তখন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। যাক, স্বপ্ন ! সত্যি নয় তা হলে।

কিন্তু মনটা খারাপ হয়ে গেল কেমন যেন। ভোর হয়ে গেছে তখন। উঠে চোখ-মুখ ধুয়ে পড়তে বসলাম। কিন্তু কিছুতেই পড়ায় মন বসল না।

ধীরে ধীরে উঠে এসে রান্নাঘরে ঢুকলাম।

না, মা নেই কাছেপিঠে। উনুনে চায়ের কেটলি, সামনে কাপ ডিস নিয়ে বসে আছে সেজদি।

ফিসফিস করে বললাম, আচ্ছা সেজদি, ভোরের স্বপ্ন তো সত্যি হয়, না ?

সেজদি হেসে বললে, হ্যাঁ। কি স্বপ্ন দেখেছিস, পরীক্ষার ?

বললাম, না রে। খুব খারাপ স্বপ্ন।

—কি খারাপ ? বল্ না।

বললাম।

শুনে হাসল সেজদি। বললে, দূর, ও স্বপ্ন সত্যি হয় না।

যাক্ সত্যি হয় না তা হলে ? ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেলেও এত আনন্দ হয় না। ফিরে এসে পড়তে বসলাম।

তবু কেমন যেন খচ্খচ্ করল বুকের ভেরতটা। কেমন এক সন্দেহ, দুশ্চিন্তা।

বাবা বাজারে বেরিয়ে যেতেই বইপত্তর ফেলে রেখে হঠাৎ উঠে পড়লাম।

ছুটতে ছুটতে যখন এসে পৌঁছলাম গুজরাটী হোটেলের পিছনে হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়ির সামনে, তখন রীতিমত হাঁফাচ্ছি!

দাদু বাইরে বসে গল্প করছিলেন কার সঙ্গে।

—কি তিমু, কি খবর ? দাদু জিজ্ঞেস করলেন।

বলতে পারলাম না লোকটির সামনে। ভয় হল, যদি হেসে ওঠে সবাই ?

—না, কিছু না। এমনি। বলে ঢুকে গেলাম বাড়ির ভেতর।

দিদিমা রান্না করছিলেন। কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, কথাটা গুছিয়ে বলবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলার স্বরটা কেঁপে গেল।

বললাম, দিদা, বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখেছি ভোরবেলায়।

—কি স্বপ্ন রে ?

যেমন খাপছাড়া ভাবে দেখেছিলাম স্বপ্নটা তেমনি ভাবেই বললাম। আর তা শুনে দিদিমার চোখে মুখে আতঙ্কের ভাব ফুটে উঠল।

খুন্তি হাতেই বাইরের বাগানে বেরিয়ে এলেন, দাদুকে বললেন, খোকার নামে এখনই একটা টেলিগ্রাম করে দাও, কেমন আছে খবর দিতে লেখো।

—কেন, কি হয়েছে ? উৎকণ্ঠিত হয়ে দাদু জিজ্ঞেস করলেন।

আর আমার কাছে স্বপ্নে দেখা ঘটনাটা শুনে দাদুও বিচলিত হয়ে উঠলেন। অথচ দাদু বলতেন, স্বপ্ন স্বপ্নই, সত্যি নয়। মানুষ দুশ্চিন্তার জন্যে স্বপ্ন দেখে, মনের গুপ্ত কামনার জন্য স্বপ্ন দেখে।

বাবার বকুনির ভয়ে আমি ফিরে এলাম তখনই।

সেদিনটা ছিল শনিবার। পরের দিন রবিবার বিকেলে নিরুদের বাড়ি এসে অপেক্ষা করলাম। রবিবার বিকেল হলেই দাদু আসতেন।

টেলিগ্রাম করেছিলেন কিনা, কি জবাব এসেছে টেলিগ্রামের, জানবার জন্যে অপেক্ষা করে রইলাম।

যথারীতি সেদিনও, বিকেল হওয়ার অনেক আগেই, ফিটনটা এসে দাঁড়াল নিরুদের খিড়কির দরজায়। কিন্তু কোচোয়ানটা নেমে সেলাম করে দাঁড়াল না। আর আমরা যারা ছুটে এসেছিলাম, সবাই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

দেখলাম, দাদুর দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

নিরুর মাও কেঁদে উঠল দাদুর কথা শুনে। কয়েকজনে মিলে ধরাধরি করে দাদুকে নিয়ে এসে বসালো একটা ঘরে, আর বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা।

জবাব আসার আগেই একটা টেলিগ্রাম করেছে অন্য একজন ডাক্তার।

নিরুর বড়মামার কাজই ছিল ঠেলা ট্রলিতে করে আজ এখানে কাল সেখানে রুগী দেখে বেড়ানো।

সেদিনও রাত্তিরে কোথায় কলেরা হয়েছে শুনে ট্রলিতে করে যাচ্ছিলেন তিনি। হঠাৎ একটা বে-টাইমের ইঞ্জিন এসে পিছন থেকে ধাক্কা দেয় বাঁকের মুখে। শেষ মুহূর্তে লাফ দিতে গিয়ে তাঁর সমস্ত শরীর থেঁতলে যায় ইঞ্জিনের ধাক্কায়। আর সেই খবর জানিয়ে টেলিগ্রাম করেন সেখানকার একজন ডাক্তার।

এই ঘটনার দিন-কয়েক পরে রাঙামামীমা সত্যিই ফিরে এলেন। কিন্তু এভাবে তো আমি তাঁকে ফিরে চাইনি!

১২

রাঙামামীমাব একটা রূপই চিনতাম। দেখতে পেলাম আরেকটি রূপ।

ঠাট্টা বিদ্রূপ রঙ্গ রসিকতায় উচ্ছল হাসিখুশি রূপ নয়। উজ্জ্বল আলোর মত সপ্রতিভ রঙমিছিল সৌন্দর্য নয়।

শান্ত সংযত ম্লান বিষণ্ণতা। চাপা কান্নার মতো। শাড়িতে লাল পলাশের আগুন নয়, শ্বেত শিউলির মতো শান্ত দেখাল তাঁকে। ক্লান্ত করুণ দুটি চোখ।

সরু কালো পাড় একটা সাদা ধবধবে ধুতি পরতেন। সাদা ব্লাউজের হাতাটা এঁটে বসতো তাঁর কোমল বাহুতে।

এ এক আশ্চর্য রূপ। ভাল লাগে না, কিন্তু বড় আপন মনে হয়। কাছে যেতে ইচ্ছে হয়।

অথচ কাছে গিয়েও কথা খুঁজে পাওয়া যায় না।

কথা খুঁজে পেতাম না। শুধু কাছে কাছে ঘুরতাম।

আশা করতাম, রাঙামামীমা হয়তো নিজেই কথা বলবেন। হয়তো কাছে টেনে নেবেন আগের মতোই।

কিন্তু না, কোনো কথা বলতেন না রাঙামামীমা। চুপচাপ বসে থাকতেন। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কখন ঘুমিয়ে পড়তেন, ডেকে সাড়া পাওয়া যেতো না।

তখন চলে আসতাম দাদুর কাছে। এসে বসে থাকতাম চুপ করে। আর দাদু এক মনে পরীক্ষার খাতা দেখতেন; খাতায় নম্বর দিতেন একটার পর একটা।

সেদিনও এমনি ভাবে বেশ কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে আসছিলাম।

দাদু ডাকলেন।—বসো, তিমু বসো।

চৌকিটার একপাশে বসলাম আবার।

দাদু যেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর হঠাৎ বললেন. বড় হয়ে আর যাই করো, রেলে চাকরি কোরো না তিমু। মালঞ্চর লোকেরা ঠিকই বলতো, ট্রেন হল যন্ত্রের অজগর, নিশ্বাসে বিষ ছড়ায়।

নিশ্বাসে বিষ ছড়ায় এই যন্ত্রের অজগর। সত্যিই তো। কতো লোকের জীবন নিয়েছে এই রেল। কতো অভিশাপ বয়ে এনেছে।

ইস্কুলে রচনা লেখবার সময় লিখতাম, সারা দেশে ম্যালেরিয়ার অভিশাপ ছড়িয়ে দিয়েছে এই রেল। নদীতে পুল দেয়ার জন্যে, বাঁধ দেয়ার জন্যে, রেললাইনের দু-পাশের জমি জলে ডুবে থাকে, তাই এত মশা হয়, ম্যালেরিয়ার বিষ ছড়ায়।

সে-সব কথা রচনার বইয়ে লেখা ছিল বলেই লিখতাম, কোনদিন বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু দাদুর দীর্ঘশ্বাস শুনে মনে হল সব সত্যি।

টাকার লোভে মানুষকে দেশ ছাড়া করেছে এই রেল। সংসার ভেঙেছে, ভেঙেছে

মানুষের বিশ্বাস।

আর আমাদের এই ভারতবর্ষের অতীত গৌরবের সব চিহ্ন ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে।

মনে আছে, বিকেলে ব্যায়ামচর্চার সময় নিমাইদা লাঠি খেলা শেখাতো আমাদের! তারপর সবাই যখন ক্লান্ত হয়ে বাগানের ঘাসে এসে বসতো, ঠিক লাইটপোস্টের নীচে, তখন নিমাইদা বই থেকে, পত্রিকা থেকে কিছু না কিছু পড়ে শোনাতো।

এমনি ভাবে খবর পড়ে শোনাতে শোনাতে একদিন চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠেছিল।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সেই প্রথম শুনলাম, আর মহেঞ্জোদারোব নাম।

নিমাইদা উত্তেজিত কণ্ঠে পড়ে শোনাচ্ছিল।

—এই দেখ তিমু, কতো প্রাচীন সভ্যতা আমাদের, প্রমাণ করেছেন একজন বাঙালী।

খবরটা পড়ে শুনিয়ে শেষকালে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, তবু ইংবেজরা বলে কিনা আমরা ভারতবাসীরা অসভ্য বর্বর। অথচ ওরা যখন জানোয়ারের মতো জঙ্গলে বাস করতো, সিন্ধু উপত্যকায তখন ভারতবাসীরা আজকের মতোই আধুনিক শহর তৈরি করতে শিখেছে।

সিন্ধু উপত্যকা!

রবি বর্মার ছবি দেখে যেদিন মনে হযেছিল রাম লক্ষ্মণ সীতা কেউই বাঙালী ছিল না, সেদিনকার মতোই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। ভাবতবর্ষের প্রাচীন গৌরব তা হলে বাংলা দেশে ছিল না?

তা হোক ভারতবর্ষ তো। মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম।

আর রেলওয়ের ওপর মন বিষিযে উঠেছিল হরপ্পা আর মহেঞ্জোদারোর স্মৃতি-চিহ্ন ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্যে।

নিমাইদা হেসে বলেছিল, তা কেন, হরপ্পাকে খুঁজেও পাওয়া গেছে এই রেললাইনের জন্যেই।

দাদুরা যেমন এদিকে রেললাইন পাততে শুরু করেছেন, তেমনি করাচি থেকে লাহোব অবধি বেললাইন পাতা হয়েছিল। লাইন পাতার ভার পড়েছিল জন্ ব্র্যান্টন আর উইলিয়ম ব্র্যানটন দুই ভাইয়ের ওপর। দু-জনেই ছিল ইঞ্জিনিযার। করাচির দিক থেকে লাইন বসাতে বসাতে আসছিল জন্, আর লাহোরের দিক থেকে উইলিয়ম।

এমন সময় সমস্যা দেখা দিল দু-দিকেই, লাইন পাততে হলে শুধু কাঠের স্লিপার বসালেই তো চলবে না, মজবুত করার জন্যে ঢালতে হবে নুড়ি-পাথর, নয়তো অন্য কোনো পাথরের কুচি।

কিন্তু কাছাকাছি কোথাও পাথর পেল না ওরা। না জন্। না উইলিয়ম!

তখন একজন এসে খবর দিলে ব্রাহ্মণাবাদ বলে একটা জায়গায় একটা পুরনো শহরের ধ্বংসস্তূপ পড়ে আছে, সেখান থেকে পোড়া ইঁট পাওয়া যাবে প্রচুর। জন্ ব্র্যানটন সেই ইঁট আনিয়ে কাজ চালালে।

এদিকে মুলতান থেকে লাহোর পর্যন্ত রেললাইন টানতে গিয়ে উইলিয়ম খোঁজ পেল আরেকটা শহরের, হরপ্পা গ্রামের কাছে। পাঁচ হাজার বছরের পুরনো, না পঁচিশ হাজার, সে খবর রাখার প্রয়োজন বোধ করল না উইলিয়ম। ইঁট পাটকেল তুলে নিয়ে এসে তার সঙ্গে কিছু কিছু সীল, পাথরের মূর্তি ভেঙে নিজের কাজ চালালে।

কিন্তু সেই ভগ্নস্তূপের নীচে মাটি খুঁড়েই পরে প্রমাণ পাওয়া গেল ভারতবর্ষের সভ্যতা কতো প্রাচীন, কতো উন্নত।

তাই বললাম, এসব জেনে সাহেবদেব মুখ কালো হয়ে যাবে, না নিমাইদা?

নিমাইদা হাসলো।—ওপরের ইঁটগুলো ওভাবে লাইন পাতার কাজে না লাগালে আরো

হয়তো কতো কি আবিষ্কার হতো।

বললাম, সত্যি। রেললাইন এসে ভারতবর্ষের যতো অধঃপতন হয়েছে, তাই না নিমাইদা ? আগেকার দিনের মতো সবাই চাষ-বাস করে দিব্যি সুখে থাকতে পারতো। কি প্রয়োজন ছিল রেলের ?

প্রয়োজন ?

সদাশিব জ্যাঠা শুনে হেসেছিলেন একদিন। বলেছিলেন, ছিল প্রয়োজন, যুগের প্রয়োজন। মল্লিক মশাইয়ের দুঃখ হওয়া স্বাভাবিক, তিনি তাঁর সন্তানকে হারিয়েছেন এই রেলের যূপকাষ্ঠে। তেমনি হাজার হাজার কুসংস্কারকেও বলি দিয়েছে এই রেল। গ্রামের অন্ধকূপ সমাজে আলো-বাতাসের মুক্তি এনে দিয়েছে।

সদাশিব জ্যাঠার কথায় কি যেন যাদু ছিল। প্রতিটি কথা যেন মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যেতো। যা বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হতো না, তাও ভুলতে পারতাম না। আর তাঁর কথা শুনতে শুনতে ইংলণ্ডের ইতিহাসের একটা পাতা মনে পড়ে যেতো।

সারা ইউরোপে নাকি একদিন বিপ্লব ঘটেছিল, সে বিপ্লবের নাম ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন। যন্ত্রজাগরণের বিপ্লব। তারই হাওয়ায় বিলেতের মানুষ, সমাজ, ধর্ম, মন—সব কিছু বদলাতে শুরু করেছিল।

রেলও যেন তেমনি এক বিপ্লব এনেছিল ভারতবর্ষে।

সদাশিব জ্যাঠা বলতেন, তোমরা তো তখন জন্মাওনি, দেখোনি সে-সব দিন ! অস্পৃশ্য বলে যাদের দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল তাদের ছায়া মাড়ালে স্নান করতে হতো ! শুধু কি তাই ? কাছাকাছি এসে পড়ার দোষে জরিমানা দিতে হতো তাদের। মারধরও খেতো অনেক সময়।

রেলগাড়িতেও প্রথম প্রথম নাকি কামরা আলাদা করা থাকতো।

সাহেবদের জন্যে, উচ্চবর্ণ হিন্দুদের জন্যে আর অস্পৃশ্যদের জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রইল শুধু সাহেব আর ভারতীয়—দুটো শ্রেণী।

সেদিন থেকেই অস্পৃশ্যতার পাপ দূর হতে শুরু হয়েছে। উপায় কি ; রেলের কাছে সকলেই সমান। টিকিট কাটলে পাশে বসতে দিতে হবে।

—শুধু তাই নয় তিমু। রেল মানুষকে দেশ চিনিয়েছে, সমগ্র ভারতবর্ষকে নিজের দেশ বলে ভাবতে শিখিয়েছে। ১৮৫৩ সালে রেল এসেছে এ-দেশে আর ১৮৫৭ সালে সারা ভারতে সিপাই বিদ্রোহ। কোনো যোগাযোগ নেই মনে করো ? ইংরেজদের মুখোশ খুলে দিয়েছে এই রেল—রেলের কারখানা।

সদাশিব জ্যাঠার কথা শুনতে শুনতে মনে হতো রেলগাড়ি অভিশাপ নয় আশীর্বাদ। যে গ্রাম শুধু মহকুমা শহর চিনেই সন্তুষ্ট থাকতো, তার মুঠোর মধ্যে সারা দেশকে এনে দিয়েছে। ধর্মের গোঁড়ামি দূর করেছে, দেশ-বিদেশের খবর এনে দিয়েছে। আর সবার ওপর যন্ত্রসভ্যতার ভিত গেড়ে মানুষের মন বদলে দিয়েছে।

সদাশিব জ্যাঠা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, এই যে সে-বার ইউনিয়ন করল তোমার বাবা, সেও এক বিরাট বিপ্লব, আজ চিনতে পারছে না সকলে, একদিন পারবে। কিন্তু তারও মূলে এই রেলওয়ে। শ্রমিকদের এক করেছে। আজ তারাও একটা শক্তি।

মনের মধ্যে তোলপাড় হতো এ-সব কথা শুনে, আর বাড়ি ফেরার পথে কেবলই মনে হতো, এবার পরীক্ষায় যদি রেলওয়ে সম্বন্ধে রচনা লিখতে দেয়, তা হলে নির্ঘাত ফার্স্ট হবো।

কিন্তু তারপর কখন যে ভুলে যেতাম সব ! আনমনে চলে যেতাম সাহেবপাড়ার চাঁদমারির দিকে, কোনো কালভার্টের গায়ে সাইকেলটা ঠেসিয়ে রেখে বসতাম। কোনোদিন

বা চলে যেতাম কবরস্থানে। খ্রীস্টানদের কবর দেওয়া হতো যেখানে। গাছ থেকে গোটাকয়েক গোলাপজাম পেড়ে নিয়ে চিবোতে চিবোতে গিয়ে বসতাম শ্বেত পাথরে বাঁধানো জোড়া-কবরের নীচে, ঘাসের ওপর। জন কোলম্যান আর তার স্ত্রী সীতা কোলম্যানের কবর ছিল পাশাপাশি। আমরা বলতাম জোড়া-কবর।

সীতা কোলম্যান! মেম সাহেবদের আবার সীতা নাম হয় নাকি? তখনও গল্পটা শুনিনি। তারপর একসময় চোরা-চোখে এপাশ-ওপাশ দেখে নিয়ে লুকিয়ে-কেনা সিগারেটটা বের করতাম। অনেক কষ্টে ধরাতাম সেটা।

কিন্তু কাশতে কাশতে শেষে ফেলে দিতে হতো। ভাবতাম মেমসাহেবরাও যখন সিগারেট খেতে পারে তখন আমি পারি না কেন?

মেমসাহেব! সীতা কোলম্যানের কবরই দেখেছিলাম। জানতাম না, ব্রাহ্মণকন্যা সীতা কিনা ধর্মপত্নী হয়েছিল কোলম্যান সাহেবের!

—আবিদ হোসেন আর ক-টা বিয়ে করেছে, সে যুগের কুলীন বামুনদের কাছে ও তো তুচ্ছ! নিরুর মা একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন।

বলেছিলেন নিভামাসীকে। আমি যে পাশের কুঠবিতে অঞ্জলিদির টেবিলে বসে রহস্য-কাহিনী পড়ছি, তা বুঝতে পারেননি। আড়ি পেতে শুনেছিলাম সেদিন জোড়া-কবরের কাহিনী। সেই জোড়া-কবর, যার ওপর ছড়িয়ে পড়ে থাকতো রাশি রাশি গোলাপজাম।

গোলাপজামের মিষ্টি সুগন্ধটা ভাল লাগতো। খাওয়ার চেয়ে শুঁকতে। তাই মাঝে মাঝে চলে যেতাম সেখানে।

তিনপটিয়াদের গির্জা পার হয়ে, পোস্টঅফিস পার হয়ে লাল ধুলোর রাস্তাটা ঢলে নেমে গেছে উত্তরে। সোজা উত্তরে গেছে খরিদা আর মালঞ্চ। ঢল নীচে নেমেই আরেকটা শাখা বেরিয়েছে পশ্চিমের দিকে। মাঝখানে শুধু একটা লেভেল ক্রসিং। লেভেল ক্রসিং পার হয়ে নিউ সেটেলমেন্টের দিকে যেতে মাঝপথে একটা কবরস্থান। খ্রীস্টানদের সিমেট্রি। মাঝখানের মাঠটায় তখনও সিনেমা হল দুটো তৈরি হয়নি। সবে ইঁট গাঁথা হচ্ছে। তাই সারা পল্লীটাই থাকতো কেমন চুপ-চাপ। শান্ত, স্তব্ধ। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা অনেকখানি জায়গা নানা পাতাবাহার আর ফুলগাছে বাগানের মতো করে সাজানো। আর সবুজ দুর্বা ঘাসের জাজিম বিছানো সারা বাগানে। তারই ফাঁকে ফাঁকে সাদা পাথরের সমাধি। ওপরে নানারকমের ক্রস। আর কবরের গায়ে পাথরে খোদাই করা নাম, জন্ম মৃত্যুর তারিখ, বংশ পরিচয় কোনোটায়, কোনোটায় বা দু-এক ছত্র প্রশংসা। যেদিন মন ভাল থাকতো না, কিংবা যেতে ইচ্ছে হতো না হৈ-হল্লার মধ্যে, সেদিন দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে এসে বসতাম ঐ কবরস্থানে।

ওখানে গেলেই মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে যেতো। কেমন একটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা, চুপচাপ, শান্ত মধুর পরিবেশ ছিল যেন কবরস্থানের বাতাসে।

কোনোদিন বা ঘুরে ঘুরে সব কবরগুলো দেখতাম, পড়তাম তাদের ইতিহাস। বাইবেলের উদ্ধৃতি। গিয়ে বসতাম কিন্তু কোলম্যান সাহেবের কবরের পাশের জমিতে।

পাশাপাশি দুটো কবর। স্বামী আর স্ত্রী। জন কোলম্যানের পাশে সীতা কোলম্যান। ওই দুটোই সবচেয়ে সুন্দর ছিল বলে নাম হয়েছিল 'জোড়া-কবর'।

সীতা কোলম্যানের মুখটা কেমন ছিল, সুন্দর কিনা জানতে ইচ্ছে হতো। কল্পনায় আঁকতাম তার ছবি।

কোন সুদূর বেলফাস্ট থেকে রেলের চাকরি নিয়ে এসেছিল এই কোলম্যান সাহেব। এসে বিয়ে করেছিল এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে। তারপর এই মাটিতে তারা দু-জনেই দেহরক্ষা করে গেছে।

ভাবতেও অবাক লাগতো আমাদের। কল্পনার চোখে দেখতে পেতাম।

বিরাট বাংলো। বড় বড় ঘর। চমৎকার সাজানো বাগান। ঝকঝকে দামী আসবাব প্রত্যেক ঘরে। অথচ এত বড় বাংলোটায় নাকি একা থাকতো কোলম্যান সাহেব। পঞ্চাশ ষাটজন চাকর, মালী, পিওন, দারোয়ান, কত কি ছিল কোলম্যান সাহেবের। কিন্তু তার মধ্যেও হাঁফিয়ে উঠতো, নিজেকে একা মনে হতো। আর সেই একাকিত্বের জ্বালা নাকি মাঝে মাঝে প্রকাশ করে ফেলতো বন্ধুদের কাছে।

কিন্তু বিলেত তো বাংলা দেশ নয় যে গেলেই মেয়ের বাপরা হুমড়ি খেয়ে পড়বে। মহারানী ভিক্টোরিয়া তখনও জুবিলি করেনি, ওদেশের মেয়েরাও কব্জি পর্যন্ত ঢাকা ঘটি-হাতা ব্লাউজ পরতো তখন। তাই কোলম্যান মাঝে মাঝে বলতো, বিয়ে যদি করি তো ভারতীয় মেয়ে বিয়ে করবো।

কোলম্যানের কাছে গাউন পরা মেয়ে ছিল দু-চক্ষের বিষ।

শুধু গাউন পরা মেয়েই নয়, কোটপ্যাণ্ট পরা পুরুষও হয়তো পছন্দ করতো না কোলম্যান। তাই, কাজের সময়টুকু ছাড়া অন্য সময় গরদের ধুতি আর পিরান পরতো সে, বাঙালী বাবুদের মতো। গরদের চাদর জড়াতো গায়ে, পায়ে দিতো লাল মখমলের চটি, মখমলের ওপর সোনালি জরির কাজ করা। আর বেতের আরামকেদারায় শরীর এলিয়ে দিয়ে যখন রূপোর গড়গড়ায় তামাক খেতো তখন দূর থেকে দেখে সাহেব বলে মনেই হতো না। মনে হতো কাশ্মীরের যুবরাজ বুঝি বা।

হুকাবরদার হাজির থাকতো সামনেই। টিকে ধরিয়ে তামাক সেজে দেবার কাজের জন্যে মাইনে পেতো মাসে তিন টাকা। রুপোলী জরির কাজ করা নলটায় ঠোঁট ছুঁইয়ে কোলম্যান গড়গড়ায় টান দিতো আয়াস করে। চাকর-বাকর সবাই ছিল পুরুষ। এক শুধু রাধু গয়লানী আসতো দুধ দিতে—টাকায় আঠারো সের দুধ তখন। এই রাধু গয়লানী দুধ দিতে আসতো, কোনোদিন বা তাকে ডেকেই গল্পগুজব করতো কোলম্যান সাহেব। আর তার কাছ থেকেই একদিন শুনল সে কুলীনবধূ সীতার কথা।

সে-সব দিনের কথা বলতে বলতে নিরুর মা বলেছিলেন, তখনকার কেচ্ছা আর কি বলবো। কুলীন বামুনরা বিয়ে করতো বাদশা নবাবদের চেয়ে বেশি। বলে কি একটা হাসির কথা বলেছিলেন।

শুনে হো হো করে হেসেছিলেন নিভামাসী।

আর আমি অঞ্জলিদির টেবিলে রহস্য-কাহিনীর পাতা খুলে রেখে কান বাড়িয়ে শুনেছিলাম।

শুনেছিলাম সীতা কোলম্যানের গল্প।

সীতা কোলম্যান। অমন রূপ নাকি তখনকার দিনে খুব কমই ছিল। কিন্তু মেয়েদের রূপ গুণের কোনো আদরই ছিল না তখন। বাপের টাকা থাকলে তবেই কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পেতো, তা না হলে....

নিভামাসী প্রশ্ন করেছিলেন, সে-যুগে মেয়েরা থাকতো কি করে দিদি ? খারাপ তো হতো না !

শুনে হেসেছিলেন নিরুর মা। বলেছিলেন, এক একজন কুলীন বামুন তো টাকা নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে বিয়ে করে বেড়াতো। তারপর ভুলেই যেতো বিয়ের কথা। তা বলে মেয়েটা তো আর ভুলে যেতে পারে না যে তার বিয়ে হয়েছে ! আর তাও যদি ভোলে তো তার শরীর ভুলবে কেন ?

—তবে ?

নিরুর মা-র কণ্ঠস্বর হঠাৎ কেমন যেন করুণ শুনিয়েছিল। বলেছিলেন, এই বাঁড়ুজ্যেদের

সীতার কথাই ধরো না। স্বামী কোন্ ছোটবেলায় বিয়ে করে চলে গেছে তার মনেও পড়ে না। তারপর ক্রমশ বড় হয়েছে, যৌবন এসেছে—অথচ স্বামী আর কোনোদিন ফিরবে কিনা তার ভরসাও নেই। কি করবে সে ? পাপপুণ্যের কথা ভেবে কতদিন আর নিজের মনকে বোঝাবে সে। শেষকালে হয় কোনো আত্মীয়স্বজন আর নয়তো বাড়ির নায়েব গোমস্তা····

নিভামাসী ছি-ছি করে উঠেছিলেন—তাই কখনো সম্ভব দিদি ? এখন হয়তো হয়, কিন্তু সে-যুগে মেয়েরা সতী থাকতো।

—কেউ কেউ হয়তো সতী থাকতো। তাও হাজারে একটা। স্বামী বেঁচে থাকতে যারা স্বামীর মুখ দেখতেও পাবে না তারা সতী থাকবে কোন দুঃখে! শরীর নেই ?

নিভামাসী হেসে ফেলে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারপর ছেলেপিলে হলে ?

—ছেলেপিলে ? অন্য পুরুষের ওপর মেয়ের আসক্তি দেখেও মেয়ের মা কিছু বলতে পারতো না। কি করে বলবে, বললেও নিষেধ মানবে কেন মেয়ে। তারপর যখন বুঝতে পারতো মেয়ের সর্বনাশ হয়েছে, তখন কি করতো জানো ?

—কি করতো ?

নিরুর মা হেসে বলেছিলেন, রাত্তিরে খিড়কির দরজায় একরাশ এঁটো পাতা ফেলে রাখতো। তারপর পাড়ায় পাড়ায় রটিয়ে আসতো যে জামাই এসেছিল রাত্তিরে, কাজের তাড়ায় ভোরবেলাতেই চলে গেছে।

সীতা কোলম্যান যখন কোলম্যানের গৃহিণী হয়নি তখন নাকি এমনি ভাবেই তাকে সম্মান বাঁচাতে হয়েছিল।

একটি ছেলেও হয়েছিল তার। কিন্তু কয়েক বছর বাদে হঠাৎ একদিন তার স্বামী এসে দেখা দিল। আর সম্ভবত শ্বশুরের কাছ থেকে প্রয়োজন মতো টাকা আদায় করতে না পেরে রাষ্ট্র করে দিল যে সীতার ছেলেটি তাব নয়। টাকা পেলে বলতো ছেলেটা তারই

ফলে একঘরে হতে হল সীতাকে। আর তাই লজ্জায় ক্ষোভে ধুতরোব বীজ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করল সে।

নিরুর মা বলেছিলেন, রাধু গয়লানী দুধ দিতে এসে সে-খবর জানাল কোলম্যান সাহেবকে। আর তা শুনে বন্দুকটা নিয়ে তখনই পালকি তৈরি করতে বলল কোলম্যান সাহেব।

—পালকি ?

নিরুর মা হেসে বলেছিলেন, তাও জানো না। তখন তো আর ফিটন গাড়ি কি মোটর ছিল না, থাকলেও যাবে কি করে, রাস্তা তো ছিল না এমন পাকাপোক্ত। মাঠ ভেঙে যাতায়াত করতে হতো বলে প্রত্যেক সাহেবের নিজের পালকি ছিল, আর ছিল বারোজন করে বেহারা, মাইনে দিতো রেল কোম্পানি।

পালকি বেহারা। দাদু একদিন এমনি গল্প বলতে বলতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন, বেহারা শব্দের উৎপত্তি কি করে হয়েছে জানিস ? bearer থেকে, আর পালকি এসেছে পর্তুগীজ থেকে।

সদাশিব জ্যাঠাও বলতেন, অনুসন্ধান করলে দেখবে সবই কোন না কোন যুগে বিদেশী প্রভাব থেকে এসেছে। ভাষা, আচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, এমন কি মানুষের চিন্তাধারাও। তবু আমরা ঐতিহ্যের মোহে ধর্মের গোঁড়ামিকে আঁকড়ে ধরে আছি, ধর্মের ভয়ে দুঃখ বরণ করে নিই।

তখন সত্যিই বিশ্বাস করতাম, ধর্মের পথে এ-জীবনে সুখ না পেলেও পরজন্মে স্বর্গবাস হয়। অধর্মের পথে—না এ-জন্মে না পরজন্মে। কিন্তু অধর্মের পথেও তো সুখী হয়েছিল এই সীতা কোলম্যান!

আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে সীতাকে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছিল কোলম্যান সাহেব, ডাক্তার দেখিয়ে সারিয়ে তুলেছিল তাকে। তারপর গির্জায় গিয়ে একদিন বিয়ে করেছিল।

অনেকগুলো ছেলেমেয়ে হয়েছিল তাদের, সুখেই কেটেছিল সারা জীবন। কবরস্থানেও পাশাপাশি জায়গা পেয়েছিল মৃত্যুর পর।

এই কবরস্থানে কোলম্যান বংশের ছেলেমেয়েরা ফুলের মালা বিছিয়ে দিয়ে যেতো—তাদের মৃত্যুর দিনে।

সূক্ষ্ম কারুকার্য করা পিতলের এক জোড়া সুন্দর 'ভাস'—একটা ছিল কোলম্যানের কবরের ধারে, আরেকটা সীতা কোলম্যানের পায়ের দিকে।

একদিন হঠাৎ দেখলাম কোটপ্যান্ট পরা একটি সাহেব বাচ্চা আর রঙিন স্কার্ট পরা একটি তেরো চোদ্দ বছরের মেয়ে একরাশ ফুল নিয়ে এসে ভাস সাজাচ্ছে।

যেটুকু ইংরেজি বিদ্যে ছিল তাই কোনোরকমে গুছিয়ে তাদের হঠাৎ প্রশ্ন করলাম, ফুল দিয়ে সাজালে কেন, সীতা কোলম্যান কে হয় তোমাদের ?

ছেলেটি প্রথমে একটু বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই মেয়েটি বললে, ওঁরা আমাদের পূর্বপুরুষ।

মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, জানো আমরা ওঁদের শ্রদ্ধা করি—মিঃ কোলম্যান ইণ্ডিয়ান মেয়ে বিয়ে করেছিলেন তা জানো ?

শুনে যেন খুশি হল দু-জনেই। ছেলেটি বললে, আমার নাম রবার্ট, আর এ আমার বোন ক্লারা। ইয়েস, উই আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্‌স্‌। আমার বাবার কাছে গেলে অনেক গল্প শুনতে পাবে ওদের।

বলেছিলাম, সত্যি ? যাবো তা হলে।

তারপর আলাপও হয়েছিল ওদের সঙ্গে। আরো ঘনিষ্ঠভাবে। কিন্তু সাহস করে কোনোদিন ওদের বাংলোয় ঢুকতে পারিনি। কিন্তু সেদিনই জেনেছিলাম অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মানে কি !

১৩

উপনগরের পশ্চিমে নিউ সেটেলমেণ্টের গা ঘেঁষে যেমন খ্রীস্টানদের কবরস্থান, তেমনি শহরের পূর্বপ্রান্তে ট্রাফিক সেটেলমেণ্টের গা ঘেঁষে ছিল হিন্দুদের শ্মশান। ঝিঁঝিপোকা মারা যাওয়ার পরেও পরীর সঙ্গে কতবার গিয়েছি।

দলের মধ্যে সবচেয়ে ডানপিটে ছিল পরী, সবচেয়ে বিজ্ঞ। পৃথিবীর যেখানে যত গোপন খবর ও-ই যোগাড় করে আনতো। যা অবোধ্য ঠেকতো বুঝিয়ে দিতো। আর আমরা আশ্চর্য হতাম এই ভেবে যে পরীর যখন এত বুদ্ধি, এত জ্ঞান, তখন বছর বছর ফেল করে কেন !

সত্যি, সেই বয়সেই অনেক কিছু বুঝতো ও, জানতো। সুধাদির সম্পর্কে যা বলেছিল, শুনে সেদিন চটে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল, পরীটা কি নোংরা, কি অসভ্য। তবু নিরুর মা যেদিন কোলম্যান সাহেবের গল্প বলছিলেন নিভামাসীকে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে শুনছিলাম, সেদিন সব কথা বুঝিনি, রহস্য রহস্য ঠেকেছিল। তাই মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম পরীকে জিজ্ঞেস করবো।

কত কি তো দুর্বোধ্য মনে হতো তখন !

বাড়ির কাছেই ছিল এক সারি কোয়ার্টার…মেয়েদের ইস্কুলের দিদিমণিরা থাকতো সেখানে।

মেয়েরা যাকে বড় দিদিমণি বলতো সে ছাড়া আর কারও বিয়ে হয়নি শুনতাম।

না, একজনের হয়েছিল। ড্রয়িং দিদিমণির। সুন্দর চেহারা, হাসিখুশি মুখ, সাজগোজ করে থাকতেন সব সময়। যেমন স্বাধীন, তেমনি বেপরোয়া। নিজেই বাজার করতেন চাকর সঙ্গে নিয়ে। একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল তাঁর, বছর সাত আট বয়সের। শুনেছিলাম, বিয়ের বছর কয়েক পরেই নাকি দিদিমণির স্বামী অন্য এক মেয়ের সঙ্গে চলে যান। তারপর উনি ইস্কুলের মাস্টারনী হয়ে আসেন।

শুধু এইটুকু জানতাম! হঠাৎ একদিন শুনলাম, অঞ্জলিদি আর সেজদি হাসাহাসি করছেন।

কি ব্যাপার, না লম্বা ছুটি নিয়েছে ড্রয়িং দিদিমণি।

ছুটি নিয়েছে তার জন্যে এত হাসাহাসির কি আছে। বুঝতে না পেরে পরীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

কানের কাছে মুখ নামিয়ে পরী বলেছিল, ড্রয়িং দিদিমণির ছেলে হবে।

ছেলে হবে? ছেলে হবে কেন?

শুনে হাসল পরী। বললে, তুই একটা ছেলেমানুষ।

তারপর কানে কানে অনেক কথা বলেছিল পরী। শ্মশানের পাঁচিলে বসে পেয়ারা চিবোতে চিবোতে শুনছিলাম তার কথা। জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে ইভকে যা শিখতে হয়েছিল, আর ইভের কাছ থেকে আদমকে, সে রহস্যের ঘর খুলে দিল পরী। নিরুর মা যেদিন সীতা কোলম্যানের গল্প বলছিলেন নিভামাসীকে, আর যা শুনে আমি বুঝতে পারিনি সীতা কেন ধুতরোর বীজ খেয়ে মরতে চেয়েছিল, সে রহস্যের অর্থ বুঝতে পারলাম।

জন্মরহস্যের কপাট খুলে দিয়ে পরী বললে, সব মানুষই এইভাবেই হয়েছে, বুঝলি?

—আমিও? অবিশ্বাস ও অস্বস্তির কণ্ঠে প্রশ্ন করেছিলাম।

—হ্যাঁ, তুইও।

উত্তরটা শুনে স্তম্ভিত ক্রোধে তাকিয়েছিলাম পরীর মুখের দিকে। তারপর হঠাৎ সজোরে একটা চড় বসিয়ে দিয়েছিলাম ওর গালে। অনেকদিন কথাবার্তাই বন্ধ ছিল। ওর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও হয়নি বহুদিন।

তারপর হঠাৎ একদিন সন্ধেবেলায় এসে হাজির হল ও।

বললে, রামাই পণ্ডিতের কাছে যাবি তিমু? রামাই পণ্ডিতের বৌয়ের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার।

—রামাই পণ্ডিত বলে সত্যি আছে কেউ? আমি তো ভেবেছিলাম গল্প।

পরী হেসে বললে, আছে। খড়্গেশ্বরের মন্দিরে থাকে আর অমাবস্যার রাতে শ্মশানে এসে তন্ত্র সাধনা করে।

বলেছিলাম, ভয় করবে না?

—ভয় কিসের। তান্ত্রিক হলেও তো মানুষ।

তান্ত্রিক হলেও তো মানুষ! সত্যিই মানুষ? প্রশ্ন জেগেছিল মনে।

রামাই পণ্ডিত ছিল সিদ্ধপুরুষ। ডাকিনী যোগিনীদের সঙ্গে কথা বলতো, প্রেতাত্মা নামাতে পারতো বাঁশপিড়িতে। শ্মশানে গিয়ে সাধনা করতো অমাবস্যার রাত্তিরে। সেই রামাই পণ্ডিতের দর্শন পাবার জন্যে কি অদম্য ইচ্ছাই না পুষে রেখেছিলাম মনে মনে।

পরীকে তাই জিজ্ঞেস করলাম, সত্যি দেখা পাওয়া যাবে রামাই পণ্ডিতের?

—হ্যাঁ! কিন্তু যেতে হবে অনেক রাত্তিরে, যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে তখন। যেতে পারবি তো, ভয় পাবি না?

—না।

—তা হলে আসবো রাত্তিরে, এসে দরজায় টোকা দেবো, বেরিয়ে আসিস যেন। ঘুমিয়ে পড়বি না তো ?

বললাম, না, ঘুমোবো না।

ঘুম আসেইনি চোখে।

বারান্দার দিকের ঘরটায় শুতাম আমি। ছোট্ট একটা ক্যাম্প-খাট, একটা টেবিল আব একটা বেতের চেয়ার। সেল্‌ফে থাকতো বই আর একটা জলের কুঁজো। এই ছোট্ট ঘরটাই ছিল আমার একক রাজত্ব।

আমাদের বাড়িটার সব জানালাগুলোই ছিল কাঁচের। মাঝে মাঝে পড়ার সময় বন্ধুবান্ধবরা বাইরে থেকে নানা মুখভঙ্গি করে বিরক্ত করতো বলে আমার ঘরের জানালাটায় মা একটা পর্দার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু পরী এসে হয়তো ফিরে যাবে, কিংবা ঘরে অন্য কেউ আছে মনে করে ডাকতে সাহস পাবে না, এই ভেবে পর্দাটা তুলে দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রান্নাঘর থেকে বাসনের টুং-টাং শব্দ আসছিল, তাও থেমে গেল একসময়।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সপাসপ ঝাঁটার শব্দ এল। বুঝলাম মা রান্নাঘর ধুচ্ছে। আর কলতলায় সেজদি হয়তো চায়ের পেয়ালাগুলো নামিয়ে রাখল।

রান্নাঘরের আলোও নিভে গেল একটু পরে। তবু বারান্দায় আলো জ্বলে কেন ? ধীরে ধীরে বিছানা ছেড়ে উঁকি মেরে দেখলাম। তরিতরকারির ঝুড়ি সামনে নিয়ে বঁটিতে বসে একমনে কুটনো কুটছে মা। সকালে তাড়াতাড়ি রান্না করতে হতো বলে মা রাত্তিরেই তরকারি কুটে রাখতো। বাবা ন-টার আগেই ভাত খেয়ে আফিসে বেরিয়ে যেতেন।

নিঃশব্দে পড়ে রইলাম বিছানায়, আর মনে মনে বিরক্ত হলাম মা-র ওপর। কাজ কি আর শেষ হয় না ? সারারাত কি কাজ করবে নাকি। না কি মা-ও টের পেয়েছে, কাউকে কিছু না বলে পরীর সঙ্গে রামাই পণ্ডিতের কাছে যাব ?

একটু পবেই বারান্দার আলোটাও নিভে গেল। কাঠের সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হল।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আর পরক্ষণেই টুক-টুক-টুক-টুক শব্দ কাচের জানালায়।

ফিসফিস করে বললাম, চুপ, যাচ্ছি আমি।

ঘরের দবজা ভেজিয়ে রেখে বেরিয়ে পড়লাম পরীব সঙ্গে।

অন্ধকার নিঝুম বাত। সমস্ত পৃথিবী যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমে ঢুলছে রাস্তার লাইটপোস্টগুলোও।

বাজার পার হয়ে, ইস্কুলেব ময়দান পার হয়ে, ট্রাফিক সেটেলমেণ্ট আর ইঁদার মাঠ পার হয়ে চলেছি দুজনে। চলেছি তো চলেছি, পথ যেন আর শেষ হয় না।

খড়োশ্বরের মন্দিরটা যত কাছে আসে ততই ভয় বাড়তে শুরু করে।

ইঁদার মাঠ পার হয়ে কাশ ঝোপের ভেতর দিয়ে মেঠো রাস্তাটা মিলিয়ে গেছে গাছগাছালির অন্ধকারে। চারদিক নিশ্চুপ, নিঝুম। শুধু ঝিঁঝির একটানা শব্দ বাজে।

এমন সময় গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি নামল হঠাৎ।

সিরসির করে উঠল সারা গা, জলের ফোঁটা লেগে, না ভয়ে, কে জানে।

বললাম, পরী !

—কি রে ভয় করছে ?

—না। বলছিলাম কি, হেঁটে হেঁটে পা ব্যথা হয়ে গেছে, আজ ফিরে গেলে হতো না ?

পরী হাসল। —এতদূরে এসে ফিরে যাবি কি রে। তা হলে আর জীবনে রামাই পণ্ডিতের দর্শন মিলবে না।

—চল তবে। অনিচ্ছার স্বরেই বললাম।

কিন্তু রামাই পণ্ডিতের দর্শন পাবার ইচ্ছে তখন আর একেবারেই নেই।

অথচ এই সিদ্ধপুরুষকে একবার চোখে দেখার জন্যে কত আগ্রহ যে পুষে রেখেছিলাম! রামাই পণ্ডিতের মাদুলী পাবার জন্যে নাকি অনেকে সর্বস্ব দিয়ে দিতেও রাজি। প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলে সে, যে-কোনো রোগ সারিয়ে দিতে পারে, আর মানুষের কাঁধে যখন ভূত নামে তখন একবার রামাই পণ্ডিতকে আনতে পারলেই হল! কিন্তু সবচেয়ে দুরূহ কাজ তার দেখা পাওয়া।

এ হেন লোক নাকি দর্শন দিতে রাজি হয়েছে। কম সৌভাগ্যের কথা! তবু, অন্ধকারে বনঝোপের ভেতর দিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে যেতে যেতে কেমন যেন গা ছমছম করে উঠল।

বললাম, রাস্তায় সাপখোপ নেই তো পরী?

—চুপ! ধমক দিল ও, বললে, রাত্তিরে নাম করতে নেই, তাও জানিস না? আর এত ভয় কিসের, লতায় কাটলে রামাই পণ্ডিতই মন্ত্র পড়ে সারিয়ে তুলবে।

বললাম, মাঝপথে পড়ে থাকলে আর খবর পাবে কি করে, খবর দিলেও কি আসবে নাকি?

—তুই কি ছেলেমানুষ রে! হাসল পরী। বললে, লতায় কেটেছে শুনলেই ছুটে আসতে হয় ওঝাদের, না এলে বিদ্যে ভুলে যায়।

শুনে খানিকটা সাহস বাড়ল। কিন্তু ভয় তো আসলে তা নয়, ভয় রামাই পণ্ডিতের সামনে যাওয়ার।

যখন এসে পৌঁছলাম মন্দিরটার কাছে, কাপড়-চোপড় সব ভিজে গেছে।

ভাঙা মন্দিরটার সামনে স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে ছিল এক রাশ ইঁট, তার ভেতর থেকে গজিয়ে উঠেছে কয়েকটা চারাগাছ। সেই ইঁটের স্তূপ পার হয়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল পরী, তারপর ধীরে ধীরে শিকল নাড়ল।

ভেতর থেকে মেয়েলী প্রশ্ন এল, কে?

পরী চাপা গলায় উত্তর দিলে, আন্নামাসী।

কপাট খুলতেই দেখলাম লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে আন্নামাসী।

কালো কুচকুচে চেহারা, কিন্তু আঁটসাঁট দোহারা গড়ন। লণ্ঠনের আলোয় আন্নামাসীর চেহারা দেখে বোধ হয় লজ্জায় কান লাল হয়ে উঠেছিল। কালো পাথর কুঁদে তৈরি যেন, যেমন স্বাস্থ্য তেমনি মুখ-চোখের গড়ন। কিন্তু শুধু কোমর থেকে হাঁটু অবধি একটা গামছা, শরীরের ওপর দিকটা প্রায় আঢাকা।

চোখ নামিয়ে নিলাম।

পরী কিন্তু একটুও লজ্জা পেল না। আমাকে দেখিয়ে বললে, এ আমার বন্ধু তিমু।

—এসো। বলে লণ্ঠনের আলো দেখিয়ে নিয়ে গেল আন্নামাসী।

পরী ফিসফিস করে বললে, আজ দর্শন পাবো তো?

উত্তর এল, হ্যাঁ। কিন্তু কথা বোলো না, ধ্যানে বসেছেন এখন।

লণ্ঠন হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল আন্নামাসী। দু-পাশে শ্যাওলা, ভাঙা দেয়াল, ইঁট সুরকির আবর্জনা। সরু লম্বা বারান্দা পার হয়ে অন্ধকার, আর অন্ধকারের ওপারে একটা কুপি জ্বলছে।

ভোর হবার আগেই চুপিচুপি ফিরে এসে ভিজে কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়েছিলাম সেদিন। কিন্তু ঘুমোতে পারিনি। আতঙ্কে শিউরে উঠেছিলাম মাঝে মাঝে। দেবদারু গাছের ছায়াটা এমন ভাবে এসে পড়েছিল জানালার গায়ে, মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন একটা ছায়ামূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে পায়ের কাছে।

নিজে দেখেছি, নিজের কানে শুনেছি, তবু কাউকে বলতে পারিনি সে-কথা। অথচ না

বলেও থাকতে পারিনি। রাঙামামীমা, অঞ্জলিদি, আলোবৌ—তিনজনকেই বলেছিলাম শেষ পর্যন্ত। বলেছিলাম, পরী দেখেছে, পরী যায় রামাই পণ্ডিতের কাছে।

নিরুর মামা মারা যাওয়ার মাস কয়েক পরেই একটা ছোট ফুটফুটে ছেলে এসেছিল রাঙামামীমার কোলে। তবু হাসতে দেখতাম না তাঁকে।

রাঙামামীমা কিন্তু প্রথমটা বিশ্বাস করেননি, তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রামাই পণ্ডিতকে ডাকলে আসবে তিমু? টাকা দিলে?

—কেন রাঙামামীমা?

রাঙামামীমার মুখখানা বড় করুণ হয়ে উঠেছিল। বলেছিলেন, আমার যে একটা কথা জানতে ইচ্ছা করে তিমু। তোমার মামার কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে।

—কি কথা?

—সে তুমি বুঝবে না। দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাঙামামীমা বলেছিলেন। তারপর বালিশে মাথা গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন।

কথাটা কি তা বলেছিলেন।—সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার সেদিন ঝগড়া হয়েছিল তিমু। সারাদিন একটা কথাও বলিনি অভিমান করে। তারপরই রাত্তিরে হঠাৎ খবর এল কোথায় যেন কুলিদের ক্যাম্পে কলেরা হয়েছে। অভিমান এমনই জিনিস, উনি যখন পোশাক পরে বেরিয়ে যাচ্ছেন, তখন কি যেন জিজ্ঞেস করলেন, তবু উত্তর দিলাম না। আর তাই মিনিট কয়েক থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন।

—তারপর? উৎকণ্ঠার স্বরে প্রশ্ন করলাম।

—তারপর সেই যে বেরিয়ে গেলেন, আর একটা কথাও বলতে পেলাম না তিমু। কিন্তু, কিন্তু···

—কিন্তু কি রাঙামামীমা?

দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম। আর দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কান্নার স্বর।—ওঁকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো তিমু। সত্যি দুর্ঘটনা, না কি···

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জলে-ভাসা একজোড়া ঠাণ্ডা চোখ তুলে তাকালেন রাঙামামীমা।—ইচ্ছে করেই, জেনেশুনেই···

—কি জেনেশুনেই? কি ইচ্ছে করে?

—আচ্ছা তিমু ভাই, তোমার কি মনে হয়? আত্মহত্যা নয় তো?

আত্মহত্যা? না, না, কক্ষনো না। তা হতে পারে না। রাঙামামীমার ওপর শোধ নেবার জন্যে কেউ কি আত্মহত্যা করতে পারে? কক্ষনো না।

১৪

উপাধ্যায়বাবুদের বাড়ির একটি ছেলে আমাদের ইস্কুলেই পড়তো, আমার চেয়ে এক ক্লাস ওপরে। আমি তখন থার্ড ক্লাসে, আর অজয় পড়তো সেকেণ্ড ক্লাসে।

উপাধ্যায়রা কেউ রেলে চাকরি করতো না। তবু রেল স্কুলে ভর্তি হতে পেরেছিল। ওরা থাকতো মালঞ্চ গ্রামে। মালঞ্চর জমিদার ছিল ওরা, আর গোলবাজারে একটা কাপড়ের দোকানও ছিল।

সদাশিব জ্যাঠা বলতেন, ছিল বামুন, হয়েছে বেনে।

—কিন্তু সিংহবাহিনী তো স্বপ্নে বড়লোক করেছিলেন ওদের? আমি অনুযোগ

করেছিলাম।

—হ্যাঁ স্বপ্নেই বটে ; হেসেছিলেন সদাশিব জ্যাঠা।

আমরাও জানতাম অবশ্য, ও সবই গল্প। আসলে লোভে পড়ে সিংহবাহিনীর বুকের ওপর দিয়ে রেল চালিয়ে দিয়েছিল ওরা।

হিজলীর দিকে যেখানে রেললাইনটা বাঁক ঘুরেছে, সে জায়গাটাব নাম ছিল ট্যাংরা।

ট্যাংরার হাটে বিক্রি হতো ছাগল মোষ মুরগী। তিরিশ চল্লিশ মাইল দূর থেকে খদ্দের আসতো সে-হাটে। উপাধ্যায়রা তখন ছিল রীতিমত গরীব। সিংহবাহিনীর একটা মন্দির ছিল তাদের, ট্যাংরা হাটের কাছেই। আর ছিল বিঘে কয়েক জমি।

কোনরকমে দিন কাটাতো, দুবেলা খেতে পেতো কি পেতো না। এমন সময় ঐ দিকেই লাইন খোলবার জন্যে জমি কিনতে শুরু করল গভর্নমেণ্ট। সরকারী টাকায় কিনে, জমিগুলো সরকার বিনা দামেই দান করতো কোম্পানিকে। আর যাদের ওপর ভার ছিল জমি নিশানা করার, তাদের চোখেও পড়েনি, কোথায় একটা মাটির ঘরে ছোট্ট একটা সিংহবাহিনীর মূর্তি আছে। টিমটিম করে একটা প্রদীপ জ্বলে কি জ্বলে না।

সেই জমির ওপর দিয়ে লাইন নিয়ে যাবে শুনে রুখে দাঁড়াল উপাধ্যায়রা। সিংহবাহিনীর জমির ওপর দিয়ে যাবে রেলের লাইন। কক্ষনো না। আসলে গভর্নমেণ্টের এক কর্মচারীই ওদের বুদ্ধি দিয়েছিল।

হয়তো কোন কর্মচারীর দোষেই ঠাকুরবাড়িটা চোখে পড়েনি, কিন্তু তখন আর উপায়ও নেই। আশেপাশের জমিগুলো এমন ভাবে কেনা হয়েছে যে ইচ্ছে থাকলেও অন্যদিকে লাইন ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। লক্ষ লক্ষ টাকা লোকসান। অথচ দেবমন্দিরের ওপর দিয়ে লাইন নিয়ে যাওয়ার সাহসও হয় না কোম্পানির। হিন্দুধর্ম যে কি তার পরিচয় বহুবার পেয়েছে তারা। বিশেষ করে সাতান্ন সালের বিদ্রোহের পর থেকে মন্দির মসজিদের ধারে-কাছেও যেতে চাইতো না।

কিন্তু সামান্য একজন কর্মচারীর ভুলে এমন হয়েছে বললে তো সাধারণ লোক বুঝবে না।

উপাধ্যায়রাও হুমকি দিলে, জবরদস্তি করে কোম্পানি যদি জমি নিয়ে লাইন বসায় তো রাতারাতি লাইন উপড়ে ফেলে দেওয়া হবে। মামলা করবে।

'জীবন দেবো তবু সিংহবাহিনীর অমর্যাদা হতে দেবো না', উপাধ্যায়রা বললে। আশেপাশের গ্রামের লোকরাও লাঠি শরকি হাতে নিয়ে এসে জটলা করলে : সিংহবাহিনী আমাদের, আমরা রক্ষা করবো তাকে।

খুনোখুনি মারামারিও নাকি হয়েছিল। গ্রামের কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল পুলিস। মামলা উঠল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য! উপাধ্যায়রা কোনো অনুযোগ করল না। এমন কি, ম্যাজিস্ট্রেট যখন প্রশ্ন করলেন, সিংহবাহিনীর মূর্তি ছিল কি না ওখানে, পুজো হতো কি না, তখন উপাধ্যায়রা স্রেফ অস্বীকার করলে।

বললে, না হুজুর। দেবমূর্তি ওখানে কোনদিনই ছিল না।

—ছিল না? বিস্মিত হলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব।

—না হুজুর। সিংহবাহিনী স্বপ্ন দিয়েছিলেন অনেক আগেই, তাই ওখান থেকে সরিয়ে এনে মালঞ্চয় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম।

মামলা টিকল না, তাই যেখানে দেবমন্দির ছিল, তার ওপর দিয়েই রেললাইন পাতা হল।

কিন্তু যিনি সিংহবাহিনীকে রক্ষা করবার জন্যে জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলেন, তিনি এমন

মিথ্যার আশ্রয় নিলেন কেন ; জানতে বাকি রইল না কারও।

কোম্পানির কাছ থেকে প্রচুর টাকা নিয়ে ধর্ম জলাঞ্জলি না দিলে মালঞ্চ গ্রামে অত জমি কিনল কি করে উপাধ্যায়রা ? অতবড় বাড়িই বা বানালো কি করে ?

সদাশিব জ্যাঠা বলেছিলেন, উপাধ্যায়দের ছেলেরা এখন বলে, স্বপ্নে আদেশ পেয়ে নাকি সিংহবাহিনীকে মালঞ্চয় সরিয়ে এনেছিল। সব মিথ্যে, ধর্ম বিক্রি করেছিল ওরা।

ধর্ম বিক্রি করা টাকায় বড়োলোক হলেও উপাধ্যায়ের ছেলে অজয়ের অহংকারের সীমা ছিল না।

বলতো, শহরের বেশির ভাগ লোক আমাদের কাছে বিকিয়ে আছে, জানিস্ তিমু ?

—কেন ?

—কেন আর ? সবাই তো ধারে কাপড় কেনে। তিরিশ টাকা মাইনে পায় তো পুজোয় তিনশো টাকার শাড়ি কেনে।

বিস্মিত হয়ে বলতাম, শোধ দেবে কি করে ?

অজয় হাসতো।—কিছু কিছু শোধ দেয়, কিন্তু যত না শোধ দেয় ধার বেড়ে যায় তার বেশি। তারপর রিটায়ার করার সময় যা প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড আর গ্র্যাচুইটি পায় সব ধার শোধ করতেই যায়।

—তা হলে বুড়ো বয়সে খায় কি ?

—কি আবার খাবে ? ছেলের রোজগারে, নয় তো আবার চাকরি খোঁজে দোকানে-টোকানে !

শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। মানুষ এমন বেহিসেবী হতে পারে !

মা তাই ছড়া কাটতেন, ধার দেনা কর্জ, এই নিয়ে গর্ব !

আর আবিদ হোসেন বলেছিল, একেই সাহেবলোক বিজনেস বলে ছোটাসাব। রুপেয়া দিয়ে সারা জিন্দেগী কাজ করাবে, কিন্তু বুড়ো বয়সে কাজ ছেড়ে যেন এক কড়িও নিয়ে যেতে না পারে।

ঘনঘন যাতায়াতের ফলে আবিদ হোসেন আমাকে বোধহয় একটু স্নেহের চোখেই দেখতো। বিশেষ করে সেই হকি ম্যাচের দিন থেকে।

আমাদের ইস্কুলটার নাম ছিল ইণ্ডিয়ান আর দক্ষিণ পাড়ার সাহেবদের ছেলেমেয়েদের জন্যে ইউরোপীয়ান হাই স্কুল। দুটো ইস্কুলের মধ্যে সেদিন ছিল হকি ম্যাচ।

খেলায় হেরে গিয়েছিলাম আমরা। আর হকি স্টিক হাতে নিয়ে যখন দু'তিনজন বন্ধু ফিরছি সেই সময় দেখি জনকয়েক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছোকরা হাসাহাসি করে কি যেন বলছে।

প্রথমটা উপেক্ষা করেছিলাম আমরা। দ্বিতীয়বার ঠাট্টাটা কানে আসতেই ঘুরে দাঁড়ালাম।

ফিরিঙ্গি ছোকরাগুলোও যেন ঝগড়া করবার জন্যে তৈরি ছিল। হঠাৎ চারপাশ ঘিরে দাঁড়াল তারা।

বেশ অপমানসূচক কি যেন বললে। আর রাগের মাথাতেই হোক বা আত্মরক্ষার জন্যেই হোক, এলোপাতাড়ি হকি স্টিকটা দমাদম ঘোরাতে শুরু করলাম।

আমার গায়েও যে দু-চার ঘা এসে না পড়ল তা নয়। কিন্তু হঠাৎ ক্যাঁচ করে একটা শব্দ হল। আর ছোকরাগুলো মুহূর্তের মধ্যে ছুটে পালাল।

আবিদ হোসেন গাড়ির দরোজাটা খুলে দিয়ে বললে, উঠে এসো ছোটাসাব। বন্ধুদেরও ডাকল।

তারপর পিঠে হাত বুলিয়ে বললে, সাবাস !

এই ঘটনার পর থেকেই খাতির বেড়ে গেল আমাদের। একেবারে অন্দরমহলের দোতলার ঘরে নিয়ে গেল আমাদের।

চোখ ঝলসে গেল ঐশ্বর্যের ঝলসানিতে। সুন্দর কারুকার্য করা খাটের বাজুতে রুপোর পাত মোড়া, রুপোর ওপর নানারঙের মীনা। মেঝেতে নরম কাশ্মীরী কার্পেট। দেয়ালের চারদিকে বড় বড় ছবি।

কিন্তু ছবিগুলোর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিতে হল। ছি ছি, এই ছবি কেউ বাড়িতে টাঙিয়ে রাখতে পারে?

বিবসনা নারীর নানা ভঙ্গিমার ছবি।

বিস্মিত না হয়ে পারিনি। যে-বাড়ির মেয়েরা বোরখায় ঢাকা থাকে সেই বাড়িতেই কিনা এই ছবি?

বিজু আর করুণা একেবারে থ। মুখে কথা নেই।

আবিদ হোসেন বললে, বোধহয় আমার অস্বস্তির কারণ বুঝতে পেরেই বললে, এ সব তসবির কার জানো ছোটাসাব? এ ছবি আমার বাঁদীদের।

চমকে চোখ তুললাম।

আবিদ হোসেন বললে, সারা দুনিয়ায় খুবসুরত মেয়ে দেখে দেখে বাঁদী এনেছি আমি। আর হিন্দুস্থানের নামকরা আর্টিস্ট এই ছবিগুলো এঁকেছে।

তারপর একটা ছবির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, এ ছিল পেশোয়ারী গরীব শেখের মেয়ে, দু-বছর বাদেই মারা গেছে।

আরেকটার দিকে।—এ ছিলো সিন্ধী মুসলমান। উটের দুধ বেচতে আসতো ওর চাচা।

আবিদ হোসেন হাসল।—আমি তখন থাকতাম গুজরাতের ওখা বন্দরে. হিন্দুস্থানের নক্‌শায় দেখবে মেয়েদের বুকের মতো একটা দেশ, তার ডগায় এই বন্দর। গাধায় চেপে একটা লোক আসতো সেখানে উটের দুধ বেচতে। ইয়া পহেলবান চেহারা, লাল মখমলের ওপর জরির কাজ করা কুর্তা আর পায়জামা, মাথায় লাল ফেজ। নবাবজাদার মতো সুরত। তার সঙ্গে একদিন একটা লড়কী এল। পঁচিশ মোহর দিয়ে তাকে নিয়ে নিলাম তার চাচার কাছ থেকে।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল আবিদ হোসেন। আমার মুখ-চোখের ভাব দেখে হয়তো ভাবলে আমি তার কথা বিশ্বাস করছি না।

হঠাৎ ডাক ছাড়লে, এ বান্দী!

একটা ঝি এসে কুর্নিস করে দাঁড়াল।

আবিদ হোসেন বললে, ফুলজান বিবিকে ডাক, আর ফিরোজাকে, আর রোশেনারাকে।

সেলাম করে বাঁদী চলে গেল, আর খানিক পরেই বোরখায় ঢাকা তিনজন বিবি না বাঁদী ঘরে ঢুকতে গিয়ে বোধহয় আমাকে দেখে চৌকাঠের কাছে থমকে এ ওর গায়ে ঢলে পড়ল।

আবিদ হোসেন ধমক ছাড়ল—ভিতর আও। আরে এ লোগ তো দুধকি বাচ্চা, শরম কাহে!

তিনজনেই এবার ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকল এবং বেশ বোঝা গেল থরথর করে কাঁপছে ওরা।

আবিদ হোসেনের হুকুমে বোরখা খুলে ফেলতে হল তাদের। আর একে একে আমার সামনে এসে দাঁড়াল তারা।

একজনের ঘাগরা ধরে টানলে আবিদ হোসেন। হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে…

গা ঘিন-ঘিন করে উঠল আমার! বাইরের লোকের সামনে মেয়েদের সঙ্গে কেউ এমন ব্যবহার করতে পারে!

কিন্তু একদিকে যেমন অস্বস্তি বোধ করলাম, তেমনি সেই প্রথম বোধহয় আবিষ্কার করলাম নারীদেহের মধ্যে কি এক অদ্ভুত রহস্য, কি এক অদম্য আকর্ষণ।

যৌবনের প্রলুব্ধি কাকে বলে সে-সম্পর্কে কানে কানে শোনার জ্ঞানটুকুই ছিল, সেই প্রথম সমস্ত শরীরে যেন তার উত্তাপ অনুভব করলাম, রক্তের স্রোতে কি এক অবোধ্য উন্মাদনা।

আবিদ হোসেন তাদের বিদায় দিয়ে বললে, দু-পেয়ালা চা নিয়ে এসো।

তারা চলে গেল, কিন্তু রহস্যপুরীর এক আশ্চর্য রূপের ঝলক যেন তখন রেশ বাজিয়ে চলেছে।

রূপ। সৌন্দর্য। যৌবন।

রাঙামামীমার হাসিখুশি রঙ, ঝলমল রূপ দেখে একদিন ভাল লাগতো, তাঁর ম্লান বিষণ্ণ বৈধব্যের রূপ দেখেও ভক্তিতে নুয়ে পড়তো মাথা। অঞ্জলিদির রূপ যেন ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে কাছে টানতো। সুধাদির রূপ দেখে মনে হতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে থাকি।

কিন্তু ফুলজান বিবির এ সৌন্দর্য যেন ভিন্ন রূপ। এ সৌন্দর্য কোথায় যেন লোভের আগুন জ্বালিয়ে সারা শরীরে জ্বালা ধরায়।

ফুলের পাপড়ি নয়, আগুনের শিখা।

একটু পরেই দু-পেয়ালা চা নিয়ে এল ফুলজান বিবি।

চায়ের কাপের দিকে তাকিয়েই আবিদ হোসেন হাসতে হাসতে বললে, দুধ কম কেন চায়ে ?

ফিক করে হেসে ফেলে ফুলজান বললে, সিরাজুল দুধ নিয়ে ফেরেনি এখনো।

হঠাৎ একটা কুৎসিত রসিকতা করলে আবিদ হোসেন।

আর তা শুনে লজ্জিত বা ক্রুদ্ধ হওয়া তো দূরের কথা, আঠারো বিশ বছর বয়সেব রূপসী মেয়ে ফুলজান বিবি খিলখিল করে হেসে পালিয়ে গেল।

সব কথা সেদিনই খুলে বলেছিলাম মুস্তাফাকে। বলেছিলাম, বাব্বা সাহেব একটা রীতিমত ছোটলোক।

মুস্তাফা গম্ভীর হয়ে বলেছিল, বাব্বা সাহেবের বাড়িতে আর কোনদিন যাস্ না তিমু। তুই আর কি দেখেছিস, আমি তার চেয়েও বেশি দেখেছি, তারপর থেকে যাই না।

—আর কি ?

—দিনের পর দিন এক একজনকে নিয়ে গিয়ে বিবিদের সামনে রসিকতা করে। তারপর···

—তারপর ? বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

মুস্তাফা গম্ভীর হয়ে বলেছিল, সে জেনে তোর দরকার নেই, কিন্তু কোনদিন আর যাস্ না তিমু !

যাইনি।

কিন্তু যৌবনের হাতছানিকে অগ্রাহ্য করি কি করে ?

তখন থেকেই বোধহয় মেয়েদের শরীরের ভাঁজে ভাঁজে কি এক লোভানি আবিষ্কার করতে শুরু করলাম। যে মনের গোপন কথা এতদিন নিজের কাছেই অজানা ছিল, সেখানে গুঞ্জন তুলল নতুন এক সুর।

প্রেমের পিপাসা, না যৌবনের জ্যোতি !

যৌবনের শরীরে প্রথম যে মেয়ে ঘুঙুরের বোল ফোটাল তার নাম মীরা।

যখনকার কথা বলছি আমি তখন আর নেহাত ছেলেমানুষ নই। কিন্তু কলকাতা শহরের তুলনায় সে উপনিবেশটা তখনও রীতিমত ছেলেমানুষ। ইলেকট্রিক আলো অবশ্য ছিল, কল খুললেই জল পেতাম, কিন্তু কলোনির বাসিন্দারা ছিল আধা শহুরে আধা গ্রাম্য।

ধুলো-ওড়া লাল মোরাম ঢালা রাস্তার দুপাশে ছিল কোয়ার্টারের রেঞ্জ। পয়েন্টিং করা অর্থাৎ ইঁট বের করা দেয়ালের দু-কুঠুরি বা তিন কুঠরির একই ডিজাইনের গায়ে-গা-লাগানো কোয়ার্টারের সারি, আর তার সামনে একফালি করে বাগান। কেউ সেটা ঘিরেছে বাঁশের বাতা দিয়ে, কেউ বা কারখানা থেকে সাফাই করা কাঁটা তার, এক্সপ্যাণ্ডেড মেটাল বা করোগেটেড টিন দিয়ে। বাড়ির সামনে যেমন বাগান, পিছনে তেমনি গোয়াল। গোয়াল নয় ঠিক, খিড়কি ঘর। অর্থাৎ পাঞ্জাবীদের খিড়কির ঘরে থাকতো মোষ, হিন্দুস্থানীদের গরু, আর অন্যান্য প্রদেশবাসীরা কেউ পুষতো ছাগল, কেউ মুরগী। নিরামিষাশীদের ক্ষেত্রে ওটা ছিল যাঁতা-ঘর বা অন্য কিছু। শুধু বাঙালীদের এ-সব বালাই ছিল না, এ ঘরটা তারা ব্যবহার করতো স্রেফ ছেলেমেয়েদের পড়ার ঘর হিসেবে।

গরমের দিনে এই টিনের শেডের তলায় হাত পাখা নাড়তে নাড়তে অঙ্ক কষা যে কি দুঃসহ ব্যাপার তা আমরা আটটি ছাত্র বেশ ভাল রকম বুঝতাম। আমরা আটজনই ছিলাম ফার্স্ট ক্লাসের ছাত্র, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছি। আর আমাদের এই ক-জনকে তৈরি করার ভার ছিল বিকাশবাবুর ওপর।

বিকাশবাবু ছিলেন আমাদের ইস্কুলের থার্ড মাস্টার। ইংরেজি আর অঙ্ক ছাড়া আর কোনো বিষয়কে তিনি বিশেষ শিক্ষণীয় মনে করতেন না। গলাবন্ধ একটা খদ্দরের কোট পরতেন, কিন্তু কোটের নীচে শার্ট তো দূরের কথা, গেঞ্জিও পরতেন না। আর আমরা আশ্চর্য হতাম এই দেখে যে বিকাশবাবু গলাবন্ধ কোট পরেও গরমের দিনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়িয়ে যেতেন আমাদের, এতটুকু অস্বস্তি বোধ করতেন না। এ জন্যে তাঁর ওপর শ্রদ্ধাও কম ছিল না। শ্রদ্ধা হতো অবশ্য আরেকটা কারণে। বিকাশবাবু ইস্কুলে যা মাইনে পেতেন, টিউশনি করে তার চেয়ে বেশি রোজগার করতেন। তাই অন্যান্য মাস্টারমশাইদের চেয়ে বিকাশবাবু অনেক বেশি সম্মান পেতেন কলোনির সকলের কাছ থেকেই। আর ওপর-ক্লাসের ছেলেরা প্রাইভেট টিউটর হিসাবে বিকাশবাবুকেই বেশি পছন্দ করতো। অথচ অমন কড়া শাসন আর কোনো মাস্টারমশাইদের ছিল না।

তা হলে ছাত্ররা তাঁকে এত পছন্দ করতো কেন ? কেন, তার জবাবটা অত সহজ নয়। কিংবা এতই সহজ যে বলতে সঙ্কোচ হয়।

একদিন ইস্কুলে ইংরেজি পড়াতে পড়াতে বিকাশবাবু উপদেশ দিয়েছিলেন, কখনো খালি গায়ে বাড়ির বাইরে শোবে না, আর দিনের বেলায় ঘণ্টায় অন্তত দু-বার করে জল খাবে। এতে নাকি স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

উপদেশের প্রথম অংশটা কেউই মনে রাখেনি। কারণ গরমের দিনে রেল কোম্পানির তৈরি অন্ধকূপগুলোয় রাত কাটানো প্রায় অসম্ভব ছিল, তাই মেয়ে পুরুষ সকলেই বাগানে খাটিয়া পেতে মশারি টাঙিয়ে শুতো, সেটাই রেওয়াজ ছিল। কিন্তু উপদেশের শেষ অংশটা পুরোপুরি মেনে চলতাম আমরা আটটি বন্ধু, যাদের প্রাইভেট টিউটর ছিলেন বিকাশবাবু।

এ ব্যাপারে বলতে গেলে আমরা রীতিমত পরস্পরের সঙ্গে রেষারেষি করে চলতাম।

কারণ—কারণটা পরেই বলছি।

বলেছি তো, আমাদের ঐ রেল কলোনিটা ছিল দু-ভাগে ভাগ করা, উত্তরপাড়া আর দক্ষিণপাড়া। পুব পশ্চিমে রেললাইন, রেললাইনের দক্ষিণে ইঞ্জিন শেড পার হয়ে সাহেব পাড়া অর্থাৎ অফিসারদের বাংলো। আর উত্তরে ওয়েস্ট কেবিন পার হয়ে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে গোলবাজার। এই গোলবাজারে ঝি চাকর রাখার রেওয়াজ ছিল না। বাড়ির কর্তা গিন্নী ছেলেপিলেরাই সব কাজ করতো, দু-চারজন যারা একটু ভদ্রগোছের মাইনে পেতো তাদের ঘরোয়া কাজে সহায়তা করতো মধ্যপ্রদেশের রাউত আর রাউতাইনরা। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া এসব কাজ ছিল এই রাউতাইনদেরই একচেটে।

বিকাশবাবুর বাড়িতেও এমনি একটি রাউতাইন ঝি কাজ করতো বটে, কিন্তু জলের কুঁজো ছোঁয়ার এক্তিয়ার ছিল না তার। তাই আমাদের যখন তেষ্টায় গলা শুকিয়ে আসতো তখন আমরা এই খিড়কি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পিছনের দরজায় টোকা দিতাম। আর মীরার কান ছিল এত সজাগ যে একবার টোকা দিলেই হল, এক মুখ হাসি নিয়ে কপাট খুলে দিয়েই চোখ গোল-গোল করে ধমক দিত।—আবার? কি চাই আবার?

বলতাম, এক গ্লাস জল দাও মীরা।

ধমক দিতে গিয়ে হেসে ফেলতো ও। বলতো, পড়ায় ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে, না? যাও পড়গে যাও, জল দিয়ে আসছি আমি।

তবু দাঁড়িয়ে আছি দেখে কাঁসার গ্লাসে করে এক গ্লাস জল এনে দিত ও। এবং সবটুকু জল ঢক-ঢক করে গিলে প্রমাণ করতে হতো যে সত্যিই তেষ্টা পেয়েছিল।

মীরা বয়সে আমাদের হয়তো সমবয়সী ছিল কিংবা কয়েক মাসের ছোট। আর আমরা ছিলাম ঠিক সেই বয়সের, যখন যৌবনকে মনে হয় রহস্যময়, মেয়েদের সম্পর্কে থাকে অসীম কৌতূহল।

মীরার ওপর আমাদের যত না ছিল আকর্ষণ, তার চেয়ে বেশি ছিল আগ্রহ। সহজ কথায় বলতে গেলে, ওকে আমাদের ভাল লাগত, এমন কি ওর শাসন মানতেও।

মনে ভাবতাম, যেমন বাপ তেমনি মেয়ে বটে।

বলতাম, বড় হয়ে তুমি আর যাই হও, ভুলেও যেন ইস্কুলের মাস্টারনী হয়ো না মীরা।

শুনে হাসতো মীরা। আব বিকাশবাবুর গলার স্বব শুনতে পেলেই ও যেমন সরে পড়তো টুক করে, আমিও তেমনি চট্ করে ফিরে আসতাম খিড়কিব ঘরে।

সত্যি, বিকাশবাবুকে কি ভযটাই পেতাম আমরা। এমন বদমেজাজী রাগী লোক আমি কখনও দেখিনি। অঙ্কের উত্তর না মিললেই উড্‌পেন্সিলটা ঠকাস্ ঠকাস্ কবে ছাত্রের মাথায় ঠুকে আবার কষতে বলতেন। আর ইস্কুলে পিছনের বেঞ্চিতে বসে কেউ হয়তো পাশের কারও সঙ্গে একটা কথা বলেছে, অমনি চাবির থোকাটা ছুঁড়ে মারতেন বিকাশবাবু। আর এর চেয়েও তীব্র শাস্তি ছিল হাঁটুতে কাঠের ডাস্টার ঠোকা। সব সময়ে গম্ভীর মুখ, সব সময়েই পড়ার কথা! সেই রাগা মাস্টারেব মতো। তাই হঠাৎ কোনদিন যদি বিকাশবাবু অন্য কোন গল্পগুজব শুরু করতেন, কিংবা যেদিন মুহূর্তের জন্যে মুখে হাসি দেখা দিত তাঁর, সেদিন আনন্দে বুক ভরে যেতো আমাদের, মনে হতো বিকাশবাবুর মতো মাস্টার তো দূরের কথা, মানুষই হয় না।

বাড়িতে কিন্তু বিকাশবাবুর যত না কড়া শাসন ছিল, তাব চেয়ে বেশি ছিল মাসীমার! মাসীমাই বলতাম আমরা মীরার মাকে। এমনি বেশ হাসি মুখে কথা বলতেন, আদর আপ্যায়ন কবতেন, যেদিন রূপনারায়ণের ইলিশ মাছ আসতো, কাঁসার রেকাবী করে এনে সামনে বসে খাওয়াতেন। কিন্তু মীরাকে বকুনি দিতেন উঠতে বসতে, সামান্য একটু কিছু ভুল চুক হয়তো করেছে বেচাবী, অমনি চিৎকার শুরু করতেন। সংসারের প্রায় সব কাজেরই ভার ছিল মীরার ওপর, ভোরবেলায় উঠে উনোন ধরানো থেকে রাত্তিরে মশারি টাঙানো পর্যন্ত। খেটে খেটে হয়বান হতো মেয়েটা, অথচ বকুনির মধ্যে ছিল একটি মাত্র খোঁচা, যা প্রতিনিয়ত মীরাকে মনে পড়িয়ে দিত যে তার বিয়ের বয়েস হয়েছে, তাকেও পরের ঘর করতে যেতে হবে, আর তখন নাকি এ সব ভুলচুক ক্ষমা করবে না কেউ।

এইজন্যেই হয়তো মাকে এড়িয়ে চলতো মীরা। কিন্তু বিকাশবাবুর সুখ সুবিধের দিকে সব সময়েই চোখ রাখতো সে, তাঁর যত্নে কোথাও ত্রুটি রাখতো না। বিকাশবাবু অবশ্য একটু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, কথাবার্তা কমই বলতেন, তাই মেয়ের সঙ্গে কথা বলতেও দেখতাম না তাঁকে।

এসব দেখেশুনে মন মেজাজ খারাপ হয়ে যেতো আমাদের, মায়া হতো, দুঃখ বোধ করতাম মীরার জন্যে। কিন্তু এমনই আশ্চর্য, মায়ের বকুনি বা বাপের অবহেলা কোনো কিছুই গায়ে মাখতো না মীরা। বকুনি শুনেও যেমন মুখ টিপে টিপে হাসতো, বাবার হাবভাব দেখেও তেমনি। আমরা বিস্মিত হতাম, ভাবতাম, এ-হেন মা-বাবার জন্যে যার শরীরে এতখানি মায়া, এত ভালবাসা, না জানি তার মন কোন ধাতুতে গড়া।

তখন পর্যন্ত মীরার জীবনের একটা দিকই শুধু দেখেছিলাম, অন্য দিকটা দেখতে পেলাম হঠাৎ একদিন।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও আমরা আটজন ছাত্র দল বেঁধে গেলাম বইখাতা বগলে নিয়ে, গিয়ে বসলাম বিকাশবাবুর খিড়কির ঘরে। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত বিকাশবাবুর দেখা পেলাম না। যখন দেখা পেলাম, তাঁকে আর চেনাই যায় না। যেন মস্ত বড় একটা ঝড় বয়ে গেছে তাঁর ওপর দিয়ে, মুখে চোখে দুঃখের, দুশ্চিন্তার ছাপ।

বিকাশবাবু ধীরে ধীরে এলেন, এসে বসলেন সামনেব চেয়ারে। বললেন, আজ যাও তোমরা, আজ পড়াবো না। বলে উঠে গেলেন।

নানারকম আলোচনা করতে করতে ফিরে এলাম আমরা।

১৫

—জানো আলোবৌ, আমি রামাই পণ্ডিতকে দেখেছি। লতায় কাটলে বিষ ঝাড়তে পারে রামাই পণ্ডিত, প্রেতাত্মার সঙ্গে কথা বলতে পারে, মন্ত্র পড়ে যা খুশি করতে পারে, রোগ সারাতে পারে।

আলোবৌ উদ্‌গ্রীব হয়ে শুনল সব। শুনে বললে, হাঁ রে, বশীকরণ মাদুলী দিতে পারে রামাই পণ্ডিত?

—বশীকরণ? সে আবার কি?

আলোবৌ খিলখিল করে হেসে বললে, হ্যাঁ ছেলে, এমন মরদ হয়ে উঠেছিস, গলার স্বব পর্যন্ত বদলে গেছে, আর বশীকরণ জানিস না?

মুখ কাচুমাচু করে বললাম, কই না তো?

আলোবৌ হেসে বললে, বশীকরণ মাদুলী থাকলে যাকে চাওয়া যায় তাকেই বশ করা যায়। যাকে ভালবাসি সে যদি ফিরেও না তাকায়, বশীকরণ করলেই সে কাছে আসবে, বশ হবে।

ভয় পেয়ে বললাম, তারপর যদি ছাড়তে না চায়, সব সময়ে যদি সঙ্গে সঙ্গে থাকে?

—থাকলেই বা। আলোবৌ আবার ফিক করে হাসল।

বললাম, বাঃ রে, থাকলেই বা! সবাই তো জানতে পারবে তা হলে, বাবা মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেবে না।

আলোবৌ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বললে, কিন্তু আমার যে ভীষণ দরকার তিমু, দে না যোগাড় করে।

বললাম, কেন! তোমার আবার কি দরকার?

যা বলল আলোবৌ, শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এও কি সম্ভব? মানুষ আর পশুর মধ্যে কি কোন পার্থক্য নেই?

পান্ধাপুলির কাজ করতো তখন আলোবৌ, কেন করতো তা জানতাম না।

কারখানায় কাজ করতো মঙ্গল। কিন্তু যা মাইনে পেতো তা নাকি ধনীরামের মদের

ভাঁটিতে শেষ করে তবে বাড়ি ফিরতো। আর ফিরে এসে অত্যাচার শুরু করতো আলোবৌয়ের ওপর। সারা মাস ঘুঁটে বিক্রির টাকায় চলতো না, তাই শেষ পর্যন্ত চাকরি নিতে হয়েছিল আলোবৌকে।

সাহেবদের বাংলোর বারান্দায় ছিলো টানা-পাখা, আর ঘরের ভেতর ইলেকট্রিকের পাখা। সাহেব মেমরা যখন বারান্দায় বসে গল্পগুজব করতো, চা খেতো, তখন আলোবৌয়ের কাজ ছিল এক কোণে বসে বসে পুলির দড়ি টানা।

বললাম, কিন্তু বশীকরণ নিয়ে কি করবে ?

আলোবৌ দুঃখের হাসি হাসলে।—কি বলবো তোকে তিমু, একটা ছত্রিশগড়িয়া মেয়েকে নিয়ে আছে মঙ্গলটা।

ছত্রিশগড়িয়া মেয়ে। অর্থাৎ রাউতাইন।

শহরে এই রাউত আর রাইতাইন ছিল কয়েক হাজার।

তাদের মেয়েপুরুষ অনেকেই কারখানায় কুলির কাজ করতো, অনেকের আবার ছিল সকাল বিকেল দু-বেলা বাসন মাজার ঝিয়ের কাজ। আর ছুটির দিনে একটা ঝুড়ি নিয়ে গিয়ে দাঁড়াত বাজারে। মুটের কাজ করতো তারা। আমরা বলতাম, বোঝাওয়ালী। পুরুষগুলোর মধ্যে যারা কারখানায় কাজ পেতো না তাদের রোজগার ছিল বাঁকে করে জলের 'ভার' বওয়া।

একটা বাঁশের দু-প্রান্তে দড়িতে বাঁধা দুটো কেরোসিনের টিন। রাস্তার কল থেকে তিন নম্বর কোয়ার্টারে জল তুলে দিত তারা—টাকায় চার ভার। অর্থাৎ সকাল বিকেল দু-বেলা আট টিন জল তুলে দিলে মাসে একটা টাকা পেতো। আর বাজার থেকে দু-মাইল পথ মোট বয়ে বোঝাওয়ালীরা পেতো দু-পয়সা।

অভাব ছিল বলেই স্বভাবও নষ্ট হয়েছিল।

চার পয়সার ধনের শাক কিনেও অনেকে বোঝাওয়ালী ডাকতো কেন, তা প্রথম প্রথম বুঝতাম না। বুঝতাম না মুটে ডাকতে হলে বোঝাওয়ালীর মুখ বাছবার প্রয়োজন। আর তা দেখে ছেলেছোকরারা কেনই বা হাসাহাসি করে।

ছত্রিশগড়বাসীদের সংখ্যা এত বেশি হবে না কেন ! প্রথমে এই রেল কোম্পানির নামই তো ছিল নাগপুর-ছত্রিশগড় রেলওয়ে। নাগপুরে ছিল কোম্পানির হেড অফিস। এদিকে ছত্রিশগড় রেলওয়ে, আর মাদ্রাজের দিকে যে রেল ছিল তার নাম ইস্ট-কোস্ট রেলওয়ে। বিলাসপুর থেকে একটা লাইন, খুর্দা রোড থেকে একটা, কোলিয়ারি অঞ্চলের দিকে আদ্রা পর্যন্ত আর এদিকে হাওড়া—চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল লাইন। মাঝখানে কিছুদিন শুধু কোলাঘাট অবধি থেমে ছিল রেলগাড়ি।

১৮৭৯ সালে একটা নতুন ব্রিজ খোলার দিনে মাদ্রাজের কোম্পানি একটা বিরাট বল-ডান্সের ব্যবস্থা করে। ডিউক অফ বাকিংহাম নাকি উপস্থিত ছিল সেই নাচে। আর যে-বারে রূপনারায়ণের ওপর পুল খোলা হল, কোলাঘাট থেকে হাওড়া পর্যন্ত গাড়ি চলল, সাতদিন ধরে রাউত নাচ হয়েছিল। ঠিকাদাররা চাঁদা করে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেছিল। নাচ গান মদ আর মাংস।

ছত্রিশগড়িয়া মেয়েরা চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে সুর টেনে গাইতো আর তালে তালে হাততালি দিতো। পুরুষগুলো নাচতো লাঠি-সোঁটা নিয়ে মুখোশ পরে। নাচের বিষয়বস্তু ছিল দু-পক্ষের যুদ্ধ।

পুরুষগুলোর যেমন ছিল স্বাস্থ্য তেমনি শ্রী। কিন্তু বেঁটে বেঁটে। অথচ মেয়েগুলো পুরুষদের সমান, কি তাদের চেয়েও লম্বা। গঙ্গামাটির মত রঙ। সুন্দর মুখশ্রী, সুন্দর স্বাস্থ্য। অথচ মেয়েগুলো কয়েকটি পয়সার লোভে কেন যে এমন কেনাবেচার সামগ্রী হয়ে

দাঁড়াতো কে জানে।

দারিদ্র্য যে কি বস্তু তখনও জানতাম না। জানলাম, বিলাইতির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর।

ছত্রিগড়িয়াদের একটা নতুন দল সেবারে মুলুক থেকে এসে ডেরা বাঁধলে মন্দির আর মেথর-পাড়ার মাঝখানকার ফাঁকা মাঠে। রাতারাতি হোগলার ছাউনি পড়ল সারি বেঁধে।

গোলবাজার থেকে ওদিকে কলাইকুণ্ডা আর এদিকেপুরোনোবাজার অবধি কয়েকটা নতুন রাস্তা তৈরির জন্যেই নাকি আনা হল ওদের।

খাস ঠিকাদার আবিদ হোসেনের প্রসাদ পেতো জন দশ বারো ছোট ছোট ঠিকাদার। তাদেরই একজন পেয়েছিল এই রাস্তা তৈরির কাজ। ঠিকাদার গুর্দয়াল সিং-এর কুলি জোগাড়ের আড়কাঠি ছিল নিমাইদার বন্ধু অবনীদা। শুধু গুর্দয়াল সিং নয়, অন্য ঠিকাদারদের জন্যেও কুলিকামিন যোগাড় করে আনতেন অবনীদা।

থাকতেন একা, আর মাঝে মাঝে চলে যেতেন বিলাসপুর, রায়পুর, চিরিমিরি, চিন্দোয়াবা। সেখানকার লোকদের নানারকম লোভ দেখিয়ে মালগাড়ি ভর্তি করে নিয়ে আসতেন। যাবার সময় নতুন কাপড়, কাচের চুড়ি, জার্মান সিলভারের চুটকি, তাগা, হাঁসুলি আর নানারকম আয়না, সাবান, চিরুনি ইত্যাদি নিয়ে যেতেন। ঐ সব জিনিসপত্তর দিয়ে, টাকার লোভ দেখিয়ে গ্রামকে গ্রাম উজার করে নিয়ে আসতেন।

অথচ এই কুলিকামিনদের সম্পর্কে যখন কোনো কথা বলতেন অবনীদা, মনে হতো যেন কথায় ঘৃণা ঝরে পড়ছে।

প্রত্যেকটা কুলি যোগাড় করে দেবার জন্যে দশ টাকা করে পেতেন তিনি। আর কুলিদের যে-সব জিনিসপত্তর বা টাকা বায়না দিতেন তাও পেতেন ঠিকাদারদের কাছ থেকে। যাওয়া আসার খরচখরচা।

তবু অনুশোচনার অন্ত ছিল না তাঁর। বলতেন, আমি আর কি পাই, যা লাভ তা তো ঠিকাদাররাই মেরে দেয়। আগেকার দিনে যখন রেল কোম্পানি লোক নিতো, তখন একটা কুলি এনে দিলে আড়কাঠিরাই পেতো পঁচিশ টাকা।

বলতাম, ওরা নিজেরা এলেও তো চাকরি পায়, আসে না কেন?

অবনীদা হাসতেন।—নিজেরা আসবে? কত মিছে কথা বলে লোভ দেখিয়ে আনতে হয়, তাও তো দু-দিন থেকেই পালাবার চেষ্টা করে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করতাম, কেন, পালাতে চাইবে কেন?

—কেন চাইবে না শুনি? দিনে আট আনা মজুরী শুনে ভাবে কত আরামেই না কাটবে। গাঁয়ে থাকতে তো নুন ছাড়া আর কিছুই কিনতে হয় না। কিন্তু এখানে এসে দেখে সবই পয়সা দিয়ে কিনতে হয়, আট আনায় দু-বেলা পেটের ভাতও হয় না। অথচ প্রথম সাতদিনেই পনেরো বিশ টাকা আগাম দিয়ে ধনীরামের মদের ভাঁটিটা চিনিয়ে দিই। ব্যস্, টাকাও শোধ করতে পারে না, পালাতেও সাহস পায় না।

বলতাম, কিন্তু মেয়েগুলো সব খারাপ ওদের।

অবনীদা হাসতেন।—না রে, এত খারাপ ছিল না। এখানে এসে না হয়ে পারে না। বিদেশ বিভুঁই, লাজলজ্জার ভয়ও নেই, আবার অভাবও রয়েছে—তাই।

বলেই বিড়িতে টান দিয়ে কাটা গাছটার গুঁড়িতে উঁচু হয়ে বসে কাজ দেখতেন।

একদল মেয়েপুরুষ মোরাম ঢালা রাস্তায় রোলার টানছে হয়তো সুর করে করে, আর জনকয়েক মেয়ে পিছন থেকে জল ঢালছে রোলারের গায়ে।

কোনদিন হয়তো মেয়েগুলো সুড়কি ছড়াতো রাস্তায়, আর পুরুষগুলো দুরমুজ পিটতো।

আমাদের বাংলোর পাশ দিয়ে যখন নতুন রাস্তাটা তৈরি হচ্ছিল তখন আমিও দেখতাম,

লোহার গেটটার ওপর বসে বসে। এমনি ভাবে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম, আমার দিকে ইশারা করে কয়েকটা ছত্রিশগড়িয়া মেয়ে কি যেন বলে হাসাহাসি করল।

কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করলাম।

তিনজনের মধ্যে একজনের বয়স খুবই কম। অঞ্জলিদির চেয়েও যেন ছোট। কচি ডাবের মতো মুখ। অথচ বেশ গোলগাল, রোদেপোড়া গঙ্গামৃত্তিকা গায়ের রঙ।

মেয়েটা কাজের ফাঁকে একবার করে তাকাচ্ছিল আর পরমুহূর্তেই হেসে ফেলে সঙ্গীদের কি যেন বলছিল।

লক্ষ্য করিনি পরী কখন পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

—কি বাবা, ছত্রিশগড়িয়া ছুঁড়িটার সঙ্গে ডুবে ডুবে এত কাণ্ড?

চমকে ফিরে তাকালাম পরীর গলা শুনে।

রেগে গিয়ে বললাম, ছিঃ, কি যা-তা বলছিস।

—যা-তা? বলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজল পরী, তারপর হঠাৎ মেয়েটাকে ডেকে বসল।—এই, এদিকে আয়।

মেয়েটা হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি। সঙ্গীগুলোও হেসে উঠে ওকে ঠেলে পাঠিয়ে দিলে।

মেয়েটা হাসি চেপে থমথমে মুখে এগিয়ে এল। কিছুটা ভয়ে, বাবুদের অমান্য করার সাহস নেই বলে।

মেয়েটা কাছে আসতেই পরী গেটের ওপর থুতনি চেপে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করলে, কি নাম রে তোর?

—বিলাইতি। নাম বলেই হেসে ফেলল মেয়েটা।

বিলাইতি? বাঃ বেশ চাঁদপানা মুখ তো। এই বাবুকে খুব পছন্দ হয়েছে, না? পরী জিজ্ঞেস করলে।

আর মেয়েটা কি উত্তর দিল কানেও গেল না আমার। রাগে, কিংবা কে জানে হয়তো বাড়ির কেউ এসে পড়বে এই ভয়ে সেখান থেকে ছুটে পালালাম।

অঞ্জলিদির পড়ার ঘরে যখন এসে দাঁড়ালাম তখন আমার বুকের ভেতর কে যেন দুরমুজ পিটছে।

—কি রে? হঠাৎ এ সময়? অঞ্জলিদি জিজ্ঞেস করলেন।

বললাম, চিঠি দেবে না?

—চিঠি? না। বলে চুপ করে রইলেন অঞ্জলিদি।

দেখলাম অঞ্জলিদির সারা মুখ যেন কালো হয়ে গেছে।

বললাম, কেন, চিঠি দেবে না কেন?

—আমি আর নিমাইদার সঙ্গে কথাই বলবো না।

বুঝলাম, অঞ্জলিদি ভীষণ রেগে গেছেন নিমাইদার ওপর।

বললাম, বেশ, তা হলে যাচ্ছি আমি।

—শোন একমুখ হেসে উঠলেন অঞ্জলিদি। তারপর আমার দু-কাঁধের ওপর দুটো হাত রাখলেন।—নিমাইদার সঙ্গে দেখা হলে বলবি, অঞ্জলিদি খুব চটে গেছে, বলেছে আপনার সঙ্গে আর কথাই বলবে না, কেমন।

—আচ্ছা।

চলে আসছিলাম। হঠাৎ মনে পড়তেই বললাম, অঞ্জলিদি তুমি বশীকরণ মাদুলী নেবে?

কপালে চোখ তুললেন অঞ্জলিদি। বললেন, সে কি রে! তুই কোথায় পেলি ও মাদুলী?

বললাম, না পাইনি, রামাই পণ্ডিতের কাছে গেলেই পাওয়া যাবে।

অঞ্জলিদি হাসল, কোন জবাব দিল না। তারপর, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ বললে, আমাকে খানিকটা বিষ জোগাড় করে দিতে পারিস তিমু ?

—বিষ ? কি হবে ?

—না, এমনি। ঘরে খুব ইঁদুর হয়েছে কিনা ছড়িয়ে রাখবো।

বললাম, কোথায় পাবো ?

—কেন, নিমাইদাকে বললে হয়তো এনে দিতে পারে। চাইবি, কেমন ? প্রথমে কিন্তু বলবি না, আমি চেয়েছি। জিজ্ঞেস করলে তবেই বলবি।

সায় দিয়ে চলে এলাম। একেবারে ছোট হাসপাতালে।

কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হাসপাতালের গায়ে গা দিয়ে খানকয়েক কোয়ার্টার। তাব একটাতে থাকতেন কম্পাউণ্ডার মুরলীবাবু, আর একটায় ডাক্তাব রমেশবাবু।

মাঝে মাঝে হাসপাতালে এসে মুরলীবাবুর কাছ থেকে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে যেতাম ফুটবল খেলার সময় হাঁটুতে বেঁধে নি-কাপ করবার জন্যে।

কোন কোনদিন দেখতাম, মুরলীবাবুর জন্যে ধর্ণা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক রাশ লোক, আর মিনিটে তিনটে করে রুগী দেখছেন তিনি। ড্রেসার রামশরণকে মুখে মুখে প্রেসক্রিপশন বাতলে দিচ্ছেন আর রুগী পিছু আট আনা ফি পকেটে ভরছেন।

কোম্পানির এই হাসপাতালটায় রুগী দেখে ফি নেওয়া বে-আইনী ছিল। কিন্তু তেমনি আবার মুরলীবাবু ছিলেন কম্পাউণ্ডার, রুগী দেখা তাঁর কাজ ছিল না।

ডাক্তার আসলে রমেশবাবু, তবু পারতপক্ষে কেউ তাঁর কাছে ঘেঁষতো না। মাথা ধরলে তিনি নাকি পটাপট দাঁতগুলো তুলে দিতেন, চোখ উঠলে ক্যাস্টর অয়েল খাওয়াতেন, আর অ্যাকসিডেন্টে কারও পা কাটা গেলে জিজ্ঞেস করতেন, পেট-খারাবি ?

তাঁর ডাক্তারীতে পেটের গোলমালই ছিল সব রোগের মূল, তাই সাইকেল চাপা পড়ে হাত পা ছড়ে গেলে তিনি এক ডোজ ম্যাগ-সাল্‌ফ খাইয়ে তারপর টিংচার আইডিনের ব্যবস্থা করতেন।

এ নিয়ে হাসাহাসিব অন্ত ছিল না। আর বাইশ বছর চাকরি করেও কোনদিন কোন রুগী পাননি তিনি! অথচ মুরলীবাবুকে আট আনা ফি দিয়েও লোকে রোগ দেখাতো।

রুগী না থাকলেও রুগীদের ভিড় থাকতো রমেশবাবুর টেবিলে। তার কারণ কম্পাউণ্ডার মুরলীবাবু রোগই সারাতে পারতেন, ফিট আনফিট সার্টিফিকেট দিতে পারতেন না!

তাই ছুটির দরখাস্তের সঙ্গে আনফিট সার্টিফিকেট দেবার প্রয়োজন হলে সকলকেই এসে দাঁড়াতে হতো রমেশবাবুর সামনে। আর এইটেই ছিল তাঁর একমাত্র সম্বল। আনফিট সার্টিফিকেট—দু-টাকা, ফিট সার্টিফিকেট—এক টাকা।

রমেশবাবু আর মুরলীবাবুর মধ্যে কিন্তু রীতিমত প্রতিযোগিতা চলতো। কাব উপার্জন বেশি—তারই।

উপার্জন অবশ্য কম্পাউণ্ডার মুরলীবাবুরই বেশি হতো, আর তাই বমেশবাবু খুঁজতেন কি ভাবে তাকে জব্দ করা যায়।

অর্থাৎ হাসপাতালে ওঁরা দু-জনেই ব্যস্ত থাকতেন পরস্পরের দিকে লক্ষ্য রাখায়, অন্য কে কি করছে না করছে সে-দিকে দৃষ্টি থাকতো না।

ওষুধ-ঘরেও আমাদের যাতায়াত ছিল, আর দেখতাম সেলফের ওপর কয়েকটা শিশিতে লেখা আছে 'পয়জন'।

সেদিন গিয়ে ভালোমানুষটির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম এক কোণে, আর মুরলীবাবুকে একটু অন্যমনস্ক হতে দেখেই 'পয়জন' লেখা একটা শিশি টুপ করে পকেটে পুরে ধীরে ধীরে

বেরিয়ে এলাম।

তারপর একেবারে অঞ্জলিদির টেবিলের ওপর শিশিটা রেখে বললাম, এই নাও বিষ।

অঞ্জলিদি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল, কোথায় পেলি ?

—নিমাইদা দিল।

—নিমাইদা দিল ? সত্যি বলছিস্ ? বলেছিলি, আমি চেয়েছি ?

বললাম, হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—ইঁদুর মারার জন্যে চেয়েছি, বলেছিলি ?

বললাম, না। জিজ্ঞেসও করেনি। বললাম, নিমাইদা, অঞ্জলিদি এক শিশি বিষ চেয়েছে, দেবে ? নিমাইদা সঙ্গে সঙ্গে এনে দিল।

অবিশ্বাসের সুরে অঞ্জলিদি আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বসে পড়লেন চৌকিটার ওপর ! দু-হাতের মধ্যে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

কিছুই বুঝতে পারলাম না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম।

ভেবেছিলাম, নিমাইদা দিয়েছে বললেই খুশি হবেন অঞ্জলিদি। কে জানতো····

সম্ভব অসম্ভব নানা কথা ভাবতে ভাবতে মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ গার্ড সাহেবের সঙ্গে দেখা।

তাঁর নামটাও জানতাম না আমরা। সকলেই বলতাম, গার্ড সাহেব। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার জন্যে কোয়ার্টারটা ছেড়ে দিতে হয়েছিল তাঁকে।

তার জন্যে অনুযোগও কম ছিল না গার্ড সাহেবের।

শহরে রেলের যত কর্মচারী ছিল তার তুলনায় কোয়ার্টার ছিল অনেক কম। তাই অনেকেই থাকতো কলোনির বাইরে।

কোয়ার্টার দেবার ভার ছিল মটুবাবুর ওপর। এই মটুবাবুর ওপরই রাগ ছিল সকলেব, গার্ড সাহেবেরও।

বলতেন, আমি যেবার মেল ট্রেনের গার্ড হলাম তিমু, সেবার ডিক্সন সাহেব নিজে এসে পাঁচ পাঁচটা কোয়ার্টার দেখিয়ে বললে, কোনটা পছন্দ বেছে নাও। আর আমার ছেলে কিনা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ফোরম্যান হয়েও চার নম্বরেই রয়ে গেল।

বলতাম, তা অনেকে তো ঘরই পায় না।

—ঘরই পায় না ? রেগে যেতেন গার্ড সাহেব।—জানো, এই চার নম্বব পাওয়ার জন্যে কত ঘুষ দিতে হয়েছিল মটুবাবুকে ? নগদ পাঁচশো টাকা।

—পাঁচশো টাকা ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম একদিন।

গার্ড সাহেব হেসে বললেন, তোমরা আর কি দেখছো। আগে লোভ দেখিয়ে খোশামোদ করে চাকরি দিতে হতো, আর এখন কি হয় জানো ?

—কি হয় ? সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকালাম।

গার্ড সাহেব হাসলেন।—চাকরি পেয়ে কুলিখালাসিদের প্রথম মাসের পুরো মাইনেটাই নিয়ে নেয় বড়বাবু, আর তাবপর যত মাইনে পাবে টাকায় এক আনা করে দিয়ে যেতে হবে সারা জীবন।

এমনি অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনতে পেতাম গার্ড সাহেবের কাছে, তাই হঠাৎ কোনদিন তাঁর মেজাজ ভাল দেখলে তাঁর সঙ্গে রানিং রুম অবধি চলে যেতাম।

বুড়ো বয়সে চাকরি তাঁকে ছেড়েছিল বটে, কিন্তু গার্ড সাহেব চাকরির মায়া ছাড়তে পারেননি। রোজ গিয়ে বসতেন রানিং রুমে। ওয়েস্ট কেবিনে, কন্ট্রোল ঘরে, এ এস এম-দের আড্ডায় একবার ঢুঁ মেরে যেতেন শুধু।

রানিং রুমে কোন না কোন গার্ড, ব্লক ইন্সপেক্টর, টি টি আই থাকতো আর অব্যর্থ সঙ্গী

ছিল রানিং রুমের খানসামাটা।

একটা গা-এলানো কেদারা টেনে নিয়ে গার্ড সাহেব বসে পড়তেই খানসামা এসে সেলাম করে দাঁড়াল সেদিন।

বললে, খেয়ে এসেছেন সাহেব ?

—কেন ? যেন প্রশ্নটার অর্থ বুঝেই হাসলেন।

খানসামা বললে, দুবেজী সেভেন আপে আসছেন, 'তার' করে রোস্ট বানাতে বলেছেন, আপনি আর খোকাবাবু যদি....

গার্ড সাহেব হেসে বললেন, খাবে নাকি তিমু ? দাও খোকাবাবুকে, আমি আর....

—না হুজুর খুব খুশমেজাজে বানিয়েছি আজ। আপনি সমঝদার লোক, আপনি না খেলে...

অগত্যা গার্ড সাহেব রাজি হলেন।

কিন্তু রোস্ট আসার আগেই একদল লোক ঢুকল। কালো কোট, সাদা প্যাণ্ট পরা টি টি সি, টি টি আইয়ের দল।

সকলেই সসম্ভ্রমে নমস্কার জানিয়ে চেয়ার টেনে নিয়ে ঘিরে বসলো গার্ড সাহেবকে।

সেভেন আপ আজ এত দেরি কেন মল্লিক ? গার্ড সাহেব বললেন।

কালো-কোট মল্লিক কি যেন জবাব দিতেই গার্ড সাহেবের কপালে দুশ্চিন্তা দেখা দিল।

বললেন, কি যে হয়েছে আজকাল তোমাদের, একটা ট্রেন কি টাইমিং রাখবে না ? আমাদের সময় আধ মিনিট লেট হলে হুলস্থূল পড়ে যেতো!

চিবুকে নুর-ওয়ালা একজন টি টি সি বললে, আজকাল ট্রেন কত বেড়ে গেছে বলুন ?

—ট্রেন বেড়ে গেছে ? চটে গেলেন গার্ড সাহেব।—একবার পুরীর রথের জন্যে আঠারোটা স্পেশাল দেওয়া হয়েছিল তা জানো ? কই সেদিন তো লেট হয়নি এমন ?

আঠারোটা স্পেশাল ! সত্যি, তীর্থযাত্রীদের কি ভিড়ই না হতো তখন। দাদুর কাছে শুনেছিলাম সে-কাহিনী।

বলেছিলেন, 'দোভাষী' থেকে সাহেবরা যেমন আমার নাম দিয়ে দিলো 'ডুবাশ', তেমনি রাম তেওয়ারী ছিলো 'ফাকির' অর্থাৎ পাইকের। পুজোপার্বণে স্পেশাল ট্রেন দিলে সব টিকিট কিনে নিতো রাম তেওয়ারী, তারপর চড়া দামে বিক্রি করতো যাত্রীদের কাছে। কোম্পানির নতুন জেনারেল ম্যানেজার এসে একবার তার নামে মামলাও করেছিল, কিন্তু হেরে গিয়েছিল কোর্টে। বেশি দামে টিকিট বিক্রি করা যাবে না এমন আইন তো ছিল না তখন। তারপর থেকেই টিকিটে লেখা থাকে নট্‌ ট্রান্সফারেব্‌ল্‌।

সেই সব কথা ভাবতে ভাবতেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ কানে গেল, কে যেন বললে, কন্ট্রোল আপিসে সব বাজে লোক ঢুকেছে, হবে না কেন বলুন।

—গার্ডরাও আজকাল ইররেসপন্সিব্‌ল্‌। গার্ড সাহেব বললেন। তারপর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, সেভেন আপ যখন লেট রয়েছে তখন টু ডাউন তো লাইন ক্লিয়ার পাবে না বি এস পিতে।

দুশ্চিন্তার রেখা ফুটল তাঁর কপালে। মনে মনে হাসলাম। চাকরি ছেড়েও ট্রেনের জন্যে এত ভাবনা ?

কে যেন প্রশ্ন করল, কেন, টু ডাউন লাইন ক্লিয়ার পাবে না কেন ?

গার্ড সাহেব কেমন যেন বিরক্ত হলেন।—সেভেন আপকে পাস করবার জন্যে তো টু ডাউনকে সাইডিংয়ে ফেলে রাখতে হবে এম সি সিতে। তারপর সেই লেট আর মেক-আপ হবে কি করে, থার্টিন আপ গেলে তো কে জি পি ছাড়বে।

—তা ঠিক। মল্লিক সায় দিলে।

গার্ড সাহেব বললেন, বি এস পিতে নির্ঘাত দু-তিনঘণ্টা লেটে পৌঁছবে, শেষকালে টু ডাউন লাইন ক্লিয়ার পাবে না।

মল্লিক বললে, আপনি চাকরি ছেড়েও এত ভাবেন ট্রেনের জন্যে, আর যারা চাকরি করছে তারা দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

কথাটা শুনে বোধহয় খুশি হলেন গার্ড সাহেব।

বললেন, শেষ ডিউটি দিয়েছিলাম ওয়ান আপে, বুঝলে হে মল্লিক! সারা জীবন চাকরিতে একটা স্পট ছিল না, অথচ সেদিন এক ব্যাটা মিছিমিছি চেন টেনে, দিলে পনেরো মিনিট লেট করে। ওয়ান আপ এখানে এসে পৌঁছবে আর আমারও চাকরি খতম্ হবে সেদিন—তাই ভাবলাম, যেমন করে পারি ট্রেন ঠিক টাইমে পৌঁছে দেবো।

—পৌঁছল ঠিক টাইমে? মল্লিক প্রশ্ন করল।

—পনেরো মিনিট লেট! সোজা কথা? গার্ড সাহেব হাসলেন।—কিন্তু আমার তখন জীবনমরণ সমস্যা। ভিড়ের মধ্যে এক ব্যাটা ঘুম থেকে উঠেই দিয়েছে চেন টেনে। কি না বাচ্চা ছেলে পড়ে গেছে। হৈ হট্টগোল, খোঁজাখুঁজি, শেষে বছর আটের ছেলেটা বেরিয়ে এল পায়খানা থেকে। ভাবলাম, পঞ্চাশটা টাকা ফাইন দেবার সঙ্গতি নেই, হয়তো শেষ পর্যন্ত হাজতবাস হবে তার। আর আমারও তখন অনুশোচনা, জীবনের শেষ ট্রেনটা লেট হবে' ঠিক কবলাম, যেমন করে পারি মেক-আপ করবো। ইয়াসিন ছিল ড্রাইভার, গিয়ে বললাম, নিশ্চিন্ত হয়ে বিটাযার করতেও দিলে না ইয়াসিন!

—তারপব? জিজ্ঞেস করলো সবাই।

—ইয়াসিন হেসে বললে, কিছু ভাববেন না সাহেব, বলেন তো মেক-আপ করে দিই। আমিও ভাবলাম, ছেলের জন্যেই তো চেন টেনেছিল, কোনো রকমে রাইট টাইমে পৌঁছতে পারি তো ও-ব্যাটার ফাইনটাও মকুব করে দেওয়া যাবে।

—মেক-আপ হল শেষ পর্যন্ত? মল্লিক অধৈর্য হয়ে প্রশ্ন করল। গার্ড সাহেব হেসে বললেন, না বে ভাই, এসে যখন পৌঁছল, আধ মিনিট লেট। তা, তখন এস এম ছিল জ্যাক্সন্ সাহেব, রাইট টাইম বলেই লিখে দিলে খাতায়। সে-সব সাহেবও আজকাল নেই, সে দিনকালও নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গার্ড সাহেব।

১৬

সে-সব দিনকালও নেই, সে-সব সাহেবও নেই।

শুনে নিমাইদা হেসেছিল। সব মিথ্যে কথা তিমু, মিথ্যে কথা। তখনকার দিনের লোকগুলো ছিল ভেড়া আর সাহেবগুলো ছিল চাঁড়াল।

কথা তো নয়, কথার মধ্যে বিছুটি। অথচ এত বিদ্বেষের কারণ বুঝতাম না।

বাড়িতে তখন চরকা কাটতে শুরু করেছে নিমাইদা, বিকেলে আমাদের বাগানে জিমনাশিয়ামে এসে স্বাস্থ্যচর্চা করতো, আর রবিবার সকালে দল বেঁধে আসতাম আমরা, নিমাইদা হারমোনিয়াম বাজিয়ে বন্দেমাতরম্ গান শেখাতো।

আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে তিনপটিয়ারা গির্জায় যেত। আর বন্দেমাতরম্ গান শুনে তাদের বাচ্চা ছেলেমেয়েগুলো ছুটতে শুরু করতো। বয়স্ক লোকগুলোর মুখেচোখে ভয়ের

ছাপ পড়তো।

আর ওরা ভয় পেতো বলেই আমরা আরও গলা ছেড়ে গাইতাম। ছেলেগুলোকে মুখ ভেংচে আরও ভয় দেখাতাম।

একদিন এমনি সরবে গান গাইছি আমরা, সারি বেঁধে তিনপটিয়াবা চলেছে গির্জার দিকে, হঠাৎ একজন বুড়ো এসে দাঁড়াল আমাদের কাছে।

সে এসে বললে, গান থামাও।

—কেন ? নিমাইদা রুখে দাঁড়ালো।

বুড়ো উত্তর দিলে, ও গানে সিডিশন আছে।

'সিডিশন' কথাটার মানে জানতাম না। মনে হল, কোনো গালাগালি দিল লোকটা। আর তাই পরী হঠাৎ তার পিছন দিকে গিয়ে তার টুপিটা ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে আরো জনকয়েক তিনপটিয়া এগিয়ে এল অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে।

আর দূর থেকে পরী ধাঁই করে একটা পাথর ছুঁড়ে মারল। সেটা এসে লাগল ওদেরই একজনের মাথায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ল।

আমরা সবাই মিলে তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে এলাম।

তারপর পরীকে বললাম, কেন মারলি বল তো ? ওরা সাহেব তা জানিস ?

—সাহেব না কচু। ওরা তো তিনপটিয়া। বলে দাঁত বের করে হাসল পরী।

ওর ভঙ্গি দেখে আমরাও হেসে ফেললাম।

কিন্তু তিনপটিয়ারাও যে রাজার জাত টের পেলাম এক সপ্তাহ পরেই।

এক গাড়ি লাল-পাগড়ি পুলিস এসে কয়েকটা বাড়ি সার্চ করল, আর ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ এল, ক্লাব তুলে দিতে হবে।

এক নিমাইদা শুধু হাসতে হাসতে বললো, তিনপটিয়ারা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে কি দরখাস্ত করেছিল জানিস ? আমরা 'বন্দেমাতরম্' গাই তো ? 'বন্দেমাতরম্' মানে নাকি খ্রীস্টান দেখলেই বেঁধে মারো।

বলে হো-হো করে হাসলো নিমাইদা।

কিন্তু সদাশিব জ্যাঠা হাসলেন না। সব শুনে গম্ভীর হয়ে গেলেন, তারপর হঠাৎ কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন তিনি। ফরসা মুখে যেন এক ঝলক রক্ত এসে জমা হল, ক্রমে কপালের একটা শিরা ফুলে উঠল তাঁর।

বললেন, ইংরেজ রাজত্বে এখনো বাব্বাই আইন চলছে রে, ওদের তাড়াতে না পারলে দেশে শান্তি ফিরবে না।

—বাব্বাই আইন ? সে আবার কি ?

বাব্বা সাহেবের নামটাই জানতাম, কিন্তু তার এই একটা দিকের পরিচয় জানা ছিল না।

আবিদ হোসেনের এত শক্তি ছিল ? আশ্চর্য !

কলাইকুণ্ডার জঙ্গলের মধ্যে একটা বাগানবাড়ি ছিল আবিদ হোসেনের, আর প্রায়ই গভীর রাতে সেখান থেকে ফিরতো সে। আবিদ হোসেন আর তার ড্রাইভার—কোমরের গেঁজেতে থাকতো হাজার হাজার টাকা।

একদিন তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, এত রাত্তিরে আসো, ভয় করে না ?

আবিদ হোসেন হেসে বলেছিল, ডাকু ? আমার নিশানার খবর ডাকুরাও রাখে ছোটা সাব।

বলে পকেট থেকে একটা পিস্তল বের করে সামনে কি যেন লক্ষ্য করে ধরল।

ভাবতেই পারিনি। সামনে দিয়ে যাচ্ছিল বছর দশেকের একটি মেয়ে, মাথায় একটা মাটির হাঁড়িতে দুধ নিয়ে।

পিস্তলের শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখি দুধে স্নান করে ফেলেছে মেয়েটা।

বাব্বা সাহেব তখন প্রাণ খুলে হাসছে।

কিন্তু মেয়েটাকে কাঁদতে দেখেই তাকে কাছে ডাকলে, পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে দিল। মেয়েটাও চুপ করল।

সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম তার হাতে পিস্তল দেখে আর পিস্তলের নিশানা দেখে। জানতাম না এই পিস্তলের গুলিই বাব্বাই আইন।

সদাশিব জ্যাঠা বললেন, এই আবিদ হোসেন হল অর্ধেক অসুর আর অর্ধেক দেবতা। অর্ধনারীশ্বর যেমন, তেমনি অর্ধ দেবাসুরও।

—দেবাসুর ?

—হ্যাঁ, দেবাসুর। যে-কোনো লোককে শত্রু মনে হলেই আবিদ হোসেন তাকে নিমন্ত্রণ করতো ওর বাগানবাড়িতে। তখন তো মোটরগাড়ি ছিল না এখানে, মোটর চালাবার রাস্তাও ছিল না। তাই পালকিতে করে নিয়ে যেতো তাকে।

—তারপর ?

—তারপরে জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ পালকি থেকে নামতে বলতো তাকে। আর নামলেই একটি পিস্তলের গুলি।

আশ্চর্য হয়ে বললাম, বাব্বা সাহেব লোকটা তো তা হলে খুনে ? খুন করতো ও ?

সদাশিব জ্যাঠা হাসলেন। কত লোক যে নিখোঁজ হয়েছে এ-ভাবে তার সন্ধান মেলে না। কিন্তু ওর মধ্যে দেবতাও আছে তিমু। যাকে খুন করতো ও, তার পরিবার ছেলেমেয়ে সকলের ভরণপোষণের খরচ যুগিয়ে এসেছে ও সারা জীবন। শুধু খরচই নয়, তাদের সুখ-সুবিধে, ছেলের পড়াশুনো, মেয়ের বিয়ে, সব ব্যবস্থার জন্যে অঢেল টাকা ঢেলে দিয়েছে।

ফায়ারম্যান ইদ্রিস, যে আমার চোখে ছিল পাঞ্জা লড়ায় অদ্বিতীয়, মহরমের বাঘ নাচ যার চেয়ে কেউ ভাল পারতো না, সেই ইদ্রিস একদিন দুঃখ করে বলেছিল, এমন নসিব যে বাব্বা সাহেবের গুলিও লাগে না ছাতিতে।

সেদিন বুঝতে পারিনি এ-কথার অর্থ। বুঝতে পারিনি কতো দুঃখে এ-কথা বলেছিল।

ইয়ার্ডের এ-পাশটায়, যেখানে দিনরাত ইঞ্জিন শান্টিং করতো, হুইস্‌ল দিতো, তার ধারে ধারে ছিল লোহার পাত দিয়ে ঘেরা ফেন্সিং। আর তার পাশ থেকেই শুরু হয়েছে কুলি খালাসি ফায়ারম্যানদের বস্তি।

এই লাইনের ঘরগুলো ইঞ্জিনের ধোঁয়া লেগে লেগে এমন কালো হয়ে গিয়েছিল যে রান্নাঘরের ঝুলও তার কাছে হার মানতো। এমনি একখানা ঘর নিয়ে ছিল ইদ্রিসের সংসার।

দুটো ছেলে আর একটা বউ। অথচ যা মাইনে পেতো ও, তাতে সংসার চলতো না। তাই দুটো উপরি রোজগারের ব্যবস্থা করেছিল ইদ্রিস।

বাড়িতে ঘুড়ি তৈরি করে বিক্রি করতো ও, আর আমাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেই সূত্রে। ছুটির সময়, ছুটির দিনে, বসে বসে একমনে ঘুড়ি বানাতো বাজার থেকে কাগজ কিনে এনে।

এক দিন দুটো পয়সা পকেটে নিয়ে গিয়েছি বায়নাদেওয়া ঘুড়িটা আনতে, গিয়ে শুনলাম ইদ্রিস বেরিয়ে গেছে কাজে।

ইদ্রিসের বউ ডেকে বললে, বায়না মত তৈরি এখনো হয়নি, কিন্তু যেগুলো রয়েছে তা থেকে পছন্দ হয় তো নিয়ে যাও। বলে ঘরের ভেতর যেতে বললে।

চট আর বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা বারান্দাটার ভেতর এর আগে কোনদিন ঢুকিনি।

ঢুকে দেখি এক পাশে কয়লা বোঝাই হয়ে আছে। কাঁচা কয়লার বড় বড় চাঙর।

সেদিকে তাকিয়ে আছি দেখে হাসল ইদ্রিসের বউ, বললে, কয়লা আর ঘুড়ি এই দুটো রোজগার আছে বলেই চলে খোকাবাবু।

বললাম, কয়লা পাও কোত্থেকে ?

ইদ্রিসের বউ নির্বিকার ভাবে বললে, চুরি। বলেই সাবধান করে দিলে, ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডে খবর দিয়ে দিও না যেন।

বললাম, না, তা দেবো না। বরং কয়লার দরকার হলে তোমার কাছ থেকে নিয়ে যাবো কিনে।

ইদ্রিসের বউ শুনে খুশি হল, কিন্তু পরমুহূর্তেই কেমন বিষণ্ণ দেখাল ওকে।

বললে, বড় ডর লাগে খোকাবাবু, বাচ্চারা ঝুড়িতে করে আনে, কবে সাথীর চোখে পড়বে, গুলি কবে দেবে হয়তো।

সাথীদের সকলেই ভয় পেতাম।

ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়ার্ডের গুর্খা পাহারাওয়ালাদের সাথী বলতাম আমরা। হাসি ঠাট্টা গল্পও করতাম তাদের সঙ্গে। আর গল্প করতে করতে হঠাৎ কোন কোনদিন কুলি-খালাসিদের ছেলেমেয়েগুলোকে লাইনের ধার থেকে কয়লা কুড়োতে দেখলে তাড়া দিতো তারা। অথচ যারা ঝুড়ি পিছু দু-পয়সা করে তাদের সেলামী দিয়ে কয়লা নিয়ে পালাতো তাদের কিছুই বলতো না।

দেখতাম, শান্টিং করতে করতে বস্তিটার কাছে এসে একরাশ কয়লা ফেলে দিয়ে যেতো ইঞ্জিনগুলো। আসলে ফায়ারম্যানদের সঙ্গে যোগসাজস। তারপর একসময়ে ছোট ছোট ছেলেগুলো এসে ঝুড়ি করে কয়লা নিয়ে পালাতো ফেন্সিং ডিঙিয়ে।

আর সন্ধের সময় বস্তির সামনের মাঠটায় সারি সার কয়লার স্তূপ জ্বলে উঠতো দাউ-দাউ করে।

ভাবতাম, শীতকালে আগুন পোয়াবার জন্যেই বুঝি কয়লায় আগুন ধরানো হয়।

ইদ্রিসের বউ বললে, তা নয় খোকাবাবু, কাঁচা কয়লা তো কেউ কিনবে না, তাই পুড়িয়ে কোক করা হয়।

—বাঃ বেশ তো মজা, তা হলে অনেক টাকা রোজগার করো তোমরা, না ?

হাসবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু তার কালো মুখখানা যেন আরো কালো দেখাল। করুণ বড় বড় চোখ দুটো তুলে বললে, হ্যাঁ, খোকাবাবু, অনেক টাকা রোজগার হয়। কয়লা, ঘুড়ি, তারপর মহরমের সময় বাঘ-পাঞ্জা লড়েও অনেক টাকা ঘরে আনে মানুষটা। দেখছো না, সেইজন্যই তো ছেলেমেয়েগুলোর পাঁজর দেখা যাচ্ছে।

সত্যি, বড় রোগাসোগা দেখাতো ছেলেগুলোকে।

এমনি রুগ্‌ণ দেখাতো মুস্তাফাকেও।

চোখের সামনে দেখতে পেতাম, দিনে দিনে কেমন রোগা হয়ে যাচ্ছে, চোখ দুটো সব সময়েই বিষণ্ণ, মুখে যেন রক্ত নেই।

—ডাক্তার দেখা মুস্তাফা, তোর বোধহয় কোন অসুখ হয়েছে, এত রোগা হয়ে যাচ্ছিস কেন ?

ম্লান হাসি হেসেছিল মুস্তাফা।—অসুখ ? হ্যাঁ, শরীরে নয়, মনে।

দুর্বোধ উৎসুক চোখ তুলে আমাকে তাকাতে দেখে মুস্তাফা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিল, তিমু ভাই, আমি বোধ হয় প্রেমে পড়েছি।

—সে কি রে ? হেসে ফেলেছিলাম ওর কথা শুনে।

ও উত্তর দিয়েছিল, হাসি নয় রে, সত্যি। ফুলজান বিবিকে মনে আছে ?

বিস্মিত হয়েছিলাম !—আমাকে যে বড় উপদেশ দিয়েছিলি, অথচ নিজেই.....

—মাফ কর ভাই তিমু, তোর ওপর কেন জানি না ঈর্ষা হতো, তাই ভয় দেখিয়েছিলাম। কিন্তু কি যেন এক নেশা আছে রে বাব্বা সাহেবের বাড়িতে। সব-দিন ফুলজান বিবির দেখাও পাই না, তবু না গিয়েও পারি না।

—তোর সামনে বেরোয় রোজ? না জিজ্ঞেস করে পারিনি।

মুস্তাফা উত্তর দিলে, বাব্বা সাহেবের যেদিন মনমেজাজ ভাল থাকে সেদিন ডেকে নিয়ে যায় ওর ঘরে, ফুলজানও আসে....

একটু থেমে বললে, ওর বিবিগুলো তো কেউ পেশোয়ারী, কেউ পাঞ্জাবী, এক ফুলজান হলো বাঙালী। বেচারী তো কথা বলবার, গল্প করবার লোক পায় না, তাই আমাকে ডেকে নিয়ে যায় বাব্বা সাহেব। বলে, বাংলা কথা বলে বিবিটাকে খুশি রাখো।

বললাম, আর সেই সুযোগ নিয়ে....

কথাটা শেষ করতে দিল না মুস্তাফা। বললে, জানি অন্যায়, তবু কালো বোর্খাটা খুলে রেখে ফুলজান যখন চৌকি টেনে নিয়ে কাছে এসে বসে, আমি চোখ ফেরাতে পারি না। এমন রূপ তুই কখনো দেখিসনি তিমু! ওর চোখের মধ্যে কি এক নেশা আছে!

বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুস্তাফা। ইচ্ছে সত্ত্বেও বলতে পারলাম না, ফুলজান বিবির রূপ দেখে আমিও মুগ্ধ হয়েছি।

মুস্তাফা হঠাৎ ফিসফিস করে বললে, তোকেই বলছি তিমু, বিশ্বাস কর, আমি ফুলজানকে ভালবেসে ফেলেছি।

—কিন্তু বাব্বা সাহেব যদি টের পায়?

—পাবেই। আমি জানি আগুনে ঝাঁপ দিচ্ছি আমি, তবু ফিরতে পারছি না। প্রেম কাকে বলে জানিস না তিমু, যেদিন জানতে পারবি, দেখবি মৃত্যু জেনেও ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়।

প্রেম কাকে বলে জানিস না তিমু! মুস্তাফা বলেছিল। আর নিমাইদা বলেছিলেন, দেশপ্রেম হলো অমৃতময় আগুন, ঝাঁপিয়ে পড়লে তাতে জ্বালা নেই, আছে আনন্দ, আছে সুখ।

তাই বোধহয় সে আগুনের দিকে ছুটে গিয়েছিলেন নিমাইদা।

জন দশেক বন্ধুবান্ধব নিয়ে 'বন্দেমাতরম্' গাইতে গাইতে বিদায় নিয়েছিলেন সেদিন। তখনও আন্দোলন এমন ছড়িয়ে পড়েনি সব মানুষের মধ্যে। মনে মনে অনেকেই স্বাধীনতার জন্য প্রার্থনা জানাতো ভগবানকে। কিন্তু সাহস করে আন্দোলনে এগিয়ে যেতো না। কিংবা কে জানে অন্য সব জায়গা যখন উত্তাল হয়েছে, রেলনগরে তখনো হয়তো ভয় কাটেনি। তাই শুধু জন দশেক বন্ধু সাড়া দিয়েছিল নিমাইদার ডাকে!

যোগ না দিলেও সারা শহরের লোক ভিড় করে এসেছিল। দুর্গা মন্দিরে একটা সভা হয়েছিল। খদ্দরের তিনরঙা পতাকা তুলেছিলেন বাবা, আর আমরা সবাই ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছিলাম নিমাইদাদের।

মনে আছে, পান্না, নিরু, অঞ্জলিদি, সুধাদি আরও অনেকে এককোণে জড়ো হয়ে পিঁড়িতে চন্দন ঘষছিল।

হঠাৎ কে যেন বললে, ও কি রে, শ্বেতচন্দন এনেছিস কেন? রক্তচন্দন নেই?

—সত্যি, রক্তচন্দনের তিলক পরালে কি সুন্দরই না হতো!

তা শুনে হঠাৎ থমকে আমার মুখের দিকে তাকালেন অঞ্জলিদি। তারপর নিরুর কানে কানে কি যেন বললেন, আর নিরু ছুটে গিয়ে কি একটা নিয়ে এল বাড়ি থেকে।

কি আর! একটা দাড়ি কামাবার ব্লেড!

ব্লেডটা হাতে নিয়ে বুড়ো আঙুলের খানিকটা চর্‌র্ করে কেটে ফেললেন অঞ্জলিদি,

ঝরঝর করে রক্ত পড়ল।

চন্দনের সঙ্গে সেই রক্তটা মেশাতে মেশাতে অঞ্জলিদি হাসতে হাসতে বললেন, হল তো তিমু, শ্বেতচন্দনে রক্ত মেশালেই তো রক্তচন্দন।

আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম, অঞ্জলিদির ইচ্ছে ছিল, নিজের হাতে নিমাইদার কপালে চন্দনের তিলক এঁকে দেবেন। কিন্তু লজ্জায় মুখ ফুটে বলতে পারলেন না।

সুধাদিই সকলের কপালে তিলক এঁকে দিল।

নিমাইদার দল বিদায় নিয়ে চলে গেল।

মাইল কয়েক দূরে, হিজলী পার হয়ে, হিজলীর বন পার হয়ে নাকি সমুদ্র দেখা যায়! কাঁথি থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে হেঁটে গিয়ে দিঘার সমুদ্রের ধারে পৌঁছবে নিমাইদা।

সমুদ্র!

মাত্র সাত দিনের জন্যে একবার পুরী গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে, ইস্কুলের ম্যাপে নীল রঙের যে অংশটায় লেখা ছিল 'বঙ্গোপসাগর', সেই সাগরের রূপ দেখেছিলাম নিজের চোখে। সমুদ্রে স্নান করবার সময় নোনা জল খেয়ে ফেলেছিলাম সেদিন।

সেই নোনা জল থেকেই নুন তৈরি হয়, কে জানতো তখন। কে জানতো, সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরি করা সবচেয়ে বীরত্বের কাজ!

—বীরত্ব নয়? অঞ্জলিদি ফুলঝুরির মতো একমুখ হাসি ঝরিয়ে বলেছিলেন, নিমাইদা নুন তৈরি করতে গেছে কি বিক্রি করবার জন্যে? নুন তৈরি করে দেশ স্বাধীন করবে নিমাইদা!

দেশ কি সত্যিই কোনোদিন স্বাধীন হবে? সত্যি যদি হয় কোনোদিন! পূজারীর দোকানটা কি-এমন সাজানো হয় দেওয়ালীর সময়? আমি সারা বাড়ি প্রদীপ দিয়ে সাজাবো সেদিন। দোতলার কার্নিসে, নীচের তলায় পাঁচিল ঘিরে, এমনকি কাঁটা তারের বেড়ার লোহার পোস্টের মাথার ওপরও কাদা দিয়ে প্রদীপ সাজাবো। শুধু কি আমাদের বাংলো? সারা শহরটাই হয়তো সেদিন আলোয় আলো হয়ে যাবে।

—আচ্ছা পরী, রামাই পণ্ডিত বলতে পারে না?

—কি?

—দেশ স্বাধীন হবে কিনা?

পরী অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর দিয়েছিল, কি জানি!

—কি এত ভাবছিস?

—ভাবছি নিমাইদার কথা। ঝিঝিপোকা কি অভিশাপ দিয়েছিল মনে আছে?

ঝিঝিপোকার অভিশাপ! ঝিঝিপোকার অভিশাপ কখনো ফলতে পারে? কে জানে! পরীর কথা শুনে ভয় হয়েছিল। মনে পড়ে গিয়েছিল সেদিনের ঘটনাটা।

—বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে ঝিঝিপোকা বিড়বিড় করে কি বলেছিল জানিস তো?

বললাম তোর কাছেই শুনেছি। কিন্তু…

—কিন্তু সে অভিশাপ সত্যি হলে…

—না না। চিৎকার করে উঠলাম, সে অভিশাপ মিথ্যে, মিথ্যে।

মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, মিথ্যে হোক্, মিথ্যে হোক্ ঝিঝিপোকার অভিশাপ। তা না হলে যে অঞ্জলিদির ক্ষতি হবে।

বললাম, পরী, আবার একদিন যাবি রামাই পণ্ডিতের কাছে?

পরী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, হ্যাঁ রে, আমি ভাবছি তাই। চল্, দুপুরের দিকেই যাই একদিন।

গিয়েছিলাম।

ইঁদা-কাঁসাই উঁচু রাস্তাটা থেকে ঢল নেমে গেছে ধান জমির মাঠে। ধান কাটা হয়ে মাঠে মাঠে জমা হয়ে আছে, খড়ের পালুই দেখা যায় কোন কোন মেটে-বাড়ির চালার চেয়েও উঁচু। খোঁচা খোঁচা কাটা ধানের গেঁড়োর ওপর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, কাশবনের সাদা ঢেউ পার হয়ে, বনপথের ভেতর দিয়ে পৌঁছলাম খড়্গেশ্বর মন্দিরে।

সেদিন রাত্তিরে এত ভয় পেয়েছিলাম, অথচ দুপুর রোদে হাঁটতে হাঁটতে যখন ভাঙা পুরোনো মন্দিরটা চোখে পড়ল, একটুও আতঙ্ক হল না।

পরীকে বললাম, রাঙামামীমার কাছে নিয়ে যেতে পারবি রামাই পণ্ডিতকে ?

—কেন ?

বললাম, রামাই পণ্ডিত তো ভূত নামাতে পারে। যদি নিরুর মামার আত্মা নামাতে পারে তো রাঙামামীমা তাঁর সঙ্গে কথা বলতেন।

পরী কোনো উত্তর দিল না। হঠাৎ বললে, আচ্ছা রাঙামামীমার কতই বা বয়েস, আবার বিয়ে দিচ্ছে না কেন রে!

—বিধবার আবার বিয়ে ? বিস্মিত হয়ে বললাম—তাছাড়া রাঙামামীর যে ছেলে রয়েছে।

পরী হঠাৎ বললে, তা হলই বা। বিদ্যাসাগর তো বিধবা বিয়ের আইন করে গেছেন।

বিধবা বিয়ের আইন করে গেছেন বিদ্যাসাগর! জানতাম, তবু বিস্মিত হয়েছিলাম সেদিন। টুলো পণ্ডিতের মতো চেহারা, পড়ার বইয়ে সে ছবি দেখে কিছুতেই মনে হতো না সে-লোক এমন একটা আইন আনতে পারে।

সদাশিব জ্যাঠা হেসে বলেছিলেন, বিদ্যাসাগর ছিল খাস বিলিতি সাহেব। টিকি দেখে ভাবিস বুঝি, গোঁড়া হিন্দু ছিল ? মোটেই না, বিদ্যাসাগর ছিল বিপ্লবী। ভগবান টগবানে বিশ্বাসই করতেন না। দেখবি একদিন ভারতবর্ষের সব হোমরা-চোমরাদের নাম মুছে গিয়ে বিদ্যাসাগরের নাম বেঁচে থাকবে।

শুনে খুশি হতাম, এ যেন আমাদেরই গর্ব। বিদ্যাসাগর তো জন্মেছিলেন এই জেলাতেই। একবার ইস্কুল থেকে তাঁর জন্মস্থান দেখতেও গিয়েছিলাম।

সদাশিব জ্যাঠা বলেছিলেন, তাঁর আগে রাজা রাজবল্লভ একবাব চেষ্টা করেছিলেন, পলাশডাঙার ব্রহ্মানন্দ মুখোপাধ্যায়ের দশ বছর বয়েসের বিধবা মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। কিন্তু সে তো একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা। বিধবাদের সম্পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

—আজ যদি তিনি বেঁচে থাকতেন, রাঙামামীমার কোনো দুঃখ থাকতো না, না রে পরী ? খড়্গেশ্বরের মন্দিরের দিকে যেতে যেতে বলেছিলাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গিয়েছিল দাদুর কথা।

—এই বিদ্যাসাগরের একটি মেয়ে না খেতে পেয়ে মাবা যাচ্ছিল, তিমু, দেশের লোক চেয়ে দেখে না। তাঁর ঐ মেয়েকে শেষকালে সসম্মানে আশ্রয় দিয়েছিল সংস্কৃত কলেজের মালী।

বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম, সে কি দাদু, এমন একজন মহাপুরুষের মেয়ে আশ্রয় পায় নি কোথাও ? তুমি তো তাঁর ছাত্র!

দাদু ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, হ্যাঁ, আমি এই বিদ্যাসাগরের ছাত্র তিমু, মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে যেবার বি এ পড়বার ব্যবস্থা করলেন, আমি ঢুকলাম সেইবারে। নিজে পড়াতেন আমাদের।

বললাম, তুমি কেন তাঁর মেয়েকে সাহায্য পাঠাও নি ?

দাদু হাসলেন।—দু-একবার পাঠিয়েছি তিমু, কিন্তু আমরা কতই বা মাইনে পাই,

নিজেদেরই সংসার চলে না। ডাক্তার বিধুমুখী বসু নাকি শেষে ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিলেন।

সে অনেকদিন আগের কথা। চাঁদা তোলবার জন্যে একজন ভদ্রমহিলা আর জনকয়েক ছাত্র এসে উঠেছিলেন বারুদ-ঘরে। ভাঙা পুরোনো একখানা ঘর আর তিন দিকে এই ইঁটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা বারুদঘরে বারুদ রাখা হতো না কোনোদিনই। আসলে ওটা ছিল ডিনামাইট স্টেব্‌ল্। স্টেব্‌ল্ মানে তো আস্তাবল। ডিনামাইটের আবার আস্তাবল কি? অনেকেই বুঝতে পারতো না। পোড়ো-বাড়িটা ভেঙে ফেলে ওর ওপরে যখন মুসাফিরখানা তৈরি হল, সদাশিব জ্যাঠা দুঃখ করে বলেছিলেন, একে একে সব যাবে, সব স্মৃতি মুছে ফেলবে। পুরোনো দিনের কিছুই আর থাকবে না রে, কিছুই আর থাকবে না।

আমারও ভাল লাগে নি এই ইতিহাসের ওপর দুরমুজ পেটানো।

তখন নোবেল সাহেব সবে ডিনামাইট আবিষ্কার করেছেন, পাহাড় ফাটাতে টানেল কাটতে যেখানে হাজার হজার মানুষের শক্তি লাগতো, সেখানে ডিনামাইট যেন নতুন এক আশীর্বাদ হয়ে এল পৃথিবীতে, মুছে নিল লক্ষ লোকের ঘাম।

দুঃখ হতো শুধু রিচার্ডস্ সাহেবের জন্যে। সে বেচারী যখন এসেছিল ডিনামাইটের বিদ্যে শিখে, তখনও ঐ বজ্রশক্তির শৈশব কাটেনি। ইচ্ছামত শক্তির মাপ ঠিক করা যেতো না। তাই পলতেতে আগুন লাগিয়েই ছুটে পালাতে হতো ঘোড়ায় চড়ে। আর সেই ঘোড়াগুলো রাখা হতো এই বারুদ-ঘরে।

—তাই ওর নাম ছিল ডিনামাইট স্টেব্‌ল্। দাদু বলেছিলেন।

আর আমার মনে পড়ে গিয়েছিল রিচার্ডস্ সাহেবের কথা।

বিলেত থেকে কোম্পানি নতুন ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়েছিল রিচার্ডস্ সাহেবকে।

কিন্তু মাস কয়েক পরেই আরো তেইশ জন সাহেব এসে পৌঁছল কারখানা চালু করবার জন্যে। আর তেইশ জনের মধ্যে একজন বাঙালী। দত্ত সাহেব।

অন্য সাহেবদের মতোই সরাসরি বিলেত থেকে চাকরি নিয়ে এসেছিলেন দত্ত সাহেব। এসে খাতাপত্র দেখে রিচার্ডস্ সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে হাসাহাসি করলেন এক-যাত্রার বাকি বাইশজন সাহেবসুবোর সঙ্গে।

বললেন, তোমাদের ঐ রিচার্ডস্‌কে দেশে ফেরত পাঠাও, ও এখনো প্রাগৈতিহাসিক যুগে পড়ে আছে।

হিসেবপত্র দেখতে দেখতে দত্ত সাহেব হঠাৎ দেখতে পেলেন, একটা হিসেব চলেছে ডিনামাইট হর্সের নামে। ডিনামাইট হর্সটা কি বস্তু? জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

রিচার্ডস্ সাহেব বোঝালেন ব্যাপারটা।

ডিনামাইটের পলতে ধরিয়ে ছুটে পালাতে হবে না?

শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন দত্ত সাহেব। তারপর অন্য সাহেবদের যাকেই পান হাসতে হাসতে সে-খবর জানান। শুনেছো, তোমাদের প্রিহিস্টোরিক ম্যান রিচার্ডসের কীর্তি শুনেছো।

গল্পটা বলতে বলতে দাদু হঠাৎ প্রশ্ন করেছিলেন, প্রিহিস্টোরিক মানে কি তিমু?

বললাম, প্রাগৈতিহাসিক। কিন্তু দত্ত সাহেব হাসল কেন দাদু?

হাসবারই কথা। কিন্তু দত্ত সাহেব একদিকে ছিল পুরোদস্তুর সাহেব, অন্য দিকে বিলেতের পরীক্ষায় রেকর্ড নম্বর পাওয়া ছাত্র। তাছাড়া ডিনামাইট তখন ছেলেখেলা। ছুটে পালানোর দরকার নেই। ঠিক যতখানি পাহাড় ফাটাতে হবে ততখানি শক্তি মেপেদেওয়া চলে, আর, কতদূর সরে যেতে হবে তাও জানা খবর। কিন্তু রিচার্ডস্ বেচারা যখন শিখে এসেছিল তখনও এত উন্নতি হয় নি ডিনামাইটের।

শুধু কি ডিনামাইট ? কোম্পানির মাইনে করা পণ্ডিত আছে দেখে তো ক্ষেপে লাল দত্ত সাহেব।

বললেন, ও-সব বুজরুকি চলবে না। তাড়াও লোকটাকে।

ওয়াটসন্ ছিল পুরনো লোক, পণ্ডিতের গণনার ওপর বিশ্বাসও ছিল তার। তাই অনেক কাকুতি-মিনুতি করে ঠিক হল, পণ্ডিতকে আর আপিসে আসতে হবে না, ঘরে বসে মাসে মাসে দশ টাকা করে পাবে। আর রিচার্ডস্ সাহেব, সেও তো খাস বিলেতের লোক। কোম্পানির চাকরি নিয়ে সেও এসেছিল একদিন দত্ত সাহেবের মতোই, তাই রিচার্ডস্ শুধু আপিসেই আসতো, কাজ বিশেষ কিছু করতে পেতো না।

—কাজ করতে হতো না ? বসে বসে মাইনে নিতো ? বিস্ময়ের স্বরে প্রশ্ন করলাম।

দাদুকে বিষণ্ণ দেখাল। বললেন, হতো না নয়, কাজ করতে পেতো না। ইচ্ছে থাকলেও দত্ত সাহেব কোনো কাজ দিত না তাকে। বলতো, যা করতে দেবে একটা গোলমাল বাধিয়ে বসবে।

মনের দুঃখেই হয়তো, কিংবা একজন ভারতীয়ের কাছে এমন ভাবে অপমানিত হওয়ার জন্যেও হতে পারে, একদিন দেখা গেল নিজের বন্দুকে নিজেই মাথায় গুলি করে আত্মহত্যা করেছে রিচার্ডস্। আর তারপর থেকেই এই রেলে ভারতীয়দের অফিসারের চাকরি দেওয়া বন্ধ ছিল বহুদিন।

ঘোড়া দুটো তার পরও অবশ্য ছিল। পোলো খেলার মাঠে নাম লেখানো হয়েছিল সে-দুটোর।

দাদু বলেছিলেন, এই হল পৃথিবীর রীতি তিমু। এই হল পৃথিবীর রীতি। নতুন চিরকাল পুরনোকে দেখে হাসে অবিশ্বাস করে। যে-সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠি সেই সিঁড়ি চিরকাল পদাঘাতই পায়।

১৭

শুনলাম সব। শুনে যেন বিশ্বাস হল না। এও কি সম্ভব ? এও কি হতে পারে ?

সমস্ত কলোনি ছি-ছি করে উঠল, শত্রুরা হাসাহাসি করল, মেয়েরা বলল এমন মেয়ের মরাই ভাল ছিল।

ব্যাপারটা ক্রমশ কানে এলে আমাদের। শেষে কিনা পরিমলদা এমন কাণ্ড করল ? আমাদের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল পরিমলদার ওপর। কিন্তু মনে রাগ পুষে রাখা ছাড়া উপায় ছিল না। মীরার মতোই তারও খোঁজ মিলল না কিছুদিন।

পরিমলদার বাবা ছিলেন রেল কারখানার মোটা মাইনের ইঞ্জিনিয়ার। হাবে-ভাবে আচারে-বিচারে প্রায় আধা সাহেব। তিনিও ক্ষমা করতে পারলেন না পরিমলদাকে। জাত মানার গোঁড়ামি তাঁর ছিল না, তা বলে একটা ইস্কুল মাস্টারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ?

বললেন, আমি ভাববো ছেলে ছিল না আমার, মরে গেছে আমার ছেলে।

বিকাশবাবু কিছু বললেন না, আগের চেয়ে আরও গম্ভীর হয়ে গেলেন, আর খিড়কি ঘরে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ একদিন দেওয়ালের ফটোটার দিকে চোখ যেতেই সেটা নামিয়ে এনে ভেঙে চুরমার করলেন, চুরমার করেও খুশি হলেন না। ফটোটা বের করে, যে ফটোতে বিকাশবাবু আর মাসীমার ছবির পাশে অন্য ছেলেমেয়েদের মধ্যে মীরা দাঁড়িয়ে অছে, সেটা বের করে আমাদের চোখের সামনেই পুড়িয়ে ফেললেন।

তারপর মাস ছয়েক কেটে গেল। প্রায় ভুলেই গেলেন মীরার কথা।

ইতিমধ্যে টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেল আমাদের, ফাইনাল পরীক্ষার জন্যে তোড়জোড় চলছে তখন। একদিন জনকয়েক বন্ধু মিলে সাইকেল চালিয়ে গিয়েছি কলোনির পশ্চিমে নতুন তৈরি পল্লীটার দিকে বেড়াতে।

হঠাৎ দেখি পরিমলদা একটা ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ফিটন থেকে মালপত্র নামাচ্ছে।

বললাম, পরিমলদা আপনি ?

পরিমলদা হাসল, আর সঙ্গে সঙ্গে ফিটন থেকে উঁকি দিল আরেকটি মুখ। কপাল অবধি ঘোমটা, লাজুক-মুখ তুলে তাকাল মীরা, হাতছানি দিয়ে কাছে ডাকল।

—বাবা কেমন আছে, ছোড়দা ?

মীরা কেন, মীরার বন্ধুবান্ধব অনেকেই আমাকে ছোড়দা বলতো।

আমি চুপ করে আছি দেখে ও আবার প্রশ্ন করল, বাবা কেমন আছে, ছোড়দা ? বলো না কেমন আছে ?

বললাম, ভাল। কিন্তু এ তুমি কি করলে মীরা ?

গাড়ি থেকে নামল ও, ঘোমটা খাটো করল। দেখলাম, সিঁথিতে বেশ চওড়া সিঁদুর টেনেছে। তবু আমার অনভ্যস্ত মন এটাকে কিছুতেই যেন বিয়ে বলে স্বীকার করতে চাইল না।

পরিমলদা তখন জিনিসপত্তর গোছগাছ করছে, মীরা ফিটনের ভাড়া মিটিয়ে ঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, এই তো ভাল ছোড়দা। আমার বিয়ের জন্যই তো মায়ের দুশ্চিন্তা ছিল এত, এ তো ভালই হল ! বলে হাসবার চেষ্টা করল।

তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল, মা ভাল আছে তো ?

বললাম, হ্যাঁ ? কিন্তু…

কিছু একটা হয়তো বলতে চেয়েছিলাম, বলতে পারিনি। ফিরে এসে প্রথমেই চলে গিয়েছিলাম পরিমলদার মায়ের কাছে। সব শুনে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি, তারপর বললেন, ও-ছেলের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক নেই, ও মুখ দেখতেও চাই না আমি। উঁচু নীচু জ্ঞান নেই যে-ছেলের সে আমার কেউ নয়।

পরিমলদার বাবা বললেন, ছেলে আমার মরে গেছে জানবো।

বিকাশবাবুকে খবর দিলাম। উনি শুনলেন শুধু, কোনো কথা বললেন না। আর মাসীমা দপ করে জ্বলে উঠলেন রাগে।—আমি না মরলে কি স্বস্তি নেই মীরুর। আবার এখানেই ফিরে এসেছে আমার মুখ পোড়াতে।

বুঝলাম, যা ভেঙেছে তাকে আর জোড়া লাগানো যায় না। মনে হল, স্নেহ ভালবাসা মায়া মমতা সব মিথ্যে, মানুষের কাছে আত্মসম্মানটাই বড়।

এর পর পরীক্ষার জন্যে এত ব্যস্ত ছিলাম, মীরার কথা, পরিমলদার কথা প্রায় মুছেই গিয়েছিল মন থেকে। পরীক্ষার পর যখন রেজাল্ট বের হল, প্রথমেই মনে পড়ল বিকাশবাবুকে, প্রণাম করতে গেলাম।

ফল শুনে খুশি হলেন বিকাশবাবু, একটা প্লেটে করে নিজেই দুটো বাড়ির-তৈরি মিষ্টি এনে দিলেন। তারপর নানা গল্পগুজব করতে করতে হঠাৎ একসময় ফিসফিস করে বললেন, হ্যাঁ রে মীরারা কোথায় আছে, তুই তো চিনিস বাড়িটা, না ?

বললাম, হ্যাঁ চিনি।

আমাকে একদিন নিয়ে যাবি ? কেউ যেন জানতে না পারে, তোর মাসীমাকেও বলবি না।

বললাম, বেশ তো।

—আর, আর এমন সময় যেতে হবে যখন পরিমল থাকবে না।

বললাম, দুপুরে পরিমলদা কারখানায় বেরিয়ে যায়, তখন গেলেই তো হয়।

দুপুর বেলাতেই গেলাম, একদিন, লুকিয়ে লুকিয়ে। আমি আর বিকাশবাবু।

শিকল নাড়তেই কপাট খুলে দিল মীরা। তারপরেই বাপ আর মেয়ে পরস্পরের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। মীরা যখন বিকাশবাবুকে প্রণাম করে উঠল, তখন শুধু মীরার চোখেই নয়, বিকাশবাবুর চোখ বেয়েও জল গড়িয়ে পড়ছে।

অনেকক্ষণ বসে রইলেন বিকাশবাবু, তারপর আসবার সময় বললেন, আমি এসেছিলাম একথা কাউকে বলিস না মীরা, পরিমলকেও না।

বলে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে এলেন। এর পর থেকে খোঁজখবর আনবার জন্যে মাঝে মাঝে যেতাম আমি মীরার কাছে, কোনোদিন বিকাশবাবুও যেতেন লুকিয়ে লুকিয়ে।

সেদিনও দুপুর বেলায় সাইকেল চালিয়ে চলেছি হঠাৎ, দেখি আগে আগে মাসীমার মতো কে যেন হাঁটতে হাঁটতে চলেছে, আর এক একবার থেমে থেমে আশপাশের লোকদের কি যেন জিজ্ঞেস করছে।

থেমে পড়লাম। একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে লক্ষ্য রাখলাম সেদিকে। এক একজনকে কি যেন জিজ্ঞেস করছেন আর এগিয়ে যাচ্ছেন মাসীমা, দেখতে পেলাম। শেষ পর্যন্ত যা সন্দেহ হয়েছিল তাই।

কপাটের কড়া নাড়লেন, কে যেন কপাট খুলে দিল, তারপর ভিতরে ঢুকলেন মাসীমা।

বাড়ির সামনে এসে অপেক্ষা করলাম। অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন মাসীমা, কয়েক পা এগিয়ে এলেন না দেখেই, তারপর হঠাৎ আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল তাঁর।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লেন। হেসে ফেললেন আবার চোখাচোখি হতেই।

এগিয়ে এসে আঁচলের খুঁটটা খুলে বের করলেন একটা রুপোর টাকা।

টাকাটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, পরীক্ষায় পাশ করেছিস, নে, মিষ্টি খাবি।

তারপর ফিসফিস করে বললেন, কাউকে বলিস না যেন, কেমন ? কেউ যেন না শোনে, তোর মেসোমশাইকেও না। বাড়ি গিয়ে আরেকটা টাকা দেবো তোকে।

হেসে ফেললাম। টাকাটা ফেরত দিয়ে বললাম, কোনো ভয় নেই মাসীমা কেউ জানবে না। বলবো না আমি, কক্ষনো বলবো না।

এরপরও মাসীমাকে না জানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে এসে মীরার সঙ্গে দেখা করে গেছেন বিকাশবাবু। আর বিকাশবাবুকে না জানিয়ে লুকিয়ে এসে দেখা করে যেতেন মাসীমা।

কিন্তু কি আশ্চর্য, হাবে-ভাবে আচার-বিচারে আধা সাহেব হয়েও জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পরিমলদার বাবা ছেলেকে ক্ষমা করতে পারেন নি, পরিমলদা আর মীরা বার বার গিয়ে ফিরে এসেছিল। পরিমলদার মা ছেলের মুখ দেখতেও রাজি হন নি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

মুখের ওপরই নাকি মানুষের সত্যিকার চরিত্র দেখতে পাওয়া যায় ! বুঝলাম. সব ভুল, সব ভুল। অন্তরের ছবি বাইরের চেহারা দেখে বোঝা যায় না। সুন্দর মুখের আড়ালে কত কুৎসিত মন লুকিয়ে থাকে, কুশ্রীতার ভেতর কত নির্মল মন !

আন্নামাসী। আন্নামাসীকে প্রথম যেদিন দেখেছিলাম, কত ভাল লেগেছিল। আর বিশ্বাস হয়েছিল রামাই পণ্ডিত সত্যিই সিদ্ধপুরুষ।

অথচ পরে যেদিন দুপুর বেলায় পরীর সঙ্গে গিয় হাজির হলাম, কম আশ্চর্য হই নি।

এই নাকি সর্বশক্তিমান রামাই পণ্ডিত ? যার মন্ত্রের শক্তিতে ভূতপ্রেত বশ হয়, হুকুম তামিল করে ক্রীতদাসের মতো ? যার দেওয়া বশীকরণ মাদুলি ধারণ করে প্রেমিক তার প্রণয়পাত্রীকে পায় আলিঙ্গনের মধ্যে, সেই রামাই পণ্ডিত কিনা সামান্য একটি নারীর

তর্জনীকে ভয় করে ? যে রামাই পণ্ডিত সাপের বিষ ঝাড়তে পারে, সাপিনীর ফণাকে তার এত ভয় ?

সব বিশ্বাস যেন মুহূর্তে নিভে গেল।

খড়েশ্বরের জীর্ণ মন্দিরটার পাশে পোড়ো ঘরটার পিছনের দরজা দিয়ে নিঃশব্দে ঢুকছিলাম আমি আর পরী। পাছে রামাই পণ্ডিতের ধ্যানে ব্যাঘাত ঘটে, তাই।

ভাঙা ইঁটের পাঁজা পার হয়ে সবে শ্যাওলা-পড়া কপাটের কাছে পৌঁছেছি, হঠাৎ আন্নামাসীর চিৎকার কানে এল।

—নচ্ছার বদমাশ, হতভাগা, পোড়ামুখো মিন্‌সে, হাড় ভেঙে দেবো না তোর হারামজাদা !

স্তম্ভিত হয়ে এক মুহূর্ত অপেক্ষা করেই কপাট ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়েছি তখন। দেখি একটা চেলা-কাঠ নিয়ে তাড়া করছে আন্নামাসী, আর রামাই পণ্ডিত কোণ-ঠাসা বেড়ালের মতো তাকিয়ে আছে কাতর দুটি চোখ মেলে।

আমাদের দিকে একচোখ তাকিয়ে নিয়েই আবার যেন ফেটে পড়ল আন্নামাসী।—পোড়ারমুখো মিন্‌সে আমার কাছেও ভেলকি দেখাতে চায়, হতভাগা। মেরে তোর আজ রক্তপাত করে তবে ছাড়বো নচ্ছার কোথাকার !

রামাই পণ্ডিত হাতজোড় করে অনুনয় শুরু করলে, ছেড়ে দে আন্না, ছেড়ে দে আন্না। তোর পা ছুঁয়ে বলছি আর কোনোদিন যদি—আর কোনোদিন যদি—

—কতোবার এ কথা বলেছিস বল তো হতভাগা। আন্নামাসীর রাগ আর কমতে চায় না।

পরী হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল, কি হয়েছে আন্নামাসী ?

—কি হয়েছে ? জিজ্ঞেস কর না মিন্‌সেকে। আমাকে বলে শ্মশানে যাই সাধনা করতে। আবার হিরিং-বিরিং মন্তর আওড়ায়। শ্মশানে গিয়ে চাঁড়ালদের একটা মেয়ের সঙ্গে পিরিত করে হতভাগা। তার সঙ্গেই যদি পিরিত করবি পোড়ারমুখো তো আমাকে কেন বের করে এনেছিলি ঘর থেকে ? বাপ মা ছিল না, ছিল না, ভাতার জুটতো না আমার, হতভাগা ?

আন্নামাসীর রাগ যেন কিছুতেই পড়তে চায় না।

সেদিন বাড়ি ফিরতে কি হাসিটাই না হেসেছিলাম আমরা।

সে-সব কথা আলোবৌকে জানাতে পারি নি। খুঁজে পাই নি তাকে। এসে বলেছিলাম শুধু রাঙামামীকে। আর তা শুনে হতাশায় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রাঙামামীমা বলেছিলেন, শুধু একটা কথার উত্তর জানতে চাই তিমু, তাও জানতে পাবো না ? বেহুলা স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলেছিল, আর আমি একটা কথার উত্তর জানতে পাবো না !

চোখ ছলছল করে উঠেছিল রাঙামামীমার।

আমার মন বলতো, নিরুর মামার মৃত্যু ঘটেছিল দুর্ঘটনায়, রাঙামামীর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটলেও তার সঙ্গে এ-মৃত্যুর কোনো সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই সহজ কথাটা কি করে বোঝাবো তাঁকে।

অঞ্জলিদিকেও তো বোঝাতে পারিনি, নিমাইদা সত্যিই ফিরে আসবেন একদিন।

নিমাইদা চলে যাওয়ার পর থেকেই কেমন একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করতাম অঞ্জলিদির মধ্যে। সব সময়ে চুপচাপ, বিষণ্ণ ম্লান মুখ। কথা বলতেন কম, আর দেখে মনে হতো চোখের আড়ালে যেন একরাশ কান্না থমকে আছে, কথা বললেই ঝরে পড়বে।

ঝরে পড়ল। যেদিন খবর এল নিমাইদা গ্রেপ্তার হয়েছে।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদলেন অঞ্জলিদি, আর মুখ তুলে চোখের ওপর থেকে ছড়িয়ে-পড়া চুলের খি সরাতে সরাতে আতঙ্কের ম্লান স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, নিমাইদা কবে ছাড়া পাবে

তিমু ?

আমার মনেও ব্যথার মোচড় দিল। ছলছল চোখে বললাম, তা তো জানি না। না-ও ছাড়তে পারে অঞ্জলিদি।

—না-ও ছাড়তে পারে ? হতাশায় ভেঙে পড়লেন যেন আবার।

অথচ কোনো সান্ত্বনাই খুঁজে পেলাম না।

সমুদ্রের জল থেকে নুন তৈরি করা কি এমন অপরাধ ?

অপরাধ নয়, গৌরব। সারা কলোনির লোক নিমাইদার জন্য যেন গর্বিত হয়ে উঠল। আর ক্রমে ক্রমে ভরে গেল হিজলীর জেলখানা নানা জায়গা থেকে ধরে গ্রেপ্তার করে আনা বন্দীতে।

একদিন বাবা বললেন, নিমাইদাকে নাকি হিজলীতে রাখা হয়েছে।

ছুটতে ছুটতে এলাম অঞ্জলিদির বাড়ি।

কিন্তু কপাট খুলতেই দেখি সামনে দাঁড়িয়ে নিভামাসী।

বললাম, অঞ্জলিদি কোথায় নিভামাসী।

—কেন ? বজ্রগম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন নিভামাসী। মুখ থমথমে।

বললাম, এমনি।

নিভামাসী হঠাৎ রাগে যেন ফেটে পড়লেন।—না, দেখা হবে না তার সঙ্গে।

—দেখা হবে না ? বিস্মিত না হয়ে পারি নি।

—না দেখা হবে না।

তারপর একটু থেমে বললেন, তুমি আর ছোট খোকাটি নও তিমু, অমন যখন-তখন অঞ্জুর কাছে এসে গল্প কোরো না।

অবাক হয়ে গেলাম। কিছু বুঝতে না পেরে অভিমানে ছলছল চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আচ্ছা।

ফিরে এলাম। চোখ ছাপিয়ে জল এল। কি এমন বড হয়েছি আমি, কত বড় ? অঞ্জলিদি তো আমার চেয়েও বড়। তবে ? বড় হয়েছি বলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে পাবো না ? কথা বলতে পাবো না ?

রাঙামামীমাও কি আমার সঙ্গে কথা বলবে না আর ? দেখা করবে না ?

সরাসরি অন্দরমহলে ঢুকে গিয়ে রাঙামামীমার সঙ্গে দেখা হতেই সেদিন প্রশ্ন করেছিলাম, আমাকে আর আসতে দেবে না ? কথা বলবে না আমার সঙ্গে ?

রাঙামামীমা হেসে উঠলেন শব্দ করে।—কেন তিমু, আসতে দেবো না কেন ?

—আমি বড় হয়েছি বলে ? নিভামাসী যে নিষেধ করল, অঞ্জলিদির কাছে যেতে, কথা বলতে ?

মৃদু হেসে রাঙামামীমা কাছে টেনে নিলেন আমাকে। বললেন, যত বড়ই হও, আমার কাছে এসো, যত খুশি কথা বলো। আমার কাছে তুমি চিরকাল ছোটই থাকবে ' কেমন ?

তারপর একে একে নিভামাসীর ওপর যত রাগ সব মুছে গিয়েছিল। মনের ক্ষোভ মুছে গিয়েছিল রাঙামামীর সঙ্গে সতী ঠাকরুনের চিতার গল্প করতে করতে।

বিশ ক্রোশ পথ গরুর গাড়িতে গিয়ে তারপর ময়নাগড় গ্রাম। সেই গ্রামে ছিল সতী ঠাকরুনের চিতা, রাখিপূর্ণিমার দিনে সতীর মেলা বসতো। আর সে-সময় হাজার হাজার যাত্রী নামতো এখানে। কেউ পিঠে মালপত্র নিয়ে, কেউ বা গরুর গাড়ি ভাড়া করে ময়নাগড়ে যেতো। মেলা দেখতে, চিতা দেখতে।

রাঙামীমামাও যেতে চেয়েছিলেন, যেতে পান নি। কোলের ছোট্ট ফুটফুটে ছেলেটা তখন দিব্যি হাঁটতে শিখেছে পা-পা করে। দাদু শুনে হেসেছিলেন।—এই কচি ছেলে নিয়ে

কেউ মেলা দেখাতে যায় বৌমা!

কিন্তু মনে মনে আমি আর রাঙামামীমা বহুবার ময়নাগড়ে ঘুরে এসেছিলাম। সতী ঠাকুরুণকে দেখেছিলাম কল্পনার চোখে।

সে হল গিয়ে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আমল। আকবর বাদশা যা পারেন নি, বেণ্টিঙ্ক বললে, আমি তা রোধ করবো। সতীদাহ প্রথার কলঙ্ক দূর করবো ভারতবর্ষ থেকে।

আকবর বাদশা পারেন নি, কারণ দেশের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দল তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিল। কিন্তু বেণ্টিঙ্কের সহায় হলেন রামমোহন, দ্বারকানাথ, দুর্গাচরণ দত্ত।

আইন হল, সতীদাহের ব্যাপারে কেউ কোনো সাহায্য করলে শাস্তি পাবে। আর নির্দেশ দেওয়া হল জেলায় জেলায়, কেউ স্বেচ্ছায় সহমরণে বা অনুমরণে যেতে চাইলে তাকে বোঝাতে হবে, বিরত করবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে কালেক্টরদের।

স্বামীর শবদেহকে আলিঙ্গন করে চিতায় দগ্ধ হওয়ার নাম ছিল সহমরণ, আর বিদেশে স্বামীর মৃত্যু হলে তার কোনো প্রিয়বস্তুকে বুকে নিয়ে চিতায় ওঠার নাম অনুমরণ। শুধু ব্রাহ্মণীদের ক্ষেত্রেই অনুমরণ ছিল অশাস্ত্রীয়। এ-সবই অবশ্য শুনেছিলাম সদাশিব জ্যাঠার কাছে। সতী ঠাকরুণের গল্পটাও।

তাই কল্পনায় দেখতে পেতাম সতী ঠাকরুনকে।

অমাবস্যার শ্মশান। চন্দন কাঠে সাজানো চিতা। আর সামনেই এক বৃদ্ধের মৃতদেহ। হরিবোল ধ্বনিতে শ্মশানবন্ধুরা বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে থেকে থেকে। দূরে একটা জ্বলন্ত চিতার ধারে রসিকতা করছে কয়েকটা চাঁড়াল।

আর এদিকে বৃদ্ধের মৃতদেহের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে অপরূপ সুন্দরী এক ব্রাহ্মণ বধূ। রূপলাবণ্যময়ী এক নারীমূর্তি দাঁড়িয়ে আছে স্থির অবিচলিত চোখ মেলে। রক্তবস্ত্র পরিহিতা সেই নীরব রূপ যেন লেলিহান অগ্নিশিখার মতো সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। সর্বশরীর স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিতা সেই ঘৃতস্নাত হরিদ্রাচর্চিত যৌবনদেহ স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাবে। সঙ্কল্পের প্রতীক হিসেবে তাই তার দক্ষিণ করে একটি আম্রশাখা।

হরিবোল ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ স্বামীর শবদেহ চিতায় তুলে দেওয়া হল। সদ্যবৈধব্যের শোক নয়, বধূর মুখে তৃপ্তির হাসি। যেন স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হতে চলেছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চললে সে, স্বামীর চিতার দিকে। এখনও সময় আছে, এখনও ফিরে যেতে পারে। সমাজ হয়তো তাকে ফিরিয়ে নেবে না আর, সঙ্কল্প-সতীর ফিরে যাবার সসম্মান পথ নেই। কিন্তু জীবন উপভোগে বাধা নেই তার। এমন যৌবনদেহ যার, ধনীর প্রমোদকক্ষে বিলাস-ব্যসনে জীবন কাটাতে পারবে সে। কিংবা রূপোপজীবিনীর গ্লানিময় স্বাধীনতা বেছে নিতে পারবে। কিন্তু সেও তো এক ধরনের সতীদাহ, তিলে তিলে মৃত্যু।

কিন্তু চিতা স্পর্শ করে যদি ভয় পায় তা হলে আর বাঁচবার উপায় নেই। কালেক্টরের চর এই নগণ্য গ্রামে এসে পৌঁছতে পারবে না। তার আগেই গ্রামের পণ্ডিতকুল, সঙ্কল্প-সতীর আত্মীয়স্বজন তাকে সহমরণে বাধ্য করবে।

কিন্তু কে জানতো কালেক্টর সাহেবের কাছেও এ-খবর পৌঁছে গেছে।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সতী ঠাকরুন। বিস্ময়ের চোখ তুলে সকলে তাকাল দূরের অন্ধকারে।

দূরের মাঠ থেকে যেন পালকিবাহী বেহারাদের চাপাস্বরের ধুয়ো ভেসে আসছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সিপাই-শান্ত্রী সমেত এসে দাঁড়াল পালকি। সাহেব কালেক্টর নামলেন পালকি থেকে।

তারপর সকলের দিকে একচোখ তাকিয়ে নিয়ে এগিয়ে গেলেন সতী ঠাকরুনের সামনে। হাঁটু গেড়ে টুপি খুলে সেলাম করলেন।

—সতী মাদার। তোমার ছেলের একটা আপীল আছে তোমার কাছে।

আপীলের পর আপীল। কত বোঝালেন সাহেব। এ-ভাবে চিতায় দগ্ধ হওয়ার মৃত্যুযন্ত্রণার ছবি এঁকে তাকে বিরত করার চেষ্টা করলেন। সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্যের লোভ দেখালেন। বিজ্ঞানের বুলি আওড়ালেন—পরজন্ম নেই, বৈকুণ্ঠ নেই। এ শুধু কুসংস্কার।

সাহেবের 'ডুবাশ' সব বাংলা করে বোঝালে। আব সব শুনে ম্লান হাসি হাসল সতী ঠাকরুন।

মৃদু তৃপ্তির হাসি হাসতে হাসতেই চিতায় উঠলেন সতী ঠাকরুন। স্বামীর শবদেহ জড়িয়ে শুয়ে পড়ে চিতায় অগ্নিসংযোগ করতে বললেন।

দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। আগুনের লেলিহান শিখায় ঝলমল করে উঠল সতী ঠাকরুনের রক্তবস্ত্র আর স্বর্ণালঙ্কার। প্রচণ্ড শব্দে বেজে চলেছে তখন ঢাক ঢোল আর কাঁসি। হরি হরি ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত।

কিন্তু সতী ঠাকরুনের মুখ থেকে কোনো আর্তনাদ শোনা গেল না। উচ্চনাদ ডমরুবাদ্যে কি সে আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল ? না, অগ্নি সংযোগের পূর্ব মুহূর্তেই আতঙ্কে হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার ?

কে জানে। শ্মশানবন্ধুরা শুধু দেখলে কালেক্টর সাহেব সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে পড়ে গেছেন।

সামান্য একটি অশিক্ষিতা নারীর দুর্জয় সাহসের কাছে পরাজয় স্বীকার করে ফিরে গিয়েছিলেন সেই কালেক্টর সাহেব। আর প্রচার করেছিলেন যে স্বামীর মৃত্যুতে হিন্দু নারীর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে।

কিন্তু গ্রামবাসীর কাছে সতী ঠাকরুনের চিতা হয়ে উঠল পুণ্যস্থান, পবিত্রভূমি। এই চিতাভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল কিংবদন্তী, আর কিংবদন্তীকে কেন্দ্র করে সতী ঠাকরুনের মেলা।

সদাশিব জ্যাঠার কাছে এ-গল্প শুনেছিলাম। কিন্তু জীবিত অবস্থায় দগ্ধ হওয়ার জ্বালা নেই যন্ত্রণা নেই, এ-কথা বিশ্বাস হতো না।

আমার অবিশ্বাস দেখে কিন্তু হেসেছিলেন রাঙামামীমা। পুজোর ঘরে বসে চন্দন ঘষছিলেন, হঠাৎ ফিরে তাকালেন আমার মুখের দিকে।

বললেন, আগুনে পুড়তে কষ্ট হয় ?

—হয় না ?

রাঙামামীমা হাসলেন। তারপর প্রদীপের শিখার ওপর একটা আঙুল রাখলেন। এক মিনিট, দু-মিনিটি।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলাম, সরিয়ে নাও, সরিয়ে নাও, পুড়ে যাবে।

তবু আঙুল সরালেন না রাঙামামীমা। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ঠোঁট টিপে টিপে। আমি হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিলাম।

সদাশিব জ্যাঠা শুনে বলেছিলেন, একাগ্রতা থাকলে মানুষের পক্ষে সবই সম্ভব তিমু। সে-যুগে স্বেচ্ছায় সহমরণে যেতো অনেকেই, কিন্তু এ আত্মনিধনের, এ-বীরত্বের মূল্য কতটুকু ?

মূল্য নেই ? তা হলে উদ্ভব হল কেন এ প্রথার। লক্ষ লক্ষ হিন্দুনারী আত্মাহুতি দিল কি শুধুই মিথ্যা মরীচিকার আগুনে।

সদাশিব জ্যাঠা হেসেছিলেন।—না, সাময়িক সত্যের আগুনে। যা যুগসত্য, চিরন্তনের কাছে তা মিথ্যা। চিরন্তন সত্য মাত্র একটি—গতিই একমাত্র সত্য। চক্রবৎ চলেছে মানুষ, মানুষের জীবন, পৃথিবী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ইন্দ্রিয়সুখের মধ্যে মানুষের জন্ম, মানুষের সমাজবৃদ্ধি।

কিন্তু অনাচার তৃপ্তি দিতে পারে না সারা জীবন। তাই সতীত্ব আর ব্রহ্মচর্যের আদর্শে শান্তি আর শ্রী খুঁজেছিল মানুষ। যেমন একদল সংযমকে বলেছিল ব্রহ্ম—তাও অতৃপ্তিই এনেছে। আবার অনাচারে ফিরে চলেছে মানুষ। কিছুই স্থায়ী নয়, সবই অনিত্য।

—বর্ণাশ্রম ধর্মও মুছে যাবে? বিস্মিত হয়ে বলেছিলাম।

—না। কিছুই মুছে যায় না। চক্রবৎ ঘুরবে, শুধু একজনের স্থানে আরেকজন এসে সিংহাসন অধিকার করবে। মন্ত্রপাঠের মতো গুরুগম্ভীর স্বরে বলেছিলেন। আর সে কথা বহুদিন ধরে মনের মধ্যে তোলপাড় তুলেছিল।

চক্রবৎ ঘুরছে পৃথিবী। অতৃপ্তিই মানুষের ধর্ম, অতৃপ্তি আছে বলেই সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। আবার অতৃপ্তির জন্যেই মানুষের অধঃপতন।

অতৃপ্তির জন্যেই মানুষের অধঃপতন!

কথাটা যে কতখানি সত্যি, বুঝতে পেরেছিলাম আলোবৌয়ের জীবন থেকে। আর সে-জীবনের অজ্ঞাত দিকটা মেলে ধরেছিল পরী।

আশ্চর্য চরিত্র এই পরী। যত ভাবি ততই বিস্মিত হতে হয়।

মনে আছে, রামাই পণ্ডিতের বুজরুকি ধরা পড়ে যাওয়ার পর কেমন যেন মুষড়ে পড়েছিল ও।

বেচারার কত স্বপ্ন ছিল। রামাই পণ্ডিতের শিষ্য হবে, তন্ত্র সাধনা করে সিদ্ধাই হবে। স্বাধীনতা আনবে, পৃথিবী শাসন করবে মন্ত্রের জোরে। আর তাও যদি না হয় তো বশীকরণ মন্ত্রটা শিখে নিয়ে ইচ্ছে মতো কাজে লাগাবে।

আন্নামাসীর চেলা-কাঠের ভয়ে রামাই পণ্ডিতকে বেড়ালছানার মতো চোখ মিট-মিট করতে দেখে হতাশায় ভেঙে পড়েছিল পরী। বহুদিন আর দেখা মেলে নি তার।

ভেবেছিলাম নিমাইদার মতো হয়তো নুন তৈরি করতে গেছে।

স্বদেশীওয়ালাদের নুন যাতে কেউ না খায় তার জন্যে কি কারসাজিটাই না করেছিল গভর্নমেণ্ট। বস্তা বস্তা নুন এসে জমা হয়, অথচ কেউ কেনে না। কিনলেও খায় না, ফেলে দেয় লুকিয়ে লুকিয়ে।

তারপর জানা গেল ব্যাপারটা। কয়েকজন ডাক্তারকে ঘুষ দিয়ে গভর্নমেণ্ট স্বাস্থ্যরক্ষা সমিতির নামে প্রচার চালিয়েছিল, স্বদেশীদের নুন নাকি বিষাক্ত, বৈজ্ঞানিক পন্থায় তৈরি নয়।

—বৈজ্ঞানিক পন্থা? হেসেছিল পরী। সব গাঁজা, সব গাঁজা; এই তো বানিয়েছি ঘরে, শুঁকে দেখ, বিলিতীর চেয়ে কম নয় কোনোখানে। বলে হাতের ওপর খানিকটা এসেন্স ঘষে দিয়েছিল পরী।

সেদিন কাকে যেন ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলাম। গাড়ি এসে থামতেই একটা কামরা থেকে নামল পরী, হাতে ছোট্ট একটা সুটকেস। নেমেই পাশের কামরাটায় উঠল। আমাকে ও দেখতে পায় নি।

ভেবেছিলাম, নিশ্চয় ডব্লু-টি। উইদাউট টিকেট। তাই টিকিট চেকারকে দেখে কামরা পাল্টাল।

পাশের কামরার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে দেখি সুটকেস খুলে কয়েকটা শিশি হাতে নিয়ে সুর করে কি সব আউড়ে যাচ্ছে।

শুনে হেসে উঠেছিলাম হো-হো করে। ধন্যি ছেলে যা হোক।

কামরা থেকে নামতেই খপ্ করে একটা হাত ধরলাম পরীর।

বললাম, এ-সব কি ব্যাপার?

পরী হেসে বললে, গ্রাণ্ড স্বদেশী স্নো-সেন্ট ফ্যাক্টরি। নিজের হাতে তৈরি করি আর ট্রেনে

ফিরি করি।

—হঠাৎ ব্যবসায়ে মন গেল যে!

—না গিয়ে রোড কি, ব্রাদার। বাবা বৈকুণ্ঠপুরে বদলি হয়ে গেলেন, এখন তো নিজের লেগ্-এ দাঁড়াতে হবে।

বিস্মিত হয়ে বললাম, বৈকুণ্ঠপুর ? সে কোথায় ? তুই তো সেখানে চলে গেলেই পারিস।

—বৈকুণ্ঠপুরে পোস্ট আপিসও নেই ফ্রেণ্ড। যাওয়া তো দূরের কথা। আর আমি যাবো ? কোন দুঃখে শুনি ? আমার বাঁশতলী বেঁচে থাক।

বাঁশতলী নামটা শুনেই সারা গা ঘিন-ঘিন করে উঠল। উপনগরের পুবে একটা নোংরা পল্লীর নাম ছিল বাঁশতলী। তাই, নিজের অজ্ঞাতেই বোধ হয় পরীর স্পর্শ বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে হাঁটছিলাম।

তারপর বাড়ি ফেরার পথে পরী হাসতে হাসতে বললে, তুই ছেলেমানুষই থেকে গেলি তিমু।

—কেন ?

—কথার মানে বুঝিস না কেন ? বৈকুণ্ঠপুর বলে সত্যিই কোনো জায়গা আছে নাকি ? বৈকুণ্ঠ হল স্বর্গ, বাবা স্বর্গে গেছেন।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বাপের মৃত্যু নিয়ে কেউ এমন রসিকতা করতে পারে ?

অথচ এই পরীই একদিন বাপের মর্যাদা রাখতে গিয়ে মার খেয়েছিল পাঞ্জাবী ট্যাক্সি ড্রাইভারের কাছে। হর্ন শুনতে পায় নি বলে ওর বাবাকে কি যেন বলেছিল ড্রাইভারটা, আর তা শুনতে পেয়ে একটা লাঠির বাড়ি মেরেছিল পরী। ওর রোগা কব্জির মার খেয়ে পাগড়িটাই শুধু খুলে গিয়েছিল পাঞ্জাবীটার। তারপর কি মারটাই না মেরেছিল পরীকে।

সেই পরী আজ এই মানুষ! তবু রাগ চেপে রেখে বললাম, বৈকুণ্ঠপুর তো স্বর্গ, বাঁশতলীটা ঐ নরকই তো ?

পরী হাসল।—না ঐ নরক নয়। তবে নরক বটে। মানে মালঞ্চর যে বাড়িটায় থাকি তার পাশে কয়েকটা বাঁশঝাড় আছে।

—ও। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললাম।

পরী আবার হাসল।—যাবি ? চল না, আমার কারখানা দেখাবো তোকে। কিছু টাকা যদি পেতাম তিমু, একটা ফ্যাক্টরি করতাম! স্নো সেন্টেই দেশের সব টাকা বিলেতে চলে যায়, বুঝলি ? নুন-টুন সব বাজে, সাবান আর সেন্ট যদি বিলেত থেকে না আসে তা হলেই দেখবি দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। সাহেবরা তো গোখলে সেন্ট নেবে না, তাই ঠিক করেছি 'ইভিনিং ইন লণ্ডন' বলে একটা লেবেল ছাপাবো। চল্ দেখাবো ডিজাইনটা।

গিয়েছিলাম। পরীর কারখানা দেখতে। গিয়ে যার দেখা পেলাম কোনোদিন তাকে পরীর ঘরে দেখতে পাবো কল্পনাও করি নি।

বললাম, আলোবৌ—তুমি ?

আলোবৌ ম্লান হাসি হাসল। জবাব দিল না কথার।

তারপর জিজ্ঞেস করল, কেমন আছো তিমু, সব ভাল তো ? উঃ কতকাল দেখা হয় নি বলো তো!

বললাম, আমি কিন্তু অনেকবার খুঁজেছি তোমাকে।

আলোবৌ হাসল। বাবা, মা সব ভাল তো ?

উত্তর দিয়ে বললাম, লক্ষ্মী কোথায় আলোবৌ ?

—লক্ষ্মী ? বিষণ্ণ দেখাল ওকে, বললে, ওদের নাম আর মুখে এনো না তিমু, যথেষ্ট

শিক্ষা হয়েছে আমার।

বলে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

পরী সেন্ট বিক্রি করা খুচরো পয়সাগুলো আলোবৌয়ের হাতে তুলে দিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে হাসল।—আমার গুড্ মাদার!

—মানে!

বাইরে বেরিয়ে এসে মানেটা বলল পরী!—বাপের ক্যারেক্টর তো জানতিস। তা বুড়ো যাকে বাড়িতে এনে রেখেছিল, তাকে তো আবার বাঁশতলীতে ফিরে যেতে দেওয়া যায় না। মন্ত্র পড়ে বিয়ে হয় নি বলে কি মা নয়? ও আমার সৎ মা, গুড্ মাদার।

১৮

আবিদ হোসেন লোকটা আমার কাছে চিরকালের বিস্ময়। কিন্তু তার চেয়ে বড় বিস্ময় ফুলজান বিবি।

চাঁদমারি ময়দানের দিকে বেড়াতে গেছি। একেবারে যে উদ্দেশ্যহীন ভাবে তা নয়। মনে একটা গোপন বাসনা ছিল। সাহেবপাড়ার এ-পথ ও-পথ ঘুরে খুঁজে পেয়েছিলাম রবার্টদের বাংলোটা। বারকয়েক চক্রও দিয়েছিলাম। যদি রবার্ট বা ক্লারাব দেখা পাই, হঠাৎ যদি দেখতে পেয়ে ডাকে।

মাঝে মাঝে কবরস্থানে দেখা হতো ওদের সঙ্গে, সীতা কোলম্যানের কবরে ফুল দিয়ে যেতো যখন। নিমন্ত্রণও জানিয়ে যেতো, কিন্তু কোনোদিনই নিজে থেকে বাংলোটায় ঢুকতে পারি নি। কেমন এক অস্বস্তি বোধ করতাম।

সেদিনও বাংলোটাকে বার-কয়েক চক্র দিয়ে চলে এলাম একেবারে চাঁদমারির দিকে।

ও কে? মুস্তাফা না? দূর থেকে দেখলাম একটা কালভার্টের গায়ে সাইকেলটা ঠেস দিয়ে রেখে বসে আছে মুস্তাফা। উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে আছে হিজলীর জেলখানার চূড়াটার দিকেই হয়তো।

কাছে এসে বসলাম।—কি রে, কবি হয়ে গেলি নাকি?

দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলাম। আর হতাশার স্বর:

বললে, না ভাবছি।

—কি ভাবছিস?

—ফুলজানের কথা।

—ফুলজান কি বলে? কদ্দুর এগিয়েছিস? রসিকতা করে জিজ্ঞেস করলাম।

আর পরমুহূর্তেই কেমন যেন ভেঙে পড়ল মুস্তাফা। বললে, শুনিস নি? তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ফুলজান পালিয়েছে।

—পালিয়েছে?

—হ্যাঁ, সেই জুতো-পালিশ সাহেবের সঙ্গে।

সে কি! আবিদ হোসেনের বিবিকে নিয়ে পালিয়েছে কিনা একজন নগণ্য মুচি? হোক সাহেব, মুচি তো!

বললাম, আবিদ হোসেন পুলিসে খবর দেয় নি?

—না। ম্লান হাসল মুস্তাফা।—আবিদ হোসেন একেবারে চুপ করে আছে, একটা কথাও বলে না কারও সঙ্গে। বোধহয় আত্মহত্যা করে বসবে। খুব ভালবাসতো কিনা,

ফুলজানকেই ও ভালবাসতো।

বিস্মিত হয়ে বললাম, আর তার প্রতিদান দিল সে এইভাবে?

মুস্তাফা হাসল।—প্রতিদান? আমিই কি কম ভালবাসতাম? মেয়ে জাতটাই অবিশ্বাসী, বুঝলি তিমু। কোনোদিন বিশ্বাস করিস না ওদের!

শুনে হেসেছিলাম মনে মনে। মুস্তাফার যত আক্রোশ যেন ফুলজানের ওপর। অথচ আমার দুঃখ হয়েছিল ফুলজানের জন্যে।

আর, আর আবিদ হোসেনের জন্যে।

জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষা ঐশ্বর্য—তা পেয়েছিল আবিদ হোসেন। পেয়েছিল প্রভুত্বের শক্তি। কিন্তু ভালবাসা তো টাকা দিয়ে কেনা যায় না। সব পেয়েও তাই ভালবাসা পায় নি সে, আর পায় নি ভালবাসার আশীর্বাদ—সন্তান।

আমার চোখে আবিদ হোসেন ছিল ইতিহাসের প্রতীক। একটি সুদীর্ঘ যুগ, অন্ধকার থেকে মুক্তির আলো ছুটে আসার একটি বিস্তৃত কাল যেন কিংবদন্তীর মতো জড়িয়ে ছিল আবিদ হোসেনের গায়ে। সেই ইতিহাসও তা হলে ব্যর্থ হতে পারে, ভুল পথে যেতে পারে। ইতিহাসও সত্য নয়, সুখের সার্থকতার পথ নয়?

না! সদাশিব জ্যাঠা বলেছিলেন, ইতিহাস হল লোভ আর অতৃপ্তির কর্মফল।

বলেছিলেন, এই যে বর্ণাশ্রম ধর্ম—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র—এ ধর্মের কথা নয়, অর্থনীতির কথা, রাজনীতির কথা।

সেই আদিম যুগে মানুষ প্রথম যখন সমাজ তৈরি করল, তখন শক্তি হাতে পেয়েছিল ব্রাহ্মণ। সে ব্রাহ্মণকে গলার পৈতে দিয়ে চিহ্নিত করতে হয় নি, তার বুদ্ধি আর চাতুর্য, কৌশল আর জ্ঞানই ছিল ব্রাহ্মণত্বের পরিচয়। আর সেই বুদ্ধি-বলেই সমাজকে শাসন করেছে সে। জন্ম হয়েছে মন্ত্রতন্ত্রের।

—তারপর?

তারপর সমাজের মধ্যে যারা শক্তিশালী, যারা দুঃসাহসী আর বীর তারা হঠাৎ আবিষ্কার করল, তাদের বাহুবলের ওপর নির্ভর করেই ব্রাহ্মণ শক্তিমান হয়ে বসে আছে। তা হলে সে নিজেই কেন রাজা হয়ে বসবে না, কেন প্রাধান্য দেবে ব্রাহ্মণকে? তাই শুরু হল ব্রাহ্মণ আর ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সংঘর্ষ। জন্ম হল রাজতন্ত্রের। পরশুরাম কুঠার হাতে পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করবার জন্যে বেরিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি বুঝতে পারেন নি কখন 'প্রজ্ঞা'র বদলে 'পরশু' হাতিয়ার নিয়ে নিজেই ক্ষত্রিয়ে রূপান্তরিত হয়ে গেছেন। আর ক্ষত্রিয়-শক্তি বুঝতে পারে নি তার প্রধান শত্রু ব্রাহ্মণ নয়, বৈশ্য।

—ক্ষত্রিয়ের শত্রু বৈশ্য?

হ্যাঁ, বৈশ্যও একদিন আবিষ্কার করেছিল, ক্ষত্রিয় তার অর্থেই সিংহাসন রক্ষা করছে। তারই দেওয়া রাজস্ব ক্ষত্রিয়ের রাজকোষে জমা হয়। যুদ্ধেবিগ্রহে বৈশ্যেরই অর্থ নিয়ে—কখনো কর্জ নিয়ে, কখনো বা কেড়ে নিয়ে সৈন্য সংগ্রহ করে, যুদ্ধে জয়লাভ করে, রাজ্য রক্ষা করে ক্ষত্রিয়। সুতরাং সে নিজেই কেন সমাজ, দেশ, মানুষকে শাসন করবে না?

তাই জন্ম হল বৈশ্য-শক্তির। ধনতন্ত্রের।

—তারপরে?

সদাশিব জ্যাঠা হেসেছিলেন।—পৃথিবী জুড়ে এই বৈশ্য-শক্তির রাজত্ব চলছে তিমু, দ্বন্দ্ব চলছে তার রাজশক্তির সঙ্গে। আজকের বৈশ্যের যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা রাজার সঙ্গে। কিন্তু ক্ষত্রিয়ের মতোই এরাও বুঝতে পারছে না, শত্রু কে।

শূদ্র আজ ভাবছে, আমারই পরিশ্রম, আমারই শক্তিকে শোষণ করে বৈশ্যের ঐশ্বর্য বাড়ে। সে-ঐশ্বর্য আমি নিজেই কেন উপভোগ করবো না, কেন দেশ সমাজ মানুষ

আমাদেরই অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চলবে না।

চলবেও। শূদ্রও রাজত্ব পাবে, শক্তি পাবে। ঐ যে ইউনিয়ন, বন্দেমাতরম্, ম্যাজিস্ট্রেট মারা, এ-সবই শূদ্রের রাজত্ব আসবার জন্যে। আসবেও সে রাজত্ব।

আসবে ? খুশি হয়ে উঠেছিলাম।

—আসবে সেদিন ? বাবা বলেন, সেদিন এলে নাকি মানুষের আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

সদাশিব জ্যাঠা হেসেছিলেন।—তা জানি না তিমু। সুখ দুঃখ বড় সূক্ষ্ম মনের ব্যাপার। যে তীব্র দুঃখ পায়, দুঃখ অনুভব করতে পারে, সেই মানুষই সুতীব্র সুখও অনুভব করতে পারে। যার দুঃখ নেই তার আনন্দও নেই। কিন্তু কি ভয় হয় জানো তিমু ? ভয় হয়, শূদ্রও বোধ হয় তার শত্রুকে চিনতে পারবে না। বৈশ্যকে শত্রু ভেবে শুধুমাত্র তারই উৎখাতে মন দেবে, আর সেই সুযোগে ব্রাহ্মণ—অর্থাৎ বুদ্ধিমান যে, কৌশলী আর চতুর যে, শক্তি লুণ্ঠন করবে। শূদ্র যেদিন শক্তি পাবে, বৈশ্য সেদিনই তার বন্ধু হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হবে, অথচ দেখবে শূদ্র সেই বন্ধুকেই বিনাশ করতে চাইবে। আর পিছন থেকে কখন সিংহাসন অধিকার করে বসবে কৌশলী ব্রাহ্মণ।

এই নাকি নীতি, এই হল ইতিহাস। চক্রবৎ চলেছে পৃথিবী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। মানুষ, সমাজ, দেশাচার, রুচি—সবই চাকার মতো ঘুরে চলেছে। ঘুরে চলাই প্রকৃতি। আমাদের কাজ, মানুষের কাজ এই চক্রবৎ প্রকৃতির মধ্যে গতি এনে দেওয়া। ঘুরুক, কিন্তু একই বৃত্তে নয়, ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে চলুক প্রকৃতি, সব মানুষের সমান কল্যাণের জন্যে। সাপের খোলস ছাড়ার মতো পোশাকটুকুই বদলায় সব কিছুর, কিন্তু আপনা থেকে বিষ খায় না। গরলকে অমিয় বানানোর কাজ আমাদেরই করতে হবে। বিষ দূর করতে হবে মানুষকেই।

বিষ ?

আরও অনেক কথা বলেছিলেন সদাশিব জ্যাঠা, অনেক কথাই বলতেন, কিন্তু সে বয়সে অতোশতো কি বুঝতাম ? বিষ ! ছোট্ট এতটুকু একটা শব্দ, কানে যেতেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম।

মনে পড়ে গিয়েছিল অঞ্জলিদির কথা।—আমাকে একটু বিষ এনে দিতে পারিস তিমু ?

হাসপাতাল থেকে 'পয়জন' লেখা একটা শিশি চুরি করে এনে দিয়েছিলাম। তখন বুঝতে পারি নি।

নিভামাসী নিষেধ করার জন্যে নয়, অঞ্জলিদি নিজেও কেমন যেন লুকিয়ে লুকিয়ে থাকতেন। দেখা করতেন না, দেখা করতে দিতেন না।

তবু হঠাৎ একদিন ঢুকে পড়েছিলাম অঞ্জলিদির ঘরে। নিভামাসীকে মন্দিরের দিকে যেতে দেখেই ছুটতে ছুটতে এসে দরজার কড়া নেড়েছিলাম।

—কে ? কপাটের ওদিক থেকে অঞ্জলিদির কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

চাপা গলায় বললাম, আমি তিমু, শিগ্গির দরজাটা খোলো অঞ্জলিদি। খুট করে শব্দ হল, দরজা খুলে উৎকণ্ঠার চোখ মেলে তাকালেন অঞ্জলিদি।

একমুখ হেসে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে আর কথা বলবে না, দেখা করবে না অঞ্জলিদি ?

অঞ্জলিদি ম্লান হাসি হাসলেন।—নিমাইদার কোনো খবর পেয়েছিস তিমু ?

—নিমাইদা ? নিমাইদার জেল হয়ে গেছে, কবে ছাড়বে ঠিক নেই। কেন যে নুন তৈরি করতে গেল। বলে চোখ তুলে তাকালাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল অঞ্জলিদি যেন অনেক সুন্দর হয়ে উঠেছে।

বললাম, তুমি খুব মোটা হয়েছো অঞ্জলিদি, সত্যি খুব মোটা হয়েছো।

অঞ্জলিদি হাসলেন, বিষণ্ণ হাসি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, তুই আর আসিস না তিমু, নিমাইদা ফিরলে তবেই খবর দিতে আসবি!

বলে হঠাৎ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।—কে জানে নিমাইদা ফিরে আসা পর্যন্ত বাঁচবো কি না।

সারাটা দিন এই একটা কথাই মনের মধ্যে ঘুরেছিল। কেন বাঁচবে না অঞ্জলিদি? কেন? কেন?

দিন কয়েক পরেই রহস্যের চাবি খুঁজে পেলাম।

নিরুর মা আর মীরার মা গল্প করছিলেন।

নিরুর মা বললেন, দুঃখ করে কি হবে, দিদি, এ অনেক ভাল। ভালবেসে বিয়ে করেছে মীরা, সে আর লজ্জার কথা কি! অঞ্জলির মতো তো নয়।

—অঞ্জলি? নিভাদির মেয়ে অঞ্জলি? সে আবার কি করল? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন মীরার মা।

আর নিরুর মা কৌতুকের হাসি হেসে ফিসফিস করে কি যেন উত্তর দিয়েছিলেন।

কথাগুলো সেদিন শুনতে পাই নি, কিন্তু আমিও জেনেছিলাম। পরীর কাছে। আর সেদিন কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম।

—দেখিস শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করতে হবে অঞ্জলিদিকে। পবী হাসতে হাসতে বলেছিল।

সে-কথা শুনে সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল আমার। আত্মহত্যা করতে হবে?

না, না। ভগবান, অঞ্জলিদিকে যেন আত্মহত্যা করতে না হয়।

সোয়া পাঁচ আনার ফুল আর বাতাসা কিনে রামমন্দিরে পুজো দিয়ে এসেছিলাম। মনে মনে প্রার্থনা জানিয়েছিলাম, অঞ্জলিদিকে যেন আত্মহত্যা করতে না হয়। তবু, শান্তি পাই নি হিন্দুস্থানীদের সীতারামের মূর্তির কাছে পুজো দিলে কি কাজ হবে! সন্দেহ জেগেছিল।

মনে হয়েছিল, দুর্গা মন্দিরে মা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠার কথায় যদি অত বাক্‌বিতণ্ডা হয়ে কাজটা বন্ধ না হতো। কালীর কাছে পুজো দিতে পারলে হয়তো আরও বেশি ফল হতো।

মা কালী ইচ্ছে করলে সব পারেন।

একাই খড়্গেশ্বরের মন্দিরে চলে গিয়েছিলাম একদিন। খড়্গেশ্বরের পুজো দেবার জন্যে। মাঠের পর মাঠ পার হয়ে। ভাঙা পুরোনো মন্দিরটায় যেতে যেতে গা ছমছম করে উঠেছিল, কাঠবেড়ালীর শব্দে চমকে উঠেছিলাম প্রথমটা। তবু ভয় পেয়ে ফিরে আসি নি।

গিয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। কয়েকটা মাটির হাঁড়ি, ভাঙা সরা, উনোনে একরাশ ছাই আর এঁটো পাতা কয়েকটা।

তন্নতন্ন করেও আন্নামাসী বা রামাই পণ্ডিতকে খুঁজে পাই নি। ব্যথায় ব্যর্থতায় চোখ ঠেলে জল এসেছিল।

তবে কি অঞ্জলিদি বাঁচবেন না!

সন্ধের পর লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলাম অঞ্জলিদির ঘরের সামনে।

টুক্-টুক্ টুক-টুক শব্দ করতেই দরজা খুলে দিলেন অঞ্জলিদি। বিরক্ত হয়ে বললেন, আবার এসেছিস?

—বিষের শিশিটা ফেরত দাও অঞ্জলিদি, ফেরত দাও। ও তুমি খেতে পাবে না, কক্ষনো না। দেখো, নিমাইদা ঠিক ফিরে আসবে।

—আসবে? মুখে হাসি উছলে উঠেছিল।—ভয় নেই তিমু, ও বিষ আমি ফেলে দিয়েছি।

তবু বিশ্বাস হয় নি। যাকে আত্মহত্যা করতে হবে, হাতে বিষ পেয়েও সে ফেলে দিতে পারে?

ভেবে কূল কিনারা পাই নি। কি করবো। কি করা উচিত।

চলে গিয়েছিলাম নিমাইদার বন্ধু অবনীদার কাছে।

আড়কাঠির কাজ করতেন অবনীদা, মাঝে মাঝে চলে যেতেন দূরে দূরে, গাড়ি-বোঝাই কুলি নিয়ে ফিরতেন।

অবনীদার নামে সকলে কত কি বলতো। কামিন মেয়েদের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে কুৎসা রটনার অন্ত ছিল না।

অবনীদার বাড়িতে ঢুকেই থমকে দাঁড়াতে হল।

খাটিয়ায় শুয়ে আছেন অবনীদা, আর একটা ছত্রিশগড়িয়া মেয়ে পা টিপছিল তাঁর। আমাকে দেখতে পেয়েই খাটিয়া থেকে উঠে সরে দাঁড়াল সে।

চিনতে পেরে বললাম, বিলাইতি না?

ফিক্ করে হাসল বিলাইতি। আর অবনীদা উঠে বসলেন!—তুই চিনলি কি করে?

—বাঃ রে, আমাদের বাংলোর সামনে তো ও রাস্তা তৈরির সময় কাজ করতো।

—বটে? হাসলেন অবনীদা, পরী যেভাবে হেসেছিল সেদিন। তারপর হঠাৎ বললেন, বিয়ে করছি তিমু।

—সত্যি?

—হ্যাঁ, অঞ্জলিকে। তোদের বাংলোর উত্তরে···

বললাম, অঞ্জলিদিকে? কিন্তু···

বলতে গিয়েও পারি নি।

তারপর সেই বিয়ের রাত।

পিঁড়িতে পাশাপাশি বসেছিলেন অবনীদা আর অঞ্জলিদি। অবনীদার হাতের ওপর অঞ্জলিদির হাত। বিয়ের মন্ত্র পাঠ হচ্ছে। চারিদিক চুপচাপ।

অবনীদার বাবা বসেছিলেন সামনেই একটা চেয়ারে। সেই প্রথম অবনীদার বাবাকে দেখলাম। দেশ থেকে এসেছিলেন ছেলের বিয়ে দিতে।

হঠাৎ কেমন যেন একটা উসখুস শুরু হল। কানাঘুষো, তারপর হৈ-চৈ। কে যেন কানে কানে অবনীদার বাবাকে কি বললো। মুখের চেহারাই বদলে গেল তাঁর।

উঠে দাঁড়িয়ে বজ্রগম্ভীর গলায় হাঁক ছাড়লেন।—অবনী!

শুধু অবনীদা নয়, অঞ্জলিদিও চমকে চোখ তুললেন। পরক্ষণেই চোখ নামিয়ে নিলেন অঞ্জলিদি।

অবনীদার বাবা তখনও রাগে কাঁপছেন। চিৎকার করে উঠলেন, উঠে আয় অবনী, উঠে আয়। কুলটা মেয়েকে ঘরের বৌ করে নিয়ে যাবো না আমি। উঠে আয় এখনি।

শুনে মৃদু হাসলেন অবনীদা। যেমন বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন।

তারপর পুরুত ঠাকুরকে বললেন, থামলেন কেন ঠাকুরমশাই? আপনি মন্ত্র বলুন।

আবার মন্ত্র-পাঠ শুরু হল। অবনীদার বাবা রেগে বেরিয়ে গেলেন। আর শুভদৃষ্টির জন্যে অঞ্জলিদি আর অবনীদাকে যখন তুলে নিয়ে গেল, হঠাৎ চোখে পড়ল অঞ্জলিদির পিঁড়ির সামনে মাটিতে কয়েক ফোঁটা শিশির পড়েছে।

১৯

অঞ্জলিদির বিয়ের হৈ-চৈ হট্টগোল শান্ত হল। হাসি ফুটলো অঞ্জলিদির মুখে।

বিয়ের পর মা বাপকে ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় সব মেয়েই কাঁদে। সেজদিও

কেঁদেছিল। কিন্তু, মনে হল অঞ্জলিদি যেন খুশি চেপে রাখছেন। এতদিনের চাপা দুঃখ সব যেন দূর হয়ে গেছে। আর অবনীদার মুখ দেখেও মনে হল, কোনো ক্ষোভ নেই তাঁর। কোনো অনুশোচনা নেই।

শুনলাম, কোলকাতায় খিদিরপুরের ডকে কি যেন কাজ পেয়েছেন অবনীদা। অঞ্জলিদিকে নিয়ে সেখানেই চলে যাবেন। বুঝতে কষ্ট হল না, এই কানাঘুষো অপবাদ থেকে অঞ্জলিদিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চান অবনীদা, আর তাই মনে মনে খুশিও হলাম। এই ভাল। নতুনভাবে জীবন শুরু হোক অঞ্জলিদির।

অঞ্জলিদির বিয়েতে 'আড়কাঠি' অবনীদার সত্যিকার পরিচয় পেলাম। পরিচয় পেলাম আরো একজনের।

পান্না। নিজেই বুঝতে পারিনি, ছোটবেলাকার সঙ্গী ফ্রক-পরা সেই ছোট্ট মেয়েটি কখন থেকে ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গিয়েছিল। নিভামাসীর মতো কেউ এসে বলে নি, বড় হয়েছিস, এখন আর যখন-তখন বাড়ির ভেতর ঢুকিস না। কেন জানি না, আমরা পরস্পর থেকে সরে এসেছিলাম। কত বছর, কত যুগ যেন দেখিনি তাকে।

হঠাৎ দেখলাম অঞ্জলিদির বিয়েতে। দেখে চমকে উঠেছিলাম।

কিছুতেই যেন বিশ্বাস হল না। পান্না এত বড় হয়েছে, এত সুন্দর হয়েছে। এমন যৌবনের হাতছানি ফুটেছে সেই ছোট্ট পান্নার শরীরে।

মণ্ডপের এক কোণে এক থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল পান্না। উজ্জ্বল লাল রেশমী শাড়িটা আঁটসাঁট করে জড়ানো, কপালে একটা কাঁচপোকার টিপ, চোখে কাজলের পাতলা রেখা। আর সব সৌন্দর্য ছাপিয়ে মুখে চোখে তীব্র কৌতুক, শরীরে যৌবনের হিল্লোল। এ যেন সেই পুরোনো দিনের পান্না নয়, যে ঝিঁঝিপোকার বিয়ের ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল, যে পিসীমার গরদের শাড়ি পরবার জন্যে একদিন মনে মনে লোভ পুষতো। এ যেন অন্য কেউ, অচেনা, অজানা।

প্রথমটা হয়তো চিনতেও পারি নি। একদৃষ্টে তাকিয়েছিলাম অঞ্জলিদির ঘোমটায় ঢাকা মুখের দিকে। ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়েছিল নিমাইদার কথা।

হঠাৎ চোখাচোখি হল। দেখলাম বড় বড় একজোড়া চোখ মেলে তাকিয়ে আছে একটি মেয়ে। লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলাম, আর পরক্ষণেই চিনতে পারলাম। পান্না না? আবার কিছুক্ষণ পরে আকস্মিকতার ভান করে চোখ তুললাম। তখনও তেমনি বিস্ফারিত চোখ মেলে তাকিয়ে আছে পান্না।

কিন্তু আগের মতো তার কাছে এগিয়ে যেতে পারলাম না। সহজ ভাবে কথা বলতে পারলাম না। তবু মনে হল, শান্ত সমুদ্রের মতো গভীর একজোড়া চোখের কোমল চাউনি যেন কাছে ডাকছে, কথা বলবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

সারা রাত, যতক্ষণ অবধি চোখের পাতায় ঘুম নামে নি, ততক্ষণ শুধুই ঐ একটি মুখ বার বার জেগে উঠেছে, মনের চারপাশে ঘুরেছে একজোড়া চোখ।

কি এক বিচিত্র আকর্ষণ। দুর্জয় তার আহ্বান।

ফুলজান বিবির আকর্ষণ তো এমন ছিল না। সে হাতছানির মধ্যে কোথায় ছিল এক তীব্রতা, জ্বালা ছিল সে ডাকে।

কিন্তু কিসের নেশায় পালালো ফুলজান বিবি? জুতা-পালিশ সাহেবের সঙ্গে পালিয়েছে ফুলজান, দীর্ঘশ্বাসের স্বরে বলেছিল মুস্তাফা।

নেশা? হ্যাঁ, যৌবনের নেশাই হয়তো। যে নেশায় আলোবৌ সুখের আশ্রয়ে জলাঞ্জলি দিয়ে চলে গিয়েছিল মঙ্গলের সঙ্গে।

ফুলজানের ভবিষ্যৎও কি আলোবৌয়ের মতো?

মুস্তাফা দুঃখের হাসি হেসে বলেছিল, শেষ পর্যন্ত দেখিস, ফুলজানও বেশ্যা হয়ে যাবে।

বেশ্যা ? কথাটা শুনে কেমন এক আতঙ্ক বোধ করেছিলাম। এমন ঘৃণিত শব্দ যেন পৃথিবীতে আর নেই। এ যেন নারী জীবনের অন্ধকার পিঠ। আলো-উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় ধোয়া দিকটা ছিল—সতী।

সতী হওয়া, সহমৃতা হওয়া যেন জীবনের সবচেয়ে বড় গৌরব। সতী ঠাকরুনের চিতার কথা মনে পড়লেই মন যেন আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়তো বহু যুগ আগেকার সেই সতী ঠাকরুনের উদ্দেশে। চোখের সামনে ভেসে উঠতো সেই দৃশ্য। হাতে আম্রশাখা নিয়ে স্বামীর চিতার দিকে এগিয়ে চলেছেন, দেহে রক্তবস্ত্র, স্বর্ণালঙ্কার, অবগুণ্ঠিত মুখে হলুদের প্রলেপ, পায়ে রক্তবর্ণ আলতা। সহাস্যমুখে যেন এগিয়ে চলেছেন সতী ঠাকরুন।

—কষ্ট ? হেসেছিলেন রাঙামামীমা ! তারপর প্রদীপের শিখার ওপর একটা আঙুল ধরে রেখেছিলেন। কৌতুকের চোখে আমার বিস্মিত মুখের ওপর তাকিয়ে বলেছিলেন, কই কষ্ট ? জ্বালা করছে না তো ?

তখন কে জানতো, এ সবই পরীক্ষা। ভেতরে ভেতরে নিজেকে তৈবি করছেন রাঙামামীমা, মনেই হয় নি।

তারপর...

সারা শহর টহল দিয়ে ফিরে সবে সাইকেলটা বাড়ির ভেতরে তুলেছি, মা ছুটে এল।

—সর্বনাশ হয়েছে তিমু।

—কি হয়েছে ? চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলাম।

মা-র গলা ভারী হয়ে এল। কথা শেষ করতে পারলো না। শুধু বললে, নিরুর রাঙামামীমার কি হয়েছে জানিস ? বমেশ ডাক্তার নাকি ছুটতে ছুটতে গেল এখনি।

সাইকেল আর ঢোকানো হল না। তখনই বেরিয়ে গেলাম।

কি হয়েছে নিরুর রাঙামামীর ? নিরুব রাঙামামী ! তিনি তো আমারও রাঙামামীমা।

বাসার সামনে গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন একরাশ লোক জমা হয়েছে সামনে। সকলেই চুপচাপ। ফিসফিস দু-একটা কথা শুধু।

শুনলাম সাহেব পাড়ার বড় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রাঙামামীকে।

বড় হাসপাতাল।

ডাক্তার আর নার্সের ভিড়। কয়েকটা লাল পাগড়ি পুলিস ঠেলে ভিড় সরিয়ে দিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে হল।

কে যেন বললে, বাঁচবার আশা নেই।

বাঁচবার আশা নেই ! ছোট্ট এক টুকরো কথা। যেন আমারই জীবন সম্পর্কে। বুকের ভেতরটা অসহ্য যন্ত্রণায় মোচড় দিয়ে উঠল, চোখ ঠেলে জল এল।

কিন্তু কেন এমন করলো রাঙামামীমা। কেন, কেন, কেন !

আশ্চর্য। ভয় ছিল, অঞ্জলিদি হয়তো বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করবে। অথচ অঞ্জলিদির ব্যর্থজীবনে আবার হাসি ফিরে এল। আর যার কোল আলো করে একটুকরো আশার আলো এসেছিল, মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেছিল, সেই রাঙামামীমাই কিনা সারা শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করলেন।

মারা গেলেন পরেব দিন ভোরে।

মা, আমি, সেজদি সবাই গেলাম দাদুর বাসায়।

বীভৎস ! ছুটে পালিয়ে এলাম সেখান থেকে।

অনেকদিন পরে মা বলেছিল, দামাল ছেলের মায়া ছেড়ে কেউ আত্মহত্যা করতে পারে ?

শুনে চিৎকার করে উঠেছিলাম।—চুপ করো তোমরা, আত্মহত্যা, আত্মহত্যা ! কেন

তোমরা আত্মহত্যা বলো ? সতী হয়েছেন রাঙামামীমা, সতী হয়েছেন।

চোখে জল এসে গিয়েছিল মা-র কথা শুনে।

কিন্তু নিরুর দাদুর চোখে একবিন্দু জল দেখি নি। যেন পাথর হয়ে গেলেন। আগের মতো আর কথা বলতেন না, গল্প বলতেন না। রবিবার বিকেল হলেই আগের মতো ফিটনে করে আসতেন, এসে ঢুকতেন নিরুদের বাড়ি। কিন্তু আমরা কেউই আর তাঁর কাছে যেতাম না! কেমন অস্বস্তি বোধ করতাম তাঁর সামনে।

সতী, সতী! একটা অন্যায়, তবু গর্ব! বোধহয় ইতিহাসকে ভালবাসি, তাই।

পোলো খেলার মাঠের ধারে স্টিফেনসন্ সাহেবের পুরোনো জরাজীর্ণ বাংলোটার দিকে তাকিয়েও যেমন দুঃখ হতো।

চোখের সামনে দেখতে পেতাম, দিনে দিনে ধুলোয় মিশে যাচ্ছে বাংলোটা। মুছে যাচ্ছে ইতিহাসের স্বাক্ষর। কেমন একটা বেদনাবোধ। সব অতীতের জন্যেই হয়তো এমন হয়।

ভাবতেও বিস্ময় লাগে। ১৮২৫ সালের আগে নাকি পৃথিবীর কোথাও রেল ছিল না।

ঘোড়া ছুটতো, আব উটের গাড়ি চলতো। টাঙা নয়তো একাও। জলপথে নৌকো, সমুদ্রের বুকে জাহাজ। ওখা বন্দর থেকে, গোয়া আর করাচী থেকে সমুদ্রে নামতো পাল-তোলা জাহাজ। সদাশিব জ্যাঠা তাই বলতেন, রেলওয়ে পৃথিবীর এক নতুন যুগের প্রবর্তক।

সেই কোন প্রাচীন যুগে হেবোডোটাস বলে গিয়েছিলেন, পারস্যের ঘোড়ার চেয়ে দ্রুতগতি আর কিছুই হতে পারে না। প্রায় দু-হাজাব বছর ধরে মানুষ সে-কথাই বিশ্বাস করে এসেছিল। তারপর হঠাৎ আবিষ্কার করলো স্টীম ইঞ্জিন।

১৮৫৩ সালে রেল পাতা হল ভারতবর্ষের মাটিতে। বোম্বাই থেকে মাত্র একুশ মাইল পথ। ১৮৪৪ সালে ক্লার্ক সাহেব স্বপ্ন দেখেছিলেন বম্বে গ্রেট ইস্টার্ন রেলওয়ে কোম্পানির, আর সে কোম্পানির একজন ডিরেক্টর ছিলেন স্যাব জামসেটজী জীজিভয়।

—আরেকজন কে ছিলেন জানো? সদাশিব জ্যাঠা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

তারপর নিজেই বলেছিলেন, তাব নাম তোমরা সবাই জানো। জর্জ স্টিফেনসন্—যিনি স্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা: দশ হাজার কুলি মিস্ত্রী নিয়ে বোম্বাই থেকে থানা পর্যন্ত রেল পেতেছিল ফ্যারিয়েল অ্যাণ্ড ফাউলার কোম্পানি।

বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি দেখেছেন?

—না। কিন্তু শুনেছি সে-সব দিনের গল্প। ১৬ই এপ্রিল বেলা সাড়ে তিনটের সময় প্রথম ট্রেন ছাড়লো বড়ি বন্দর থেকে, চারশো জন যাত্রী নিয়ে। চোদ্দটা কামরা ছিল গাড়িটায়, আর ট্রেন ছাডাব সময় একুশটা কামান দাগা হয়েছিল।

শুনে বলেছিলাম, আচ্ছা সদাশিব জ্যাঠা, তখনকার বাংলাদেশ তো সবদিক থেকেই এগিয়ে ছিল, তবে বেল এখানেই আগে হল না কেন

সদাশিব জ্যাঠা হেসেছিলেন।—হ্যাঁ, কোলকাতাতেই হওয়া উচিত ছিল তিমু। কোলকাতা থেকে ভগবানগোলা পর্যন্ত বেল খোলার জন্যে, ১৮৪৫ সালে—বোম্বাইয়ের আট বছব অগেই, কোম্পানি হয়েছিল। সেন্ট্রাল বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানি—টাকাও উঠেছিলো অনেক—কিন্তু সে টাকা যে কিভাবে উড়ে গেল কেউ টেরও পায় নি। তবে বোম্বাইয়ের মাস কয়েক পরেই কোলকাতা থেকে পাণ্ডুয়া অবধি রেল পাতা হয়েছিল।

কোলকাতা নয়, হাওড়া। গঙ্গার ওপর তখন পুল তৈরি হয় নি। আর রেল পাতার পর ঝগড়া বেধেছিল ফরাসী চন্দননগরের সঙ্গে। ফরাসী সরকার বললে, আমার জমি দখল করেছো, ট্রেন যেতে দেব না। এদিকে সময়মতো ইঞ্জিনও এসে পৌঁছল না বিলেত থেকে।

—তারপর?

—তারপর প্রথম ট্রেন ছাড়লো যেদিন হাওড়া থেকে, হুগলীতে পৌঁছতে লাগলো পুরো দেড় ঘণ্টা।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, যাত্রী হয়েছিল ? তখন তো রেলগাড়ি দেখে ভয়ে পালাতো সবাই।

সদাশিব জ্যাঠা হেসেছিলেন।—গ্রামের লোক পালাতো, কিন্তু কোলকাতাব লোক অত বোকা ছিল না। প্রথম দিনের গাড়িতে চড়বার জন্যে তিন হাজাব দরখাস্ত পড়েছিল। ভয় পাবে কি, ওটাই তখন ইজ্জৎ।

এব বছর দুই পরেই হল মাদ্রাজ রেলওয়ে কোম্পানি। তারপর একে একে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রেল বসানে হল। কিন্তু সাধাবণ লোকের কুসংস্কার দূব করতে সময় লেগেছিল অনেক।

রেললাইনের আশেপাশে গরু চরতে দিতো না কেউ, ইঞ্জিন দেখলে গরুর দুধ বিষাক্ত হয়ে যাবে ধারণা ছিল সকলের।

—শুধু কি তাই। হেসেছিলেন সদাশিব জ্যাঠা।—সে ছিল মগের মুলুক। ইংরেজরা যা খুশি তাই করতো, রেলের সাহেবদের কথাই ছিল আইন।

—সত্যি ? অবিশ্বাসের সুরে বলেছিলাম।

—হ্যাঁ সত্যি। একবার একটা গরু চরতে চরতে লাইনের ওপর এসে ইঞ্জিনে কাটা পড়লো। অমনি সঙ্গে সঙ্গে খোঁজ শুরু হল, কার গরু। আমরা ভেবেছিলাম, হয়তো কোম্পানি কিছু টাকা দিয়ে ক্ষতিপূবণ করতে চায়। তা হল কি, লাইনের ওপর গরু আসতে দেয়ার অপরাধে ছ-মাস জেল হল লোকটার। কোম্পানি যুক্তি দেখালে, গরু ছেড়ে রাখার দোষে নাকি দুর্ঘটনা হতে পারতো, প্রাণহানি হতো।

তাই দেশের লোক প্রথম প্রথম রেলকে অভিশাপ ভাবতো।

শুনে মনে পড়েছিল দাদুর কথা।

দাদু একদিন বলেছিলেন, শুধু আমাদের দেশে নয় তিমু, ইংরেজরাও রেলকে শত্রু ভেবেছিল প্রথমে।

আর ভারতবর্ষে বাধা দিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। বলেছিলেন, যে-দেশের লোকের এক আনা খরচ করার শক্তি নেই সে-দেশে হাওড়া থেকে হুগলী আটাশ মাইল পথের জন্যে সে চার টাকা ভাড়া দেবে ! বলেছিলেন, তার চেয়ে ঐ টাকায় ক্যানেল কেটে জলের ব্যবস্থা করলে চাষের উন্নতি হবে।

আটাশ মাইলের ভাড়া চার টাকা !

—আর সে কি গাড়ি ! দেখিস নি তোরা, দোতলা কামবা ছিল তখন। ছাদ ছিল ক্যানভাসের। হাঁটু মুড়ে মাথা বাঁচিয়ে বসতে হতো দোতলার যাত্রীদের। হাওয়া ঢুকতো না এতটুকু। তা ছাড়া এখনকার মতো ফস করে বিড়ি সিগারেট ধরানো চলতো না রেলগাড়িতে।

—সে কি ? বিস্মিত হয়েছিলাম।

আর দাদু বলেছিলেন, প্লাটফর্মে নোটিস ঝুলতো, হুঁকো নিয়ে উঠতে পাবে না। তখন তো এমন বিড়ি সিগারেট চলতো না। সিগাবেটকে বলতাম বার্ড্‌স্‌আই—মার্কা ছিল পাখির চোখ ! ও-সব চলতে শুরু হয়েছে দেশলাই আসার পর থেকে।

ভারতবর্ষে প্রথম দেশলাইয়ের কারখানা নাকি করেছিলেন একজন বাঙালী। এই শহরের একজন বাসিন্দে, রেলের চাকরি ছেড়ে বিলাসপুরে গিয়ে কারখানা খুলেছিলেন।

—কিন্তু সে দেশলাই কিনলো না কেউ। দাদু বলেছিলেন।

দেশী দেশলাই কিনলো না !

—শালাই আছে বাবুজী ?

কথাটা স্পষ্ট মনে আছে আজো। দেশলাই চেয়েছিল বিলাইতি, আর ফিরে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলাম।

ভোর বেলায় ঘুম ভাঙতেই নীচে নেমে এসে উঠোনের কলে মুখে চোখে জল দিচ্ছিলাম। পাশে কে বাসন মাজছে লক্ষ্য করি নি।

এ সময়টায় প্রতিদিনই রাউতাইন এসে বাসন মেজে রেখে উনোনে আঁচ ধরিয়ে দিয়ে যেতো। কিন্তু পুরোনো রাউতাইনটা যে চলে গেছে, নতুন কেউ এসেছে, তা জানতাম না।

উনোন ধরাবার জন্যেই হয়তো দেশলাই চেয়েছিল সে।

—শালাই আছে বাবুজী ! কথাটা শুনে ফিরে তাকালাম, আর ফিরে তাকিয়েই অস্ফুটে বলে ফেললাম, বিলাইতি ?

বিলাইতি ঠোঁট টিপে হাসল। পরক্ষণেই মনে পড়লো অবনীদার কথা। বিয়ের আগে একদিন তাঁর বাসায় গিয়ে দেখেছিলাম, অবনীদার পা টিপছে বিলাইতি। মনে মনে হাসলাম। বেচারী। হয়তো স্বপ্নেও ভাবে নি, অবনীদা বিয়ে করে বসবে। হয়তো জানেও না, অবনীদা অঞ্জলিদিকে নিয়ে কোলকাতায় চলে যাচ্ছে নতুন চাকরি পেয়ে।

বাবার পকেট থেকে দেশলাইটা এনে দিলাম। দেশলাইটা হাত পেতে নেবার সময় কেমন এক রহস্যের চোখে তাকালো বিলাইতি। তারপর ঠোঁটের হাসি চেপে রেখে উনোন ধরাতে চলে গেল।

নেশা ধরিয়ে দিয়ে গেল আমার মনে।

তখন তো আর জানতাম না, বন্ধুবান্ধবরা রঙ ফলিয়ে যে-সব প্রেমের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিত তার বেশির ভাগই উদ্ভট আর অসত্য। মনে হতো সব সম্ভব।

তাই নিজেকে কেমন যেন ছোট মনে হতো তাদের কাছে। আমি একাই যেন অসম্পূর্ণ।

প্রেম !

মানুষের জীবনে যেন এর চেয়ে বড় উদ্দেশ্য নেই, এতখানি গৌরব আর নেই।

তাই স্বপ্ন বুনতাম মনে মনে। কখনো পান্নাকে ঘিরে, কখনো বিলাইতিকে ঘিরে।

মেয়েদের নগ্নদেহের প্রতি কি এক অদম্য আকর্ষণ অনুভব করতাম।

মনে আছে, সকালের কাজ শেষ করে চলে যাবার আগে উঠোনের কলে স্নান করতো বিলাইতি। আর সেই সময়টুকুর জন্যে দোতলার জাফরির আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতাম আমি।

লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম বিলাইতির যৌবন জোয়ারের ছন্দ। নিটোল দুটি স্তনের মধ্যে পৃথিবীর রহস্য অনুভব করতাম।

যৌবনে এমন এক নির্বোধ মুহূর্ত আসে যখন নিজের হাত রুচির বশ্যতা স্বীকার করে না। তেমনি এক নির্বোধ মুহূর্তের অসংযমকে খিলখিল করে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল বিলাইতি।

এ যেন অতি তুচ্ছ নগণ্য এক পাগলামি। হেসে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করবার নয়, এমনি ভাবেই খিলখিল করে হেসে উঠেছিল বিলাইতি।

লজ্জায় আত্মধিক্কারে পালিয়ে এসেছিলাম। ছি ছি ছি, এ কি করলাম আমি ?

পাছে আবার বিলাইতির সামনে পড়ে যাই, চোখোচোখি হয়, এই ভয়ে ভোরবেলায় যতক্ষণ তার বাসন মাজার শব্দ শুনতে পেতাম ততক্ষণ নীচে নামতাম না।

তারপর যেদিন মা বললে, বিলাইতি কারখানায় চাকরি পেয়েছে, নতুন রাউতাইন রাখতে হবে, সেদিন যে কি স্বস্তি অনুভব করেছিলাম বলার নয় !

এমন এক অস্বস্তির পর শান্তি পেয়েছিলাম, যেদিন শম্ভুজীর বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে

হৈ-চৈ হয়েছিল সদাশিব জ্যাঠাকে ঘিরে।

কারখানার টাইম-কীপার শম্ভুজী ছিলেন আমাদের পড়শী। জাতে মারাঠী। কিন্তু বাঙালীদের সঙ্গেই শম্ভুজীর আত্মীয়তা ছিল বেশি। ভাঙা ভাঙা বাংলাও বলতে পারতেন।

তাই শম্ভুজীর ছেলের পৈতেতে বাঙালীদের নিমন্ত্রণ দেখে বিস্মিত হই নি।

শম্ভুজীর মেয়ে সর্সতী নিমন্ত্রণ করে গিয়েছিল আমাদের।

গিরিয়ার মুঞ্জি-বন্ধনে আমি একাই গিয়েছিলাম। সামান্য পৈতে নেওয়ার জন্যে এমন যাগযজ্ঞ বাঙালী ঘরে কখনো দেখি নি। সাতদিন ধরে চললো মন্ত্রপাঠ, পুজো-আর্চা। কাশী থেকে পণ্ডিত এসেছিলেন কয়েকজন, বেদ পাঠ করলেন তাঁরা।

শম্ভুজীর স্ত্রীর মতোই তাঁর মেয়ে সর্সতীও কাছা দিয়ে ঝকঝকে রঙিন শাড়ি পরে কি ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়েই না কাজ করছিল। সংসারের সব কাজ, যাগযজ্ঞের ব্যবস্থা, নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন—সব ব্যাপারেই মেয়েরা!

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম নিয়ে হাসি-মুখে সর্সতী যখন ছোটাছুটি করে কাজ করছিল, কি ভালই না লাগছিল। আর এতটুকু লজ্জা নেই বাঙালী মেয়েদের মতো, পুরুষ দেখলে জড়িয়ে যায় না।

আরো অনেক মারাঠী মেয়ে এসেছিল। যেমন স্বাস্থ্য তেমনি সুন্দর।

শুধু একটা খটকা লেগেছিল। লজ্জা না থাক, পুরুষদের সামনে চলাফেরা করছে, অথচ মাথায় কাপড় দেয় না কেন বউগুলো।

শুনে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সর্সতী।—বেবা নাকি কেউ, যে মাথায় কাপড় দেবে?

বেবা অর্থাৎ বিধবা। শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। বলে কি মেয়েটা? মাথায় কাপড় কি বিধবারাই দেয়?

—তবে? মুক্তোর মালার মতো দু-সারি সাদা ঝকঝকে দাঁত উঁকি দিল সর্সতীর হাসির ফাঁকে। বললে, সোহাগিনদের মাথায় ছত্র রয়েছে না? ঘোমটা দেবে কেন?

সোহাগিন অর্থাৎ সধবাদের মাথায় ছাতা রয়েছেন স্বামী। স্বামী থাকতে আবার ঘোমটা কি!

অর্চনা চলছিল তখন। শম্ভুজী আর শম্ভুজীর স্ত্রীকে পাশাপাশি বসিয়ে হলুদ মাখানো হচ্ছিল। বিয়ের সময় যেমন গায়ে হলুদ হয় সেই ভাবে।

মুঞ্জি-বন্ধন নয়, ঠিক যেন বিয়ে বাড়ি।

সর্সতীর মা আর বাবা পাশাপাশি পিঁড়িতে বসে আছেন। একজন মারাঠী সোহাগিন সর্সতীর বাবাকে হলুদ মাখিয়ে দিলেন। তারপর শম্ভুজী তাঁর স্ত্রীর মুখে প্যাঁড়া আর ক্ষীর তুলে দিলেন, সর্সতীর মা তুলে দিলেন স্বামীর মুখে। শাঁখ বাজলো।

নিমন্ত্রিতরা আহারে বসলেন।

আমরা বসেছিলাম বারান্দার দিকে। দেখলাম ঘরের ভেতরে অন্যান্য অবাঙালী ব্রাহ্মণদের থেকে দূরে বাঙালীদের আসন হয়েছে। সেখানে সদাশিব জ্যাঠা আর মন্দিরের পুরুতঠাকুরের আসন।

অতো লোকের মধ্যে সদাশিব জ্যাঠাকেই সকলে আপ্যায়ন করছিল! লম্বা চওড়া চেহারা, ফরসা রঙ, চওড়া কপাল থেকে নেমেছে টিকোলো নাক, পরনে গরদের ধুতি।

খট্ খট্ খট্ খট্ শব্দ করে এলেন সদাশিব জ্যাঠা, খড়ম খুলে রেখে আসনে গিয়ে বসলেন।

আমাদের পাতে তখন পুরানপুরী আর ঘি পৌঁছে গেছে। কাড়ি আর মেওয়া দেয়া

হচ্ছে। পরিবেশন করছে সর্সতী আর ওরই বয়সী একটি বউ।

হঠাৎ ঘরের ভেতর হট্টগোল উঠল।

পুরুতঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার কবছেন। আর শম্ভুজী কি যেন বোঝাবার চেষ্টা কবছেন।

তারপব রাগে গরগর করতে করতে পুরুতঠাকুর উঠে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে।

কথা শুনে বুঝলাম তার উষ্মাব কাবণ। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সব নাকি একাসনে বসতে দেওয়া হয়েছে।

পুরুতঠাকুর সকলকে উঠে পড়তে বললেন, কিন্তু কেউই উঠল না। কে শুধু চাপা গলায় বললে, সবই তো বাপু কোম্পানির গোলাম, তার আবার জাত।

কিন্তু তখনও বুঝতে পাবি নি অব্রাহ্মণ কে।

—কে আবাব, ঐ সদাশিব।

পুরুতঠাকুর রেগে চলে গেলেন। সরস্বতী পুজোর সময় সদাশিব জ্যাঠা ভুল উচ্চারণের জন্যে সেই যে অপমান করেছিলেন তারই প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা, বেশ বুঝতে পারলাম।

কিন্তু শম্ভুজী কিছুতেই সদাশিব জ্যাঠার অনুরোধ শুনলেন না।

—মঙ্গলকর্মে বাধা না পড়াই ভাল শম্ভুজী। আমাকে অন্য কোথাও আসন দিন। সদাশিব জ্যাঠা মীমাংসা করার চেষ্টা কবলেন।

আর শম্ভুজী বললেন, বাঙালী ব্রাহ্মণ বাবুজী মছলি খায়, ব্রাহ্মণের আচারই নেই তার, তবু এই রেল-শহরে এসে আমরা সংস্কার ছেড়ে বসতে পারলাম, আর উনি কিনা—

সর্সতীর কাকা শ্রৌতজী বললেন, বর্ণাশ্রমের ইতিহাস বড় পঙ্কিল বাবুজী, যারা একদিন ছিল সমাজেব উপরে, বাজশক্তির বিরোধিতা করার জন্যে তারাই আজ নেমে গেছে নীচের স্তরে। যারা নীচে ছিল বিদেশী রাজার তাঁবেদারি করে তারাই উঠে যায় উপরে। ইংরেজ আসার পর আবার ঠিক তাই হয়েছে। হচ্ছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, শম্ভুজীর বাড়ি থেকে নিমন্ত্রণ সেরে ফিরে আসার সময় সদাশিব জ্যাঠা হাসতে হাসতে বললেন, যেমন পাগল আমাদের ঐ পুরুতঠাকুর, তেমনি এই শম্ভুজী। জাত জাত করেই গেল দেশটা। শুধু একটি কথা সত্যি যে, জাত নেই, কোনো জাতই বড় নয়। সব মানুষ সমান।

সব মানুষ সমান। বাবাও এই একই কথা বলতেন। কিন্তু কিছুতেই যেন বিশ্বাস হতো না।

নিমাইদা যাবার আগে কয়েকখানা বই দিয়ে গিয়েছিল! বলেছিল নিজে পড়ে বন্ধুদের পড়িও। সে-সব বইয়ে একই কথা ছিল। বাঙালীর প্রাচীন গৌবব, বাঙালীর সাহস আব স্বদেশপ্রেম।

পডতে পডতে বক্ত গরম হয়ে উঠতো কোনো কোনোদিন। আর তারপর একসময় হতাশ হয়ে পড়তাম।

দেশ স্বাধীন হবে। এই একটাই স্বপ্ন তখন আমাদেব। ভাবতাম, খড়োগেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে সাধনা করলে হয় না!

খড়োগেশ্ববেব মন্দিবে গিয়ে কিন্তু কোনো মূর্তি দেখতে পাই নি!

ধারণা ছিল, মা কালীর মূর্তি আছে ও-মন্দিবে, আসলে খড়োগেশ্ববীর মন্দির, লোকে হয়তো ভুল কবে বলে খড়োগেশ্বর। ঐ মন্দির থেকেই নাকি এ শহরের নাম হয়েছে, এইটুকুই জানতাম!

পরী বলেছিল, তা নয় রে। কাপালিকদের মন্দির বলে ওর নাম খড়োগেশ্বর।

শুনে সেদিন বিশ্বাস করেছিলাম।

কিন্তু নিমাইদার কাছ থেকে পাওয়া একটা ইতিহাস পড়তে পড়তে চমকে উঠলাম
ইস্কুলে যে ইতিহাস পড়ানো হতো তার চেয়ে জ্যামিতির বইও ভাল লাগতো। কেবল সাল তারিখ আর সাল তারিখ।

ইতিহাস যে পড়তে এত ভাল লাগে, তা জানতে পারলাম নিমাইদাব কাছ থেকে পাওয়া ইতিহাসের পাতা ওলটাতে ওলটাতে।

আর তাই জানতে পারলাম খড়্গেশ্বর মন্দিরের অতীত কাহিনী।

সমস্ত শরীরে সেদিন রোমাঞ্চ জেগেছিল। মাত্র একশো বছর আগে এখানে শুধুই বন আর জঙ্গল। বলতেন দাদু। অথচ একদিন নাকি এখানেই ছিল এক বিরাট হিন্দু রাজ্যেব রাজধানী।

এক রাজার নাম ছিল নাকি খড়্গমল্ল। বিশালাকৃতি এক খড়্গ হাতে নিয়ে যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন খড়্গমল্ল!

তিনিই রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এখানে, প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই মন্দির। আর তাঁর সেই বিশালাকৃতি খড়্গের পুজো হতো এখানে। সেই জন্যেই মন্দিরের নাম হয়েছিল খড়্গেশ্বরের মন্দির। আব তা থেকেই এ শহরের নামকরণ, কে জানতো।

সেই বিশাল খড়্গটা দেখবার ইচ্ছে হতো, কিন্তু কি হল সেটা, কোথায় গেল, কেউ বলতে পারতো না। কবে, কি ভাবে যে এই রাজধানী ধ্বংস হল, এত উন্নত একটা শহব কি করে যে আবার বন জঙ্গলে ঢাকা পড়লো, ভাবতে বিস্ময় লাগতো।

মনে ভয় হতো, আমাদের এই রেল কলোনিটাও কি একদিন জঙ্গলে ঢাকা পড়বে? আবার জঙ্গলে ভরে যাবে চতুর্দিক?

কে জানে। হয়তো এরোপ্লেনের চল হলে কেউ আর রেলগাড়িতে চড়বে না। এরোপ্লেন-ওয়ালারা হয়তো তখন ইঞ্জিনের ড্রাইভারদের ঠাট্টা কববে। ফিটন আর ঘোড়ায় টানা পালকিগাড়িব কোচোয়ানরা যেমন প্রথম প্রথম রিক্‌শাওয়ালাদের ঠাট্টা করতো দু-পায়ের ঘোড়া বলে।

তখন স্টেশন থেকে বেরিযে আবার সুড়ঙ্গটার মুখেই দাঁড়িয়ে থাকতো খানকয়েক ঘোড়ার গাড়ি, আর ছই-দেওয়া কয়েকটা গরুব গাড়ি। মোটর বলতে শুধু বাব্বা সাহেব, সি এম ই আর দু-চারজন বিলিতী সাহেবের।

এমন সময় হঠাৎ একদিন রাস্তায দেখা গেল রিক্‌শা। একজন তেলেঙ্গী রিক্‌শাওয়ালা দু-আনায় স্টেশন থেকে খরিদা নিয়ে যেতো। আর সস্তা ভাড়ার জন্যে চটে গিয়েছিল কোচোয়ানরা। যা-তা বলতো তাকে, ঠাট্টা করতো দু-পায়ের ঘোড়া বলে।

অথচ, কি আশ্চর্য, সারা শহর যখন হাতে-টানা রিক্‌শায় ছেয়ে গেছে, তখন এক বাঙালী রিক্‌শাওয়ালা যেদিন প্রথম সাইকেল-রিক্‌শা বের করলে রাস্তায়, সেদিন হাতে-টানা রিক্‌শাওয়ালাদের সঙ্গে ফিটনের কোচোয়ানরাও যোগ দিলে ঠাট্টায়, বিদ্রূপ করলো সাইকেল-রিক্‌শাওয়ালাকে।

অনেকে যেমন স্বদেশীর দলকে ঠাট্টা করতো। যারা খদ্দর পবতে শুরু কবেছে তখন, চরকা কাটে, বন্দে মাতরম্ বলে প্রসেশন নিয়ে বেরোয় মাঝে মাঝে, তাদের 'স্বদেশীওয়ালা', বলে ঠাট্টা করতো অনেকে।

বলতো, নুন তৈরি করে নাকি দেশ স্বাধীন হবে! বন্দে মাতরম্ তো নয়, বঁদে খেয়ে মাথা গরম হয়েছে ছেলেগুলোর! ঠুঁটো গান্ধীটা ব্যারিস্টারী পাশ করে এসে প্র্যাকটিস জমাতে পারলো না, তাই লোক ক্ষ্যাপাচ্ছে।

আমরা কিন্তু চটে যেতাম এ-সব রুচিহীন ঠাট্টা শুনে।

তখন মনে-প্রাণে একটাই ব্রত আমাদেব। দেশ স্বাধীন করতে হবে।

২০

মুস্তাফার সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

জিজ্ঞেস করলাম, ফুলজান বিবির কোনো খবর পাওয়া গেছে ?

মুস্তাফা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।—না রে। ওর দেখা আর বোধ হয় মিলবে না।

বললাম, কিন্তু আবিদ হোসেন কি ছেড়ে দেবে ওদের ? সবাই যে বলে, আবিদ হোসেন যার ওপর চটে তাকেই গুলি করে মারে ?

মুস্তাফা হাসল। বললে, সে-সব দিনকাল এখন নেই তিমু, বাব্বাই আইন এখন ঠুঁটো হয়ে গেছে। এক সময় সুন্দর মেয়ে দেখলেই নিয়ে গিয়ে হারেমে পুরতো বুড়ো, আর এখন কনস্টেবলগুলোও ওকে সেলাম করে না। আবিদ হোসেনের কম দুঃখ নাকি। বলে, এখন নাকি সম্মান শুধু গান্ধীর চেলাদের, খদ্দর দেখলে হাকিমরাও সমীহ্ করে।

বললাম, কি যে বলিস। তা হলে আর ওদের ওপর অত অত্যাচার করতো না, জেল হতো না ওদের।

মুস্তাফা বললে, বাইরে থেকে তাই মনে হয়। কিন্তু স্বদেশীওয়ালাদের সত্যি জোর বেড়েছে, একটা বে-আইনী কাজ করলে আবিদ হোসেনকেও ঠাণ্ডা বানিয়ে দেবে।

একটু থেমে বললে, তোর বাবাকেও খুব গালাগালি দেয় আবিদ হোসেন। বলে কুলিমজুরদের নাকি পায়া ভারী করে দিচ্ছে তোর বাবা, এরপর আর কেউ ব্যবসা করতে পারবে না। রেল-কোম্পানিও নাকি লোকসান দিয়ে উঠে যাবে।

তাই যেদিন শুনলাম আবিদ হোসেন চলে যাচ্ছে, ছুটতে ছুটতে গেলাম দেখা করতে, ভাবলাম, সত্যিই হয়তো ব্যবসা করে লাভ হচ্ছে না।

খাটিয়ার ওপর বসে কি-সব খাতাপত্তর দেখাশোনা করছিল আবিদ হোসেন, সামনে জনকয়েক লোক।

চোখ তুলে তাকালো একবার।—কে, ছোটাসাব যে, এতদিন পরে ? বসো বসো।

বসলাম, খাটিয়ার এক কোণে। তারপর ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করলাম, সত্যি বাব্বা সাহেব ? তুমি সত্যি চলে যাচ্ছো ?

আবিদ হোসেন হাসল !—হ্যাঁ ছোটাসাব। আমীর হয়ে দেখলাম সুখ নেই, এবার ফকির হয়ে দেখবো।

—কোথায় যাবে ?

—কোথায় ? মক্কা যাবো, হাজী হতে হবে আগে। তারপর ঠিক করবো। মক্কায় থাকবো, না আজমীঢ়ের দরগায়।

—সে কি ? ফিরবে না ?

হাসল আবিদ হোসেন।—না ছোটাসাব, এ নিমকহারামের দুনিয়ায় ফিরবো না আর। ফকির হয়ে ঘুরে বেড়াবো।

ফকির হয়েই চলে গেল আবিদ হোসেন। যে বাব্বা সাহেবের ধনরত্ন ছিল সারা শহরের বিস্ময়, সে কিনা ফকির হয়ে চলে গেল।

বিরাট বাড়িখানা যেন মোগল বাদশার প্রাসাদ। দু-তিন শো বান্দা আর বাঁদী ছিল আবিদ হোসেনের। তাদের সবাইকে মুক্তি দিয়ে দিলে আবিদ হোসেন, মুক্তির সঙ্গে বেশ কিছু টাকা, জমিজমা।

বান্দা আর বাঁদী। এ যেন আইন বাঁচানো দাসপ্রথা। আগাম মাইনে দিয়ে পনেরো বিশ বছরের জন্য ঠিকা করে নিয়েছিল যাদের, তাদের ইচ্ছামতো যেখানে খুশি চলে যেতে বললে।

আর কি আশ্চর্য, যে বাহারওয়া আর বাহারওয়ানীদের চোখেমুখে সব সময় আতঙ্ক দেখা যেতো, উঠতে বসতে যাদের অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিত আবিদ হোসেন, তাদের চোখেও জল দেখা দিল।

একে একে তাদের বিদায় করে দিল আবিদ হোসেন। তারপর বিবিদের ডাকলে।

বললে, কি চাও তোমরা বলো। ধনদৌলত, বাড়ি যাকে খুশি বিয়ে করেও সুখী হতে পারো তোমরা।

কয়েকজন কাঁদল। কেউ কেউ বললে, আমাদেরও নিয়ে চলো। তুমি যেখানে থাকবে তাই আমাদের ঘর! কেউ বললে, যতদিন না ফিরে আসো এ বাড়িতেই থাকবো আমরা!

আবিদ হোসেন হাসল।—সে হয় না। এ বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে তোমাদের, অন্য বাড়ি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি! আর ধনদৌলতও দিয়ে যাবো যাতে সারাজীবন নিশ্চিন্তে কাটাতে পারো।

একে একে বিবিদেরও সরিয়ে দিল আবিদ হোসেন।

তারপর যাবার দিনে বললে, তোমাকেও একটা জিনিস দিয়ে যাবো ছোটাসাব।

—কি জিনিস?

আবিদ হোসেন হেসে বললে, মুস্তাফা বলেছিল তুমি নাকি বয়েত লেখো, রোবাই লিখতে জানো।

শুনে লজ্জিত হয়ে পড়লাম। আমার লুকিয়ে কবিতা লেখার কথা আবিদ হোসেনও জানতে পেরেছে?

আপত্তি করতে গেলাম। বললাম, না, না, মুস্তাফা মিছে করে বলেছে।

আবিদ হোসেন বললে, তোমার চোখে কবির রঙ রয়েছে ছোটাসাব। তাই তোমাকে এই কলমটা দিয়ে যাচ্ছি। বড় হয়ে আমাকে নিয়ে একটা কাহানী লিখো।

—তোমাকে নিয়ে? বিস্মিত স্বরে প্রশ্ন করলাম।

আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন চোখ ছলছল করে উঠল বুড়ো আবিদ হোসেনের, গলার স্বর ভাবী হয়ে এল।

বললে, ধনদৌলত আমি অনেক করেছি ছোটাসাব, বাদশার মতো নিজের কব্জির জোরে জীবন কাটিয়েছি, খুবসুরত বিবি এনে হারেম ভরতি করেছি। কিন্তু, কিন্তু শান্তি পাই নি ছোটাসাব।

চুপ করে রইলাম। কি উত্তর দেবো এ অনুশোচনার।

আবিদ হোসেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

বললে, মহব্বৎ করেছো কখনো? জিন্দিগির সবচেয়ে বড় দৌলত মহব্বৎ।

প্রেম। জীবনের সবচেয়ে বড় ঐশ্বর্য প্রেম।

আর তাই প্রেমে ব্যর্থ হয়ে, প্রেমিকার কাছ থেকে আঘাত পেয়ে সব ছেড়ে যেতে চায় আবিদ হোসেন।

মুস্তাফাও বলেছিল, ফুলজান বিবিকে সত্যিই ভালোবাসতো বাব্বা সাহেব, তাই ফুলজান পালিয়ে যাওয়াতে জীবন ব্যর্থ হয়ে গেছে ওর।

অথচ এ সমস্যার কোনো মীমাংসা খুঁজে পাই নি। একজন শুধুই ভালবাসে, প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, কিন্তু নারীর যৌবনকে সার্থক করে তুলতে পারে না! আরেকজন চায় প্রেমের মধ্যে যৌবনের কামনাকে তৃপ্ত করতে হয়তো মাতৃত্বও।

সুতরাং একজনকে অসুখী হতেই হবে।

বান্দা বাঁদীদের, আর বিবিদেব ব্যবস্থা করে বাকি টাকা মাদ্রাসায় আর মসজিদে দান করে দিল আবিদ হোসেন।

তারপর যেদিন চলে গেল ও···

কে যেন এসে খবর দিল।

উত্তরের সারা আকাশ তখন লাল হয়ে গেছে, আর তারও ওপরে বৈশাখী মেঘের মতো আকাশ জুড়ে কালো ধোঁয়া।

ছুটতে ছুটতে গেলাম মসজিদ-পাড়ার দিকে।

গিয়ে দেখলাম আবিদ হোসেনের বাড়িটা দাউ-দাউ করে জ্বলছে। আকাশ পর্যন্ত দুলে দুলে উঠছে লেলিহান শিখা।

আগুন নয়, যেন এক প্রেমাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধের অভিমান। ফুলে ফেঁপে উঠছে। আক্রোশের অগ্নিশিখা ? না অসংখ্য নারী জীবনের অতৃপ্তির আগুন জ্বলে উঠেছে হঠাৎ ? কে জানে।

পাশ থেকে মুস্তাফা শুধু ফিসফিস করে বললে, সব শেষ হয়ে গেল। ফুলজান আর কোনোদিন এখানে ফিরে আসবে না তিমু।

শুধু ফুলজান নয়, কেউই ফিরে আসে না। ইতিহাসের নিয়ম। যা যায় তা আর ফিরে আসে না। সে শুধু স্মৃতি হয়েই বেঁচে থাকে।

অঞ্জলিদিও একদিন এমনি ভাবেই চলে গেলেন।

মাত্র দুটো ট্যাক্সি হয়েছে তখন শহরে। কিন্তু কেউই চড়তো না। ট্যাক্সি নয়, ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল অবনীদার কোয়ার্টারেব সামনে।

সন্ধে হয়ে গেছে তখন। রাস্তায় নতুন ইলেকট্রিকেব আলোগুলো সবে জ্বলে উঠেছে। পড়াব টেবিলে মাথা গুঁজে ভাবছিলাম অঞ্জলিদির কথা। ইচ্ছে হচ্ছিল একবাবটি দেখা করে আসবো। কিন্তু বাবা তখনও বাইরের বারান্দায় বসে কাগজপত্র দেখছেন।

কেমন একটা তন্দ্রার ভাব এসেছিল। হঠাৎ চমকে উঠলাম মাথার ওপর নরম হাতের স্পর্শে।

—অঞ্জলিদি ?

ম্লান হাসি হাসলেন অঞ্জলিদি।

দেখলাম, সাবা শরীব কালো শাডিতে ঢাকা, মাথায ঘোমটা, অঞ্জলিদি দাঁড়িয়ে আছেন।

—চললাম তিমু।

—এখনই ?

বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, বেঁচে থাকি তো আবার দেখা হবে তিমু।

উত্তর দিতে পারলাম না।

ধীরে ধীরে কপালের ওপর ঠোঁট ছোঁয়ালেন অঞ্জলিদি

বললেন, ভুলে যাবি না তো ?

—ভুলে যাবো ? অভিমানে চোখে জল এল।

অঞ্জলিদি হাসলেন। তারপর বললেন, তিমু, নিমাইদা যদি ফিরে আসে একটা কথা বলবি তাকে ?

—কি ?

—বলবি, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করেন। আর···

দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো অঞ্জলিদির। একটা শিশি আমার টেবিলের ওপর রেখে বললেন, আর এই শিশিটা ফেরত দিয়ে বলবি, তিনি যা চেয়েছিলেন আমি তা পারি নি। তিনি যেন ক্ষমা করেন আমাকে।

শিশিটার দিকে চোখ গেল। হঠাৎ বলে উঠলাম, না, না, এ শিশি তো আমি এনেছিলাম অঞ্জলিদি। নিমাইদা দেয় নি।

—তুই ?

বললাম. হ্যাঁ। তুমি বিষ চেয়েছিলে, তাই হাসপাতাল থেকে চুরি করে এনেছিলাম। 'বিষ' লেখাই আছে শিশির গায়ে, এ খেলে মানুষ মরে না!

অঞ্জলিদির সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।—নিমাইদা দেয় নি? তুই এনেছিলি?

বললাম, হ্যাঁ। নিমাইদা জানেও না।

এক মুহূর্ত নিশ্চল চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে,তারপব হঠাৎ অঞ্জলিদি আমাকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলেন বার বার।

বললেন, আমার বুকের সব ভার তুই হালকা করে দিলি তিমু। আর কোনো ক্ষোভ নেই আমার। আমি ভুল করি নি।

সত্যিই যেন হেসে উঠলেন অঞ্জলিদি। তারপর দ্রুত পায়ে চলে গেলেন।

খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে দেখলাম। কিছুক্ষণ পরেই ছাদে বিছানা ট্রাঙ্ক বাঁধা ঘোড়ার গাড়িটা ধুলো উড়িয়ে চলে গেল।

সকলেই একে একে চলে গেল। অঞ্জলিদি চলে গেলেন, আবিদ হোসেন চলে গেল, রাঙামামীমাও চলে গেলেন।

চলে যাওয়াই কি পৃথিবীর নিয়ম?

না। সদাশিব জ্যাঠা বলেছিলেন, চক্রবৎ ঘুরছে পৃথিবী। একদল যায় আরেকদল আসে। কিন্তু কই; কেউ তো এল না!

আসে। অন্য চেহারা নিয়ে, অন্য জীবন নিয়ে। যেমন-ভাবে এসেছিল পান্না। মানুষের সংস্পর্শে আসি আমরা, বিভিন্ন পরিবেশে। মানুষ আর প্রকৃতির লক্ষ লক্ষ মুহূর্ত দিয়ে তৈবি হয় একজনের জীবন। তিলে তিলে তিলোত্তমাকে গড়া হয়েছিল, এ কি শুধু গল্প?

না। প্রকৃতির সব কিছুর ভালটুকু তিল তিল করে বেছে নিয়ে যেমন তিলোত্তমাকে গড়া হয়েছিল, তেমনি সব মানুষই তিল তিল করে গড়ে ওঠে। ভাল আর মন্দ। জীবন আর মানুষের সংস্পর্শে আসাও এই অংশে অংশে সম্পূর্ণ হওয়া। জীবনে যে মন্দের অংশ বেশি নিল সে হয় অসুর, যে মহত্ব আহরণ করতে পারে সে হয় দেবতা।

আর পৃথিবীর সব কিছু ভাল নিয়েই যেন পান্নাকে গড়েছিলেন ভগবান।

আশ্চর্য, কি অদ্ভুত পরিবর্তনই না হয়েছিল পান্নার। লজ্জানম্র মুখ, শরমাতুর চোখ, যেন কথা বললেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে গাল দুটি।

তিন নম্বর পাড়া থেকে গোকুলপুরে গিয়েছিল ওরা কিছুদিন, তারপর আমাদের বাংলোব পিছনের চার নম্বরে বদলি হয়ে এসেছিল পান্নারা। তাই মাঝে মাঝে দেখা পেতাম।

আমাদের দোতলার জানালা থেকে দেখা যেতো ওদের উঠোন। সংসারের কাজ করতো পান্না, কখনো কোমরে কাপড় জড়িয়ে চৌবাচ্চায় জল তুলতো, কখনো হয়তো বঁটি পেতে সব্জির ঝুড়ি নিয়ে বসতো। আর, বেশ বুঝতে পারতাম, ওর মুখ যতো মাটির দিক নামছে চোখ দুটো ততোই যেন আমাদের দোতলায় জানলার দিকে তাকাতে চাইছে। সামনে বইয়ের পাতা খুলে রেখে আমি যে ওর দিকে তাকিয়ে আছি তা যেন বুঝতে পারতো পান্না, আমার দিকে একবারও চোখ না তুলে। তারপর হঠাৎ একসময় চকিতে চোখ তুলে তাকাতো ও, আর চোখাচোখি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুখ নামাতো।

সে-মুখ কোনোদিন লজ্জায় অপ্রতিভ দেখাতো, কোনোদিন মনে হতো যেন এক ঝিলিক কৌতুকের হাসি লুকোনো ওর ঠোঁটের পাশে।

তবু কথা বলতে পেতাম না। অথচ কতো কথাই না শুনতে এবং শোনাতে চাইতাম।

সুযোগও ঘটে গেল একদিন।

সেদিন বিকেল বেলায় হঠাৎ বাসায় ফিরে দেখি মা উল বুনছে বসে বসে, আর পান্না পাশে বসে খুব হাসাহাসি করে কি যেন বলছে।

পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলাম, মা হঠাৎ ডাক দিল।

কাছে যেতে মা হেসে বললে, পান্না কি বলছে শুনেছিস তিমু ?

—কি ?

মা চশমাটা খুলে কাঁচে আঁচল ঘষতে ঘষতে বললে, বল্ না পান্না।

পান্না তবু চুপ করে রইলো।

মা হাসল। বললে, কি মেয়ে রে তুই ? ছোটবেলায় কতো খেলা করেছিস একসঙ্গে, কতো ঝগড়াঝাঁটি করেছিস, আর তাকেই এত লজ্জা।

পান্না মুখ নামালো লজ্জায়, কিন্তু কোনো কথা বললে না।

মা আড়চোখে তার দিকে তাকিয়ে আমাকে বললে, বোস্ তুই। বলে পান্নাকে উদ্দেশ করে বললে, যা না মা, তিমুর খাবারটা এনে দে রান্না ঘর থেকে।

বললাম, থাক্। আমি নিচ্ছি।

—কোনটা তোর বুঝবি কি করে ? মা ধমক দিল।

—আমি যদি না বুঝি তো ও কি করে বুঝবে শুনি ?

মা হেসে বললো, বুঝবে, বুঝবে।

সঙ্গে সঙ্গে পান্না ঠোঁট টিপে হেসে উঠে গেল। ফিরে এল একটা কাঁসার রেকাবি হাতে নিয়ে।

মা বললে, দেখলি তো ?

দেখেছিলাম, এবং দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম। তারপর এক সময় মা উঠে যেতেই বলেছিলাম, কথা বলবে না বুঝি আমার সঙ্গে ?

উত্তরে ক্রুদ্ধ একজোড়া চোখ তুলে তাকিয়েছিল পান্না।

তারপর বলেছিল, রোজ অসভ্যের মতো তাকিয়ে থাকো কেন।

—তুমিই বা ঐ জায়গাটায় বসো কেন ?

কথাটা বলে ফেলে কি ভুলই করেছিলাম। পরের দিন থেকে আর দেখা মেলে নি পান্নার। তারপর হঠাৎ একদিন শুনলাম গার্ড সাহেবের ছেলের সঙ্গে নাকি পান্নার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। সামান্য একটা খবর। তুচ্ছ। মেয়েদের বিয়ে যদিও একবারই হয়, বিয়ের কথাবার্তা তো হয় কতোবার। তবু খবরটুকু শুনেই কেমন যেন নিঃস্ব বোধ করলাম নিজেকে। স্বপ্নের সব রঙ যেন নিমেষে কালো হয়ে গেল। অসহ্য এক ব্যথা! নিস্তেজ বোধ করলাম নিজেকে। এ এক অবোধ্য বেদনা, কান্না চেপে রাখার মতো এক আকুলতা।

সেই প্রথম অনুভব করলাম প্রেমের স্পর্শ।

মুস্তাফা যখন ফুলজান বিবির কথা বলতো, কৌতুকে হাসতাম। মুস্তাফার দীর্ঘনিশ্বাসকে একদিন ব্যঙ্গ করেছি বলে অনুশোচনায় নিজেকে ধিক্কার দিলাম।

কে জানতো, প্রেম এমন আত্মভোলা, এমন বেদনাময়!

একাগ্র মনে প্রার্থনা করলাম, এ-বিয়ে ভেঙে যাক, এ-বিয়ে ভেঙে যাক।

তারপর একসময় গিয়ে হাজির হলাম গার্ড সাহেবের কাছে।

বারান্দায় বসে বসে একা একাই দাবা খেলছিলেন গার্ড সাহেব।

চোখ তুলে তাকালেন।—তিমু ? দাবা খেলতে জানো ?

বললাম, না।

গার্ড সাহেব বললেন, জানলেও খেলতে পারতে না। এ তোমার গজ আর ঘোড়ার দাবা নয়, রীতিমত মডার্ন দাবা, বুঝলে ?

—মডার্ন দাবা ? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলাম।

উত্তর এল, হ্যাঁ। ইঞ্জিন…গজের বদলে এম ক্লাস ইঞ্জিন।

চুপ করে রইলাম।

গার্ড সাহেব নিজের মনেই চাল দিতে দিতে বললেন, নিজে বানিয়েছি এ-সব। এই দেখো, এটা হল মেল ট্রেন, আর এটা প্যাসেঞ্জার, আর এই যে কালো বোড়ে এগুলো সব গুড্‌স ট্রেন।

একে একে দাবার ঘুঁটি চিনিয়ে দিলেন গার্ড সাহেব। বললেন, চাল দিলেই হবে না হে, লাইন ক্লিয়ার চাই।

একটা ঘুঁটি সরিয়ে বললেন, এই মেল চলে গেল, এবার মালগাড়িকে সাইডিং থেকে সরিয়ে এনে চলতে দাও।

দাবার অদ্ভুত ছকটার দিকে তাকিয়ে গার্ড সাহেবের মুখের দিকে তাকালাম। পাগল হয়ে গেল নাকি লোকটা!

বললাম, রানিং রুমে বেড়াতে যাবেন না আজ?

গার্ড সাহেব হঠাৎ যেন চটে গেলেন।—না, কক্ষনো না। খোদ সি এম ই এসে খোসামোদ করলেও যাবো না।

কেন?

কেন তা গার্ড সাহেব বলেন নি, কিন্তু জানতে পেরেছিলাম। রানিং রুমে গিয়ে টি টি আই আর টি টি সি-দের উত্যক্ত করেই ক্ষান্ত হন নি গার্ড সাহেব। একদিন কন্ট্রোলারের ঘরে গিয়ে নাকি ঝগড়া করেছিলেন, উপদেশ দিয়েছিলেন, কোন ট্রেনকে সাইডিং-এ ফেলে রেখে কোন ট্রেনকে আগে লাইন ক্লিয়ার দেওয়া উচিত।

ওয়েস্ট কেবিনে গিয়েও নাকি কাজে বাধা দিয়েছিলেন।

আর সেই জন্যেই ডি টি এস অর্থাৎ ডিস্ট্রীক্ট ট্রাফিক সুপারিনটেণ্ডেণ্ট হুকুম দিয়েছিলেন, গার্ড সাহেব স্টেশনে আসতে পাবে না। এলে তাঁকে পুলিসে দেওয়া হবে।

পুলিসকে তখন সকলেই ভয় পেতো। তিন তিনটে ম্যাজিস্ট্রেট খুন হয়েছে তখন পরপর। ম্যাজিস্ট্রেট বার্জসাহেব যেদিন সন্ত্রাসবাদীদের গুলিতে প্রাণ হারালো তার পর থেকে পুলিসের অত্যাচার বেড়ে গেল।

আইন হল বাঙালীরা-সূর্যাস্ত থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত বাড়ির বাইরে বের হতে পাবে না আর সাইকেলে চড়তে পাবে না। সাইকেলে চড়েই নাকি গুলি করে পালিয়েছিল, অতএব তার বিরুদ্ধেই জেহাদ।

থানায় গিয়ে একদিন সাইকেলটা জমা দিয়ে আসতে হল।

সে এক দৃশ্য। সমস্ত উপনগরের মানুষ চলতো শুধু সাইকেলের ওপর নির্ভর করে, তা বোঝা গেল থানার সামনে মাঠটা দেখে। কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা মাঠে সাইকেলের পহাড় হয়ে গেল।

মনে তবু আশা রইলো, এই বাঙালী নির্যাতনের আইন উঠে গেলেই যথারীতি সাইকেলগুলো ফেরত পাবো।

কিন্তু আইন উঠল না, আরো বেশি নৃশংস হয়ে দেখা দিল। আর সেই প্রথম উঁচুনীচু ভুলতে শুরু করলাম সকলে।

সদাশিব জ্যাঠা বলেছিলেন, এ ভালই হল। অত্যাচার আসলে আশীর্বাদ তিমু। এ-গ্রেডের লোক আগে বি-গ্রেডের বাড়ি গেলে বসতে চেয়ার পেতো না। এখন সব এক হয়ে গেছে।

—কিন্তু বাঙালী আর অবাঙালী তো এক ছিল, তাদের মধ্যেও যে বিভেদ এনে দিচ্ছে এ-আইন। অত্যাচার শুধু বাঙালীর ওপর, তাই অবাঙালীদের আমরা অবিশ্বাস করছি, আর তারা বিদ্রূপ করছে আমাদের।

সদাশিব জ্যাঠা হেসেছিলেন।—সব কর্মফলই ভালয় মন্দয় মেশানো। সাগর মন্থনে অমৃতের পর বিষ উঠবেই তিমু, তাকে সহ্য করতে হবে।

সহ্য করেই চলেছিল সারা কলোনি। কিন্তু সহ্যেরও বোধহয় সীমা আছে।

দীপাবলী। দেওয়ালীর দিনে সমস্ত শহর প্রদীপের মালায় এক বিচিত্র রূপ ধরেছিল সেদিন। দোতলার টালির ছাদের ওপর উঠে দেখেছিলাম। যেদিকে তাকাই শুধু প্রদীপের মালা। আর গোলবাজার থেকে ভেসে আসছিল জলসার গান। আকাশে অন্ধকারে হাউইয়ের ফুল, তুবড়ির ঝলসানি।

ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল। অথচ উপায় নেই।

ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলাম, এসে দাঁড়ালাম কাঁটা তারে ঘেরা বাগানের মাঝখানে। আর দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চোখ গেল পান্নাদের কোয়ার্টারের দিকে।

বাঁশের বাতা দিয়ে ঘেরা ওদের বাগান। সেই বেড়ার প্রত্যেকটি খুঁটির ওপর একটি করে প্রদীপ জ্বলছে, আর সেই ম্লান আলোয় দেখতে পেলাম পান্নাকে। নিভে-যাওয়া প্রদীপের পলতের দেশলাই জ্বেলে দিচ্ছে এক এক করে।

সে এক বিমুগ্ধ রূপ। আলো আর অন্ধকারের লুকোচুরি যেন। কিন্তু পান্নার পাশে কে ?

এগিয়ে গেলাম। খাটো ঘোমটার চোখ তুলে মীরাও তাকিয়েছে তখন।

—তিমুদা ! ছোড়দা তুমি ?

—তুমি এখানে ?

মীরা হেসে উঠল।—এসো না।

বললাম, কি করে যাই বলো ? রাস্তার লাইট পোস্টের ধারে লাল পাগড়িটা দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখতে পাচ্ছো না ?

মীরা সেদিকে তাকিযে একমুখ হাসল।—বেশ জব্দ হয়েছো তোমরা !

জব্দ ? সত্যি তাই। পরের দিনই শুনলাম পরীকে পুলিসে ধরে নিয়ে গেছে। ফেন্সিংয়ের গায়ে প্রদীপ দিতে দিতে একটা প্রদীপ বুঝি বাইরে পড়ে গিয়েছিল, আর অন্যমনস্কভাবে সেটাকে তুলে বসাবার জন্যে যেই এক পা বাইরে বেরিয়েছে অমনি লাল পাগড়ি পুলিস এসে ধরেছে ওকে। এক মাসের জেল হয়েছে।

কারফিউ তো নয়, এ যেন সীতার গণ্ডি পার হওয়া। ভিক্ষে দিতে এসে রাবণের হাতে বন্দী হওয়া।

পান্নাদের সঙ্গে মীরাদের কি একটা আত্মীয়তার বন্ধন ছিল। আর বিকাশবাবু এবং বিকাশবাবুর স্ত্রী যদিও প্রকাশ্যে মীরাকে ক্ষমা করেন নি, তবু পান্নার মা মীরাকে গ্রহণ করেছিলেন। আর সেই সূত্রেই মীরা বেড়াতে আসতো পান্নাদের বাড়ি।

একটা দিনের কথা মনে আছে। ঘটেছিল পান্নার দাদার বিয়েতে। বৌভাতের দিনে।

দু-খানা ঘর নিয়ে ওদের কোয়ার্টার। তাই লোক-খাওয়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিল আমাদের বাগানে।

আমাদের ভেতর-উঠোনে একরাশ পান নিয়ে বসেছিল পান্না, সেজদি আরো অনেকে। পান সাজছিল ওরা।

হঠাৎ মীরা বললে, পান্না, এই সঙ্গে তোর বিয়েটাও হয়ে গেলে ভাল হতো. না রে ?

পান্না লজ্জায় মুখ নামালো, আর সেজদি বললে, বর কই ? বর আনতে পারিস তো মাসীমাকে বলে দেখি।

—কেন, তিমুদা তো রয়েছে। বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল মীরা।

লজ্জায় রাগে ছুটে পালালো পান্না।

সেদিন বিকেলেই মীরা হাসতে হাসতে এসে বললে, পান্না কি বলেছে শুনেছো ?

—বলেছে তিমুদার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়াও ভাল
শুনে হেসেছিলাম। কিন্তু মনে আঘাত লেগেছিল।

২১

পুজোর সময় রাত জেগে যাত্রা দেখছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, পান্না ডাকছে।

কাছে যেতেই বললে, আমাকে একটু বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসবে?

—চলো।

নির্জন রাস্তায় বেরিয়ে চুপচাপ পাশাপাশি হেঁটে চলেছি, পান্না হঠাৎ বললে, মীরাদি তোমার নাম করে এতো রাগায় কেন বলো তো?

বললাম, কি জানি।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ।

হঠাৎ বললাম, মীরা কি বলেছিল মনে আছে তোমার?

পান্না বোধহয় লজ্জা পেলো। তবু ফিসফিস করে বললে, কি বলেছিল?

—সেই যে সেজদি জিজ্ঞেস করেছিল, বর কই, তার উত্তরে? তা যদি হয়, ভালই হয়, না পান্না?

পান্নার গলার স্বরে কেমন যেন অস্বস্তি ফুটলো। লজ্জার স্বরে বললে, জানি না।

দেওদার গাছের নির্জন অন্ধকারটুকু পার হয়েই পান্নাদের বাড়ি, প্রায় পৌঁছে গেছি তখন।

বললাম, না, এড়িয়ে যেয়ো না পান্না। বলো তুমি।

—তুমি জানো। তুমি যা বলবে···শান্ত গলায় উত্তর দিল পান্না। তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল।

সমস্ত শরীরে কি এক উষ্ণতা বোধ করলাম। কি এক অদৃশ্য প্রবৃত্তি। উন্মাদের মতো কাছে টেনে নিলাম, বুকে জড়িয়ে ধরলাম তাকে।

—ছাড়ো তিমুদা, ছেড়ে দাও। ফিসফিস করে পান্না বললে।

তবু সে-কথা যেন স্পর্শ করলো না আমাকে।

চুম্বনের মধ্যে যে এমন এক অদ্ভুত আনন্দ, এমন এক বিচিত্র অনুভূতি, কে জানতো। কে জানতো নারীবক্ষের কোমল স্পর্শে এমন বিচিত্র উন্মাদনা জাগে।

আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পেয়েই ছুটে পালালো পান্না।

আর আমার সমস্ত মন যেন হঠাৎ লজ্জায় অনুশোচনায় ডুবে গেল। যেন মস্তো বড় এক অপরাধ করে ফেলেছি।

পান্নার মনেও হয়তো এমনি এক অনুতাপ উঁকি দিয়েছিল। তাই বহুদিন আর দেখা পাই নি তার।

সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা। কতোদিন অপেক্ষা করে কটে গেছে! মন নিঃস্ব হয়ে গেছে ব্যর্থতায়।

এমনি ব্যর্থতা যেন দেখেছিলাম নিরুর দাদুর চোখেও। এমনি এক পেয়ে হারানোর ব্যথা।

আমার চোখে যেমন পান্না, তেমনি দাদুর কাছে ছিল ইস্কুল।

হঠাৎ একদিন দুপুরে দেখা গেল লাল পাগড়ি পুলিস স্কুলবাড়িটা ঘেরাও করে ফেলেছে। বন্দুক হাতে কয়েকজন গুর্খা সিপাই টহল দিচ্ছে।

তারপর একজন দারোগা এসে বললে, ইস্কুল সার্চ করবো, পরোয়ানা আছে ছাত্রের নামে।

হেডমাস্টারের দৃষ্টি দেখলাম দাদুর চোখে। কালো চোগা-চাপকান, মাথায় শামলা, বঙ্কিমচন্দ্রকে ছবিতে যেমন দেখায় ঠিক তেমনি। শুধু দাদুর মুখে ছিল এক মুখ সাদা দাড়ি, আর চোখ দুটো বড়-বড়।

একজোড়া শান্ত বড়-বড় চোখ প্রতিবাদ করলো। বললেন, বাইরে যা-খুশি করতে পারেন, এ ইস্কুলের এলকায় আমি আপনাদের সম্রাট পঞ্চম জর্জের চেয়েও বড়। এখানে আমার অধিকারই সবচেয়ে বড়।

দারোগা খুশি করবার চেষ্টা করলে দাদুকে। বললে, সেইজন্যেই তো আপনার অনুমতি চাইছি।

—না। এমন অন্যায় অনুমতি আমি দিতে পারি না। বজ্রগম্ভীর স্বরে দাদু উত্তর দিলেন।

দারোগা হাসল। তারপর ইশারা করতেই জনকয়েক গুর্খা সিপাই ঢুকলো ভেতরে।

দাদু বাধা দিতে গেলেন, তাঁকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল দারোগা।

তল্লাস করে একটি ছেলেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল তারা।

পরের দিনই শুনলাম, দাদু চাকরি ছেড়ে দেবার ইচ্ছে জানিয়ে চিঠি দিয়েছেন কোম্পানিকে।

ইস্কুলের প্রেসিডেন্ট বোঝাবার চেষ্টা করলো, সি এম ই সাহেব নিজে এসে ক্ষমা চাইলো, কিন্তু দাদু মত ঠিক করে ফেলেছেন তখন।

সমস্ত জিনিসপত্র আসবাব নীলামে তুলে দিয়ে একদিন সত্যিই চলে গেলেন।

বললেন, তিলে তিলে যে পৃথিবী গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম, তিল তিল করে তার মৃত্যু ঘটবে আমার চোখের সামনে, সে-দৃশ্য আমি দেখতে চাই না।

চলে গেলেন। যারা গড়ে তোলে, চিরকাল তাদেরই বোধহয় চলে যেতে হয়। রেলের লাইন তো নয়, মৃত্তিকার শরীরের বন্ধন। মাটির পায়ে বেড়ি পরিয়ে দেবার কাজে একদিন সহায়তা করেছিলেন বলেই কি এমন ভাবে বিদায় নিতে হল ?

সমস্ত শহরের, লক্ষ লোকের ভিড় ভেঙে পড়েছিল বিদায় সংবর্ধনার দিনে। হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান, গুজরাতী মারাঠী মাদ্রাজী, সব প্রদেশবাসী এক হয়ে চোখের অশ্রু দিয়ে বিদায় জানিয়েছিল। বুঝেছিলাম, কোনো ঘটনা, আদর্শ বা আইনের অত্যাচার নয়, সব ভেদাভেদের উর্ধ্বে সকল মানুষকে একসূত্রে বাঁধতে পারে শুধু ব্যক্তিত্ব—একজন মানুষের হৃদয়।

বিষণ্ণ মনে সদাশিব জ্যাঠার কাছে চলে গিয়েছিলাম।

বাঘছালের আসনে বসে তুলসীদাস পড়ছিলেন তিনি, সুর করে করে। সুদীর্ঘ স্বাস্থ্যবান শরীর, উন্মুক্ত বক্ষে শ্বেতশুভ্র উপবীত, গৌরবর্ণ প্রশান্ত মুখমণ্ডল।

একটু দূরে নিঃশব্দে বসে পড়লাম।

তন্ময় হয়ে গেয়ে চলেছেন সদাশিব জ্যাঠা :

পহেলা প্রহরমে সবকোই জাগে।
দোসরা প্রহরমে ভোগী ॥
তিসরা প্রহরমে তস্কর জাগে।
চৌঠা প্রহরমে যোগী ॥

সত্যিই তো তাই। প্রথম প্রহরেই সকলে জেগে থাকে। দ্বিতীয় প্রহরে জেগে থাকে শুধু ভোগলিপ্সু, কামার্ত মানুষ। তৃতীয় প্রহরে সকলেই ঘুমোয়, তস্কর ঘুরে বেড়ায় চৌর্যের

লোভে। আর চতুর্থ প্রহর—রাত্রির শেষ প্রহরে জেগে ওঠে শুধু তাপস—যোগসাধনার উদ্দেশে।

হেসেছিলেন সদাশিব জ্যাঠা।—শুধু এই সাধারণ অর্থেই তুলসীদাকে গ্রহণ কোরো না তিমু। আরো গভীর অর্থ আছে এর।

গতিই একমাত্র সত্য। চক্রবৎ ঘুরছে পৃথিবী, মানুষ, সমাজ। ইতিহাস সেও এই চক্রের আবর্তে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। কিন্তু এই চক্রের মধ্যেও উন্নতি আছে, ক্ষতিবৃদ্ধি আছে, পরিবর্তন আছে। তাই আমাদের দর্শনে সৎসঙ্গ আর সদিচ্ছা পোষণ করতে বলেছে। পরিবেশ আর প্রকৃতিধর্ম···এই দুইয়ের প্রভাবেই মানুষ এবং সমাজ বেড়ে ওঠে। পরিবেশকে যেমন সর্বমুহূর্তে আমরা লঙ্ঘন করতে পারি না, তেমনি আমাদের একাগ্র ইচ্ছাকেও অস্বীকার করতে পারে না পরিবেশ। জ্ঞানের বলে, বিজ্ঞানের বলে এই চক্রবৎ প্রকৃতিকে জয় করে মানুষের কাজে লাগানোই সভ্যতার সাধনা।

একাগ্রতার নাকি পরাজয় নেই সদাশিব জ্যাঠা বলেছিলেন। কিন্তু এই একাগ্রতা তো আমার ভালবাসায় ছিল।

—ছোড়দা তুমি সত্যি ভালবাসো পান্নাকে, সত্যি ? মীরা জিজ্ঞেস করেছিল।

—হ্যাঁ মীরা। হয়তো নিজের জীবনকে এত ভালবাসি না।

মীরা হেসেছিল।—নিজেকে ভালবাসলে অপরকে ভালবাসা যায় না ছোড়দা।

বিশ্বাস হয়নি। মীরা কি নিজেকে ভালবাসতো না ? নিজের ওপর মায়া মমতা নেই এমন মানুষ কি পৃথিবীতে আছে ? কে জানে।

প্রশ্ন জাগতো মনে, কিন্তু সাহস করে জিজ্ঞেস করতে পারিনি কোনোদিন। অথচ কতোবার তো ছুটে গিয়েছি মীরার কাছে, সান্ত্বনা পাবার জন্যে।

পরিমলদাও হাসাহাসি করতেন পান্নার কথা উঠলে।

বলেছিলেন, মীরার কাছে শুনেছি তুমি নাকি কবিতা লেখো। সেই ভাল তিমু, প্রেমের কবিতা লেখাই সহজ। সত্যিকার ভালবাসা মানে বিদ্রোহ, সে তুমি পারবে না।

—পারবো, নিশ্চয়ই পারবো। সাহস যুগিয়েছিলাম পান্নার মনে!

শীত-রাতের সেই ভীরু অভিসার মনে পড়ে।

একে একে সব আলো নিভে যেতো। কাঠের সিঁড়িতে শব্দ হতো। তারপর একসময় টের পেতাম, মা, বাবা, সেজদি সকলে শুয়ে পড়েছে। চারিদিক নিঃশব্দ আর অন্ধকার।

প্রচণ্ড শীতে গরম চাদরটা গায়ে জড়িয়ে এসে অপেক্ষা করতাম বাগানের এক কোণে, শিউলি গাছটার তলায়।

সেদিন ছিল পূর্ণিমার রাত। আর ঠাণ্ডা হাওয়ার দাপট।

প্রতীক্ষার কাল গুনে গুনে হয়তো অধৈর্য হয়ে উঠেছিলাম। পায়চারি করতে করতে কেবলই তাকাচ্ছিলাম পান্নাদের বাড়িটার দিকে!

হঠাৎ নিঃশব্দে কপাট খুললো। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে এল পান্না।

কাছে আসতেই বিস্মিত হলাম।—এ কি ? গরম জামা গায়ে দাওনি ? চাদর নাওনি কেন ?

পান্না শীতে কাঁপতে কাঁপতে বললে, গরম জামা চাদর সব মা-র ঘরে। আনতে গেলেই ঘুম ভেঙে যাবে।

বললাম, তবে চলো আমার ঘরে।

—না, না। প্রতিবাদ করে উঠল পান্না।

হাসলাম।—এত অবিশ্বাস ?

কৌতুকের চোখ তুলে তাকালো ও, মৃদু হেসে বললে, অবিশ্বাস তোমাকে নয়।

বলেই আমার চাদরের আধখানা টেনে নিয়ে গায়ে জড়ালে।

বুকের আরো কাছে পেলাম। এত কাছে বোধহয় আর কোনো দিন পাইনি।

অথচ কতো স্বপ্নই না বুনতাম ওকে ঘিরে। কল্পনার রঙ ওর মনে কম ছিল না।

তারপর হঠাৎ একদিন কান্নায় ভেঙে পড়লো। কোনো কথা বললে না, কোনো কারণ জানালো না, শুধু কাঁদলো আর কাঁদলো।

মীরার কাছে ছুটে গেলাম সেদিনই।—কি হয়েছে মীরা ?

মীরাকেও কেমন যেন বিষণ্ণ দেখালো। বললে, সর্বনাশ হয়েছে ছোড়দা।

—কি হয়েছে ?

—বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে পান্নার।

হেসে ফেললাম।—যাক সুখে থাকতে পারবে পান্না, গার্ডসাহেবের সঙ্গে মেল ট্রেন আর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের দাবা খেলতে পাবে।

উষ্মা প্রকাশ পেলো মীরার কথায়।—তুমি কি বলো তো ?

উত্তর দিলাম না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মীরা বললে, গার্ডসাহেবের ছেলে নয়, মালঞ্চর উপাধ্যায়দের ছেলে অজয়…

—সে কি ? বললাম, চিনি ওকে, শহরের সবাই ওদের কাছে মাথা বিকিয়ে রেখেছে বলে গর্ব করে।

মীরা ভারী গলায় বললে, এর চেয়ে গার্ডসাহেবই ভাল ছিল।

বললাম, কিন্তু ওখানে কি হল মীরা ?

মীরা হঠাৎ হেসে উঠল। মুখে আঁচল গুঁজে হাসতে হাসতে বললে, পাগল হয়ে গেছে বুড়ো! ছেলের জন্যে মেয়ে দেখে গিয়ে শেষে নিজে বিয়ে করতে চেয়েছিল।

মীরা হাসল, কিন্তু আমি হাসতে পারলাম না।

হঠাৎ বললাম, মীরা, পরিমলদা বলেছিল, ভালবাসা মানে বিদ্রোহ। বিদ্রোহ করার সাহস আমারও আছে।

শুনল মীরা, চোখ তুলে তাকালো। বড় বড় চোখজোড়া উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওর।

বললে, তাই করো, ছোড়দা, তাই করো।

বাড়ি ফেরার পথে মনে পড়ছিল সদাশিব জ্যাঠার কথা, একাগ্রতা থাকলে পরিবেশকে অস্বীকার করা যায়।

তবু পথ খুঁজে পাইনি, ভরসা দিতে পারিনি পান্নাকে। ওই বয়েসে ভালবাসাই যে পাপ, জানতাম না।

প্রতিদিনের মতোই সকালে বিকেলে এসে বসতো ও মা-র কাছে। গল্প করতো, ঘরকন্নার কাজে সাহায্য করতো মাকে, সেজদিকে। আর আমার সঙ্গে চোখোচোখি হলেই কি যেন খুঁজতো ওর দৃষ্টি, কি যেন জানতে চাইতো।

তারপর একদিন মা বললে, তোর বইপত্র দোতলার ঘরে নিয়ে যা তিমু।

—কেন ?

মা বিস্মিত হল। বললে, শুনিসনি ? পান্নার যে এই বুধবারে বিয়ে! আমাদের বাগানে মেরাপ বাঁধতে লোক আসবে আজ থেকে। হট্টগোলে পড়তে পাবি না।

কোনো কথা বলতে পারিনি। মনে আছে, টেবিলে মাথা রেখে অনেকক্ষণ কেঁদেছিলাম। হ্যাঁ, কান্নাই তো। চোখে জল না এলে কি কান্না বলে না ? সমস্ত বুক যেন ব্যথায় ভেঙে পড়েছিল।

ধীরে ধীরে বইখাতা, জিনিসপত্র সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। যেরূপ বাঁধা হয়েছিল। আলো ঝলমল করে উঠেছিল। লাল শামিয়ানার গায়ে যেন সল্‌মা চুমকির চমক। সমস্ত পৃথিবী যেন খুশিতে উছলে উঠেছিল!

আর আমার চোখে শুধু কান্না। এ এক অবোধ্য ব্যথা। ব্যর্থতার বেদনা, অভিমানের পাথর যেন চেপে বসেছিল বুকের ওপর।

আর মাত্র দুটি দিন।

রাত ঘন হতেই একে একে সকলেই চলে গেল। নির্জনতা পেয়ে আমার একটা হাত চেপে ধরলো মীরা। বললে, এ কি করলে ছোড়দা! পান্না যে তোমাকে বিশ্বাস করেছিল।

হঠাৎ বলে বসলাম, সে বিশ্বাসের মর্যাদা আমি রাখবো মীরা।

তারপর অনেকক্ষণ জল্পনা-কল্পনা হয়েছিল মীরার সঙ্গে। ভালবাসা মানে বিদ্রোহ!

দেশকে ভালবাসাও তো বিদ্রোহ। সেই আগুন একদিন জ্বলে উঠেছিল হিজলীর জেলখানায়। জেলখানা নয়, বারুদ ঘর।

আশ্চর্য। হিজলীর এই জেলখানার চূড়াটার দিকে তাকিয়ে থেকেছি কতদিন চাঁদমারির ময়দানে বেড়াতে গিয়ে। চাঁদমারির ময়দানে সাহেবদের পোলো খেলা দেখেছি কতোবার। ঘোড়া ছুটে চলেছে এদিক থেকে ওদিকে, পিঠের খেলোয়াড়দের হাতে লম্বা স্টিক।

পোলো খেলাটা সাহেবদের দেশ থেকে এসেছে বলে ধারণা ছিল। সদাশিব জ্যাঠা বলেছিলেন, তা নয়, পোলো একেবারে ভারতীয় খেলা, মণিপুরীদের কাছ থেকে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

বড়দিনের মিটিঙে একজন সাহেব ঠাট্টা করে বলেছিল, পোলো খেলায় কোনো ভারতীয় যোগ দেয় না, তার কারণ তারা ভীতু।

সদাশিব জ্যাঠা প্রমাণ দেখিয়েছিলেন, খেলাটাই নাকি ভারতীয়দের কাছ থেকে শিখেছে ওরা।

এর পরও কয়েক বছর পোলো খেলা হয়েছিল। তারপর হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল একদিন। দেখলাম ঘোড়ার পিঠে চড়ে নয়, বন্দুক হাতে নিয়ে চাঁদমারির ময়দানে এসে জড়ো হল সাহেব বাচ্চারা।

বন্দুক ছোঁড়া শিখবে।

টার্গেট প্র্যাকটিস দেখতে যেতাম রবিবারে সকালে। আর অন্যমনস্ক ভাবে হঠাৎ কখনো চোখ পড়তো হিজলীর জেলখানার চূড়ার দিকে।

কি এক রহস্য যেন গুমরে মরে ওখানে, মনে হতো আমার।

নিমাইদাকে দমদম জেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওখান থেকে। কিন্তু নিমাইদার মতো কতো হাজার হাজার দেশ-প্রেমিক যে বন্দী হয়ে পড়ে ছিল ওখানে! বিনা বিচারে!

অথচ, কি আশ্চর্য, বিচারের জন্যই তো হয়েছিল হিজলীর জেলখানা। এত বড় শহরের জন্যে একটা পৃথক আদালতের প্রয়োজন হয়েছিল। তাই কোর্ট তৈরি হয়েছিল ওখানে। ইতিহাসের কি প্রহসন। বিচারালয় হয়ে গেল অবিচারের কেন্দ্র।

সদাশিব জ্যাঠা বলেছিলেন, জেল নয়, বারুদঘর। দেখিস, হঠাৎ একদিন ফেটে পড়বে।

বারুদে আগুন লেগেছিল একদিন। সমস্ত শহর চঞ্চল হয়ে উঠেছিল খবর শুনে। স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম সকলে। এও কি সম্ভব? এমন হতে পারে?

তবে যে সভ্যতার বড়াই করে ইংরেজরা?

লৌহকপাটের ভেতর রাজবন্দীদের আটক করে রেখে বাইরে থেকে গুলি চালিয়েছিল সিপাইরা। জনকয়েক মারা গেল, জখম হল অনেকেই। আর সারা শহর বিদ্রোহী হয়ে উঠল মুহূর্তের মধ্যে।

কলকাতা থেকে নেতারা গেলেন, দাবি করলেন, তদন্ত চাই।

আব স্ট্রাইক ময়দানে যে মিটিং হল, লক্ষ লোকের সেই জনতায় বাবা বললেন, তদন্ত চাই না, ইংরেজের তদন্তকে আমরা চিনি। মৃত রাজবন্দীদের শবদেহ চাই আমরা।

মিটিং থেকে ফিরে আসতেই বাবাকে প্রশ্ন করেছিলাম, কি হবে তদন্ত বন্ধ করে ? শবদেহ চাইলেই তো দিয়ে দেবে ওরা।

বাবা হেসেছিলেন।—শব নয় তিমু, ও হলো দধীচির অস্থি। ঐ শবদেহ চিতায় জ্বলবে দাউ-দাউ করে, লক্ষ লোকেব সামনে। আর ঐ চিতার মুঠো মুঠো ছাই পাঠিয়ে দেবো ভারতবর্ষের প্রতিটি গ্রামে। ছাই নয়, বারুদ হয়ে জ্বলে উঠবে দেশে দেশে।

কিন্তু রাজনীতির পাণ্ডাদের কাছে এ-কথা ভাল লাগেনি। ফলে, কি হাস্যকর তদন্তই না হয়েছিল !

তদন্ত পেশ হওয়ার দিন কয়েক পরেই নিমাইদা ফিরে এলেন।

প্রথমটা চিনতেই পারিনি। রুগ্ণ অসুস্থ শরীর, মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, পরনে ময়লা খদ্দরের ধুতি।

বাবা ছিলেন না। বারান্দার বেঞ্চিটায় পা গুটিয়ে বসে নিমাইদা বললো— এক কাপ চা খাওয়া তিমু।

বললাম, মা আসছে খাবার নিয়ে।

নিমাইদা হাত ধরে কাছে টানলে।—বোস্ এখানে। তারপর কি খবর সব বল।

বললাম, এতদিন পরে এলে নিমাইদা, কত কি হয়ে গেল।

নিমাইদা হাসলো। ধীরে ধীরে, বেশ সঙ্কোচের সঙ্গে প্রশ্ন করলো অঞ্জলি ?

চোখে জল এল। বললাম, সেই যদি ফিরলে নিমাইদা. দু-দিন আগে এলে না কেন।

তারপর সব কথা খুলে বললাম। শুনে চুপ করে রইলো।

চা আর খাবার খেয়ে চলে গেলো নিমাইদা।

বললো, শুধু তোদের খবর নিতে এসেছিলাম তিমু। আজকেই পুনা যাচ্ছি, অনেক কাজ পড়ে আছে আমার।

চলে গেলো। আর আমার মনে হল আমাদের নয়, শুধু অঞ্জলিদির খবর নিতে এসেছিল নিমাইদা।

নিমাইদাব সেই হতাশার মুখ ভুলতে পারিনি কোনোদিন।

মীরাকে বলেছিলাম সে-কথা। বলেছিলাম, নিমাইদাও বিদ্রোহ করতো, কিন্তু···

—কিন্তু মানুষের চেয়ে দেশকে বেশি ভালবাসতেন উনি। মীরা উত্তর দিয়েছিল।

আর আমি ? মানুষের চেয়ে নিজেকে !

পান্নার বিয়ের আগের দিনটা বেশ মনে আছে। মীরার সঙ্গে নানান ষড়যন্ত্র করে দুরদুর বুকে ফিরে এলাম।

কিন্তু বাড়ি ফিরতেই কেমন এক ছমছম ভাব। বাবা, মা, সেজদি, সকলেই চুপচাপ বসে আছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। আর বাবার হাতে একটা কাগজ।

—কি হয়েছে মা ? উদগ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলাম।

—আমাদের চলে যেতে হবে তিমু। দীর্ঘশ্বাসের সুরে জবাব দিল মা।

তারপর নোটিসটা পড়ে শোনালেন বাবা।

সেজদি বললে, থানা থেকে দিয়ে গেছে একটু আগে।

চলে যেতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এ শহর ছেড়ে, এই জেলার আওতা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কে যেন একটা ট্যাক্সি ডেকে আনলো। একেবারে আনকোরা নতুন ঝকঝকে ট্যাক্সি।

ট্যাক্সিতে উঠে হঠাৎ চোখ পড়লো পান্নার দিকে। কাছাকাছি প্রতিবেশীরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, দেখতে পাইনি এতক্ষণ।

দেখলাম উৎসুক চোখ মেলে তাকিয়ে আছে পান্না। আর মীরার চোখে যেন হতাশা।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল।

একটু এগিয়ে এসে মোড় নিতেই কানে গেল সদাশিব জ্যাঠার গুরুগম্ভীর গলায় তুলসীদাস আবৃত্তি।

বোধ হয় মন্দিরের কুয়োয় স্নান করতে করতে গাইছিলেন :

পহেলা প্রহরমে সবকোই জাগে।
দোসরা প্রহরমে ভোগী ৷৷
তিসরা প্রহরমে তস্কর জাগে।
চৌঠা প্রহরমে যোগী।

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। বুদ্ধি, বল, অর্থ, শ্রম।

সদাশিব জ্যাঠা সাবধান করে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আবার প্রথম প্রহর এসেছে তিমু, সকলে জেগে উঠেছে। মন্ত্রতন্ত্রকে সরিয়ে রাজতন্ত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছিল মানুষ, রাজতন্ত্র সরিয়ে ধনতন্ত্রকে। এবার দিন এসেছে, বৈশ্য হেরে যাবে, সিংহাসন পাবে শূদ্রের শ্রমশক্তি। কিন্তু চক্রবৎ ঘুরছে সব, সাবধান না হলে সাধারণের কাছ থেকে রাষ্ট্রনীতির ব্রাহ্মণ তার চাতুর্যের বলে, বুদ্ধি আর কৌশলে শক্তি হরণ করবে। ঘুরে চলাই প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু মনুষ্যত্ব হল প্রকৃতিকে জয় করা।

আর বলেছিলেন, প্রথম প্রহরে তো সবাই জাগে, জাগছে সকলেই। কিন্তু এরপরই দ্বিতীয় প্রহরে দেখবে ভোগবিলাসের কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। আজ যারা ত্যাগী কাল তারাই হবে বিলাসী, অর্থলোভী।

—তারপর ?

—তারপর তৃতীয় প্রহরে আসবে চৌর্যবৃত্তির যুগ, ভারতবর্ষ ছেয়ে যাবে তস্করে। কিন্তু সবশেষে আসবে ত্যাগী কর্মীর দল। আসবে জ্ঞানযোগী কর্মযোগী মানুষ। অপেক্ষা করতে হবে, অপেক্ষা করে থাকতে হবে ততদিন।

কিন্তু সে প্রতীক্ষা যে দুঃসহ। ততদিন ধৈর্য ধরে থাকবে মানুষ ?

হঠাৎ নিমাইদার কথা মনে পড়লো। নিমাইদা বলতো, ঐতিহাসিক নিয়মে সবই অনিবার্য, স্বাধীনতাও। কিন্তু অপেক্ষা করে থাকলে তো চলবে না, তাকে কাছে এগিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে আমাদেরই। নিমাইদা কোথায় আজ ?

তন্ময়তা ঘুচে গেল। লেভেল ক্রসিংয়ের গেট উঠতেই হুস করে ছুটে এসে ক্ষণপরেই সাবওয়ের মুখে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সিটা।

বাবা হঠাৎ নিজের মনেই বললেন, সব বদলে যাচ্ছে, সব বদলে যাবে !

ঝকঝকে নতুন ট্যাক্সিটা দেখে তাই মনে হয়েছিল। স্টেশনে পৌঁছে একটাও ফিটন দেখতে পাইনি। যে ফিটনে চড়ে, নিরুর দাদু নিউ সেটেলমেণ্টের ইস্কুল দেখতে যেতেন, যে ফিটনে চড়ে রাঙামামীমা স্বামীর ঘর করতে গিয়েছিলেন, যে ফিটনে করে অবনীদা অঞ্জলিদিকে নিয়ে গিয়েছিলেন কলকাতায়।

আর প্লাটফর্মের সাবওয়ের সুড়ঙ্গ-পথে শুঁড়-তোলা সেই হাতির মাথাটা দেখতে পাইনি। সে-জায়গায় একটা ঝকঝকে নতুন ধরনের আলো জ্বলছিল।

বললাম, হাতির মাথাটা কোথায় গেল বাবা ?

সেজদি হেসে বললে, সে কি রে, শুনিসনি ? কোলকাতার হেড আপিসে নিয়ে গিয়ে

রেখেছে সেটা।

কেমন একটা ব্যথা লাগল বুকে। পুরোনোকে বিদায় দিয়ে নতুনকে আহ্বান করার মানেই তো ইতিহাসকে মুছে ফেলা। কিন্তু হাতির শুঁড়-তোলা মাথাটা দেখে ট্রেনের সঙ্গে হাতির যুদ্ধের গল্পটা মনে পড়তো না, মনে পড়লো আজ—সেই স্মৃতিচিহ্ন সরিয়ে ফেলেছে দেখে।

আমাদের চলাও হয়তো এমনি ভাবেই মুছে যাবে এ-মাটির মন থেকে। পান্নার মন থেকেও কি মুছে যাবো আমি ? না না, কক্ষনো না। প্লাটফর্মের ঝনঝন শব্দ, সান্টিঙের আওয়াজ, হুইসল্, ঘন্টি, যাত্রীদের গুঞ্জন, ফেরিওয়ালাদের হাঁকডাক—সব ছাপিয়ে এক বিচিত্র নিস্তব্ধতা যেন থমকে রইলো মনের কোণে। পান্না, পান্না। হ্যাঁ, আবার ফিরে আসবো, আবার দু-হাত বাড়িয়ে কাছে টেনে নেবো।

পান্না কি অপেক্ষা করবে। যতদিন না ফিরে আসার সুযোগ পাই। মন বললে, পান্না অঞ্জলিদির মতো ভীরু না। বুকের মধ্যে অবোধ্য এক ব্যথা বাজলো, দীর্ঘশ্বাস থমকে রইলো। আর দু-চোখের উদাস দৃষ্টি যেন ব্যথার বাতাসে ছায়া ফেলতে চাইলো।

বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম। এ বাতাসে আর কোনোদিন বুঝি নিশ্বাস নিতে পাবো না। এই সূর্য বুঝি আর কোনোদিন দেখতে পাবো না। মন যেন চিৎকার করে বলে উঠতে চাইলো, আসবো, আসবো ! ফিরে আসবো পান্না, তোমার জীবনে আমি আবার ফিরে আসবো একদিন। হয়তো ততদিনে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে, তবু জানি তোমার মধ্যে কেউ অপেক্ষা করবে।

ট্রেন এল।

উঠে বসলাম সকলে।

আর হঠাৎ পরীর গলা শুনে চমকে উঠলাম।

সুর টেনে টেনে কি যেন বলতে যাচ্ছিল পরী, চোখোচোখি হতেই থেমে গেল। বললে, তিমু তুই ? কোথায় চলেছিস ?

বললাম।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো পরী। পাশে এসে বসলো। ওর চোখ দুটো হঠাৎ যেন কৌতুকে হেসে উঠে ইঙ্গিতে প্রশ্ন করলো, পান্না ! দীর্ঘশ্বাসেই তার জবাব দিলাম। ক্রমে ক্রমে চোখে জল জমলো পরীর।

জোলো একজোড়া চোখ মেলে জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলো পরী।

তারপর ধীরে ধীরে সুটকেস খুলে এক শিশি এসেন্স বের করে দিয়ে বললে, নিয়ে যা এক শিশি, প্রথম দিন নিয়ে বেরিয়েছি। সাহেবরা আমাদের জিনিস তো কিনবে না তিমু, জেল থেকে ছাড়া পেয়ে তাই শেষ পর্যন্ত নাম দিয়েছি মর্নিং ইন্ ইণ্ডিয়া। লেবেলটা ভাল হয়নি ?

আতরের সৌরভে মন ভরে গেল।

তারপর....

গার্ডের হুইসল্ বাজলো, নড়ে উঠল ট্রেনটা ! আর সুটকেসটা হাতে নিয়ে টুপ করে নেমে পড়লো পরী।

ছুটতে ছুটতে গিয়ে পাশের কামরাটায় উঠল।

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে। প্রথমে লঘুছন্দে, তারপর দ্রুততালে। ক্রমে ক্রমে স্টেশন পার হয়ে ইস্ট কেবিন পার হয়ে ছুটে চললো ট্রেন। শুধু ওভারব্রিজটা দেখা গেল ট্রেনটা বাঁক নিতেই।

এই ওভারব্রিজের ওপর দাঁড়িয়ে কতদিন তাকিয়ে থেকেছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জংশন স্টেশন তো নয়, যেন এক বিরাট বনস্পতি ঐ দোতলা স্টেশনটা। অগুন্তি রেলের লাইন নয়, যেন শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে চতুর্দিকে। জোড়া-জোড়া রেললাইন পড়ে আছে

পাশাপাশি। কত দেশবিদেশে ছুটে গেছে, কিসের অন্বেষণে কে জানে।

দু-জোড়া লাইন গেছে সাহেবপাড়ার পাশ দিয়ে, ধোবিঘাটের পাশ দিয়ে, তারপর বাঁক নিয়েছে ট্যাংরার হাটের দিকে।

এই জমি নিয়েই নাকি কোম্পানির সঙ্গে মামলা লড়েছিল গ্রামের লোক। বলেছিল, সিংহবাহিনীর বুকের ওপর দিয়ে যেতে দেবো না ইস্পাতের লাইনকে।

আর উপাধ্যায়বাবুরা ধর্ম বিক্রি করেছিল কোম্পানির কাছে।

ঘুষ খেয়ে ফেঁপে ওঠা সেই উপাধ্যায়দের ছেলের সঙ্গে হয়তো বিয়ে হবে পান্নার!

পান্না কি এখনও ভাবছে আমার কথা? কাঁদবে কোনোদিন?

সাহেবপাড়ার ছিমছাম নির্জনতায় একদিন পান্নাকে কাছে পেয়েছিলাম।

বড়দিনের সময় আতসবাজী পোড়ানো হতো চাঁদমারীর ময়দানে। সারা শহরের লোক ভেঙে পড়তো তখন।

পান্নাও এসেছিল, নিরুদের সঙ্গে। তারপর একসময় চুপিচুপি কাছে এসেছিল ও।

আতসবাজীর ভিড় ফেলে রেখে দু-জনে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম নির্জন পথে পথে। দু-পাশে কৃষ্ণচূড়া, ইউকেলিপটাস, মুচকুন্দের সারি। জনহীন শান্ত স্তব্ধ পথ। হলুদ নরম মুচকুন্দের ঝরে-পড়া পাপড়ির মৃদু গন্ধ। হালকা বাতাস।

কত স্বপ্ন।

সব পিছনে পড়ে রইলো। মুছে গেল, মিলিয়ে গেল স্মৃতির পট থেকে।

শেষকথা

তারপর সুদীর্ঘ একটি যুগ পার হয়ে গেছে। ঘুরেছি দেশে দেশে। কত নতুন মানুষ, নতুনতর পরিবেশ। লিখেছি তাদের কথা। সাহিত্যিকের পরিচয় মিলেছে। কিন্তু কোনোদিন সেই শৈশবের ফেলে-আসা দিনগুলিতে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়নি।

ঘুমন্ত শিশুর মতোই নিঃশব্দে পড়ে ছিল সেই অতীতের রঙিন দিনগুলি। কে জানতো, পরিব্রাজক জীবনের শেষে হঠাৎ একদিন এই অনেক-চেনা স্টেশনে এসে ট্রেন থামবে। কানের পাশে সে-নাম শুনতে পাবো। আর ল্যাম্পপোস্টের ধোঁয়াটে জ্যোৎস্নার নীচে অপেক্ষা কববে সে।

—তিমুদা না?

নিজের ডাক-নামটা নিজেই যেন ভুলে গিয়েছিলাম। চমকে চোখ তুলে তাকালাম বিপরীত বার্থের দিকে।

ছোট ছোট দুটি মেয়ের হাত ধরে সুলেশ সৌন্দর্য নিয়ে যে ট্রেনে উঠল তাব মুখের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে দেখিনি। কিন্তু তার মুখের দিকে তাকিয়ে শুধুই চেনা-চেনা লাগলো, কিন্তু চিনতে পারলাম না। নাম মনে পড়লো না।

কে এই অপরিচিতা? কে?

স্মৃতির গভীরে অনুসন্ধান করেও হদিস পেলাম না এ সুন্দর মুখের। কে এই রহস্যময়ী?

তবু অস্ফুটে বলে ফেললাম, কি খবর? ভাল আছো তো?

হাসল সে।—যাক, চিনতে পেরেছো তা হলে?

চিনতে পারিনি। এ এক অসহ্য দুশ্চিন্তা। একজন আমাকে ক্রমাগত মনে পড়িয়ে দিচ্ছে ফেলে-আসা জীবনের কথা, পরিচিত প্রতিবেশী আর আত্মীয়স্বজনদের কথায় মুখর হয়ে উঠছে, অথচ স্মৃতির পাতা উলটেও খুঁজে পাচ্ছি না তাকে।

তবু চিনতে পেরেছি এমনি ভান করতে হয়।

হিজলের বন থেকে হিজলী। সমুদ্র সৈকতের গভীর অরণ্যের মাঝে হঠাৎ একদিন বেজে উঠেছিল বারো বেহারার ঝুমুর-ঝুম ঝুমুর-ঝুম ! রক্তবরণ ঝালর-দোলানো সোনালী পালকির ঘুঙুর এসে থেমেছিল এখানে। রিচার্ডস সাহেব বজ্রের শক্তি নিয়ে এসে পৌঁছেছিল।

বলেছিল, তোমার দেশের নদীতে যতো বানই ডাকুক আমার হাতে সে বন্দী হবেই।

বন্দী হয়েছিল। মাটি, মানুষ—সব।

পত্তনি নিশানার কাছে তাঁবু ফেলেছিল কোম্পানির সাহেবরা। তারপর ক্রমে ক্রমে লাইন এগিয়ে গেল, রূপনারায়ণের বুকে কংক্রিটের কাঁচুলি বাঁধা হল।

—আচ্ছা তিমুদা, রাউতনাচ মনে আছে ? আজকাল আর হয় না। রাউতাইন বললে মেয়েগুলো চটে যায় আজকাল। খিলখিল করে হেসে উঠল সে।—আজকাল আত্মসম্মান জ্ঞান হয়েছে ওদের।

ঠিক এমনি খিলখিল করে একদিন বিলাইতিও হেসে উঠেছিল। যেন প্রতিবাদ করার মতো কোনো অন্যায় করিনি।

যে-বয়সে কৌতূহলী মন কামলুব্ধ হাতকে বশে রাখতে পারে না সে-বয়সের উদ্ভট পাগলামিকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল বিলাইতি !

—উঃ, কতকাল পরে দেখা বলো তো। অপরিচিতার কণ্ঠস্বরে কোথায় যেন ব্যথা লুকিয়ে ছিল।

সত্যি, কত সুদীর্ঘ কাল পার হয়ে গেছে।

মনে পড়ে, রবিবার বিকেল হলেই ফিটনটা এসে দাঁড়াতো নিরুদের খিড়কির রাস্তায়। চোগা-চাপকান পরা নিরুর দাদু ধুতি চাদর পরে আসতেন সেদিন। গল্প বলতেন। উটের গাড়ির গল্প। দুটো চাকার ওপর দোতলা গাড়ি, সামনে একটা উট, আর পিছনে একটা।

হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল সে।—সেই ছড়াটা মনে আছে তিমুদা ? রেল রেল রেল ?

ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ। ভারতবর্ষে প্রথম রেললাইন পাতার ছবি ভেসে উঠল যেন চোখের সামনে। ঠিক যেমনটি দাদুর কাছে শুনেছিলাম। মনে পড়লো সুর টেনে টেনে গাইতাম :

রেল রেল রেল
তোমার পায়ে দিই তেল
রেলের কুঠি কতদূর,
ব্যথার পায়ে তেল সিঁদুর।

ট্রেন এসে দাঁড়িয়েছে। আর দল বেঁধে মেয়েরা এসেছে সদ্য স্নান করে এলোচুলে, মটকার শাড়ি পরে। হাতে কুলোর ওপর সিঁদুর আর ফলমূল।

ইঞ্জিনের সামনে এসে কেউ উলু দিল, কেউ শাঁখ বাজালো, তারপর সারি বেঁধে গান ধরলে তারা। ইঞ্জিনের চাকায় তেল দিয়ে তার পায়ের ব্যথা দূর করলো, যেমন করে প্রতিমা বরণ করে তেমনি ভাবে ইঞ্জিনের কপালে সিঁদুর দিল, ফল বাতাসা তুলে ধরলো মুখের কাছে।

যন্ত্র নয় কৈলাস থেকে যেন স্বয়ং নেমে এসেছেন শঙ্করী। মানুষের কষ্ট লাঘব করতে, দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মুখে অন্ন দিতে নেমে এসেছেন অন্নপূর্ণা।

—কি ভাবছো ?

বললাম, আচ্ছা, আজকাল মহরমে বাঘের লড়াই হয় ?

—না, তিমুদা। দাঙ্গার পর থেকে কি যে হল, যেমন দুর্গাপুজোর বিসর্জ্জনে আনন্দ নেই, তেমনি মহরমও যেন শুধু মসজিদ পাড়ার পার্বণ। বাঘ সেজে কেউ আর বখশিশ নিতেও আসে না।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে।

কেমন যেন ব্যথা অনুভব করলাম। তা হলে সত্যিই কি সেই পুরানো দিনের শহরটা বদলে গেছে ? সবই কি বদলে যায় ?

—আশ্চর্য মানুষ তোমরা ! এটা তোমার জন্মস্থান, মাঝে মাঝে এলে তো পারো।

জন্মস্থান ! আলোবৌকে মনে পড়লো।

মাতাল স্বামীকে পরিত্যাগ করে সুখ খুঁজতে এসেছিল আলোবৌ। শান্তি খুঁজেছিল।

অথচ কোনোদিন তো আলোবৌয়ের কথা লিখতে ইচ্ছে হয়নি। সময় পাইনি বলে ?

—সময় পাবে কি করে ? হেসেছিল সে। এখন তুমি মস্ত বড় লেখক, এখন তো আর আমাদের তিমুদা নও। কি, চোখ কপালে তুলছো যে, কোনো খবরই রাখি না ভেবেছিলে ?

বলেছিলাম, আমিই কোনো খবর রাখি না বলে লজ্জিত।

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।—বাব্বা, কি ঘষামাজা কথা বলো আজকাল।

পরক্ষণেই তার চোখে বিষণ্ণতা নেমেছিল। বলেছিল, আমাদের আর কি খবর রাখবে বলো। আমরা যেমন ছিলাম তেমনি আছি।

কথা খুঁজে পাইনি। তবু চিনতে পেরেছি এমনি ভান করতে হয়েছিল। মন যদিও তন্নতন্ন করে খুঁজছিল তাকে। কে এই অপরিচিতা ? কে এই রহস্যময়ী ?

চলন্ত ট্রেনের কামরায় হঠাৎ-দেখা-হওয়া কে এই অনন্তরঙ্গিণী, যে আমার শৈশব জীবনকে, জীবনের প্রথম প্রহরের কথা মনে পড়িয়ে দিল। যে আমাকে আজও মনে রেখেছে, অথচ যাকে আমি চিনতে পারিনি।

—বিয়ে করেছো তো ? হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল সে।

—সুযোগ ঘটেনি।

খিলখিল করে আবার হেসে উঠেছিল।—জানতাম। সুযোগ এলেও গ্রহণ করার মতো সাহস নেই তোমার, জানতাম।

চমকে উঠলাম। মনের কোণে যে অপরাধ লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি সেই তারে কে যেন নতুন করে ঘা দিল। সুযোগ তো সত্যিই একদিন এসেছিল, গ্রহণ করার সাহস হয়নি সেদিন।

তারপরই কথা পালটেছিল সে। প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা, মেয়ে দুটির মধ্যে কোনটি সুন্দর বলো তো ? এর নাম রেখা, আর এ রেবা। উনি কিন্তু বলেন,··

বলেছিলাম, দুজনেই সুন্দর।

—ও তোমার মন-রাখা কথা। আচ্ছা, সদাশিব জ্যাঠা সন্ন্যাসী হয়ে চলে গেছেন শুনেছো ?

সদাশিব জ্যাঠা সন্ন্যাসী হয়েছেন ? কিন্তু সন্ন্যাসীই তো ছিলেন তিনি।

মনে পড়ে, ভোর বেলায় শুনতে পেতাম তাঁর খড়মের শব্দ, আর জলদগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ। দীর্ঘ স্বাস্থ্যবান চেহারা, ফরসা বুকে শ্বেতশুভ্র উপবীত। কখনো বা রামায়ণ আবৃত্তি করতে করতে চলেছেন মন্দিরের কুয়োয় স্নান করতে।

—আর নিমাইদা ? পরী ?

—পরীর এখন খুব নাম, আবার জেলে গিয়েছিল। চাঁদা তুলে একটা হাসপাতাল করেছে। আর নিমাইদা এখন লক্ষপতি। ঠিকাদারি করে বড়লোক হয়ে গেছে।

নিমাইদা বড়লোক হলেন আর আবিদ হোসেন ফকির হয়ে চলে গিয়েছিল।

একটা কলম দিয়ে গিয়েছিল আবিদ হোসেন।—আমাকে নিয়ে একটা কাহানী লিখো ছোটাসাব।

কলমটা কোথায় যে হারিয়ে গেল! তেমনি আবিদ হোসেন নিজেও হারিয়ে গিয়েছিল আমার মন থেকে।

কত কিছুই তো হারিয়ে গেছে। দাদু, রাণা মাস্টার, রাঙামামীমা।

প্রদীপের শিখার ওপর আঙুল রেখে রাঙামামীমা বলেছিলেন, আগুনে পুড়তে নাকি কষ্ট হয় তিমু? কই কষ্ট?

আর মনে পড়ে এলা বেলা দুই যমজ বোনকে। মনে পড়ে সেই ছড়াটা শুনলে কেমন চটে যেতো দু-বোনই।

অঞ্জলিদির মা আর নিভামাসীর রসিকতা। তাঁর কাছেই শোনা সীতা কোলম্যানের গল্প। সীতা কোলম্যানের বংশের রবার্ট আর ক্লারাকে।

প্রতি রবিবারে কবরে ফুল দিযে যেতো তারা।

কিন্তু সুধাদি? সুধাদির কি হল? বিয়ে হয়েছে? না, গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল এই অপবাদে আজীবন কুমারী থাকতে হয়েছে সুধাদিকে?

মুস্তাফা? গার্ডসাহেব? মীরা আর পবিমলদা?

আর আডকাঠি অবনীদা। গ্লানিব জীবন থেকে, আত্মহত্যার অভিশাপ থেকে অঞ্জলিদিকে রক্ষা করেছিলেন!

কিন্তু ফুলজান বিবি স্টুয়ার্ট সাহেবেব সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে সুখ পেয়েছিল, মুক্তি পেয়েছিল?

ট্রেনের কামবায দেখা হওয়া সেই অনন্তরঙ্গিনী খিলখিল কবে হেসে উঠে বলেছিল, আমাদের নিয়ে তো একটা বই লিখলে পারো, তিমুদা। লেখো না একটা বই।

হেসেছিলাম তার কথা শুনে।

—হাসছো যে? যায় না, আমাদের নিয়ে বই লেখা যায় না?

বলেছিলাম, লিখবো।

—সত্যি লেখো তিমুদা। বানানো গল্প তো কতই লিখেছো, সত্যিকার গল্প লেখো না একটা। ঠোঁট টিপে হেসেছিল সে।

পরক্ষণেই বলেছিল, তোমার সব লেখাই পড়ি, যখনই নতুন কিছু দেখি, মনে হয় এইবার বুঝি তিমুদা আমাদের নিয়ে লিখবে। কিন্তু কিছুই তো লিখলে না।

তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম, কোনো কথা হয়নি।

হয়তো দু-জনের মনেই বিগত দিনের ছবি ভেসে উঠেছিল। জানলায় মুখ রেখে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল সে। যখন মুখ ফেরালো, মনে হল যেন চোখ ছলছল করছে তার।

ধীরে ধীবে প্রশ্ন করেছিল, মাসীমা ভাল আছেন, মেসোমশাই?

—হ্যাঁ।

দীর্ঘশ্বাসের শব্দটাও শুনতে পেয়েছিলাম।

তাবপব একসময একটি ছোট স্টেশনে এসে ট্রেন থামলো।

উঠে দাঁড়াল সে।—চলি তিমুদা। এখানেই নামবো। ও এখন এখানেই রিলিভিং করছে।

জিনিসপত্র নামাতে সাহায্য করলাম, মেয়ে দুটিকে কোলে করে প্লাটফর্মে নামিয়ে দিলাম।

বিষণ্ণ হাসি হাসলে সে বিদায়ের দৃষ্টি দিয়ে।

বললে, তিমুদা, এসো না একদিন সময় করে। সত্যি, কত কথা ছিল কিছুই বলা হল না। আসবে একদিন ?

—আসবো।

—সত্যি আসবে একদিন। ঐ যে কাঠের জাফরির পাশে মাধবীলতার ঝাড়, ঐ তো আমাদের কোয়ার্টার। পাশেরটা স্টেশন মাস্টারের।

—আচ্ছা আসবো একদিন।

—তা হলে, আজই এসো না। নামবে ?

বললাম, আসবো, আজ নয়। সত্যি আসবো একদিন।

—যে-কোনো শনিবার এসে সোমবারে চলে যেয়ো, কথা দিচ্ছি ছেড়ে দেবো।

বললাম, আসবো, আসবো একদিন।

হাত নেড়ে বিদায় জানালো সে। অদৃশ্য হয়ে গেল ক্রমে ক্রমে।

আর অদৃশ্য হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত দেখলাম, তাকিয়ে আছে সে, হাত নাড়ছে।

নির্জন কামরার স্তব্ধতায় মন ফিরে এল একটু পরেই।

অনুশোচনায় দগ্ধ হল মন।

কে এই অপরিচিতা ? যাকে একদিন গভীর অন্তরঙ্গতায় চিনতাম, অথচ আজ যাকে চিনতে পারলাম না।

এমন দুঃসহ প্রশ্ন আর কখনও বুঝি বোলতাব হুল্ ফোটায়নি।

ইচ্ছা হল চিৎকারে করে জিজ্ঞেস করি, কে তুমি ? কে ? আমি মিথ্যাব ভান করেছি, কিন্তু চিনতে পারিনি তোমাকে।

কত দিন মাস কেটে গেছে। এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি। তারপর একদিন বিস্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম।

ভুলে গিয়েছিলাম। সব, সব ভুলে গিয়েছিলাম।

হঠাৎ সেদিন প্রকাশকের ঠিকানায় লেখা একখানা নীল খাম পেলাম। বেশ কিছুদিন থেকে চিঠিটা তাঁর কাছে পড়ে আছে।

গোটা-গোটা হরফে নাম ঠিকানা লেখা।

আর সুন্দর ছাঁদের তিন লাইনের চিঠি।

তিমুদা।

আসবে কথা দিয়েছিলে। কত শনিবারের বিকেল তো অপেক্ষা করে কেটে গেল। আসবে না একদিন ? সত্যি, কত কথা ছিল তোমার সঙ্গে। এসো না একদিন। আসবে ?

ইতি—

কে বলো তো ?



দ্বীপের নাম টিয়ারঙ



সমুদ্রে বুঝি অনেক শান্তি। সমুদ্রে আছে স্বাধীনতা।

মানুষের জীবনও হয়তো এমনই সমুদ্র আর দ্বীপে আনাগোনা। মুক্তির আনন্দে হাঁপিয়ে ওঠে মানুষ। বিশাল জনতার ভেতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গড়ে নিতে চায়। দেশ আর সমাজের, লোভ আর মমতার ছোট ছোট দ্বীপ গড়ে নেয়। মুক্তি থেকে ফিরে পেতে চায় অসীম বন্ধন। তারপর একদিন সেই দ্বীপ মনে হয় অসহ্য জীবন। ঘরের প্রাচীর ভেঙে সমুদ্রের, জীবনের মুক্তি পেতে চায়।

শুধু এই আনাগোনা, দ্বীপ থেকে সমুদ্রে, আর সমুদ্র ছেড়ে দ্বীপে ফিরে আসা।

ছোট্ট এই টিয়ারঙ দ্বীপ। কেউ আসে সম্পদের লোভে, কেউ পথ ভুলে, কেউ শুধু সুখশান্তির প্রেমময় নীড় খুঁজে খুঁজে। তারপর একদিন ফিরে যেতে হয়, সমুদ্রের ডাকে। ভুল পথ ভুলে গিয়ে, স্বপ্ননীড় ভেঙে দিয়ে, আরো কিছু সম্পদের লোভে। মুক্তির নেশায় তারা দ্বীপের আকাশে দেখে মৃত্যুর ইশারা।

মনে ভাবে, সমুদ্রে বুঝি অনেক শান্তি, সমুদ্রে আছে স্বাধীনতা। জীবনের সমুদ্রেও আছে এমনই এক বিচিত্র উন্মাদনা। তবু সে-মুক্তির আনন্দে হাঁপিয়ে ওঠে মানুষ. অসহ্য মনে হয় অসীম সাগর। তাই ফের ফিরে পেতে চায় মায়া আর মমতার, সংসারের দ্বীপ. ফিরে আসে। নীল ঢেউ এসে দেখে দ্বীপ তার বোবা হয়ে গেছে।

টিয়ার পালকের মতো ছোট্ট একটু সবুজের দ্বীপ। দ্বীপ সত্যিই। বঙ্গোপসাগরের ওপরে নুড়ি পাথরের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে বিক্ষিপ্তভাবে। মাতলা, রায়মঙ্গল, কাঙ্গা নদীর মোহনা থেকে হরিণঘাটা, তেঁতুলিয়া, হাতীয়া নদীর সাগর-সঙ্গমে এই ছোট ছোট দ্বীপের সারি নামহীনভাবে মানচিত্রের গায়ে চিহ্নিত হয়ে আছে, টিকে আছে সমুদ্র উপকূলের তরঙ্গোচ্ছ্বাস প্রতিহত করে। জনবিজন এই দ্বীপগুলির খবর রাখে না কেউ। দ্বীপ বলে এগুলিকে যেন স্বীকার করাও চলে না, এত ক্ষুদ্র।

মাতালি, রোদপোয়া, টিয়ারঙ এমনি সব বিচিত্র নামকরণ এই সমুদ্রে ভাসা মৃত্তিকাশ্রেণীর। মানচিত্রে বা সরকারী নথিপত্রে কোনো নামের সন্ধান মেলে, কোনোটির মেলে না, তবু স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে তা সার্থকনামা। মাতাল ঢেউ আছড়ে পড়ছে প্রতিমুহূর্তে, তাই হয়তো দ্বীপের নাম মাতালি। সমুদ্রের উপর পিঠ ভাসিয়ে রোদ পোয়ায় রোদপোয়া। আর টিয়ারঙ যেন টিয়াপাখির খসে পড়া পালক। সমস্ত দ্বীপ যেন সবুজের বন্যা। সবুজের বন্যায় বুনো গাছের চূড়া ছেয়ে যায় ফাল্গুনের রক্ত-লাল ফুলে ফলে। সবুজ টিয়ার লাল ঠোঁটের মতো দেখায় তখন। তাই হয়তো দ্বীপের নাম টিয়ারঙ।

টিয়ারঙ দ্বীপে এখন হয়তো আবার স্টিফেন্স কোম্পানির কুঠি বসেছে। চাষী-মজুরের ভিড় জমেছে আবার।

স্টিফেন্স সাহেবের স্টীমার প্রথম যেদিন টিয়ারঙে এসে নোঙর ফেলেছিল সেদিন এই

টিয়ারঙ দ্বীপের বাসিন্দারা সমুদ্রে নৌকো ভাসিয়ে মাছ ধরত শুধু, চাষ করত মেয়েরা, পুরুষদের কেউ কেউ উদ্বৃত্ত ফসল আর শুঁটকী মাছ বেচে আসত দূরের কোনো হাটে। ঝিনুক আর শামুক কুড়িয়ে, পুড়িয়ে, কলিচুন বানাত কেউ, কেউ বা নৌকো বোঝাই করে বেচে আসত চট্টগ্রামের গদিতে।

স্টিফেন্স সাহেব চাকরি করতেন হ্যামিল্টন কোম্পানির জমিদারীতে। বাঁ হাতে চাকরি এবং ডান হাতে ব্যবসা করতে করতে হঠাৎ ফুলে-ফেঁপে উঠলেন তিনি। চাকরি ছেড়ে কাঠের ব্যবসা জাঁকিয়ে বসলেন সারা সুন্দরবনের দক্ষিণ সীমান্ত জুড়ে।

এই কাঠের খোঁজেই স্টিফেন্স সাহেবের স্টীমার এসে নোঙর ফেলেছিল টিয়ারঙে।

ছোট্ট দ্বীপ টিয়ারঙ। সমুদ্রের ঢেউ এসে পড়ছে তীরের ওপর। অবিরাম তরঙ্গের আঘাতে এতটুকু একটা দ্বীপ কি করে যে টিকে রয়েছে ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। তবু বছরের পর বছর রোদে ঝলমল করে ওঠে টিয়ারঙের সবুজ বন, রক্তলাল শাল পলাশ, বুনো গাছের ফুল।

মাত্র তিরিশ চল্লিশ ঘর বাসিন্দা টিয়ারঙের। গায়ের রঙে তাদের একটু হয়তো বা হলুদের আভা। কিন্তু চমৎকার স্বাস্থ্য প্রত্যেকটি মেয়েপুরুষের। দেহের গড়নে, মুখের ভাষায়—উপজাতিসুলভ।

শোনা যায়, পর্তুগীজ হার্মাদ দস্যুর দল যখন বাংলায় আর উড়িষ্যায় লুঠতরাজ ডাকাতি করে বেড়াত, সে-সময় আর-পাঁচটা দ্বীপের মতোই এই টিয়ারঙও ছিল তাদের আশ্রয়স্থল। আওরঙজেবের আমলে শায়েস্তা খাঁ বাংলার সীমান্ত থেকে হার্মাদদের নির্মূল করার পর কিছুসংখ্যক পর্তুগীজ এখানে এসে বসবাস শুরু করে। মগধাওনির পর কয়েকটি মগ পরিবারও এখানে পালিয়ে আসে। তারপর মগ, পর্তুগীজ ও টিয়ারঙের আদিম অধিবাসীদের রক্ত-সংমিশ্রণে যে-জাত গড়ে ওঠে তাদের অনেকেই দূরে দূরে অন্নসংস্থানের আশায় সরে গেলেও তিরিশ চল্লিশটি পরিবার রয়ে গেল এই টিয়ারঙে।

এদের সুন্দর স্বাস্থ্য এবং সুন্দর চেহারার কারণও বোধহয় এইটুকুই।

সব কটি পরিবারই ডিঙি নৌকোয় মাছ ধরে, জমি চষে, স্বভাবজ নারকেল পাতার ছাউনি বুনে ঘর বানায়, ঝুনো নারকেল আর নারকেল ছোবড়ার দড়ি বিক্রি করে আসে দূর দূর গঞ্জে। কারও বা চুনের ভাটা। ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ পুড়িয়ে কলিচুন বানায় তারা, বেচে আসে গঞ্জের মহাজনকে।

এমনিভাবেই দিন কেটে যায় এদের। পৃথিবীর কোথায় কি-হল না-হল খবর রাখে না।

প্রত্যেকটি পরিবারের মেয়েপুরুষ ছেলেপিলের নাম যদিও বাঙালীদের মতোই, ভাষাও বিকৃত বাংলা, কিন্তু পদবীগুলো অদ্ভুত। বোধহয় মগ এবং পর্তুগীজ পদবীর অপভ্রংশ, কিংবা উপজাতীয়।

কয়েক ঘর মুসলমানও আছে এদের মধ্যে। অর্থাৎ নাম দেখে বোঝা যায় তারা মুসলমান। নাম ছাড়া আর সব দিক থেকেই তারা এক জাতি। আচার-বিচার সকলেরই এক। বিয়েও হয় পরস্পরের মধ্যে কোনো বাছবিচার না রেখেই। বিয়ের পর ছাড়ন আছে, সাঙাও আছে।

পরিবেশটা যতখানি ছন্নছাড়া, জীবনধারনের পথ যত বন্ধুর, মানুষগুলোও তেমনি রুক্ষ আর রূঢ়। যদিও এমনিতে বড় ঠাণ্ডা, শান্তিপ্রিয়, কিন্তু যৌবনের গরম রক্ত যখন কোনো মেয়ের দিকে লোভের দৃষ্টি দেয় তখন তাকে বাহুবলে কেড়ে আনতে যেমন নীতিতে বাধে না এদের, তেমনি মন-দেওয়া পুরুষের প্রতি অন্য মেয়ের দৃষ্টি পড়লে চকচকে খুনিয়া বের করে তার পেটে বসিয়ে দিতেও পিছপাও নয় টিয়ারঙের প্রেমিকার জাত।

'খুনিয়া' অস্ত্রটা দেখলেই বোঝা যায় পর্তুগীজ এবং মগ দস্যুদের রক্ত বইছে এদের শিরায়

উপশিরায়। একটা সামুদ্রিক মাছের মাথার ওপরকার ছুঁচলো এবং গোল করাতের মতো 'খুনিয়া' দিয়ে এরা ধান কাটে, মানুষ খুন করে। কাস্তের মতো এতখানি গোল নয়, কিন্তু করাতের মতোই কাটা কাটা দাঁত আছে তার ভিতরে বাইরে—দু-দিকেই। অর্থাৎ কাস্তের ডগাটা যদি ছুঁচলো হয় এবং তার দুপাশেই যদি ধারাল দাঁত থাকে তা হলেই 'খুনিয়া'র চেহারাটা বোঝা যাবে।

হাঁড়ি কলসী রাখার বিড়ের মতো চ্যাপটা খোঁপা মেয়েদের মাথার ওপর,তার ওপর গোল চিরুনি বসানো থাকে এই খুনিয়া।

গরিব সকলেই, খেটেখুটে দিন গুজরান হয়। তবু দু-চার ঘর আছে যাদের বংশগৌরব কম নয়। জাতের মাহাত্ম্য আর বংশের গর্ব যেমন সর্বত্রই জনশ্রুতি ছাড়া কিছু নয়, এখানেও তাই।

ফিরুজা বানুরা বলে, কোন এক নবাব নাকি তার মেয়েদের নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল বাংলা দেশ থেকে। তারপর ডাকাতের হাতে তারা সকলেই প্রাণ দিয়েছিল, শুধু পালিয়ে এসেছিল একটি মেয়ে। সেই মেয়েরই বংশধর তারা।

শুনে মনে হতে পারে শাহ সুজা যখন আওরঙজেবের ভয়ে পালিয়ে এসেছিলেন মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে, এবং সুজার শেষ জীবনের সঠিক খবর যখন জানা যায়নি, তখন তাঁর কোনো এক মেয়ে হয়তো এ-দ্বীপে পালিয়ে এসেছিল। এ পর্যন্ত ভাবা যেতে পারে, বিশ্বাস করা যায় না। কারণ ফিরুজাদের কেউই জানে না শাহ সুজা বলে কেউ কখনো ছিল কি না। যেমন সে নিজেই জানে না যে তার নামটা ফিরোজা বানুর অপভ্রংশ।

এসব জানবার বাসনাও নেই দ্বীপের লোকগুলির। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক তা শুধু জনকয়েক পুরুষের, যারা নৌকো বোঝাই করে নারকেল এবং শুঁটকী মাছ নিয়ে গিয়ে বেচে আসত দু-মাসে ছ-মাসে একবার। ফেরার পথে কিনে আনত দু-চারটে জরুরী তৈজসপত্র।

তাই টিয়ারঙের তীর ঘেঁষে যেদিন প্রথম একখানা স্টীমার এল, সবাই অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে দেখল। দেখতে দেখতে ছুটে গেল। তিরিশ চল্লিশটি পরিবারের একটি লোকও বুঝি বাকি রইল না। সকলেই সারবন্দী হয়ে পাড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল স্টীমারের দিকে তাকিয়ে।

এত বড় নৌকো তারা কখনো দেখেনি। ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে যেদিন ফিরতে রাত হয়ে গেছে সেদিন শুধু দেখেছে দূরে দূরে জলটুঙির ক্ষীণ আলো, আর দেখেছে জলপুলিসের নৌকো। তাও বছরে দু-বার তারা এদিকে টহল দিয়ে যায় কিনা সন্দেহ। শুধু যারা গঞ্জে যেত তারাই বললে, এর নাম ইস্টিমার, দাঁড় টানবার লাগে না, কলের নৌকা এটা।

প্রথমবারে স্টীমার এসে তীরে ভিড়তে পারল না।

দু-খানা ডিঙি নৌকো নামিয়ে দেওয়া হল স্টীমারের গা থেকে। আর সেই ডিঙি দুটো এসে ভিড়ল তীরে।

জনসাতেক লোক নেমে এল। একজন সাহেব। হাতে বন্দুক, মাথায় শোলা হ্যাট, পরনে কোটপ্যান্ট। আর দুজন সাহেবী পোশাকে বাঙালী।

বুড়ো মাধো কোলাসো দু-দুবার চট্টগ্রামে গিয়েছে মাল বেচে ফিরে আসার সময়। টিয়ারঙের লোকদের কাছে সে শুধু বৃদ্ধ নয়, জ্ঞানবৃদ্ধ।

তাই ফিরুজা তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে অবাক চোখ চেয়ে নবাগতদের দেখতে দেখতে জিগ্যেস করলে, কে ওই মানুষগুলান ? ঠগী নাকিন ?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে নিজের অজান্তে হাতটা তার খোঁপায় গিয়ে ঠেকেছে। অর্থাৎ খুনিয়া

ঠিক আছে কিনা।

মাধো কোলাসোও ভয় পেয়েছিল। তবু এতগুলো লোকের সামনে ভয়টা চাপা না দিয়ে উপায় নেই।

তাই তাচ্ছিল্যের ভাবে সে বললে, কালেট্যার সাহেব হবে। গোরা সাহেব।

অর্থাৎ কালেক্টর সাহেব।

মাধো কোলাসোর দোষ নেই। তার ধারণা, গোরা সাহেব মাত্রেই কালেক্টর।

মিস্টার স্টিফেন্স ততক্ষণে লোকগুলোর মুখের ওপর একচক্কর চোখ দুটো বুলিয়ে নিয়ে মাধো কোলাসোকে বেছে নিয়েছে সবচেয়ে বুড়ো দেখে।

এবার দু-হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এসে মাধোকে জড়িয়ে ধরল সে। মাধো বুঝল, সাহেব তাদের কোনো ক্ষতি করতে আসেনি। হঠাৎ সেও এক-বুক দাড়ির ফাঁকে হেসে উঠল খলখল করে, তারপর দু-হাতে চেপে ধরল সাহেবের চওড়া পিঠটা।

অন্য লোকগুলো তখনো সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি। তন্ন তন্ন করে যেন যাচাই করে দেখছে লোকগুলোকে।

মাধোকে হাসতে দেখে ফিরুজাব ভয় কেটে গেল। হয়তো খানিকটা কৌতূহল, হয়তো বা আর সকলকে তার সাহসের প্রমাণ দেখাবার জন্যেই সেও হাসিহাসি মুখে এগিয়ে এল সাহেবের কাছে।

বন্দুকের গায়ে নরম করে হাত বুলিয়ে সপ্রশ্ন চোখ তুলে বললে, এটা কি কামের গা গোরা ?

ফিরে তাকাল স্টিফেন্স। ফিরে তাকিয়েই মুগ্ধ হল। এমন স্বাস্থ্য এমন রূপ এই জংলা দ্বীপে ?

বাঁশ দিয়ে বানানো হাত-তাঁতে বোনা লাল-কালোর নকশা-কাটা ঘাগরা, পরিপূর্ণ বুকে হলুদ রঙের কাঁচুলি, তার ওপর একটা শাদা গামছার মতো ওড়না জড়ানো।

সাহেবকে একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে লজ্জা পেল ফিরুজা। তবু কৌতূহল গেল না।

বললে, এটা কি কামের গা গোরা সাহেব ?

প্রশ্ন শুনে হো হো করে হেসে উঠল স্টিফেন্স। তারপর বন্দুকটা তুলে উড়ন্ত এক ঝাঁক হরিয়ালের দিকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল।

গুলির শব্দে চমকে উঠল সকলে। ভয়ে মাধোকে জড়িয়ে ধরল ফিরুজা।

পরক্ষণেই দেখলে একটা হলুদরঙা হরিয়াল টাল খেতে খেতে দলছাড়া হয়ে নীচে এসে পড়ল।

ছুটে গিয়ে সবাই দেখলে রক্তাক্ত হরিয়ালটা মরে গেছে।

খলখল করে শব্দ করে মেয়েপুরুষ সবাই হেসে উঠল সাহেবের কৃতিত্বে। ভয়ে বিস্ময়ে তাকাল বন্দুকটার দিকে।

আর চ্যাটার্জি বললে, ইউ হ্যাভ ওঅ্যান দি ফার্স্ট রাউণ্ড।

সত্যিই তাই। দ্বীপের লোকগুলো বন্ধু হয়ে গেল এই একটা ঘটনায়। যুদ্ধের প্রথম দফায় জয় হল স্টিফেন্সের। লোকগুলোর মনে যেটুকু অবিশ্বাস ছিল মুছে গেল। যেটুকু ভয় ছিল আরো বেড়ে গেল।

খুনিয়ায় হাত দেওয়ার যে কোনো দাম নেই তা বুঝতে পেরেই যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল সব রক্ত। যার হাতে এমন অদ্ভুত অস্ত্র তাকে বন্ধু মনে করা ছাড়া উপায় কি !

জনকয়েক শুধু ভয় পেল না। তারা গোরা সাহেব দেখেছে, বন্দুক দেখেছে, সন্দ্বীপে

কিংবা চট্টগ্রামে মাল বেচতে গিয়ে।

স্টিফেন্সের দল এবার চলল টিয়ারঙের বনে। পিছনে পিছনে দ্বীপের মেয়েপুরুষ। গোরাটা কেন এসেছে তা কেউই বুঝতে পারল না।

তারা শুধু অবাক বিস্ময়ে চেয়ে রইল। দেখলে বনের গাছগুলো পরীক্ষা করে দেখছে স্টিফেন্স। কি যেন বলা কওয়া করছে নিজেদের মধ্যে। জলপুলিসের নৌকো করে এর আগেও নতুন লোক এসেছে, বাইরের জগতের লোক এসেছে। তারপর চলেও গেছে। কিন্তু এরা যেন অন্য ধারার মানুষ!

সারাটা দিন ঘোরাঘুরি করে টিফিন ক্যারিয়ারে নিয়ে আসা খাবার খেয়ে তীরের দিকে ফিরে এল স্টিফেন্সের দল।

বাচ্চাগুলোকে লজেন্স বিস্কুট দিয়ে, মেয়েদের কাচের জলচুড়ি পরিয়ে, জোয়ানদের দিকে মুঠো মুঠো পয়সা ছড়িয়ে দিয়ে ডিঙিতে করে স্টীমারে ফিরে গেল তারা।

খুশি খুশি মুখে সকলে তাকিয়ে রইল যতক্ষণ স্টীমারটা দেখা গেল।

তারপর স্টীমার অদৃশ্য হতে ফিরুজা অস্ফুটে বললে, গোরাটা মানুষ ভালো লাগে।

২

সাহেবের দল এসেছিল। সাহেবের দল চলে গেছে। কিন্তু টিয়ারঙের মনে রোমাঞ্চ বুনে দিয়ে গেছে তারা। আগেকার মতোই চাষ করে মাছ ধরে দিন কাটে, অন্নসংস্থান হয়। কিন্তু থেকে থেকে স্মৃতির তারে কোথায় যেন মিষ্টি একটা সুর বেজে ওঠে।

টিয়ারঙের সবাই মনে মনে চায় গোরার দল আবার ফিরে আসুক।

মেয়েরা কাচের জলচুড়িগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে, গঞ্জে যাওয়ার সময় পুরুষদের কাছে বায়না ধরে, এমনি চুড়ি এনে দিতে হবে তাদের।

পুরুষগুলো হাসে। এত শৌখিন হলে আর ভাত জুটবে না তাদের। একজোড়া চুড়ির পয়সায় এক কুঞ্চি চাল পাওয়া যায়।

পুরুষগুলোও অবশ্য চায় গোরার দল ফিরে আসুক। এক ডিঙি শুঁটকী বেচে যে-পয়সা পায় তারা গঞ্জে, ততগুলো পয়সা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে গেছে গোরার দল। লুটোপুটি করে কুড়িয়ে নিয়েছে তারা। এমনভাবে যারা পয়সা ছড়াতে পারে, না জানি তাদের কত পয়সাই আছে।

কোপাই কাঁধে নিয়ে বনের ভেতর থেকে জ্বালানি যোগাড় করে আনতে যায় পুরুষগুলো, মেয়েগুলো কাঠ-পাতার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসে। আর সেই ফাঁকে হেলেদুলে হাসতে হাসতে হঠাৎ এক একসময় আনমনা হয়ে যায়।

বালির ওপর তাদের পায়ের শব্দ হতেই ক্ষুদে ক্ষুদে কাঁকড়াগুলো দল পাকিয়ে ছুটে পালায়। সেদিকে তাকিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে মেয়েগুলো।

বাতাসের গায়ে সে-হাসি ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে, অনেকটা পাহাড়ের গায়ে-লাগা প্রতিধ্বনির মতো। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের দিকে ফিরে তাকায় তারা, পায়ের গতি থেমে যায় আপনা থেকেই।

মনে হয় সমুদ্রের মধ্যে থেকে কারা যেন হেসে উঠল।

উদাস সরল দৃষ্টি মেলে দেয় ফিরুজাও। অনিমেষ চেয়ে থাকে, যেখানে একদিন গোরা সাহেবের ইস্টিমার এসে থেমেছিল।

—ডাঁড়াস কেন রে ফিরুজা? পিছন থেকে পুরুষকণ্ঠে কে যেন ঠাট্টা করে বলে, লাগর

তর আসবে নাই রে, আসবে নাই।

ফিরুজা সশব্দে হেসে উঠে বলে, না আসুক গিয়া। মন লাগে তো পান্‌সি নিয়া চলে যাব লাগরের কাছ বরাবরকে।

বলেই বালিতে এক পা গেঁথে দিয়ে থেমে পড়ে। তরতর করে সঙ্গীসাথী সবাই এগিয়ে যায় হাসতে হাসতে। জানে তারা কেন থামল ফিরুজা, কেন থামে।

মদ্‌না এসে পৌঁছয়, পাশে দাঁড়ায়।

জোয়ান চেহাবা, খালি গায়ে হলদে আভা। মাথায় একরাশ ফাঁপানো কটা কটা চুল। কাঁধে কোপাই।

রসিকতা করে পুরুষ্টু কাঁধের একটা ধাক্কা দেয় মদ্‌না। সঙ্গে সঙ্গে ফিরুজার মাথার বোঝাটা পাশে বালির ওপর ঝুপ করে পড়ে যায়।

দু-জন একই সঙ্গে সশব্দে হেসে উঠে একই সঙ্গে বালিতে পা ফসকিয়ে ধুপ করে বসে পড়ে।

মেঘ-ঢাকা রোদের তাপ নেই তখন ; কিন্তু আলো আছে। বেশ একটা টকটকে রক্তের মতো লাল আলো। বালির ওপর লম্বা লম্বা নারকেল গাছের ছায়া মিলিয়ে গেছে।

সবল একখানা হাত আলতোভাবে ফিরুজার ঘাড়ের ওপর এলিয়ে দিয়ে ঘন হয়ে বসে মদ্‌না।

তারপর ফিরুজার চোখে চোখ রেখে বলে, সাঙা করবি কিনা কয়ে দে, ফিরুজা। যম্‌নীর লেগে তাকায় থাকিস তুই তো আমি তাকাই কোনদিক পানে, ক ?

হাসিটা হঠাৎ কেমন দপ করে নিবে যায় ফিরুজার চোখ থেকে। মাথা নীচু করে বসে থাকে, একটা কাঠি হাতে নিয়ে আনমনে কি যেন আঁকে বালির ওপর।

একসময় ধীরে ধীরে বলে, বড়ো ডর লাগেরে মানুষটারে। যতি ফিরা আসে দেখে কি সাঙা করেছি তোরে, কোপাই বসায় দিবে মানুষটা।

—হুঃ। অদ্ভুত একটা শব্দ করে মদ্‌না। মানুষটা নাকি আবার ফিরে আসবে। বলে, ও আর বাঁচা নাই রে, বাঁচা নাই।

ফিরুজাবও তাই মনে হয়। সেই যে ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে গিয়েছিল লোকটা তারপব তো কতদিন কেটে গেছে, ফিরল কই ফিরুজার স্বামী। ফিরবে না তা ফিরুজাও জানে। হয়তো সমুদ্রেই প্রাণ হারিযেছে, হয়তো মানুষখেকো মাছে টেনে নিয়ে গেছে তাকে। তবু ভয় যায় না। যদি কোনোদিন ফিরে আসে, যদি দেখে ফিরুজা তার নতুন করে সাঙা করেছে তাহলে···

পাতার ছাউনি দেয়া ঘরখানা ফিরুজার চোখের সামনে ভেসে উঠল। সে-ঘরের একপাশে মাচা থেকে ঝুলাটা ঝুলে আছে এখনও। সেদিকে চোখ পড়লে হঠাৎ এক একদিন বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। যম্‌নীব কথা মনে পড়ে যায়। ঐ ঝুলা দুলিয়ে দুলিয়ে ছোট্ট ছেলে বুধাকে ঘুম পাড়াত যম্‌নী, আর ঘরের কাজ করত ফিরুজা, রান্না করত, তাঁত বুনত একমনে।

নিজের দীর্ঘশ্বাসের শব্দে নিজেই চমকে উঠল ফিরুজা। উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সমুদ্রের দিকে।

ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে তীরের ওপর। ক্রমে ক্রমে আকাশের আলো নিবে যাচ্ছে—অন্ধকার নেমে আসছে। আর চাঁদনী রাতের জ্যোৎস্না। ঢেউয়ের গায়ে ঢেউ ফেটে পড়ছে চডচডচড শব্দ করে। ঠিক যেন দু-হাতে কাপড়ের জোড়া ছিঁড়ছে কেউ। সঙ্গে সঙ্গে শাদা শাদা ফেনার ফুল উথলে উঠছে ঢেউয়ের মাথায়।

ওদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে ফিরুজার। বোজ ভোরবেলায় তাই ছুটে

আসে সে. একা একা দাঁড়িয়ে দেখে। কোনো কোনোদিন বুধার কথা মনে পড়ে যায়। ছুটে যায় যম্‌নীর বুড়া বাপটার কাছে. আদর করে তার ছেলে বুধাকে কোলে টেনে নেয়। বুধার মুখ চেয়েই হয়তো যম্‌নীকে ফিরে চায় সে। আর তাই অসীম সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ এক একসময় মনে হয় তার সেই হারিয়ে-যাওয়া মানুষটা এত বড় সুমুদ্রের কোলে কোথাও বেঁচে থাকলেও থাকতে পারে।

সে-কথা মনে হলেই মদ্‌নার কথা ভেবে শিউরে ওঠে ফিরুজা। মনে মনে ভাবে. সে যেন না আসে, সে যেন না আসে।

আবার কখনো কখনো দু-চোখে জল ভরে আসে হারিয়ে-যাওয়া স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে। বুকের ভেতর অসহ্য এক ব্যথা অনুভব করে অকারণেই মনে মনে বলে. সে যেন ফিরে আসে, সে যেন ফিরে আসে।

হয়তো তার ফিরে আসার পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্যেই প্রতিদিন সমুদ্রের তীরে ছুটে আসে ফিরুজা। হয়তো উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে, দূরে কোথাও একটা ডিঙিকে ঢেউয়ের পিঠে মাতালের মতো টলতে দেখবে এই আশায়।

সেদিনও এমনি নেশার ডাকেই এসে দাঁড়াল ফিরুজা। ঢেউ যেখানে স্তব্ধ হয়ে গেছে সেই নীলের সমতলের দিকে তাকিয়ে।

তারপর হঠাৎ চমকে উঠল সে।

দূরে কি যেন একটা দেখা যাচ্ছে। ডিঙি নয়, পালের নৌকোও নয়।

হ্যাঁ, ধোঁয়া উড়ছে যেন। আনন্দে চিৎকার করে ঘরের দিকে ছুটে গেল ফিরুজা। স্টীমার। গোরা সাহেবের ইস্টিমার আছে।

ছুটতে ছুটতে পট্টির সকলকে খবর দিয়ে এল ফিরুজা। সবাই ছুটে এল তার পিছনে পিছনে।

প্রথম দিনের মতোই সারিবন্দী হয়ে সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়াল তারা। আগ্রহের, ঔৎসুক্যের চোখে তাকিয়ে রইল।

তেমনি আগের মতোই স্টীমারের গা থেকে দুটো সাম্পান নামল। বারকয়েক ফেরি দিয়ে স্টীমারের লোকলস্কর মালপত্তর তীরে এনে তোলা হল।

টিয়ারঙের বাসিন্দাদের কাছে দু-চারটে মুখ চেনা চেনা লাগল। সাহেবী পোশাক-পরা চ্যাটার্জি আর অমিয়বাবুকে দেখে চিনতে পারল ফিরুজা। কিন্তু গোরা সাহেব ? তন্ন তন্ন করে খুঁজল সকলে, তারপর হতাশ হল গোরা সাহেবকে দেখতে না পেয়ে। না গোরাটা আসেনি এবার। তার জায়গায় চ্যাটার্জির কাঁধে বন্দুক, চ্যাটার্জিই যেন দলের রাজা।

—গোরাটার কি হল রে বাবু ? ফিরুজা অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করে এগিয়ে গেল চ্যাটার্জির কাছে।

হাসল চ্যাটার্জি।—সাহেবকে খুব মনে ধরেছে বুঝি ?

তারপর ওভারসিয়ার পাঠককে ইশারা করলে তাঁবু ফেলবার জন্যে।

ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই বালির ওপর পরপর কয়েকটা তাঁবু টাঙানো হয়ে গেল। নির্জন ধূ ধূ বালির ওপর কলকোলাহলে মুখর হয়ে উঠল ছোট্ট এক টুকরো নতুন জাগা পৃথিবী।

দিনে দিনে তৈরি হল স্টীমারঘাটা। ছোট ছোট কুঠরি তৈরি হল কয়েক সারি কুলিকামিন, মাল টানার যন্ত্রপাতি সব এসে পৌঁছল।

একটা ভাল দোকানও খুলে ফেলল ব্রিজলাল। একদিকে মদের দোকান, অন্য দিকে মনোহারী থেকে তৈজসপত্র সব কিছু।

ডুগডুগি বাজিয়ে টিয়ারঙের বাসিন্দাদেরও জানিয়ে দিল চ্যাটার্জি, যার খুশি এসে কাজ নিতে পারে। নগদ মজুরি পাবে, পাবে কোম্পানির দোকান থেকে চাল ডাল গামছা চুড়ি।

কিন্তু কাজটা কি ? কাজ বিশেষ কিছু নয়। টিয়ারঙের জঙ্গল ইজারা নিয়েছে স্টিফেন্স কোম্পানি। সেই কোম্পানির হয়ে চ্যাটার্জি এসেছে বন থেকে বয়স হওয়া শাল আর শিমুলের গুঁড়ি কেটে চালান দেবার জন্যে।

গাছ কাটবার জন্যে, গুঁড়ি বয়ে স্টীমারে তুলে দেবার জন্যে কুলি চাই।

একে একে সকলে এসে যোগ দিল কোম্পানির কাজে।

ফিরুজার দিকে একচোখ তাকিয়ে নিয়ে চ্যাটার্জি বললে, রান্না করতে পারিস ?

—বসুই ? পারি গো বাবু। হেসে ঢলে পড়ার ভঙ্গিতে ফিরুজা বললে।

চ্যাটার্জি ফিরুজার পিঠে হাতের একটা হালকা থাবড়া দিয়ে বললে, ঠিক্ হায়। মুরগী পাওয়া যায় এখানে ? মুরগীর আণ্ডা ?

ফিরুজা হাসলে।—তুই হুকুম দিলে বাবু বাঘের দুধটাও মিলবে।

—মিলবে ? ফিরুজার মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথাটার মধ্যে কোনো দ্বিতীয় অর্থ আছে কিনা খোঁজবার চেষ্টা করলে চ্যাটার্জি তারপর অমিযবাবুকে সহাস্যে বললে, বলে কি মশাই ?

চ্যাটার্জি ও অমিয়বাবু দুজনেই হেসে উঠল হো হো করে।

দূরে দাঁড়িয়ে দেখলে মদ্‌না। হাসিটা ভাল লাগল না তার। ভাল লাগল না ফিরুজার এতখানি ঢলাঢলি।

বাসায় ফেরার পথে মদ্‌না সাবধান করে দিল ফিরুজাকে। বললে, বাবুগুলো দুশমন রে ফিরুজা, মানুষ ভাল লয় তেনারা।

চমকে ফিরে তাকাল ফিরুজা তার মুখের দিকে। তারপর সশব্দে হেসে উঠল।

—মানুষ ভাল লয় ? সপ্রশ্ন চোখজোড়া যেন কৌতুকে ঝলকে উঠল। পরমুহূর্তেই ফিরুজা দেখতে পেল ঝোপের ভেতর থেকে একটা খড়গোশ বেরিয়েই ছুটতে শুরু করেছে। হয়তো তাদের পায়ের শব্দে।

চট্ করে খোঁপা থেকে খুনিয়াটা তুলে নিয়েই তাক্ করে সজোরে সেটা ছুঁড়ে দিল ফিরুজা।

টিয়ারঙের মেয়েদের খুনিয়ার লক্ষ্য কি ভুল হয় ? ঠিক খরগোশটার গায়ে বিঁধে গেল খুনিয়াটা। ফিনকি দিয়ে এক ঝলক রক্ত ছিটকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটন্ত খরগোশটা নেতিয়ে পড়ল।

খলখল করে সশব্দে হেসে উঠল ফিরুজা।

তারপর ছুটতে ছুটতে এসে খরগোশটার ঠ্যাং ধরে তুলে বললে, তুই চ আগুতে ; আমি বাবুরে সেলাম দিয়া আসছি নি।

বলে তরতর করে আবার চ্যাটার্জির ঘরের দিকে চলে গেল ফিরুজা। খরগোশটা তখনো ছটফট করছে তার হাত থেকে ঝুলতে ঝুলতে।

ফিরুজা হেলে দুলে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু মদ্‌নার পা সরল না। ঠায় সেখানেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল সে।

অপেক্ষা করে করে পা টনটন করে উঠল তার, তবু ফিরুজার পাত্তা নেই। এদিকে অন্ধকার বাড়ছে ক্রমশই। রাত বাড়ছে। এতক্ষণ, এত রাত অবধি কি করছে ফিরুজা ?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাঁধের কোপাইটা তুলে এক ঘা বসিয়ে দিল সে গাছের গুঁড়িটায়। তারপর রাগে দপদপ পা ফেলে বাড়ির পথ ধরল।

৩

সমুদ্রেব পাড় থেকে খানিকটা এগিয়ে এসে বেশ কিছুটা উঁচু লেভেলের ডাঙা জমি। তার এক ধারে সারি সারি তাঁবু পড়েছিল প্রথম দফায়। এবার তাঁবু উঠে গেল, গড়ে উঠল এক সারি ছোট ছোট ঘর। স্টিফেন্স কোম্পানির নিজস্ব ডায়নামো শব্দ করে জেগে উঠল, আলো জ্বলল ঘরে ঘরে। কুয়োর জল তুলে বাংলোয় পৌঁছে দেবাব জন্যে পাম্প বসল। রীতিমত একটা ক্ষুদে শহর গজিয়ে উঠল টিয়ারঙে।

কোম্পানি-মহল থেকে স্টীমারঘাটা অবধি একটা চওড়া বাস্তা বাংলোব সারি পার হয়ে কাটগুদামে পৌঁছেছে। তারপর সেখান থেকে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে বনের ভেতব পর্যন্ত।

একে একে চ্যাটার্জি, অমিয়বাবু, আরো অনেকে স্ত্রী-পুত্র-পরিবাব নিয়ে এলেন। অমিযবাবুর সঙ্গে এল তাঁর ছোট ভাই সৌমেন। চ্যাটার্জির স্ত্রীর এই বনবাসে সাহচর্য দেবার জন্যে এল তার ছোট বোন তামসী।

তামসীর নামটা তার চেহারার সঙ্গে সঙ্গে যে মানানসই তা নয়। অতিশয়োক্তিই বলা চলে। কারণ তার গায়ের রঙ যদিও একটু চাপা তবু সব মিলে কেমন একটা আকর্ষণ আছে তাব চেহাবার। দোহারা স্বাস্থ্যে ভবা শরীব। যৌবনেব মসৃণ আভায় সর্বাঙ্গ ঝলমল করে ওঠে যে-বয়সে, তামসীর ঠিক সেই বয়েস। ভরাট মুখে চমৎকাব একটা হাসি যেন সর্বক্ষণ লেগে আছে। চোখ দুটো চটুল। তার চেয়েও চঞ্চল তামসীব শবীব। দৌড় ঝাঁপ, ছুটোছুটি, হাসি চিৎকার। যেন একটা ফুর্তির প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়ায়। মনে হয় বুঝি এ-ফুলে বসবে, নয়তো ও-ফুলে। কিন্তু না, কেবল উড়ে উড়েই বেড়ায় বসতে চায় না সে সুস্থির হয়ে।

পাশের বাংলোর সৌমেন কিন্তু একেবারে অন্য মানুষ। চুপচাপ একা একা থাকে। মাথা নীচু করে পথ হাঁটে। মেয়েমানুষ দূরের কথা, শাড়ি দেখলেই শামুকের মতো খোলসের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে নেয়। নিজেকে নিয়েই যেন সম্পূর্ণ, নিজেকে নিয়েই সন্তুষ্ট।

তার হাবভাব দেখে তামসীর বড় মজা লাগে। প্রথম প্রথম আড়চোখে তাকাত ও, মুচকি হেসে চোখ ঘুরিয়ে নিত অন্যদিকে। কিন্তু এই টিযাবঙ দ্বীপে, এই সভ্যতাব স্পর্শচ্যুত আদিম অরণ্যবাতাসে সব লজ্জার আবরণ বুঝি উড়িয়ে নিয়ে যায়। ক্রমশ তাই স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠল তামসী, সপ্রতিভ।

পাশাপাশি বাংলো। কারণে অকারণে এ ওর বাড়িতে ছুটে যায়। দু-দণ্ড কথা বলে গল্প করে যেন সময়-হারানো দ্বীপের দুঃসহ সময়টুকু কাটাতে চায়।

প্রথম প্রথম তামসী একটু সংযত ছিল। একটু অস্বস্তির গতিভঙ্গি ছিল তাব চলায় বলায়।

তবু মাঝে মাঝে ইচ্ছে হত টিয়ারঙেব আদিম অধিবাসীদের মতোই উদ্দাম হযে উঠতে। এত লজ্জা. এত বাধা-নিষেধ. শহুবে মনের শান্ত নম্র ভাবটুকু ফুঁ দিয়ে উড়িযে প্রাণেব জোয়ারে গা ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছে হত কখনো কখনো।

ফিরুজাকে তাই বোধ হয় ঈর্ষা করত তামসী।

তার স্বাস্থ্য শ্রী, তার প্রাণখোলা খিলখিল হাসি, তাব স্বতঃস্ফূর্ত অলজ্জ স্পষ্টতা।

ফিরুজার কথাই ভাবছিল তামসী, হঠাৎ হেলেদুলে শবীরের ছন্দ নাচিয়ে হাসিহাসি মুখে এসে দাঁড়াল ফিরুজা।

সমুদ্রের নোনা জলে স্নান করে উঠে এসেছে ফিরুজা। টকটকে লাল রঙের ঘাগরা. বুকে এক ফালি হলদে আঙিয়া, তার ওপর ফিকে নীল বঙের জালি, অর্থাৎ ওড়না। ভিজে

শরীরের জল লেগেছে ঘাগরার এখানে, ওখানে জালি ওড়নায়। স্বাস্থ্যে ভরা মুখখানা বড় সুন্দর দেখাল ফিরুজার। পীতাভ রঙের ওপর একটা নোনা হাওয়ার কাল্‌চে ভাব। বড় সুন্দর দেখাল ফিরুজাকে। পিঠের ওপর এলিয়ে পড়া একরাশ ফাঁপানো চুল যেন সারা পিঠ ঢেকে লুটিয়ে পড়েছে কোমরের নীচে অবধি। একটা কাঠের কাঁকুই দিয়ে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে তামসীদের বাসার সামনের উঠোনে এসে দাঁড়াল ফিরুজা।

—ও তাপুদিদি, বড়্‌দিদিগো। শোনেন না একবারটি।

তামসীর দিদি তাপসী ডাক শুনে বেরিয়ে এসে ফিরুজার সাজপোশাক দেখে হকচকিয়ে গেল।

—কি ব্যাপার রে ফিরুজা ? বিয়ে করতে যাচ্ছিস নাকি ? হেসে জিগ্যেস করল তাপসী।

ফিরুজাও কলকলিয়ে হেসে উঠল।—বিয়াশাদি তো একবার হয়েছিল গা দিদি। তা মানুষটা সাম্পান নিয়া গেল মাছ ধরতে তো ফিরল না আর।

তামসী হেসে ওঠে কথা শুনে। বলে, খোঁজ করলি না কোথায় গেল ?

ফিরুজা হেলে দুলে এগিয়ে আসে। বলে, তার কথা চিন্তা করে তো আধেক যৈবন কেটে গেল ছুটদিদি। তাই ভাবলাম, মানুষটা গেছে যাক্, যৈবন গেলে তো আর ফিরবে নাই।

কথা শুনে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে খিলখিল করে হেসে ওঠে তামসী আর তাপসী।

স্পষ্ট কথা। মানুষটা গেছে বলে যৌবন তো আর অপেক্ষা করে থাকবে না। সত্যি কথাই তো।

—তা কি আবার একটা মানুষ যোগাড় করবি নাকি ? হাসির দমক চাপতে চাপতে তামসী জিগ্যেস করে।

ফিরুজা হাসির অর্থটুকু যেন ভাল করে বুঝতে পারেনি।

বলে, মাদোনটাকে তো দেখেছিস দিদি, তো মানুষটা ভালই। ভাবলাম, একটা মানুষ ঘর থিকা হারায় গেল তো মাদোনটাকেই বান্ধে আনি।

তাপসী হাসল।—তা আনিলি না কেন ?

প্রশ্ন শুনে ফিরুজার মুখের হাসিটা যেন দপ্‌ করে নিভে গেল।

বলল্‌লে, ভয় লাগে দিদি। মানুষটা অটাৎ ফিরা আসে তো প্রাণ জখম করবে কোপাই দিয়ে।

—হুঁ। সমস্যাটা যেন তাপসীও বুঝতে পারে।

তামসী তখনো ফিকফিক করে হাসছে।

ফিরুজা তা দেখে বলে, হাসিস কেন গ দিদি। পরক্ষণেই ভিক্ষের ভঙ্গিতে বলে, তোর আরসিটা দেন না গ একটিবার।

তামসী আর তাপসী সকৌতুকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে।

—আরসি ? কেন আয়না নিয়ে কি করবি ?

ফিরুজা লজ্জার হাসি হাসলে পায়ের দিকে চোখ নামিয়ে।—বেশভূষাটা দেখব, চুল বাঁধব গ দিদি।

—কেন রে, এত সাজপোশাক করার দরকার হল কেন ? তামসী প্রশ্ন করলে।

ফিরুজা হাসল, উত্তর দিলে না প্রথমটা। তারপর ধীরে ধীরে বললে, মাদোনটার সাথে আজ ডিঙিতে করে যাব সমুদ্দরে মাছ ধরবার লেগে।

উত্তর শুনে দু-বোনই সশব্দে ফেটে পড়ল উদ্দাম হাসিতে।

তামসী হেসে বললে, আমাকে নিয়ে যাবি ?

—না গ দিদি, তুমরা টাল রাখতে পারবে নাই। জলের মানুষ আমরা, জল আমাদের চিনে।

তামসী বললে, আয়নাটা এনে দে তামু। তারপর কানে কানে বললে, সেন্টের শিশিটাও।

তামসী আয়নাটা এনে দিল, আর তাপসী সেন্টের শিশি থেকে খানিকটা ছিটিয়ে দিল ফিরুজার পোশাকে।

যেখানটায় সুগন্ধির ছিটে পড়ল 'জালি'র সেইখানটা নাকের কাছে ধরে জোরে নিশ্বাস টানল ফিরুজা। খুশিতে ভরে উঠল ওর মন।

বললে, বড়ো দামী খুশবাই, না রে দিদি ? মনটা উদভ্রান্ত লাগে। বলে নিজের মনেই হেসে উঠল ফিরুজা। তারপর আয়নাটা সামনে নিয়ে কাঠের কাঁকুই দিয়ে সযত্নে চুল আঁচড়াতে, বিনুনি বাঁধতে শুরু করলে।

চুল বেঁধে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের মুখটা আয়নায় দেখে ফিক্ করে হেসেই দ্রুত পায়ে হঠাৎ ছুটে পালিয়ে গেল ফিরুজা, সমুদ্রের পাড়ের দিকে, সমুদ্রের দিকে।

এমনি সমুদ্রের দিকে, সমুদ্রের তীরে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয় তামসীরও। এত লোকের মাঝেও দ্বীপটা যেন বড় নির্জন মনে হয় তার। বড় বেশি নিঃশব্দ।

শুধু অবিরাম ছন্দে বেজে চলেছে সমুদ্রের ঢেউ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। ব্রেকারের একঘেয়ে ছন্দ, একটানা শব্দ। রাত্রির নিঃশব্দতায় সে-শব্দ যেন আরো বেশি কানে বাজে।

প্রথম প্রথম এই আওয়াজে ঘুম আসত না তামসীর। দিনের চেয়েও রাতটা ছিল আরো বেশি ভয়াবহ। আরো বেশি দুঃসহ।

টিয়ারঙ ছেড়ে পালাবার জন্যে অধীর হয়ে উঠত।

কিন্তু কয়েকটা মাস যেতে মন বসে গেল তামসীর। কেন কেমন করে সে নিজেই যেন বুঝতে পারে না।

মাসে একবার মাত্র চঞ্চল হয়ে উঠত টিয়ারঙের জীবন। শুধু একবার।

ক্রমে ক্রমে টিয়ারঙের স্টীমারঘাটার বনিয়াদ পাকা হল।

স্টিফেন্স কোম্পানির কাঠের ব্যবসা জেঁকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্টীমারের বদলে মাসে একটা করে জাহাজ এসে দাঁড়াতে শুরু করল টিয়ারঙের তীরে। বালির ওপর ইঁট-গাঁথা সরু রাস্তা চলে গেছে—যেখানে জল এসে ছুঁয়েছে দ্বীপের প্রান্ত। তারপর কাঠের গ্যাংওয়ে ভেসে আছে জলের ওপর, রোদ-বিলাসী কুমীরের পিঠের মতো। সমুদ্রের অনেকখানি ভেতর অবধি গ্যাংওয়ে।

জাহাজ এলেই দ্বীপের সবাই ছুটে যায় সেই গ্যাংওয়ের উপর। শুধু কুলিকামিন, টিয়ারঙের মেয়েপুরুষরাই নয়। বাবুবাংলোর ছেলেমেয়ে নারীপুরুষ সকলেই।

উপেক্ষিত ছোট্ট স্টেশনের অধিবাসীরা যেমন দিনের একটি মাত্র লোকাল ট্রেনের নতুন নতুন মুখ দেখবার জন্যে স্টেশনে ছুটে আসে তেমনি এক অসহ্য নীরবতার মাঝে সামান্য একটু বৈচিত্র্য খুঁজে পাবার নেশায় টিয়ারঙের বাবুপাড়াও ছুটে আসে গ্যাংওয়ের ওপরে।

নতুন নতুন লোক আসে, আসে দোকানদারদের অডারী মালপত্তর, কোম্পানির কাগজ, আরো কত কি।

তারপর এক সপ্তাহ ধরে কাঠ বোঝাই হয় জাহাজে। আশপাশের আর পাঁচটা দ্বীপকে কেন্দ্র করে টিয়ারঙ হয়ে উঠেছে স্টিফেন্স কোম্পানির কাঠগুদাম। বড় বড় নৌকোয় করে কাঠ চালান আসে টিয়ারঙে। স্টীমারে বোঝাই হয়ে চলে যায় মাতলার ডিপোতে। সুঁদরি, শিমুল, শাল বোঝাই হয়ে, চিমনির ধোঁয়া ছেড়ে, বাঁশি বাজিয়ে, বিদায় জানিয়ে অদৃশ্য হয় জাহাজ। টিয়ারঙের কুলিমজুর কিংবা কেরানীবাবুদের দু-দশজন লোকও নিয়ে যায় সে-জাহাজ। কারো আত্মীয়স্বজন দেশে যায়. কেউ বা বদলি হয় স্টিফেন্স কোম্পানির অন্য

আড়তে।

জাহাজ চলে গেলেই আবার সেই নীরবতা।

এই অসহ্য নীরবতা থেকে যেন মুক্তি নেই। দম্ বন্ধ হয়ে আসে যেন তামসীর।

সেদিনও সে এমনি এক অসহ্য নীরবতা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই হাঁপিয়ে উঠেছিল।

একা একা সমুদ্রের পাড়ে এসে বালির ওপর পা ছাড়িয়ে বসে ছিল তামসী।

সন্ধে হয়ে আসছে তখন।

আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ। আবছা। আলো-অন্ধকার ঘন হয়ে এল। ঠাণ্ডা হয়ে এল বাতাস।

তন্ময় হয়ে জ্যোৎস্না-ভেজা গ্যাং-ওয়েটার দিকে তাকিয়ে ছিল তামসী। কোন ফাঁকে জোয়ার আসার সাবধানী ঘণ্টি বেজে উঠে থেমে গেল, তব্ সচেতন হল না।

হঠাৎ যেন একটা নেশার আকর্ষণে উঠে দাঁড়াল সে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল ইঁট-গাঁথা সরু রাস্তা ধরে, কাঠের জলে-ভাসা গ্যাংওয়েটার দিকে।

ধীরে ধীরে গ্যাংওয়ের ওপর দিয়ে শেষ প্রান্তের দিকে এগিয়ে চলল তামসী। সমুদ্রের ঝড়ো বাতাসের দমকায় তার শাড়ি উড়ে যাচ্ছে, চুল উড়ছে, পায়ের গতি টলে পড়ছে, তবু খেয়াল নেই।

অজগরের বিষনিশ্বাসের মতো ফুলে ফুঁসে উঠছে টিয়ারঙের সমুদ্র। অজগরের মোহময় দৃষ্টির আকর্ষণে যেন এগিয়ে চলেছে একটি আত্মহারা হরিণী।

—তামসী! তামসী!

বহুদূর থেকে হঠাৎ কে যেন চিৎকার করে ডেকে উঠল।

চমকে ফিরে তাকাল তামসী।

৪

আল্ভার হাতের তিনতারার সুর শুনেই বেরিয়ে এসেছিল সৌমেন।

আল্ভাকে চেনা যেত তার তিন তারের 'রাবা' দেখে। রাবার সুর শুনে দূর থেকেও লোকে বুঝতে পারত আল্ভা বুনো বাতাসের গায়ে তার গানের মূর্ছনা ছড়িয়ে দিয়ে চলেছে।

বড় মিঠে সুর এই রাবার। তিনটি তারে টুং টাং ধ্বনির লুটোপুটি যেন ঢেউয়ের মতো ভেঙে ভেঙে পড়ে সমুদ্রের গায়ে। তার চেয়েও মধুর আল্ভার পরিপূর্ণ গম্ভীর কণ্ঠের গান।

আত্মভোলা এই লোকটি যেন টিয়ারঙের সবচেয়ে বড় রহস্য। দস্যুর মতো বিরাট চেহারা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরি চুল, গলায় একটা প্রবালের মালা। প্রবাল নয়, প্রবালের মতোই দেখায়। সমুদ্রের পাড়ে বালির গায়ে গায়ে জমে থাকে কি এক ধরনের ছোট ছোট শামুক। রঙটা লাল আর হলুদের মাঝামাঝি। মেয়েরা তার মালা গেঁথে গলায় পরে, খোঁপায় জড়ায়। পেশীবহুল স্বাস্থ্যবান জোয়ান চেহারা আল্ভার, তার গলায় তাই এই লাল রঙের মালাটা বড় অদ্ভুত কিন্তু সুন্দর।

হাতে থাকে রাবা। টিয়ারঙের বাসিন্দারা বাঁশির চেয়ে এই তিনতারার ভক্ত, তাদের ভাষায় যার নাম দিয়েছে তারা 'রাবা'। ঢোলক বাজিয়ে আগুনিয়া পরবের নাচ নাচে মেয়েপুরুষ সবাই, আর একদল এই রাবা বাজিয়ে গান গায়। টিয়ারঙে যেমন তাঁত বুনতে জানে না এমন মেয়ে নেই—তেমনি পুরুষ নেই যে কিনা রাবা বাজায় না। কিন্তু আল্ভার হাতে তা যেন আরো মিষ্টি হয়ে বেজে ওঠে।

প্রথম দিন সৌমেন এই আল্‌ভার গান শুনেই মুগ্ধ হয়েছিল, তারপর তার বিশাল চেহারা দেখে। তারের ওপর আঙুলের খেলার সঙ্গে সঙ্গে আল্‌ভার কাঁধের পেশীও যেন নেচে নেচে ওঠে।

ওভারসিয়ার পাঠকের বাংলোর সামনে একটা কাটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে গান গাইছিল আল্‌ভা। উচ্চগ্রামে বাঁধা তার কণ্ঠের সুর যেন কাঁপিয়ে তুলছিল সারা আকাশ-বাতাস। দূর থেকে মুগ্ধ হয়ে শুনছিল সৌমেন। তারপর কখন যেন তন্ময় হয়ে ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এসেছিল।

গান শেষ করে আল্‌ভা তাকাল সৌমেনের দিকে। একমুখ হেসে সেলাম করলে।

তারপর প্রশ্ন করলে, আর গান শুনবেন হুজুর ?

সৌমেন হেসে বললে, বড় মনমাতানো গান তোমার আল্‌ভা। গাও আরেকটা···

আল্‌ভা হেসে তার বাবরি চুল ঠিক করে নিয়ে গান ধরল আবার :

ফির‍্যাও তাকাও মনমাতালি
শোনাও তোমার গান,
তোমার তরে আনলাম আমি
সোনায় মোড়া সাম্পান।

গান শেষ হতে সৌমেন পয়সা দিতে গিয়েছিল তাকে। হেসে পয়সা ফেরত দিলে আল্‌ভা।

—পয়সা দিবেন না হুজুর। আল্‌ভা গরিব নয়।

না, আল্‌ভার ধারণা তার চেয়ে ধনী নেই কেউ।

ফিরুজাকে জিগ্যেস করেছিল সৌমেন।

ফিরুজা উত্তর দিয়েছিল, গায়েন ভাইটা পাগল বাবু।

পাগলই হয়তো। বউ ছেলে নেই, সঙ্গীসাথী নেই, আপন মনে শুধু গান গেয়ে বেড়ায়। দ্বীপের বাসিন্দাদের বাড়ি বাড়ি খেয়ে বেড়ায়—আজ এর বাড়ি, কাল ওর বাড়ি। টিয়ারঙের অধিবাসীও নয় আল্‌ভা। হঠাৎ একদিন ডিঙি নিয়ে এসেছিল কোত্থেকে। তারপর রয়ে গেল এখানেই। কাজকর্ম নেই, শুধু গান গায়।

আর মাঝে মাঝে পাগলের মতো চোখে তাকিয়ে বলে, মোহরগুলান স-ব চুরি হয়ে গেল, স-ব চুরি হয়ে গেল।

কিসের মোহর, কে চুরি করল সে-কথা জিগ্যেস করলেও বলে না।

শুনে সৌমেনের কেমন রহস্য রহস্য মনে হয়। ইচ্ছে হয় একদিন নিজেই সে জিগ্যেস করবে। কিন্তু সাহস পায় না।

ফিরুজা সাবধান করে দিয়েছিল, মোহরের কথা কইলে মানুষটা পাগল হয়ে যায় বাবু। খুন চেপে যায় ওর।

সে-কথা শুনেই একটু দূরে দূরে থাকত সৌমেন। কাছে যাবার সাহস হত না। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার নিঃশব্দ জ্যোৎস্নায় আল্‌ভার রাবা বেজে উঠতেই আবার কেমন এক আকর্ষণ বোধ করলে সৌমেন।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সে রাবার সুমধুব ধ্বনি লক্ষ্য করে।

দেখলে, একটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একমনে গান গাইছে আল্‌ভা।

এ এক অবোধ্য আকর্ষণ। সব সাবধানী উপেক্ষা করে কাছে এগিয়ে গেল সৌমেন। আল্‌ভার কাছে বসে পড়ল।

কিন্তু তাকে যেন লক্ষ্যও করেনি আল্‌ভা। তেমনি গলা ছেড়ে গান গেয়ে চলে সে। থামতে চায় না।

অনেকক্ষণ পরে গান থামাল সে।

তারপর সৌমেনকে দেখে যেন বিস্মিত হল। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী চোখে দেখল সে সৌমেনকে।

চিনতে পেরে বলল, সেলাম হুজুর।

—সেলাম আল্‌ভা।

বাবুপাড়ার একটা লোক কিনা তাকে সেলাম করছে! হো হো করে সশব্দে হেসে উঠল আল্‌ভা।

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল পরমুহূর্তেই। ফিসফিস করে বললে, একটা আরজি ছিল হুজুর।

—কি আরজি আল্‌ভা ?

—আমারে একবার মাটিতে নিয়া চলেন হুজুর।

মাটিতে। দ্বীপের মানুষদের কাছে টিয়ারও হল 'জল', সমুদ্রের ওপারে সুন্দরবন, কিংবা গঞ্জের দিকটা, অর্থাৎ চট্টগ্রামের উত্তর দিকটাকে তারা বলে 'মাটি'। সেখানে ক্রোশের পর ক্রোশ হেঁটে গেলেও নাকি মাটি ফুরোয় না, তাই।

সৌমেন বিস্মিত হয়ে বললে, কেন আল্‌ভা ?

আল্‌ভা চুপ করে গেল। কিছুক্ষণ পরে বললে, আপনারেই কইছি হুজুর। গোপন রাখবেন কথাটা।

তারপর ধীরে ধীরে বললে আল্‌ভা, তার গোপন কথা। আল্‌ভার কাছে নাকি একটা নকশা আছে। তার বাপ মরবার সময় দিয়ে গেছে। বাপকে দিয়ে গিয়েছিল তার বাপ। আর সেই নকশাতে লেখা আছে 'মাটি'তে কোথায় ঘড়া ঘড়া মোহর পুঁতে রেখে গেছে তাদের কোন এক পূর্বপুরুষ।

ফিরুজার সাবধানবাণী মনে পড়তেই কোনোরকমে বিদায় জানিয়ে সরে এল সৌমেন। সমুদ্রের পাড়ের দিকে এগিয়ে গেল দ্রুত পায়ে।

লোকটা তাহলে সত্যিই পাগল।

একা একা সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে হাঁটতে আল্‌ভার কথাটাই ভাবতে শুরু করলে সৌমেন।

হঠাৎ একসময় মনে হল, আল্‌ভার কথাটা মিথ্যে নাও হতে পারে। পাগল নয় হয়তো সে। মগধাওনির ইতিহাস মনে পড়ে গেল সৌমেনের।

মগ আর পর্তুগীজ দুস্যরা শায়েস্তা খাঁর আক্রমণের ভয়ে পালিয়ে আসার সময় ঘড়া ঘড়া মোহর, হীরে-জহরত, তাদের লুঠের সম্পদ নাকি মাটিতে পুঁতে রেখে পালিয়ে এসেছিল, আশ্রয় নিয়েছিল এই সব ছোট ছোট অজ্ঞাত দ্বীপে।

সৌমেনের মনে হল, তেমনই কোনো দস্যুর বংশধর হয়তো আল্‌ভা। আল্‌ভার নামটা কেমন যেন বিদেশী, বিদেশী, হঠাৎ আবিষ্কার করলে সে।

ইচ্ছে হল আবার ফিবে যেতে। ফিরে দাঁড়িয়েই কিন্তু চমকে উঠল সৌমেন। দেখলে, দূরে জ্যোৎস্না-ভেজা অন্ধকারে একটি নারীর ছায়াশরীর একা একা এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে।

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সৌমেন।

ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল আবছায়ার নারীদেহ। স্পষ্ট চিনতে পারল সৌমেন। সমস্ত শরীরে তার রোমাঞ্চের শিহরণ খেলে গেল।

তামসী !

কিন্তু একা এই অন্ধকারে কোথায় চলেছে তামসী ?

বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিচলিত হয়ে উঠল সৌমেন। দেখলে, ধীরে ধীরে গ্যাংওয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে তামসী। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কোন এক

অশরীরীর আকর্ষণে যেন এগিয়ে চলেছে।

ঝড় উঠল এদিকে। কালো মেঘের পাগলা ঝড় সোঁ সোঁ করে ছুটে এল। ঢেউয়ের দাপাদাপি ফুলে ফুঁসে উঠল সমুদ্রের বুকে।

তখনো ঝড়ো বাতাসে টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে তামসী। ছায়াশরীরটা স্পষ্ট হয়ে উঠল গ্যাংওয়ের ওপর। পাগল হয়ে গেছে নাকি ? ঝড়ে উড়ে পডছে তামসীর শাড়ির আঁচল, চুল উড়ছে। তবু গ্যাংওয়ের রেলিং ধরে ধরে এগিয়ে চলেছে তামসী। একেবারে সমুদ্রের বুকের মধ্যে।

একটু আগেই ঝড়ের সম্ভাবনা জানিয়ে সাবধানী ঘণ্টা বেজে উঠেছিল, আবার ঘণ্টা বেজে উঠল জোয়ারের আশঙ্কা জানিয়ে।

হঠাৎ কেমন যেন ভয় পেল সৌমেন। আতঙ্কে শিউরে উঠল।

এই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে গ্যাংওয়ের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে তামসী। ঝড়ের দাপটে বুঝিবা পড়ে যাবে সমুদ্রের বুকে।

মুহূর্তমাত্র। মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে নিল সৌমেন।

তারপর চিৎকার করে ডাকলে, তামসী ! তামসী !

বাতাসের গায়ে অদ্ভুত শোনাল তার আতঙ্কের চিৎকার। কিন্তু তামসীর কানে গিয়ে পৌঁছল না সে-ডাক : সমুদ্রের গর্জন আর ঝড়ো বাতাসের সনসনানির মধ্যে চাপা পড়ে গেল।

পরক্ষণেই চিৎকার করতে করতে ছুটতে শুরু করল সৌমেন।

—তামসী ! তামসী !

শঙ্কিত কণ্ঠের চিৎকার ক্রমশ কাছে এগিয়ে এল। শুনতে পেল তামসী।

বিস্মিত হয়ে ফিরে তাকাল সে। ফিরে দাঁড়াল। দেখলে, সৌমেন ছুটে আসছে তার দিকে।

কিন্তু কেন ? যার ডাক শোনবার জন্যে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছে, যার কাছ থেকে এতটুকু ইশারার হাতছানি পেলেই ছুটে যেত, সে নিজেই ছুটে আসছে তামসীর কাছে।

বড় দুর্বোধ্য ঠেকল তামসীর। তবু অকারণেই সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চের শিহরণ খেলে গেল তার।

ফিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করল সে।

কাছে এসে পৌঁছল সৌমেন। তামসীর একখানা হাত চেপে ধরে বললে, এ কি করতে চলেছ তামসী, এই ঝড়ের মাঝখানে কেন এসেছ এখানে ?

প্রথমটা বিস্মিত অভিভূত হয়ে গিয়েছিল তামসী। পরক্ষণেই খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠল সে।

—সমুদ্রে পড়ে যাব ? এই ঝড়ে ! খিলখিল করে হেসে উঠল তামসী। বললে, এখান থেকে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেখতে চাই সেখানে কত শান্তি।

ক্রমে সব কৌতুক হাসি মিলিয়ে গেল তামসীর মুখ থেকে। বিস্ফারিত দুটি অনিমেষ চোখে সৌমেনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, চল, ফিরে যাই।

—চল।

দুজনে পাশাপাশি ঝড়ে টলতে টলতে চুপচাপ ফিরে চলল গ্যাংওয়ের পথ ধরে, বালি মাড়িয়ে, লতাঝোপের পাশ দিয়ে, বাবুপাড়ার পথ ধরে।

বাংলোর কাছে এসে থমকে দাঁড়াল তামসী। চোখ তুলে তাকাল সৌমেনের দিকে।

তামসীর হাতখানা মুঠোর মধ্যে নিয়ে ঈষৎ চাপ দিয়ে হাত ছেড়ে দিল সৌমেন, দ্রুতপায়ে চলে গেল সেখান থেকে।

একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে রইল তামসী। মনের কোণে মৃদু মধুর গুঞ্জরনের মুগ্ধতায় উৎফুল্ল হয়ে উঠল সে।

মনে মনে বললে, ভুল বুঝে ভুলের বোঝা বাড়িয়ে দিলে সৌমেন।

তারপর তরতর করে এগিয়ে গেল ফটকের দিকে।

কিন্তু পরক্ষণেই চমকে উঠল তামসী। কে যেন লুকিয়ে লুকিয়ে বেরিয়ে আসছে। থমকে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করলে সে। হ্যাঁ, একটি নারীর ছায়াশরীর লুকিয়ে ছুটে পালাল অন্ধকারের দিকে। ফিরুজা? ফিরুজা বলেই মনে হল যেন।

কিন্তু কি করছিল ও এই অন্ধকার ঘরে? কেনই বা ছুটে পালাল।

ঘরে ঢুকেই তামসী প্রশ্ন করলে, দিদি, ফিরুজা এসেছিল?

—ফিরুজা? তাপসী বিস্মিত হল। বললে, কই না তো।

৫

লুকিয়ে লুকিযে ফিরে এল ফিরুজা। যে-উদ্দেশে গিয়েছিল সে, তা সফল হয়নি। কিন্তু মন থেকে লোভ দূব করতে পারল না। ফিরে এল ব্যর্থ কামনা চেপে রেখে। বাবুবাংলো থেকে গাঁওপাড়ায় ফিরে এসে দেখলে, কাঠপাতা জ্বালিয়ে আগুনের কুণ্ডলীকে ঘিরে বসেছে গাঁয়েব সকলে।

জনকয়েক ছোকরা বসে জুয়া খেলছে এক পাশে, হাতের কাছে চোলাই করা দিশী মদের ভাঁড়। একবার করে ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে নামিয়ে রেখে তারা কড়ি চালছে একমনে। আরেক পাশে বুড়ো সর্দার মাধোকে ঘিরে কি যেন সলাপরামর্শ চলছে।

মেয়েগুলো নেচে নেচে ঘুরছে, পাক দিচ্ছে আগুনের কুণ্ডলীকে। আর আল্‌ভা রাবাব তারে তালে তালে টুংটাং বাজিয়ে গান গাইছে গলা ছেড়ে।

—সই, সাধেবাদে আগুন জ্বেলেছি.....

সুবে সুর মিলিয়ে ফিরুজাও গেয়ে উঠল।

হঠাৎ ফিরুজার গলা শুনতে পেয়েই চমকে ফিরে তাকাল সকলে, তারপর জোয়ান ছোকরাগুলো হেসে উঠল হো হো করে।

ঠাট্টাটা গায়ে মাখল না ফিরুজা। গিয়ে বসল মাধো সর্দারের পাশে।

মাধো সর্দার তখন আগুনিয়া উৎসবের বিধান দিচ্ছে সকলকে।

আগুনিয়া টিয়ারঙ অধিবাসীদের বহুদিনের পরব, টিয়ারঙের ধর্ম। এ সময়টায় বনের একটা অংশ বেছে নিয়ে খরগোশ বলি দিয়ে পুজো হয় প্রতি বছর। নির্দিষ্ট এলাকার চারপাশে খুঁটি গেড়ে আগুন লাগিয়ে দেওযা হয় গাছে গাছে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন, লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে।

প্রতি বছরেই এ-উৎসব হয়ে আসছে। টিয়ারঙের লোকদের হাতে তখন পয়সা ছিল না। ছিল শুঁটকী মাছ, কলিচুন, আর ধান। এখন কোম্পানির কাজ করে হাতে পয়সা এসেছে তাদের। তাই অন্যবারের চেয়ে আরো ভাল ভাবে পরব করতে হবে। হাঁড়িয়া আর খাটাস-খরগোশের মাংস চলবে সারারাত। নাচ আর গান থামতে পাবে না এক মুহূর্ত।

মাটির ওপর দাগবন্দী গুনে সীমানা ঠিক করে দিল মাধো।

মাধোর মেয়ে আকাশী বললে, আগুনিয়া হবে, বাবুদের ডাকবি না তোবা?

শুধু ফিরুজা বললে, বাবুরা পরবে আসবে নি রে আসবে নি।

মাধো সান্ত্বনা দিলে, আমি আনব উদের, আমি ডাকে আনব। বাবুরা আসবে নি তো কি পরব হবে ?

কেউ আর প্রতিবাদ করল না। ডেকে আনতে পাবে সে-তো ভালই।

আগুনিয়া পরবের নিমন্ত্রণ জানিয়ে এল মাধো। চ্যাটার্জি, অমিয়বাবু, পাঠককে। সরল বিশ্বাসে নিজেদের আনন্দের ভাগ দিতে চাইল টিয়ারঙীরা। কেউ কল্পনাও করল না, এই সরল আমন্ত্রণ শেষ পর্যন্ত এমন একটা দুর্ঘটনাব কারণ হবে।

বাবুপাড়ার সবাই রাজি হল আসতে। কিন্তু কেউই প্রশ্ন করল না, আগুনিয়া পরবটা কি।

জিগ্যেস করলে হয়তো এমন একটা অঘটন ঘটত না।

পরবের দিনে বাবুবাংলোর সকলেই এল। চ্যাটার্জি কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে, অমিযবাবু, পাঠক, সৌমেন।

অদ্ভুত এই টিয়াবঙের মানুষগুলো। চালে চলনে কথাবার্তায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হলেও কোথায় যেন একটা আদিম বন্যতা লুকিয়ে আছে তাদের শরীবে। সকলে ভাবলে, পরবটাও হয়তো তেমনি অদ্ভুত কিছু। বিচিত্র আচার আচবণ কিছু দেখতে পাবে এই লোভেই এসে দাঁড়াল তারা।

দেখলে, বনের একপাশে জড়ো হয়ে একটা আগুনের কুণ্ডলীকে ঘিরে নেচে চলেছে মেয়েপুরুষ সবাই। পুরুষগুলোর হাতে জ্বলন্ত মশাল।

নাচ আর গানের হল্লা চলেছে বহুক্ষণ ধরে। মাঝে মাঝে মদেব ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে নেয় মেয়েগুলোও। নাচ তো নয়, যেন মদের নেশায় টলছে সকলে। মেয়েগুলোর শরীর থেকে কাপড় খসে পড়েছে, ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে।

শুধু মাধো সর্দার বসে বসে মন্ত্র পড়ছে বিড়বিড় করে, আর বাবা বাজাচ্ছে আল্‌ভা।

গলা ছেড়ে গাইছে আল্‌ভা :

আন্ধাইরা নিঝুম রাতি
আস্‌মানে জ্বলে তারা
মদন আসিয়া দুয়ারে হইল খাড়া ॥

সমস্বরে ধুয়া ধরে মেয়েরা :

আসমানে জ্বলে তারা
মদন আসিয়া দুয়ারে হইল খাড়া

আল্‌ভার পূর্ণকণ্ঠের গান ভেসে আসে আবাব :

লাজেতে গইলা পড়ে
কন্যার মাথার কেশ
আস্তে ব্যস্তে টানিয়া কন্যা
পরে নিজ বেশ ॥

সমস্বরে ধুয়া ধরে মেয়েরা :

আস্তে ব্যস্তে টানিয়া কন্যা
পবে নিজ বেশ।

ক্রমে ক্রমে উদ্দাম হয়ে ওঠে ঢোলকের আওয়াজ।

তারপর একসময়ে হুকুম দিল মাধো।

চিৎকার করে বললে, আগুন লাগায় দে। লাগায় দে আগুন।

হইহই করে চিৎকার করে উঠল সকলে। পুরুষগুলো হাতের জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ছুটে

গেল, গাছে গাছে শুকনো ডালে আগুন লাগাবার জন্যে।

চ্যাটার্জি, অমিয়বাবু, পাঠক সকলেই বিস্মিত স্তম্ভিত হয়ে যায়।

এ কি করতে চলেছে এরা ?

দামী দামী গাছে এইভাবে আগুন লাগিয়ে নষ্ট করতে চায় ? সমস্ত বন যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফার স্বপ্ন দেখে কোম্পানি-মহলের পত্তন করেছে স্টিফেন্স সাহেব, গ্যাংওয়ে বানিয়েছে, বাংলো গড়েছে। যার লোভে ছুটে এসেছে তারা, সেই বন পুড়িয়ে নষ্ট করতে চায় টিয়ারঙের অধিবাসীরা ?

চ্যাটার্জি হঠাৎ গর্জন করে উঠল। এই !

চমকে ফিরে তাকাল সকলে।

চ্যাটার্জি চিৎকার করে ধমক দিয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরল তাদের দিকে।

বললে, একটা গাছেও যদি আগুন লাগে, বন্দুকের গুলিতে···

মাধো সর্দার ছুটে এল।—এটা পরব হুজুর ! আগুনিয়া পরব। এটা ধরম আমাদের।

চ্যাটার্জি বললে, না। বনে আগুন লাগানো চলবে না।

কাকুতি মিনতি করলে মাধো। ধর্মের আচার না রাখলে অমঙ্গল হবে তাদের, অমঙ্গল হবে টিয়ারঙের।

চ্যাটার্জি তবু সম্মতি জানাত রাজি হল না।

ক্রমশ চেহারা বদলে গেল মাধোর। সমস্ত শরীর রাগে অপমানে কেঁপে উঠল তার। ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে।

রক্তচক্ষু হেনে একবার চ্যাটার্জির দিকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি ফেলেই হাত তুলে হুকুম দিল মাধো।—লাগায় দে, লাগায় দে আগুন।

পরমুহূর্তেই বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল। বুকে হাত দিয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল মাধো সর্দার।

স্তম্ভিত হয়ে গেল সকলে। বিমূঢ় বিস্ময়ে চ্যাটার্জির বন্দুকের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ছুটে পালাতে শুরু করল তারা।

শুধু আকাশী আব ফিরুজা ছুটে এসে মাধো সর্দারকে তুলে ধরবার চেষ্টা করল।

দু-হাত রক্তে ভরে গেল আকাশীর।

রক্তাক্ত দুটি হাতের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল আকাশী ! লুটিয়ে পড়ল বাপেব বুকের ওপর।

৬

দু-পক্ষই রীতিমত ভয় পেয়ে গেল।

টিয়ারঙীরা প্রাণ হাতে নিয়ে পালাল, প্রাণ হাতে নিয়েই ফিরে এল চ্যাটার্জি, অমিয়বাবু, পাঠকের দল।

চ্যাটার্জি বাংলোর বাগানে এসে বসল সকলে। পরামর্শ শুরু হল।

সকলেই উত্তেজিত, সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত চ্যাটার্জি নিজে। ঠিক এমনটা হবে, এমন একটা ব্যাপার মুহূর্তের মধ্যে ঘটে যাবে তা চ্যাটার্জি ভাবতে পারেনি। উত্তেজনার কুক্ষণে সত্যিই মাধোবুড়োকে গুলি করে বসে চ্যাটার্জি যেন আরো উত্তেজিত বোধ করল।

তখনো থরথর করে সারা শরীর কাঁপছে। নিজের অন্যায়, নিজের ভুল যত বেশি করে

অনুভব করল, ততই যেন যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করতে চাইল যে সে যা করেছে ঠিকই করেছে। এ ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

পাঠক বললে, স্টিফেন্স সাহেবকে এ-হপ্তার জাহাজেই খবর পাঠিয়ে দিন চ্যাটার্জিসাব।

অমিয়বাবু বাধা দিলেন।—না, না এসব ছোটখাটো খবর স্টিফেন্স সাহেবকে জানিয়ে কি হবে। ও সব ঠিক হয়ে যাবে দু-দিন গেলেই।

সত্যিই তো। টিয়ারঙের একটা বুড়োকে গুলি করেছে, সে আর এমন কি খবর। দু-দশদিন একটু সাবধান থাকলেই চলবে। লোকগুলো না কোপাই নিয়ে গাছের আড়ালে ওত পেতে বসে থাকে।

তারপর সময়ে সব ভুলে যাবে ওরাও। আবার কাজ করতে লেগে যাবে নগদ পয়সার লোভে। এমন অনেক দেখেছেন অমিয়বাবু। পেটে ভাত না জুটলে, আর হাতে পয়সা পেলে সব রাগ জল হয়ে যাবে।

কোম্পানির কুলিদের হুকুম দিলে পাঠক, দিনরাত পাহারা দিতে হবে বাবুবাংলো।

কিন্তু আশ্চর্য, পরের দিনই যথাসময়ে কাজে এসে যোগ দিল টিয়ারঙের অধিবাসীবা। প্রতিদিনের মতোই এসে দাঁড়াল ফিরুজা। এল মদ্না, এল সবাই।

একটা রাতেই মেরুদণ্ড নুয়ে পড়েছিল চ্যাটার্জির। সকলকে কাজে আসতে দেখে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল।

ফিরুজাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকলে।

বললে, মাধো বুড়োর একটা মেয়ে আছে না?

ফিরুজা মাথা নীচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ চোখ তুলে বললে, না রে বাবু, ও বাচ্চা মেয়েটার দিকে আঁখ দিবি না আপনি।

চ্যাটার্জি কড়া চোখে তাকাল ফিরুজার দিকে। বললে, কি নাম তার?

—আকাশী বলি আমরা। ওর বুড়া বাপটাও আকাশী বলত।

চ্যাটার্জি বললে, ওকে কাল ডেকে আনবি আমার কাছে। ওকে টাকা দেব আমি, অনেক টাকা।

—টাকা? কেন রে বাবু? তুই টাকা দিলে যে বদনামী হবে মেয়েটার।

চ্যাটার্জি বললে, ওর বাপ মারা গেছে আমার বন্দুকের গুলিতে, তাই ক্ষতিপূরণ দেব তাকে।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখ তুলে তাকাল ফিরুজা। যেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না ব্যাপারটা। রেগে গিয়ে যাকে খুন করেছে লোকটা, তার মেয়েকে আবার টাকা দেবে কেন?

মানুষকে মেরে ফেললেই তো সব শেষ হয়ে গেল, তার আবার ক্ষতিপূরণ হয় নাকি? টাকা দিয়ে সে-ক্ষতি কমানো যায়? আর তা করবেই বা কেন।

ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে আকাশীকে ডেকে আনার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে চলে গেল ফিরুজা।

চ্যাটার্জির মনটা হালকা হল। ঠায় তাকিয়ে রইল সে সামনেব রাস্তাটার দিকে—যে-রাস্তাটা সমুদ্রের বুকে-বাঁধা গ্যাংওয়ে থেকে এঁকেবেঁকে বাবুবাংলোর পাশ কাটিয়ে বনের পথ ধরেছে, সেই রাস্তার দিকে।

দেখলে, প্রতিদিনের মতোই দলে দলে কাজে চলেছে টিয়ারঙের অধিবাসীরা। কাঁধে কোপাই নিয়ে হনহন করে হেঁটে চলেছে পুরুষগুলো, মেয়েগুলোব পায়ের ছন্দ কাঁপছে তালে তালে।

মেয়েপুরুষ সবাই বনের ভেতর নির্দিষ্ট এলাকায় এসে দাঁড়াল। পরস্পর পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, কিন্তু কেউই কোনো কথা বলল না। ওভারসিয়ার পাঠক নতুন দাগ

দেওয়া গাছগুলো দেখিয়ে দিল, কুড়ুলের পর কুড়ুল পড়ল গুঁড়ির গায়ে।

চার চাকার টানা ট্রলীতে করে একে একে কাটা গুঁড়িগুলো সমুদ্রপাড়ের আড়ত-গোলার দিকে টেনে টেনে নিয়ে যেতে শুরু করল মেয়েগুলো।

কিন্তু মুখচোখ দেখে বেশ বোঝা গেল মনের ভেতর যেন বারুদের স্তূপ জমা হয়ে আছে। যেন যে-কোন মুহূর্তে ফেটে প্রলয়কাণ্ড বাধিয়ে দিতে পারে।

এদিকে সূর্য উঠল মাথার ওপর, বাড়ল রোদের তাত। দুপুরের ঘণ্টা পড়লে ওভারসিয়ার পাঠক চলে গেল বাড়ির পথ ধরে। সঙ্গে আনা কুলিমজুরের দলও ছুটল কোয়ার্টারের দিকে। আর টিয়ারঙীরা এসে জটলা পাকিয়ে বসল।

গামছা খুলে পাখার মতো হাওয়া করতে করতে মেয়েপুরুষ সবাই ঘর থেকে বয়ে আনা ঠাণ্ডিভাতের থালা নিয়ে বসল। হাঁড়িয়ায় দু-এক চুমুক দিয়ে নিল মেয়েগুলোও।

ফিরুজা এক চুমুক নেশা করে নিয়ে মদ্‌নার পাশে গিয়ে গা ঘেঁষে বসল।

বললে, খুনীবাবুটা আকাশীরে টাকা দিতে চায় রে মাদোন।

—টাকা? আকাশীরে? বিস্মিত হয়ে তাকাল মদ্‌না ফিরুজার মুখের দিকে।

তারপর দূরে, আকাশী যেখানে ছিল এতক্ষণ, সেদিকে তাকাল।

আকাশী ততক্ষণে উঠে গেছে আল্‌ভার কাছে।

এ সময়টায় প্রতিদিনই তার রাবা হাতে নিয়ে আসে আল্‌ভা। এসে গাছের একটা গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে গান গায়। কাজের ফাঁকে এইটুকু বিশ্রামের মধ্যে আল্‌ভার গান যেন সকলের ক্লান্তি দূর করে।

গামছায় ভাতের থালা বেঁধে আনত আকাশী বুড়ো মাধোর জন্যে। তার থেকে কিছুটা ভাগ দিয়ে আসত সে আল্‌ভাকে। আর যেদিন অভাব হত চালের, সেদিন আর পাঁচজনে ভাগাভাগি করে খেতে দিত আল্‌ভাকে।

আকাশী কোনো কোনোদিন হয়তো অনুযোগ করত, আল্‌ভাকে বলত কোম্পানির কাজ নিতে।

হাসত আল্‌ভা। রাবা দেখিয়ে বল্‌ত, ভগবানের কাজ নিয়েছি, আমার কি আর ভয়ডর আছে রে আকাশী।

আকাশী রেগে যেত সে-কথা শুনে, রাগে দপ্‌দপ্‌ করে পা ফেলে এসে বসত দলের মধ্যে।

আবার কোনো কোনোদিন আল্‌ভার কাছেই গিয়ে বসত নিরিবিলিতে।

সবাই লক্ষ্য করত, সবাই বুঝত, কিন্তু কেউই কিছু মনে করত না। আল্‌ভা মানুষটাকে যদি ভাল লেগে থাকে আকাশীর, আপত্তি করবে কেন তারা।

ফিরুজার কথা শুনে আপনা থেকেই মদ্‌নার চোখদুটো আকাশীকে খুঁজল যেন।

না, আকাশী ততক্ষণে ভাতের থালা নিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে আল্‌ভার কাছে। হেসে হেসে কি যেন বলছে।

সেদিকে তাকিয়ে ফিরুজা আর মদ্‌না মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল। যাক্‌, বুড়ো বাপের মৃত্যুর শোকটা তাহলে মুষড়ে দেয়নি মেয়েটাকে।

ফিরুজা হেসে বললে, গায়েনভাইটারে মনে ধরছে আকাশীর।

—হুঁ। হাসলে মদ্‌না।—দুটাই ত পাগলপারা বটে।

পাগল মানুষই বটে আল্‌ভা।

কাজকর্ম করবে না, ঘর বাঁধবে না। সারাটা জীবন হাতের রাবা বাজিয়ে গান গেয়ে গেয়েই যেন কাটাতে চায়।

কোনো কোনোদিন হঠাৎ খেয়াল হয়, দাগ টানা একটা পুরোনো ময়লা কাগজ, অর্ধেক

তার ছিঁড়ে গেছে, সেটাই মাচার তলা থেকে বের করে কুর্তার পকেটে নিয়ে বেরোয়। একবার খোলে সেটা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, তারপর পায়ের শব্দ পেলেই চটপট ভাঁজ করে লুকিয়ে ফেলে।

মনে মনে স্বপ্ন দেখে গুপ্তধনের।

ডিঙি নিয়ে সমুদ্রপার পার হয়ে যেতে হবে গঞ্জে। তারপর দিনের পর দিন বন জঙ্গল হেঁটে পার হয়ে মগদের দেশে গিয়ে খুঁজে বের করতে হবে সেই নির্দিষ্ট জায়গাটুকু।

মাটির তলায় যেখানে নাকি ঘড়া ঘড়া মোহর পুঁতে রেখে গেছে আল্‌ভার কোন এক পূর্বপুরুষ।

কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ দু-একবার ডিঙি নিয়ে বেরিয়েও পড়েছিল আল্‌ভা।

দু-তিনদিন এক নাগড়ে ডিঙি বেয়ে, 'মাটি'তে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু সেই ঘন বন আর নির্জনতা দেখে সাহস পায়নি সে এগিয়ে যেতে।

ভয়ে ভয়ে ফিরে এসেছে আবার। ভেবেছে অন্য কাউকে সঙ্গে নিয়ে আবার রওনা হবে। কিন্তু বলতে সাহস হয়নি। দু-একবার বলে দেখেছে, টিয়ারঙের লোকগুলো হেসে ওঠে ওর কথা শুনে। বলে, পাগল।

আল্‌ভার নিজেরও মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, সত্যিই পাগল নয় তো সে? কই, তার গুপ্তধনের কথা তো আর কেউ বিশ্বাস করে না।

স্টিফেন্স সাহেব প্রথম যেবার এসে পয়সা ছড়িয়ে দিয়েছিল, হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল লোকগুলো। অথচ, তার ঘড়া ঘড়া মোহরের লোভ নেই কারো?

ফিরুজাও হেসেছে আল্‌ভার কথা শুনে। বলেছে, তোমার নাগালে এমন সোনা, তুমি সোনার তরে পাগল হও কিসে?

সতিই তাই, আল্‌ভার নাগালের মধ্যে এত সোনা আসে যায়, সেদিকে চোখ নেই তার। মাটির নীচে যে-সোনা লুকিয়ে আছে সেই সোনাই চায় আল্‌ভা।

আকাশীর দিকে তাই প্রথম প্রথম ভাল করে ফিরেও তাকাত না আল্‌ভা। টিয়ারঙের কেউই ফিরে তাকাত না আকাশীর দিকে।

অমন নরম চোখ-ছলছল মেয়েকে মেয়েমানুষ বলেই মনে হয় না যেন। বড় ঠাণ্ডা, উত্তাপও নেই যেন। গরম রক্তের মানুষগুলোর কাছে যত আকর্ষণ পুরুষালি চেহারার শক্ত সমর্থ মেয়েগুলোর, ফিরুজার মতো যারা হাসতে হাসতে ছোবল দিতে পারে, যারা রাগলে খুনিয়া বাগিয়ে ধরে।

আকাশী একেবারে অন্য মানুষ। লাজুক লাজুক মুখ, চলে তো শব্দ হয় না পায়ের, হাসে তো শব্দ হয় না।

ভোর না হতেই এসে দাঁড়ায় সে আল্‌ভার ঘরের সামনে, খুঁটি ধরে দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলে। গান শোনে।

জ্যোৎস্না রাতে কোনোদিন হয়তো দূরে কোথাও বসে গান গায় আল্‌ভা।

দুলতে দুলতে আসল বান
আমি কুড়ায় পেলাম সোনার চাঁদ
এ চাঁদটি কাদেব
কপাল ভালো যাদেব...

গলা ছেড়ে গান গায় আল্‌ভা। আর তা শুনে ছুটে আসে আকাশী। দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোনে।

কিন্তু বাপ মারা যাবার পর হঠাৎ যেন ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল আকাশী। আশ্রয় খুঁজল যেন।

কি আশ্রয় দেবে আল্‌ভা? তার নিজেরই [illegible]

তাই আকাশীর ভাবভঙ্গি দেখে হাসল বটে ফিরুজা আর মদ্‌না, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাদের রক্ত গরম হয়ে উঠল চ্যাটার্জির ওপর আক্রোশে।

ফিস্‌ফিসানি থেকে চাপা গুঞ্জন উঠল টিয়ারণ্ডীদের দলে। রাগে তাদের সমস্ত শরীর যেন জ্বলে ওঠে থেকে থেকে।

আনমনেই খোঁপা থেকে খুনিয়াটা ফিরুজার হাতে নেমে আসে।

পরমুহূর্তেই তাপুদিদির মুখটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

ধীরে ধীরে খুনিয়াটা আবার খোঁপায় গুঁজে রাখে সে।

এ-অন্যায়ের প্রতিশোধ নিতে হবে। কিন্তু কি করে তা সম্ভব খুঁজে পায় না কেউ। মাছ ধরার মরশুম নয় এটা, চাষবাসের সময় নয়। তা না হলে কোম্পানির লোকেদের তাড়িয়ে দিতে ভয় পেত না তারা। শুঁটকী মাছ বেচে এলে দিন কেটে যেত।

কিন্তু সবাই বিস্মিত হয় আকাশীব হাবভাব দেখে। বাপের মৃত্যুর জন্যে প্রতিশোধ নেবার কি কোনো বাসনাই নেই মেয়েটার মনে?

আবার ঘণ্টা বাজল। দুপুরের বিশ্রাম শেষ হওয়ার ঘণ্টা।

নিজের নিজের কাজে মন দিল সবাই। কুড়ুলের পর কুড়ুল পড়ল গাছের গুঁড়িতে।

চার চাকার ট্রলীতে মাল বোঝাই করে টানতে শুরু করল মেয়েরা।

এমন সময় হঠাৎ ওভারসিয়ার পাঠকের গলার স্বর শুনে চমকে উঠল সকলে।

ফিরে তাকিয়ে সবাই দেখল, আকাশীকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে ওভারসিয়ারবাবু।

আকাশী হাত ঝাড়তে ঝাড়তে এগিয়ে গেল পাঠকের দিকে। জালি ওড়নায় মুখের ঘাম মুছে কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে।

কি যেন কথা হল দুজনে।

এদিক-ওদিক একবার তাকালে আকাশী, তারপর পাঠকের পিছনে পিছনে হাঁটতে শুরু করলে।

স্থাণুর মতো সকলেই দেখলে, দাঁড়িয়ে রইল।

শুধু দাঁতে দাঁত চেপে ফিরুজা বললে, বেইমান।

ওদিক থেকে আরেকটা মেয়ে চিৎকার করে ডাকলে, আকাশী।

আকাশী ফিরে দাঁড়াল।

মেয়েটা খোঁপা থেকে খুনিয়াটা খুলে ছুঁড়ে দিল তার দিকে।

মুচকি হেসে খুনিয়া তুলে নিয়ে পাঠকের পিছনে পিছনে হনহন করে হেঁটে গেল আকাশী।

৭

পরের জাহাজে এল আরো একজন।

প্রতিবারের মতোই বাবুবাংলোর সবাই এসে ভিড় করল গ্যাংওয়ের ওপর। শহরের ইস্কুলে পড়ে চ্যাটার্জির ছেলে, ছুটি পেয়ে বাপ-মার কাছে এসেছে নতুন লোকটির সঙ্গে।

গ্যাংওয়েতে তাকে দেখতে পেয়েই তাপসী ছুটে গেল। দু-হাত বাড়িয়ে হাসিহাসি মুখে তাকে জড়িয়ে ধরে কোলে নেবার চেষ্টা করলে। পারল না।

একমুখ হেসে বললে, কত বড় হয়েছিস মণ্টু, তোকে আর কোলে নেওয়া যায় না।

মণ্টুও মাকে জড়িয়ে ধরে মুখ লুকিয়ে হাসল।

তামসী কিন্তু তখনো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে নবাগত মানুষটির দিকে।

চ্যাটার্জির সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করতে করতে এগিয়ে এল সে, হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলে অমিয়বাবুর সঙ্গে।

চমৎকার সুন্দর চেহারা, মাথায় একরাশ হালকা চুল উড়ছে বাতাসে। হাবভাব, চালচলন পুরোদস্তুর সাহেবী। আর চোখেমুখে সপ্রতিভ ভাব, অনর্গল কথা।

আপনা থেকেই তার চোখের দৃষ্টি যেন তামসীর মুখের উপর এসে পড়ল। চ্যাটার্জি হেসে বললে, আমার শ্যালিকা।

দুজনে দুজনকে নমস্কার করলে।

তামসী জিজ্ঞেস করলে, আপনি বুঝি···

—হ্যাঁ, তোমাকে বলেছি বোধ হয়, ইনিই সমীরণবাবু।

সমীরণ হেসে পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বের করল। চ্যাটার্জিব দিকে সেটা বোতাম টিপে এগিয়ে দিল, তারপর নিজে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, যাক্ ভরসা হল, বনবাস নয় তাহলে। আপনারা আছেন যখন···

চ্যাটার্জি হেসে বললে, না বেশিদিন নয়, তামসীর চলে যাবার ডাক এসে গেছে।

—সে কি ? চমকে ওঠার ভান করলে সমীরণ।—না, না, সে হতেই পারে না।

বলে হাত বাড়িয়ে দিল সে তামসীর দিকে। তামসী প্রথমটা একটু ইতস্তত করে মৃদু হেসে হাত বাড়াতে বাধ্য হল।

তামসীর হাতটা চেপে ধরে সমীরণ বললে, কথা দিন, এখন কিছুদিন অন্তত থেকে যাবেন।

তামসী উত্তর না দিয়ে হাসল শুধু, তারপর এপাশ-ওপাশ তাকাতেই দেখলে, একটু দূরেই সৌমেন কটমট করে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

চোখাচোখি হতেই দ্রুতপায়ে গ্যাংওয়ে থেকে নেমে গেল সৌমেন।

আর সমীরণ তামসীর সঙ্গে, তাপসীর সঙ্গে গল্প করতে করতে বাংলোর পথ ধরলে।

সমীরণ মণ্টুর একটা হাত ধরে নামতে নামতে তাপসীকে বললে, আপনার পুত্রের সঙ্গে জাহাজে এই ক-দিনেই কিন্তু খুব ভাব হয়ে গেছে।

মণ্টু কেন, ভাব হতে কারো সঙ্গেই বাকি রইল না সমীরণের।

স্বতঃস্ফূর্ত, সপ্রতিভ। দু-দিনের মধ্যেই যেন ঘরের মানুষ হয়ে উঠল সমীরণ। টিয়ারঙের বাবুপাড়ায় নতুন প্রাণ এল। নীরস নির্জন দ্বীপটাকে হঠাৎ যেন নাড়া দিয়ে জাগিয়ে তুলল সে।

কোম্পানির কুলিকামিন থেকে শুরু করে বাবুদের বাড়ি পর্যন্ত সর্বত্র অবাধ গতিবিধি। সর্বত্র সমান সমাদর।

সকলে বেশ অনুভব করল এতদিনে একটা লোক এসেছে যে কাজকে কাজ মনে করে না।

কর্মচারীদের সুখ-সুবিধে দেখবার জন্যে, কুলিদের অভাব অনটনে সাহায্য করবার জন্যে এল সমীরণ।

স্টিফেন্স অ্যাণ্ড কোম্পানির এল-ডব্‌লু-ও সমীরণ সরকার। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল তাব নাম।

হাত-গোটানো সার্ট, দামী কাপড়ের ট্রাউজার্স। ঠোঁটে সব সময় সিগারেট চেপে চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে। আর না হেসে যেন কথা বলতে পারে না।

তাপসী দেখে আর আড়ালে বলে, কী ছটফটে ছেলে বাপু!

তামসীও হাসে।

সত্যি, এত চঞ্চল মানুষ কি করে হয়! কি করে শরীরে পোষায়! এক জায়গায় এক

মিনিট স্থির হয়ে বসে না। বসতে পারে না। কেবলই ছুটোছুটি করে।

তখনই হয়তো এসে ঢুকেছে, জানলাটা দড়াম করে খুলে গেল বাতাসে। তাপসী জানলাটা আবার বন্ধ করতে করতে বললে, দেখ সমীরণ, তোমাদের কোম্পানির ঘরদোর, জানলায় খিল নেই।

—দেখছি আমি। তিড়িং করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল সমীরণ। সটান চলে গেল ওভারসিয়ার পাঠকের কাছে।—এখনই লোক পাঠান, পাঠকজী।

প্রথম প্রথম অস্বস্তি বোধ করত তাপসী। ভাবত শুধু তাদের জন্যেই বুঝি সমীরণের এত উৎসাহ।

দেখলে, তা নয়। বিকেলে বেড়াতে বেরিয়েছে, কুলিরা কেউ হয়তো বললে, ছাদ দিয়ে জল পড়ে। তখনই তার ব্যবস্থা করতে ছুটল সমীরণ।—পাঠকজী, ডামর ঢালতে বলুন কুলিছাপরায়।

সকলেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে, মাঝে মাঝে সমীরণের তাড়াহুড়োর জন্যে চটে। তবু ভালও বাসে।

কুলিমেয়েগুলো, টিয়ারণ্ডীরা, কেউ বলে বাপ, কেউ ছেলে, কেউ ভাই। সকলের সঙ্গেই একটা না একটা সম্পর্ক।

এতগুলো লোক, একটা খেলার মাঠ নেই? একটা ক্লাবঘর নেই?

উঠে পড়ে লাগল সমীরণ। পাঁচটা কুলির সঙ্গে নিজেই কোদাল হাতে নিয়ে নেমে পড়ল খেলার মাঠ বানাতে। কোম্পানি যা দিয়েছে বা দেবে, বাকিটা চাঁদা তুলে ক্লাবঘর করতে হবে।

চাঁদার ভারে নুয়ে পড়লেও 'না' বলতে পারে না কেউ। সমীরণকে যেন ফিরিয়ে দেওয়া যায় না।

সঙ্গে সাজ-সরঞ্জামও নিয়ে এসেছিল সে। ব্যাডমিন্টনের নেট টাঙিয়ে তামসীর হাত ধরে টেনে নিয়ে এল।

—খেলবেন না মানে! এইটুকু জায়গা, পাঁচটা লোক এখানে ওসব লজ্জাটজ্জা করলে চলবে না। বলে তামসীর হাতে র‍্যাকেট ধরিয়ে দেয় সমীরণ।

তাপসীর যদিও মনে একবার আপত্তি উঁকি মারে, তবু কিছু আর বলতে ইচ্ছে হয় না। হাসে মনে মনে।

তামসী এসে অনুযোগ করে, কী লোক বাপু তোমাদের ঐ সমীরণবাবু।

—কেন কি হল?

—কী জ্বালান! টেনে নিয়ে গেল খেলবার জন্যে। এদিকে নিজে না খেলে একগাদা লোকের সামনে নামিয়ে দিয়ে সরে পড়ল রেডিওতে যুদ্ধের খবর শুনবে বলে।

সশব্দে হেসে ওঠে চ্যাটার্জি তামসীর কথা শুনে।

ঠাট্টা করে বলে, মনে ব্যথা লেগেছে বুঝি? আহা, এত রূপ তবু ঐ একটা ছোকরাকে···

কটমট করে তাকিয়ে রাগ দেখিয়ে চলে যায় তামসী।

কখনো হয়তো হঠাৎ আবার এসে হাজির হয় সমীরণ। বলে, একটা থিয়েটার করলে কেমন হয়, বৌদি?

বৌদি অর্থাৎ তাপসী। তাপসী তাড়াতাড়ি হাত নেড়ে বলে, আমি কিন্তু ওসব করতে পারব না।

চ্যাটার্জি হেসে তাকায় তামসীর মুখের দিকে, জিজ্ঞেস করে, কি গো, ইচ্ছে আছে নাকি?

সমীরণ বাধা দেয়।—কি যে বলেন মেজদা, ওসব থিয়েটারে চলে না। নায়িকা হব আমি নিজে। দেখবেন কেমন মানায়। মেয়েদের পার্ট মেয়েরা পারে না।

বলেই তোড়জোড় শুরু করে দেয়।

টিয়ারও যেন ভোরের পাখির মতো পাখা ঝেড়ে জেগে উঠতে চায়।

চারিদিকে শুধু যুদ্ধের খবর, আতঙ্কের খবর, তার মধ্যে সমীরণ যেন একমাত্র আনন্দের ভরসা।

সবারই মুখে তাই সমীরণ আর সমীরণ।

শুধু একজনের কিছুতেই ভাল লাগে না লোকটাকে। সে বড় একটা কাছেও আসতে চায না। দূর থেকে দেখে। দেখে আর জ্বলে। সৌমেন।

তামসী যে বুঝতে পারে না এমন নয়। সৌমেনের চোখের দৃষ্টিতে ঈর্ষার জ্বালা দেখতে পায় তামসী, দেখে আর হাসে মনে মনে।

কৌতুক বোধ করে তার ব্যবহারে। আরো বেশি রাগাবার জন্যেই সৌমেনের কাছে কেবলই সমীরণের কথা বলে সে।

এমনভাবে বলে যেন সমীরণের সঙ্গে অন্য কারো তুলনাই হয় না। হয়তো সবটাই অভিনয় নয়, হয়তো বা তামসীর মনের কথাই।

সত্যি, সৌমেনের কাছে বসে থেকে কথা খুঁজে পায় না তামসী। অনেক কিছু বলবার কথা বলা হয় না, অনেক কথা শোনবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু শুনতে পায় না। শুধুই অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থাকা, সীমাহীন সময়ের দিকে চোখ মেলে বসে থাকা। অথচ, সমীরণের কাছে কত অনর্গল কথা বলে যায় তামসী, কত সময় কেটে যায় দ্রুত তালে।

এ-পরিবর্তন চোখে পড়েছে সৌমেনের। পড়েছে বলেই সেই প্রথম দিন, যেদিন এসে পৌঁছল সমীরণ যেদিন তামসীর সঙ্গে কথা বলতে দেখল তাকে গ্যাংওয়ের ভিড়ে দাঁড়িয়ে, সেদিন থেকেই সমীরণকে যেন সহ্য করতে পারে না সে।

তাই একটু বুঝি এড়িয়ে এড়িয়েই চলছিল সে তামসীকে।

অবহেলা দিয়েই অবহেলার জবাব দেবে ভেবেছিল তামসী।

দিনের পর দিন কেটে যায়। অপেক্ষা করে। কিন্তু না, সৌমেনের দিক থেকে কোনো ডাক এসে পৌঁছল না।

মন বেঁধে রেখেছিল সে। কিন্তু যাবার দিনের ডাক এসে পৌঁছল যখন, তখন আর নিজেকে টেনে রাখতে পারল না।

সৌমেনের খোঁজেই একা একা বেরিয়ে পড়েছিল। সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে একমনে হেঁটে চলেছিল সৌমেন। কোনোদিকে যেন ভ্রূক্ষেপ নেই।

পিছন থেকে চিৎকার করে ডাকলে তামসী।

ফিরে দাঁড়াল সৌমেন।

দেখল। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল।

অন্যদিন হলে হয়তো ফিরে চলে যেত তামসী।

কিন্তু আজ যে সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই। তামসী ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল। সৌমেনের পথ রোধ করে বললে, শোন।

কোনো জবাব দিল না সৌমেন।

তামসী ঈষৎ হেসে বললে, এরপর যত ইচ্ছে রাগ দেখিও, আজকের দিনটা শুধু—

সৌমেন তখনো কোনো উত্তর দিল না।

তামসী ধীরে ধীরে বললে, কাল থেকে তোমাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না কাল চলে যাচ্ছি আমি।

চলে যাচ্ছ? কোথায়? চমকে উঠল সৌমেন।

তামসীর হাসিটা বড় বিষণ্ণ দেখাল।

বললে, থাকবার জন্যে তো আসিনি । চলে যাচ্ছি···

একটু থেমে বললে, হয়তো চিরদিনের জন্যেই। হয়তো আর কোনোদিনই দেখা হবে না।

দু-হাত বাড়িয়ে তামসীর একখানা হাত চেপে ধরল সৌমেন।—না, না, তামসী।

তামসী হাসল।—তা হয় না। তা হয় না। শুধু একটা কথার উত্তর দাও। ভুলে যাবে ? একেবারে ভুলে যাবে আমাকে ?

তামসীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাকে গাঢ় আশ্লেষে জড়িয়ে ধরতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল সৌমেন।

ফিরুজাকে দেখতে পেয়ে। ফিরুজা আর মদ্‌না।

খিলখিল করে হেসে উঠল ফিরুজা।

সশব্দে হেসে উঠল মদ্‌না।

সৌমেন আর তামসী দেখলে, দুজনে দুজনের কোমরে হাত রেখে টলতে টলতে এগিয়ে আসছে।

ওদের দুজনের সামনে এসে দাঁড়াল ফিরুজা, মদ্‌নার কোমর থেকে হাত না সরিয়েই বললে, কাল জাহাজে চলে যাবি গ ছুটদিদি ? চলে যাবি ?

৮

এর আগে কখনো চুরি হয়নি টিয়ারঙে। কিন্তু কে চুরি করল কেউই বুঝতে পারল না।

তামসীর সেদিন চলে যাবার দিন। আগের রাতে জিনিসপত্তর গোছগাছ করে একখানা সিল্কের শাড়ি বাইরে তুলে রেখেছিল সে। সৌমেন বলেছিল, এই শাড়িটাতেই নাকি বড় সুন্দর মানায় তাকে। তাই যাবার সময় এই শাড়িটাই পরবে ভেবেছিল।

সে-কথা মনে পড়তে নিজের মনেই হেসে ফেলল তামসী। মনে পড়ল সেই দিনটার কথা, যেদিন ভয় পেয়ে চিৎকার করে তাকে ডেকেছিল সৌমেন। কিন্তু ভুল বুঝে যেন ভুলের বোঝা বাড়িয়ে দিয়েছে সে।

যাবার দিনে তামসী অনুভব করলে, এই কৌতুক আর কথার হালকা পথেই কখন যেন নিজেরই অজান্তে সৌমেনকে ভালবেসে ফেলেছে সে।

তেমনি আগের মতোই আবার জাহাজঘাটায় এসে ভিড় করল সকলে।

অমিয়বাবু চলেছেন কোম্পানির আদি মহল মাতলার কুঠিতে, সেখান থেকে তামসীকে পৌঁছে দিয়ে আসবেন তিনি।

জাহাজের বাঁশি বাজল। একে একে সকলে গিয়ে উঠল জাহাজে। বদলি-হওয়া বা ছুটি-পাওয়া কুলিকামিন, কর্মচারী, অমিয়বাবু, তামসী।

ছেড়ে যাবার মুহূর্তে দিদিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদল তামসী, মন্টুকে কোলে নিয়ে আদর জানাল। তারপর জাহাজের রেলিং ধরে হাত নাড়তে নাড়তে চোখ পড়ল তার সৌমেনের দিকে।

আশ্চর্য, ভিড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সৌমেন। অথচ এতক্ষণ একবার কাছে আসবার, কথা বলার চেষ্টা করেনি।

সমীরণ যখন তার হাত ধরে বিদায় জানিয়েছে, আবার ফিরে আসবার জন্যে আহ্বান জানিয়েছে, তখন বার বার সৌমেনকে খুঁজেছে তামসী। মনে হয়েছে, সমীরণের মতোই কেন সপ্রতিভ হতে পারে না সৌমেন, কেন এমনিভাবে তার হাতে হাত দিয়ে বিদায়

জানাতে পারে না।

দূরে সৌমেনকে একা-একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুকটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল। দু-ফোঁটা অশ্রুও যেন টলটল করল তার চোখের কোণে।

হাত তুলে সৌমেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে বিদায় জানাল তামসী, কিন্তু সৌমেন হাত তুলতে গিয়েও যেন পারল না।

জাহাজ তখন ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে সমুদ্রের দিকে। ক্রমে ক্রমে দূরে সরে গেল জাহাজ।

ফিরে এল সকলে।

ফিরে আসতে আসতে সকলের আলোচনা কেন্দ্র করল তামসীর শাড়ি চুরির ব্যাপারটার ওপর।

কে চুরি করল, কেন?

সমীরণ বললে, এ চুরির হদিস আমি বের করবই। এ নিশ্চয় আমাদের কুলিমজুরদের কাজ।

চ্যাটার্জি তার কথায় সায় দিয়ে বললে, তাই মনে হয়। টিয়াবঙীরা প্রয়োজন হলে খুন করতে পারে, কিন্তু চুবি করে না।

ক্রমে ক্রমে চুরির কথাটা টিয়ারঙীরাও শুনল। এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলে। চুরি? টিয়ারঙে চুরি হয়েছে? লজ্জায় মাথা হেঁট করলে সকলে।

মদ্‌না রেগে গিয়ে বললে, নিমকহারামটার পেট ফাঁসায়া দিব হুজুব.কোপাই বসায় দিব।

সমীরণ সান্ত্বনা দিল।—আরে না না, তোদের মধ্যে কেউ নেয়নি, নিয়েছে কোম্পানির কুলিমজুরদের কেউ।

খুশি হল মদ্‌না।

টিয়ারঙীদের একজনকেও যদি সন্দেহ করত বাবুরা, কি ঘটত বলা যায় না। বাবুরা তাদের যে বিশ্বাস করে এইটুকুতেই ফুর্তিতে ভরে উঠল তার মন। আনন্দে টলতে টলতে বনের পথে পা বাড়াল সে। তিতির নয়তো খরগোশ কিছু একটা মেরে আনবার জন্যে।

বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে তখন। আকাশে এক ফালি বাঁকা চাঁদ। অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল মদ্‌না। না, শিকার মিলবে না এখন। ক্লান্ত-পায়ে বস্তির দিকে পা টেনে টেনে চলল।

খানিকটা নেশা করে চাটাইয়ে গা এলিয়ে দিতে পারলে যেন শান্তি।

গাঁয়ের মুখেই আল্‌ভার ডেরা। দূর থেকেই আল্‌ভার রাবা শুনতে পাচ্ছিল। কাছে আসতে গানটা স্পষ্ট হল।

গলা ছেড়ে গাইছে আল্‌ভা:

রে নিঠুর গরজী
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি
সবুর বিহনে···

গানের অর্থ সব সময় হয়তো টিয়ারঙীরা বোঝে না, কিন্তু তবু মাথা দোলায় আল্‌ভার সুরে মুগ্ধ হয়ে। শিকারে ব্যর্থ হয়ে মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে ছিল মদ্‌নার, রাবার সুর আর গলার সুর শুনে চনমন করে উঠল বুকের ভেতরটা।

ধীরে ধীরে ডেরার কাছে এসে ভেতরে উঁকি দিল। দেখলে, পইঠেতে বসে গান গাইছে আল্‌ভা আর খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে শুনছে আকাশী।

কৌতুকে হাসল মদ্‌না।

তারপর, আকাশীকে দেখেই হয়তো, ফিরুজার কথা মনে পড়ল।

ভাবলে, ফিরুজা কি করছে দেখেই যাই না।

নিজের কুঠির দিকে না গিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিল। রতনা মাঝির ডেরার পাশ দিয়ে।

দেখলে রতনা মাঝি তার উঠোনের গাছটার গুঁড়িতে জাল শুকোতে দিচ্ছে। আর বউটা তার সুতো কাটছে 'কাঠি' ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।

দু-তিন ঘর পার হয়ে ফিরুজার উঠোন। চিৎকার করে ডাকতে যাচ্ছিল মদ্‌না। হঠাৎ হোঁচট খেল।

ফিরুজার বুড়ি-মা বসেছিল অন্ধকারে, দেখতে পায়নি মদ্‌না

গায়ে পা লাগতেই বিড়বিড় করে গাল দিতে শুরু করলে বুড়ি।

মদনা পিঠে হাত দিয়ে মালিশ করার ভঙ্গিতে বললে, আঁধারে লজর হয়নি গ বুড়ি-মা।

বুড়ি মালিশ পেয়ে খুশি হল। বললে, জোয়ান বয়সে বুড়িটার দিকে লজর যাবে কেনে গ বেটো।

মদ্‌না হেসে বললে, ঠিক কথাটাই বললি বুড়ি-মা। তোমার রাঙা বেটিটারেই তো খুঁজছি বটে।

বুড়ি পিঠটা বাড়িয়ে বললে, টুকুন ঘস্যে দে ছেলা। বেটিটা পালাবে নাই রে, পালাবে নাই।

মদ্‌না আরো কিছুক্ষণ মালিশ করে দিতে বুড়ি বললে, ঘরে যা, ঘরে বসে সাজ করছে নিলজ্জ মায়াটা।

মদ্‌না হাসল বুড়ির কথায়, তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল ফিরুজার ঘরের দিকে।

বাইরে থেকে উঁকি দিলে।

পরমুহূর্তেই চমকে উঠল।

টিমটিম করে একটা প্রদীপ জ্বলছে ঘরে, ভাল ঠাওর হয় না। কিন্তু সেইটুকু আলোতেই স্পষ্ট দেখতে পেল মদ্‌না।

দেখলে, শাড়িটা গায়ে ঠিক করে জড়াবার চেষ্টা করছে ফিরুজা। দেখেই বুঝতে পারল মদ্‌না। ঘাগরা নয়, রীতিমত দামী শাড়ি। মনে পড়ল, একদিন যেন এই শাড়িটাই পরে বেড়াতে বেরিয়েছিল বাবুপাড়ায় সেই মেয়েটি।

গলায় লাল প্রবালের মতো মালা দুলিয়েছে ফিরুজা, খোঁপায় গুঁজেছে ফুল। নিজেকে সুন্দর করে সাজিয়ে শাড়িটা ঠিক করে পরবার চেষ্টা করতে করতে কি একটা গানের কলি গুনগুন করছিল ফিরুজা।

কিন্তু সেদিকে চোখ গেল না মদ্‌নার। ও শুধু দেখলে, ফিরুজার শরীরে সেই চুরি-যাওয়া শাড়িটা।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত শরীর যেন রাগে কেঁপে উঠল। টিয়ারডাঁদের ইজ্জত এমনভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে ফিরুজা?

রাগের স্বরেই ডাকলে মদ্‌না।—ফিরুজা।

ফিরুজা চমকে ফিরে তাকাল। তারপর এক মুখ হেসে এগিয়ে এল সে।

—সোন্দর লাগছে কিনা বল্ মাদোন।

মদ্‌নার দু-চোখ জ্বলে উঠল হাসি দেখে। বললে, বিষ লাগছে তরে। ইজ্জত নাই রে ফিরুজা, বাবুদের সামগ্‌গীর চুরি করছিস্?

ফিরুজার মুখ শুকিয়ে গেল। মাথা নীচু করে বললে, তর তরেই তো চুরি করছি। তুই তো কয়েছিলি বাবুদের মাযেটারে বড় সোন্দর লাগে। সোন্দর সাজবার সাধ লাগে নাই আমার?

মদনা ধীরে ধীরে বললে, যা, ফিরতি দিয়া আয় বাবুদের, ফিরতি দিয়া পাপ ধুয়ে আয়

তুই।

—না। বেঁকে দাঁড়াল ফিরুজা।—কেন, দিব কেনে ফিরতি, চুরি করছি, চুরি করছি। কষ্ট লাগে নাই আমার ?

স্থিরদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল মদ্‌না, তারপর বললে, যাঃ তর উ পাপ মুখ আমি দেখব নাই আর।

বলেই ফিরে দাঁড়িয়ে চলে যাবার উপক্রম কবল মদ্‌না।

ফিরুজা ডাকলে, মাদোন !

মদ্‌না সাড়া দিল না, রাগে গজগজ করতে করতে বড় বড় পা ফেলে চলে গেল।

ফিরুজা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

তারপব একসময় একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তার বুক নিঙড়ে।

যার চোখে সুন্দর হবার জন্যে পাপ করল ও, সেই চলে গেল রেগে। কি হবে তার সুন্দর সেজে।

চোখে জল এল ফিরুজার। পোশাক বদলে ফেলল ফিরুজা, তারপর শাড়িটা ভাঁজ করে হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। গিয়ে ফেরত দিয়ে আসবে ফিরুজা। ক্ষমা চেয়ে আসবে।

তাড়াতাড়ি পা ফেলে এগিয়ে চলল বাবুবাংলোর দিকে।

বাবুপাড়া তখন নিঃশব্দ। ঘুমে নিঝুম যেন। শুধু দু-একটা বুনো পাখির ডাক, আর সমুদ্রের সঙ্গত বেজে চলেছে অবিরাম ছন্দে। ফিকে আলোর আকাশে চিকচিক করে তারার সারি।

ফিরুজা দ্রুত পায়ে এসে পৌঁছল চ্যাটার্জির বাংলোর সামনে। দরজা জানলা বন্ধ হয়ে গেছে তখন। বাগানের বেড়ার ফাঁকটায় এক হাত রেখে আরেক হাতে শাড়িটা বুকে চেপে কি যেন ভাবলে ফিরুজা।

ডাকবে ? ডাকবে সে তাপুদিদির নাম ধবে ? পা জড়িয়ে ধরে ক্ষমা চাইবে ?

হঠাৎ একরাশ লজ্জা এসে জড়ো হল তার মনে। না, না, এমনভাবে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না সে। তার চেয়ে—

নতুন বাবুর কথা মনে পড়ল তার। হ্যাঁ, সমীরণ, সমীরণের কাছে গিয়ে শাড়িটা ফেরত দিয়ে অসবে। নতুন বাবু তাদের বন্ধু টিয়ারঙীদের বন্ধু। বললে বুঝবে মানুষটা, দোষ ধরবে না। বিপদ আপদে বহুবার তাকে দেখেছে ফিরুজা। দেখেছে, কত আপনার জনের মতো সাহায্য করতে ছুটে আসে সে।

ধীরে ধীবে বেড়াব ফটক থেকে হাত তুলে নিয়ে নতুন বাবুর কুঠির দিকে পা বাড়াল ফিরুজা।

সেদিনের কথাটা মনে পড়ল।

ওভারসিয়ার পাঠক যখন আকাশীকে ডেকে নিয়ে গেল, সেদিন ভয় পেয়েছিল ফিরুজা, ভয় পেয়েছিল টিয়ারঙের মেয়েরা। ভেবেছিল, হয়তো মাধো বুড়ো মারা গেছে দেখে মেয়েটাকে পাপের পথে টেনে নিয়ে যাবে বাবুরা।

গঞ্জে যারা ডিঙি নিয়ে শুঁটকী মাছ আর নারকেল ছোবড়ার দড়ি বেচতে যেত তারা ফিরে এসে 'মাটির' গল্প বলত তাদের কাছে। বলত, গঞ্জের মানুষগুলোর নাকি পাপপুণ্য নাই, লজ্জাশরম নাই। সুযোগ পেলেই মেয়েদের ইজ্জত কেড়ে নেয় তারা।

ফিরুজা তার হারানো-স্বামীর কাছেও সে-গল্প শুনেছে। শুনেছে, গঞ্জের কসবীগুলোর পায়ে নাকি টাকা ঢেলে দেয় পুরুষগুলো। টাকার লোভে নাকি কসবী হয়ে যায় মেয়েরা।

তাই প্রথম যেদিন আকাশীকে টাকা দিতে চেয়েছিল চ্যাটার্জি, ভয় পেয়েছিল ফিরুজা। আরো ভয় পেয়েছিল, আকাশীকে পাঠক যখন ডেকে নিয়ে গেল।

কে যেন একটা খুনিয়া ছুঁড়ে দিয়েছিল সেদিন। কৌতুকে হেসে খুনিয়াটা কুড়িয়ে নিয়ে পাঠকের পিছনে পিছনে চলে গিয়েছিল আকাশী।

তারপর চ্যাটার্জির দেওয়া টাকা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছিল সে।

বাপের জীবনের দাম কিনা কয়েকটা টাকা। নেয়নি আকাশী।

তারপর টিয়ারঙে এল এই নতুন বাবু। হাসি মুখ, রাঙা মুখ।

টিয়ারঙীরা নাম দিলে নতুন বাবু।

সেই নতুন বাবু এসে টিনের ছাদ দিয়ে দিল তাদের ঘরে, দোকান খুলে দিল মসলাপাতির, কাপড়, চুড়ি, জলে-ভাসা সাবানের। যা কিনা শুধু গঞ্জের লোকে কিনতে পারত। শুধু কি দোকান! নগদ দাম না দিয়েও যাতে ধারে জিনিস পায় তার ব্যবস্থাও করে দিল এই নতুন বাবু।

আর আকাশীকে হালকা কাজ দিল, 'রোজ' বাড়িয়ে দিল তার। চ্যাটার্জি অর্থাৎ বড়বাবুর মতো টাকা দিয়ে তার মন কাড়তে চাইল না।

না, নতুন বাবুটা মানুষ ভাল।

ধীরে ধীরে সমীরণের বাংলোর দিকে পা বাড়াল ফিরুজা। দূর থেকে দেখতে পেল একটা জানলা খোলা রয়েছে, খোলা জানলায় আলো দেখতে পেল।

নিঃশব্দ পায়ে কপাটের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে জানালায় একবার উঁকি দিলে।

টেবিলের ওপর একটা আলো জ্বলছে। আর টেবিলের ওপর দু-হাতে মাথা গুঁজে বসে আছে সমীরণ।

মন-মাতানো বেশ একটা মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল ফিরুজার নাকে। প্রথমটা বুঝতে পারল না। বুক ভরে নিশ্বাস টেনে গন্ধটা কিসের ঠাওর করতে চেষ্টা করল।

না, ছুটর্দিদি সেদিন যে-খোশবাই এনে দিয়েছিল, তাপুদিদি যেটা তার গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছিল, তেমন গন্ধ নয়।

সে-গন্ধে এমন মন মেতে ওঠে না, গা তেতে ওঠে না।

ফিরুজা ধীরে ধীরে এসে দাঁড়াল কপাটের সামনে।

টুক্ টুক্ টুক্ টুক্, হালকা হাতে টোকা দিল দরজায়।

ভেতর থেকে গম্ভীর গলায় সাড়া পেল ফিরুজা।—কে?

—আমি গ লতুন বাবু। একটা সলা ছিল তুমার সাথে। খিলখিল করে হাসল ফিরুজা।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সমীরণ।

তারপর এসে দরজা খুলে দিল। খুলে দিয়েই চমকে উঠল।—কে?

—আমি বটি গ, ফিরুজা বটি আমি। খিলখিল করে হেসে উঠল ফিরুজা।

সমীরণ তখন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ফিরুজার দিকে। ফিরুজার ছন্দময় শরীরের লোভানির দিকে।

টিয়ারঙের সবচেয়ে সপ্রতিভ মেয়েটাকে এই যেন প্রথম দেখছে সমীরণ। এ-সৌন্দর্য, এই যৌবনের লীলায়িত তরঙ্গের উচ্ছ্বাস যেন প্রথম চোখে পড়ল তার।

ক্রমে ক্রমে চোখের দৃষ্টি বদলে গেল সমীরণের। কৌতূহলের চোখে আকাঙ্ক্ষার আগুন জ্বলে উঠল।

কাছে এগিয়ে এল সে, একেবারে ফিরুজার শরীরের কাছে এগিয়ে এসে বললে, এসেছিস্?

—হ্যাঁ গ লতুন বাবু, আসতে হল তুমার কাছে। সশব্দে হাসল ফিরুজা, চোখের কোণে দুষ্টুমির কটাক্ষ হেনে।

বললে, দোষটারে খণ্ডন করতে আসছি। ই কাপড়টা চুরি করছিলাম রে বাবু, ই তুদের

ছুটদিদির কাপড় । তাপুদিদির যে-বুনটা চলে গেল ঐ জাহাজে, তার কাপড় বটে ইটা ।

শাড়িটা সমীরণের দিকে এগিয়ে দিল ফিরুজা ।

সমীরণ তখনো মোহময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার দিকে । ক্রমে ক্রমে মৃদু হাসি দেখা দিল সমীরণের চোখে ।

বললে, কেন নিয়েছিলি ?

—সাজ করবার শখ নাই আমার ? ই কাপড়টা পরে ছুটদিদিকে সোন্দর লাগল তো ভাবলাম ই টিয়ারঙী মেয়েটারেও সোন্দর লাগবে নাই কি লেগে ! তা মাদোনটার উষ্‌ম হল ফিরতি দিতে এলাম গ । তুই ইটা উদের পাঠায় দিবি লতুন বাবু ।

হাসল সমীরণ ।—কাপড় ফেরত দিতে এসেছিস এত রাতে ?

বলে টেবিলটার দিকে এগিয়ে গেল ।

টেবিল থেকে বোতল তুলে গ্লাসে ঢালতে শুরু করলে ।

উৎসুক একজোড়া চোখ মেলে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আবার বুক ভরে নিশ্বাস টেনে আঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করলে ফিরুজা ।

বললে, বড় মিঠা খোশবাই । কি বটে রে উ পাত্রটা ।

সমীরণ হেসে বললে, মদ্ ।

খিলখিল করে হেসে উঠল ফিরুজা ।

—দেখ্ বাবু, ঠিক কথাটাই ভাবছিলাম আমি ! তো ভাবলাম কি আমাদের পচাইটার খোশবাই ভাল লয় ।

—পচাই খাস্ তুই ?

—হ, কত । তা লতুন বাবু, টুকুন দিবি তুদের পচাই । বড় মিঠা লাগছে খোশবাইটা ।

সমীরণ এদিক-ওদিক তাকাল একটা গ্লাসের খোঁজে । এক কোণে একটা মাটির ভাঁড় পড়ে ছিল, ফিরুজা সেটা তুলে নিয়ে কাছে গিয়ে দাঁড়াল ভিক্ষার ভঙ্গিতে ।

বললে, দে টুকুন ।

মাটির ভাঁড়ে ঢেলে দিল সমীরণ ।

এক চুমুকে সেটা শেষ করে আবার ভাঁড়টা ধরল ফিরুজা ।

আবার ঢেলে দিল সমীরণ ।

একটু-একটু করে নেশায় চুর হয়ে গেল ফিরুজা । পা টলতে শুরু করল তার ।

—পড়ে যাবি রে । বলে ফিরুজাকে ধরে খাটের এক প্রান্তে নিয়ে গিয়ে বসাল সমীরণ ।

খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠেই দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল ফিরুজা । পরমুহূর্তেই আবার উঠে বসে দেখলে দুটি কামনাতপ্ত চোখে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সমীরণ ।

লজ্জার হাসি হেসে দুটি হাত আড়াআড়ি রেখে বুক ঢাকবার চেষ্টা করার ভঙ্গিতে সমীরণের দিকে তাকালে সে ।

সমীরণ বললে, আর খাবি ?

—দে টুকুন । লজ্জিত চোখ তুলে তাকাল ফিরুজা ।

আবার ভাঁড় ভরতি করে ফিরুজার হাতে তুলে দিল সমীরণ ।

এক চুমুকে সেটা শেষ করে ভাঁড়টা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল ফিরুজা ।

তারপর নাচের ভঙ্গিতে হাততালি দিতে দিতে গান শুরু করলে । আল্‌ভার কাছে শেখা গান :

এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবের কালে
কোথাকার এক মদন রাজা পানসি বান্ধল ঘাটে

আমি কি করি—

নেশার ঘোরে নাচ আর গান যেন থামতে চায় না তার।

এক ডুব দুই ডুব তিন ডুবের কালে
চুলের মুইঠা ধইরা রাজা উঠায় নৌকার পরে রে।
আমি কি করি—

গাইতে গাইতে খিলখিল করে হেসে বিছানায় লুটিয়ে পরে ফিরুজা।

পরক্ষণেই উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিতে দিতে আবার গাইতে শুরু করে :

আগা নৌকায় ঝামুর ঝুমুর
পাছা নৌকায় ছায়া
ধীরে সুস্থে বাইও নৌকা
আমি পতির ক্রন্দন শুনি রে!
আমি কি করি—

গানের তালে তালে সমীরণও হাততালি দিতে শুরু করে। তা দেখে হেসে লুটোপুটি খায় ফিরুজা। নেশায় টলতে টলতে কখনো সমীরণের বুকের উপর আছড়ে পড়ে।

তারপর কোনোরকমে নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে গায় :

কাইন্দ না কাইন্দ না পতি রে
না কান্দিও আর
ঘরে আছে অষ্ট অলঙ্কার
তুমি আরেক বিয়া কইর রে,
আমি কি করি—

গাইতে গাইতে হঠাৎ চুপ করে ফিরুজা।

অনিমেষ চোখে সমীরণের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করে।

সমীরণের উষ্ণ রক্তেও তখন নেশা ধরে গেছে। ধীরে ধীরে ফিরুজাকে কাছে টেনে নেয় সমীরণ। দুটি সবল বাহুর আলিঙ্গনে বুকে টেনে নেয় সে ফিরুজাকে। তার কোমল নারীদেহের যৌবনছন্দকে যেন বুকের নিবিড়ে নিষ্পেষিত করতে চায়।

পরমুহূর্তেই যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে সমীরণ।

হঠাৎ যেন নেশা ছুটে গেছে ফিরুজার। আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ছটফট করেই সমীরণের কাঁধের ওপর শক্ত কামড় বসিয়ে দিয়েছে ফিরুজা।

যন্ত্রণায় বাহুর বাঁধন শিথিল হয়ে পড়ে সমীরণের।

ছিটকে দূরে সরে আসে ফিরুজা।

ক্রুদ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে খোঁপা থেকে খুনিয়াটা বের করে শক্ত মুঠোয় ধরে কি যেন ভাবে ফিরুজা! তারপর আবার আস্তে আস্তে সেটা খোঁপায় গুঁজে খিলখিল করে সশব্দে হেসে উঠেই ছুটতে শুরু করে।

সমীরণ কপাটের কাছে এসে দাঁড়ায়। দেখে, ছুটতে ছুটতে চলেছে ফিরুজা। আর দূর থেকে ভেসে আসছে তার খিলখিল হাসি।

৯

হাঁপাতে হাঁপাতে মদনার ডেরায় এসে উঠল ফিরুজা। ভরা যৌবনের সঠাম শরীর তার

তখনো কাঁপছে থরথর করে। হয়তো এতখানি ছুটে এসেছে বলে, হয়তো নেশাব আবেশে।

মুখে মদো গন্ধের উগ্রতা, চোখের চাউনিতে কেমন এক উন্মাদনা।

ঊর্ধ্বভাগের ভার বাঁকা কোমরের ওপর ছেড়ে দিয়ে দু-হাত পিছনে রেখে অপরূপ ভঙ্গিমায় এসে দাঁড়াল ফিরুজা, ঠিক যেখানটিতে শুয়ে ছিল মদ্‌না।

ঘরের উঠোনে চাটাইয়ের ওপর দেহ এলিয়ে মদ্‌না একদৃষ্টে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ ফিরুজার ছায়া-ছায়া চেহারাটার দিকে চোখ গেল তাব।

ফিরুজা কাছে এসে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হেসে উঠল।

বললে, কি ভাবছিস্ রে লাগরা?

মদ্‌না সাড়া দিল না। ফিরুজাকে সাঙা করবার জন্য দিনের পব দিন যে-স্বপ্ন দেখেছে সে, আজ হঠাৎ যেন ফিরুজা সে-স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। বিষিয়ে দিয়েছে তার মন। চুরি করেছে ফিরুজা? টিয়ারঙের মানুষ কিনা চুরি করেছে ছুটদিদির শাড়ি?

ফিরুজা ধীরে ধীরে বসে পড়ল মদ্‌নার পাশে। তারপর আবছা অন্ধকারে মদ্‌নার মুখের কাছে তার চোখজোড়া নামিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে মানুষটা সত্যই ঘুমিয়ে আছে কিনা।

মদ্‌না কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, ফিরায় দিছিস্ উটি? মাফি মেগে লিয়েছিস্ বাবুদের?

—হুঁ।

মদ্‌না চুপ করে রইল। কোনো কথা বললে না অনেকক্ষণ।

ফিরুজা একটা হাত রাখল তার বুকের ওপব।

হাতটা সরিয়ে দিল মদ্‌না। বললে, নেশা লাগছে তর, নেশা করছিস্ ফিরুজা!

—হুঁ।

মদ্‌নার পাশে শুয়ে পড়ল ফিরুজা। নাঃ, লোকটার রাগ ভাঙাতে হবে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে অস্ফুটে ডাকলে, মাদোন।

—উঁ। ঘুম-ঘুম চোখে সাড়া দিল মদ্‌না।

ফিরুজা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। ধীরে ধীরে বললে, বিয়াসাঙাটা করবার ইচ্ছে জাগছে রে।

—মিছা কইছিস্।

না রে, মিছা লয়। ইচ্ছার কথাটা কইলাম।

মদ্‌না হাসল।—জবর নেশা লাগছে তর।

হঠাৎ উঠে বসল ফিরুজা।—নেশা লয় রে, নেশা লয়। কথাটা বলবার জন্যে কথা খুঁজল ফিরুজা। এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। বড় ভয় পেয়ে গেছে সে নতুনবাবুকে। মদের নেশায় নতুনবাবুটা যে শয়তানি করতে চেয়েছিল, সে-কথাটা মদ্‌নাকে না বলতে পেলে যেন শান্তি পাবে না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস হারাল ফিরুজা।

কি হবে বলে।

হয়তো মদনা চমকে উঠবে।

বলবে, খুনিয়া ছিল নাই? উয়ার পেটটা ফাঁসায় দিলি না?

বেশ তো, সে-কথা যদি বলে, ফিরুজা হেসে উঠবে খিলখিল করে। মদনাকে চটাবার জন্যেই নয় বলবে, খুন চাপে নাই তো খুনিয়া লিয়ে কি করব। বাবুটা বড় সোন্দর রে মদ্‌না, বড় ভাল উ মানুষটা।

নিজের মনেই হেসে ফেলল ফিরুজা। না, নতুনবাবুর কথাটা বলা চলবে না। মদ্‌নাকে চেনে ও। তাই ভয় হয় বলতে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ফিরুজা আবার বললে, জবাবটা দে কথার?

—তর মানুষটা যদি ডিঙি লিয়ে ফিরো আসে ?

ফিরুজা হেসে বললে, উ কি আর বাঁচে আছে রে, অরে সাগরের মাছে খায়ে লিয়েছে।

—হুঁ। শুধু সাড়া দিল মদ্না। কোনো কথা বললে না।

কিছুক্ষণ পরে ফিরুজা বললে, পেরভাত হলে খবরটা দিয়া দিব। লতুনবাবুরেও কয়ে দিব।

প্রভাত হতে সত্যিই খবরটা জানিয়ে দিল ফিরুজা, দলের সকলের কাছে। এমন কিছু নতুন খবর নয়; দলের লোক, টিয়ারঙের লোক অনেকদিন থেকেই অপেক্ষা করে আছে এ-খবরের জন্যে।

তারাও ধরে নিয়েছে ফিরুজার স্বামী যম্নী-জেলে মাছ ধরতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছে। হয় ডিঙি উলটে মানুষখেকো মাছের মুখে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তার শরীর, আর নয়তো 'মাটির' ডাকুডাঙরদের হাতে পড়েছে।

সে কি আর আজকের কথা!

অতশত হিসেবগুস্তি জানে না টিয়ারঙীরা। ঋতুর পরিবর্তনটুকুই বছরের পর বছর তাদের চোখে পড়ে। হ্যাঁ, অনেকবার শীত বর্ষা এসেছে গেছে তারপর।

যম্নী-জেলে বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই এতদিনে ফিরে আসত। ফিরুজার টানে ফিরে আসত একদিন না একদিন। আর নয়তো তার ছেলে বুধার টানে।

হাবেভাবে চলনে-বলনে মনে হয় যেন ফিরুজার নতুন যৌবন। তার যে সাত বছরের একটা ছেলে আছে, দেখে বোঝা যায় না।

যম্নী হারিয়ে যাওয়ার পরেও কিছুদিন বুধা ছিল তার মায়ের কাছে, ফিরুজার কাছে; কিন্তু ফিরুজার ঘরে আছে তার বুড়ি মা। দুটো মুখের যোগাড় নেই, আবার ছেলেকে খেতে দেবে কি করে সে অপেক্ষা করে করে যখন ফিরল না যম্নী, তখন বুধাকে নিয়ে গিয়ে রেখে এল সে যম্নীর বাপের কাছে।

বললে, তুমার পুতের পুত ও, ভাত দিবার কথা তুমার। যম্নী ফির্যা আসে তো লিয়ে যাব, ডাঙর হলে লিয়ে যাক।

যম্নীর বুড়ো বাপ কোনো কথা বলেনি। ছলছল দুটি চোখ চেয়ে তাকিয়েছে ফিরুজার দিকে। সম্মতিতে ঘাড় নেড়েছে।

সত্যি তো, বেটা তার যখন ফিরল না, তখন নাতিকে তার ভাত দেবে কেন ফিরুজা।

কিন্তু বুড়ো নিজেই বা কি করে ভাত দেবে তাকে। গতর খাটিয়ে মাছ ধরার কিংবা চাষ করাব সামর্থ্য নেই যে তারও।

তবু কোনোরকমে দিন চলছিল বুড়োর। টিয়ারঙীদের সাহায্যে। নাতিটার শক্তি হয়নি কিন্তু দুটো হাত তো আছে। সারাদিন গাছের ছায়ায় বসে বসে দড়ি পাকায় বুড়ো। একটা দিক ধরে থাকে বুধা, আর বুড়ো নারকেল ছোবড়ার দড়ি পাকিয়ে পাকিয়ে বিক্রি করে আসে গঞ্জমাঝিকে। গঞ্জে গিয়ে মাল বেচে আসে যে-মাঝিরা।

সেদিনও এমনি ছায়ায় বসে বসে দড়ি পাকাচ্ছিল বুড়ো। বুধা বসে ছিল পাশেই।

ফিরুজা তরতর করে এসে দাঁড়াল বুড়োর কাছে।

চোখ ঝাপসা হয়ে এসেছে বুড়োর। ভাল দেখতে পায় না। তবু ফিরুজার কাপড়টা পতপত করল চোখের সামনে। বুঝলে, কে যেন এসে দাঁড়িয়েছে।

—কে বটে ? প্রশ্ন করলে বুড়ো।

ফিরুজা উত্তর দিলে, তুমার ছেলার বউ গ, ফিরুজা বটি।

—ফিরুজা ? মুখে একটু যেন হাসি দেখা দিল বুড়োর।—বুড়াটার কথা মনে আসছে ?

—হুঁ।

অস্ফুট একটা শব্দ করল ফিরুজা। তারপর চুপ করে রইল কিছুক্ষণ, পায়ের নখে মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বললে, তুমার মতিটা জানতে আসছি কর্তা, মাদোনটারে সাঙা করব মন লাগছে।

চমকে উঠল বুড়ো। ভাসা ভাসা দুটি চোখ তুলে তাকাল সে ফিরুজার মুখের দিকে। দুটি চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল তার।

ধীরে ধীরে বললে, বুড়া হইছি। দেবতারা ডাকে লিবে যখুন, বুধা বেটাটার কি হবে রে ফিরুজা ?

বলে আন্দাজে বুধার মাথায় গায়ে স্নেহের হাত বোলাতে শুরু করলে বুড়ো।

ছেলের মুখের দিকে তাকাল ফিরুজা। বুধা কিন্তু তার মায়ের মুখের দিকে তাকাতে পারল না। চোখ নামিয়ে নিল, লজ্জায় নয়তো অভিমানে।

ফিরুজার বুকেও যেন লাগল কথাটা। ধীরে ধীরে বুধার কাছে বসে পড়ল ফিরুজা। আদরের ভঙ্গিতে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বললে, বেটাও আমার, বুড়াও আমার। সাঙা করবই কথাটাই কয়েছি মাদোনরে। তুমাদের ফেলায় দিব ক্যানে ?

কথা শুনে মুখেচোখে হাসি দেখা দিল বুড়োর।

ফিরুজাও হাসল। বললে, বুধাটা আর টুকুন ডাঙর হলে বাবুদের কামে লাগবে, মজুরি মিলবে।

বুড়ো কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বললে, তর ইচ্ছাটা যখুন সাঙার পানে গেল, আমি বুড়াটা মানা করব ক্যানে ? হোক্ সাঙা, সাঙা হোক্ তর।

হোক্ সাঙা। কথাটা শুনেই যেন ফুর্তির ফুলঝুরি ফুটে উঠল ফিরুজার মুখেচোখে। হাসিমুখে তরতর করে চলে গেল সে পাকা খবরটা দলের সকলকে জানাতে। একে একে সব ডেরা ঘুরে সকলকে খবর জানিয়ে আল্‌ভার ঘরের সামনে এসে পৌঁছল সে।

দেখলে উঠোনে বসে তাঁত বুনছে আকাশী। এক পাশে একরাশ তুলো, লাটিমভরা রাঙন সুতো কোলে নিয়ে বাঁশের ছোট্ট হাত-তাঁতে কাপড় বুনছে আকাশী। টুক টাক টুক টাক শব্দ হচ্ছে, তারই তালে তালে গুনগুন করছে কি একটা গানের কলি।

উঁকি মেরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে আল্‌ভাকে খুঁজলে ফিরুজা।

তারপর আকাশীকে বললে, গায়েন ভাই আমার গেল কুথায় রে আকাশী ?

চমকে ফিরে তাকিয়ে হাসল আকাশী। চোখের ইশাবায় আল্‌ভাকে দেখিয়ে দিল সে।

ফিরুজা দেখল এক কোণে উনুনে কাঠ ঠেলতে ঠেলতে ফুঁ দিচ্ছে আল্‌ভা। কি ব্যাপার। আল্‌ভা রান্না করছে !

—তাজ্জব করলে গ গায়েন ভাই। ঘর ছাড়ে শেষে ঘর বাইন্ধবার মন লাগছে তুমার ? খিলখিল করে হেসে উঠল ফিরুজা।

আল্‌ভাও হেসে উঠল। বললে, মুখে হাসিটা তোমার বিজলীর পানা চমক দেয় কেন গো টিয়ারানী ? খবর আছে নাকি কিছু ?

বিদেশী আল্‌ভা 'মাটির' মানুষ। টিয়ারঙে হঠাৎ একদিন এসে হাজির হয়েছিল সে ডিঙি নিয়ে। তারপর এই মানুষগুলোকে ভাল লেগে গিয়েছিল তার। তাই এখানেই রয়ে গেছে, মিশে গেছে এদের সঙ্গে। শুধু মুখের ভাষাটাই তার অন্য, কিন্তু মন এক হয়ে গেছে।

স্টিফেন্স সাহেবের মতো আল্‌ভার প্রথম দৃষ্টি পড়েছিল এই ফিরুজার ওপর। ফিরুজার নাম দিয়েছিল টিয়ারঙের রানী। তারপর থেকে ফিরুজাকে ঠাট্টা করে 'টিয়ারানী' বলে ডাকে আল্‌ভা।

ঠাট্টা হলেও কথাটা ফিরুজার ভারী পছন্দ।

বলে, রানী তো বটি গ আমি, টিযাবঙেব রানী আমি। দেখ ক্যানে, তুমার আকাশী সোন্দর।

আল্‌ভা হাসে। বলে টিয়াপাখিটা ব্যঙ্গ কববার পাখি নয ব ফিরুজা। ও যৌবনেও সবুজ বুড়া হলেও সবুজ। ওর মনটা চিরকাল সবুজই থাকে। কিন্তু চক্ষু মেলে যে তুমারে দেখবার লোক নাই।

—তুমি তো আছ গ গায়েন ভাই। তুমি দেখলেই আমার মনটা সবুজ রইবে। হেসে ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলে ফিরুজা।

আল্‌ভা হেসে বলে, উঁহু। আমার হাতে খুনিয়াও নাই, আমার হাতে কোপাইও নাই। বাবা নিয়ে তোমার মানুষটার সাথে যুদ্ধ লড়তে পারব না আমি।

কথা শুনে খিলখিল করে হেসে ওঠে ফিরুজা।

বলে, মানুষটা বাঁচে নাই গ, বাঁচে নাই। তাই তো বুড়াব কাছে মতি জানে আসলাম, মাদোনকেই বিয়াসাঙা করে ঘর বাঁধব মন করেছি।

—হুঁ? সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল আল্‌ভা।

আকাশীও বিস্ময়ের চোখে তাকাল।

তারপর দুজনেই হেসে উঠল আনন্দে। আর আল্‌ভা ছুটে গিয়ে ঘরের মাচা থেকে 'রাবা' নামিযে এনে গান জুড়ে দিলে:

নিশিতে যাইও ফুলবনে, রে মন-ভমবা।
কব কথা প্রাণবন্ধুর কানে, রে মন-ভমবা॥

আকাশীও হাসল আল্‌ভার গান শুনে। কিন্তু ফিরুজার মতো তালে তাল মিলিয়ে সেও গেয়ে উঠল না।

তা দেখে ফিরুজা বললে, তুমার এ মন-ভমরারে বিযা কবে সুখ পাবে না গাযেন ভাই। ই মেয়েটার মন বড় শীতল।

আল্‌ভা হেসে উঠল সশব্দে, আব আকাশী যেন লজ্জা পেল। কিন্তু কথাটা মিথ্যে নয় ফিরুজার। বড় ঠাণ্ডা মেয়ে আকাশী। উদাস উদাস ডাগব দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে, নিঃশব্দে কাজ করে যায়, কোনো কথা বলে না।

না, কথা বলে না আকাশী। সব কথা যেন গুমরে মরে তার মনের আডালে। কি সে-কথা? আল্‌ভা? আল্‌ভার গানের সুর? না তার মরা বাপের জন্যে বাবুদের বিরুদ্ধে ব্যর্থ আক্রোশ?

আল্‌ভা লক্ষ্য করে দেখেছে, বাবুদেব কথা উঠলেই হঠাৎ কেমন যেন জ্বলে ওঠে তাব দু-চোখ। আর চ্যাটার্জি, টিয়ারঙীবা যাকে বড়বাবু বলে, সে যখন বস্তির পাশ দিয়ে মাঝে মাঝে জঙ্গলের পথে শিকার করতে যায় বন্দুক নিয়ে তখন কেমন যেন রহস্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে আকাশী। কি এক দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে।

১০

আদবকায়দায়, ভাবে ভঙ্গিতে সমীরণ পুরোদস্তুর সাহেব হলেও টিয়ারঙেব জীবন যেন এক অদ্ভুত উন্মাদনা এনে দিয়েছে তার মনে।

ভয় পেয়ে পালিযেছিল ফিরুজা। মাতাল পায়ে তাকে ছুটে পালাতে দেখে নেশাব ঘোবে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অট্টহাসে হেসে উঠেছিল সমীরণ। নেশা ছুটে গিয়েছিল পবক্ষণেই। প্রথমটা সেও ভয় পেয়েছিল ফিরুজাকে হঠাৎ খোঁপা থেকে খুনিয়া বের করে

রুখে দাঁড়াতে দেখে। পরমুহূর্তেই হেসে উঠেছিল সে ফিরুজাকে পালাতে দেখে। কিন্তু হাসিটা মাঝপথেই থমকে গেল। মনের মধ্যে তীব্র এক জ্বালা অনুভব করল। যেন হাতের মুঠো থেকে কামনালুব্ধ পাখিটা উড়ে পালিয়েছে।

নেশায় পাওয়া মেয়েটার সুপুষ্ট শরীরের ছন্দ যেন কামনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তার শিরায় উপশিরায়।

টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে অনেকক্ষণ কেটে গিয়েছিল সমীরণের। জ্যোৎস্নার আবছা আলোয় ছুটন্ত নারীর শরীরের ছায়াটা যতক্ষণ দেখা গিয়েছিল অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে দেখেছিল সে।

তারপর একাই বেরিয়ে পড়েছিল সমুদ্রতটের দিকে।

এই বিচিত্র পরিবেশ, টিয়ারঙের এই বিচিত্র মানুষগুলো যেন তার শরীরের রক্তে উষ্ণতা ঢেলে দিচ্ছে। বেরলগা এই আদিম বন্যতার জীবনে কি এক আকর্ষণ আছে, কি এক উন্মাদনা।

টলতে টলতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়ায় সমীরণ। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় মনে হয় যেন পৃথিবীর চঞ্চল জীবন থেকে ছিটকে হারিয়ে গেছে সে। হারিয়ে গেছে নির্জন দ্বীপের নিঃশব্দতায়।

যতদূর চোখ যায় জল আর জল। সীমাহীন সমুদ্রেব অবিরাম তরঙ্গোচ্ছ্বাস। ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ে বালিতটের ওপর। আর পিছনে ঘন অরণ্য। শাল সুঁদরির অন্ধকার রহস্যময় বীভৎস বনের আতঙ্ক। ছোট্ট এইটুকু দ্বীপ টিয়ারঙ, তবু রাতের অন্ধকারে মনে হয় অসীম রোমাঞ্চের স্তব্ধতা। বন আর বন। উঁচুনীচু অসমতল রুক্ষ মাটিও ঢেউয়ের মতোই এঁকেবেঁকে মিলিয়ে গেছে দূরের টিলায়। দ্বীপের পুব-দক্ষিণের সমস্ত সীমারেখাটা দিকচক্রবালের গায়ে একটা নারীর শায়িত শবীরের মতো পড়ে আছে। নারীর শরীর নয়, এক সারি অনুচ্চ টিলা।

সেই টিলার গা বেয়ে, বনের ভিতর দিয়ে বর্ষার সময় একটা ঝরনাধারা এসে পড়ে সমুদ্রে। বৃষ্টির জল জমে জেগে ওঠে একটা বর্ষার নদী। ডিঙিতে চড়ে সে-সময় পারাপার করে টিয়ারঙীরা। লগি ঠেলতে ঠেলতে চলে মেয়েগুলো। ডিঙি বেয়ে কাজ করতে যায় কোম্পানির কুঠিতে। আবার গ্রীষ্মের সময় নালাটা শুকিয়ে যায়, আল্‌ভার কপালের কাটা দাগটাব মতো শুধু একটা সরল স্মৃতিচিহ্নের মতো পড়ে থাকে খালটা।

এই খালেব ধারে ধাবে একটা পায়ে চলাব পথ এগিয়ে গেছে টিযারঙীদের বস্তির দিকে। এই পথ বেয়েই ছুটে পালিয়েছিল ফিরুজা।

সমীরণ খালের ধারে এসে দাঁড়াল।

অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে তখন। একরাশ পুঞ্জীভূত মেঘ ছুটে আসছে দ্রুতবেগে। কালো মেঘের আড়ালে ঢাকা পড়ে গেল সমস্ত আকাশ।

দূরে, অনেক দূরে শুধু টিমটিম করে জ্বলছে টিয়ারঙীদের বস্তির আলো। এদিকের কোম্পানি-মহল একেবারে নিঝুম।

চুপ করে একটা গাছের নীচে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল সমীরণ। একাকিত্বের জীবন যেন দুঃসহ হয়ে উঠছে তাব কাছে। এক-এক সময় তামসীকে মনে পড়ে যায় : নির্জন দ্বীপের বুকে এক টুকরো সঙ্গ। নিঃশব্দ দ্বীপের বুকে এক টুকরো সঙ্গীত। তামসীকে ঘিরে মনে মনে কত না রোমাঞ্চ বুনেছে সে।

একটি নারীর সঙ্গ পাবার জন্যে, একটি উষ্ণ শরীবের কোমল স্পর্শ পাবাব জন্যে যেন উন্মাদ হয়ে ওঠে সমীরণ। ইচ্ছে হয় টিয়ারঙের বন্য আদিমতার মধ্যে ডুবে যেতে, হারিযে যেতে।

ফিরুজা। ফিরুজার সমর্থ শরীরের মাংসল ছন্দের মোহমদির আকর্ষণে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে সে। ন্যায় অন্যায় পাপপুণ্য নয়। আদিম কামনার আগুন জ্বলে উঠেছে তার শরীরে, মনে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পিছন থেকে, বহু দূর থেকে একটা গুনগুনুনি ভেসে এল বাতাসে।

চমকে ফিরে তাকাল সমীরণ।

গানের সুর লক্ষ্য করে দেখলে, দূর থেকে কে যেন এগিয়ে আসছে।

অপেক্ষা করল সমীরণ। ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল গানের সুর, অস্পষ্ট একটা ছায়া এগিয়ে এল।

আল্‌ভা। কি একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে এগিয়ে আসছে। আর তার পাশে পাশে আকাশী।

আল্‌ভা কাছে আসতেই সমীরণ প্রশ্ন করলে, কোথায় চলেছ আল্‌ভা।

আল্‌ভা থমকে দাঁড়াল। বললে, মেঘ দেখছেন না নতুনবাবু। পানি নামবে ঘোর হয়ে। সমুন্দুরে জোয়ার আসবে।

—হুঁ! তা তুমি কোথায় চলেছ? পরক্ষণেই আকাশীর দিকে চোখ পড়ল সমীরণের। বললে, ওটি কে? কি রে মেয়ে, আবার আড়ালে লুকোচ্ছিস কেন? হেসে উঠল সমীরণ।

কথা শুনে আরো লজ্জা পেল আকাশী, আরো বেশি করে লুকোবার চেষ্টা করল আল্‌ভার পিঠের আড়ালে।

আল্‌ভাও হেসে উঠল।—বড়ো শরম বাবু আকাশীর, বাবুদের ডর পায় ও।

একটু থেমে বললে, ডিঙিটা ভাল করে বাঁধা রয়েছে কিনা দেখে আসছি নতুনবাবু, চলেন কেন ডিঙিঘাটকে।

সমীরণ আকাশীর দিকে এক চোখ দেখে নিয়ে বললে, চল। কিন্তু তোমার আবার ডিঙি আছে নাকি আল্‌ভা?

—আছে হুজুর। ডিঙি না হলে মাটিকে যাব কেমন করে বাবু।

আল্‌ভার পাশে সমীরণও তখন চলতে শুরু করেছে।

চলতে চলতেই আল্‌ভা হঠাৎ বললে, আপনারে একটা গোপন কথা বলব হুজুর, কইবেন না অন্য কারেও।

—না বলব না। কি কথা?

আল্‌ভা ইতস্তত করে বললে, ডিঙিটা রাখছি হুজুর মাটিতে যাবার লেগে। আপনার ইস্টিমারে বরং আমারে একবার মাটিতে লয়ে চলেন বাবু।

সমীরণ হেসে বললে, কেন, মাটিতে কি হবে?

এপাশ-ওপাশ তাকাল আল্‌ভা। কেউ আছে কিনা। কেউ না শুনতে পায়। ঠিক যেভাবে সতর্কতার সঙ্গে একদিন সৌমেনকে বলেছিল, সেইভাবে চাপা গলায় বললে, মাটিতে সোনা আছে হুজুর, মাটিতে সোনা আছে।

বুঝতে না পেরে হাসল সমীরণ।

আল্‌ভা আবার বললে, কথাটা গোপন রাখবেন কর্তা, কেবল আপনারেই কইছি।

—কি গোপন কথা আল্‌ভা, বল, খুলেই বল। উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করল সমীরণ।

আল্‌ভা ফিসফিস করে বললে, আমার কাছে একটা নকশা আছে হুজুর.....

—নকশা?

হ্যাঁ, একটুকরো কাগজ, মানচিত্রের মতো আঁকজোক তার গায়ে। মগদের দেশ পার হয়ে কোন গঞ্জের কাছে মাটিতে নাকি ঘড়া ঘড়া হীরে জহরত সোনার মোহর পুঁতে রেখে

পালিয়ে এসেছিল তাদের পূর্বপুরুষ। সেই নকশাটা পেয়েছে আল্‌ভা তার বাপের কাছে থেকে, তার বাপ পেয়েছিল আল্‌ভার বড় বাপের কাছে। কোনোরকমে মাটিতে পৌঁছে এই নকশা দেখে দেখে ঠিক জায়গাটায় পৌঁছলেই সব ফিরে পাবে আল্‌ভা। আল্‌ভা গরিব নয়, আমির সে। তার মতো ধনী আছে নাকি পৃথিবীতে?

কিন্তু নকশাটা বুঝতে পারে না আল্‌ভা, পড়তে পারে না কি লেখা আছে নকশার গায়ে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আল্‌ভা বললে, মুখ্যু মানুষ হুজুর, লিখাপড়াটা শিখায় দেন কর্তা নকশা দেখে দেখে পৌঁছে যাব।

হাসল সমীরণ। পাগল নাকি লোকটা?

না, পাগল নয় আল্‌ভা। এই গুপ্তধনের সন্ধানেই ডিঙি নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়েছিল সে। দিক্ হারিয়ে টিয়ারঙে এসে পৌঁছেছিল। তারপর কেমন করে যেন আটকে পড়েছিল এই ছোট্ট দ্বীপে। টিয়ারঙের বাতাসে কি যেন নেশা আছে। একবার এসে পড়লে আর বাইরে যাবার ইচ্ছে হয় না। মনে হয়, কত না শান্তি। মানুষের জীবনের মতো। এত বড় সমুদ্র, এত মুক্তি। তবু ফিরে ফিরে সেই ছোট্ট এক টুকরো দ্বীপ গড়ে নিতে ইচ্ছে হয়। সেই ছোট্ট এক টুকরো দ্বীপের মধ্যে বন্দী থাকতে ইচ্ছে হয়। শুধু মাঝে মাঝে উন্মাদ হয়ে ওঠে, বুকের কাছে লুকিয়ে রাখা নকশাটা নিয়ে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয় গুপ্তধনের সন্ধানে। মাটির নীচে কোথায় লুকোনো আছে ঘড়া ঘড়া সোনার মোহর। সেই মোহরের লোভে।

আল্‌ভাও তাই নকশার কথা বলতে বলতে পাগল হয়ে ওঠে। চোখ দুটো আশায় আনন্দে জ্বলে ওঠে তার। বলে, যাবেন কর্তা, নিয়ে যাবেন আমারে?

—কোথায়? বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে সমীরণ।

সমীরণ কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই আল্‌ভার পিঠের ওপর দুটো নরম হাতের স্পর্শে চমকে উঠল সে।

আকাশী ফিসফিস করে বললে, তুফান আসছে গায়েন, ডিঙিটা জুয়ারে ভেসে যাবে।

ঝড় আসছে। সত্যিই সমস্ত আকাশ কালো হয়ে উঠেছে, দ্রুতবেগে ঝড় এগিয়ে আসছে। ঠাণ্ডা জলো বাতাসের স্পর্শে তন্ময়তা ভাঙল সমীরণের।

বললে, চল আল্‌ভা, ডিঙিটা বেঁধে আসব।

দ্রুতপায়ে তীরের দিকে হেঁটে চলল আল্‌ভা আর আকাশী। পিছনে পিছনে সমীরণ। পা টলছে তার, আল্‌ভা লক্ষ্য করল।

হঠাৎ এক সময় ফিরে তাকিয়ে আল্‌ভা হাসল।—আপনি ন্যাশা করছেন কর্তা?

—হুঁ।

আবার চুপচাপ হেঁটে চলল তারা।

সমুদ্রের পাড়ে এসে দাঁড়াল সমীরণ।

সোঁ সোঁ করে ইতিমধ্যে ঝড় এসে গেছে। বালির ওপর সোজা হয়ে দাঁড়ানো যায় না। টলে টলে পড়ে আকাশী। বাতাসে উড়ে পড়ে তার ঘাগরা।

এদিকে ফুলে ফুঁসে উঠছে সমুদ্রের ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে উন্মত্ত আক্রোশে। ঢেউয়ের আগে বালির ঝাপটা পড়ছে তীব্র উন্মাদনায়। তীরের উপর সারি সারি ডিঙি পড়ে আছে। জেলেদের জাল টাঙানো আছে বাঁশের গায়ে। ঝড়ের দাপটে ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে চায় জালগুলো।

আশ্চর্য, টিয়ারঙের জেলেরা সারাদিনের খাটুনির পর হয়তো অকাতরে ঘুমোচ্ছে ক্লান্ত হয়ে। ডিঙি বাঁধবার জন্যে, সরাবার জন্যে কেউ ছুটে আসেনি।

ছুটে এসেছে শুধু আল্‌ভা। ডিঙি কেটে গেলে, জোয়ারের ধাক্কায় ডিঙি ভেসে গেলে মাটিতে যাবে কি করে সে! তার সোনার মোহরের ঘড়া পাবে কি করে।

ডিঙিটা টেনে টেনে ওপরে তুলল আল্ভা আর আকাশী। শালের খুঁটিতে বাঁধল শক্ত করে। তারপর একে একে জালগুলো খুলে ঘুমুঙ্গিতে তুলে রাখল। ছোট ছোট ছাউনি, জেলেরা শীত বর্ষায় এই ঘুমুঙ্গির ঘরে এসে রাত কাটায়, ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়ে ডিঙি নিয়ে।

আল্ভা আর আকাশীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমীরণ জালগুলো টেনে তুলতে সাহায্য করল।

ক্রমশ বৃষ্টি নামল অঝোর ধারায়। আকাশ কাঁপিয়ে বাতাস কাঁপিয়ে বৃষ্টি নামল। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকায়। বাজ পড়ে।

কাজ সেরে দ্রুতপায়ে বস্তির পথ ধরল আল্ভা আর আকাশী।

বললে, ঘরকে চলেন কর্তা, বর্ষা নামছে। আর দেরি হলে খালে জল নামবে, পার হতি পারবেন না।

১১

সেদিন ছুটতে ছুটতে পালিয়ে এসেছিল ফিরুজা। নেশা ছুটে গিয়েছিল তার। কিন্তু ফিরে এসে মদ্‌নাকে বলতে পারেনি কথাটা। বহুদিন ইচ্ছে হয়েছে, বলি বলি করেও শেষ পর্যন্ত চেপে গেছে। ভয় হয়েছে, কি জানি কথাটা শুনে না সন্দেহ হয় মদ্‌নার। না মনে করে ফিরুজা পাপ করেছে, ধর্ম হারিয়েছে সমীরণের কাছে। আবার আশঙ্কাও হয়েছে তার। নেশা করিয়ে বেচাল ফিরুজাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল সমীরণ, এ-কথা জানলে হয়তো ধারালো কোপাইটা নিয়েই বেরিয়ে পড়বে মদ্‌না। নতুনবাবুর মাথাটা কুপিয়ে নিয়ে এসে হয়তো ছুঁড়ে দেবে ফিরুজার পায়ের কাছে।

মেয়েদের যেমন খুনিয়া, পুরুষদের হাতে তেমনি কোপাই কুড়ুলের মতো দেখতে কিন্তু ক্ষুরের মতো ধার। বনের ভেতর দিয়ে আনাগোনা করতে হয় টিয়ারঙীদের, হঠাৎ একটা চিতা বাঘ লাফিয়ে পড়লে এই কোপাই কুড়ুলের এক কোপে শেষ করে দেওয়া যায়। তারপর এর ধারাল ফলা দিয়েই চামড়াটা ছাড়িয়ে কাঁধে ফেলে নির্ভয়ে নিজের নিজের কাজে চলে যায় পুরুষগুলো। আবার সমুদ্রে মাছ ধরতে যায় যখন ডিঙি নিয়ে তখনো সঙ্গে সঙ্গে থাকে। হাঙর কি খুনী মাছ ডিঙি তাড়া করলে লম্বা দড়িতে বেঁধে এই কোপাই ছুঁড়ে দেয় জেলেরা। হাঙরের পিঠে বসে যায় কোপাইটা, রক্তের ফিনকিতে লাল হয়ে ওঠে জল। আর যন্ত্রণায় ছুটে বেড়ায় হাঙরটা বঁড়শির সুতোর মতো দড়ি ছাড়তে থাকে জেলেরা, যতটা সম্ভব। তারপর একসময় দড়ি ফুরিয়ে যায়, শেষ প্রান্তটা ডিঙিতে বেঁধে টাল সামলাতে হয়। আর খেপা হাঙরটার টানে বিদ্যুৎগতিতে এঁকে-বেঁকে ছুটতে থাকে ডিঙিটা। শেষে একসময় নির্জীব হয়ে পড়ে হাঙরটা, আর ধীরে ধীরে দড়ি গুটাতে থাকে জেলেরা। পিঠ ভেসে উঠতেই আবার দু-তিনটে কোপাই ছুটে এসে গেঁথে যায় হাঙরের পিঠে।

চিতা মারতেও কোপাই, হাঙর মারতেও কোপাই। মানুষ তো সামান্য ব্যাপার। তাই বড় ভয় পায় ফিরুজা। আর এই ভয়েই গোপন কথাটা কোনোদিন বলেনি সে।

কিন্তু সাঙা হয়ে যাবার পর না বলে পারল না।

সেদিনও সারা রাত ধরে অবিরাম বৃষ্টি আর ঝড়। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকায়, বাজ পড়ে। আর খড়ো চালের ফাঁকি দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। জল আর ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া।

চাটাইয়ের ওপর শুয়ে ছিল ফিরুজা আর মদ্‌না। পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ দুটি স্বাস্থ্যে ভরা শরীর। যৌবনের উদ্দমতা দুজনেরই চোখে। দেহে কামনার ছন্দ।

গভীর আশ্লেষের ঈষৎ তন্দ্রার ফাঁকে ফাঁকে দু-একটি কথা।

এমনি নিবিড় আনন্দের হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলি যেন চকিতে ভেসে ওঠে ফিরুজার চোখের সামনে। এমনিভাবেই অন্তরঙ্গ স্পর্শের শিহরন জাগত সেদিনও।

যম্‌নীর কথা মনে পড়তেই ভয়ে দুলে উঠল ফিরুজার বুক।

ঘুম-জড়ানো চোখে মদ্‌না জিজ্ঞেস করল, কাঁপন লাগছে তর, ফিরুজা?

মদ্‌না ভাবলে বৃষ্টির ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটাতেই বুঝি কেঁপে উঠেছে ফিরুজা।

ফিরুজা প্রথমটা উত্তর দিল, না। তারপর ধীরে ধীরে বললে, ডর লাগছে রে মাদোন, এমন সুখটা সয় কি না সয়।

হাসল মদ্‌না, তৃপ্তির হাসি। মুখটা তার ফিরুজার মুখের উপর ধরল।

—সাঙার-মানুষটা তরে সুখ দিছে।

—খু-উ-ব। মন কইছে, যৈবনটা পূরণ হল। কিন্তু বড় ডর লাগে রে…

—ক্যানে?

—ভাবন লাগছে কি যম্‌নী মানুষটো যদি আসে দেখে তার ফিরুজা সাঙা করছে…

মদ্‌না হেসে উঠল সশব্দে। বললে, ডর নাইরে ফিরুজা ডর নাই। যম্‌নী জেলেটো ফির‍্যা আসে তো ছাড়ে দিব তরে। তার বুকেই শুয়া থাকিস তুই।

—উঁহু। আপত্তি করে ফিরুজা। বলে, তরে ছাড়ে দিয়ে যম্‌নীর ঘরকে ফিরতে নারব আমি।

—ক্যানে?

—তর ঘামটা পদ্ম লাগে রে, অর ঘামটা পঙ্ক লাগে। বলে খিলখিল কবে হেসে উঠল ফিরুজা। স্বতঃস্ফূর্ত হাসিটা যেন বিদ্যুতের চমক দিল।

মদ্‌না হেসে বললে, তবে ডর করিস না, কোপাই দিয়ে যম্‌নীব মাথাটা…

শিউরে উঠে বসল ফিরুজা। হাতে মুখ চাপা দিল মদ্‌নার। বললে, না মাদোন, এই কামটা পাপ বটে। আমি যম্‌নীর বিবি বটি, বাঁচে থাকলে বিবি, মরে যালেও বিবি। আমার যৈবনটা তর বটে মাদোন ধরমটা অর।

কথাটা ঠিক যেন বুঝল না মদ্‌না। ও শুধু আরো গাঢ় আলিঙ্গনে কাছে টেনে নিল ফিরুজাকে।

ফিরুজা তার নরম শরীরটা মদ্‌নার সক্ষম দেহের কাছে এনে সোহাগ-ভরা কণ্ঠে বললে, কোপাই দিয়া তুই মানুষ মারতে নারবি কথা দে মাদোন। কথা দে তুই।

—তর ইচ্ছাটাই কথা হল, এত ডরাস ক্যানে।

ফিরুজা হেসে বললে, তর কোপাইটারে বড় ডর লাগে, গোপন কথাগুলাও তাই কইতে ডর লাগে।

—কি কথাটা বটে? হাসল মদ্‌না।

ফিরুজা মৃদু হেসে চুপ করে রইল একটুক্ষণ। ভাবলে, বলবে কিনা কথাটা। এমন অনেকবার ভেবেছে ও। কিন্তু বলতে পারেনি।

তামসীকে দেখে মদ্‌না একদিন বলেছিল, ছুটদিদিটারে বড় সোন্দর দেখায় রে, টিয়ারঙের মেয়েগুলান ছুটদিদির পানা সোন্দর লয়। সে-কথা শুনে আহত বোধ করেছিল ফিরুজা। সে জানে, তামসীর মতো রূপসী মেয়ে সত্যিই নেই টিয়ারঙীদের মধ্যে। তবু মদ্‌নার মুখে যেন শুনতে চায়নি কথাটা। তাহলে মদ্‌নার চোখে ফিরুজাই সবচেয়ে সুন্দর নয়? নিজের মনকে প্রবোধ দিয়েছিল ফিরুজা, তামসীর বেশটাই তাকে সুন্দর করে তুলেছে। ছুটদিদির মতো দামী রঙিন কাপড় পরলে ফিরুজাকে আরো সুন্দর দেখাবে। তাই শাড়িটা চুরি করে এনে লুকিয়ে পড়েছিল ফিরুজা। ইচ্ছে ছিল, এই পোশাকে তাকে দেখে মদ্‌না বলবে, ফিরুজা ছুটদিদির চেয়েও সুন্দর।

কিন্তু, না, সেদিকে চোখ পড়েনি মদ্‌নার। ও শুধু চুরিটাই দেখেছিল, ভেবেছিল টিয়ারঙীদের ইজ্জতের কথা।

শাড়ি ফেরত দিলেও আঘাতটা ভুলতে পারেনি ফিরুজা। কোনোরকমে নিজের রূপকে ছুটদিদির চেয়ে সুন্দর প্রমাণ করার জন্যে খোঁপায় ফুল জড়িয়েছে সে, চেয়ে-আনা আতর মেখেছে, রোজের মুজরি বাঁচিয়ে জলে-ভাসা সাবান কিনেছে।

কিন্তু কিছুতেই এই একটা কথা শুনতে পায়নি সে মদ্‌নার কাছে, যে-কথাটা শুনলে শান্তি পেত, তৃপ্তি পেত।

তারপর নতুন বাবুর কাছ থেকে পালিয়ে এসে সেদিনের সেই দৃশ্যটুকু মনে মনে ভাবতে ভাবতে খুশিতে আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে সে।

নতুন বাবু তাকে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিল। ভাঁড়ের পর ভাঁড় মদ খেতে দিয়েছিল তাকে।

ছুটদিদি যদি তার চেয়ে সুন্দর হত তাহলে কি টিয়ারঙের নোংরা মেয়ে ফিরুজাকে এমনভাবে কাছে টানতে চাইত নতুনবাবু!

সমীরণ যে তাকে মদ্‌নার মতো করেই কাছে পেতে চায় এটা যেন গর্বের কথা। মদ্‌নাকে সে-কথাটা বার বার জানাতে চেয়েছে ফিরুজা। ভেবেছে, এ-কথা শুনলে মদ্‌না বুঝবে ছুটদিদির চেয়েও সে কত সুন্দর। শুধু বলতে পারেনি এই ভয়ে যে মদ্‌না সন্দেহ করবে, সে সত্যিই বুঝি পাপ করেছে।

তবু শেষ পর্যন্ত না বলে পারল না।

বললে, তার কোপাইটারে বড় ডর লাগে, গোপন কথাগুলাও তাই কইতে ডর লাগে।

—কি কথাটা বটে? প্রশ্ন করলে মদ্‌না।

ফিরুজা হেসে বললে, তর চখে ছুটদিদিটা সোন্দর বটে, কিন্তুক লতুন বাবুটা কয় ফিরুজা ছুটদিদির চেয়েও সোন্দর।

—মাটির লোক বটে লতুন বাবু, অরা মিছা কয়।

ফিরুজা ঈষৎ রাগের কণ্ঠে বললে, মিছা লয় রে মিছা লয়। লতুন বাবু আমারে সাঙা করবে কয়েছিল।

বাজের আওয়াজ শুনেও এমন করে চমকে ওঠে না মদ্‌না। কথাটা চাবুকের মতো তার পিঠে পড়ল যেন। চন্ করে রক্ত উঠে গেল মাথায়।

উঠে বসল মদ্‌না, একদৃষ্টে তাকিয়ে দেখল ফিরুজার মুখের দিকে।

তা দেখে সশব্দে খিলখিল করে হেসে উঠল ফিরুজা।

বললে, মিছা কথাটা শুনে তড়াক করিস ক্যানে?

—মিছা বটে? একমুখ হেসে ফেলল মদ্‌না।

না, সত্যি নয় কথাটা। ছুটদিদির সঙ্গে নতুন বাবুর ভাবসাব দেখেছে মদ্‌না। ছুটদিদির মতো সুন্দর মেয়েকে ছেড়ে টিয়ারঙের জংলা রূপকে ভালবাসবে কেন সে!

তবু সাবধান করবার জন্যেই মদ্‌না বললে, বাবুরা মানুষ ভাল লয় রে ফিরুজা। মানুষ ভাল লয়।

মানুষ যে ভাল নয় তা ফিরুজা জানে। তবু কেমন একটা মোহ আছে বাবুদের কথায়-বার্তায় কি এক আকর্ষণ। মনে হয়, বাবুরা অনেক সুখে আছে। তাদের মতো কষ্টের জীবন নয়। রাজামানুষ বাবুরা, কত টাকা তাদের। কত শাড়ি-গয়না। এক একসময় ফিরুজার মনে হয় সে ছুটদিদির মতো হতে পারত, কিংবা তাপুদিদির মতো! এমন নোংরা খড়পাতার ঘরে রোদেজলে কষ্ট পেতে হত না।

এমনি সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়ল ফিরুজা।

এদিকে সারারাত বৃষ্টি আর ঝড়। থেকে থেকে বিদ্যুৎ চমকায়, কড় কড় করে বাজ পড়ে। ঘুমের ফাঁকেই চমকে চমকে ওঠে ফিরুজা।

কিন্তু সকালবেলার জন্যে এমন একটা চমক অপেক্ষা করে আছে জানত না সে।

চিৎকার হট্টগোলে ভোর বেলাতেই ঘুম ভেঙে গেল তার।

আকাশী চিৎকার করে ডাকছে তাকে।—ফিরুজা, ফিরুজা।

ধড়মড় করে উঠেই বাইরে বেরিয়ে এল সে। দেখলে উত্তেজনায় আশঙ্কায় থরথর করে কাঁপছে আকাশী।

—কি হয়েছে রে আকাশী, চেঁচাস ক্যানে?

কোনো উত্তর দিল না আকাশী। ফিরুজার হাতখানা ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। বললে, জল্‌দি আয় ফিরুজা, জল্‌দি আয়।

সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকাল ফিরুজা। কানে কানে কি যেন বললে আকাশী, আর আকাশীর সঙ্গে একরকম ছুটতে ছুটতে চলল সে সমুদ্রের পাড়ের দিকে।

সারারাত বৃষ্টি হয়ে গেছে অবিরাম। নালাটা জলে থইথই করছে জোয়ার আসা নদীর মতো।

পাড় থেকে একটা ডিঙি খুলে নিয়ে ফিরুজা আর আকাশী স্রোতে ভাসিয়ে দিল। খাল পার হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছল বালির ওপর।

ঝড়ের চিহ্ন পড়ে আছে তীরের গায়ে। ছোট ছোট ঘুমুঙ্গিঘরগুলো ভেঙে পড়েছে, চালার খড় পাতা উড়ে গেছে এখানে সেখানে। ডিঙিগুলো উলটে গেছে, ছিটকে পড়ে আছে দূরে দূরে।

কিন্তু...

দূর থেকেই দেখতে পেল ফিরুজা। একটা লোক বালিতে মুখ গুঁজে পড়ে আছে মড়ার মতো।

বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল ফিরুজার। মরে যায়নি তো লোকটা।

না, মরেনি। মুখটা তুলে ধরতেই সেটা ধপ করে পড়ে গেল আবার বালির ওপর।

আর সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে কেঁদে উঠল ফিরুজা।

যম্‌নী। তার সেই হারিয়ে-যাওয়া স্বামী যাম্‌নী-জেলে ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে।

আকাশী বললে, কাঁদিস ক্যানে, মানুষটারে বাঁচাতে হবে নাই?

নাকের কাছে হাত রেখে দেখলে ফিরুজা, বুকের ওপর কান পাতল। না বেঁচে আছে মানুষটা, বেঁচে আছে।

আকাশী ছুটে গেল জল আনতে। মুখে-চোখে ঝাপটা দিলে জ্ঞান ফিরবে। অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে শুধু মরেনি।

ফিরুজা ভাল করে তার দিকে তাকাল এবার। নীল রঙের প্যান্ট, গায়ে একটা সবুজ কুর্তা।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ দূরে একটা অচেনা ডিঙি দেখতে পেল ফিরুজা। উলটে পড়ে আছে বালির ওপর। নতুন ডিঙি। কই, এ-ডিঙি তো টিয়ারঙীদের নয়।

তবে কি এই ডিঙি করেই আসছিল যম্‌নী? সমুদ্রের তুফানের মধ্যে পড়ে তীরে এসে ভিড়েছে?

নালার মিঠা জল নিয়ে ফিরে এল আকাশী। চোখে-মুখে ঝাপটা দিতেই কয়েক মুহূর্ত পরে জ্ঞান হল যম্‌নীর। একটু একটু করে চোখের পাতা খুলল।

অস্ফুটে বললে, নাচনী!

আকাশী আর ফিরুজা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।

নাচনী আবার কে ?

১২

একে একে সবাই ভিড় করে এল ফিরুজার হারিয়ে-যাওয়া মানুষটার চারপাশে। যম্‌নী জেলে ফিরে এসেছে, এত বছর বাদে ফিরে এসেছে লোকটা। এত বড় খবর অনেকদিন শোনেনি টিয়ারঙীরা।

কিন্তু লোকটার হাবভাব, কথাবার্তা, পোশাকপরিচ্ছদ সবই যেন বদলে গেছে।

কোথায় ছিল সে এতদিন ?

যম্‌নী হাসে প্রশ্ন শুনে, আর তার বিচিত্র ভাষায় বলে তার অভিজ্ঞতার কাহিনী।

ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছিল বটে যম্‌নী জেলে, তারপর পথ ভুল করে চলে গিয়েছিল মাটিতে। সেখান থেকে গঞ্জে। তারপর এক নাচের দলে নাম লিখিয়েছিল।

যম্‌নীর বুড়ো বাপ ফো্‌কলা দাঁতের হাসি হেসে বলে, জেলের বেটা তুই, নাম লিখালি লাচের দলে ?

যম্‌নী হাসে। বলে, খুবসুরত একটা নাচনী ছিল, ও লেড়কিটা বললে নাচের পাটিতে নাম লিখাতে তো নাম লিখালাম।

টিয়ারঙীরা হাসে সে-কথা শুনে। বুড়ো বাপটাও তার হাসে।

এরই ফাঁকে বুধা এসে দাঁড়াল কাছে।

বুড়ো বললে, মরদ হয়েছে তর বেটাটা, দেখরে যম্‌নী।

যম্‌নী বুঝতে না পেরে এপাশ-ওপাশ তাকালে।

টিয়ারঙীরা হেসে উঠল হো হো করে। অর্থাৎ বুধাকে চিনতে পারছে না তার বাপ। কি করে চিনবে ! বেশ বড়সড় হয়েছে যে ছেলেটা। যম্‌নী চলে যাওয়ার পর কত বছর পার হয়ে গেছে, কে হিসেব রেখেছে তার।

বুড়ো টেনে এনে সামনে দাঁড় করাল বুধাকে।

এই এতবড় হয়েছে তার ছেলে ? চমকে উঠল যম্‌নী।

তারপর ধীরে ধীরে বলল, ফিরুজা কাঁহা গেল ? বাচ্চার মা ?

তাই তো, গেল কোথায় ফিরুজা ? আকাশীর সঙ্গে সেই তো পাড় থেকে তুলে এনেছিল যম্‌নীকে। তারপর গেল কোথায় ?

সবাই এদিক ওদিক দেখল। না আসেনি ফিরুজা।

শুধু আকাশী বললে, উ ঘরকে গেছে।

বুড়ো হাসল নিজের মনেই। তারপর ছেলেকে বললে, উ ফিরুজার পানে লজর দিয়ে কাম নাই তর। মদ্‌নার সাথে সাঙা হয়েছে ফিরুজার।

—হাঁ ? সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে সশব্দে হেসে উঠল যম্‌নী।—হামি শালা নাচনীর পাটিতে চলে গেলাম তো উ শালীভি নাচ লাগাল ?

যেন কত বড় রসের কথা, এমনভাবে হেসে উঠল যম্‌নী। সবাই বিস্মিত হল। এতবড় একটা ঘটনাকে এত সহজভাবে নেবে সে, কেউ ভাবতেও পারেনি।

কে বলে উঠল, তা যম্‌নী ভাই, লাচের দলে ছিলে তো একটা লাচ দেখাও ক্যানে।

—হাঁ, হাঁ, জরুর দিখাবে, নাচ নেহি, ডান্স দিখাবো। বলেই উঠে দাঁড়াল যম্‌নী।

টিয়ারঙীরা হইহই করে উঠল। আল্‌ভার ডাক পড়ল।

—আল্‌ভারে ডাক, আল্‌ভা। বলল সবাই।

লজ্জিত মুখে রাবা হাতে এগিয়ে এল আল্‌ভা। একপাশে দাঁড়িয়ে রাবার তারে টুংটাং ধ্বনি তুলল। মিষ্টি মধুর জলতরঙ্গের সুর যেন।

নাচতে শুরু করল যম্‌নী। দু-পাক ঘূর্ণি দিয়েই থমকে দাঁড়াল। বললে, জুড়ি কাঁহা ? জুড়ি নাই তো নাচ নাই।

বলেই ভিড়ের মধ্যে জোয়ান মেয়েগুলোর দিকে তাকালে।

আকাশীও দাঁড়িয়ে নাচ দেখছিল হাসতে হাসতে।

ভিড়ের মধ্যে থেকে হঠাৎ তাকে হাত ধরে এক ঝটকায় টেনে নিল যম্‌নী। তারপর উদ্দাম বেগে নাচতে শুরু করল। কৌতুকের হাসি হেসে তালে তালে পা ফেলে যম্‌নীর জুড়ি হবার চেষ্টা করল আকাশী।

দেখতে দেখতে ওস্তাদ নাচনীর মতো নাচতে শুরু করে দিল আকাশী। নেশা জেগে উঠল যেন তারও।

উদ্দাম হয়ে উঠল টিয়ারঙীর দল।

অনেকক্ষণ পরে নাচ থামল। সাবাস দিল আল্‌ভা। মদের ভাঁড় এনে হাজির করল টিয়ারঙীরা।

আর দূরে দাঁড়িয়ে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখল ফিরুজা।

লজ্জায় কাছে এগিয়ে আসতে পারেনি সে। ভয় পেয়েছে।

মদ্‌নাকে সাঙা করেছে সে এ-খবর শুনে রাগে জ্বলে উঠবে যম্‌নী, মনে হয়েছিল তার। ভেবেছিল, হয়তো রেগে গিয়ে কোপাই নিয়ে ধাওয়া করে আসবে তাকে।

মনে মনে অনেক কিছু ঠিক করে রেখেছিল ফিরুজা কি বোঝাবে যম্‌নীকে। কি করে ঠাণ্ডা করবে।

প্রয়োজন হলে মদ্‌নাকে ছেড়ে দিয়ে আবার যম্‌নীর সঙ্গেই ঘর করবে ভেবেছিল। যম্‌নীর বুড়ো বাপ আর তার বুধাকে নিয়ে এসে সংসার বাঁধবে নতুন করে।

কিন্তু যম্‌নী এমনভাবে ঘা দেবে তার বুকে ভাবেনি ফিরুজা।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখল সে। দেখল, ফিরুজার কোনো খোঁজই করল না। একটা বাচ্চা মেয়ে এক ফাঁকে এসে খবর দিয়ে গেল ফিরুজাকে। বললে, তার সাঙার খবর শুনে নাকি হো হো করে হেসেছে যম্‌নী।

তবু হয়তো সহ্য করতো ফিরুজা। বছরের পর বছর তার হারিয়ে-যাওয়া স্বামীর অপেক্ষা করছে কি এই জন্যেই ? দিনের পর দিন সাঙার অনুরোধ জানিয়েছে মদ্‌না, আর যমনী আবার ফিরে আসবে ভেবেই না মদ্‌নার কথায় রাজি হয়নি সে। হারিয়ে-যাওয়া মানুষটার কথা ভেবেই তো আধেক যৈবন কেটে গেছে তার।

অথচ সে-মানুষটা তার কথা একেবারেই ভুলে গেছে।

হঠাৎ আকাশীর হাত ধরে এক ঝটকায় তাকে কাছে টেনে নিয়ে যখন নাচতে শুরু করল যম্‌নী, তখন তার চোখের মধ্যে কি যেন দেখতে পেল ফিরুজা। দেখল, আকাশীর চোখেও রঙ লেগেছে।

রাগে দুঃখে অপমানে সমস্ত শরীর যেন জ্বলে উঠল। এই লোকটার কথা ভেবেই কিনা সাঙার দিনটা পিছিয়ে পিছিয়ে দিয়েছে ফিরুজা।

হঠাৎ মনের ভেতরটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগল। তার চোখে রঙ লাগিয়েছে মদ্‌না। নতুন সংসার পেতেছে সে, অনেক স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু যম্‌নীকে তো একেবারে ভুলে যায় নি। ফিরুজার মনের কোণে কোথায় একটু দুর্বলতা যেন লুকিয়ে ছিল। ভাবতে ভাল লাগত যে স্বামী তার বেঁচে নেই. বেঁচে থাকলে এখনো তার কথাই মনে পুষে রেখেছে। তাই

আকাশীর কোমর জড়িয়ে ধরে উদ্দাম বেগে যম্‌নীকে নাচতে দেখে মনে জ্বলে উঠল ফিরুজা।

মদ্‌না অবশ্য দেখেশুনে খুশিই হল। প্রথম কয়েকটা দিন একটু ভয়ে ভয়ে, অস্বস্তির মধ্যে কাটাল।

শেষে বললে, মিছা মিছা ডর করিস রে ফিরুজা, উ যম্‌নী মানুষটা সব ভুলে গেছে।

কথাটা সান্ত্বনা দেবার জন্যেই বলল মদ্‌না। কিন্তু চিমটির মতো লাগল ফিরুজার।

বললে, আকাশীর চোখে রঙ লাগছে রে, অখন আকাশীর রঙে মাতেছে মানুষটা।

সত্যই তাই। আকাশী যেন মেতে উঠেছে যম্‌নীকে দেখে, আর আকাশীকে দেখে মেতে উঠেছে যম্‌নী।

আল্‌ভা সেই আগের মতোই এখানে ওখানে বসে রাবা বাজায়, গান গায় আর আকাশী ছুটে বেড়ায় সারা টিয়ারঙ। কোম্পানি-মহল, কুলিদের বস্তি, বাবুদের বাংলো।

যম্‌নীকে আকাশী বলে, কোম্পানির কাজ লাও তুমি।

—কাজ লেগা ? টাইমকা কুলি ? আরে ছোড়, নাচ দিখাবো, বহুৎ পয়সা মিলবে নাচ দিখালে।

আকাশী হাসে হো হো করে।—পয়সা দিবে লাচ দেখে ?

বিশ্বাস হয় না যেন তার।

যম্‌নী রেগে যায় তার অবিশ্বাস দেখে। রিঠের ঘুঙুর আর ঢোলক বানায়।

তারপর আকাশীকে ডাকে। বলে, চল্‌ নাচ দিখাবো বাবুলোগদের।

আকাশীকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হয় কোম্পানি-মহল। ঢোলক বাজাতে বাজাতে নাচ শুরু করে যম্‌নী। যম্‌নী আর আকাশী।

উদ্দাম যৌবনের ছন্দ নেচে ওঠে। ঘূর্ণির মতো উড়ে পড়ে আকাশীর রঙিন ঘাগরা আর রিঠের ঘুঙুরে শব্দ হয় ঝুম ঝুম ঝুম ঝুম।

চিৎকার করে ওঠে কুলিমজুরের দল। রসিকতা করে, অশ্লীল রসকিতা। আর তা শুনে হাসে যম্‌নী, হাসে আকাশী।

ঝনঝন করে পয়সা পড়ে ওড়নার আঁচলটা পেতে দাঁড়াতেই।

ঘরে ফেরার পথে পয়সা গুলো গুনতে গুনতে মুগ্ধ হয়ে যায় আকাশী। নাচের দাম এত বেশি ? সারাদিন খেটে যা না পায় এক ঘণ্টা নাচ দেখিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে আকাশী।

পয়সাগুলো তুলে নিয়ে হিসেব করে যম্‌নী, তারপর আধাআধি করে ভাগ করে নেয় দুজনে।

ভাগের পয়সাগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করে আকাশী, আর খিলখিল করে হেসে ওঠে।

বলে, এতগুলান পয়সা, দেখে খুশি হবে গায়েন।

যম্‌নীর কানে যায় না সে-কথা। নিজের পয়সাগুলো কুর্তার পকেটে ভরে বলে, ভাঁটিতে চল্‌। দারু পিয়ে আসবো।

কোম্পানি-মহলের মদের দোকানে মদ খেতে যাবে যম্‌নী।

হাত ধরে টানে সে আকাশীকে।

আকাশী হেসে হাত ছাড়িয়ে নেয়। বলে, ঘরকে চলো না, মদ আমার ঘরকে আছে।

—আরে দূর্‌। যম্‌নী হাসে। বলে, দুকানের নম্বর ওয়ান দারু পিয়ে দেখবি বহুৎ নেশা হয়।

শেষে আকাশীকে ছেড়ে দিয়েই মদের দোকানটার দিকে চলে যায় যম্‌নী। আর আকাশী

খুশি মনে পয়সাগুলো বার বার গুনতে গুনতে ঘরের পথ ধরে।

এসে দেখে আল্‌ভা চুল্লীতে আগুন জ্বলাবার চেষ্টা করছে। ধোঁয়ায় চোখ ভরতি জল তার।

তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই রান্নার যোগাড় করবার জন্যে এগিয়ে যায় আকাশী। বলে, আজ নাচ দেখিয়ে কত পয়সা মিলেছে আল্‌ভা, বাবুরা দিয়েছে, মজুররা দিয়েছে।

বলে পয়সাগুলো আল্‌ভার হাতে দেয়।

ধোঁয়ায় জ্বালা-করা জলে-ভরা দুটো চোখ দুর্বোধ্য বিস্ময়ে ক্ষণকাল তাকিয়ে থাকে আকাশীর দিকে।

তারপর হঠাৎ রাগে জ্বলে ওঠে আল্‌ভার শরীর।

পয়সাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় আল্‌ভা।

বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে আকাশী।

আল্‌ভাও রাগে? আল্‌ভার শরীরেও রাগ আছে?

১৩

সত্যিই বুঝি আকাশীকে ভালবেসে ফেলেছে আল্‌ভা। টিয়ারঙের ঠান্ডা মেয়ে আকাশী, তার রূপের মোহেই কি পড়ে অছে লোকটা?

একদিন ডিঙি নিয়ে সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছেছিল আল্‌ভা। গঞ্জে গিয়ে পৌঁছনোর বদলে টিয়ারঙের দ্বীপে এসে ঠেকেছিল তার ডিঙি। তারপর হাতে 'রাবা' নিয়ে তিনতারের মিঠে সুরে সুর মিলিয়ে টিয়ারঙীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। মাটিতে ফিরে যেতে পারে নি। হয়তো আকাশীর শান্ত রূপের মোহময় আকর্ষণেই টিয়ারঙে থেকে গিয়েছিল সে।

হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখেছিল আল্‌ভা। আকাশীকে নিয়ে ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখেছিল। হয়তো ঘরের টানেই বাঁধা পড়ত সে। কিন্তু এমন যে হবে কোনোদিন কল্পনাও করে নি আল্‌ভা। ভাবতে পারেনি ফিরুজার হারিয়ে-যাওয়া মানুষটা এমনভাবে হঠাৎ একদিন ফিরে আসবে। ফিরে এসে তার থেকে আকাশীকে কেড়ে নেবে।

আকাশীকে সত্যিই বুঝি কেড়ে নিতে চলেছে যম্‌নী। দিনের পর দিন সহ্য করে যায় আল্‌ভা। বোবা দুঃখের দুটি চোখ মেলে সব দেখে সে, সব সহ্য করে।

প্রথম প্রথম বাধা দিতে চায়নি আল্‌ভা। আহা, অনেক দুঃখ মেয়েটার। আল্‌ভার চোখের সামনেই তো বাবুদের বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে আকাশীর বাপ মাধো সর্দার। অসহায় মেয়েটা তখনো বাবুদের কাছে ছুটে যায়নি টাকার লোভে, পাপ করেনি। তার বদলে তার চেয়েও অসহায় এই আল্‌ভার কাছেই ফিরে এসেছিল, তাই চোখের সামনে সব কিছু দেখেও দেখে না আল্‌ভা। ভাবে, হয়তো তার চোখের ভুল, তার মনের অবিশ্বাস।

প্রথম যেদিন যম্‌নীকে সবাই নাচ দেখাতে বলেছিল সেদিন ভিড়ের থেকে আকাশীকে জুড়ি হবার জন্যে যখন টেনে নিয়েছিল যম্‌নী, তখন আল্‌ভা খুশিই হয়েছিল। কিন্তু সেই প্রথম দিনেই যে আকাশীর ঠাণ্ডা রক্তে এমন উষ্ণ নেশা জাগিয়ে দিয়েছে যম্‌নী, তা সে ভাবতে পারেনি। তারপর অনেকগুলো মাস কেটে গেছে, কিন্তু নেশা ছাড়তে পারেনি আকাশী।

নির্বাক দুটি চোখ মেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছে আল্‌ভা। দেখেছে, যম্‌নীর সঙ্গে নাচবার সময় আকাশীর সারা মুখ যেন খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে। যম্‌নীর ডাক এলে একটা মুহূর্তও যেন অপেক্ষা করতে পারে না, ছুটে যায় আকাশী। তবে আল্‌ভাকে ভুলে গেছে সে ? তবে কি যম্‌নীর নাচের ঘূর্ণিতেই নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায় !

কে জানে। হয়তো মনের ভুল। হয়তো চোখের বিভ্রম।

মনকে বোঝাবার চেষ্টা করে আল্‌ভা ; নাচের নেশা জেগেছে আকাশীর রক্তে, যম্‌নীর নয়।

সারাদিন নাচ দেখিয়ে যখন রাতের অন্ধকারে ফিরে আসে আকাশী তখন ভাতের থালাটা এগিয়ে দেয় আল্‌ভা. বলে তুমার লেগে বসে আছি সেই সাঁজবেলা থেকে।

—উ আমি খায়ে আস্‌ছি বাবুদের দুকানে। বলে থালাটা সরিয়ে দেয় আকাশী।

আল্‌ভার চোখের কোণ দুটো চিকচিক করে ওঠে কিনা খবর রাখে না সে। নিজের মনেই গল্প করতে শুরু করে। কোন বাবু কি বলেছে তার নাচ দেখে, নাচ দেখিয়ে কত পয়সা পেয়েছে সে। যম্‌নী নাকি বলেছে, গঞ্জে নিয়ে যাবে তাকে, নাচ দেখাবে সেখানকার হাটে-বাজারে। অনেক পয়সা মিলবে।

শোনে আল্‌ভা। চেষ্টা করে মুখে হাসি টেনে আনতে, এমন ভাব দেখায় যেন আকাশীর ফুর্তিতে তারও আনন্দ।

সেই একটা দিনই সে আকাশীর নাচের পয়সাগুলো রাগে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তারপরই অনুতপ্ত হয়েছিল আল্‌ভা। ক্ষমা চেয়ে বলেছিল, আমার মনটা বিষায় ছিল রে আকাশী।

বলে হাসিহাসি মুখে তাকিয়েছিল সে আকাশীর দিকে। কিন্তু আকাশী হাসতে পারেনি। আল্‌ভার শরীরে রাগ দেখে বরং খুশিই হয়েছিল সে।

নাচের নেশা অবোধ্য নেশা, জানে আকাশী। আর জানে তার চেয়েও বড় নেশা পয়সার নেশা। এ-আকর্ষণ থেকে নিজেকে সরিয়ে আনার ইচ্ছে হয় তার, সরিয়ে আনার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না।

যম্‌নী যখন এসে হাজির হয়, তার বিচিত্র ভাষায় যখন ডাক দেয়, নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না আকাশী। ছুটে যায়।

কিন্তু আল্‌ভা কেন পথ আটকে,দাঁড়ায় না। কেন বলে না, না যেতে দেব না তোকে। তা নয়, লোকটা শুধুই বসে বসে রাবা বাজায় আর মোহরের গল্প করে।

ঘাগরা উড়িয়ে একটা পাক দিলেই ঝনঝন করে একরাশ পয়সা পড়ে আকাশীর আঁচলে। সে-পয়সায় যা খুশি কেনা যায়। ছুটদিদির মতো শাড়ি, গয়না। আর তার চেয়েও বড় আকর্ষণ—মদ। পচাই নয়, বাবুবাংলোর ওপারে কোম্পানি-মহলের দোকানে পাওয়া যায় এ-মদ। বড় জবর নেশা হয়।

শুধু কি মদের নেশা, না মানুষটারও!

মাঝে মাঝে সাবধান করে দিতে আসে ফিরুজা।

ইতিমধ্যে একটি ছোট্ট মেয়ে এসেছে তার কোলে। মেয়েকে কোলে নিয়ে এসে দাঁড়ায় সে। বলে, সোনার লেশায় পাগল হয়ো না গায়েন ভাই, তুমার ঘরের সোনাটারে ঘরে আনো।

শুনে হাসে আল্‌ভা। সত্যিই বুঝি মোহরের স্বপ্ন দেখতে দেখতে আসল মোহরটাই হারাতে বসেছে সে। আকাশীকে হারাতে বসেছে।

কিন্তু যার চোখ নতুন রঙ দেখেছে তাকে ফিরিয়ে আনবে সে কি করে।

তবু আকাশীকে খুশি করবার জন্যে পথ খোঁজে আল্‌ভা। সারা দুপুর যম্‌নীর সঙ্গে

কোম্পানি-মহলে কুলিমজুরদের বস্তিতে নাচ দেখিয়ে বেড়ায় আকাশী। আর সেই সময়ে লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁত বোনে আল্ভা। বাঁশের ছোট্ট হাত-তাঁতে রঙবেরঙের টানা আর পোড়েনে রঙিন নকশা ফুটে ওঠে। নিজের হাতে কাপাসের চারা লাগিয়েছে আল্ভা, একটু-একটু করে বড় হয়েছে গাছগুলো। তারপর নিজের হাতে সুতো কেটেছে সে, রঙ করেছে দক্ষ রংরেজের মতো।

দিনে দিনে কাপড়ের গায়ে বিচিত্র সব নকশা ফুটে ওঠে, লাল হলুদ রঙে ঝলমল করে ওঠে কাপড়টা। নিজের হাতে ঘাগরা বানিয়ে দেবে সে আকাশীকে। আকাশীর নাচের ঘাগরা। তা হলে হয়তো চমকে উঠবে আকাশী। হয়তো আনন্দে ঝলমল করে উঠবে তার মুখ। তাঁত বুনতে বুনতে মৃদু স্বরে গুনগুন করে আল্ভা, আর এক একসময় গান থেমে যায়। কল্পনার চোখে দেখতে শুরু করে সে ঘাগরা পেয়ে আকাশীর ডাগর চোখ দু-খানা বিস্ময়ে বড় বড় হয়ে উঠছে, খুশিতে নেচে উঠেছে মেয়েটা।

দিনে দিনে কাপড়টা বুনে শেষ করে ঘাগরা বানিয়ে সেদিন তাই অপেক্ষা করেছিল আল্ভা। নাচ দেখাতে গেছে আকাশী। ফিরে এলেই ঘাগরাটা নিয়ে গিয়ে হাজির করবে সে, আর তা দেখে আকাশীর বিস্মিত দুটি চোখ করুণ হয়ে উঠবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে।

সে-কথা ভাবতে ভাবতে নিজের হাতে বোনা কাপড়টার দিকে নিজেই মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল আল্ভা। হঠাৎ শুকনো পাতার মর্মর শব্দ শুনে সকচিত হয়ে উঠল।

পরক্ষণেই সশব্দ খিলখিল হাসি ভেসে এল।

হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়াল ফিরুজা, কিসের পানে ঠায় লজর গ গায়েনভাই।

ফিরুজাকে দেখে আল্ভাও তৃপ্তির হাসি হাসল, আমাব আকাশী লেগে বুনছি গো টিয়ারানী, অর নাচের ঘাগরা বানায়ছি।

বিস্মিত চোখে আল্ভার মুখেব দিকে তাকিয়ে চট্ করে সামনে এগিয়ে এল ফিরুজা। দু-হাতে ঘাগরাটা তুলে নিল সযত্নে, পায়রার পিঠে হাত বোলানোর মতো করে নবম হাতে সেটার স্পর্শ নিয়ে বললে, কি সোন্দর বুনছো গ গায়েন ভাই, বড় সোন্দর বুনছো। তুমার হাতটা বড়ো মিঠা গায়েন, রাবা লিলে মিঠে গান বাজে, তাঁতের কাঠি লিলে মিঠে লকশা ফুটে।

আলভার মুখে খুশি উছলে উঠল।—তুমার পছন্দ হইছে টিয়ারানী।

—হবে নাই? ঘাগরাটি আমারে দাও ক্যানে গায়েন ভাই, মাদোনের চোখটা ঝলসায় দিবো।

আল্ভা হাসল।—দিবো গো টিয়ারানী তুমার লেগেও বুনে দিবো একটা। ইটা আমার আকাশীর নামে বুনছি।

হঠাৎ চোখ ছলছল করে উঠল ফিরুজার। কিছু বলল না। শুধু ঘাগরাটা বারবার খুলে আর ভাঁজ করে দেখল।

তারপর একসময় উঠে চলে গেল।

বললে, বিটিরে রেখে আসছি, মাদোনের কাছে। যাই গ গায়েনভাই।

বলে তরতর পায়ে চলে গেল ফিরুজা। কিন্তু মনের মধ্যে ঘাগরার লোভটা রয়েই গেল। সত্যি, বড় সুন্দর নকশা বুনেছে আল্ভা। বড় চমকদার রঙের নকশা।

আল্ভার মনটাও ফূর্তিতে ভরে গেল। ফিরুজা বলছে, বড সুন্দর ঘাগরা হয়েছে, বড় সুন্দর নকশা।

কল্পনার চোখে দেখে আল্ভা, যেন এই ঘাগরা পরে নাচছে আকাশী। ঘূর্ণির মতো ঘুরছে সে ঢোলক বাজাতে, পায়ে রিঠের ঘুঙুর বাজছে ঝুমঝুম ঝুমঝুম। আর উড়ন্ত ঘাগরা থেকে

যেন নীল হলুদ লাল সবুজের রঙ ছিটিয়ে পড়ছে, আলো ছিটিয়ে পড়ছে।

কিন্তু অপেক্ষা করে করে, অপেক্ষা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়ল আল্‌ভা। রাত ঘনিয়ে এল, এখনো ফিরছে না কেন আকাশী।

আকাশীর পথ চেয়ে বসে থাকতে থাকতে একসময় তন্দ্রার ঘোর এসেছিল। হঠাৎ ঢোলকের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার।

চাঁদনী রাতের মৃদু জ্যোৎস্নায় দেখলে যম্‌নী আর আকাশী আসছে। তাদের কথা আর হাসি ভেসে এল, ভেসে এল আকাশীর হাতের ঢোলকের মৃদু শব্দ।

উঠে বসল আল্‌ভা।

প্রশ্ন করলে, কে আকাশী!

খিলখিল করে একমুখ হেসে ছুটে এল আকাশী। কোমরের ছোট্ট থলি থেকে পয়সাগুলো হাতে ঢালল ঝনঝন করে, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, বাবুরা আজ টাকা দিয়েছে, টাকা। এই দ্যাখো!

বলে হাতের পয়সাগুলো মেলে ধরল সে আল্‌ভার সামনে।

তারপরই ছুটে গেল ঘরের মধ্যে। একটা কুপি জ্বালিয়ে নিয়ে এসে বললে, বাবুদের টাকা লিয়ে ই কাপড়টা কিনে আনছি, ছুটদিদির পানা রাঙা কাপড়।

বলতে বলতে কাপড় আর টাকার আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে আকাশী। বলে, ই কলের কাপড় বটে, তাতের বুনা লয়। অনেক দাম বটে কাপড়টার।

আল্‌ভার চোখের কোণা দুটো জ্বালা করে ওঠে। একবার যম্‌নীর মুখের দিকে তাকায় আল্‌ভা, একবার আকাশীর মুখের দিকে। হ্যাঁ, নেশা করে এসেছে দুজনেই। মদের গন্ধ ভুরভুর করছে দুজনের মুখেই।

যম্‌নী ধীরে বললে, আকাশী হামার নাচনী হায়, অরে গঞ্জমে লে যাবো। নাচ দিখালে বহুত রুপেয়া মিলবে গঞ্জমে।

টলতে টলতে বলে যম্‌নী।

আকাশী খিলখিল করে হাসে।—হাঁ, যাবো আমি, গঞ্জে যাবো নিচ্চয়। টাকা দিবে গঞ্জের মানুষগুলো। ভাল কাপড় কিনবো, কলের কাপড়।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আল্‌ভার বুক নিঙড়ে। ধীরে ধীরে মাচার ভেতর লুকিয়ে রাখা ঘাগরাটা এনে মেলে ধরে সে আকাশীর সামনে।

বলে, তুমার লেগে বুনছি, নতুন নকশা দিয়ে বানায়ছি ঘাগরাটা। তুমার নাচের ঘাগরা।

খিলখিল করে হেসে ওঠে আকাশী। টলতে টলতে কুপির আলোতে ঘাগরাটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে।

তারপর উপহাসের হাসি হেসে ওঠে। বলে, তাতের কাপড় পড়বে লাচনী!

খিলখিল করে হেসে উঠে ঘাগরাটা সে তুলে ধরে যম্‌নীর সামনে।

বলে, গায়েনটা জংলী বটে, তাতের কাপড় বুনছে লাচনীর জন্যে।

বলেই সশব্দে হেসে ওঠে আবার।

তারপর একহাতে ঘাগরাটা, আর একহাতে কুপিটা নিয়ে আল্‌ভার দিকে যেতে যেতে বলে, ই ঘাগরাটা তুমার টিয়ারানীরে দিবে। তুমার টিয়ারানী। টেনে টেনে রসিকতার স্বরে বলে আকাশী।

বলতে বলতে হঠাৎ টলে পড়ে আকাশী, আর পরমুহূর্তেই হাত থেকে ঘাগরাটা পড়ে যায়। ঘাগরার ওপর জ্বলন্ত কুপিটা।

মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে ঘাগরাটা।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধৈর্য ধরে যে-ঘাগরাটা বানিয়েছে আল্‌ভা, যে-ঘাগরাটা

দিয়ে আকাশীকে খুশি করবে স্বপ্ন দেখেছে, মাতাল আকাশীর কুপির আগুনে সেটা দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে, পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

আল্‌ভার চোখের জলে সে-আগুন নেবানো যায় না। আল্‌ভার দীর্ঘশ্বাসের বাতাসে সে-আগুন নেবে না।

১৪

যম্‌নীর বিরুদ্ধে ফিরুজার যত আক্রোশ তা ক্রমশ পরিণত হল আকাশীর বিরুদ্ধে।

প্রথম যেদিন সে সমুদ্রের পাড় থেকে যম্‌নীকে তুলে নিয়ে এসেছিল সেদিন হঠাৎ বুঝি পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে পড়ে গিয়েছিল তার। সেই কত বছর আগেকার হারানো দিনগুলো নতুন করে ভেসে উঠেছিল চোখের সামনে। সেই রঙিন স্মৃতিটুকু কতবার মনের পটে ছায়া ফেলে গেছে।

যম্‌নীর বাপ আর মা—বুড়ো-বুড়ি দুজনেই বেঁচে ছিল তখন। আর ছিল একরত্তি ছেলে বুধা। কোনো কোনদিন যম্‌নীর সঙ্গে ডিঙিতে মাছ ধরতে যেত ফিরুজাও। মাছ ধরে ফিরে আসত অনেক রাতে। বুধা তখন বুড়া মায়ের কোলে ঘুমিয়ে। এসে আদর করে কোলে তুলে নিত তাকে যম্‌নী। আধো-ঘুম আধো-জাগা সোহাগে ছেলেকে ঘিরে কত সুখদুঃখের কথা হত। কত স্বপ্ন। কোনো কোনোদিন বর্ষার রাতে খাল পার হত না। সমুদ্রের ধারে অন্ধকার ঘুমুঙ্গি ঘরেই রাত কাটাত যম্‌নী আর ফিরুজা, ঝমঝম ঝমঝম বৃষ্টি পড়ত সারা রাত, ঘুমুঙ্গি ঘরের চালে ঝড় লেগে শব্দ হত সনসন সনসন। ফিরুজা আর যম্‌নী পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ঘন হয়ে শুয়ে থাকত। অস্ফুটে দু-একটা কথা বলত যম্‌নী। বলত, বুধা বড় হলে তাকে গঞ্জে নিয়ে যাবে। মাছ ধরে আনবে যম্‌নী, আর গঞ্জমাঝি হবে বুধা। বুধা গিয়ে গঞ্জে বেচে আসবে সে-মাছ।

ফিরুজাও এক একদিন আবদার ধরত, সেও গঞ্জে যাবে।

হাসত যম্‌নী।—যাবো, যাবো। বুধার সাথে বুধার মাটারেও লিয়ে যাবো।

খুশি হত ফিরুজা। মাটির কত গল্পই তো শুনেছে সে গঞ্জমাঝিদের কাছে। কল্পনার চোখে সে-সব যেন নতুন করে দেখতে পেত ফিরুজা।

তারপর একদিন টিয়ারঙীদের দলের সঙ্গে ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়েছিল যম্‌নী।

রাত কেটে গেল, সকাল দুপুর হল, টিয়ারঙীদের ডিঙিগুলো সব একে একে ফিরে এল। ফিরে এল না শুধু যম্‌নীর ডিঙি।

আশায় আশায় বসে রইল ফিরুজা। কিন্তু না, ডিঙিটা আর ফিরল না।

টিয়ারঙের জেলের দল ডিঙি নিয়ে খুঁজতে বের হল, ঢেউয়ের পিঠে ভেসে ভেসে খুঁজে বেড়াল তারা। কিন্তু ফিরুজার হারিয়ে-যাওয়া মানুষটার হদিস পেল না শেষ পর্যন্ত।

আর ফিরুজা দিনের পর দিন মানুষটার পথ চেয়ে বসে রইল। যম্‌নী হয়তো ফিরে আসবে, ফিরে অসবে যম্‌নী।

না, দিন মাস বছর পার হয়ে গেল। বছরের পর বছর কেটে গেল, ফিরে এল না যম্‌নী।

কি করবে ফিরুজা, কতদিন আর পথ চেয়ে থাকবে সে। বুড়া-বুড়ির ঘরের ধান শেষ হয়ে গেল। দু-জোড়া পেটের ক্ষিদে সামলাবে সে কি করে। অপেক্ষা করে করে শেষে জুড়ি বাঁধল সে মদ্‌নার সঙ্গে। শক্ত সমর্থ জোয়ান চেহারা, বুকে নেই ভয়ডর। তার সঙ্গেই

জুড়ি বেঁধে ক্ষেতে চাষ করতে, ধান বুনতে বের হল ফিরুজা। রোপাই শেষ হলে মন্‌দার সঙ্গেই মাছ ধরতেও বের হত।

তারপর কি করে যেন মদ্‌নাকে ভাল লেগে গেল ফিরুজার। তবু যম্‌নীকে ভুলতে পারল না সে। মনে হল একদিন না একদিন ফিরে আসবে যম্‌নী।

শেষ পর্যন্ত ফিরেই এল। কিন্তু সব স্বপ্ন ভেঙে দেবার জন্যেই যেন ফিরে এল। না, তার মন থেকে মুছে গেছে ফিরুজার ছায়া। ফিরুজাকে ভুলে গেছে সে।

তবু হয়তো সহ্য করতে পারত ফিরুজা। কিন্তু তারই চোখের সামনে কিনা আকাশীকে নিয়ে মেতে উঠল যম্‌নী। আর তার গায়েনভাইকে ছেড়ে, আল্‌ভার মতো মাটির মানুষকে ছেড়ে আকাশী কিনা ঢলে পড়ল নাচের নেশায়।

সবই দেখে, সবই দেখতে পায় ফিরুজা। আর সারা শরীর তার আক্রোশে জ্বলে ওঠে আকাশীর বিরুদ্ধে।

বলে, কথাটা শুন আকাশী, গঞ্জের কসবীগুলার মতো লাচ দেখায় বেড়াস বাবুপাড়ায়, লাজশরম নাই তর ?

শোনে আকাশী, শুনে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

বলে, মদ্‌নারে তুই সাঙা করলি তো উ মানুষটার কি হবে ? জুড়ি বাঁধবার সাধ নাই যম্‌নীর ?

গম্ভীর হয়ে যায় ফিরুজা। চোখ ছলছল করে তার। যম্‌নীর মনের সাধটাই বড় হল আকাশীর কাছে ? বউ ছেলে বাপ মা ভুলে যে-লোকটা গঞ্জের নাচনী মেয়ের সঙ্গে নাচ দেখিয়ে কাটাল এত বছর, টিয়ারঙের টানে একবারও মন কাঁদল না যার, তার জন্যে এত দরদ আকাশীর ? কেন আল্‌ভা কি দোষ করল। গায়েনভাই তার দিনের পর দিন যে চোখের জল লুকিয়ে রাখছে তার কথাটা ভাবতে হবে না!

রসকিতার স্বরে আকাশী আবার বলে ওঠে, গায়েন মানুষটার তরে দরদ ক্যানে তর ?

বলেই সশব্দে খিলখিল করে হেসে ওঠে আকাশী। বলে, উ পাগল বটে রে। মোহরের স্বপন দেখে গায়েন। আর যম্‌নীর সাথে গঞ্জে লাচ দিখালে ঝনক ঝনক মোহর ঝরে পড়বে পায়ের লীচে।

শোনে ফিরুজা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তার বুক নিঙড়ে। বোঝে, যে-নেশায় মেতেছে আকাশী সে-নেশা থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না তাকে।

আল্‌ভাকে এসে বলে, তুমি জুড়ি বাছে লাও গায়েনভাই, উ আকাশী আর ফিরবে নাই।

আল্‌ভা রাবা তুলে নেয় হাতে। মৃদু মৃদু গুনগুন সুরে গান গাইতে শুরু করে।

তারপর একসময় রাবা থামিয়ে হাসে ফিরুজার দিকে তাকিয়ে। বলে, নেশা ছেড়ে যাবে টিয়ারানী, নেশা ছেড়ে যাবে। টাকার নেশা লাগছে অর, নাচ দেখে বাবুরা টাকা দিচ্ছে সেই নেশা লাগছে। কিন্তু আল্‌ভা গরিব নয় টিয়ারানী, মোহর আছে আল্‌ভার, কলসভরা মোহর আছে। একবার মাটিতে বাবুরা নিয়ে গেলে…

বলতে বলতে কেমন যেন উদাস হয়ে যায় আল্‌ভাব চোখ দুটো। উদ্‌ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকে সমুদ্রের দিকে।

ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ছে, আবার দূরের গভীর সমুদ্রে মিলিয়ে যাচ্ছে ঢেউগুলো। আল্‌ভা যেন সেদিকে তাকিয়ে স্বপ্ন দেখে, তার ডিঙি ভেসে চলেছে মাটির দিকে, গঞ্জের দিকে। মাটিতে পৌঁছে তার সেই গুপ্তধন উদ্ধার করে আনবে সে। ঘড়া ঘড়া মোহর। অনেক, অনেক টাকা।

তারপর নেশা ছুটে যাবে আকাশীর। আবার ফিরে আসবে আকাশী।

বলতে বলতে গলা ভারী হয়ে আসে আল্‌ভার। লজ্জায় অন্যদিকে মুখ ফেরায় সে।

আর ফিরুজার দু-চোখ ছাপিয়ে জল আসে।

—তুমি মানুষ লও, গায়েনভাই, তুমি মানুষ লও। বলতে বলতে ছুটে পালায় ফিরুজা। চোখের কান্না তার গলার স্বরে ভেঙে ভেঙে পড়ে।

কিন্তু পালিয়ে এসেও শান্তি পায় না সে। টিয়ারঙের নোনা বাতাসে সেও যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে এসে বসে যম্‌নীর বুড়ো বাপটার কাছে।

চিনতে পেরে হাসে বুড়ো।—ফিরুজা বটিস, মা বটে আমার ?

—হ্যাঁ।

চুপচাপ এসে বসে সে বুধার কাছে। গায়ে মাথায় হাত বুলোয়। আদরে, স্নেহে।

বুড়ো বসে বসে দড়ি পাকায় আর অনর্গল কথা বলে যায়। নিজের দুঃখের কথা, ভবিষ্যতের ভাবনা। আর মাঝে মাঝে ধমক দেয় বুধাকে, পাক ভুল হচ্ছে তার।

পাক তো ভুল হবেই বুধার। ফিরুজা কাছে এসে দাঁড়ালেই কেমন সব ভুল হয়ে যায় তার। ভালও লাগে। হঠাৎ সমস্ত মন তার ঝলমল করে ওঠে। মা তার গায়ে মাথায় যখন হাত বুলিয়ে দেয়, আদুরে স্বরে কথা বলে, তখন খুশিতে নেচে ওঠে বুধার চোখ দুটো। মনে হয় সারা দিন সে বসে থাকে মায়ের কাছটিতে।

কেমন যেন বোবা বোবা চোখ মেলে তাকায় বুধা। কি যেন বলতে চায়, বলতে পারে না। কেমন রহস্যে ঘেরা যেন তার মায়ের মন। কোনো কোনোদিন বুধাকে ডেকে নিয়ে যায় ফিরুজা। আদর করে ছেলেকে কাছে বসিয়ে পেট ভরে খাওয়ায়। গল্প করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আবার হয়তো দিনের পর দিন কোনো খবরই নেয় না। চোখের দেখাটাও পায় না বুধা।

বুড়া বাপের কাছে শুনেছিল সে, বাপ তার হারিয়ে গেছে সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে। শুনে কিছু না বুঝেই কাঁদত বুধা। আর ফিরুজা তখন সান্ত্বনা দিত। বলত, বাপ তর ফিরা আসবে রে, ফিরা আসবে।

শেষে ফিরেই এল যম্‌নী। বাপকে দেখবার জন্যে ছুটে গেল বুধা। টিয়ারঙীদের জমায়েতে ভয়ে ভয়ে বুড়া বাপের পাশটিতে গিয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে অবোধ্য দুটি চোখ চেয়ে দেখল সেই অদ্ভুত মানুষটাকে।

কিন্তু না, বুধাকে কাছে ডাকল না যম্‌নী, আদরে জড়িয়ে ধরল না। শুধু একবার তার দিকে তাকিয়েই হেসে উঠে যম্‌নী নাচতে শুরু করল।

লজ্জায় অপমানে সেদিন ছুটে পালিয়ে এসেছিল বুধা, পালিয়ে এসেছিল ফিরুজার কাছে। মাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল সেদিন।

আজ আবার ফিরুজার হাতের স্নেহস্পর্শ পেয়ে আবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল বুধা।

বুড়ো কাশতে কাশতে বললে, বুড়া হইছি, বুধা বেটার কি হবে রে ফিরুজা!

বুধাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফিরুজা বললে, বুড়াও আমার, বেটাও আমার। অর বাপটা পাগল হইছে লাচের নেশায় কিন্তুক ফিরুজা পাগল লয়।

বুড়ো এদিক-ওদিক তাকাল ভয়ে ভয়ে। তারপর ধীরে ধীরে বললে যম্‌নী আসে বুধারে কাড়ে লিবে কয়েছে রে ফিরুজা। কয়, লাচ শিখাবে অরে।

—লাচ শিখাবে! খিলখিল করে সশব্দে হেসে ওঠে ফিরুজা। পাগলের মতো সশব্দে হেসে ওঠে সে।

তারপর ঝট্ করে খোঁপা থেকে খুনিয়াটা খুলে বুড়োকে দেখিয়ে বলে, ই খুনিয়াটাও লাচতে জানে। খুনিয়াটা লাচে গ বুড়া।

১৫

আবার জাহাজ এসে ভিড়ল টিয়ারঙের জাহাজঘাটায়। আর সেই প্রথমবারের মতোই হাসিমুখে নেমে এল তামসী।

সমীরণ দেখল, সৌমেন দেখল। দুজনের মনেই খুশির ফুল পাপড়ি মেলে দিল। কিন্তু এগিয়ে যেতে পারল না সৌমেন। সে শুধু দূর থেকে দেখল তামসীকে। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এল তার ছোট্ট ঘরটিতে।

তামসীকে ঘিরে অনেক স্বপ্ন দেখেছিল সে। অনেক কামনা জেগেছিল তার মনে। কিন্তু সমীরণের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে লজ্জায় নুয়ে পড়েছে সে বার বার। মাসের পর মাস বেদনার্ত মনের কোণে শুধু অতীতের টুকরো মধুর স্মৃতি পুষে রেখে চলেছিল সে।

চাকরির চেষ্টায় এসেছিল সৌমেন। কিন্তু না, দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেও কোনো চাকরি জোটেনি। এবার হয়তো ফিরে যেতে হবে তাকে। এভাবে নিজের জীবনকে নষ্ট হতে দেবে না।

তাই ইচ্ছে করেই যেন দূরে সরে যেতে চাইল সে তামসীর কাছ থেকে।

প্রথম প্রথম তামসীও যেন অস্বস্তি বোধ করে। এতদিন বাদে আবার নতুন করে সৌমেনের কাছে এগিয়ে যেতে সাহস পায় না।

অথচ সমীরণ কত সপ্রতিভ।

প্রথম যেদিন ফিরে এল তামসী, সমীরণ সহাস্যে এগিয়ে এসে বলেছিল, সে কি! কই, যা ভেবেছিলাম তা তো দেখছি না।

বলে তামসীর সিঁথিটার দিকে তাকিয়েছিল।

চমকে উঠেছিল তামসী, তারপর স্মিত হাসি হেসে প্রশ্ন করেছিল, কি ভেবেছিলেন?

—ভেবেছিলাম সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর দেখতে পাব। সপ্রতিভ স্বরে বলেছিল সমীরণ।

আর তা শুনে চ্যাটার্জি আর তাপসী দুজনেই সশব্দে হেসে উঠে তামসীকে লজ্জায় মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছিল।

তামসীর বিয়ের কথাটা তার দিদির মনেও বার বার উঁকি দিয়ে গেছে। কোন ছোটবেলায় বাপকে হারিয়েছে তারা, বৃদ্ধা মা মৃত্যুর দিকে এক পা বাড়িয়ে ভিটে আঁকড়ে দিন গুনছেন। সুতরাং তামসীর বিয়ের ভাবনাটা তাপসীর কম নয়।

মাঝে মাঝে সমীরণের কথাটা মনের মধ্যে উঁকি দেয়। ছেলেটিকে বেশ লাগে তাপসীর। এমন চমৎকার মিশুকে, ছিমছাম চেহারা, ভাল চাকরি। এমন একটি পাত্র জুটিয়ে দিতে পারলে তবেই স্বস্তি পায় সে। স্বামীকে সে-কথা দু-একবার বলেছে তাপসী। চ্যাটার্জিরও তাই মত।—তা মন্দ হয় না।

অনেক ভেবেচিন্তেই তামসীকে তাই আবার ফিরিয়ে এনেছে তাপসী। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে যেমন করে হক এ-বিয়ে ঘটাতেই হবে। কিন্তু স্পষ্ট করে কথাটা সমীরণকে বলতে কেমন যেন বাধো বাধো ঠেকে।

হয়তো এমন স্পষ্ট করে বলতে পারত না তাপসী। কিন্তু সুযোগটা যেন সমীরণই জুটিয়ে দিলে। সশব্দে হেসে উঠে সমীরণ বলল, ভেবেছিলাম সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর দেখতে পাব।

তাপসী ঠোঁট টিপে হেসে বললে, সেটুকু বোধহয় তোমার জন্যই অপেক্ষা করছে সমীরণ।

কথাটা শুনেই সে গম্ভীর হয়ে গেল। পরমুহূর্তে হেসে উঠে বলল, তেমন ভাগ্য কি হবে এ-অভাগার।

বলে তাকাল সে তামসীর মুখের দিকে। তামসী ততক্ষণে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েছে।

খানিকটা অস্বস্তিতে, কিছুটা লজ্জায়। তারপর তরতর করে গ্যাংওয়ে পার হয়ে বাবুবাংলোর পথ ধরেছে। সত্যি, দিদিটা কি নির্লজ্জ। এমনভাবে এ-কথা বলা যায়? তাও সমীরণকে!

অভিমানে ক্রোধে ভালো করে কথাই বলেনি তামসী, বাসায় ফিরেও।

চ্যাটার্জি রসিকতা করে বলেছে, কি ব্যাপার, এতদিন পর ফিরে এলে, মুখে হাসি নেই, কথা নেই...

রাগে চোখ ঠেলে জল এসেছে তামসীর। দিদির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে ফেটে পড়েছে তামসী।—কি বল তো তুই, কি ভাবলেন বল তো?...

তামসীর রাগ দেখে চ্যাটার্জি আর তাপসী মুখ চাওয়াচায়ি করে হেসে উঠেছে।

আর সেই সময়ে ফিরুজা কোলে মেয়ে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে এক পাশে।—গড় হই গ ছুটদিদি।

চোখের জল মুছে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে তামসী। ফিরুজা? হ্যাঁ, ফিরুজাই তো। আরো যেন সুন্দর হয়েছে টিয়ারঙের সেই মেয়েটা। মুখে তৃপ্তির ছাপ।

ফিরুজার কোলের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়েটার দিকে চোখ যায় তামসীর।

সহাস্যে এগিয়ে এসে মেয়েটাকে কোলে তুলে নেয় সে। বলে, মেয়ে তোর?

—হ্যাঁ গ ছুটদিদি, বান্নু নাম দিছি। মাদোনার মেয়া বটে। সাঙাটা করলাম তো তুমি দেখলে নাই গ।

তাপসীর দিকে তাকিয়ে হাসল তামসী। তারপর ফিরুজাকে প্রশ্ন করলে, সাঙা করেছিস?

—করি নাই? মেয়া হল ক্যামনে গ! বলে হেসে উঠল ফিরুজা।—আমার বিয়া হল যম্‌নীর সাথে ত বেটা হল, ফের সাঙা করলাম মাদোনরে,ত মেয়া হল। আর তুমার বিয়া হল নাই ছুটদিদি!

চ্যাটার্জি হেসে উঠে বললে, দেখলে তামসী! ওদেরও চোখে লাগছে।

—বেশ। আপনি চুপ করুন তো!

বলে কপট রাগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় তামসী। কিন্তু মন থেকে মধুর সুরের গুনগুনুনিটুকু দূর করতে পারে না। সত্যি, জীবনের একাকিত্বে সঙ্গী পাবার রোমাঞ্চময় স্বপ্ন বার বার উঁকি দিয়ে গেছে। কত বিনিদ্র রাত্রিতে টিয়ারঙের সেই দু-দণ্ডের স্মৃতিটুকু অদ্ভুত আনন্দে কতবার নাড়াচাড়া করেছে তামসী। না, সমীরণ নয়। সৌমেনকে ঘিরে স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে বারবার।

সমীরণকে ভুলে গিয়েছিল তামসী। মুছে গিয়েছিল তার স্মৃতি। কিন্তু সৌমেন বার বার উঁকি দিয়েছে তার কল্পনার জানলায়। অথচ টিয়ারঙে ফিরে এসে মনে হল সেই সৌমেনই যেন কত দূরে সরে গেছে। আর আগের মতোই পথ আগলে দাঁড়িয়েছে সমীরণ—যাকে ভুলে যাওয়া যায়, কিন্তু কিছুতেই যেন উপেক্ষা করা যায় না।

আগের মতোই সৌমেনের কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হল তামসীর।

বেশ কয়েকটা দিন অপেক্ষা করে করে কেটে গেল। তারপর নিজেই এসে হাজির হল সে সৌমেনের ছোট্ট ঘরটিতে।

চমকে উঠে দাঁড়াল সৌমেন ওর পায়ের শব্দে।

বিষণ্ণ হাসি হেসে তামসী প্রশ্ন করলে, ভালো আছ?

মাথা নাড়ল সৌমেন, কোনো কথা বলতে পারল না।

আবার হাসল তামসী।—ভুলে গেছ?

—কি হবে মনে রেখে? দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল তামসী।

লজ্জা পেল তামসী, কেমন একটা অস্বস্তি। বুঝল, খবরটা রাষ্ট্র হয়ে গেছে সারা

টিয়ারঙে।

সেদিনের হালকা রসিকতাটা নিরর্থক নয় জানিয়ে দিয়েছে সমীরণ। এই নিঃসঙ্গ দ্বীপের দুঃসহ জীবনে তামসীকে সঙ্গী বেছে নিতে রাজি হয়েছে সে। আর সে-খবর শুনে খুশি হয়েছে চ্যাটার্জি। খুশি হয়েছে তাপসী।

শুধু খুশি হতে পারেনি তামসী নিজে। কেন সমীরণের মতোই প্রগল্ভ আবেদনে এগিয়ে যেতে পারে না সৌমেন। কেন এই ভীরু অস্বস্তি তার!

জানলার পাশে গিয়ে বসল তামসী। অনিমেষ তাকিয়ে রইল সৌমেনের মুখের দিকে, যেন কিছু শুনতে চায়, যেন কিছু বলতে চায়। দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষা যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে এই মধুময় মুহূর্তটিতে।

ধীরে ধীরে সূর্যাস্তের লাল আলো নীল হয়ে আসে। অন্ধকার ঘনিয়ে আসে ধীরে ধীরে। ম্লান মেঘের মতো স্তব্ধ উত্তেজনায় অপেক্ষা করে তামসী।

অসহ্য নীরবতা ভেঙে সৌমেন বলে ওঠে, ফিরে যাও তামসী, রাত হয়ে এল।

হাসে তামসী। অদ্ভুত বিচিত্র সে-হাসির শব্দ। বলে, হ্যাঁ যেতে হবে। তবু···

হঠাৎ ছুটে এসে সৌমেনের হাতটা জড়িয়ে ধরে তামসী। দু-চোখ জলে ভরে যায়। উচ্ছ্বাসের স্বরে বলে, এলাম এতদিন বাদে, কিছু বলবে না, বলবে না কিছু?

তামসীর মুঠো থেকে হাতটা মুক্ত করে সৌমেন।

অমিয়বাবু আর রাণুদির কথা ভেসে আসছে, শুনতে পায় তামসী। বেড়িয়ে ফিরে আসছেন ওরা।

দূরে সরে আসে তামসী।

আর সৌমেন মৃদু হেসে বলে, সব শুনেছি তামসী। তুমি সুখী হও।

—না, না, না। কি শুনেছ তুমি? চিৎকার করে ওঠে তামসী। বলে, সব মিথ্যে, সব মিথ্যে। তুমি বল, তুমিও সুখী হতে চাও।

হাসে সৌমেন, দুঃখের হাসি।—তা হয় না তামসী। চাকরির চেষ্টায় এসেছিলাম, এবার ফিরে যেতে হবে।

আবার কি যেন বলতে গিয়ে চুপ করে যায় তামসী।

রাণুদি এসে ঢুকেছে।

চোখাচোখি হতেই এক মুখ হেসে এগিয়ে গেল তামসী।

তারপর সারা সন্ধ্যাটা রাণুদির সঙ্গে কাটিয়ে ফিরে গেল সে বিচলিত মন নিয়ে।

না, এভাবে নিজের জীবনকে নষ্ট করতে পারবে না তামসী! তার গোপন বুকের রঙিন কথাগুলো মেলে ধরতে হবে তাপসীর সামনে।

সমস্ত রাত নির্ঘুম কেটে গেল। সমস্ত শরীরে ক্লান্তি আর চোখের নীচে অবসাদের চিহ্ন নিয়ে এসে দাঁড়াল সে তাপসীর সামনে।

ফিরুজাকে তাপসী বলেছে, তোদের নতুনবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে ছুটদিদির। শুনল তামসী।

আগের রাত্রেও চ্যাটার্জি আর তাপসীর নানান জল্পনা-কল্পনা শুনেছে তামসী। শুনে বিষিয়ে উঠেছে তার সারা শরীর।

ভোর বেলায় উঠে এসেও সেই একই কথা শুনল। বিরক্তিতে মন ভরে গেল তার।

আর তার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল তাপসী। এ কি শরীর হয়েছে তামসীর?

তামসী কঠিন চোখে তাকাল তাপসীর দিকে।—দিদি!

চোখে বিস্ময় ফুটল তাপসীর। ডাকটা কেমন যেন অস্বাভাবিক ঠেকল।

তামসী আবার ডাকল।—দিদি!

তারপর ছুটে এসে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল সে। কাঁদল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে, কাঁদল অনেকক্ষণ।

কাছে এসে বসল তাপসী।—কি হয়েছে?

কি হয়েছে? কি হতে বাকি আছে?

একে একে সব খুলে বলল সে।

শুনল তাপসী। দেখল, তামসীর দু-চোখে টলমল করছে দু-বিন্দু অশ্রু।

তামসীর পিঠের উপর একখানা সান্ত্বনার হাত রেখে বসে রইল তাপসী। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ।

তারপর ধীরে উঠে এল কপালে দুশ্চিন্তার রেখা নিয়ে।

দেখলে, বাইরের বাগানে স্বামী তার বন্দুকের নল পরিষ্কার করছে। পাশে এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল তাপসী।

স্বামী মুখ তুলে তাকাল।—বলছ কিছু?

—হ্যাঁ!

—বল।

তাপসী হাসল।—এ-বিয়ে হবে না।

—কেন?

—তামসীর ইচ্ছে নেই এ-বিয়েতে।

স্বামীর মুখে বিস্ময়ের ছাপ দেখতে পেল তাপসী। যেন, এ-অদ্ভুত কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

তাপসী ধীরে ধীরে বললে, সৌমেনকে, অমিয়বাবুর···

কথা শেষ হবার আগেই সব স্পষ্ট হয়ে উঠল চ্যাটার্জির কাছে। পরমুহূর্তেই অট্টহাসে হেসে উঠল সে। যেন কত বড় একটা হাসির কথা।

হাসির কথাই তো? একটা বেকার ছেলে, বসে আছে চাকরির চেষ্টায়, তার সঙ্গে তামসীর বিয়ে?

সশব্দে হেসে উঠল চ্যাটার্জি। তারপর বন্দুকটা তুলে রেখে হনহন করে অমিয়বাবুর বাংলোর দিকে এগিয়ে গেল।

ডাক শুনে বেরিয়ে এলেন অমিয়বাবু।—কি খবর মিঃ চ্যাটার্জি!

—সুখবর আছে।

দুটো চেয়ার পেতে বাগানেই বসলেন অমিয়বাবু আর চ্যাটার্জি সাহেব।

—আপনার সৌমেনের জন্যে চাকরির কথা বলেছিলেন না?

—হ্যাঁ, করতে পারলেন কিছু? উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করলেন অমিয়বাবু।

—হ্যাঁ, আপাতত একটা ক্লারিক্যাল পোস্ট। এই জাহাজেই পাঠিয়ে দিন, চিঠি দিয়ে দিচ্ছি স্টিফেন্স সাহেবকে।

একটু থেমে বললে, এখানে নয়, কোম্পানির মাতলা আপিসে।

১৬

চাকরি পেয়ে কোম্পানির মাতলা আপিসে চলে গেছে সৌমেন, শুনল তামসী। শুনে নিজের মনেই হাসল সে। আশ্চর্য, এমন ভীরু কাপুরুষ একটা মানুষকে ভালবেসেছিল তামসী? এত স্বার্থপর? যাবার আগে কি একটা কথাও বলে যেতে পারত না সৌমেন,

বলতে পারত না এমন কিছু, যা শুনে, সব হারিয়েও অতীতের মধুর স্মৃতিটুকুকে সম্বল করে রাখতে পারত তামসী ?

গভীর অবসাদের ভার নিয়ে সমুদ্রের ধারে একটা ঘুমুন্সি ঘরের নির্জনতায় এসে বসে তামসী। একাকিত্বের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। তাকিয়ে থাকে সফেন নীল সমুদ্রের দিকে।

সৌমেন চলে গেছে। তাকেও চলে যেতে হবে। এ-দ্বীপ জনশূন্য করে চলে যেতে হবে সরকারী হুকুম এলেই। জাহাজ আসবে, একটানা, ঘণ্টাধ্বনি বাজবে, বোমার ভয়ে দ্বীপ ছেড়ে পালাতে হবে সকলকে, জাহাজে ছুটে যেতে হবে ঘণ্টাধ্বনি শুনেই। তবু তারই ফাঁকে বিষণ্ণ করুণ একটা সানাইয়ের সুর শুনতে পায় তামসী। সৌমেন নয়, সমীরণের হাতছানি।

যতদূর চোখ যায় শুধু জল আর জল। শান্ত নীল সমুদ্র থেকে একটি একটি করে উত্তাল তরঙ্গ ভেসে আসে, উদ্দাম আবেগে ফেটে পড়ে ঢেউয়ের সারি। স্মৃতির সমুদ্র থেকে একটি একটি করে বেদনার ঢেউ যেন তামসীর মনের তীরে এসে ভেঙে পড়ছে।

অনেক দূর থেকে একটা গানের কলি ভেসে এল। ক্রমে ক্রমে কাছে এগিয়ে এল সে-গান। তারপর তামসীর পাশ দিয়েই গান গাইতে গাইতে চলে গেল আপন-ভোলা আল্‌ভা। দূরের এক সারি গাছের আড়ালে মিশে গেল।

অনিমেষ চোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে রইল তামসী। সময়-হারানো দ্বীপের দুঃসহ যন্ত্রণা বুকে নিয়ে।

হঠাৎ খিলখিল হাসির শব্দে তন্ময়তা ভেঙে গেল। তামসী ফিরে তাকিয়ে দেখল ফিরুজা এসে দাঁড়িয়েছে।

কোলের ফুটফুটে মেয়েটাকে বুকে চেপে সামনে এসে দাঁড়াল ফিরুজা।

হেসে উঠে বললে, কি গ ছুটদিদি, নতুনবাবুর লেগে বস্যে আছো নাকিন গ ?

মৃদু হাসি দিয়ে বিরক্তি চাপা দিল তামসী। তবু বুঝতে পারল ফিরুজা। দপ্ করে হাসি নিভে গেল তার মুখ থেকে।

মুহূর্ত কয়েক তামসীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে সমুদ্রের দিকে পা বাড়াল সে।

—শোন্! ডাক দিল তামসী।

ফিরে দাঁড়াল ফিরুজা। বললে, মাদোনটার লেগে এলাম গ ছুটদিদি। ডিঙি লিয়ে যেছে মাছ ধরতে, সাঁঝ হয়ে এল, ফিরে না ক্যেনে।

ফেরে না কেন! বিস্মিত দৃষ্টিতে ফিরুজার মুখের দিকে তাকায় তামসী। কি যেন খুঁজে পেতে চায়।

আশ্চর্য! একদিন এই ফিরুজাকেই সমুদ্রের দিকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকতে দেখেছিল সে। তার সেই হারিয়ে-যাওয়া মানুষটার আশায় আশায়। যতদূর চোখ যায়, অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো ফিরুজা, খুঁজতো কোথাও ছোট্ট একটি কালো বিন্দু ঢেউয়ের পিঠে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসে কিনা। বহু বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ডিঙিতে করে আবার বুঝি ফিরে আসবে যম্‌নী, আশায় আশায় তাকিয়ে থাকতো ফিরুজা। আজ আবার তেমনি দুশ্চিন্তা আর আগ্রহ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ফিরুজা।

ডিঙিতে করে মাছ ধরতে গেছে মদ্‌না। তার ছোট্ট মেয়ের বাপ গেছে সমুদ্রে ডিঙি ভাসিয়ে।

কিন্তু ফিরে আসে না কেন সে! উৎকণ্ঠার দৃষ্টিতে বার বার সমুদ্রের দিকে তাকায় ফিরুজা। বড় ভয় তার সমুদ্রকে।

ধীরে ধীরে বিকেলের আলো ম্লান হয়। সন্ধ্যা নেমে আসে। ওদিকে পুবের আকাশে

মেঘ জমা হয়।

ঝড় আসছে, ঝড় আসবে।

উঠে দাঁড়ায় তামসী। ধীরে ধীরে বাংলোর পথ ধরে। আর ফিরুজা তরতর করে বালি মাড়িয়ে গিয়ে দাঁড়ায় একেবারে তীরের জল ছুঁয়ে।

ছোট্ট মেয়েকে বুকে আঁকড়ে অনুসন্ধানী এক জোড়া চোখ সারা সমুদ্রের বুকে একটি ছোট্ট ডিঙিকে খুঁজে বেড়ায়।

অনেকক্ষণ পরে ছোট্ট ডিঙিটা দেখা দেয়। খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে ফিরুজা। হাত নেড়ে ইশারা করে।

ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মদ্‌নার ডিঙি। ঢেউয়ের পিঠে ভাসতে ভাসতে তীরে এসে পৌঁছয় মদ্‌না আর একটা বাচ্চা ছেলে।

পিঠে ভারী জালটা বয়ে নিয়ে আসছে মদ্‌না, কুঁজো হয়ে গেছে জালের ভারে।

সার্চলাইটটা ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিমের দিকে হেলে পড়তেই কালো জালের ফাঁকে ফাঁকে রুপোলী মাছগুলো চিকচিক করে উঠল। স্পষ্ট হয়ে উঠল মদ্‌নার মুখখানা। সারা মুখে ঘাম চকচক করছে তার।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জলের দিকে ছুটে গেল ফিরুজা।

দু-একটা ফুর্তির কথা, দু-একটা টুকরো হাসি।

ঘুমুঙ্গি ঘরের খুঁটিতে জালটা টাঙিয়ে মাছগুলো ঝেড়ে নিল মদ্‌না। তারপর টোকায় ভরে নিয়ে বস্তির পথ ধরল।

এদিকে ঝড় এগিয়ে আসছে ক্রমশ। টিয়ারঙের ঝড়! সেই বিচিত্র উন্মাদ ঝড়ের সনসন আওয়াজ ভেসে আসছে।

দ্রুত পায়ে ঘরে ফিরে এল দুজনে।

শুনতে পেল রাবা বাজাতে বাজাতে কোথায় যেন গান গাইছে আল্‌ভা। করুণ একটা সুর ভেসে আসছে থেকে থেকে। গান নয়, কান্না যেন। আল্‌ভার গানে এমন বেদনার অশ্রু ঝরে পড়তে দেখেনি ফিরুজা।

নিজের মনেই বললে, গায়েনভাইটার গান লয়, চক্ষুর জল বটে গানটা।

মদ্‌নার বুকের মধ্যেও যেন সে-বেদনার স্পর্শ এসে লাগছে। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মদ্‌নাও সায় দিল। বললে, আকাশী অর বুকে খুনিয়া বসায় দিছে রে।

সত্যিই বুঝি তাই। শ্রান্ত ক্লান্ত আল্‌ভার দুটি চোখ যে-স্বপ্ন দেখেছিল তা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে যম্‌নী।

ক্রমশ গানটা এগিয়ে আসছে কাছে। কান পেতে শুনলে ফিরুজা।

হ্যাঁ, ফিরুজার ঘরের দিকেই বোধহয় আসছে।

একটু পরেই শুকনো পাতা মাড়ানোর শব্দ শুনতে পেল ফিরুজা আর পরমুহূর্তেই দেখলে, রাবা হাতে গান গাইতে গাইতেই এসে দাঁড়িয়েছে আল্‌ভা।

গান থামল তার। হাসি মুখে বললে, একটা কথা কইবারে এলাম গো টিয়ারানী।

—কি কথা গ গায়েনভাই?

কি কথা? যে-কথাটা বলবার জন্যে দিনের পর দিন অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করেছে আল্‌ভা, সেই কথাটাই বলতে এসেছে সে। কিন্তু বলতে গিয়ে কি এক অস্বস্তি।

আল্‌ভা ধীরে ধীরে বললে, আকাশীরেই কইতাম টিয়ারানী, কিন্তু খুঁজে পেলাম না আকাশীরে।

বিস্মিত চোখ তুলে তাকাল ফিরুজা।—কুথায় আকাশী? খুঁজে মিললো না অরে?

—না, যম্‌নীর সাথে কুথাও লাচছে হবে?

বলে হাসবার চেষ্টা করল আল্‌ভা। সে-হাসিতে কেমন যেন অপ্রতিভ দেখাল তাকে।

খানিক চুপ করে থেকে আল্‌ভা বললে, টিয়ারানী, ডিঙি লিয়ি ফিরে চলল্যম আমি, তুমি কয়ে দিও আকাশীরে। কয়ো যম্‌নীরেই সাঙা করতে।

—ফিরা চললে? কুথায়? চমকে উঠল ফিরুজা।

হাসল আল্‌ভা। হাসি নয় যেন কান্না। চোখ তুলে ফিরুজার দিকে তাকাতেও যেন কষ্ট হচ্ছে তার।

বললে, যেখান হইতে আসেছিলাম, সেই মাটিতেই ফিরে চললাম।

মদ্‌না এগিয়ে এল। জিজ্ঞেস করলে, গঞ্জের পানে? মোহর আনবার তরে?

আল্‌ভার মুখটা মুহূর্তে চুপসে গেল।

বললে, হাসো না মাদোনভাই। গঞ্জে গিয়া কি হবে, হাতের মোহরটাই হাতে রইল না। নকল মোহর লিয়ে কি হবে?

ফিরুজা এসে একটা হাত ধরল আল্‌ভার।

—না গায়েনভাই, ই টিয়ারঙ ছাড়ে কুথায় যাবে?

হাসল আল্‌ভা।—টিয়ারঙের টিয়াপাখিটা পালায় গেছে, রঙেটা লিয়ে কি হবে রানী? আমি চললাম, তুমাদের ছেড়ে, কয়ে দিও আকাশীরে।

বলে পা বাড়াল আল্‌ভা।

ছুটে এসে পথ আগলে দাঁড়াল ফিরুজা।—না গায়েনভাই, যাতে দিবো নাই তুমারে।

হাসল আল্‌ভা। আর পরমুহূর্তেই ঝরঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ল তার দু-চোখ বেয়ে।

একদৃষ্টে ফিরুজার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ফিরুজাকে জড়িয়ে ধরল আল্‌ভা। কাঁদল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল ছোট ছেলের মতো।

অনেকক্ষণ পরে মুখ তুলল আল্‌ভা।

বললে, টিয়ারঙে মনটি থাকতে চায় গো টিয়ারানী শুধু ই বুনটির তরে। কিন্তু উ লাচনীর ঝুমুর শুনে প্রাণটা জ্বলে যায়।

বলে আবার পা বাড়ায় আল্‌ভা।—যাতে দাও টিয়ারানী, যাতে দাও।

ফিরুজার দু-চোখ বেয়েও তখন কান্না ঝরে পড়ছে। কি বলে আটকাবে সে আল্‌ভাকে, কি সান্ত্বনা দেবে? গায়েনভাই তার যা হারিয়েছে তা তো ফিরিয়ে আনতে পারবে না সে! কেন থাকবে আল্‌ভা কিসের লোভ দেখিয়ে তাকে থাকতে বলবে ফিরুজা?

ধীরে ধীরে পা বাড়াল আল্‌ভা চলে যাবার জন্যে।

তারপর হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল সে। এগিয়ে এল ফিরুজার কাছে। বুকের ভেতরে লুকিয়ে রাখা সেই ময়লা কাগজের টুকরোটা বের করে বললে, ই লকশাটা আকাশীরেই দিও টিয়ারানী।

—লকশা? চমকে উঠল ফিরুজা।

বিষণ্ণ হাসি হাসল আল্‌ভা।—হঁ টিয়ারানী, আমার লকশাটা। গঞ্জের দিকে মাটিতে অনেক মোহর আছে আমার, সোনা আছে। আকাশীরে কয়ো উসব সোনাদানা অরেই দিয়া গেলাম।

বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকায় ফিরুজা। তা হলে সোনার লোভে যাচ্ছে না আল্‌ভা। তার লুকনো গুপ্তধন উদ্ধারের জন্যে নয়?

না, আর কোনো কিছুতেই লোভ নেই আল্‌ভার। কোন কিছুতেই না। শুধু রাবা হাতে নিয়ে ডিঙি ভাসিয়ে চলে যাবে সে। যেদিকে চোখ যায়, কিংবা যেখানে থেকে একদিন গুপ্তধনের লোভে এসেছিল সে সেই দিকেই।

ফিরুজা চোখ মুছে বললে, ঝড় আসে গায়েনভাই, ই ঝড়ের রাতে যায়ো না।

হাসল আল্ভা।—উ আকাশের ঝড়টা ভাল টিয়ারানী, আকাশের ঝড়ে বুকের ঝড়টা লিভে যাবে।

বলে ধীরে ধীরে চলে গেল আল্ভা। যেমন এসেছিল তেমনি রাবার তারে গুনগুন সুর তুলে চলে গেল তার গায়েনভাই। ক্রমশ গানের সুর মিলিয়ে গেল দূর থেকে দূরান্তে।

আর স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ একসময় যেন তন্ময়তা ভেঙে গেল ফিরুজার। চঞ্চল হয়ে উঠল সে।

মুহূর্তের মধ্যে কি যেন এক প্রলয় ঘটে গেছে তার বুকের মধ্যে।

মদ্নার কোলে বাচ্চা মেয়েটাকে দিয়েই ছুটতে শুরু করল ফিরুজা।

ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে ডেকে উঠল, গায়েনভাই!

কোন সাড়া এল না।

আবার চিৎকার করে ডাকল ফিরুজা।

—গায়েনভাই!

এবারও কোনো সাড়া এল না।

ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের ধারে এসে পৌঁছিল ফিরুজা। তন্ন তন্ন করে খুঁজলে চতুর্দিক! না, আল্ভার ডিঙিটা নেই কাছে পিঠে। সমুদ্রের ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ছে তীরের ওপর। কালো অন্ধকার সমুদ্রের বুকে শাদা ফেনার সারি ফেটে পড়ছে।

যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে রইল ফিরুজা। তন্ন তন্ন করে খুঁজল। আর ডাকল চিৎকার করে।

—গায়েনভাই!

বার বার চিৎকার করে ডাকল ফিরুজা। সাড়া নয়, সে-ডাক বিচিত্র এক প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এল।

ধীরে ধীরে স্টীমারঘাটার সার্চলাইটটা ঘুরতে ঘুরতে পশ্চিম থেকে উত্তরে বাঁক নিতেই ফিরুজা চমকে উঠল।

ঢেউয়ের পিঠে ছোট্ট একটা কালো বিন্দু স্পষ্ট হয়ে উঠল সে আলোয়। হ্যাঁ, আল্ভার ডিঙি ভেসে চলেছে ঢেউয়ের পিঠে দুলতে দুলতে।

ফিরুজা আবার চিৎকার করে ডাকলে, গায়েনভাই. ফিরা এসো, ফিরা এসো।

সে-ডাক পৌঁছল না আল্ভার কানে। আর সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ফিরুজার দু-চোখের কোণে দুটি অশ্রুবিন্দু টলমল করে উঠল।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ যেন কোনো সংবিৎ ছিল না ফিরুজার।

হঠাৎ একসময় ফিরে দাঁড়াল ফিরুজা। আর নিজেরই অজান্তে খোঁপা থেকে খুনিয়াটা তুলে এনে আবার খোঁপাতেই গুঁজে রাখল। কিন্তু আকাশী কোথায়?

কোম্পানি-মহলের মদের দোকানে গিয়ে নেশা করে নেশায় চুরচুর হয়ে টলতে টলতে চলে গিয়েছিল বনের দিকে। ঘন গভীর বনে। হরিণ শিকার করবার খেয়াল হয়েছিল হঠাৎ।

এ-সময় হরিণ শিকার করা খুব সহজ। খুনিয়া কি কোপাই লাগে না, তীর-ধনুক লাগে না। শুধু ফাঁদ পেতে রাখতে হয়।

বনের ভেতর থেকে ঝিরঝির করে যেখান থেকে জল নেমে আসছে খাল বেয়ে তার পাশেই একটা ছোট্ট খাদের মতো। হাত পনেরো গভীর একটা কুয়োর মতো খাদ। তার মুখটায় পাটকাঠি কি সর বিছিয়ে তার ওপর কচি কচি নতুন পাতা এমনভাবে ছড়িয়ে রাখতে হয় যে দেখে মনেই হবে না তলায় খাদ আছে। খাটাস খরগোশ কি হরিণ বনশুয়োর বুঝতে না পেরে খাদ্যের লোভে ছুটে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে তার শরীরের ভারে পাটকাঠি সরকাঠি

ভেঙে সরসুদ্ধ গিয়ে পড়ে খাদের ভিতর। তারপর শুধু দড়ির ফাঁস ছুঁড়ে তুলে আনতে হয় শিকারটা।

যমুনী আর আকাশী গিয়েছিল সেই লোভে। খাদের মুখে পাতা দিয়ে ঢেকে দূরে লুকিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে করে কাটিয়েছে দুজনে। তারপর ফিরে এসেছে।

চাঁদনী রাত না হলে আসবে না হরিণ। পূর্ণিমার চাঁদ উঠলে আপনা থেকেই ছুটে আসবে জলের ধারে। আর তখন কচি কচি পাতার লোভে গিয়ে পড়বে ফাঁদের মাঝখানে।

ফাঁদের মুখটা ঠিক ঠিক ঢাকা হয়েছে কিনা দেখে ফিরে এল আকাশী।

এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল।

না, কই কুপি জ্বলছে না তার ঘরে। আলো নেই।

আল্‌ভা কোথায় তবে ? এপাশ-ওপাশ খুঁজল আকাশী, ভাবল, কোথাও বুঝি পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে লোকটা। কিন্তু না, কোথাও নেই।

তবে কি পাগল মানুষটা রাবা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ? কোথাও বসে বসে গান গাইছে না‌কি নিজের মনে ? না, তার সেই মোহরের স্বপ্ন দেখছে ?

কথাটা মনে হতে ফিক করে হেসে ফেলল সে নিজের মনেই।

উননটার কাছে এসে কুপি জ্বাললে। কিন্তু কই, আল্‌ভা তো নেই।

একটু যেন ধাক্কা খেল আকাশী। প্রতিদিনই ফিরে এসে দেখেছে সে, কিছু না কিছু খাবার আছে তার জন্য। কখনো কখনো আল্‌ভা নিজেও না খেয়ে বসে থাকতো।

তা দেখে মনে মনে কত হাসত আকাশী।

আজ আর হাসতে পারল না সে। হঠাৎ সমস্ত বুকটা কেমন যেন দুলে উঠল।

ছুটে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে। নিশ্চয় ফিরুজার কাছে গেছে আল্‌ভা।

কিন্তু ফিরুজার ঘর পর্যন্ত যেতে হল না। পথের মাঝখানেই দেখা হয়ে গেল তাব সঙ্গে।

অনেক কিছু ভেবে রেখেছিল ফিরুজা, অনেক কড়া কড়া কথা শোনাবে ঠিক করে রেখেছিল। তবু কিছুই বলতে পারল না সে।

শুধু বললে, দীর্ঘশ্বাসের সুরে বললে, আকাশী ! গায়েনভাই চলে গেছে রে, গায়েনভাই চলে গেছে।

—চলে গেছে ? অবিশ্বাসের কণ্ঠে যেন চিৎকার করে উঠল আকাশী।

আর ফিরুজার গলার স্বর যেন কান্নার মতো শোনাল।

বললে, হাঁ রে আকাশী, মনে দুখ পায়েছিল গায়েনভাই, টিয়ারঙ ছাড়ে চলে গেছে।

তারপর কাপড়ের খুঁট থেকে ময়লা কাগজের টুকরোটা বের করে ফিরুজা বললে, ই লকশাটা তরে দিয়ে গেছে গায়েনভাই। লুকানো লকশাটা তরে দিয়ে গেছে।

—লকশাটা ? সব কথাগুলোই যেন দুর্বোধ্য ঠেকে আকাশীর কাছে। সব কথাগুলোই যেন অবিশ্বাস্য।

আল্‌ভা, গায়েন আল্‌ভা চলে গেছে ? গুপ্তধনের নকশাটা তাকে দিয়ে গেছে ?

কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, গায়েনভাই কয়েছে কি, ঘরের সোনাটাই রইল না ফিরুজা, ই মাটির সোনা লিয়ে কি হবে।

বিস্মিত বিস্ফারিত দুটি বড় বড় চোখ মেলে ফিরুজার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল আকাশী। যেন কিছুই বুঝতে পারছে না সে।

চলে গেছে আল্‌ভা ! চলে গেছে টিয়ারঙ ছেড়ে। কিন্তু তার গুপ্তধনের লোভে নয়, মনে দুখ পেয়ে চলে গেছে।

ফিরুজা হাত বাড়িয়ে নকশাটা দিল আকাশীকে। দেখল আকাশীর দু-চোখ ভরে জল টলমল করছে।

ধীরে ধীরে নকশাটা হাতে নিল আকাশী, ধীরে ধীরে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলল। তারপর চিৎকার করে কেঁদে উঠে ফিরুজাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল আর কাঁদল।

তারপর হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়াল, আর পরমুহূর্তেই সমুদ্রের তীরের দিকে ছুটতে শুরু করল। উন্মাদ হরিণীর মতো।

টিয়ারঙের সমুদ্রের ঢেউ তখনো অবিরাম ছন্দে বেজে চলেছে। ঢেউয়ের পর ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে তীরের ওপর। যেন এক বিশাল বুকের অসীম বেদনা বার বার আছড়ে পড়ছে, ব্যর্থতার মাটিতে নীল সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে সুশুভ্র ফেনার রাশি নয়, যেন ব্যথাক্লান্ত দুটি শান্ত চোখের কোণে উন্মাদ অনুভূতি আর সজল অশ্রু ঝরে পড়ছে বারংবার।

যতদূর চোখ যায় শুধু সমুদ্র, সমুদ্র।

ছোট্ট এইটুকু টিয়ারঙ দ্বীপ, আর অসীম বন্ধহীন সমুদ্র। এ যেন আকাশীর জীবন। এ যেন মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছবি।

১৭

মানুষ বদলে গেল আকাশী। সেই ফুর্তির হাসি, সেই হালকা রঙ মুছে গেল মুখ থেকে। আল্‌ভাকেই ভালবেসেছিল সে, যম্‌নীকে নয়। যম্‌নীর মধ্যে পেয়েছিল রঙের নেশা, বিচিত্র এক উন্মাদনা। তাই নিজেরই অজান্তে আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে সে আল্‌ভাকে। আল্‌ভার বিষাদ করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে কৌতুক বোধ করেছে।

কিন্তু ভালবাসার মানুষ যতক্ষণ কাছে থাকে ততক্ষণ বুঝি বা তার মূল্য বোঝা যায় না। তাই আল্‌ভার অভাবে এমনভাবে তার সমস্ত জীবন নিঃস্ব হয়ে যাবে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি আকাশী।

সেই হাসি নিভে গেছে তার সেই মোহ ভেঙে গেছে।

আল্‌ভা চলে যাওয়ার পরই তাই মানুষ বদলে গেল আকাশী। উদাস ব্যর্থতার ছায়া পড়ল মুখে চোখে। ক্রমে ক্রমে একটা ক্রূর কুটিল হাসি চমক দিল তার রহস্যময় দুটি চোখের তারায়। হাসি নয়, জ্বালা। আক্রোশে জ্বলে উঠল আকাশী। হয়তো নিজেরই বিরুদ্ধে, আপন নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে। হয়তো বা সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে। চ্যাটার্জি, টিয়ারঙ, যম্‌নী, কোম্পানি-মহল—সব কিছুর ওপরই একটা প্রতিহিংসা নিতে চায় যেন।

এমনিই বুঝি হয়ে থাকে। যে নেশায় ভোলায়, নেশা ভেঙে গেলে তার ওপর আক্রোশটাই সবচেয়ে বেশি হয়।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে রইল আকাশী। না যম্‌নীর ডাকে সাড়া দেবে না আর। নাচবে না তার সঙ্গে জুড়ি বেঁধে। এমন কি বাবুপাড়ায় তামুদিদির বিয়ের দিনও নাচবে না। যম্‌নী যদি ডাকতে আসে তো বলবে বায়নার টাকা ফিরিয়ে দিতে।

টিয়ারঙের লোকগুলোকেও বুঝি ভুলে গিয়েছিল আকাশী। ভুলে গিয়েছিল টিয়ারঙীদের।

সবাই তাই চমকে উঠল আকাশীকে দেখে।

প্রতিদিনের মতোই আগুন জ্বালিয়ে ঘিরে বসে ছিল সকলে। মদ্‌না, ফিরুজা, যম্‌নীর বুড়ো বাপ আর বুধা। আরো অনেকে।

টিয়ারঙীরা সকলেই এসে হাজির হয়েছে, দেখলে আকাশী। বুঝল, কিছু একটা ঘটেছে। কোনো একটা চাঞ্চল্য।

গঞ্জমাঝিদের একজন বলছিল কি যেন। আকাশীকে আসতে দেখে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল তারা।

গঞ্জমাঝি বলছিল, লড়াই লেগেছে কোথায়।

গঞ্জমাঝিদের কয়েকটা ডিঙি নাকি ফিরে এসেছে। গঞ্জে যেতে পায়নি তারা, মাল বেচতে পায়নি। যেতে দেয়নি তারা টিয়ারঙীদের। কেন, তা ভাল করে বুঝতেও পারেনি গঞ্জমাঝিরা। শুধু শুনেছে, লড়াই লেগেছে ওদিকে কোথায়।

শুনে ভেতরে ভেতরে খেপে উঠেছে তারা। শুধু গোরা পল্টনদের ওপরই নয়, স্টিফেন্স কোম্পানির বাবুদের ওপরও। গঞ্জে মাল বেচতে না পেলে খাবে কি তারা। গোরা পল্টন আর কোম্পানির বাবু—সবই মাটির লোক। মাটির লোকগুলোই তাদের খাবার কেড়ে নিচ্ছে। দু-একজন গঞ্জমাঝি শুনে এসেছে, ওদিকের দ্বীপগুলো থেকে সব ধান কেড়ে নিয়ে গেছে মাটির লোক এসে। আতঙ্কে শিউরে উঠেছে সে-কথা শুনে। ভয় পেয়েছে, হয়তো তাদের ধানগুলোও কেড়ে নিয়ে যাবে।

তাই ভেতরে ভেতরে গুমরে ওঠে সকলে। স্টিফেন্স কোম্পানির লোকগুলোকে টিয়ারঙে আসতে দিয়ে বুঝি ভুলই করেছে।

বস্তির একপাশে আগুন ঘিরে বসে সবাই। বসে আলোচনা করে, কি করবে তারা, কি করা উচিত।

মাধো সর্দারকে যখন বন্দুকের গুলিতে খুন করেছিল বাবুটা, তখনই জটলা পাকিয়েছিল তারা। খুনিয়া আব কোপাই নিয়ে তাড়া করে যাবে, ভেবেছিল। কিন্তু পারেনি। কেউ কেউ পয়সার লোভ দেখেছিল, কাজ পাবে কোম্পানির কাছে, খেয়ে পরে বাঁচবে, স্বপ্ন দেখেছিল।

কিন্তু কই, সারাদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও তো কপাল বদলাতে পারল না তারা। বরং অভাব বেড়েছে তাদের। ঘরে চোলাই করে পচাইয়ের নেশায় মন ভরত আগে, এখন সকলেই ছুটে যায় কোম্পানি-এলাকার মদের দোকানটায়। রোজের টাকা চলে যায় মদের দোকানে, কলের কাপড় কিনতে। ক্ষেতে পুরো ধান হয় না আর আগের মতো, কিনতে হয় পয়সা দিয়ে।

ভেতরে ভেতরে তাই আগুন জমা হচ্ছিল। দপ করে জ্বলে উঠল তারা একটা খবরে।

ঝড়ে ঘর ভেঙে পড়লে বন থেকে গাছ কেটে এনে বাড়ি বানাত তারা, ডিঙি বানাত বনের কাঠ দিয়ে। জ্বালানি কুড়িয়ে আনত বন থেকে।

কোম্পানি নির্দেশ দিয়েছে, বনের একটা গাছও আর কাটতে পাবে না কেউ। জ্বালানি কুড়োতে পাবে না।

কোম্পানির নির্দেশ নয়, সরকারী নিষেধ। আর সে-নিষেধ মানছে কিনা দেখবার জন্যে এসেছে বনপুলিশের দপ্তর, জঙ্গল-দারোগা।

কোম্পানি আর সরকার, দুই সমান টিয়ারঙীদের চোখে। মাটির লোক ওরা, এসেছে দ্বীপের লোকগুলোর ওপর অত্যাচার করবার জন্যে। কিন্তু টিয়ারঙীরা গোলাম নয় ওদের। কোম্পানির কাজ করে টাকা নেয়, ভিক্ষে নয়।

সব শুনে খেপে উঠল মদ্না আর ফিরুজা। রাগে চিৎকার করে উঠল আকাশী।

হাতে খুনিয়া তুলে বললে, বারণ মানবো নাই উদের।

সকলেই আশ্চর্য হল। এমনটি যেন আশা করেনি উদের।

আকাশীও রেগে গেছে কোম্পানির আইন শুনে। হ্যাঁ, মাধো কোলাসোর মেয়ে বটে আকাশী। তার শরীরেও তাহলে টিয়ারঙের রক্ত আছে।

পুরুষগুলোও কোপাই তুলে তাই চিৎকার করে উঠল, সব গাছগুলান কাটে দিবো। পুড়ায় দিবো।

হ্যাঁ, সব গাছ কেটে ফেললে, পুড়িয়ে দিলে কিসের লোভে থাকবে লোকগুলো। চলে যাবে তারা। চলে যেতে বাধ্য হবে, আর শান্তি পাবে টিয়ারঙীরা। আবার নতুন বন হবে তাদের, আগেকার মতোই ধান বুনে আর মাছ ধরে দিন কাটবে তাদের।

কিন্তু চ্যাটার্জি যদি বন্দুক নিয়ে ছুটে আসে আগের মতো ? যদি মাধো সর্দারকে যেভাবে মেরেছে সেইভাবে তাদেরও গুলি করে ?

হাসল আকাশী।—কতগুলা বন্দুক আছে উদের ? আমরা মানুষ অনেক আছি।

তা ঠিক। এতগুলো মানুষকে মারবার মতো বন্দুক নেই ওদের।

রাতেব অন্ধকারে আগুন ঘিরে ষড়যন্ত্র চলল। না এভাবে ধীবে ধীরে টিয়ারঙকে গ্রাস করতে দেবে না তারা। কোম্পানির আইনকে রোধ করবে সমস্ত শক্তি দিয়ে, প্রয়োজন হলে প্রাণ দিয়ে।

আকাশী খুনিয়া তুলে চিৎকার করে উঠল।—বন আমাদের বটে, বনের গাছগুলোও আমাদের।

সবাই ঘাড় নেড়ে সায় দিল তার কথায়।

আকাশী বললে, গাছ কাটবো কাল, হুকুম মানবো নাই।

সবাই উত্তেজিত হয়ে চিৎকার কবে উঠল, মানবো নাই।

পরের দিন সত্যিই দল বেঁধে গাছ কাটতে শুরু করল টিয়াবঙীরা। কোপাই পড়তে শুরু করল গুড়ির পায়ে।

একটার পর একটা গাছ কেটে চলে তারা। বিরাট বিরাট গুঁড়িগুলো লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। আর সমস্বরে সকলেই চিৎকাব করে ওঠে, হুকুম মানবো নাই।

এদিকে খবর পৌঁছে গেল চ্যাটার্জির কাছে। পাঠক ছুটে এল।

বললে, কোম্পানির হুকুম গাছ কাটতে পাবে না কেউ।

শুনে অট্টহাসি হেসে উঠল টিয়ারঙীরা।—গাছ কাটবে নাই তো কোপাইটা বেকাব হবে ? তুদের কাটবো তবে।

চমকে উঠল পাঠক, তাদের চোখে নৃশংস উল্লাস দেখে।

বললে, বুড়ো মাধো সর্দার হুকুম না শুনে যেমনভাবে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিয়েছে তেমনিভাবে প্রাণ দিতে হবে টিয়ারঙীদের, আইন না মানলে।

তা শুনে সুপ্ত প্রতিহিংসাটা যেন জ্বলে উঠল আকাশীর বুকে। খুনিয়া নিয়ে তাড়া কবে গেল সে পাঠককে।

ভয়ে ছুটে পালাল পাঠক। কি আশ্চর্য, যে-নাচনী মেয়েটা যৌবন কাঁপিয়ে তাদেব মন ভোলাত এতদিন সেও এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে কেন ? কোন আক্রোশে ?

চ্যাটার্জিকে খবর দেবার জন্যে ছুটে যেতে যেতে হঠাৎ একটা মেঘ-গুরুগুরু আওয়াজ শুনে থমকে থেমে গেল পাঠক। আতঙ্কের চোখ তুলে তাকাল আকাশের দিকে। এক ঝাঁক উড়োজাহাজ চলেছে মাথার ওপর দিয়ে। শত্রুপক্ষের বোমারু বিমান নাকি এগুলো ? টিয়ারঙীরা কিন্তু বিচলিত নয় এ-আওয়াজে। কোনো খবরই রাখে না তারা।

যমুনীও কোনো খবরই রাখেনি, টিয়ারঙের মনে কি ঝড় এসেছে না এসেছে। বার বার এসে ফিরে গেছে সে, দেখা পায়নি আকাশীর।

হঠাৎ এমন পরিবর্তন যে আসতে পারে আকাশীব, ভাবতেও পারেনি।

প্রতিদিনের মতোই সেদিনও এল সে আকাশীর খোঁজে। দেখা হয়ে গেল মাঝপথেই।

এক মুখ হেসে এগিয়ে এল যমুনী।—আরে নাচনী হামার, কাঁহা ছিলি তু ইতনা দিন, তোকে ঢুঁড়ে ঢুঁড়ে…

বলতে বলতে সপ্রতিভাবেই আগের মতো আকাশীর হাত দুটো ধরলে যমুনী।

স্পর্শ বাঁচাবার জন্যেই যেন পিছিয়ে এল আকাশী। তা দেখে কেমন যেন অপ্রতিভ হয়ে গেল, হেসে উঠে অস্বস্তি কাটাতে চাইল যম্‌নী। বললে, নাচনী আছিস কি দুসরা কেউ।

আকাশীর সমস্ত শরীর যেন জ্বলে উঠল। যে-আক্রোশটা সুপ্ত ছিল তার মনের মধ্যে তা যেন জেগে উঠল হঠাৎ। কঠিন স্বরে বললে সে, আমি নাচনী হব নাই আর, জুড়ি বাঁধবো নাই তোর সাথে।

—হাঁ ? নাচেগা নাই ? বিস্মিত হল যেন যম্‌নী।

—না, নাচবো নাই, জুড়ি বাঁধবো নাই তোর সাথে।

হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল যম্‌নী।—নাচেগা নাই তো ফাটক হবে। জেল। রূপেয়া আডভান্স লিয়েছিস না বাবুদের কাছে।

—টাকা তুই লিয়েছিস।

হাসল যম্‌নী।—হাঁ, হাঁ, লেকিন নেশা তো তু করেছিস উ রূপেয়ায়। নাচ না দিখালে হামারও জেল হবে ফাটক হবে।

আকাশী রেগে গেল। বললে, তোর ফিরুজার সাথে জুড়ি বাঁধবি যা ক্যানে, তোর বেটাকে নাচ শিখাবি যা ক্যানে। আমি আর নাচবো নাই।

বলে তরতর করে অন্য পথ ধরে চলে গেল।

আর তার যাওয়ার পথের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল যম্‌নী। যেন ঠিক বুঝতে পারছে না সে মেয়েটাকে, যেন অবোধ্য মনে হচ্ছে তার ব্যবহার।

মুহূর্ত কয়েক কি যেন ভাবল সে, তারপর হাঁটতে শুরু করল তার বুড়া বাপের ডেরাটার দিকে।

এসে দেখল তেমনি বসে বসে দড়ি পাকাচ্ছে বুড়ো, আর দু-চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে তার। নিজের মনেই কাঁদছে।

এদিকে-ওদিকে তাকাতেই ফিরুজাকেও দেখতে পেল। একটা গাছের শুঁড়িতে ঠেস দিয়ে গল্প করছে সে বুধার সঙ্গে। আর তার কোলের বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে আদর করছে বুধা।

একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল যম্‌নী। মন ভরে গেল তার বুধা আর ফিরুজার হাসিহাসি মুখের দিকে তাকিয়ে।

ধীরে ধীরে বুড়োর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, বেটাকে লে যায়গা বুড়া, নাচ শিখায়েগা।

চমকে ফিরে তাকাল ফিরুজা, তার কথা শুনে। বুড়োবাপ ছানিপড়া দুটো চোখ তুলে খুঁজল যম্‌নীকে। জিজ্ঞেস করলে, কে যম্‌নী বটিস ?

—হাঁ।

বুধাকে ততক্ষণে বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে আতঙ্কের চোখ তুলে তাকিয়েছে ফিরুজা। তার দিকে যম্‌নী ফিরে তাকাতেই চিৎকার করে উঠল সে।—না দিবো নাই বুধারে, নাচ শিখাতে দিবো নাই।

হো হো করে অট্টহাসি হেসে উঠল যম্‌নী।—তুম চলো, তুম ভি নাচো।

বিস্ময়ে যম্‌নীর মুখের দিকে তাকাল ফিরুজা। লোকটা কি পাগল হয়ে গেছে নাকি।

তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়াল—হাঁ, নাচবো আমি নাচনী হবো। কিন্তু বুধাকে নাচ শিখাবি না তুই।

১৮

ফিরুজা জুড়ি বেঁধেছে যম্‌নীর সঙ্গে, ফিরুজা নাচ দেখাবে তামুদিদির বিয়ের রাতে।

ফাঁকা জায়গা একটু খালের ধার দিয়ে, সবুজ ঘাসে ঢাকা। সেখান থেকেই ঘুঙুরের আওয়াজ এল। বিস্ময়ে সেদিকে ফিরে তাকাল আকাশী। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেদিকে, দূরে দাঁড়িয়ে একটা গাছের আড়াল থেকে দেখল ফিরুজাকে নাচ শেখাচ্ছে যম্‌নী। আর একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে চ্যাটার্জি, বন্দুকে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নৃশংস রহস্যের হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আকাশীর মুখ। আজ সব হারিয়ে বাপ মাধো সর্দারের অভাবটা নতুন করে বুঝতে পারে আকাশী। দিনের পর দিন চ্যাটার্জিকে বন্দুক কাঁধে নিয়ে যেতে দেখেছে সে বনের দিকে। রহস্যের চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের সামনে যেন সেই পুরোনো দিনের দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছে।

ঐ বন্দুকের গুলিতে খুন হয়েছিল তার বাপ মাধো সর্দার।

আজ বহুদিন পরে তার শিরা-উপশিরায় আবার সেই নৃশংস রক্তটা নেচে উঠল।

যম্‌নীর ওপর আক্রোশে জ্বলে উঠেছিল আকাশী। তার শান্ত রক্তে নেশার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল যম্‌নী। আর নেশাকে দিনের পর দিন বাঁচিয়ে রেখেছিল ঐ মাটির মানুষগুলো কোম্পানি মহলের কুলিকামিন, বাংলোপাড়ার বাবুরা। আজ মনে হল সব অভিশাপের জন্যে দায়ি ঐ বন্দুক-হাতে চ্যাটার্জি, যাকে এতদিন তারা টিয়ারঙের রাজা ভেবেছিল।

বাপ মাধো সর্দারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়েও খুনিয়ায় হাত ওঠেনি আকাশীর, শুধু টিয়ারঙীদের নিষেধে। বন্দুকের গুলিতে সেদিন ভয় পেয়েছিল টিয়ারঙীরা। আর আল্‌ভাকে ঘিরে শান্তির স্বপ্ন দেখেছিল আকাশী।

আল্‌ভার রক্তে উন্মাদনা আনবার জন্যেই নাচের জুড়ি বেঁধেছিল সে যম্‌নীর সঙ্গে। ঈর্ষার শিখা জ্বালিয়ে আল্‌ভাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু নাচের অভিনয় করতে করতে কবে যেন অভিনয় ভুলে নাচের ঘূর্ণিতে নিজেকেই হারিয়ে ফেলেছিল আকাশী।

আজ আবার আক্রোশে জ্বলে উঠল আকাশী। না, ফিরুজাকে জুড়ি বাঁধতে দেবে না সে। যম্‌নীর নেশায় হয়তো তার মতোই ফিরুজাও ভুলেছে। মদ্‌নার সুখের সংসার নষ্ট হতে দেবে না।

যতবার আল্‌ভার কথা ভাবে ততবারই ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে তার ছোট্ট বুক। স্বপ্নের ঘোরে যেনপুরোনোদিনের দৃশ্যগুলো ভেসে ওঠে চোখের সামনে। রাবা হাতে আল্‌ভা বুঝি বা এখনো গান গাইছে, করুণ মিঠে সুর যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে।

স্মৃতির তারে টুংটাং সুর বাজে। গভীর একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে আকাশীর হৃদয় নিঙড়ে।

আঘাতের পর আঘাত দিয়েছে সে আল্‌ভাকে। নাচের নেশায়, টাকার লোভে, যম্‌নীর চোখের রঙে সব ভুলে গিয়েছিল আকাশী। বুঝতে পারেনি তার জীবন কানায় কানায় ভরে আছে আল্‌ভাকে ঘিরেই। তাই আল্‌ভা চলে গেছে, এ-খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত জীবন যেন শূন্য হয়ে গেল, তার সমস্ত হৃদয় যেন নিঃস্ব হয়ে গেল।

ক্রমে ক্রমে ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠল তার চোখে। প্রতিহিংসার উষ্ণ শোণিত চঞ্চল হয়ে উঠল তার শিরা-উপশিরায়।

কি যেন ভাবল আকাশী। তারপর হঠাৎ একসময় নিজের মনেই হেসে উঠল।

বাবুবাংলোর ওদিক থেকে কি একটা গান ভেসে আসছে। কলের গান বাজছে ছুটদিদের বাড়িতে। ত্রিপল টাঙানো হয়েছে, লতায়-পাতায় সুন্দর করে সাজানো হয়েছে বাড়িটা। আলোর সারি ঘিরে আছে সমস্ত বিবাহ-মণ্ডপ।

অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। চিৎকার আর হট্টগোল শোনা যাচ্ছে ওদিকে।

নতুনবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে তামুদিদির, তাদের ছুটদিদির। টিয়ারঙের বাবুপাড়া ভেঙে পড়েছে তাই চ্যাটার্জির বাড়িতে।

ককিয়ে কেঁদে উঠেছে সানাইয়ের সুর। সে-সুরে কেমন যেন উদাস হয়ে ওঠে আকাশীর ভাঙা মন। অবোধ্য এক ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করে।

ওভারসিয়ার পাঠকের কাছ থেকে আগাম নিয়ে বসে আছে যম্‌নী। ছুটদিদির বিয়েতে সারারাত নাচতে হবে।

হয়তো অপেক্ষা করে আছে যম্‌নী।

ধীরে ধীরে ঘরে ফিরে এল আকাশী। হ্যাঁ, নাচতে হবে তাকে। যম্‌নীর সঙ্গে জুড়ি বেঁধে সারা রাত নাচবে সে। চোখ ঝলসে দিতে হবে বাবুদের।

রঙবেরঙের নতুন ঘাগরাটা পরল আকাশী। রক্তের মতো লাল ঘাগরাটা গায়ে কালো আর হলুদের নকশা চমক দিল। বুকের উল্লাসে কাঁচুলির বাঁধন ঘিরে তার কালো চুলের পাশ দিয়ে জড়িয়ে নিল গোলাপী ওড়না।

মুখে রঙ, চোখের কোণে কাজল টানল। নিজেকে সাজাল আকাশী সুন্দর করে।

ছোট্ট আয়নাটায় বার বার নিজের রূপ দেখল। মনে হল, যেন টিয়ারঙের সবচেয়ে সুন্দরী যেন তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়তে চায় টিয়ারঙের প্রতিটি পুরুষ।

পায়ে রিঠের ঘুঙুর বেঁধে নিল আকাশী, হাতে নিল নাচের ঢোলক।

তারপর ঝুমঝুম ঝুমঝুম শব্দ তুলে অন্ধকারের পথ ধরে বাবুবাংলোর দিকে এগিয়ে চলল সে।

মাঝপথে দেখা হয়ে গেল যম্‌নীর সঙ্গে। ফিরুজার ঘরের দিকে চলেছে সে। অদ্ভুত পোশাকে সেজেছে সেও। রঙিন কুর্তা গায়ে, মাথায় পেখম।

দেখা হতেই একমুখ হেসে এগিয়ে এল আকাশী।—নাচ দিখাতে হবে না আজ ? তোরেই তো খুঁজছি সারাদিন।

খুশি হয়ে উঠে হাসল যম্‌নী। —আরে কাঁহা গিয়েছিলি পিয়ার, তুমারে ঢুন ঢুনকে তো হয়রান হয়ে গেলাম।

রহস্যময় মধুর হাসি হেসে যম্‌নীর হাতের সঙ্গে নিজের হাতটা লতার মতো জড়িয়ে দিল আকাশী। গায়ে ঢলে পড়ে বলল, আমি তো তুমারেই খুঁজতেছি গো।

—হাঁ ? বিস্ময়ে হাসল যম্‌নী। তারপর হঠাৎ আকাশীর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে তার রঙিন পোশাক ঝকঝকে মুখখানার দিকে তাকিয়ে বললে, তুম তো হামার দিলমে খুনিয়া বসায় দিছিস ! বলে হো হো করে অট্টহাসে হেসে উঠল যম্‌নী, নিজেরই রসিকতায়।

আকাশী হেসে বললে, আরে ই টিয়ারঙীদের চোখেই খুনিয়া দেখিস ? হাতেও খুনিয়া চমক দেয় !

আবার হেসে উঠল যম্‌নী।

তারপর দুজনে হাত ধরাধরি করে ছুটল বাবুবাংলোর দিকে। না আকাশীই এসেছে নাচতে, নিজে থেকেই এসেছে। ফিরুজাকে চায় না যম্‌নী।

ফাঁকা মাঠে খানিকটা জায়গা বাঁশ দিয়ে ঘেরা হয়েছে তখন। সামনে কুলিকামিনদের ভিড়। কে একজন তাসের খেলা দেখাচ্ছে, আর তা দেখে হইহই করে উঠছে সকলে।

যম্‌নী আর আকাশীকে আসতে দেখেই হল্লা করে দাঁড়িয়ে উঠল সকলে। চিৎকার শুরু করল। কেউ কেউ অশ্লীল রসিকতা করলে।

আকাশী হাসল রসিকতা শুনে। এমন অনেক শুনেছে সে, অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

যম্‌নীর পাশে পাশে এসে এক জায়গায় বসল দুজনে। তাসের খেলা দেখতে শুরু করলে।

তাসের খেলা শেষ হলে নাচ শুরু হবে।

কিন্তু লোকগুলো ক্রমশই অধৈর্য হয়ে ওঠে।

এদিকে আকাশী চতুর্দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি যেন দেখে, কি যেন খোঁজে। না, টিয়ারঙীরা কেউ আসেনি।

দ্বীপ থেকে নাকি মাটির মানুষগুলোকে তাড়িয়ে দিতে চায় টিয়ারঙীরা। বন পুড়িয়ে ছাই করে দিতে চায়। তাদের বন, তাদেরই গাছ, অথচ বাবুরা নাকি হুকুম দিয়েছে ঘর মেরামত করবার জন্যও তারা গাছ কাটতে পাবে না।

বনের গাছ যতদিন বাবুরাও নিয়েছে, তারাও পেয়েছে, ততদিন রাগ ছিল না কারো। কিন্তু একে একে সব বুঝি ছিনিয়ে নিতে চায় কোম্পানি। তাদের জঙ্গলের গাছ কিনা কিনতে হবে কোম্পানির কাছ থেকে!

হঠাৎ একটা হল্লা হতেই তন্ময়তা ভেঙে গেল তার।

তাসের খেলা হয়েছে, এবার শুরু করতে হবে তার নাচ। পায়ে রিঠের ঘুঙুর বেজে উঠল ঝুমঝুম করে। উঠে দাঁড়াল আকাশী, হাতের ঢোলক বাজিয়ে, শরীরের ছন্দ নাচিয়ে।

উদ্দাম যৌবনের শরীরে লুব্ধতার হিল্লোল। অপরূপ একটি স্বাস্থ্যভরা দেহ নয়, যেন তরঙ্গ উত্তাল একটি সমুদ্র। নাচের ছন্দ নয়, যেন কামনাব তটে ভেঙে পড়েছে এক একটি মাংসের ঢেউ। সমুদ্রের মতো রহস্যময়, সমুদ্রের মতো উন্মাদ, সমুদ্রের মতো ছন্দময়। নাচের ঘূর্ণিতে উন্মাদ হয়ে ওঠে আকাশী। রক্তলাল ঘাগরা উড়ে পড়ে, ওড়না ভেসে বেড়ায়, ঘুঙুর বেজে চ'লে অবিরাম, আর আকাশীর হাতে ঢোলক বেজে ওঠে উদ্দাম হয়ে।

অদ্ভুত পোশাক পরে ধীরে ধীরে যম্‌নীও এসে জুড়ি বাঁধে আসরের মাঝখানে। আর নাচের তালে তালে গানের কলি ছুঁড়ে দেয় আকাশী।

আনন্দে ফুর্তিতে চিৎকার হট্টগোল করে ওঠে দর্শকের দল।

যম্‌নী নিজেও যেন বিস্মিত হয়। কামবিমুগ্ধা হরিণীর মতো আত্মহারা আনন্দে নেচে চলেছে আকাশী। তার চোখের প্রতিটি তির্যক্ ইঙ্গিত যেন রহস্যময়, প্রতিটি কটাক্ষ যেন বসে উদ্বেল।

নাচের নেশায় বুঝি সব ভুলে গেছে আকাশী। বুঝি আল্‌ভাকেও ভুলে গেছে!

ওদিকে সানাই সুর ধরেছে বাবুবাংলোয়।

এক চক্র নেচে এসে আসরের একপাশে বসল যম্‌নী আর আকাশী। কুলিকামিনদেবই কে একজন হারমোনিয়াম নিয়ে গান শুরু করেছে। ততক্ষণ বিশ্রাম নেবে দুজনে।

গান শেষ হয়ে গেল কিছুক্ষণ পরেই। আবার নাচ চাই, নাচ।

ওদিকে বাবুবাংলো থেকে শাঁখের আওয়াজ আসছে। বিয়ে হচ্ছে তামুদিদির, নতুনবাবুর সঙ্গে তামুদিদির বিয়ে হচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল আকাশীর, কেমন যেন উদাস।

হয়তো ক্ষণিকের জন্যে আল্‌ভার কথা মনে পড়ল।

কিন্তু মনেব খোঁজ রাখে না দর্শকের দল। নাচ চায় তারা, নাচ।

চিৎকার করে উঠল সকলে। তা শুনে ইশারা করল যম্‌নী। আসরে নামতে হবে।

আকাশীর শরীর যেন ক্লান্ত। নাচের মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছে।

ধীরে ধীরে বললে সে, টুকুন নেশা না করলে লাচতে পাববো নাই।

নেশা? ঠিকই তো, নেশা না হলে কি নাচা যায়?

যম্‌নীর কথা শুনে একটা বোতল এনে দিলে কে একজন। ঢকঢক করে তার খানিকটা খেয়ে নিল যম্‌নী, বাকিটা গলায় ঢেলে দিল আকাশী। মুহূর্তে কান গরম হয়ে উঠল, তার শরীরে ফুর্তি এল।

ঝুমঝুম ঝুমঝুম ঘুঙুর বেজে উঠল আবার। আসরে নামল যম্‌নী আর আকাশী। রক্তলাল ঘাগরা উড়ল, ঢোলক বাজল ডুমডুম ডুমডুম। উদ্দাম যৌবনের হিল্লোল, উদ্ধত কাঁচুলির স্পন্দন। নাচের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে যেন আকাশী, ঘূর্ণির মতো ঘুরছে ঘাগরার মগজি। দেহের ছন্দ নয়, যেন উত্তাল সমুদ্রের তরঙ্গ, অরণ্যের উন্মাদ ঝড়তুফান।

ঘন ঘন বাহবা দেয় দর্শকের দল। আর যম্‌নীর সঙ্গে জুড়ি বেঁধে নানা বিচিত্র ছন্দে, নানা বিচিত্র ভঙ্গিতে নেচে চলে আকাশী।

কেউ বুঝতে পারে না আকাশীর মনের মধ্যে কি ঝড় উঠেছে।

নাচের নেশায় সব যেন ভুলে গেছে আকাশী। নাচের ঘূর্ণিতে সবাই বুঝি মেতে উঠেছে।

আবার একবার বাহবা দিতে গিয়েই হঠাৎ যম্‌নীর চিৎকার শুনে থেমে গেল দর্শকের দল। বিস্ময়ে, দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে তাকাল তারা। এটাও নাচের একটা অঙ্গ কিনা বুঝতে পারছে না যেন।

না, নাচ নয়। অভিনয় নয়।

উন্মাদের মতো নেচে চলেছিল যম্‌নী আর আকাশী। ডুমডুম ডুমডুম বেজে চলেছিল আকাশীর হাতের ঢোলক। বেজে চলেছিল ঘুঙুরের বোল।

এমন সময় হঠাৎ আসর ছেড়ে ছুটতে শুরু করল আকাশী।

কি ব্যাপার কেউ বুঝল না। পাগল হয়ে গেছে নাকি মেয়েটা?

বিভ্রান্ত দর্শকের দল হইহই করে উঠে দাঁড়াল।

ভিড় ভেঙে পড়ল আসরের ওপর। কিন্তু তার আগেই ছুটতে শুরু করেছে আকাশী।

কয়েকজন তার পিছনে পিছনে ছুটে গেল। কিন্তু টিয়ারঙী মেয়েদের সঙ্গে ছুটতে পারবে কেন তারা। দ্রুত মিলিয়ে গেল আকাশী অন্ধকারের মধ্যে।

অন্ধকার ঘন গভীর বনের দিকে ছুটন্ত একজোড়া ঘুঙুরের আওয়াজ মিলিয়ে গেল।

১৯

ফিসফাস কানাঘুষো শুরু হয়েছিল পরের দিন সকাল থেকেই। চ্যাটার্জির কানে এসে পৌঁছল সন্ধের দিকে।

খবর শুনেই দপ করে জ্বলে উঠল চ্যাটার্জি। দু-একদিনের মধ্যে সরকারী নোটিশ এসে পৌঁছবে, বোমার ভয়ে টিয়ারঙকে জনশূন্য করে পালাতে হবে সকলকে। তবু দায়িত্ব ভুলতে পারে না চ্যাটার্জি। টিয়ারঙীদের সাহস যেন দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। রেঞ্জারের নির্দেশ অমান্য করে বার বার তারা কমবয়েসী গাছ কেটেছে নিজেদের প্রয়োজনে। কোম্পানির ইজারা নেওয়া বনের গাছ কেটে নিয়ে গেছে ঘরদোর বানাবার জন্যে। নিষেধ শোনেনি! কিন্তু এমনভাবে বনে আগুন লাগিয়ে দেবে তারা, কল্পনাও করেনি কেউ।

বুড়ো মাধো সর্দারের মৃত্যুর পর তাহলে টিয়ারঙীরা ঠাণ্ডা হয়ে যায়নি। আগুনটা ভেতরে ভেতরে চাপা ছিল শুধু।

চ্যাটার্জি শুনল, খুনিয়া, কোপাই লাঠি, গুলতাই নিয়ে সব নাকি সাজ সাজ রব তুলেছে। কোম্পানিব লোকগুলোকে—'মাটি' থেকে যারা এসেছে—তাদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে মেয়েপুরুষ সকলেই নাকি তৈরি হচ্ছে।

প্রথমটা শুনে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিল চ্যাটার্জি।

ওভারসিয়ার পাঠক খবরটা শুনেই ছুটে এল চ্যাটার্জির কাছে। সারাটা রাত কেটেছে

বিয়ের হইহাল্লায়। তার ওপর নাচওয়ালা যম্নীকে খুন করে পালিয়েছে নাচনী মেয়েটা। আসরের মাঝখানে খুন হয়েছে, তাই নিয়েই ব্যস্ত ছিল সকলে। টিয়ারঙের বনেজঙ্গলে কি হচ্ছে তার হিসেব রাখেনি।

কিন্তু পরের দিন সকাল থেকেই খবর আসতে শুরু হল কুলিকামিনদের কাছ থেকে।

কিছু একটা ষড়যন্ত্র যদি না থাকবে তো টিয়ারঙীরা আসেনি কেন নাচ দেখতে, তাসের খেলা দেখতে, গান শুনতে ?

বিয়ের রাতে অনেক দূরে বনের একদিকটায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেছে কেন ?

কাজে আসেনি কেন টিয়ারঙীরা ?

অমিয়বাবু ভয় পেয়ে গেলেন, পাঠক ভয় পেয়ে গেল। না, চ্যাটার্জি সাহেবের কানে তুলতে হবে কথাটা।

অমিয়বাবু শুধু বললেন, আর এ নিয়ে গোলমাল করে লাভ নেই পাঠক। দিনকয়েকের মধ্যেই জাহাজটা এসে পৌঁছচ্ছে।

টিয়ারঙ তো ছেড়ে যেতে হবে সকলকে। পাঠকও জানে সে-খবর। যুদ্ধ এগিয়ে আসছে এদিকে। তাই সরকারী নির্দেশ এসেছে টিয়ারঙ ছেড়ে চলে যেতে হবে সকলকে।

ওদিকের কোন একটা দ্বীপে নাকি বোমা পড়েছে। টিয়ারঙেও পড়তে পারে।

পাঠক বললে, কথাটা ঠিকই বলেছেন অমিয়বাবু, কিন্তু লড়াই তো দু-চার রোজ বাদেই থেমে যাবে। তখন তো ফিরতে হবে আবার।

শেষ পর্যন্ত চ্যাটার্জি সাহেবের কাছে খবরটা পৌঁছে দেওয়াই ঠিক হল।

শুনল চ্যাটার্জি। শুনেই দপ্ করে জ্বলে উঠল রাগে।

বিয়েবাড়ির রেশ তখনো শেষ হয়নি । সকলেই ক্লান্ত। গত রাত্রির উৎসবশেষের অবহেলা প্রতিটি কোণে।

কিন্তু চ্যাটার্জির কাছে দায়িত্ব অনেক বড়। এভাবে দিনের পর দিন একটার পর একটা বন পুড়িয়ে নষ্ট করতে দেবে না সে টিয়ারঙীদের।

কোনো কথা না বলে ঘরের ভেতর থেকে বন্দুকটা বের করে আনল চ্যাটার্জি। তারপর জঙ্গলের দিকে পা বাড়াতে গেল।

—একা যাবেন সার! বিস্মিত হল পাঠক।

হাসল চ্যাটার্জি।—হ্যাঁ।

পাঠক বললে, তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব।

—না। রূঢ় কঠিন স্বরের উত্তর এল।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকাল পাঠক। বলে কি লোকটা! এই একটা বন্দুক নিয়ে লড়তে যাবে একদল বুনো টিয়ারঙীর সঙ্গে ?

চ্যাটার্জি কোনো কথা বলল না আর। লম্বা লম্বা পা ফেলে কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়ে এগিয়ে চলল বনের দিকে। আর দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল পাঠক, তাকিয়ে রইলেন অমিয় বাবু।

ধীরে ধীরে চ্যাটার্জির সুদীর্ঘ চেহারার ছায়াশরীর মিলিয়ে গেল দূরের অন্ধকারে।

পাঠক বললে, না অমিয়বাবু, এভাবে চ্যাটার্জি সাহেবকে একা যেতে দেওয়া উচিত হবে না। চলুন কুলিদের একটা দলকে ডেকে নিয়ে আমরা পিছনে পিছনে যাই।

—তাই চলুন। বললেন অমিয়বাবু।

দ্রুতপায়ে কুলিবস্তির দিকে ছুটল পাঠক। কোম্পানি বস্তির বেশ কিছু লোক নিয়ে যেতে হবে—চ্যাটার্জি সাহেবের পিছনে পিছনে।

এদিকে বন্দুক হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঘন গভীর বনের দিকে এগিয়ে চলে চ্যাটার্জি। জঙ্গলের যেদিকটায় তখনো শিখা উঠছে থেকে থেকে, সেই দিকে। লেলিহান কয়েকটা শিখা আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে।

দূর থেকে একটা অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসছে। আর মাঝে মঝে ডুগডুগির শব্দ চঞ্চল হয়ে উঠছে। যেন উল্লাসে বিকট চিৎকার করে উঠছে টিয়ারঙীর দল।

ঈষৎ চন্দ্রালোকের অস্পষ্ট আলোয় পথ চিনে চিনে এগিয়ে চলে চ্যাটার্জি। খালের পাড় ধরে। কুলকুল স্বরে জল বইছে খালে। চাঁদের ছায়া পড়েছে তার ওপর।

এদিকে ঘন বনে অদ্ভুত কি একটা পাখির চিৎকার।

হঠাৎ বনঝোপের পাশ থেকে কে যেন খিলখিল করে হেসে উঠল। রহস্যময় নারীকণ্ঠের উচ্চকিত হাসি।

থমকে দাঁড়াল চ্যাটার্জি। এদিক-ওদিক তাকাল দুর্বোধ্য দৃষ্টিতে। না, আবছা অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না। হয়তো কোন বুনো পাখির চিৎকার।

আবার চলতে শুরু করল চ্যাটার্জি।

কিন্তু দু-পা না এগোতেই আবার খিলখিল করে কে যেন হেসে উঠল।

এবার আর বিস্ময় নয়। গা ছমছম করে উঠল চ্যাটার্জির। একটা ধূর্ত চিতাবাঘ যেন তার অলক্ষ্যে থেকে তাকেই লক্ষ্য করে চলেছে। যেন সেই বাঘিনীর মর্জির ওপর নির্ভর করেছে চ্যাটার্জির জীবন। যে কোনো মুহূর্তে বুঝি লাফ দিয়ে পড়তে পারে।

তবু মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে চলতে শুরু করে চ্যাটার্জি। অথচ থেকে থেকে সেই রহস্যের হাসি বেজে ওঠে, নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসি শুনে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে চ্যাটার্জি;

হঠাৎ থেমে দাঁড়ায় চ্যাটার্জি। চিৎকার করে ওঠে, কে ? কে তুই ?

মুহূর্তের মধ্যে হাসি থেমে যায়। চাবিদিকে নিস্তব্ধ, কোনো শব্দ নেই, কোনো কথা নেই।

আবার যেই চলতে শুরু করে চ্যাটার্জি সশব্দ হাসি ভেসে আসে পাশ থেকে।

শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে যায় চ্যাটার্জি, চিৎকার করে বলে, কে, কে তুই ?

পরমুহূর্তে ঠিক উলটো দিক থেকে কে যেন খিলখিল করে হেসে ওঠে।

সামনে পিছনে, ডাইনে বাঁয়ে, যেদিকেই ছুটে যায়, অশরীরী প্রেতাত্মার মতো ছায়াশরীর মিলিয়ে যায়, আর ক্ষণপরেই বিপরীত দিক থেকে উচ্চকিত হাসির আওয়াজ ভেসে আসে।

বিভ্রান্ত চ্যাটার্জি উন্মাদের মতো ছুটে বেড়ায়। স্বেদবিন্দু ঝরে পড়ে তার কপাল থেকে।

ক্লান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে চ্যাটার্জি। কি যেন ভাবে। তারপর দূরে যেখানে বনের প্রান্তে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করেছে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

আর সেই মুহূর্তে একটি নারীর রহস্যময় ছায়াশরীর এসে দাঁড়ায় সামনে। খিলখিল হাসির সুরে প্রশ্ন করে, পথ হারাইয়াছিস রে বাবু ?

—কে, কে তুই ? দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসে চ্যাটার্জি। বুঝি ধরে ফেলতে চায় রহস্যে ঘেরা মেয়েটিকে।

কিন্তু তার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেছে টিয়ারঙী মেয়েটা।

আবার চলতে শুরু করেছে চ্যাটার্জি, আবার খিলখিল হাসির শব্দ। চ্যাটার্জি বুঝতে পারে গন্তব্য ভুলে ক্রমশই সে হাসির শব্দ লক্ষ্য করতে করতে ঝরনাটার দিকে এগিয়ে চলেছে তবু ফিরে আসতে পারে না।

—উদিকে যাস্ না রে বাবু, চিতা আছে উদিক পানে।

হঠাৎ কানের পাশ দিয়েই যেন বলে যায় মেয়েটা। বলেই আবছায়ায় ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়।

অন্ধকারের দিকে লক্ষ্য করে চ্যাটার্জি বলে, চিতা মারতেই তো এসেছি। বন্দুক আছে

হাতে। বলে উঁচিয়ে ধরে। হয়তো বা মেয়েটাকে ভয় দেখাবার জন্যেই।

কিন্তু ভয় কাকে বলে জানে না টিয়ারঙীরা।

তাই হেসে ওঠে মেয়েটা। বলে, চিতা কি গুলি করে মারবার জিনিস রে বাবু!

—নয়? বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করে চ্যাটার্জি।

উত্তর আসে, না রে বাবু, ও হাতে মারবার জিনিস বটে। খুনিয়া দিয়ে মারতে লাগে।

বলেই খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, চিতা মারবি বাবু? চিতা আছে উ দিকে।

মেয়েটির খিলখিল হাসি কি যেন নেশা ধরায় চ্যাটার্জির মনে। কি এক অবোধ্য আকর্ষণ। কিছুতেই যেন ছেড়ে যেতে পারে না, কিছুতেই যেন ভুলতে পারে না।

চ্যাটার্জি বলে, নারে, চিতা মারতে আসিনি।

—শিকার করবি না তো উ বন্দুকটা কাঁধে লিয়েছিস কেন রে বাবু? বলে আবার হেসে ওঠে মেয়েটা।

তারপর চ্যাটার্জির সামনে এসে দাঁড়ায়

মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখে চ্যাটার্জি। টিয়ারঙের বুনো মেয়ের শরীরে এমন রূপযৌবন, এমন মোহময় আকর্ষণ।

উদ্‌ভ্রান্ত বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে চ্যাটার্জি ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করে টিয়ারঙীরা কোথায় জটলা পাকিয়েছে, বনে আগুন দেবে কিনা।

মেয়েটা এগিয়ে আসে প্রশ্ন শুনে।

বলে, হাঁ রে বাবু। ঐ দুশমনগুলো জ্বালায় দিবে বনটা, টিয়ারঙটা জ্বালায় দিবে।

চ্যাটার্জি ফিসফিস করে বলে, ওরা কোথায়? কোনদিকে?

হেসে ওঠে মেয়েটা।—আমায় কি দিবি বল আগে। উদেব ধরায় দিব তো আমায় কি দিবি বল ক্যানে।

চ্যাটার্জি ফিসফিস করে বলে, টাকা দেব। এই নে টাকা—

বলে পকেট থেকে টাকা বের করে এগিয়ে দেয় চ্যাটার্জি।

মেয়েটা তবু তুলে নেয় না টাকাটা। দূর থেকে হাত পেতে বলে, দে ছুঁড়ে দে।

টাকাটা ছুঁড়ে দেয় চ্যাটার্জি।

টুপ করে সেটা লুফে নেয় মেয়েটা। তারপর ফিসফিস করেই বলে, আয়, আমার সাথে সাথে আয় রে বাবু।

বলে তরতর করে এগিয়ে চলে আঁকাবাঁকা পথ বেয়ে; আবছা অন্ধকার ঝোপের ভেতর দিয়ে। বনের রাস্তা পার হয়ে সরু ঝরনাটার ধার দিয়ে এক জায়গায় এসে থামল মেয়েটা।

বললে, সিধা চলে যা বাবু! টুকুন গেলেই উদের দেখতে পাবি।

—তুই যাবি না?

আতঙ্কের ছাপ ফুটল মেয়েটার মুখে চোখে।

বললে, না রে বাবু, টাকা লিয়ে ধরায় দিছি উদের, শুনলে খুনিয়া বসায় দিবে।

চ্যাটার্জি পকেট থেকে আরেকটা টাকা বের করে ছুঁড়ে দিল আগের মতোই।

আগের মতোই টুপ করে সেটা লুফে নিল মেয়েটা। তারপর দাঁড়িয়ে রইল। ফিসফিস করে বললে, সিধা চলে যা রে বাবু।

নির্ভয় নিঃশঙ্কভাবে জোরে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গেল চ্যাটার্জি। আর রুদ্ধনিশ্বাসে যেন অপেক্ষা করে রইল মেয়েটা।

হ্যাঁ, ঠিক পথ ধরেই চলেছে বাবুটা। ঠিক পথ ধরেই।

কয়েক মুহূর্ত শুধু। তারপর চিৎকার করে উঠল চ্যাটার্জি।

হরিণ ধরবার ফাঁদটা বুঝতে পারেনি চ্যাটার্জি। লতাপাতার ওপর পা ফেলতেই হুড়মুড়

করে একেবারে গর্তে পড়ে গেছে সে।

চিৎকার করে উঠল চ্যাটার্জি। আর সঙ্গে সঙ্গে খিলখিল হাসি শুনতে পেল।

হাসির ঝরনা যেন। থামতে চায় না। কৌতুকে লুটিয়ে পড়ে হাসছে একটা বুনো মেয়ে। একটা নৃশংস টিয়ারঙীর উন্মাদ হাসি ভেঙে ভেঙে পড়ছে।

চিৎকার করে চ্যাটার্জি।

গভীর খাদটায় পড়ে গিয়ে ওঠবার চেষ্টা করে। কিন্তু নরম কাদায় পা বসে যায় তার। যত প্রাণপণ চেষ্টা করে ততই কাদায় পা বসে যায়।

করুণ স্বরে চিৎকার করে চ্যাটার্জি।—ওরে বাঁচা, বাঁচা আমাকে।

আর খিলখিল রহস্যময় হাসির প্রতিধ্বনি ভেসে আসে ওপর থেকে।

চ্যাটার্জি চিৎকার করে, তোকে অনেক টাকা দেব, টাকা দেব অনেক, বাঁচা, আমাকে বাঁচা।

আর টিয়ারঙী মেয়েটা উঁকি দিয়ে দেখে ওপর থেকে আর হাসি নয়, যেন শাণিত একজোড়া ছুরির আওয়াজ।

রহস্যময় মেয়েটার খিলখিল হাসি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। উঁকি মেরে, আমি আকাশী বটি রে বাবু, নাচনী আকাশী বটি।

—বাঁচা আকাশী বাঁচা। চিৎকার করে চ্যাটার্জি।

কৌতুকে হেসে ওঠে আকাশী। বলে, আমার বুড়ো বাপটারে, মাধো সর্দারটারে গুলি করেছিলি তুই।

ভয়ে আতঙ্কে চিৎকার করে চ্যাটার্জি অনুনয় করে, ক্ষমা কর্ আকাশী, বাঁচা আমাকে বাঁচা।

কিন্তু সে-অনুনয়ে মন টলে না আকাশীর। খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, আমার বুড়া বাপটা ক্ষমা করবে তরে, যা বুড়া বাপটার কাছে যা।

বলে খিলখিল করে হেসে উঠেই নাচতে নাচতে বস্তির দিকে ছুটে চলে যায় আকাশী। আনন্দে, ফুর্তিতে সমস্ত মন যেন তার পূর্ণিমার চাঁদের মতো ভরে উঠেছে।

নিজের মনে নাচতে নাচতে বলে, যা আমার বুড়া বাপটার কাছে যা। আর সঙ্গে খিলখিল হাসিতে লুটিয়ে পড়ে। যেন কত বড় কৌতুক, কত বড় রসিকতা।

২০

চ্যাটার্জিকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

খুঁজে পাওয়া গেল শুধু বন্দুকটা। হরিণ ধরবার ফাঁদটার ওপর বন্দুকটা কুড়িয়ে পেল পাঠক। চ্যাটার্জির সমস্ত শরীরটা তখন চোরাকাদায় ডুবে গেছে।

কান্নার রোল উঠল বাবুবাংলোয়। বিস্মিত হল সকলেই। এভাবে পথ ভুল করে তিলে তিলে মৃত্যুবরণ করতে হবে চ্যাটার্জিকে, কেউ কল্পনাও করেনি। তাই কেউ বুঝতে পারল না, নাচনী মেয়েটা পাগলের মতো খিলখিল করে হেসে উঠছে কেন নিজের মনেই।

হ্যাঁ, ধরা পড়েছে আকাশী, নিজেই এসে ধরা দিয়েছে সে। কিন্তু পাগল হয়ে গেছে মেয়েটা। উন্মাদ হয়ে গেছে। কেন যেন হঠাৎ নিজের মনেই খিলখিল করে হেসে ওঠে সে কেউ বুঝতে পারে না।

টিয়ারঙীরাও বুঝতে পারে না, কি হল চ্যাটার্জির!

তাই সবচেয়েও বিস্মিত হল টিয়ারঙীরাই। খবর শুনেই ছুটে এল তারা

কোম্পানি-মহলে। চ্যাটার্জির বাংলোর সামনে।

ফিরুজাও ছুটে এল। তাপুদিদির পায়ের কছে লুটিয়ে পড়ে কাঁদল সেও। তাপসীকে বার বার বোঝাতে চাইলে, টিয়ারঙীরা খুন করেনি চ্যাটার্জিকে ; টিয়ারঙীরা জানে না চ্যাটার্জি কোথায়। কেউ বললে, অন্ধকারে হয়তো পা পিছলে খালের জলে ভেসে গেছে। কেউ বললে, চিতা বাঘ তাকে টেনে নিয়ে গেছে গভীর জঙ্গলের ভেতর।

চ্যাটার্জির রহস্যময় মৃত্যুর খবর শুনে সব বিদ্বেষ যেন নিমেষে মিলিয়ে গেল টিয়ারঙীদের মন থেকে।

যাই ঘটে থাক, সবচেয়েও বড় সত্য হল চ্যাটার্জি বেঁচে নেই।

সমস্ত কোম্পানি-মহল যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে এ-খবর শুনে। বিষণ্ণ করুণ একটা স্তব্ধতা ঘিরে আছে চতুর্দিক।

শুধু চ্যাটার্জির মৃত্যুই নয়, বিষণ্ণ হবার মতো আরেকটি পরোয়ানা এসে পৌঁছেছে টিয়ারঙে।

জাহাজ এসে পৌঁছবে দু-একদিনের মধ্যেই। সরকারী নির্দেশ এসেছে টিয়ারঙ ছেড়ে ‘মাটি’তে চলে যেতে হবে সকলকে। টিয়ারঙীরাও থাকতে পাবে না।

বসে বসে চোখের জল ফেলবার সময় নেই আর। চিন্তা করবার সময় নেই। কোম্পানি-মহলের সকলেই উঠে পড়ে লেগেছে জিনিসপত্তর গোছগাছ করতে। জাহাজ এসে পৌঁছলে আর সময় পাবে না তারা।

হঠাৎ একটা বিচিত্র শব্দ শুনে ছুটে এল টিয়ারঙীরা, কোম্পানি-মহলের কুলিকামিনরা।

উড়োজাহাজ, উড়োজাহাজ!

সমুদ্রের জাহাজ নয়, আকাশের জাহাজ। এক ঝাঁক প্লেন উড়ে চলে গেল টিয়ারঙের ওপর দিয়ে। ভয়ে, বিস্ময়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল সকলে।

এই উড়োজাহাজ নাকি বোমা ফেলে যায়, বোমার আগুনে ধ্বংস করে যায় সব কিছু।

কোম্পানির লোকেদের ওপর টিয়ারঙীদের যেটুকু আক্রোশ, চ্যাটার্জির মৃত্যুতে তা মুছে গিয়েছিল। বোমার ভয়ে এক হয়ে গেল সকলেই।

উদ্‌গ্রীব উৎকণ্ঠায় সকলেই একে একে এসে জড়ো হল জাহাজঘাটার সামনে, সমুদ্রের তীরে।

শুধু ফিরুজা চলে গেল টিয়ারঙীদের সকলকে খবর দিতে।

বুমা, বুমা। এক কথা টিয়ারঙীদের মুখে মুখে। আকাশে ভাসতে ভাসতে তাদের মাথার ওপব দিয়ে হাওয়াই জাহাজ যেতে দেখেছে তারা। কি ভীষণ গর্জন তার। বাজ পড়বার পূর্বমুহূর্তে যেমন মেঘের আওয়াজ হয়, এও যেন তেমনি। বোমা পড়বার আগে উড়োজাহাজের গর্জন।

গঞ্জমাঝিদের কাছে বোমার গল্প শুনেছে টিয়ারঙীরা। সে-আগুনে নাকি সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ধ্বংস হয়ে যায় সব কিছু।

সুতরাং পালাতে হবে, টিয়ারঙ ছেড়ে পালাতে হবে তাদের।

জিনিসপত্তর গোছগাছ করতে শুরু করে টিয়ারঙীরাও।

জাহাজ আসছে, জাহাজ এসে পৌঁছবে দু-একদিনের মধ্যেই।

কোলের বাচ্চাটা বাম্বুকে ঝুলায় শুইয়ে রেখে ঘরে ঘরে খবর জানিয়ে আসতে ছুটল ফিরুজা। সব প্রথমে মনে পড়ল যম্‌নীর বুড়ো বাপ আর তার ছেলে বুধাকে। বুড়োটা আধ-কানা, চোখে দেখতে পায় না! তার ওপর হাঁটতে পারে না সোজা হয়ে। আর বুড়ো অন্ধ তো বুধাও অন্ধ। ছায়ার মতো বুড়ার পিছনে পিছনে ঘোরে সে, বুড়োকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে জায়গা করে নিতে পারবে না।

যেতে যেতে আরো সকলকে তৈরি হতে বলে দিল ফিরুজা। তৈরি তারা হয়েই আছে। খবর তারাও শুনেছে।

এদিকে ঝড় উঠছে। ঝড় শুরু হবে মনে হচ্ছে। সনসন সনসন পাতা নড়তে শুরু হয়েছে গাছের।

সমস্ত পাড়াটা ঘুরে যমুনীর বুড়ো বাপ আর বুধাকে তৈরি হতে বলে ফিরে এল ফিরুজা।

ফিরে এসে দেখলে চিৎকার করে কাঁদছে বাচ্চাটা।

মদ্‌না চাটাই পেতে শুয়ে ছিল। কান্না শুনে, আর নয়তো ফিরুজার চিৎকারে সেও ধড়মড় করে উঠে পড়ল। ছুটে গেল বান্নুর কাছে।

একটা ভয়ঙ্কর মাকড়সা। ঝুলার দড়ি বেয়ে বেয়ে একটা মাকড়সা নেমে এসে কামড় বসিয়েছে বান্নুর হাতে। এক ফোঁটা লাল রক্ত জমে আছে সেখানটায়। প্রবালের তাবিজের মতো।

মদ্‌না একমুহূর্ত থমকে চেয়ে রইল কালো মাকড়সাটার দিকে। তারপর অদ্ভুত এক নৃশংস দৃষ্টি ফুটে উঠল তার চোখে। নাকটা ফুলে উঠল।

ধীরে ধীরে ডান হাতের দুটো শক্ত আঙুল এগিয়ে গেল মাকড়সাটার দিকে। ইস্পাতের মতো শক্ত আঙুল দুটো চেপে ধরল সেটাকে, হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে পিষে দিল। তারপর দেয়ালে সেটাকে থেঁত্‌লে দিল মদ্‌না। তাতেও যেন শান্তি পেল না। থেঁত্‌লে থেঁত্‌লে শেষে যখন দেওয়ালের গায়ে শুধু কয়েকটা কালো কালো জলো দাগ ছাড়া আর কিছু রইল না তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঘুরে দাঁড়াল সে।

ততক্ষণে কি সব লতাপাতা এনে ঘষে ঘষে বান্নুর হাতে লাগাতে শুরু করেছে ফিরুজা! আর মাকড়সাটার নামে গাল পাড়ছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কান্না থামল বান্নুর। সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল ফিরুজা আর মদ্‌না। বাইরে তাকিয়ে দেখল।

তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেছে বাইরে। ঝড় উঠেছে।

এমন ঝড় বুঝি বহুকাল দেখেনি তারা। প্রলয় কাণ্ড। মাঝে মাঝে বিকট আওয়াজ আসছে। শিকড় সমেত গাছ ভেঙে পড়ার আওয়াজ। ঘরের চালাটা যেকোন মুহূর্তে উড়ে চলে যাবে। ঝমঝম ঝমঝম একটানা একটা বিশ্রী শব্দ।

ধুলো আর শুকনো পাতার ঘূর্ণিতে চতুর্দিক অন্ধকার হয়ে আসছে।

সাবধানী ঘণ্টি ভেসে আসছে সমুদ্রপাড় থেকে।

সাবধানী ঘণ্টি? না। কান পেতে শুনল ফিরুজা। এ-আওয়াজ সাবধানী ঘণ্টির নয়। এ-আওয়াজ জাহাজ এসে পৌঁছনোর।

এ-শব্দ বহুবার শুনেছে ফিরুজা। সেই পরিচিত ধ্বনি। এই ঘণ্টির অপেক্ষাতেই বসে আছে তারা। এ-শব্দ শুনতে পেলেই ছুটে যেতে হবে সমুদ্রপাড়ে।

ফিরুজা আর মদ্‌না পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। যেন কি করবে ঠিক করতে পারছে না। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়। আর দূর থেকে ভেসে আসা অবিরাম ঘণ্টাধ্বনি।

বাঁশের ছোট্ট হাত-তাঁতখানা তুলে নিল মদ্‌না, জালটা কাঁধে ফেলল। বাসনকোসন যা পারল পিঠে নিয়ে বললে, আমি ঘাটাকে চললাম, আয় তু।

ফিরুজা তাকাল একবার মদ্‌নার মুখের দিকে। বললে, তুই চ মাদোন, আমি বুড়োটারে নিয়া যাবো, বুধাকে নিয়ে যাবো।

মদ্‌না ছুটে চলে গেল ঝড়ের মধ্যে। সেদিকে তাকিয়ে রইল ফিরুজা কিছুক্ষণ। তারপর ফিরে এসে বাচ্চার দিকে তাকালে। হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছে। জ্বালা ঠাণ্ডা হয়েছে তার।

বান্নুর মুখে ঠোঁট ছুঁইয়ে নিজের মনেই হাসল ফিরুজা। তারপর ঝড়ের মধ্যে সেও ছুটে

বেরিয়ে গেল। বুড়া আর বুধাকে সঙ্গে নিয়ে ফিবে এসে বান্নুকে কোলে নিয়ে জাহাজঘাটায় চলে যেতে হবে। সময় নেই আর।

জাহাজঘাটার ঘন্টি বেজে চলেছে একটানা কান্নার মতো।

ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়ে আছড়ে পড়ে ফিরুজা। কোনোরকমে সামলে নিয়ে আবার ছুটতে শুরু করে। বিকট আওয়াজ করে গাছ ভেঙে পড়ে, গাছের শাখা ভেঙে পড়ে।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ফিরুজা। এঃ একটা পাখির বাসা একেবারে থেঁতলে গেছে। একটা বাচ্চা কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে গেছে। ঝড়ের দাপটে বেশিক্ষণ হয়তো বাঁচবে না। সযত্নে সেটাকে দু-হাতে তুলে নেয় ফিরুজা, তারপর আবার ছুটতে শুরু করে।

এদিকে টিয়ারঙীর দল কাঁধে মালপত্র নিয়ে ছুটছে জাহাজঘাটার দিকে। সকলের মুখেচোখেই আতঙ্ক।

ছুটতে ছুটতে এসে বুড়ার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকে ফিরুজা।—বুধা, বুধা!

কিন্তু কোন উত্তর আসে না।

তবে! ঘরের ঝাঁপিতে ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে যায়। উঠোনের চারপাশ, ঘরের ভেতর সর্বত্র উঁকি দিয়ে দেখে। না, কোথাও নেই। না বুড়া না বুধা।

ঝাঁপি খুলে রেখেই টিয়ারঙীর দলটা যেদিক দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল সেইদিকে পা বাড়ায় ফিরুজা।

পথে যার সঙ্গেই দেখা হয় জিজ্ঞেস করে।—বুড়াকে দেখেছিস, যম্‌নীর বাপটারে দেখেছিস। আমাব বুধা বেটাটারে দেখেছিস?

না, কেউ দেখেনি।

সকলের সঙ্গে ফিরুজাও জাহাজঘাটার দিকে ছুটতে শুরু কবে।

সমুদ্রের পাড়ে এসে দেখে সমস্ত টিয়ারঙ যেন ভেঙে পড়েছে সেখানে। কোম্পানি-মহলের কুলিকামিন, বাবুবাংলোর লোক, আর টিয়ারঙীর দল। সকলেই পালিয়ে যাবার জন্যে উন্মুখ। সকলের মুখেচোখেই আতঙ্ক।

এদিকে থেকে থেকে ঝড়ের দাপট। বালির ঘূর্ণি ওড়ে। একটানা ঝড়ের আওয়াজ আর তালে তালে ফেটে পড়ে সমুদ্রের সফেন তরঙ্গ। ঢেউয়ের পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে যেন সন্তান-শোকাহত মায়ের মতো। ঢেউয়ের গর্জন বেড়ে ওঠে।

ওদিকে দূরে, সমুদ্রের বুকে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে জাহাজখানা।

উন্মুখ হয়ে আছে সকলেই। জাহাজ এসে পৌঁছলেই ছুটে গিয়ে উঠতে চায়। তাই সবচেযে বেশি ভিড় গ্যাংওয়ের সামনে।

ভিড় ঠেলে ঠেলে ছুটে বেড়ায় ফিরুজা। আর চিৎকার করে বুধার নাম ধরে। যাকে পায় তাকেই প্রশ্ন করে বুধাকে দেখেছিস্ তুরা?

না, কেউ দেখেনি।

এক পাড় থেকে আরেক পাড়ে বুধাকে খুঁজে বেড়ায় ফিরুজা।

ঝড়ের দাপট বাড়তে থাকে। গুজব রটে যায় টিয়ারঙীদের মধ্যে, এ-ঝড়ে নাকি সমুদ্রে ডুবে যাবে সারা টিয়ারঙ।

সত্যিই বুঝি তাই এমন উত্তাল হয়ে ওঠে সমুদ্রের ঢেউ। ঘুমুঙ্গি ঘরের জাল উড়ে যায়। ডিঙিগুলো বালির ওপর ডিগবাজি খেতে খেতে সমুদ্রের ঢেউয়ের ওপর গিয়ে পড়ে। সেদিকে কেউ আর দৃষ্টি দেয় না। জিনিসপত্তরের চেয়ে নিজের জীবনের ওপরই দৃষ্টি সকলের। বাঁচতে হবে, কোনোবকমে বাঁচতে হবে এই ঝড় থেকে, বোমা থেকে। টিয়ারঙ ধ্বংস হয়ে যাবে, তাই পালাতে হবে টিয়ারঙ ছেড়ে।

পাগলের মতো ছুটে বেড়ায় ফিরুজা, এদিক থেকে ওদিক। আর থেকে থেকে চিৎকার

করে, বুধা ! বুধা !

কেউ সাড়া দেয় না।

হঠাৎ এক ফাঁকে দেখা হয়ে যায় মদ্‌নার সঙ্গে।—বুধাকে দেখেছিস্‌ মাদোন ?

না, মদ্‌নাও দেখেনি।

দুজনে দুদিকে খুঁজতে শুরু করে। এত লোকের মধ্যে কোথায় খুঁজে পাবে বুধাকে।

যম্‌নীর বুড়া বাপটাকে কথা দিয়েছে ফিরুজা। বলেছে, বুড়াও আমার, বেটাও আমার। আজ এ-মুহূর্তে তাদের ছেড়ে পালাবে কি করে সে ?

এদিকে বেলা পড়ে আসে। ঝড় বাড়ে। সমস্ত সমুদ্র যেন ক্রুদ্ধ নাগিনীর মতো ফুলে ফেঁপে উঠছে। ঢেউ নয়, যেন সাপের ফণা। ঝড় নয়, যেন বিষাক্ত নিশ্বাস। মাঝে মাঝে ঝড়ের দাপটে বালির রাশি উড়ে যায় উড়ন্ত চাদরের মতো। টলে টলে এ ওর ঘাড়ে পড়ে। কোনোরকমে জিনিসপত্তর সামলায়। পায়ের টাল সামলায়।

জাহাজ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, আর অধৈর্য হয়ে ওঠে সকলে। ফিরে ফিরে আকাশের দিকে তাকায়। ঝড়ের সোঁ সোঁ শব্দের ফাঁকে আরো কি এক বিচিত্র আওয়াজ শোনা যায় কিনা এই আতঙ্কে কান পেতে থাকে।

উন্মুখ আগ্রহে জাহাজঘাটার দিকে তাকিয়ে থাকে সকলে।

আসছে, ক্রমে ক্রমে জাহাজ ভিড়ছে সমুদ্রতীরে। উল্লাসে চিৎকার করে ওঠে সকলে। একসঙ্গে গ্যাংওয়ের দিকে ছুটে যেতে চায় সকলে। প্রত্যেকটি মানুষ যেন স্বার্থপর হয়ে উঠেছে। নিজের জীবন বাঁচাবার আগ্রহটাই যেন সবচেয়ে বড়। তারপর আপনজন। জোয়ান পুরুষগুলো বুড়ো-বাচ্চাদের ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। কুনুইয়ের গুতোয় সরিয়ে দেয় মেয়েদের।

ফিরুজা তখনো উন্মাদের মতো ছুটে বেড়ায়। চিৎকার করে ডাকে, বুধা, বুধা !

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ পিছন থেকে মদ্‌নার ডাক ভেসে আসে।—ফিরুজা, ফিরুজা ?

থমকে ফিরে দাঁড়ায় ফিরুজা।

মিলেছে, বুধাও মিলেছে, বুড়াও মিলেছে !

আনন্দে চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ফিরুজার। হাসিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে মুখখানা।

মদ্‌নার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে যম্‌নীর বুড়া বাপ, আর তার বুধা বেটা।

ছুটে এসে বুধাকে বুকে জড়িয়ে ধরে ফিরুজা। আনন্দে, হাসিতে এক অপূর্ব অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে তার মুখেচোখে।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকবার সময় নেই। উপায় নেই দাঁড়িয়ে থাকার

পিছন থেকে আতঙ্কিত মানুষের ভিড় তাদের ঠেলে নিয়ে চলে। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায় সকলে। আপনা থেকেই কখন যেন ভিড়ের চাপে গ্যাংওয়ের পথ ধরে জাহাজের ওপর উঠে আসে।

পরম নিশ্চিন্ত ফিরুজার কপাল বেয়ে ক্লান্তির ঘাম ঝরে পড়ে।

জাহাজের ডেকের রেলিং ধরে ফেলে-আসা টিয়ারঙ দ্বীপের দিকে তাকায়। পরম আনন্দে, উন্মাদ বেদনার শেষে সদ্যোজাত শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে যে-সুখ, ফিরুজার ব্যথিত বুকেও তেমনি আনন্দ উঁকি দেয়। তারপর চেতনা ফিরে আসে। অনুভবে বুঝতে পরে জাহাজ পাড়ি দিতে শুরু করছে সমুদ্রের বুকে।

তারপর ? তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যায় বান্নুকে, তার ছোট্ট মেয়েকে। আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে ফিরুজা।—বান্নু !

এতক্ষণ যেন নেশার ঘোরে কেটে গেছে তার।

কোলের বাচ্চাটার কথা মনে পড়তেই আতঙ্কে অনুশোচনায় বিকট স্বরে চিৎকার করে

উঠল ফিরুজা।

মদ্‌নার মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে গেল, বের হল না কথাটা। শুধু অস্ফুট একটা শব্দ যেন গলার স্বরেই থমকে গেল।

বান্নু! বান্নুকে সেই ছোট ঘরের ঝুলায় ফেলে এসেছে ফিরুজা। বুধাকে খুঁজতে গিয়ে বান্নুর কথা ভুলে গেছে।

জাহাজ চলতে শুরু করেছে তখন, গতিবেগ বাড়তে শুরু করেছে। আর চতুর্দিকে ভিড়, ডেকে আর তিল ধারণের জায়গা নেই। কাকে জাহাজ থামাতে বলবে সে, থামবে কেন জাহাজ? কি করবে ফিরুজা, কি করা উচিত, কিছুই ঠিক করতে পারে না।

মুহূর্ত মাত্র। মুহূর্তের জন্যে মদ্‌নার মুখের দিকে দুর্বোধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেই ছেড়ে আসা টিয়ারঙ দ্বীপের দিকে উদাস দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল সে।

তারপর হঠাৎ ডেকের ওপর থেকে সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

টিয়ারঙীরা চিৎকার করে উঠল, মদ্‌না চিৎকার করে উঠল। বোধহয় ফিরুজার পিছনে পিছনে মদ্‌নাও ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, কিন্তু পারল না। টিয়ারঙীর দল ধরে রইল তাকে। জাহাজ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে, আর কি সমুদ্রের বুকে খুঁজে পাবে সে ফিরুজাকে! এই প্রচণ্ড ঝড়ের মাঝে, এই ক্রুদ্ধ উন্মাদ ঢেউয়ের তালে তালে ফিরুজা কোথায় ভেসে গেছে খুঁজে পাবে কি করে মদ্‌না।

২১

জলের মানুষ আমরা, জল আমাদের চিনে। সত্যিই বুঝি তাই। দ্বীপের মানুষ ফিরুজা, সমুদ্র তাকে চেনে। ঝড় আর উত্তাল তরঙ্গ, সব কিছু উপেক্ষা করে দ্বীপের দিকে এগিয়ে চলে ফিরুজা।

এক একবার মাথা তুলে তাকায় দূরের দ্বীপটার দিকে, আর প্রাণপণ চেষ্টায় সাঁতার কেটে এগিয়ে চলে দ্বীপের দিকে।

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহে তীরে এসে পৌঁছয় ফিরুজা। কিন্তু ক্লান্তির সময় নেই এখন, বিশ্রামের সময় নেই। মাটি ছুঁয়েই তৃপ্তির উল্লাস দেখা দেয় তার মুখে চোখে। পরমুহূর্তেই ছুটতে শুরু করে ফিরুজা, টিয়ারঙীদের বস্তির দিকে, তার ফেলে আসা ডেরার দিকে। খাল পার হয়ে ছুটতে ছুটতে এসে পৌঁছয় ফিরুজা তার ডেরার দরজায়।

চিৎকার করে ডেকে ওঠে।

কিন্তু ঝুলাটার কাছে ছুটে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। একটা ভাম কুৎসিত শব্দ করে রক্তাক্ত জিভ চাটতে চাটতে লাফিয়ে পালায় ফিরুজার ডাক শুনে। উৎকণ্ঠায় বুক কেঁপে ওঠে ফিরুজার। ঝুলাটার কাছে ছুটে গিয়ে চিৎকার করে কেঁদে ওঠে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ফিরুজা। সংবিৎ ফিরে পেয়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

দুর্বোধ দৃষ্টিতে ঝুলাটার দিকে তাকিয়ে রইল নিষ্পলক চোখ মেলে। চোখের জল যেন শুকিয়ে গেছে। দীর্ঘশ্বাস যেন থমকে থেমে আছে বুকের মধ্যে।

দুটি নরম হাতে শিশুর রক্তাক্ত শরীর তুলে নিল সে সযত্নে, সস্নেহে। যেন এখনো বেঁচে আছে সে, যেন এখনই আবার আগের মতো হেসে উঠবে খিলখিল করে।

অনিমেষ চোখে কোলের শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেরই অজান্তে কখন যেন ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল ফিরুজা।

ঝড় থেমে গেছে তখন।

তার মনের ঝড়ও বুঝি থেমে গেছে।

ধীর পায়ে এগিয়ে চলে ফিরুজা। উদাস বিষণ্ণ অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে সামনের দিকে। যন্ত্রচালিতের মতো পায়ে এগিয়ে চলেছে ধীরে ধীরে।

সেই আঁকাবাঁকা বনপথ। কাঁটা ঝোপঝাপ। বিশাল তরুরাজির রহস্যময় চন্দ্রালোকিত ছায়া। শুক্লপক্ষের সন্ধ্যাঘন অন্ধকারে ঈষৎ আলোক।

রহস্যময়ী বনদেবীর মতো, হৃতসন্তান উন্মাদিনীর দুটি বড় বড় নীল চোখ যেন অর্থহীন বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে অনিমেষ দৃষ্টিতে।

বনের পথ পার হয়ে, খাল পার হয়ে, কোম্পানি-মহলের পরিত্যক্ত নির্জন ঘরের সারি, নিস্তব্ধ ঘুমুন্তি ঘর পার হয়ে সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়ায় ফিরুজা।

ঝড় থেমে গেছে তখন। বনের গাছে গাছে স্তব্ধতা। একটি পাতাও যেন নড়ে না, যেন বনের হৃদয়েও থমকে আছে একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস।

সমুদ্র শান্ত। নেই সেই উত্তাল তরঙ্গ। নেই সেই উন্মাদ আলোড়ন।

ডিঙি নেই সমুদ্রের বুকে, জাহাজ নেই।

যতদূর চোখ যায়, নিঃসীম নীলের দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

চন্দ্রালোকিত সমুদ্রের বুকে শুধু শান্ত অবনত বিষণ্ণ করুণ ঢেউ আর শাদা শাদা ফেনার অশ্রু।

যতদূর চোখ যায়, তাকিয়ে থাকে ফিরুজা। দুটি হাতে মৃত শিশুর রক্তাক্ত শরীর, দুটি চোখে গভীর হতাশা।

একটিও ডিঙি নেই সমুদ্রের বুকে, জাহাজ নেই।

নির্জন দ্বীপের তীরে দাঁড়িয়ে, অসীম রহস্যের সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সশব্দে কেঁদে পড়ে ফিরুজা।

উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টি ধীরে ধীরে নৃশংস হয়ে ওঠে। মৃত সন্তানের মা নয়, উচ্ছল রঙ্গময়ী নারী নয়, হিংস্র একটা পশু জেগে ওঠে ফিরুজার রক্তে।

ফিরে আসে ফিরুজা। তেমনি মৃত শিশুকে কোলে নিয়ে ফিরে আসে। তেমনি সযত্নে সস্নেহে ঝুলার শয্যায় শুইয়ে দেয় সে তাকে।

তারপর খোঁপা থেকে খুনিয়া খুলে নিয়ে লুকিয়ে অপেক্ষা করে। রক্তের স্বাদ পেয়েছে বন্য ভাম। রক্তের গন্ধে আবার ফিরে আসবে নিশ্চয়। প্রতিহিংসার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসে থাকে ফিরুজা।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর পার হয়ে যায়।

একা। ফিরুজা একেবারে একা এই নির্জন দ্বীপের বুকে। সৃষ্টির প্রথম যুগের সেই আদিম অরণ্য যেন। সমস্ত দ্বীপের সম্রাজ্ঞী হয়েও তার চেয়ে নিঃস্ব কেউ নেই। আইনের বাধা নেই, নিষেধ নেই সমাজের। লজ্জা নেই, গর্ব নেই। আনন্দ নেই, দুঃখ নেই। শুধু প্রাণধারণের মুক্তি।

বিশাল সমুদ্রের বুকে হৃদয়ের মতো ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ। ফিরুজার একক জীবনের চোখে এই ছোট দ্বীপ টিয়ারগুও যেন বিশাল সমুদ্র। বন্যহরিণীর মতো এখানে-ওখানে ছুটে বেড়ায় ফিরুজা, কখনো থমকে দাঁড়ায় সমুদ্রের তীরে। উদাস দুটি চোখ মেলে তাকায়। কখনো আকাশের দিকে।

বন্য হরিণীর মতো উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে সেদিনও সমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়াল ফিরুজা।

উদাস চোখ মেলে তাকিয়ে রইল দূরের দিগন্তের দিকে। নীল সমুদ্র আর নীল আকাশ

দিকচক্রবালে যে-রেখাটিতে মিশে গেছে সেই দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল অনিমেষ দৃষ্টিতে।

এমনি করেই তার হারিয়ে-যাওয়া মানুষটার জন্যে দিনের পর দিন অপেক্ষা করেছিল ফিরুজা। তারপর একদিন ফিরে এল সেই মানুষটাই, মোহ ভেঙে গেল তার।

আজ আবার মদ্‌নার কথা ভেবে ভেবে দু-চোখে স্মৃতির অশ্রু নামে। আজ আবার তেমনি উদাস চোখ মেলে তাকায় ফিরুজা।

ভাবে, একদিন সেই মদ্‌না বুঝি আবার ফিরে আসবে। বুঝি আবার টিয়ারঙ জেগে উঠবে আগের মতোই।

তাই আশায় আশায় প্রতিদিনের মতোই ছুটে এসে দাঁড়াল সে সমুদ্রের তীরে। তাকিয়ে রইল দু-চোখ মেলে।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক অসীম ফুর্তির কাঁপনে অধীর হয়ে উঠল ফিরুজা। নিজেরই অজান্তে সমুদ্রের জল ছুঁয়ে এগিয়ে গেল কয়েক পা।

আরো স্পষ্ট চোখে তাকাল।

হ্যাঁ, ধোঁয়া। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে দূরে কোথায়, সমুদ্রের বুকে।

আনন্দে চিৎকার করে উঠল ফিরুজা। মোহগ্রস্তের মতো চলল ধীরে ধীরে।

আরো স্পষ্ট হয়ে উঠছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী। কাছে এগিয়ে আসছে যেন।

ঢেউয়ের পর ঢেউ ভেঙে পড়ে ফিরুজার পায়ে। সময় কেটে চলে।

অনেক দূরে অস্পষ্ট রেখার মতো ফুটে ওঠে কি যেন।

জাহাজ! সমুদ্র-জাহাজ!

হাত নেড়ে নেড়ে চিৎকার করে ডাকে ফিরুজা। আসছে, টিয়ারঙের জাহাজ বুঝি ফিরে আসছে। মদ্‌না ফিরে আসছে।

আনন্দ-হাস্যে মুখর মুখখানা তার ধীরে ধীরে বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে সমুদ্রে জাহাজ, তারপর ধীরে ধীরে আবার মিলিয়ে যায় দূরে, দিক্‌চক্রাবালে।

ফিরুজার গভীর দীর্ঘশ্বাসের মতো মিলিয়ে যায় জাহাজখানা।

টিয়ারঙের জাহাজ নয়। হয়তো বা অন্য কোনো দ্বীপগামী, হয়তো বা অন্য কোনো গন্তব্যের জাহাজ আশার ইশারা দিয়েই মিলিয়ে যায়।

নির্জন রাত্রির মতো ক্লান্তি নেমে আসে। নিঃসঙ্গ পৃথিবীর মতো।

এ এক অসহ্য জীবন। কথা বলার জন্যে উন্মাদ হয়ে ওঠে ফিরুজা। চিৎকার করে আপন মনেই এক একসময় অর্থহীন কিছু একটা বলে উঠেও অসীম আনন্দ পায়। কখনো নিজের মনেই প্রলাপের মতো কত কিছু বলে যায়।

হঠাৎ কোনো শব্দ শুনে ছুটে আসে সমুদ্রের দিকে। দূরের জাহাজ দেখে আবার উল্লাসে অধীর হয়ে ওঠে। অপেক্ষা করে, তাকিয়ে থাকে সেদিকে। তারপর একসময় জাহাজ অদৃশ্য হয়ে যায়।

কেউ জানে না, হয়তো বা ভুলে গেছে ফিরুজার কথা। হয়তো বা ভুলে গেছে এই নির্জন পরিত্যক্ত টিয়ারঙের কথা।

বনপথে যেতে যেতে কখনো অর্থহীনভাবে চিৎকার করে ওঠে ফিরুজা। কখনো জাহাজঘাটার সাবধানী ঘণ্টিটা বাজিয়ে চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর সেই শব্দে আনন্দে নেচে ওঠে।

জনশূন্য টিয়ারঙ দ্বীপে যেন এক বন্দিনী মুক্তি পাবার আশায় ছুটে বেড়ায়। সমুদ্রের বুকে ভেসে যেতে চায়।

কোনো কোনোদিন ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। যতদূর চোখ যায় তারপর ক্লান্ত অবসন্ন

শরীর আর হতাশায় ফিরে আসে। অবসাদ আর ঘুম নেমে আসে।

সমুদ্রে বুঝি অনেক শান্তি। সমুদ্রে আছে স্বাধীনতা।

মানুষের জীবনও হয়তো এমনই সমুদ্র আর দ্বীপে আনাগোনা। মুক্তির আনন্দে হাঁপিয়ে ওঠে মানুষ। বিশাল জনতার ভেতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গড়ে নিতে চায়। মুক্তি থেকে ফিরে পেতে চায় অসীম বন্ধন। তারপর একদিন সেই দ্বীপ মনে হয় অসহ্য জীবন। ঘরের প্রাচীর ভেঙে সমুদ্রের, জীবনের মুক্তি পেতে চায়।

শুধু এই আনাগোনা, দ্বীপ থেকে সমুদ্রে, আর সমুদ্র থেকে দ্বীপে ফিরে আসা।

ছোট্ট এই টিয়ারগু দ্বীপ। কেউ আসে সম্পদের লোভে, কেউ পথ ভুলে, কেউ শুধু সুখশান্তির প্রেমময় নীড় খুঁজে খুঁজে। তারপর একদিন ফিরে যেতে হয়, সমুদ্রের ডাকে। ভুল পথ ভুলে গিয়ে, স্বপ্ননীড় ভেঙে দিয়ে, আরো কিছু সম্পদের লোভে।

২২

অতশত গুনতে জানে না মদ্‌না। কখনো মনে হয় আট বছর, কখনো দশ। কত কি ঘটে গেছে এতগুলো বছরে। কত কি ভুলে গেছে সে। ভোলেনি শুধু ফিরুজাকে। সেদিনের দৃশ্যটা বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। দেখেছে, বান্নু, বান্নু বলে চিৎকার করে উঠল যেন ফিরুজা, আতঙ্কের চোখে এদিক-ওদিক তাকাল, একবার মদ্‌নারই মুখের দিকে, তারপর জাহাজের রেলিং থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সমুদ্রের বুকে।

জাহাজের ধাক্কা খেয়ে ঢেউ উঠল, সমুদ্রের ঢেউয়ের পিঠে ফেটে পড়ে নীল জল ঘোলা হয়ে গেল মুহূর্তে।

উৎকণ্ঠায় অনুসন্ধানী চোখে তন্ন তন্ন করে খুঁজল সে ফিরুজাকে। জলের মধ্যে কোথাও ফিরুজার মাথাটা ভেসে ওঠে কিনা দেখবার জন্যে।

ঠিক মনে পড়ে না মদ্‌নার। সংবিৎ ছিল না বোধ হয় সে-সময়। শুধু মনে পড়ে সেও লাফ দিয়ে পড়তে চেয়েছিল, কিন্তু আশপাশের লোকগুলো লাফ দিতে দেয়নি তাকে।

দলের সঙ্গে, স্টিফেন্স কোম্পানির লোকজনের সঙ্গে জাহাজে করেই চলে এসেছিল সে মাতলার আপিসে। যুদ্ধ যত এগিয়ে এল, সরে সরে এসে কোম্পানির দপ্তর কায়েম হল ভেঁড়াহাটে। কিন্তু সেখানে জায়গা হল না টিয়ারগুীদের। একে একে সবাইকে বিদেয় করে দিল কোম্পানি।

মদ্‌নার মতোই সব টিয়ারগুীদের চোখে তখন অন্ধকার। কাজ কোথায়, খাবে কি?

লড়াই আর লড়াই। লড়াইয়ের গল্প তখন চারদিকে।

যে যেদিকে পারল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। বুধাকে নিয়ে শহরের দিকে চলে গেল যম্‌নীর বুড়ো বাপ। আর আকাশী তখন একেবারে পাগল। ভাসা ভাসা চোখ মেলে তাকায়, প্রলাপ বকে আর মাঝে মাঝে খিলখিল করে হেসে ওঠে।

প্রথম প্রথম কুলিমজুরের দলের কেউ কেউ ডেকে নিয়ে যেত আকাশীকে, খেতে দিত। কেন তা অবশ্য বুঝতো মদ্‌না। তবু বাধা দিতে পারত না।

শেষে কেউ আর ভিক্ষেও দিত না। তখন একেবারে উন্মাদ হয়ে গেছে, ডাকলে ছুটে গিয়ে আঁচড়ে কামড়ে একশা করত।

তারপর কি হল আকাশীর, জানেও না সে। বোধহয় চলেই গেল কোথাও। কোথায় কে জানে।

মদ্‌না কিন্তু মাতলার পাড় ছাড়ে না, জেলের দলে গিয়ে ঢুকল প্রথমটা। সমুদ্রে মাছ

ধরত যে সে কি আর নদীতে মাছ ধরতে পারবে না ? না, সেখানেও সুবিধে হল না। নদীতে মাছ ধরার বিদ্যে শিখতে হয়। মৌসুম জানতে হয়, জানতে হয় জলের নাড়ী-নক্ষত্র।

তাও হয়তো দুদিনেই শিখে নিতে পারত সে। কিন্তু না আছে জাল, না নৌকো। জাল নেই, ডিঙি নেই, সে আবার জেলে কিসে। জমি নেই যার সে কি চাষী হয়, সে শুধু চাষা।

তাই জন খাটতে সুরু করল মদ্না। তবু মাতলার পাড় ছাড়তে মন চায় না। কাজ পেলেও নয়, মজুরি পেলেও নয়।

ভেতরে ভেতরে ইচ্ছে, যদি একটা ডিঙি পায় জলে ভাসিয়ে একা একাই চলে যাবে টিয়ারঙে।

বড় বড় নৌকোর বহরদারদের বলে, টিয়ারঙে চলো, মাছ গিসগিস করছে জলে।

শুনে হাসে তারা।—মিঠে জলের মাছমারা আমরা, নোনাজলের খবর কি জানি!

—পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবো আমি। বলে মদ্না।

বহরদার হাসে।—রাক্কুসে মাছ আছে সাগরে, দখিন রায় আছে সোঁদরবনে, রূপসী সব ডাইনী আছে দ্বীপগুলোয়।

তা ছাড়া আছে জল-পুলিসের নৌকো। যেতেই যদি দেবে তো ভাগিয়ে আনল কেন দ্বীপের লোকগুলোকে।

উপায় নেই বলেই আজ এ-দলে কাল ও-দলে ঘুরে বেড়ায় মদ্না যদি কেউ রাজি হয়। যদি নৌকো ধার পায়।

কিন্তু কে দেবে নৌকো। জেলের নৌকো হল বউয়ের গায়ের গয়না। জমি নেই, গয়না নেই, নেই কিছুই। তবু এই নৌকো আর জালই অনেক। এ-দুটো থাকলে আর পেটের চিন্তা করতে হয় না।

মদ্নার তাও নেই। ছিল সবই, সবই ফেলে এসেছে। এমনকি ফিরুজাকেও।

বছর কয়েক এমনি করেই কাটল।

শুধু লড়াই থেমে গেছে এ-খবর শুনে ছুটে এসেছিল সে স্টিফেন্স কোম্পানির দপ্তরে। কিন্তু ফিরে গিয়েছিল ব্যর্থ মন নিয়ে। পাঠক বলেছিল টিয়ারঙে কোম্পানি ফিরে যাবে কিনা ঠিক নেই।

শেষে কাজ নিল জাহাজে। খালাসীর কাজ। মাসে মাসে মাইনে, তার চেয়ে বড় লোভ, জাহাজ সমুদ্রে ভেসে বেড়ায়।

অন্ধকার রাতে জাহাজ চলে সমুদ্রের ওপর দিয়ে। হঠাৎ হয়তো দূরে এক টুকরো আলো দেখা যায়। আর চঞ্চল হয়ে ওঠে মদ্না। খালাসীদের জিজ্ঞেস করে, কোন জায়গা, কিসের মোহানা। টিয়ারঙ নয় তো।

দিনের বেলায় কাজের ফাঁকে বার বার রেলিংয়ের ধারে এসে দাঁড়ায়। যতদূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখে, কোথাও এক টুকরো সবুজ দ্বীপ দেখা যায় কিনা। সবুজ তো নয়, শ্যামলা দেখায়।

কিন্তু না, টিয়ারঙ নয়।

এমনি করে কতবার হতাশ হয়েছে মদ্না। তবু আশা যায়নি।

আজ এ-জাহাজ। কাল ও-জাহাজ। কতবার জাহাজ বদলেছে।

জাহাজের কাপ্তেনকে বলেছে কতবার। তার ফিরুজা পড়ে আছে টিয়ারঙে। শুধু একবার, একটিবার টিয়ারঙে যেতে চায় সে।

শুনে হেসেছে সবাই।

এমনি করে বছরের পর বছর কেটে গেছে।

কত বছর মদ্না নিজেও জানে না। অতশত গুনতে জানে না সে। হিসেব রাখেনি

তার।

তবু যখনই জাহাজ ফিরে আসত, দু-দশদিনের ছুটি পেত মদ্‌না, অমনি ছুটে যেত কোম্পানির আপিসে।

মনে আশা, যদি টিয়ারঙে ফিরে যায় কোম্পানির জাহাজ।

এমনিভাবে খোঁজ নিতে এসেই চমকে উঠল মদ্‌না। দপ্তরের সামনে ভিড়। লোক নেওয়া হচ্ছে।

সারিবন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো একটা ঘরের সামনে।

জিজ্ঞেস করল একজনকে। শুনতে না শুনতে আনন্দের শিহরন খেলে গেল মদ্‌নার সারা শরীরে।

টিয়ারঙ। টিয়ারঙে চলেছে কোম্পানির জাহাজ। টিয়ারঙের ফেলে আসা কুঠিতে ফিরে চলেছে কোম্পানি।

ঘরটার কাছে ছুটে গেল মদ্‌না। ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল।

কিন্তু সামনে গিয়েই সব উৎসাহ চুপসে গেল তার। না, ওভারসিয়ার পাঠক নয়। অন্য একজন লোক চাকরি বিলিয়ে দিচ্ছে।

একমুহূর্ত থমকে দাঁড়াল মদ্‌না। তারপর হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল লোকটার পায়ের ওপর।—আমি টিয়ারঙী বটি রে বাবু। আমারে লিয়ে চ বাবু।

দু·চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল মদ্‌নার।

তার দিকে কঠিন চোখে তাকাল নতুন ওভারসিয়ার। কি যেন ভাবল। তারপর ধীরে ধীরে নরম হল তার চোখ।

—কি নাম তোর?

—মদ্‌না গো বাবু, টিয়ারঙের মদ্‌না।

নাম লিখে নিয়ে একটা চাকতি দিয়ে দিল নতুন ওভারসিয়ার।

অনেক আগে থেকে গিয়ে জাহাজে উঠে বসল মদ্‌না। মনে ভয়, যদি দেবি হয়ে যায়, যদি তাকে ফেলে রেখে জাহাজ চলে যায়।

তিল ধারণের জায়গা নেই জাহাজে। কিন্তু বেশির ভাগই নতুন লোক। চারিদিকে খুঁজল মদ্‌না। টিয়ারঙের কেউ যদি থাকে। এত লোক এসেছিল, কেউ বেঁচে নেই নাকি?

ফিরুজা? ফিরুজা কি বেঁচে আছে?

হঠাৎ কথাটা মনে হতেই চমকে উঠল মদ্‌না। কই, এত বছর কেটে গেছে, কোনদিন তো মনে হয়নি এ-কথা। কোনদিন ভয় হয়নি। আজ টিয়ারঙে ফিরে যাবার মুহূর্তে হঠাৎ ফিরুজা বেঁচে নেই মনে হল কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রেলিং ধরে এসে দাঁড়াল মদ্‌না।

জাহাজ চলতে শুরু করেছে তখন। ধীরে ধীরে ঘোলা জলের ওপর দিয়ে এগিয়ে চলেছে জাহাজ।

ক্রমে ক্রমে এগিয়ে চলে জাহাজ। গঙ্গার দুটো পাড় যেন ক্রমশ দূরে সরে চলেছে।

ঘোলা জলের গঙ্গা। টিয়ারঙের সমুদ্র কখনো নীল, কখনো সবুজ। কিন্তু গঙ্গার জলে তেমন ঢেউ নেই, রঙ নেই।

টিয়ারঙের জীবনে কতবার সে আর ফিরুজা স্বপ্ন দেখেছে এই গঙ্গার, গঙ্গার দু-পাশে এই মাটির। কত গল্প শুনেছে গঞ্জমাঝিদের কাছে। এ-মাটি নাকি সোনা ফলায়, এ-জলে ঝাঁকে ঝাঁকে রুপোর ইলিশ ঝিকমিক করে। টিয়ারঙের জেলেদের মতো প্রাণ হাতে নিয়ে উন্মাদ সাগরের বুকে ঘুরে বেড়াতে হয় না।

এই মাটিতে আসতে চেয়েছে সে আর ফিরুজা, কত কি কল্পনার জাল বুনেছে বান্নুকে

ঘিরে, তার ছোট্ট মেয়েকে ঘিরে।

তারপর সত্যিই একদিন এই গঙ্গার জলে ডিঙি ভাসিয়েছে মদ্না, এই মাটিতে ঘর বেঁধেছে, কিন্তু তার স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি। সব স্বপ্ন তার ভেঙে গেছে, সব কল্পনা মিথ্যে হয়ে গেছে।

এমনি বুঝি হয়। সমুদ্রের এপার থেকে মাটির মানুষও বুঝি এমনি মিথ্যা স্বপ্নের মোহে দ্বীপের দিকে ছুটে যায়। দ্বীপের মানুষ ভাবে সমুদ্রের এপারে মাটির জগতে আছে সব সুখ ঐশ্বর্য।

সে-ভুল ভেঙে গেছে মদ্নার।

জাহাজ এগিয়ে চলে ধীরগতিতে। ডেকের ওপাশে কুলিকামিনদের চিৎকার হট্টগোল। স্টিফেন্স কোম্পানির উঁচুতলার বাবুদের জল্পনা-কল্পনা।

সব নতুন মানুষ। ওভারসিয়ার পাঠক নেই, অমিয়বাবু নেই, নতুনবাবু নেই, ছুটদিদি নেই। তবু সবাই যেন তার কত আপনজন। যেন কত কালের চেনা। এরা যে সকলেই চলেছে আজ টিয়ারঙে। মদ্নার সেই ছোট্ট দ্বীপটিতে, যেখানে আছে ফিরুজা আর তার ছোট্ট মেয়ে বান্নু।

ক্রমে ক্রমে দু-পাশের মাটি অদৃশ্য হয়ে যায়। দূরে সরে গেছে নদীর তীর। নদী নয়, নদীর মোহনা এসে পড়েছে সমুদ্রে। জলের রঙ ঈষৎ স্বচ্ছ হয়ে আসছে। শান্ত ঘোলা জলে ধীরে ধীরে শান্ত ঢেউ এসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

দূরে, যতদূরে চোখ যায়, অনিমেষ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে মদ্না। যেন কত কি ছবি দেখতে পাচ্ছে সে, কত আশা।

ক্রমশ সন্ধ্যা ঘন হয়ে আসে। অন্ধকার আর তারার ঝিকিমিকি। সমুদ্রের মতো অসীম অন্ধকার। অন্ধকার সমুদ্রেব বুকে একটা ক্ষিপ্ত চিতাবাঘের মতো গর্জন করতে করতে এগিয়ে চলেছে স্টিফেন্স কোম্পানির জাহাজ।

আবার দপ্তর বসবে কোম্পানির। বসতি বসবে নির্জন টিয়ারঙ দ্বীপে। আগের মতোই চঞ্চল হয়ে উঠবে কুলিকামিনদের বস্তি, ছোট্ট একটি দ্বীপ আবার জেগে উঠবে। কিন্তু সে-দ্বীপে থাকবে না টিয়ারঙের কোনো আদিম মানুষ।

শুধু মদ্না আর ফিরুজা, আর তার ছোট্ট মেয়ে।

এ-কথা মনে পড়তেই আপনা থেকেই বিষণ্ণ বোধ করে মদ্না। ফিরে এসেও কি তবে ফিরে পাবে না তার সেই পুবোনো দিনের জীবন? এই টিয়াবঙের মাটি, বন, জল ছলছল নয়ানজুলি, টিয়ারঙের উদ্দাম সমুদ্র আব ডিঙি আর জাল, সবকিছুর স্বপ্ন দেখেছে সে, ভেবেছে, এই বাতাসে কত শান্তি, কত আনন্দ। ভেবেছে টিয়ারঙের মাটি আর জল বুঝি তাব মনকে আকর্ষণ করেছে দিনের পর দিন।

জাহাজের রেলিং ধরে অন্ধকার সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ বড় উদাস হয়ে গেল সে। না, মাটি নয়, জল নয়। মানুষ।

টিয়ারঙের সেই মানুষগুলোর টানেই সমুদ্র সুন্দর মনে হয়েছে তার।

নেই, সেই মানুষ নেই। টিয়ারঙের তাই রূপ নেই, বস নেই, গন্ধ নেই।

আছে। শুধু ফিরুজার জন্যে সব আছে ; সব বেঁচে আছে আজও। ফিরুজা আর তার সেই ছোট্ট মেয়ের জন্যে।

ফিরুজার কথা মনে পড়তেই অধৈর্য হয়ে উঠল সে। স্থির হয়ে রেলিঙে দাঁড়িয়ে থাকাও যেন দুঃসহ।

অধীর উৎকণ্ঠায়, অন্তরের অস্থিরতায় ছুটে বেড়াতে চাইল।

রাত্রি ঘন হল, রাত্রি ফিকে হল।

তখনো অবিরাম ছন্দে বেজে চলেছে জাহাজের শব্দ। সমুদ্রের ঢেউ কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে জাহাজ।

ভোরের সূর্য ঠিকরে পড়ল নীল জলে।

দূরের দিগন্তে স্পষ্ট হয়ে উঠল টিয়ারঙ দ্বীপ। সমুদ্রের বুকে ছোট্ট এক টুকরো মাটি। তেমনি সবুজের সমারোহ, তেমনি লাল ফুলের শিখা। ঠিক যেন একটি টিয়াপাখি বসে আছে।

উল্লাসে চিৎকার করে উঠল মদ্‌না। অধৈর্য হয়ে উঠল।

বড় ধীরগতিতে চলেছে জাহাজটা। আরো দ্রুত গিয়ে পৌঁছতে পারলে যেন শান্তি পায় সে।

ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে টিয়ারঙ। স্পষ্ট হয়ে উঠছে সেই জাহাজঘাটা।

তন্ন তন্ন করে সমুদ্রের পাড় খুঁজে বেড়ায় মদ্‌না। উন্মাদ হয়ে ওঠে যেন। ফিরুজা? ফিরুজা কি নেই? বেঁচে নেই ফিরুজা?

এই নির্জন অরণ্যদ্বীপে ফিরুজা বোধহয় বেঁচে নেই। বেঁচে নেই।

তন্ন তন্ন করে তার দৃষ্টি খুঁজে বেড়ায় একটি আরণ্যক নারীকে।

হঠাৎ চমকে ওঠে সকলে। মদ্‌নাও চমকে ওঠে।

অবিরাম ছন্দে জাহাজঘাটার সেই পুরোনো দিনের ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসছে।

বিস্ময়ের চোখে তাকায় মদ্‌না।

সত্যিই সেই পুরোনো দিনের সাবধানী ঘণ্টা, না স্মৃতির তারে অতীতের অনুরণন!

মাতাল ঢেউ ভেঙে পড়ছে দ্বীপের গায়ে, নীল ঢেউ ফেটে পড়ছে ফুলের মতো শাদা শাদা ফেনার রাশিতে। হয়তো ঘণ্টাধ্বনি নয়, মাতাল ঢেউয়েরই শব্দ।

অনেক ধৈর্য ধরেছে মদ্‌না, অনেক অপেক্ষা করেছে। আর নয়।

উন্মাদ হয়ে ওঠে সে। জাহাজঘাটায় এসে লেগেছে স্টিফেন্স কোম্পানির জাহাজ।

ভিড় ঠেলে ছুটে যেতে চায় মদ্‌না।

বিস্ময়ের চোখে পাগল লোকটার দিকে তাকায় সকলে। পথ ছেড়ে দেয় উপহাসের হাসি হেসে।

ছুটে যায় মদ্‌না।

গ্যাংওয়ের ওপর দিয়ে ছুটে যেতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়।

ফিরুজা? হ্যাঁ, ফিরুজাই।

এক মনে জাহাজঘাটার ঘণ্টিটা বাজিয়ে চলেছে ফিরুজা, কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু একি চেহারা হয়েছে ফিরুজার? বন্য জন্তুর মতো সরল, নির্বোধ অথচ বীভৎস।

চিৎকার করে ডেকে ওঠে মদ্‌না।—ফিরুজা! ফিরুজা!

তন্ময়তা ভাঙে না ফিরুজার। অবিরাম ছন্দে ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে সে। মুখে তার তৃপ্তির হাসি।

—ফিরুজা! ফিরুজা!

চিৎকার করতে করতে সেদিকে এগিয়ে যায় মদ্‌না।

তন্ময়তা ভেঙে যায় ফিরুজার। ফিরে তাকায়। একবার জাহাজটার দিকে একবার মদ্‌নার দিকে।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনুসন্ধানীর চোখে মদ্‌নার মুখের দিকে, তার সমস্ত শরীরের ওপর চোখ বুলিয়ে যায়।

তারপর হঠাৎ ছুটে আসে মদ্‌নার কাছে।

কাছে এসে মদ্‌নার মুখের দিকে পাগলের মতো দৃষ্টিতে তাকায়। কি যেন খোঁজে, কি

যেন প্রশ্ন সে-দৃষ্টিতে।

অস্ফুট কি একটা শব্দ বের হয় তার মুখ থেকে। তারপর ছুটে এসে পরস্পর পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে।

দুজনের চোখ বেয়েই অশ্রু ঝরে পড়ে। কান্না আর কান্না।

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ কেটে যায়।

তারপর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায় ফিরুজা। দু-গাল বেয়ে অশ্রুর রেখা শুধু। ইঙ্গিত ইশারায় হাত নেড়ে কি যেন বলে।

—ফিরুজা।

গভীর আবেশে কি যেন বলতে চায় মদ্‌নাও।

আর অস্ফুট গোঙানির মতো একটা শব্দ বের হয় ফিরুজার মুখ থেকে। কি যেন বলতে চায় ফিরুজা, কি যেন বলতে চেয়েছে সে এই দীর্ঘ একাকিত্বের মাঝে। এই নির্জন দ্বীপের প্রতিটি নিঃসঙ্গ মুহূর্তে কি যেন বলতে চেয়েছে সে। কিন্তু এই দীর্ঘদিনের নির্জনতায় কথা বলতে পায়নি ফিরুজা, তাই কথা ভুলে গেছে। বোবা হয়ে গেছে সে চিরতরে।

হঠাৎ দু-চোখ অশ্রুতে ফেটে পড়ে ফিরুজার। কি যেন বলতে চায়, বলতে পারে না। শুধু একটু অবোধ্য গোঙানির শব্দ বের হয়। ফিরুজা যেন এই প্রথম আবিষ্কার করে, সে বোবা হয়ে গেছে।

কথা বলতে চায় ফিরুজা, কথা বলতে পারে না।

এতদিনের নিঃসঙ্গ জীবনে কথা ভুলে গেছে ফিরুজা, কথা ভুলে গেছে।দীর্ঘ দিনের একাকিত্বে বোবা হয়ে গেছে।

শুধু কান্নাহাসির দুটি নির্বাক চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে সে মদ্‌নার মুখের দিকে।

বোবা হয়ে গেছে ফিরুজা। বোবা হয়ে গেছে টিয়ারঙ দ্বীপ। বোবা হয়ে গেছে সমুদ্রের প্রতিটি ঢেউ।

এমনিই বুঝি হয়। যুগের পর যুগ, সমুদ্রের ঢেউ কত কথা, কত প্রেম, কত আশা, কত স্বপ্ন নিয়ে উদ্দাম উন্মাদনায় ছুটে আসে। ভেঙে পড়ে দ্বীপের মাটিতে। সবুজ রঙিন পাতা আর লাল ফুল হাতে নিয়ে অপেক্ষায় বসে থাকে দ্বীপ, নিঃসঙ্গ নির্বাক। নীল ঢেউ এসে দেখে দ্বীপ তার বোবা হয়ে গেছে, বিন্দু বিন্দু অশ্রু হয়ে ফেটে পড়ে ব্যর্থতার বেদনায়।

বন্দী দ্বীপ গুমরে মরে, সমুদ্রের ওপারেতে শান্তি দেখে ফের। মুক্তি পেতে চায়। নিঃসীম নীল জলে মুক্তি আছে অসহ্য বেদনার, তাই বুঝি বন্দী দ্বীপে ছুটে আসে উন্মাদ সাগর।



পিকনিক



রাখী বলেছিল জায়গাটা খুব সুন্দর। জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর। এসে পৌঁছলে হঠাৎ মনে হবে চারপাশের নোংরা পৃথিবী থেকে টপ্ করে পা তুলে নিয়ে কবিতার কিংবা স্বপ্নের সবুজে নৌকো ভাসিয়ে দিয়েছি।

রাখী যখন জায়গাটার বর্ণনা দিচ্ছিল, তখন ওর মুখচোখ খুশিতে ঝকঝক করে উঠেছিল। কি সবুজ, কি সবুজ, একটানা নরম কার্পেটের মত, তার মধ্যে একটা না দুটো লাল টকটকে ফুলে মোড়া পলাশ গাছ। একটা বনমোরগের টকটকে লাল ঝুঁটির মত। তারপর বালির পাড়, বালির ওপর পায়ের ছাপ চলে গেছে জল অবধি, নদীর জল ছলছল করছে। ওপারে নারকোল গাছের সারি ডিঙিয়ে গোলা খয়েরের মত আকাশ।

ইতু হেসে উঠে ওকে থামিয়ে দিয়েছিল।—দ্যাখ রাখী, তোর চোখে রঙ লেগেছে, তাই যা দেখছিস তাই রেনবো কালার।

নন্দিতা সব সময়েই ভীরু ভীরু। ও যেন হাসতেও ভয় পায়। তবু কৌতূহল চাপতে পারেনি। উৎসুক হয়ে বলে উঠেছে, কাছেপিঠে এমন জায়গা আছে? সত্যি বলছিস?

—রিয়েলী, রিয়েলী। রাখী জোর দিয়ে বলেছে, নিজের চোখেই গিয়ে একদিন দেখে আয় না।

ইতু ঠেস দিয়ে বলেছে, আমাদের ভাই বয়ফ্রেণ্ডও নেই, বয়ফ্রেণ্ডের গাড়িও নেই।

গর্বে আনন্দে রাখীর চোখদুটো হাসি উপছে দিয়েছে।—চাস্ তো বল না, দেবো জুটিয়ে?

ইতু ঠোঁটের কোণে একটু ব্যঙ্গের হাসি টেনে বলে উঠেছে, না বাবা, ওসবে আমার দরকার নেই। ওসব প্যানপ্যানানি আমার ভাল লাগে না।

তবু জায়গাটা এক অদৃশ্য হাতছানি দিয়ে ওদের বারবার ডেকেছে। ইতুকে, নন্দিতাকে। আর রাখী বার বার বলেছে, বিশ্বাস কর, ও জায়গায় একা একা গিয়ে ভাল লাগে না। ইচ্ছে করে, সক্কলে মিলে একদিন গিয়ে খুব হৈ-হুল্লোড় করি।

শেষ অবধি পিকনিকের কথাটা সেজন্যেই উঠেছিল। সেজন্যেই ইতু নিজে রাজি হয়েছিল, নন্দিতাকে রাজি করিয়েছিল। দীপকের সঙ্গে তো ওদের যথেষ্ট আলাপ আছে। কলেজে এসে কতদিন ইতুর কাছেই খবর নিয়ে গেছে রাখীর, মিটমাটের জন্যে ওকেই সাক্ষী ডেকেছে দীপক। একদিন ওয়ালডর্ফে চীনে খাবার খাইয়েছিল, একদিন চা—'গে'তে। দু'দিনই দীপকের বন্ধু অতীশও ছিল। একদিন তাকে হাসতে হাসতে দিব্যি স্নাবিং দিয়েছিল ইতু। তারপর থেকে ওকে দেখলে বেশ মজা পায়, একটুও ভয় করে না। স্নাবিং খেয়ে মুখটা ঝুলে লম্বা হয়ে গিয়েছিল অতীশের, মনে পড়লে নিজের মনেই ও কুলকুল করে হেসে ওঠে।

নন্দিতা প্রথমটা রাজি হয়নি। ইতু তাকে দুই ধমক দিয়ে বলেছে, ইস্কুলের মেয়ের মত হাতে আঁচল জড়ানো ছাড় তো, ওরা কেউ বাঘ-ভালুক নয়।

নন্দিতা ভীতু ভীতু, কিন্তু কথায় কম যায় না। বলেছিল, ওরা নয়—বলে ঘাড় হেলিয়ে চোখের ইশারা ছুঁড়ে দিয়েছিল। অর্থাৎ বাড়িতে। বলেছিল, দাদা তো নয়, রয়েল বেঙ্গল টাইগার একখানা।

সে-কথা শুনে ওরা সবাই হেসে উঠেছিল। আর রাখী বলেছিল, তুই কি রে। পিকনিকে যাবো সে-কথা বলবি নাকি বাড়িতে? দুপুরে বেরিয়ে যাবো, আটটা ন'টার মধ্যে ফিরে

আসবো একেবারে লক্ষ্মী মেয়ের মত মুখ করে।

শেষ অবধি তাই নন্দিতাও রাজি না হয়ে পারেনি। কতদিন তো নিছক নির্দোষ আড্ডা দিতে দিতে রাত হয়ে গেছে, সাড়ে আটটা ন'টাতেও ফিরেছে, তারপর চটপট একটা বানানো গল্প শুনিয়ে দিয়েছে মাকে। নন্দিতার নিজেরই হাসি পায় মাঝে মাঝে। সত্যি, মা ওকে কি ভালই না বাসে, কত বিশ্বাস করে! আর ও যে কত মিথ্যে কথা বলে মাকে, পাপের আর শেষ নেই। রাখী অবশ্য একদিন হেসে বলেছিল, খাঁচার পাখিটি হয়ে থাকবি, মা তোকে ভালবাসবে না কেন! বলে নিজের দুটো হাত ডানার মত কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে, হাসিতে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল, আমার মত উড়তে শেখ, তখন দেখবি মা'র ভালবাসাটাসা সব উড়ে গেছে। তারপর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলেছে, আমার ভাই, দেরি হলেই, ডোজ ঠিক করা আছে বকুনির।

—কখনো কখনো আমার তো ডবল ডোজও হয়ে যায়। ইতু হেসে বলেছে।

নন্দিতার মা চেঁচামেচি করেন না। থম মেরে থাকেন, মেয়ের চোখে চোখ রেখে স্থির হয়ে ভেতরটা পড়ে দেখার চেষ্টা করেন। সে সময় নন্দিতার ভীষণ ভয় করে, ওর মনে হয় মা বুঝি ভিতর অবধি সব দেখতে পাচ্ছে ; রঙিন মাছ-রাখা কাচের বাক্সটার ওপরে টুক করে আলো জ্বেলে দিলে যেমন সব দেখা যায়—বালি ঝিনুক ডিম-ডিম ছোট্ট মাছগুলোও। তাই এক এক সময় মনে হয়, বাড়িটা এত গোঁড়া না হলেই ভাল ছিল। সব মেয়েরা এত-এত কাণ্ড করে, রেস্টোরেন্ট-সিনেমা-চিড়িয়াখানা কোথায় না যায়! কত ছেলেদের সঙ্গে মেশে। অথচ নন্দিতার ভাগ্যে এমন একটা দাদা জুটেছে, সব সময় সারা কলকাতা চষে বেড়াচ্ছে। কোথাও ওকে দেখলেই বাড়ি ফিরে উকিলের জেরা। ইতু একদিন বলেছিল, আমাদের শিখাকে একটু এগিয়ে দে-না ওর কাছে, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। নন্দিতাও হেসে ফেলেছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাগও হয়েছিল ইতুর ওপর। দাদাকে কেউ আর পাঁচজনের সমান ভাবলে, দাদাকে কেউ ছোট করলে নন্দিতার রাগ হবে না কেন। আসলে দাদার ভয়, ও ছোট্টটি আছে, কখন কি ভুল করে বসে। ধীরে ধীরে তাই শুধু বলেছিল, দাদাকে তোরা একটুও চিনতে পারিসনি। ইতু সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, না রে, সত্যি খুব ভাল, কেমন দাদা-দাদা।

নন্দিতা রাখীর মত হতে চায় না, হতে পারবেও না। তবু রাখীর এই কাউকে কেয়ার না করা, কিছুতে আড়ষ্ট না হওয়া ভাবের মধ্যে কি এক নেশা আছে। নন্দিতার ভীষণ ভাল লাগে ওকে। একবার কোন একটা মিছিলে হাতে পতাকা নিয়ে ওর বুকের ভেতর যেমন খানিকটা সাহস এসে গিয়েছিল, রাখীর কাছে এলেই ওর ঠিক তেমনি হয়। কখনো কখনো ওরও ইচ্ছে করে কাউকে ভালবাসতে। কিন্তু সত্যি ভালবাসা কি এমনি করে আসে নাকি। রাখী নিজে একজনকে ভালবেসেছে, তবু ও বোঝে না। মিথ্যে মিথ্যে অতীশের নাম করে ওকে ঠাট্টা করেছিল। নন্দিতা ওসব চায় না, ও শুধু একটা দিনের জন্যে একটা ছোট্ট দ্বীপের মধ্যে পালিয়ে যেতে চায়। সেই দ্বীপটা আজকের এই পিকনিক।

ইতু একেবারে অন্যরকম। ওর শুধু দেখে বেড়ানোয় সুখ, কোথাও ধরা পড়তে চায় না, ধরা দিতে চায় না। ওর মধ্যে তাই একটা কিশোর-কিশোর ভাব মিশে আছে। রাখীকে একদিন বলেছিল, তুই তো উড়িস ঘুড়ির মত, লাটাই হাতে তোকে ওড়ায় তো দীপক। রাখী হেসে উঠেছিল, তারপর কি মনে হতেই ইতুর পিঠে একটা কিল বসিয়ে দিয়েছে।—আর তুই? হাসি থামিয়ে ইতুকে প্রশ্ন করেছে। ইতু হাতে একটা শব্দ করে তুড়ি দিয়েছে ছেলেদের মত, তারপর মেয়েলী গলাতেই ছেলেদের মতই বলেছে, আমি ভো-কাট্টা, সুতোফুতো নেই, স্রেফ কাটা ঘুড়ি। নিজের ফুর্তিতে উড়ে বেড়াচ্ছি।

আসলে শাসন-ফাসন একটুও মানতে ইচ্ছে করে না ওর। বকুনি খেয়ে খেয়ে বকুনির ধার গেছে কমে। মা'র তো সবতাতেই নিষেধ, কত আর মানবে ও। তবে রাগ মায়ের ওপর

যতখানি তার চেয়ে বেশি পাড়াপড়শী আত্মীয়স্বজনদের ওপর। সবাই যেন ওর গার্জেন! সবারই ওর সম্পর্কে খোঁজ-রাখা চাই! একদিন ইভনিং শোয়ে সিনেমা দেখে ফিরতে ফিরতে দশটা। খুব বকুনি দিয়েছিল মা, রেগে সেদিন রাত্রে আর খায়নি ও। পরের দিন মা বলেছিল, তুই বুঝিস না কেন, এত রাত করে ফিরলে পাড়ার লোক ভাববে কি। কাল বড়-জা এসেছিল, বললে, এত রাত হলো ইতু এখনো ফিরলো না? তা কত বানিয়ে বানিয়ে সব বলতে হলো; মা তো হবি একদিন, তখন মায়ের দুঃখ বুঝবি।

শুনে ইতুর মনে হয়েছে এত সব কাণ্ড করার দরকারটা কি। আমার খুশি আমি ঘুরবো বেড়াবো দেরি করে ফিরবো। আমি তো কচি খুকি নই, হারিয়ে যাবো না। আমার যা খুশি আমি তাই করবো। ভো-কাট্টা ঘুড়ির মত যতই ভেসে বেড়াই না কেন, আটটা ন'টার মধ্যে ঠিক তোমার গোয়ালেই তো ফিরে আসছি। ইতু ফিক করে হেসে ফেলেছিল নিজের মনেই—মা বোধহয় ভাবে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করছি। ওসব প্রেম-ট্রেম জানা আছে, মিষ্টি মিষ্টি কথা দিয়ে ইতুকে কেউ ভোলাতে পারবে না।

ওর শুধু নেশা নিষেধের গণ্ডী পার হওয়া। ওর কাছে পিকনিকটা পিকনিক নয়, ছোট্ট একটা বিদ্রোহ। বাড়ির বিরুদ্ধে, পাড়াপড়শীর বিরুদ্ধে, আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে।

আর রাখী এখন ওসব কিছু বোঝে না। ও এখন শুধু একটা নেশার দীঘিতে ডুবে আছে। সব শুনে ইতু বলেছিল, ডুবে আব আছিস কোথায়, বল্ দীঘির ঘাটে বসে আছি। অদ্দূর গেলি বেড়াতে একা-একা, এত রেগুলার ক্লাস করছিস, অথচ প্রোগ্রেস রিপোর্টে এখনো শূন্য।

তৃপ্তিতে রাখীর চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল।—এইটুকুই ভাল, বুঝলি ইতু এই ভাল। সারা পৃথিবীটাই মনে হয় পিকনিকের মাঠ।

২

হেমন্তের দুপুরে তখনো শীত একটু একটু উঁকি দিচ্ছে। হাল্কা রোদ্দুরের আমেজ গায়ে মেখে ট্যাক্সির ভাড়া চুকিয়ে দিল রাখী। এখন দুপুর একটা। ট্যাক্সি পাওয়া যাবে আবার, কিংবা এটুকু পথ বাসে-ট্রামে চলে গেলেও হয়।

ফুটপাথে সরে এসে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলো, ইতু কিংবা নন্দিতা কোথাও আছে কিনা। না, নেই। ইতুকে তো ওরা ঠাট্টা করে নাম দিয়েছিল বিলম্বিতা। ইতুর গড়নটা বেশ দীর্ঘাঙ্গী, সারস-সারস ভাব আছে শরীরে, অর্থাৎ ওদের চেয়ে বেশ খানিকটা লম্বা সে, তাই ক্লাসে অনুরাধা একবার ইতুকে বলেছিল 'লম্বিতা', কিন্তু কোথাও মীট করার কথা থাকলেই ও দেরি না করে আসে না বলে রাখী নাম দিয়েছিল 'বিলম্বিতা'। অভিযোগ করলে ইতু হেসে উঠে বলে, দ্যাখ রাখী, কেউ আমার জন্যে অপেক্ষা না করলে নিজেকে বড় সস্তা মনে হয়। আসলে ছেলেদের দাঁড় করিয়ে রাখার তবু মানে হয়, কিন্তু ওটা একটা পাগল। সক্কলকে খারিজ করে করে ও ভাবছে ওর দাম বাড়ছে। বুঝছে না, শেষে নিজেই নিজেকে নীলাম করে দেবে।

সিনেমা হলের সামনে একটা বাস-স্টপ, বাস-স্টপের ছাউনীর নীচে দাঁড়াবার কথা। সেখানে গিয়ে এক মিনিট অপেক্ষা করেই রাখী ভাবলো, হলের ভেতর ঢুকে দেয়ালে ছবি দেখছে না তো! কিংবা নন্দিতা এসে থাকলে হয়তো ওজন নিচ্ছে। নন্দিতার ওজন নেওয়ার বাতিক আছে। সিনেমা হলে টিকিট কাটতে গেলে কিংবা ছবি দেখতে এসে ও পটাস করে ব্যাগ খুলবে, একটা দশ নয়া বের করে ওজন নেবার মেশিনে গিয়ে দাঁড়াবে।

লাল-সাদা চাকতিটা থামলেই দশ নয়াটা খাপে ঢুকিয়ে দিয়ে যেই ঝটাং করে শব্দ হবে, টিকিট বেরিয়ে আসবে, অমনি সেটা হাতে তুলে নিয়েই ব্যাগে লুকিয়ে ফেলবে। পাছে অন্য কেউ দেখে ফেলে তাই নিজেও দেখবে না তখন।

না, বুকিং কাউন্টারের আশেপাশে ওরা কেউ নেই।

—লেডী কণ্ডাক্টর বলে একটা ছবি আসছে নাকি রে!

দুটো ছোকরা দেয়ালে সাঁটা শো-কার্ড দেখছিল, দেখছিল মানে আড়চোখে তাকিয়ে রাখীকে দেখছিল। একজনের গায়ে চক্করবক্কর শার্ট, একজনের গালে গালপাট্টা জুলফি। এখন এই এক ফ্যাশন উঠেছে ছেলেদের।

রাখী বুঝলো ওকেই বলেছে, কাঁধ থেকে লম্বা স্ট্র্যাপে ঝোলা লাল ব্যাগটার জন্যে। সঙ্গে কেউ থাকলে ও হয়তো ঠোঁট চেপে হাসতো ; এখন একা, তাই ভিতরে ভিতরে রাগলো, হল থেকে বেরিয়ে এল। ওদের কি বলবে, ম্যাটিনি শো-তে ওরা কলেজ থেকে আট-দশটা মেয়ে লাইটহাউসে সিনেমা দেখতে গিয়েছে। অনুরাধা হঠাৎ ছেলেদের মত জোরসে শিস্ দিয়ে উঠল। সে কি হাসাহাসি! রাখী নিজেও তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। রাখী ভাবল, অনুরাধাকেও নিয়ে গেলে হতো। কিন্তু না, দীপকের গাড়িতে বোধহয় আঁটবে না।

রাখী হাত তুলে ইশারা করলো নন্দিতা ট্রাম থেকে নামতেই।

কাছে আসতেই বললে, তোকে নিয়ে আর পারা গেল না। এ কি বেশ করেছিস, কালীবাড়ি যাচ্ছিস নাকি?

নন্দিতা লাজুক হাসল। টকটকে লাল পাড় একখানা কোরা শাড়ি পরেছে ও। এমনিতে নন্দিতার গায়ের রঙ একটু শ্যামলা, কিন্তু ওর মুখে চোখে কেমন একটা শান্ত শ্রী আছে। লাল পাড় শাড়িতে ওকে আরো কোমল আর শান্ত লাগছে।

ঠিক তখনই ইতু এগিয়ে এল, ও কখন বাস থেকে নেমেছে রাখী লক্ষ্যও করেনি। রাখী ভেবেছিল নন্দিতা খুব সেজে আসবে, তাকে এমন ঠাণ্ডা পোশাকে দেখে তাই খারাপ লেগেছিল। দীপক আর তার বন্ধুদের কাছে ওর বন্ধুরা এমন পূজারিণী বেশে গেলে রাখীরই লজ্জায় মাথা কাটা যাবার কথা। ওরা ভাববে কি! যাক্, ইতুকে দেখে ওর মনটা আবার খুশি হয়ে উঠল।

কিন্তু ইতু রাখীর দিকে ভ্রূক্ষেপই করলো না। একেবারে নন্দিতার সামনে এসে অবাক প্রশংসার চোখ দিয়ে তার আপাদমস্তক দেখল, চোখ দুটো চোখ নয়, যেন দেয়ালে রঙ বুলোনোর বুরুশ, দৃষ্টিটা একবার ওপর থেকে নীচে নামল, আবার নীচে থেকে ওপরে উঠল। ভরা কলসীর মত শব্দ করে হেসে বললে, কি দারুণ লাগছে তোকে নন্দিতা, এক্কেবারে ইনোসেন্ট সর্সারেস!

তারপর রাখীর দিকে ফিরে বললে, যতই সাজি না আমরা, ছেলেদের কাছে ইনোসেন্টদেরই ডিম্যাণ্ড।

ইতুর প্রশস্তিতে রাখীও তখন সান্ত্বনা পেয়েছে। ওর রুচি আছে—ইতুর ; আর ও ছেলেদের খুব ভাল বোঝে। তা হলে নন্দিতার জন্যে রাখীর আর খুব একটা অস্বস্তি থাকা উচিত নয়।

ইতুর হাতে একটা ভায়োলেট রঙের কার্ডিগান ভাঁজ করা রয়েছে, কালো ছোপ-ছোপ একখানা ভায়োলেট রঙের শাড়ি পরেছে। ফর্সা রঙের সঙ্গে সুন্দর মানিয়েছে ওকে, তার ওপর ইতুর আসল রূপ তো চুলে। বেশ পুরুষ্টু আর কোমরের নীচে অবধি নেমে আসা বেণীতেই তো ওর রূপ। তাছাড়া হাঁটাচলায় ফুর্তির মেজাজে ঐ হরিণ হরিণ ভাব।

নন্দিতার সাজে অসন্তুষ্ট ভাব পুরো কাটেনি বলেই হোক্ কিংবা ইতুর সাজগোজে খুশি হয়েই হোক্, ও বলে উঠল, দারুণ লাগছে তোকে, ইতু। দেখিস, শেষে দীপ যেন····

কলকল করে হেসে উঠল ইতু।—ভয় নেই, হি'জ ট্যু ডীপ। বলে অর্থপূর্ণভাবে চোখটা কেমন যেন করলো।

রাখী ঈষৎ ভয়ে ঈষৎ কৌতুকে বললে, এই! খবরদার!

নন্দিতা বোকার মত তাকাল একবার এর মুখের দিকে, একবার ওর মুখের দিকে, কিন্তু বুঝতে পারল না।

ব্যাপারটা তুচ্ছ, কিন্তু যে-কোনো মুহূর্তে সাঙ্ঘাতিক হয়ে যেতে পারে। যদি দীপকের কানে যায়। আর ইতুকে বিশ্বাস নেই। ও কখন যে কি বলে বসে ঠিক নেই তার। অবশ্য ইচ্ছে করে বলবে না কখনো, তা জানে রাখী।

রাখী হঠাৎ হাত তুলে ডবল-ডেকার বাসটাকে থামালো। দুপুরে এসময় তেমন ভিড় নেই। তরতর করে উঠে পড়ল তিনজনই, আর বসার জায়গা পেতেই নন্দিতা দেখলো ইতু-রাখী কি যেন কানাকানি করলো। সমস্ত ব্যাপারখানা তার কাছে রহস্য-রহস্য ঠেকলো। নিশ্চয় কিছু মজার। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে বাধলো। এর আগেও দু'একবার এমন হয়েছে, ওকে বাদ দিয়েই ওরা দু'জনে কানাকানি করেছে, কিংবা কিছু একটা নিয়ে হেসে উঠেছে। অথচ নন্দিতাকে বলেনি। নন্দিতার তখন খুব রাগ হয়, ওদের সামনে ও কেমন যেন ছোট হয়ে যায়। ওরা তিনজনই তো বন্ধু, তবু মাঝে মাঝে নন্দিতাকে যেন বাইরের ঘরে বসিয়ে রাখে।

নন্দিতা তাই কোনো কৌতূহলও দেখালো না। অনেকদিন আগে একবার শুধু খুব অভিমান হয়েছিল, সুমিকে বলেছিল, সমান সমান বড়লোক না হলে ভাই সত্যি বন্ধু হয় না। বলেছিল বটে, তবে নন্দিতা জানে, ও গরীব হলেও রাখী-ইতুরা মোটেই বড়লোক নয়। তবু ওদের দু'জনকে ফিসফিস করে কথা বলতে, হেসে উঠতে দেখে নন্দিতার মন খারাপ হয়ে গেল। ও ভাবল, আমি তো যেতে চাইনি, রাখীই জোর করেছিল। ও ভাবল, যেতে রাজি না হলেই পারতাম।

রাখীর ওসব ভাবনা নেই, নন্দিতা কি ভাবছে না ভাবছে দেখার চোখ তখন তার কৌতুকে হাসছে।

আসলে ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়। দীপককে তার বন্ধুরা ডাকে 'দীপ' বলে, তা থেকে রসিকতা করে রাখী নিজেও একদিন তাকে দীপ বলে ডেকেছিল। তারপর তো কি ভাবে কি-সব হয়ে গেল মনের মধ্যে, দীপক দু'-দু'খানা লম্বা চিঠি লিখে ফেলল রাখীকে। তারপর আরো লিখেছে। কিন্তু সব ক'খানার শেষেই নাম লিখেছে ইংরেজিতে—'Deep' বলে। একটার শেষে—Too Deep.

আসলে সেটাও কিছু নয়। আসলে অপরাধ দীপকের চিঠিগুলো ইতুকে দেখানোয়। দীপক চিঠিতেও লিখেছে, ওকে বার বার মুখেও বলেছে, দীপকের চিঠি যেন কাউকে না দেখায় রাখী। ওদের মধ্যে কি কথা হয়, দীপক ওকে গাঢ় গলায় কবে কি বলেছে, এ-সব যেন কেউ না জানে। রাখী কথা দিয়েছে, বারবার বলেছে, দেখাই না দেখাই না। বলি না বলি না। একদিন অভিমানে চোখ ছল ছল করে বলেছিল, তুমি আমাকে ভীষণ সন্দেহ করো দীপ, এতই যদি সন্দেহ, আর কোনদিন বিরক্ত করবো না তোমাকে।

—সন্দেহ? অবাক হয়ে গিয়েছিল দীপক।—এর মধ্যে সন্দেহের কি আছে!

রাখী জলে ভেজা চোখের পাতাকে হাসিয়ে দিয়ে বলেছিল, বলেছি তো, কাউকে কিচ্ছু বলি না, কাউকে তোমার চিঠি দেখাইনি।

অথচ ইতুকে সব চিঠি দেখিয়েছে ও, না দেখিয়ে পারেনি। যত কথা হয়েছে তার সবই প্রায় বলে ফেলে। ফেলেছে। না বলে না দেখিয়ে সত্যি আনন্দ নেই। আর ইতু তো ওর দারুণ বন্ধু, তাকে দেখালে বা বললে দোষ কি। দীপক হয়তো ভাবে, ওর চিঠি বন্ধুদের

দেখিয়ে ও হাসাহাসি করে। কিংবা দীপটা ভীষণ ভীতু, ভাবে, গোপন কথা সব ইতু-টিতুকে বললে ওরা ভাংচি দেবে, দীপকের বিরুদ্ধে ওর মনকে বিষিয়ে দেবে।

ও তাই বার বার ইতুকে সাবধান করে দিয়েছে, দীপক যেন জানতে না পারে। জানলে সেই মুহূর্তে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।

—তা বলে কিছুই কি আর বলিনি ওদের ? একদিন হাসতে হাসতে রাখী বলেছে দীপককে।

দীপকের তখন হারাই-হারাই ভয় কেটে গেছে। জিজ্ঞেস করেছে, কি বলেছো ?

—যেটুকু না বললে নয়। রাখী দীপকের চোখে চোখ রেখে উত্তর দিয়েছে।

সেদিন থেকেই ইতু ওদের দু'জনের মাঝখানে উঁকি দিয়েছে। সত্যি সত্যি একটা ছবি আছে ওদের তিনজনের। রাখী আর দীপকের—পিছন থেকে ইতু মুখটা বাড়িয়ে দিয়ে হা হা করে হাসছে।

—হাসি থামাও, নামতে হবে না বুঝি ! ওদের দু'জনকে হাসতে দেখে নন্দিতা বলে উঠলো। কারণ বাস তখন গ্র্যাণ্ড হোটেল পার হয়ে গেছে।

চমকে জানালার বাইরে তাকালো রাখী। বাস স্টপে পৌঁছতেই হুড়মুড় করে নেমে পড়লো। পিছনে পিছনে ইতু আর নন্দিতা।

মেট্রোর নীচে ওদের অপেক্ষা করার কথা। কিন্তু কি হবে অতখানি গিয়ে। তার চেয়ে এপারে যেখানে গাড়িগুলো পার্ক করা আছে সেখানে গিয়ে দেখা যাক্। এখানেই গাড়ি রাখার কথা।

ইতু বললে, নম্বর মনে আছে তোর ?

রাখী হেসে ঘাড় নাড়লো। একবার এদিক থেকেই মেট্রোর নীচেটা দেখলো, চোখ বুলিয়ে গেল সাদা অ্যামবাসাডব গাড়ি ক'খানার ওপর দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিনজনকেই দেখতে পেল। দীপক, অতীশ আর সোমনাথ।

সোমনাথকেও দীপক টেনে আনবে রাখী ভাবেনি। ওর ধারণা ছিল, শুধু অতীশ আসবে ওব সঙ্গে।

সোমনাথের সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা, সদ্য ভাঙা।

রাখী ফিসফিস করে বললে, ঐ সোমনাথ, যে টিনোপলের বিজ্ঞাপন হয়ে এসেছে। তোদের সঙ্গে আলাপই হয়নি।

ইতু হেসে বললে, দীপকের বেশ ম্যাথমেটিক্যাল ব্রেন আছে রে, যোগে ভুল করেনি····থ্রি ফর থ্রি।

নন্দিতা নতুন মুখ দেখে একটু জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল। তবু সঙ্কোচ কাটিয়ে ইতুকে বললে, তুই কি বেহায়া বাবা !

৩

ছ'-ছটা দুঃসাহসের মুখ এতক্ষণ টাটকা লাগছিল, গাড়িতে উঠেই বাসী হয়ে গেল। না, দীপকের বরং ভয়ডর একটু কম। রাখী আর ইতু তবু মুখ দুটো ব্রাইট রাখবার চেষ্টা করলো, নন্দিতা তো ভয়েই জড়োসড়ো। চেনাজানা কেউ কোথাও আছে কিনা তাকিয়ে দেখারও সাহস হল না তার। দাদা আবার এদিকেও মাঝে মাঝে ঘোরাঘুরি করে।

ওদের দূর থেকে আসতে দেখেই চাবির রিংটা আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দীপক এগিয়ে গিয়েছিল। চেনে বাঁধা ওর এই চাবির রিংটা যেন বুকের মেডেল।

যুদ্ধজয়ের ভঙ্গিতে বাঁ হাত ট্রাউজার্সের পকেটে গুঁজে ওকে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে এগিয়ে আসতে দেখে ইতু বলে উঠেছিল, দীপ কিন্তু দারুণ স্মার্ট, না রে রাখী !

—আস্তে। শুনলে আর গর্বে মাটিতে পা পড়বে না। রাখী ফিসফিস করে বলে হেসে উঠেছিল।

দীপক কাছে থাকলে ও এমনিতেই একটা রানী-রানী ভাব করে। সাদা অ্যামবাসাডর গাড়িটার কাছে এসে রাখী আরো সপ্রতিভ ভঙ্গিতে সোমনাথের সঙ্গে নন্দিতার আলাপ করিয়ে দিল।—এ নন্দিতা, আর····নন্দিতা ঠোঁটের কোণে এক টুকরো স্মিত হাসি এনে চোখ তুলে সোমনাথের চোখে একবার তাকালো, তারপর চোখ নামালো। নমস্কার করতেও ভুলে গেল ও।

এদিকে ইতুর পরিচয় করিয়ে দেবার আগেই ইতু নিজেই বলে উঠলো, আমি ইতু সান্যাল, পাঁচ ফুট পাঁচ, অনার্স ছিল হিস্ট্রিতে, রাখীর অনেকদিনের বন্ধু।

দীপক ততক্ষণে স্টিয়ারিঙের সামনে গিয়ে বসেছে। কিন্তু অতীশ আর সোমনাথকে ওর পাশে এসে বসতে দেখেই ও দরজা খুলে নেমে পড়লো।—আমি কি মেয়ে-স্কুলের বাসের ড্রাইভার নাকি !

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে অতীশ বললে, সাদা কথাটা স্পষ্ট করেই বল না। লেডীবার্ডকে পাশে বসতে হবে এই তো !

রাখীর নিজেরও সেই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু লজ্জা পেয়ে ও রেগে গেল।—কক্ষনো না, কক্ষনো না।

জেদ ছাড়ল না ও কিছুতেই। তা দেখে ইতু বললে, কি মশাই, আমি গিয়ে বসলে হবে ? এ যাত্রায় নয় স্ট্যাণ্ডবাই হিসেবেই চালিয়ে দিই।

রাখী ওর কথায় মৃদু হাসলো, চোখের ইশারায় ওকে উসকে দিল, যা যা।

শেষ অবধি তাই ঠিক হল। সামনে অতীশ আর দীপকের মাঝখানে ইতু। পিছনে রাখী, নন্দিতা, সোমনাথ।

রাখী আড়চোখে দেখল, ছোঁয়া বাঁচিয়ে যেমন নন্দিতা বসেছে, তেমনি বিঘতখানেক ফাঁক রেখে ওপাশে সোমনাথও জড়োসড়ো।

গাড়ি স্টার্ট নিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সব ক'টা দুঃসাহসের মুখ কেমন ম্লান দেখাল। নন্দিতার তো কথাই নেই, ইতুও যেন জোর করে হাসার চেষ্টা করছে।

গাড়ি যতক্ষণ না হাওড়া ব্রীজে উঠেছে তখন অবধি রাখী, ইতু, নন্দিতার মুখে কোনো কথা নেই। কেবল এপাশ ওপাশ দেখছে, চেনাজানা কেউ না দেখে ফেলে। রাস্তাঘাটে বা রেস্টোরেন্টে দেখলে তেমন ভয় নেই। কিন্তু দীপকের গাড়িতে এবং এদিকের রাস্তায়, কি অজুহাতই বা দেবে ধরা পড়লে !

রাখী অবশ্য ওসব কথা ভাবছেই না। ওর মন তখন বাড়িতে ফিরে গেছে। সমস্ত ঘটনা আবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। সমস্ত মন বিস্বাদ।

রাখীর এক এক সময় মনে হয় দোষ ওর নিজেরই। সব বিষয়ে ওর ইচ্ছেগুলো এত স্পষ্ট কেন। তা না হলে বাড়িটার সঙ্গে ও নিশ্চয়ই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারতো। অনুরাধা একদিন ওদের বাড়ি এসেছিল। ফেরার পথে বলেছিল, তোর বাবা-মাকে দেখলে একেবারে ইয়াং মনে হয়। তুই খুব লাকি। রাখীর নিজের কিন্তু তা মনে হয় না। ওর ইচ্ছে করে বাবা বাবার মত হবে, অর্ধেক চুল পাকা, একটু ভালমানুষ ভালমানুষ। ওর ইচ্ছে করে মা অত সাজগোজ করবে না, অত রঙিন শাড়ি পরবে না। শুধু ব্যবহারে, শুধু পোশাকে মডার্ন হয়ে কি লাভ, মন যদি বিধবা পিসীটার মতই হয় ! রাঙা পিসী মাঝে মাঝেই শ্বশুরবাড়ি থেকে এসে দু'তিন মাস জাঁকিয়ে বসে। আর সে-সময় সর্বক্ষণ তার রাখীর ওপর

গোয়েন্দাগিরি। সব সময়ে মাকে অ্যাডভাইস দিচ্ছে কি করে মেয়েকে ঠিকপথে রাখতে হয়। যেন রাখী খুব একটা অন্যায় করছে, পাপ করছে। কি, না কলেজের ছেলেদের সঙ্গে মেশে। কে মেশে না! পিসী সেই নাইন্টিন্থ সেঞ্চুরিতেই পড়ে আছে। মা বাইরে সেন্ট পার্সেন্ট আধুনিকা, কলেজে ছেলেদের সঙ্গে কি গল্প হল, কে কি মজার কথা বলেছে, প্রথম দিকে শুনে হাসতো। এখনো অবশ্য খুব বেশি মাইণ্ড করে না। কিন্তু দীপকের নাম ও আর ভুলেও মা'র সামনে তোলে না। অথচ দীপ তো দিব্যি ভাল চাকরি করে, কত ভদ্র আর স্মার্ট।—বলছিস তো তোদের চেয়ে বড়, চাকরি করে। কি করে আলাপ হল? মা জিজ্ঞেস করেছিল। তখন আর উপায় কি, বানিয়ে বানিয়ে একটা গল্প বলেছিল, অবহেলার ভঙ্গিতে। যেন দীপক বিশেষ কেউ নয়। তারপর যেদিন শুনলো দীপকের একটা গাড়ি আছে সেদিন কেমন দৃষ্টিতে যেন মা তাকিয়েছিল ওর মুখের দিকে। যেন গাড়িওয়ালা লোকগুলো ভাল হয় না। অথচ রাখী জানে, গাড়ির ওপর ফ্রীজের ওপর, মা'র নিজেরও লোভ। বাবাকে কতদিন খোঁটা দিয়েছে।

মাকে এক এক সময় ওর বন্ধু মনে হয়, সব কথা বলা যায়। না, আসল কথাগুলো ছাড়া। এখন তো বাড়িতে শুধু মিথ্যে কথা আর মিথ্যে কথা। ইতু-অনুরাধার সঙ্গে একদিন থিয়েটার দেখতে গেল, দীপক-টীপক কেউ ছিল না, তবু মাকে বলতে হল লাইব্রেরী যাচ্ছি।

—সে কি রে, আমাদের সঙ্গে গেলেও আপত্তি হবে নাকি? অনুরাধা বলেছিল।

রাখী হেসে বলেছিল, কি করি বল, কাল যে ফিরতে দেরি হয়েছিল বলে তোদের নাম অলরেডি চালিয়ে দিয়েছি। ফিরতেই একেবারে পিসীর সামনে, উপায় কি!

মাথার ওপর সর্বক্ষণ একটা মিথ্যের পৃথিবী বয়ে বেড়াতে হয় বলে এক এক সময় রাগ হয়, আবার সে-সব কথা বন্ধুদের বলার সময় বেশ মজাও পায়।

দীপককে বলেছিল একদিন, তোমার জন্যে কত অজুহাত আর দেবো!

বলে, কবে কি বলেছে মা'কে, কি রকম অভিনয় করেছে, হাত-পা নেড়ে দেখিয়েছিল।

দেখে দীপকও হেসে উঠেছে, আবার ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলেছে, তা হলে অভিনয় তুমি ভালই জানো, কি বলো!

ব্যস্ রাখী কড়া চোখে তাকিয়েছে দীপকের দিকে।—ঠিক আছে। বলে তখনই দরজা খুলে নেমে পড়ে আর কি!

নেমে ও পড়তো না, ঠিকই ফিরে আসতো, হয়তো প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠতো ফিরে এসে। তবু মাঝে মাঝে একটু অভিমান দেখাতে বেশ ভালই লাগে।

আসলে দীপক সম্পর্কে ও মনে মনে প্রায় ঠিক করে ফেলেছে। আজ বাড়িতে এতখানি রাগারাগি হয়ে যাওয়ার মূল কারণই তাই।

সমস্ত ষড়যন্ত্রটা আসলে পিসীর। বাবা-মা'ও নিশ্চয়ই সব ব্যবস্থা করেছে, চিঠি লেখালেখি করেছে, অথচ রাখী ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি।

মা সকালে হঠাৎ বললে, কালকের দিনটা কিন্তু তুই বাড়ি থেকে বেরুবি না।

—কেন মা? বুঝতে না পেরে রাখী প্রশ্ন করেছিল।

মা এড়িয়ে যাচ্ছিল।—তোর বাবা বলেছে, কি কাজ আছে।

কিন্তু রাঙাপিসী চুপ করে থাকার লোক নয়। দুম্ করে বললে, কেন আবার, তোকে দেখতে আসবে।

রেগেমেগে সে এক তুলকালাম কাণ্ড করে বসলো রাখী। মা কড়া কড়া কথা বলল, পিসীর মুখে কোনো লাগাম নেই, বলে বসলো, ফস্টিনস্টি করেই সারাজীবন কাটবে!

দেখতে আসার কথাতেই ওর ভীষণ অপমান বোধ হয়েছিল। ক্লাশের একটা মেয়ের সম্পর্কে এমনি একটা খবর জানতে পেরে দল বেঁধে তার পিছনে লেগেছিল একবার,

বন্ধুদের বলেছিল, চেনা নেই জানা নেই একটা লোককে বিয়ে করা ! ইম্পসিবল্ । সেই রাখী কিনা 'হাঁটো তো মা একটু', 'দেখি তো মা চুলটা'— অ্যাবসার্ড । সমস্ত মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছে । ইতু অনুরাধা যদি জানতে পারে মুখ দেখাতে পারবে না ও ।

সকালের সেই দৃশ্যটা হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল বলেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল রাখী । গাড়ির জানালার পাশে বসেও বাড়িতে ফিরে গিয়েছিল । একবার শুধু মনে হয়েছিল, ছেলেটি কেমন দেখতে, কি করে, মাকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলে হতো । ঝগড়া করে ফেলার পরের মুহূর্তে ওর খুব জানতে ইচ্ছে হয়েছিল ।

অতীশের কথায় ঘোর কেটে গেল । অর্থাৎ অতীশের কথায় সকলে শব্দ করে হেসে উঠতেই ও নিজের মধ্যে ফিরে এল । জিজ্ঞেস করলে, কি কথা, কি বললেন ?

রাখীকে নিয়েই মন্তব্য । রাখী শোনেনি বলেই ওরা আবার হেসে উঠল ।

দীপক যত অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিচ্ছে, কোলকাতা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন হাইওয়েতে পড়ে গাড়ি যত স্পীড নিচ্ছে ততই যেন উদ্দাম হয়ে উঠছে ওরা । উচ্ছল অর্কেস্ট্রার মত ওদের হাসিহুল্লোড় কথা যেন নেশায় মেতে উঠল ।

ইতুর হয়তো বসতে অসুবিধে হচ্ছিল, হাত দুটো গুটিয়ে রাখতে । তাই ডান হাতটা দীপকের পিঠের দিকে সীটের ওপর রাখলো, বললে, দেখিস রাখী, জেলাসি হচ্ছে না তো তোর ?

রাখী পিছন থেকে বললে, হতেও পারে, বাঁ হাতটা বরং···

ইতু সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতটা নামিয়ে বাঁ হাতটা অতীশের কাঁধের দিকে সীটের ওপর রাখলো । বললে, বেশ তো, তাই রাখলাম । তারপর অতীশের দিকে মুখ না ফিরিয়েই সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়েই বললে, দেখবেন, স্যার, আপনার আবার বুকের মধ্যে কি সব হয়-টয় শুনেছি, সে সব যেন না হয় ।

অতীশ হেসে বললে, পাশে বসেই হচ্ছিল, এখন তো কাঁধটা কেমন শিরশির করছে । নেহাত অ্যামবাসাডর, তা না হলে আপনার হাতের ছোঁয়াটাও পেতাম ।

—আহা অচ্ছুত থাকবেন কেন ! বলে বাঁ হাতে অতীশের ঘাড়ের চুলগুলো মুঠো করে ধরে ঝাঁকানি দিল ইতু ।

রাখী পিছন থেকে ফোড়ন কাটলো, বাঃ, এই তো বেশ প্রগ্রেস হচ্ছে । আশা ছাড়বেন না অতীশদা ।

দীপক তখন স্টিয়ারিং ধরে মুচকি মুচকি হাসছে ।

কখনো গান, অবিরাম হাসি—কথা, ছোট ছোট স্মৃতির টুকরোকে রেকর্ড প্লেয়ারে চাপিয়ে নতুন করে বাজানো, 'অনুরাধা এলে আরো জমতো', 'ভয় নেই ভয় নেই রাখী, ওখানে পৌঁছে তোদের একা ছেড়ে দেবো'—একটা ফুর্তির বন্যা যেন হাইওয়ে ধরে সব দুঃখ ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে ।

অতীশ অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ বললে, কোথাও একটু চা খেলে হতো রে ।

তখনো বেশ কিছুটা বাকি । রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকান দেখতে পেয়ে গাড়ি থামাতে হল ।

ইতুর ডান হাতের কব্জিতে অতিরিক্ত চওড়া চামড়ার ব্যাণ্ডে ঢাউস একটা ঘড়ি । গাড়ি চলছে আবার । অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ ইতু ঘড়ি দেখলো । দীপকের তা চোখ এড়ালো না । বললে, আর এসে গেছি ।

রাখী যেন তার কথারই প্রতিধ্বনি তুললো, এসে গেছি ।

৪

লাভলি, লাভলি ! ইতু সত্যি সত্যি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। বললে, এমন একটা সুন্দর জায়গা আছে, এত কাছে, জানতামই না।

অতীশ বললে, আরো সুন্দর একটা জায়গা আছে, আরো কাছে, আপনি তো জানতে চান না।

এবার আর কেউ হাসলো না। কারণ তখন সবারই চোখ জুড়িয়ে গেছে।

হাইওয়ের চওড়া রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ব্রীজের ওপর দিয়ে। কিন্তু তার আগেই ডান দিকে একটা সরু কাঁচা রাস্তা নেমেছে সবুজ ঘাসের দ্বীপটুকুর মধ্যে। এরকম সবুজ যেন ওরা অনেক কাল দেখেনি। কাঁচা সোনা রোদ্দুরে এ সবুজ যেন অন্যরকম। আর অফুরন্ত গাছ, গাছ, যেন বন হয়ে গেছে। যতদূর চোখ যায় বালির চর, জল, জল, হলুদ রোদ্দুর, ফিকে নীল আকাশ।

সবুজ দ্বীপের মত জায়গাটায় আরো দু'খানি গাড়ি দেখতে পেল দীপক। একখানা ফিয়াট। বড় রাস্তা থেকে নেমে ওর গাড়িও সেদিকেই এগিয়ে গিয়ে থামলো। চারদিকের চারটে দরজা একই সঙ্গে খুলে গেল। ওরা সবাই নেমে পড়লো।

আঃ ! একটা আরামের নিঃশ্বাস নিল ওরা। এতক্ষণ গাড়ির মধ্যে ঠাসাঠাসি হয়ে হাত-পা জমে গেছে। এবার একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসতে হবে।

দীপক দু-পা এগিয়েই নরম ঘাসের ওপব ধপ্ করে বসে সটান শুয়ে পড়লো। অতীশ আর সোমনাথ পায়চাবী করার নাম করে অন্য গাড়ি দুটোর কাছ দিয়ে ঘুরে আসতে গেল। আর রাখী, ইতু, নন্দিতা ফিসফিস কবলো, চেনা কেউ নেই তো বে ! ওরা দুটো দলকেই দেখে নিশ্চিন্ত হল। ব্যস, এবার ওরা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারবে। এবার নিশ্চিন্তে এই আনন্দটুকু উপভোগ করতে পাববে।

দীপক শুয়ে শুযেই অতীশকে ডাক দিল। গাড়িটাব চাবিটা প্যান্টের পকেট থেকে বের করে বললে, পিছনে কেবিয়াবটা খুলে দে, মাংসটা ডবল সেদ্ধ হয়ে যাবে হয়তো।

অতীশ ফিরে আসতেই সোমনাথ থেমে পড়লো। ও চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। জায়গাটা এখনো পিকনিকের জন্যে তেমন পপুলার হয়নি। তবু রাস্তার ধারে চিকের দেয়াল আর হোগলার ছাউনী দেওযা খানকযেক চায়ের দোকান গজিয়ে উঠেছে। দু-একজন একরাশ ডাব নিযে বসেছে। ওদিকের গাছতলা থেকে ট্রান্সিসটাবের গান ভেসে আসছে। ময়লা ইজেব-পরা খালি-গা কালোকুলো আধ ডজন বাচ্চা ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিকে। একজন ওদের দিকেই ছুটে এল।—চা এনে দেবো বাবু !

সোমনাথ একটু শান্তশিষ্ট, বেশি কথা বলে না। দীপক লক্ষ্য করেছে আসার পথে সারাক্ষণ সকলে গল্প করেছে, এমন কি নন্দিতাও দু-একটা মজার কথা বলেছে, কিন্তু সোমনাথ শুধু হাসিতে যোগ দিযেছে, আব কিছু নয়। এমন লাজুক আর মুখচোরা বন্ধুটিকে নিযে দীপকেরই মুশকিল। অথচ মেয়েরা কেউ না থাকলে এই সোমনাথই অন্য মানুষ। তখন পাজামা পাঞ্জাবিতেও ওকে কবি-কবি লাগে না।

শুনে রাখী হেসে উঠেছিল একদিন।—আজকালকার কবিদের সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণাই নেই। ওদের দেখে অন্য অনেক কিছু মনে হবে, কিন্তু কবির লেবেল কোথাও খুঁজে পাবে না।

রাখী ঐসব কবিদের মিটিং-ফিটিঙে দু-একবাব গিয়েছিল, গল্পটপ্প পড়ে। দীপকের ওসব ন্যাকামি ভাল লাগে না। ওর একটাই নেশা—ক্রিকেট। শুধু দেখার নয়, নিজেও ভাল খেলতে পারে, অন্তত অতীশ তাই বলে।

অতীশ গাড়ির দিকে যেতেই সোমনাথ নিজেকে একা একা বোধ করলো। ধীরে ধীরে এসে দীপক যেখানে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে, সেখানেই স্যাণ্ডেল খুলে তার ওপর বসলো। সেখানটায় সামনের গাছটার ছায়া পড়েছিল।

ওদিকে কেরিয়ার খুলে দিতেই বেশ ভুরভুরে রান্না-করা মাংসের গন্ধ এল। একটা চেনা রেস্টোরেণ্ট থেকে সমস্ত ব্যবস্থা করে এনেছে দীপক আর অতীশ।

রাখীদের দল ততক্ষণে ঘুরে ঘুরে অন্য দুটো দলকে পার হয়ে নদীর ঢালুর দিকে নেমে যাচ্ছে।

অতীশ ফিরে এসে বললে, কি ব্যাপার, সব আলাদা আলদা হয়ে গেলাম যে!

দীপক উঠে বসে বললে, চল, একটু সার্ভে করে আসি।

বলেই উঠে পড়লো।

ইজের-পরা বাচ্চা ছেলেটা বললে, চা আনবো বাবু!

দীপক বললে, এখন না। অর্থাৎ, ওরা ফিরুক আগে।

ছেলেটা খুশি হয়ে একটু সরে দাঁড়াল।

তিনজনেই এমন ভাব করে হাঁটতে হাঁটতে অন্য দল দুটোর দিকে গেল যেন কোনো উদ্দেশ্য নেই, এমনি।

একটা দল ফ্যামিলি। স্বামী, স্ত্রী, একটা বছর পনেরোর স্ল্যাক্‌স্ আর ঢিলে কুর্তা, একটা বছর চার।

একটু এগিয়ে আরেকটা দল। দল নয়, দু'জন। দু'জনেরই বয়স কম, দীপক-রাখীদের মতই। তবে নতুন বিয়ে হয়েছে, বউটার সিঁথিতে চওড়া জ্বলজ্বলে সিঁদুর দেখে মনে হল।

রাখীরা আড়াল থেকে উঠে আসছে দেখেই দীপকরা গাছতলাটায় ফিরে এল।

নিজের মনেই বললে, এ জায়গাটাও একটা পিকনিকের জায়গা হয়ে যাবে দেখিস। এর আগে যখন এসেছিলাম, সেবার কেউ আসেনি। দোকান ছিল একটাই।

অতীশ বললে, স্ল্যাক্‌স্-পরা মেয়েটা দিব্যি দেখতে। তবে বড্ড বাচ্চা।

দীপক বললে, ক্ষুদে বৌটা খুব মিষ্টি।

সোমনাথ কোনো কথা বলল না, শুধু হাসলো।

রাখীরা তিনজন তখন এ-ওর গায়ে ঢলে পড়তে পড়তে একটা উচ্ছল হাসির ঢেউ হয়ে ফিরে আসছে।

রাখী আর নন্দিতা ফ্যামিলি গ্রুপটার কাছে থেমে পড়লো। চার বছরের বাচ্চা ছেলেটা রবারের বল খেলছিল, রাখী গিয়ে তাকে কোলে তুলে নিল।

ইতু এক মিনিট দাঁড়িয়ে দেখে দীপকের কাছে চলে এল। অতীশের সামনে বসে পড়ে বললে, কি মশাই, আরো সুন্দর জায়গাটায়গা কি বলছিলেন তখন, দেখাবেন তো?

অতীশের মনে পড়লো, গাড়ি থেকে নামবার সময় ও কি বলেছিল। 'আরো সুন্দর একটা জায়গা আছে, আরো কাছে, আপনি তো জানতে চান না।'

দীপক হাসলো। অতীশ একদিন কি করেছিল শুনুন। বাসে যাচ্ছি, প্রাইভেট বাসে, নামবার সময় চিৎকার করে উঠল, জেনানা হায়, রোখকে। পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টারও রসিক, জিজ্ঞেস করলে, কাঁহা হায় জেনানা? অতীশ নিজেব বুকে আঙুল ঠুকে বললে, ইধার।

ওরা সব ক'জন হেসে উঠল। অতীশ নিজেও।

ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে রাখী এসে হাজির হল।—কি যেন মিস্ করে গেলাম মনে হচ্ছে।

ইতু বললে, নির্জনতা। বলে হেসে উঠল।

নন্দিতাও ধীর পায়ে এল, বসবে কি বসবে না এমনি এক অস্বস্তিতে দাঁড়িয়ে রইলো।

সোমনাথ চোখ তুলে একবার তাকালো তার দিকে, চোখ নামালো, তারপর নন্দিতাকে বলতে সঙ্কোচ হল বলে রাখীকে উদ্দেশ করে বললে, বসুন না আপনারা।

নন্দিতা বোধহয় বুঝতে পারলো, ও একটু দূরত্ব রেখে বসে পড়লো।

ওর ভীষণ ভাল লাগছিল। না, সোমনাথের জন্যে নয়। রাখী, ইতু, এই একটু আগে সোমনাথকে নিয়ে হাসাহাসি করেছে ওর সঙ্গে। ওকে ছুঁয়ে ফেলার ভয়ে সোমনাথ গাড়িতে কি-রকম জড়োসড়ো হয়ে বসেছিল, সে-কথা বলে নন্দিতা নিজেও হেসেছে। কিন্তু সত্যি সত্যি ও প্রেম-ট্রেম করার জন্যে তখন ছটফট করছে না। এর আগেও দু-একবার তো সুযোগ এসেছিল। অনেকদিন আগে।

নন্দিতার আসলে ভাল লাগছে একটা নতুন জায়গায় আজ বেড়াতে এসেছে বলে। একঘেয়েমির জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছে বলে। ওর এক-এক সময় মনে হয়, ওর মত একঘেয়ে নীরস জীবন আর কারো নয়। মা'র চেয়ে নন্দিতার বাবা আরো গোঁড়া, দাদা ওর কাছে এক অস্বস্তি। অথচ যখন স্কুলে পড়তো দাদা কত ভালবাসত ওকে। ও যত বড় হয়েছে দাদার গার্জেনি ততই বেড়েছে। শুধু ছেলেদের সঙ্গে মিশলে যদি তার আপত্তি হতো ক্ষতি ছিল না। তা নয়, মেয়েদের কে ওর বন্ধু হবে কে হবে না, তাও যেন দাদার কাছে পার্মিশন নিতে হবে। পার্টওয়ান পড়ার সময় নীলা ওর বন্ধু হয়েছিল, একদিন বাড়িতে এসেছিল। খুব কালো আর রোগা ছিল মেয়েটা, বেশ গরীবও। কিন্তু মন ছিল ভীষণ সাদা। দাদা সেদিন রাত্তিরেই বললে, তোর কি যত সব ছোটলোক বন্ধু, ওটার সঙ্গে মিশিস না। নন্দিতা সেদিন খুব কষ্ট পেয়েছিল। মুখের ওপর কিছু বলতে পারেনি, মনে মনে দাদার ওপর রেগে গিয়েছিল শুধু। সব জানি, সব জানি, তুমি আমার একটা সুন্দর বন্ধু চাইছো, যে আমাদের বাড়িতে ঘন ঘন আসবে। রাখী যেদিন প্রথম এল বাড়িতে, দাদা হেসে হেসে দু-একটা কথা বললো, সেদিন নীলার কথা ওর মনে পড়েছিল।

বাড়ির শাসন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে পেরে তাই ভাল লাগছিল নন্দিতার। পুজোর সময় রাত দশটা অবধি বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পেরে যেমন ভাল লাগে।

এক-এক সময় ওর দম বন্ধ হয়ে আসে।

কোথাও যেতে পাবে না, কোথাও যেতে পাবে না। মেয়ে যে। সবাই যেন ওর জন্যে ওত পেতে বসে আছে, পৃথিবীর সব পুরুষগুলো যেন ভয়ঙ্কর এক-একটা জন্তু। বাবা দাদা তাই মনে করে। অথচ সেবার ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে সবুজ শার্ট ফরসা ছেলেটা একবারও ওর সঙ্গে চোখাচোখি তাকালো না।

ও কলেজে পড়বে, পাশ করবে, তারপর—তারপর নন্দিতা জানে আর কিছু ঠিক নেই, শেষ অবধি সেই একটা চাকরির জন্যে চেষ্টা করতে হবে। কারণ ও যত বড় হচ্ছে, বাবা-মাকে ততই অসহায় মনে হচ্ছে। আগে মা তবু বাবাকে বিয়ের কথা বলতো, এখন আর তাও বলে না।

নন্দিতা অবশ্য প্রেম কিংবা বিয়ের জন্যে কাঙাল নয়। কখনো-সখনো ট্রামে-বাসে এখানে ওখানে ঝকঝকে কোনো যুবক চেহারার কাউকে দেখলে ভাল লাগে। রাখী তো দিব্যি প্রেম করছে, এখনো বলে ওঠে, ফাইন দেখতে রে ছেলেটা ; কিংবা বাঃ, বেশ লম্বা তো !

কিন্তু ঐ অবধি, তারপর সেই গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা।

দাদা একবার তার বন্ধুদের সঙ্গে পুরী বেড়াতে গেল, নন্দিতার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। ও কখনো সমুদ্র দেখেনি। দাদা ফিরে এল, ওর জন্যে শুধু একটা মোষের শিঙের কলম। পাশের বাড়ির মাসীমা সকলকে নিয়ে একবার দার্জিলিং গেলেন, মাকে বললেন, নন্দিতা চলুক না, ওর তো কোথাও যাওয়া হয় না। মা বললে, কলেজ খুলছে ওর। অর্থাৎ মা'র

আপত্তি আছে। স্কুল থেকে একবার মেয়েদের রাঁচি নিয়ে গেল, তখন-না-হয় ও ছোট, কিন্তু কলেজের মেয়েদের আগ্রা যাওয়া···তাজমহল দেখার এত ইচ্ছে ওর, বাবা বললে, না-না, যেতে হবে না। কোথাও ওরা নিজেরা যাবে না, টাকার অভাব। কোথাও ওকে যেতে দেবে না, সব সময় ওদের একটাই ভয়।

আজ তাই একঘেয়েমি থেকে বেরিয়ে এসে একটা নতুন জায়গা দেখতে পেয়ে ওর ভীষণ ভাল লাগছে।

এই একটু আগে ওরা তিনজন যখন কোমর ধরাধরি করে আড়ালে চলে গিয়েছিল —রাখী, ইতু আর ও—তখন রাখী বলেছিল, সোমনাথ বোধহয় তোর প্রেমে পড়ে গেছে, নন্দিতা।

ইতু হেসে উঠে বলেছিল, আমি ভাই আজকে অতীশকে একটু আস্কারা দেবো!

প্রেম আর প্রেম। কিংবা বিয়ে। এছাড়া ওদের আর কোনো ভাবনা থাকতে নেই। আর কোনো আনন্দও নেই।

সত্যি, ছেলেরা কত লাকি। ওদের পৃথিবীটা কত বড়। মারপিট করে ওরা সিনেমায় লাইন দেয়, খেলা দেখে, পার্কে কিংবা রাস্তায় ক্রিকেট খেলে, রাত এগারোটা অবধি আড্ডা, আজ পিকনিক, কাল দিল্লি-জয়পুর বেড়াতে যাওয়া।

ওদের সবচেয়ে বড় যাবার জায়গা—রাজনীতি।

আমাদের কী আছে, নন্দিতা মনে মনে ভাবলো।

সঙ্গে সঙ্গে অনেকদিন আগের একটা কথা মনে পড়ে গেল। রাখী বলেছিল। ও জানতো না রাখীও ওর মতই অসুখী। তখন তো দীপকের সঙ্গে আলাপই হয়নি ওর। একটা হতাশার সুর বেজেছিল রাখীর কথায়।—জানিস নন্দিতা, আমার ইচ্ছে করে দারুণ একটা প্রেম করে ফেলি। কেন জানিস, প্রেম ছাড়া আমাদেব আর কোনো যাবার জায়গা নেই।

বাচ্চা ফুটফুটে ছেলেটাকে নিয়ে ওরা তখন সকলেই মেতে উঠেছে। কাড়াকাড়ি করে কাছে ডাকছে সবাই। বাচ্চাটা কিন্তু একটুও ভয় পাচ্ছে না, দিব্যি হাসছে, কুটুস কুটুস করে কথা বলছে। নিজেই নিজের নাম বলছে, টমটম। ছেড়ে দিলেই ছুটে বেড়াচ্ছে।

ইতুর ব্যাগের মধ্যে টফি ছিল, ও এনে দিল একটা। ব্যস্, তারপর টমটম কেবল ইতুর কাছে যেতে চাইছে।

দীপক বললে, যেতে তো চাইবেই, ঘুষ দিয়ে বশ করেছেন ওকে।

ইতু বললে, জানি জানি, ছেলেরা সব ঘুষের কাঙাল। মাইনে-টাইনে ওদের কাছে কিচ্ছু না, উপরি পেলেই হল।

রাখী লজ্জা পেল, দীপক-অতীশের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারলো না, ও মাথা নিচু করলো। এর আগে একদিন দীপক আর ও গড়ের মাঠে অন্ধকারে বসে বসে গল্প করছিল। দীপকের কাঙালপনা নিবস্ত করেছিল ও এমনি একটা কথা বলে। রাখী সেদিনের কথা অবশ্য ইতুকে বলেনি, কিন্তু এখন হয়তো দীপক ভাবছে, ইতু সব জানে। হয়তো লজ্জা পাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। কিংবা ভিতরে ভিতবে রাখীর ওপর বেগে যাচ্ছে। তা না হলে দীপক গুম মেরে চুপ করে গেল কেন!

ওদিক থেকে টমটমের মা টমটমকে ডাক দিলেন। স্ল্যাক্স্ আব ঢিলে কুর্তা পরা মেয়েটা উঠে দাঁড়াল।

রাখী টমটমকে দিয়ে আসতে যাচ্ছিল। অতীশ বললে, যাবেন না, যাবেন না। ঢিলে কুর্তা আসুক না এদিকে। ইতু হেসে উঠল। তার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললে, দারুণ! লেগে পড়ুন, লেগে পড়ুন।

রাখী দীপককে বললে, এই, তুমি ওর দিকে তাকাবে না কিন্তু।

ঢিলে কুর্তা আধখানা দূরত্ব এগিয়ে এসেছে দেখে অতীশ ঝট করে টমটমকে তুলে নিল। লম্বা লম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে।

ওবা এখান থেকে দেখতে পেল ঢিলে কুর্তার কোলে টমটমকে দিতে দিতে অতীশ দিব্যি কথা বাড়াচ্ছে, হাসছে।

একটু পরেই অতীশ ফিরে এল, ঘাসের ওপর ট্রাউজার্সের সরু পা দুটো লম্বা করে দিয়ে বসে পড়লো।

—কি, ঠিকানাটা জেনে নিলেন ? ইতু হাসতে হাসত প্রশ্ন করলো।

অতীশ হেসে বলল, আপনার কাছেই পাচ্ছি না, ও তো একটা রিয়েল বিচ্ছু। কি চোখ মাইরি দীপক, একেবারে সাপের ছোবল।

বলে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলো। তারপর ঠাট্টা করে ইতুকে বললে, খাবেন নাকি একটা!

ইতু হাত বাড়ালো, ভাবছেন পারি না ?

প্যাকেটটা হাত বাড়িয়ে নিল, একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে ধরলো ইতু ; রাখী তাড়াতাড়ি বলে উঠল, এই না, এই না। বলে সিগারেটটা টেনে নিল। রাখী ঐ ফ্যামিলি গ্রুপটার দিকে ইশারা করে দেখাল। অর্থাৎ ওরা দেখতে পাবে।

ইতু হেসে উঠল। —খারাপ মেয়ে ভাববে, এই তো! আমি কি ভাল নাকি ?

আবার শব্দ করে তুড়ি দিয়ে উঠল। বললে, আরে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দে সব। কে কি ভাবলো সব সময় সে-কথা ভাবলে নিজের ভাবনা ভাববো কখন!

অতীশ ততক্ষণে রাখীর হাত থেকে (আঙুলে আঙুল ছুঁলো) সিগারেটটা নিয়ে ঠোঁটে চেপে দেশলাই জ্বালালো। পর পর কয়েকটা রিং ছেড়ে বললে, এটুকুই সান্ত্বনা, সিগারেটে আপনার ছোঁয়া আছে।

ছোঁয়াটা ইতুর ঠোঁটের, তাই কথাটা নন্দিতার কানে খুব খারাপ ঠেকলো, ও লজ্জা পেল। চোখ তুলে সোমনাথের দিকে তাকাতেই চোখাচোখি হল। তবু লজ্জা কাটাবার জন্যে বললে, আপনি সিগারেট খান না ?

ছেলেরা সিগারেট না খেলে নন্দিতার ভাল লাগে না। একদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে একটা ছেলে একা একা সিগারেট টানছিল। অন্ধকাবে তার শরীরটা শুধু আবছা দেখা যাচ্ছিল। একা একা তাকে দেখে নন্দিতার মনে হয়েছিল ছেলেটা নিজেও জ্বলছে। নন্দিতার মনে হয় সব ছেলেগুলোই ভিতরে ভিতরে জ্বলছে।

সোমনাথ যেন নন্দিতার কথা রাখার জন্যেই তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়েছে।

৫

ময়লা ইজের-পরা খালি-গা বাচ্চাটা আবার এসে দীপককে জিজ্ঞেস করলে, এবার চা আনবো বাবু ?

দীপকের চালচলনের মধ্যে কি একটা আছে, কিংবা ওর চেহারায়, তা না হলে ঐ বাচ্চা ছেলেটা ওর কাছেই অর্ডার নিতে আসবে কেন। আরেকটা ছেলে, ঐ একই রকম কালোকুলো চেহারা, সে ভিক্ষে চাইছিল, কিন্তু দীপকের কাছে গেল না। একবার নন্দিতার কাছে হাত পাতলো, একবার অতীশের কাছে। দীপক তাকে এক ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল, তারপর অন্য বাচ্চাটাকে বললে, যা, নিয়ে আয় চা। ভাঁড় আছে তো ?

বড় রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে সরু মেটে রাস্তাটা যেখান থেকে নেমে এসেছে ঠিক সেই মোড়ে খানকয়েক দোকান উঠেছে পর পর। ছিটে বেড়ার দেয়াল, হোগলার ছাউনী। একটায় পান সিগারেট—সস্তার সিগারেট কয়েক ধরনের, তাও সামান্য কয়েক প্যাকেট, বেশির ভাগই খালি-প্যাকেট সার দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে। আর দোকানের সামনে উনোনে চাপনো তেলেভাজার কড়াই। আরেকটা দোকানে বাসী পাঁউরুটি, নোনতা বিস্কুট, আর চা। সামনে একটা তেলচিটে টেবিলের ওপর কাচের গেলাস, চায়ের কাপ সাজানো আছে, আর তোলা-উনোনে কুচকুচে কালো একটা বড় সাইজের কেটলি। টেবিলের ওপর ছাঁকনি, জাল ছিঁড়ে গেছে বলে একটা ন্যাকড়া দিয়ে চা ছাঁকা হয়। ন্যাকড়াটা চায়ের দাগে দাগে লাল হয়ে গেছে।

দোকান ক'টার আসল খদ্দের কিন্তু পিকনিক পার্টির লোকরা নয়। বড় রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ি চলে, ধানের বস্তা, খড়, কিংবা অন্য কিছু। তারাই আসল খদ্দের। কখনো কখনো ট্রাক ড্রাইভার কেউ, কিংবা দূর পাল্লার মোটর গাড়ির যাত্রীরাও দু'দণ্ড থেমে চা বিস্কুট খায়।

এক হাতে ছোট একটা কেটলি আর অন্য হাতে সার দিয়ে সাজানো মাটির ভাঁড় নিয়ে বাচ্চাটা ফিরে এল। সকলের হাতে হাতে ভাঁড় দিয়ে চা ঢেলে দিল।

নন্দিতার মনে পড়লো, রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে চা খাবার সময় সোমনাথ চায়ের ভাঁড়টা ওকে এনে দিয়েছিল. নন্দিতা সেটা নেবার সময় চোখ তুলে তাকাতেই দেখেছিল, সোমনাথ ওর চোখের দিকে স্থির তাকিয়ে আছে। নন্দিতার তাই ইচ্ছে হল এবার চায়ের ভাঁড়টা সোমনাথের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু পারলো না, বাচ্চা ছেলেটাই হাতে হাতে ভাঁড় ধরিয়ে দিয়েছে।

অতীশ পরম তৃপ্তিতে চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, ফাইন। বলে বাঁ হাত প্যান্টের পকেটে ঢোকালো পয়সা দেবার জন্যে।

নন্দিতা চায়ের ভাঁড়টা সযত্নে ঘাসের ওপর বসিয়ে ব্যাগটা হাতে নিয়ে মৃদু হেসে দীপকের দিকে তাকালো।—চায়ের পয়সাটা আমি যদি দিই?

দীপক ধমকের চোখে তাকালো নন্দিতার দিকে, তারপর ছেলেটার হাতে এক টাকার একখানা নোট দিয়ে বললে, বাকিটা তোর।

ছেলেটা একমুখ হেসে ফেলে চলে গেল কেটলি দোলাতে দোলাতে।

ইতু পয়সা দেবার কোনো চেষ্টা করেনি। ও চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললে, যে দেবেন দিন, আমার আপত্তি নেই। বলে হাসলো।

অতীশ বললে, এক নম্বরের কিপ্‌টে।

ইতু হেসে বললে, হুঁ, সেইটুকু মনে রাখবেন, আমি সব ব্যাপারেই কৃপণ।

একটু থেমে বললে, ছেলেরা আমার জন্যে খরচ করলে আমার খুব ভাল লাগে, জানেন। নিজেকে খুব দামী দামী মনে হয়।

সোমনাথও এ-কথায় হেসে উঠলো। নন্দিতা হাসলো না। ওর ব্যাগে বেশি পয়সা নেই। থাকেও না। আর সেজন্যেই বোধহয় ওর সব সময়ে সঙ্কোচ। কিছু একটা খরচ করে ও হালকা হতে চাইছিল, সকলের সমান হতে চাইছিল। ওর তাই একবার মনে হল, দীপক কি ওর অবস্থার কথা ভেবেই পয়সা দিতে দিল না! কিন্তু পয়সা দিতে পেল না বলে ওর যেমন একটু অস্বস্তি লাগলো, তেমনি পয়সাটা খরচ হল না বলেও বোধহয় খুশি হল।

দীপক ভাঁড়টা দূরে ছুঁড়ে দিল চা শেষ হতেই, তারপর বললে, ছেলেটা কিন্তু দামের জন্যে আমার কাছেই এসে দাঁড়িয়েছিল।

অতীশ হাসলো।—তোর একটা পার্সোনালিটি আছে তো, দেখলি না, ভিক্ষে চাইছিল যে ছেলেটা, তোর কাছে গেল না।

রাখী ঠোঁট টিপে হাসলো, তারপর গর্ব যেন তার নিজেরই এমন ভাবে বললো, আছেই তো।

রাখী ঠিক বুঝতে পারেনি, অতীশ একটু আগে সিগারেটটা ওর হাত থেকে নিতে গিয়ে ইচ্ছে করেই ওর আঙুল ছুঁয়েছিল কিনা। প্রথম যেদিন দীপক ওর সঙ্গে অতীশের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল, সেদিন অতীশের চোখ এক পলকের জন্যে শরীর হয়ে গিয়েছিল। সন্দেহ সেজন্যই। হাসি পেয়েছিল, গর্বও হয়েছিল রাখীর। তার জবাবেই যেন বললে, আছেই তো। ও যে দীপকের জন্যে গর্বিত সে-কথাটাই বলতে চাইলো।

দীপকের জন্যে সত্যিই ভিতরে ভিতরে গর্ব হয় রাখীর। এই মানুষটাব ওপর ও সব সময় চোখ বুজে নির্ভর করতে পারে।

দীপকের সঙ্গে রাখীর দেখা হওয়ারই কথা নয়, আলাপ কিংবা ঘনিষ্ঠতা তো দূরের কথা। ওর তখন কলেজের নিরঞ্জনকেই বরং একটু ভাল লাগছে। আর রাখী বেশ বুঝতে পারতো ওর সম্বন্ধে নিরঞ্জনের রীতিমত দুর্বলতা আছে। নিরঞ্জনকে ইতুরও ভাল লাগতো। একদিন ঠাট্টা করে বলেও ছিল।—দ্যাখ রাখী, নিরঞ্জনের সঙ্গে আড্ডা দিতে যা ভাল লাগে তোর, বলা যায় না, হঠাৎ কোনদিন প্রেমফ্রেম হয়ে যেতে পারে। রাখী হেসে ফেলে বলেছিল, কিন্তু নিরঞ্জন তো তোকেই পছন্দ করে। অবশ্য নিরঞ্জনের ব্যবহারে বোঝা যেত না সত্যি কার ওপর তার দুর্বলতা। অমন প্রাণবন্ত ছেলেদের ঘূর্ণিঝড়ের মত চলাফেরা দেখে বোঝা যায় না কোনদিকে হঠাৎ বাঁক নেবে। তাই ইতুরও কখনো কখনো তেমন সন্দেহ হয়েছে। শেষে ইতু একদিন হাসতে হাসতে মীমাংসা করে দিয়েছে, তেমন কিছু ঘটলে আমরা নয় দু'জনেই ভালবাসবো, দু'জনেই। রাখী হেসেছে।—তাই ভাল। আমরা নতুন কিছু করবো।

কিন্তু নিরঞ্জনের বোধহয় অত থিতিয়ে ভাবার মত সময় ছিল না। ও সব সময় ছোটাছুটি করছে, কখনো পত্রিকা নিয়ে মাতামাতি, কখনো মিটিং, কখনো নাটক কিংবা ফাংশন। জলপাইগুড়িতে বন্যা হল, সে যেন নিরঞ্জনের মনেও। একটা চ্যারিটি ফাংশন করতে হবে বলে নেচে উঠলো ও, টিকিট ছাপালো।

তারপর রাখী আর ইতুকে বললে, টিকিট বিক্রি করে দিতে হবে। ইতু ওসবের মধ্যে নেই। হাত ঝেড়ে বললে, না বাবা, আমার দ্বারা হবে না। তার চেয়ে যদি বলিস, তোকে বিয়ে করতে হবে সে তবু সোজা।

রাখী পরে বলেছিল, তুই ওকথা কি করে বললি ? আমার এত বিচ্ছিরি লেগেছিল !

ইতু শব্দ করে তুড়ি দিয়ে বলেছিল, আরে, বাড়িতে বলে দিয়েছি বিয়ে-বিয়ে না করতে ! তুই তো জানিস্, প্রেমফ্রেম আমি বিশ্বাস করি না, ইচ্ছা হয় একজন কাউকে ধরবো, সিঁথিটা এগিয়ে দিয় বলবো, দে না ভাই সিঁদুর টেনে।

রাখী শুধু হেসেছে তার কথায়। কিন্তু নিরঞ্জনকে 'না' বলতে পারেনি। টিকিটের বইটা নিয়ে বলেছে, চেষ্টা করবো। আর নিরঞ্জন জোর দিয়ে বলেছে, চেষ্টাফেষ্টা জানি না, এই দশটা টিকিট অন্তত বেচে দিতে হবে !

কি আর করবে রাখী, এর-ওর কাছে গোটা তিনেক গছিয়ে একদিন চলে গেছে তাদের পুরোনো পাড়ার রেবাদির কাছে। আগে ওরা যে বাড়িতে থাকতো তার পাশের ফ্ল্যাটে। রেবাদি চাকরি করেন, ওঁর অনেক আলাপ-পরিচয় আছে।

রেবাদি ব্যাপারটাকে তুচ্ছ মনে করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতেই রাখীর মুখ প্রায় কাঁদো-কাঁদো হয়ে গিয়েছিল। টিকিট বেচতে পারেনি এ-কথা নিরঞ্জনকে বলা যায় নাকি। ইতু পারে। তাছাড়া এর সঙ্গে ওর নিজেরও প্রেস্টিজ জড়িয়ে আছে। দশটা মাত্র টিকিট বেচতে না পারার মানে তো এই যে, ওর সে-রকম সার্কেলই নেই। চেনা-জানা নেই।

রেবাদি শেষ অবধি বলেছেন, ঠিক আছে, দেখি চল দু'এক জায়গায়।

এই বলে দীপকের কাছে ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। দীপকের আপিসে। রাখীর তখন ভয়-ভয় করছে। যেন টিকিট বিক্রি করার ওপরই ওর সব সম্মান নির্ভর করছে। কলেজের অন্য সকলে কত কত টিকিট বেচতে পেরেছে, আর ও কিনা এই দশটা মাত্র টিকিট···

আপিসে রিসেপ্‌সনিস্টকে স্লিপ দিয়ে মিনিট কয়েক বসে থাকতেও হয়েছে রেবাদিকে। তারপর ডাক এসেছে।

রাখী এর আগে কখনো কোনো আপিসে যায়নি। রেবাদির পিছনে পিছনে ছোট কামরাটায় ঢুকতে গিয়ে ওর মত স্মার্ট মেয়েও জড়োসড়ো হয়ে গিয়েছিল।

রেবাদি কিন্তু গিয়েই বললেন, দীপক, দশটা টাকা দাও তো।

দীপক হেসে বসতে বললো, রাখীর দিকেও ফিরে বললে, বাঃ আপনি বসুন ! তারপর জিজ্ঞেস করলে, ধার না দান ?

রেবাদি বললেন, আগে দাও না তুমি।

রাখী কি বোকা, টিকিটের বইটা বের করে ফেলেছে দীপক দশ টাকার নোটখানা রেবাদির হাতে দিতেই। আর সঙ্গে সঙ্গে দীপক নোটখানা ছিনিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বলছে, ও নো নো, চ্যারিটি-ফ্যারিটির মধ্যে আমি নেই।

রাখীর মুখ শুকিয়ে গেছে হঠাৎ আশা পেয়েও এভাবে নিরাশ হয়ে। তার চেয়ে বড় কথা, ওর কেমন অপমান অপমান লেগেছিল। হাজার হোক, ও তো মেয়ে, দীপক ওকে সমীহ না করুক, সম্মান রাখার জন্যেও তো কত ছেলে মেয়েদের কথা রাখে।

রাখী তাই মুখ কালো কবে চোখ নামিয়েছে। ও কি ভিখিরি নাকি, না ঠকিয়ে দশটা টাকা নিতে এসেছে !

দীপক কিন্তু ওর মুখেব ভাব বদলে যাওয়া দেখেই বলে উঠেছে, আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন, এটা তো আমার আর রেবাদির ঝগড়া।

রাখী আবার আশা পেয়ে হেসে ফেলেছে।—না নিলে আমি কিন্তু কলেজে মুখ দেখাতে পারবো না। কার কাছে বেচবো বলুন, আমি তো কাউকেই চিনি না।

দীপক তখন প্রশ্ন করে করে সব ব্যাপারটাই জেনে নিয়েছে, আর রাখীর কথায় অসহায় ভাব ফুটে উঠতে দেখে বলেছে, কই, দেখি টিকিট বইটা।

বলে টিকিট বইটা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।—এক মিনিট. আমি আসছি।

মিনিট দশ পনেরো মাত্র, তারপরই দীপক ফিরে এসেছে। তখন আর মাত্র দু'খানা বাকি। হিসেব মত টাকা রাখীর হাতে গুণে দিয়ে বলেছে, এ দুটো আর পারলাম না।

রাখী হাতে স্বর্গ পেয়ে গেল। দীপকের ওপর ও দারুণ খুশি না হয়ে পারলো না।

রেবাদি কিন্তু ফোড়ন কাটতে ছাড়লেন না। বললেন, সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র, বুড়ি রেবাদির কথায় দশ টাকাও আসছিল না।

সেদিন দীপক রাখীদের কোকাকোলা খাইয়ে তবে ছেড়েছিল।

ইতু সে-সব কথা সবই জানে। রাখীর কাছে শুনেছে। ও তাই অতীশের কথার পিঠে বলে উঠলো, পার্সোনালিটি নেই আবার, দশ মিনিটে পাঁচ-পাঁচখানা টিকিট গছাতে পারেন আপিসের বন্ধুদের।

অতীশও সে-ঘটনার কথা জানে। জানে বলেই শব্দ করে হেসে উঠেছে, তারপর কপট গাম্ভীর্যে বলেছে, আসল ব্যাপার জানেন না বুঝি ? বিক্রিফিক্রি বাজে কথা, আপনার বন্ধুটিকে দেখে ভাল লেগে গিয়েছিল, ইম্‌প্রেস করার জন্যে নিজেই কিনেছিল বন্ধুদের নাম করে।

এ ধরনের কথা অতীশ মাঝে মাঝেই বলে, রাখী মনে মনে হাসে।—আমার ওপর

অতীশের বোধহয় খুব লোভ, ইতুকে একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল।

দীপক অতীশের এসব ইয়ার্কি পছন্দ করে না। 'হাট্' বলে ও সাবধান করেছে, ওদের কোনো সেন্স অফ হিউমার নেই, সত্যি বিশ্বাস করে বসবে। 'ওদের' অর্থাৎ রাখীর।

রাখী হেসে গড়িয়ে পড়েছে।—বাঃ রে, তা হলে তো আরো খুশি হব। বুঝবো এই মুখটার দাম আছে।

যেন সে-কথা জানে না ও। খুব ভাল করেই জানে। এখন তো তাই নিরঞ্জনের কথা মনে পড়লে হাসি পায়। আগে একদিন তার সঙ্গে আড্ডা দিতে না পারলে কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগতো, এখন নিরঞ্জন হাত ধরে টানাটানি করলেও একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে ঠিক সোয়া পাঁচটায় মেট্রোর সামনে। দীপক আপিস ফেরত সোজা সেখানে চলে আসে।

আসলে জীবন্ত, উদ্দাম, উচ্ছল, ওসব কিছু নয়। একজন শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, আরেক জনের মুখ ফিরিয়ে তাকানোর ফুরসত নেই—এর মধ্যে কাকে ভাল লাগবে সে-কথা বলতে হবে নাকি। রাখী তখন কিছু একটা খুঁজছিল, কি খুঁজছিল জানতো না। বোধহয় নিজেকে। দীপকের মধ্যে দেখতে পেল।

আজকের এই পিকনিক, কিংবা ইতু-নন্দিতাকে সঙ্গে নিয়ে সিনেমা যাওয়া, সবই আসলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা। ওরা দেখুক, দীপক ওকে কতখানি ভালবাসে। ও যা চায় তা যেন দীপকেরও চাওয়া। রাখী বলতে না বলতে পিকনিকে আসার ব্যবস্থা হয়ে গেল। রাখীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল, 'আমরা দু'জনেই ভালোবাসবো', ইতু দেখুক না চেষ্টা করে, দীপককে টলাতে পারে কিনা। তবে ইতুকে বিশ্বাস নেই, ও তো প্রেম আছে স্বীকারই করে না, তাই দীপকের সঙ্গে ইতুকে একা একা ? না বাবা। একদিন নিউ মার্কেটে নাকি ইতুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, শুনে দীপকের ওপর খুব রেগে গিয়েছিল মনে মনে।

—আচ্ছা, ওগুলো টগর, তাই না ? নন্দিতা হঠাৎ বলে উঠল।

রাখী ফিরে তাকিয়ে দেখল ফ্যামিলি গ্রুপটার ওধারে একটা টগর গাছ। ফুলে ফুলে ভরে গেছে গাছটা। আর স্ল্যাক্স্ এবং লাল ঢিলে কুর্তার মেয়েটা লাফ দিয়ে দিয়ে একটা ডাল নামাবার চেষ্টা করছে ফুল তুলবে বলে।

ইতু ভুরু নাচিয়ে অতীশকে বললে, যান না স্যার, একটু সিভাল্রি দেখান।

নন্দিতা তার আগেই বলে উঠেছে, চলুন, চলুন। টগর আমার ভীষণ ভাল লাগে। বলে নন্দিতা উঠে পড়ে সকলের দিকে তাকালো। কেউ উঠল না দেখে তার মুখটা অস্বস্তিতে ম্লান হল। আর অস্বস্তি ঢাকার জন্যেই একা একাই সেদিকে পা বাড়ালো।

অতীশ চোখ টিপে সোমনাথকে বললে, যা না!

রাখীও বললে, এই, সত্যি যান, বেচারা কেমন মন-মরা হয়ে আছে, কেউ ওর দিকে অ্যাটেনশন দিচ্ছেন না।

সোমনাথের ইচ্ছে হচ্ছিল , সাহস পেয়ে ও সত্যি সত্যি এগিয়ে গেল।

আর ওরা দেখলে সোমনাথ পৌঁছে যাওয়ার আগেই সেই মিষ্টি বৌটাও টগর গাছটার কাছে পৌঁছে গেছে।

ইতু দেখে বললে, ভারী সুইট রে বৌটা। ঐ ফিয়েটটা ওদের, না ?

কেউ উত্তর দিল না। রাখী একবার নতুন ঝকঝকে ফিয়েটটার দিকে তাকালো, একবার দীপকের গাড়িটার দিকে। দীপক নিজের গাড়িটার দিকে তাকালো না, শুধু ফিয়েট গাড়িটার নম্বর পড়বার চেষ্টা করলো। অর্থাৎ কত নতুন।

৬

ফিকে হলুদ স্ল্যাক্স্ আর ঢিলে কুর্তার লালে অরেঞ্জে কিশোরী মেয়েটিকেও ফুলের মত লাগছিল। লাফ দিয়ে দিয়ে একটা ডাল ধরবার চেষ্টা করছিল ও।

নন্দিতা ধীরে ধীরে গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল, কিন্তু নাগাল পাবে কি পাবে না এই সন্দেহে মিষ্টি বৌটার দিকে তাকিয়ে হাসল। মিষ্টি বৌটা তখন হাসতে হাসতে পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে লম্বা হবার চেষ্টা করছে।

নন্দিতা তার দিকে তাকিয়ে বললে, টগর, তাই না ?

মিষ্টি বৌ ততক্ষণে হাল ছেড়ে দিয়েছে, বললে, হ্যাঁ।

আর কিশোরী মেয়েটি বলে উঠল, সত্যি ? এটাই টগর ফুল ?

সোমনাথ ইতিমধ্যে এসে পৌঁছে গেছে। ও একটা লাফ দিল, ডাল নামিয়ে আনলো একটা। সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই ফুল ছিঁড়ে নিল যে যতগুলো পারলো। তিনজনই যেন খুশিতে টইটম্বুর।

নন্দিতা মিষ্টি বৌটিকে প্রশ্ন করলে, আপনারা কি কোলকাতা থেকে ?

—না। মিষ্টি বৌটি মৃদু হেসে বললে, উনি তো কনস্ট্রাকশনের ইঞ্জিনিয়ার, হলদিয়ায় কাজ হচ্ছে, তাই ভাবলাম···আপনারা ?

নন্দিতা বললে, কোলকাতা থেকে, পিকনিক করতে। আমরা সব কিন্তু বন্ধু। বলে হেসে ফেলল।

তারপর হেসে ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকের দিকে তাকালো। ভদ্রলোক, মনে হল, একদৃষ্টে তাঁর বৌটিকেই দেখছেন। একটু বয়সের তফাত, হয়তো আট-দশ বছর। কপালের দু'ধারে বয়সের টাক চুলের মধ্যে অনেকখানি অবধি এগিয়ে গেছে। কিন্তু বেশ সুশ্রী।

বোধ হয় সোমনাথের উপস্থিতির জন্যেই বৌটি মিষ্টি হেসে ঘাড় কাত করে বোঝালো, চলি। তারপর দু' হাতে ফুলগুলো নিয়ে স্বামীটির কাছে ছুটে পালালো।

সোমনাথ তখন আরেকটা ডাল ধরে একটা ফুল তুলে নিয়েছে।

ঢিলে লাল কুর্তার মেয়েটি সোমনাথকে বললে, আরেকটা ডাল টেনে ধরুন না, আমি একদম পাইনি, দেখুন ক'টা মাত্র।

নন্দিতা হেসে ওর হাতের সব ফুলগুলো মেয়েটিকে দিয়ে দিল।

আর সোমনাথ যে ফুলটা নিজে তুলেছিল সেটাই নন্দিতার দিকে এগিয়ে দিল। নন্দিতা ফুলটা হাতে নিয়ে ইতু-রাখীদের দিকে ফিরে তাকিয়ে মুচকি হাসলো, তারপর দু'হাত পিছনে নিয়ে চুলে গুঁজলো।

সোমনাথ ততক্ষণে লাফ দিয়ে একটা পুরো ডালই ভেঙে নিয়েছে। সেটা নন্দিতার হাতে দিয়ে দীপকদের কাছে ফিরে এল।

অতীশ বললে, লাল টগরটা আনতে পারলি না ?

সোমনাথ বুঝতে পারলো না, কিন্তু ইতু হেসে লুটোপুটি। বললে, সত্যি, বেশ টগর-টগর চেহারা।

দীপক বললে, ফুলটুল যেন কত চেনেন। এই তো প্রথম দেখলেন, তার আবার টগর-টগর চেহারা।

ইতু হাসলো। রাখীও। রাখীই বললে, বাঃ রে, নাই বা চিনলাম, কিন্তু টগর-টগর চেহারা বললে ঠিক ঐ রকম চেহারাই মনে হয়।

তারপর হঠাৎ ফিরে তাকিয়ে বললে, নন্দিতা কোথায় গেল ?

নন্দিতা ইচ্ছে করেই সোমনাথের দেওয়া ফুলটা চুলে গুঁজেছিল। গাছের তলায় দাঁড়িয়ে

ওর নিজেরও খুব স্মার্ট হয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল তাই। কিন্তু ফিরে গেলেই ওরা কিছু টীকাটিপ্পনি করবে তো, সে-জন্যেই মিষ্টি বৌটার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সেদিকেই এগিয়ে গেল।

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক তখন টিফিন কেরিয়ার খুলে বসেছেন। পাশে জলের ফ্লাস্ক।

মিষ্টি বৌটি উঠে দাঁড়াল। ওকে ডাকলো। তারপর প্রশ্ন করলে, আপনারা সব কলেজে পড়েন বুঝি ?

—না না। আমরা সব বন্ধু। আমরা তিনজন অবশ্য···

মিষ্টি বৌ হেসে বললে, আমাদের কিন্তু অনেকদিন বিয়ে হয়েছে, তিন মাস। একটু থেমে বললে, আমাদের সঙ্গে অনেক খাবার আছে, আসুন না।

নন্দিতা হেসে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালো। তারপর ধীরে ধীরে দীপকদের দিকেই চলে গেল। কারও খাবার সময় দাঁড়িয়ে গল্প করতে নন্দিতার রুচিতে বাধে।

মিষ্টি বৌ ঠাট্টার সুরে স্বামীকে বললে, বিয়ে করে খুব ঠকে গেছ ভাবছো তো। যাও না, ওদের সঙ্গে গল্পটল্প করে এসো। তোমার তো আবার ঐরকমই পছন্দ।

ইঞ্জিনিয়ার হাসলো।—খারাপটা কি শুনি।

—না, না, ভীষণ ভালো মেয়ে সব, বন্ধুদের সঙ্গে এতদূরে হৈ হৈ করতে এসেছে, বি. এ. পাশ বৌ জুটতো একটা কপালে, নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতো।

আসলে স্বামী যে বিয়ের আগে প্রতিজ্ঞা করেছিল বি. এ. পাশ না হলে সে মেয়েকে বিয়ে করবে না, এ খবর ফুলশয্যার দিনেই বড় ননদ ওকে শুনিয়ে দিয়েছিল। কলেজের মুখ ও মাত্র মাস কয়েক দেখেছিল, তাই কথাটা শুনে খারাপও লেগেছিল। মনের মধ্যে ওর একটা কাঁটা বিঁধেই ছিল, ও তেমন শিক্ষিতা নয় বলে স্বামী নিশ্চয় ভিতরে ভিতরে অখুশি। সুযোগ বুঝে তাই কথাটা শুনিয়ে দিল।

কিন্তু ভিতরে ভিতরে ওদের হাসি-হল্লা সপ্রতিভ ভাব ওর বেশ ভালই লাগছিল। লাল-পাড় শাড়ির ঠাণ্ডা মেয়েটি দিব্যি বলে দিল, আমরা সব বন্ধু। কোনো লুকোনোর চেষ্টা নেই। কোনো সঙ্কোচ নেই। ওদের বাড়ির আবহাওয়াই হয়তো অন্যরকম। বাবা-মা নিশ্চয় দিনরাত আগলে আগলে রাখে না। ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে দেখলে নিশ্চয় ভিরমি খায় না।

ইঞ্জিনিয়ার হঠাৎ বললে, যাই বলো, কত ফ্রি দ্যাখো ওরা। তোমার তো আমার সঙ্গে আসতেও লজ্জা, মা কি ভাববে!

মা অর্থাৎ শাশুড়ী। যেন বিয়ের পর ঐ মেয়েগুলোও লজ্জা পাবে না বরের সঙ্গে বেড়াতে যেতে। কি জানি, ওদের শ্বশুর শাশুড়ীও হয়তো অন্যরকম। ওর ইস্কুলের বন্ধুরা তো ওদের কথা শুনলেও বিশ্বাস করবে না। ওরা এসব ভাবতেই পারতো না। শুধু নিজেদের মধ্যে কাউকে, কোনো ছেলেকে নিয়ে হয়তো কানাঘুষো করেছে, হাসিঠাট্টা করেছে। একটা ইস্কুলের মেয়েকে ওদের গলির মোড়ে একজনের হাত থেকে মাঝে মাঝে টুক করে চিঠি নিতে দেখতো, তাতেই মনে হতো, মেয়েটা কি খারাপ, কি খারাপ! ওর নিজেরও রাস্তা ফাঁকা থাকলেই ভয় হতো, যদি কেউ ওর হাতে চিঠি গুঁজে দেয়। ভয় পেত ঠিকই, কিন্তু চিঠি পেতেও বোধহয় ইচ্ছে হতো।

তবু, ওদের যেন কতই অপছন্দ এমন ভাবে বললে, আচ্ছা ওদের কি বাবা-মাও নেই ? বলে হাসলো।

একটা কালোকুলো আধা ভিখিরি ছেলে তখন ময়লা ইজের টানতে টানতে এসে ভিক্ষে চাইছে।

একটা যায় তো আরেকটা আসে। এদের জন্যে কোথাও গিয়ে শান্তি নেই। একটু আগে

একজনকে দিয়েছে, এই আবার।

এমন সুন্দর জায়গাটা, হাতের কাছে এক রাশ টগর ফুল, আর ফুর্তি-পাগল একদল ছেলেমেয়ে। কত চমৎকার লাগছিল, তার মধ্যে একটা নোংরা ছেলে—খাইনি বাবু, কিছু দিন না বাবু! তাও ঠিক টিফিন কেরিয়ার খুলেছে সেই সময়।

৭

রোদ পড়ে আসছিল। রোদ যতই পড়ে আসছিল দীপক ততই যেন অধৈর্য হয়ে উঠছিল। রাখী কি স্রেফ ওকে একটা ড্রাইভারই ভেবেছে নাকি! আর রাখী যখন যা হুকুম করবে ও তাই তামিল করে যাবে? 'আজ আমরা সব্বাই মিলে সিনেমা যাবো', 'এই, আজ ইতুকে আনলাম বলে রাগো নি তো', 'ইতু বলছিল ওয়ালডর্ফে খাওয়াতে হবে একদিন।' দীপক একদিন সত্যি সত্যি চটে গিয়েছিল। ভেবেছিল রাখী ওকে এড়িয়ে চলছে। নাগালের মধ্যে আসতে চায় না। 'কেমন নাচিয়ে বেড়াচ্ছি দ্যাখ', ইতুকে বলে কিনা কে জানে। অথচ প্রথম প্রথম যখন ওরা দু'জনে সার্কুলার রোডের সিমেট্রির মধ্যে গিয়ে কোনো একটা কবরের পাশে বসতো তখন তো কোনো কোনোদিন রাখীর গলাও কথা বলতে বলতে গাঢ় হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে ঐ যে সাহিত্য-টাহিত্যে গাঢ় গলার কথা পড়েছে, তার আগে সেটা যে ঠিক কেমন ওর ধারণাই ছিল না। ভিকটোরিয়া, আউটরাম, গড়ের মাঠ—কত কত জায়গা রয়েছে, দুপুর বিকেল সন্ধে তো জোড়ায় জোড়ায় কত ছেলেমেয়ে বসে থাকে। কারো ভয় নেই, যত ভয় রাখীর। 'না, না, কলেজের মেয়েরা দেখতে পাবে।' দীপককে যেন আড়াল করে রাখতে চায়। কলেজের কোনো বন্ধুটন্ধুর সঙ্গে প্রেম আছে কিনা এক-একবার সন্দেহ হয়েছে দীপকের। আসলে তাকেই হয়তো ভয় রাখীর। মেয়েদের এত ভয় করার কি আছে দীপক বুঝতে পারতো না। তাই এই কবরখানার নির্জনতা বেছে নিতে হয়েছিল। কবরের ফলকে লেখা পড়ে, বুড়ি মেমের কান্না দেখে, কিংবা পিতলের ভাসের গায়ে নক্‌শা দেখে সময় কেটে যেত।

কিন্তু শরীরটাকে একটুখানি কাছে না পেলে যেন নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। সন্দেহ ঘোচে না। একদিন সিনেমায় কাঁধে হাত রাখতে গেছে, অমনি 'সভ্য হয়ে বসো তো', বলে হাতটা সরিয়ে দিয়েছে, আড়চোখে দীপকের মুখের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হেসেছে। আরেকদিন, তখন ইতু নন্দিতা জেনে গেছে, রাখী নিজেই জানিয়েছে, গড়ের মাঠে গিয়ে বসেছে ফুচকা-টুচকা খেয়ে, শুধু ওরা দু'জন, দীপক ওর ঘাড়ে আঙুল ছুঁইয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে রাখী হেসে উঠেছে। 'এই, আমার কাতুকুতু লাগে।' আর-একদিন একটু স্পষ্ট হতে গেছে, যেদিন এখানেই এর আগে এসেছিল সঙ্গে সঙ্গে 'জানি, জানি, শেষ অবধি সেই এক। অন্য সকলের সঙ্গে তোমার তফাতটা কি তা হলে!' দীপক রেগে গিয়ে বলেছে, 'মানে অন্যদের বেলায় আপত্তি নেই, আমি ভালবাসি বলেই'—কথার মধ্যে শ্লেষ ছিল বলেই রাখীও রেগে গিয়েছিল। সারা বিকেল, ফেরার পথ—দু'জনেই গুম্।

তবু আজ পিকনিকে আসতে রাজি হয়েছিল রাখীর কথায়, কারণ ও ভেবেছিল, আগের দিনের বিস্বাদ কাটিয়ে দেবার জন্যেই রাখী আসতে চেয়েছে। ভেবেছিল কোনো সুযোগে ওরা একটু আলাদা হতে পাবে।

কিন্তু রাখীর দিক থেকে কোনো আগ্রহই নেই যেন। একটুক্ষণের জন্যে দু'জনে একান্তে বসে একটু কথাও তো বলতে পারতো। অথচ কি ভাবে ওদের কাছ থেকে আড়াল হবে দীপক খুঁজে পাচ্ছিল না। আর রাখীকেও ও ঠিক বুঝতে পারে না। ওদের সম্পর্ক সকলেই

যখন জানে তখন ওর কাছ ঘেঁষে বসতে তো পারে। অথচ এদিকে বেলা পড়ে আসছে।

দীপক একবার ভাবলো, বলি, ব্রীজের ওপর থেকে ঘুরে আসি চলো। কিন্তু তখন হয়তো অতীশ ইতুও যেতে চাইবে।

ভিতরে ভিতরে ও যত অধৈর্য হয়ে উঠছিল ততই মনে হচ্ছিল, এখানে আসার কোনো মানে হয় না।

ঠিক সেই সময়েই ইতু বলে উঠল, ও মশাই, দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে, কি আছে বের করুন।

অতীশ বললে, কিচ্ছু নেই, ঐ দোকানে চলে যান, ব্রিনজেল চপ আছে। খেয়ে আসুন। মানে বিশুদ্ধ তেলেভাজা।

ইতু হাসলো।—ও বাবা, আপনি যাকে বিয়ে করবেন সে-বেচারী বোধহয় শুধু ডালমুট চিবোবে।

—আব প্রেম করলে? রাখী টিপ্পনি কাটলো।

ইতু বললে, ম্যাক্সিমাম চানাচুর। আবার কি!

অতীশ হেসে বললে, ঠিক বলেছেন। তবে আপনি হলে সঙ্গে চীনেবাদামও খাওয়াবো।

ক্ষিদে বোধহয় সকলেরই পেয়েছিল। সোমনাথ এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। ওর ভেঙে আনা টগরের ডালটা দীপক মাঝখানে মাটিতে গর্ত কবে বসিয়ে দিয়েছিল, আর ফুলগুলো তুলে নিয়ে রাখী আর ইতু চুলে গুঁজেছিল। কিন্তু ও বোধহয় তা চায়নি। ও ভেবেছিল সব ফুলগুলোই নন্দিতা নেবে। তবু ওর দেয়া একটা ফুল নন্দিতা যে চুলে গুঁজেছিল তার জন্যেই ও খুশি হয়ে গিয়েছিল। সাদা টগরে আর লাল-পাড় শাড়িতে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। কিন্তু বেশ ক্ষিদে পেয়েছিল বলে ওর আর অত সুন্দর-ফুন্দরেব দিকে মন ছিল না।

ও তাই বলে উঠলো, ক্ষিদে ভাই আমারও পেয়েছে।

দীপকের ক্ষিদেটিদে ছিল না, তবু ও ভাবলো, ও-পাট চুকিয়ে ফেলাই ভাল।

অতীশ ততক্ষণে কেরিয়ারের কাছে গিয়ে মাংসের ডেকচিতে হাত দিয়েছে। হাত দিয়েই বললে, আইস-কোল্ড।

তাবপর ইতুর দিকে তাকিয়ে বোধহয় কিছু একটা ইশারা করলো। বললে, এক কাজ করি। এটা ঐ তেলেভাজাব উনোনে গরম করে আনি।

ইতু বললে, দি আইডিয়া। কিন্তু বসেই রইলো। অতীশের ইশারার অর্থ হয়তো ও বুঝতে পারেনি।

অতীশ বাঁ হাতের দু' আঙুলে ধরা সিগারেট নাচিয়ে ইতুকে ডাকলে, চলুন দিদিমণি, আমি বাবুর্চির মত এনে দেবো, আপনি বসে বসে খাবেন সে চলবে না।

ইতু হেসে উঠলো।—আহা রে, বাড়িতে নিজে চা বানিয়ে খেতে পারি না......

অতীশ এগিয়ে এল ইতুর কাছে, তার হাত ধরে এক ঝটকায় টেনে তুললো।—চল্ চল্, বাড়িতে ওসব আবদার করিস, চামচে করে মা তোর পায়েস খাইয়ে দেবে।

হঠাৎ ওকে 'তুই' বলার জন্যেই হোক কিংবা পায়েস খাওয়ানোর কথাতেই হোক, সব্বাই শব্দ করে হেসে উঠল।

ইতু আর অসম্মতি জানালো না। ডেকচি তুলে নিয়ে অতীশ এগোতেই ইতুও পিছনে পিছনে ইচ্ছে করে একটু বেশি বেশি হেলেদুলে চড়াই বেয়ে হোগলা ছাউনীর দোকানটার দিকে উঠে গেল।

তেলেভাজার দোকানের উনোন তখন নিভে গেছে, চায়ের দোকানটা বললে, একটু ঘুরে আসুন বাবু, করে দিচ্ছি।

ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কি হবে। তার চেয়ে ব্রীজটার ওপর বেড়িয়ে এলে হয়। একটু এগোলেই চওড়া ব্রীজ, তার ওপর থেকে নদী দেখা যাবে, দূরের স্টীমার। স্টীমারঘাটা ওপারে, স্টীমারের চিমনি বেয়ে ধোঁয়া উঠছে ভুস ভুস করে।

অতীশ বললে, চলুন ব্রীজের ওপর থেকে ঘুরে আসি।

ইতু হেসে বললে, আবার 'আপনি আজ্ঞে' কেন। 'তুই' বলুন, আমার তুই শুনতে খুব ভাল লাগে।

অতীশ ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, তোকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে ইতু।

ইতু হেসে উঠে বললে, এর পর কমা না ফুলস্টপ ?

—মানে ?

—মানে দারুণ দেখাচ্ছে বলে একটু পরে আবার বলবেন না তো 'ইতু তোকে আমি ভালবাসি', 'ইতু তোকে আমি বউ করবো', এইসব ?

কৌতুকে কৌতূহলে চোখ নাচালো ইতু।

—একটা কাজ করবেন ? আবার 'আপনি' বললো অতীশ।

ইতু বললে, উঁহুঁ, তুইটাই গ্র্যাণ্ড !

অতীশ চোখ টিপে বললে, ঠিক হ্যায়, একটা মজা করবি ? একটু থেমে বললে, তুই যা শাট্ শাট্ টেবল টেনিসের ব্যাট দিয়ে কথা ছুঁড়িস, তুই পারবি না।

ইতু হাসলো।—শুনি আগে।

—আমরা চল্ এমন একটা ভান করবো, যেন ভীষণ প্রেম হয়ে গেছে আমাদের।

এবার শব্দ করে হেসে উঠলো ইতু। বললে, দারুণ হবে। কিন্তু আমি তা হলে কি বলবো ? আপনি-আপনি ?

অতীশ এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললে, না, তুই আমাকে তুমি বলবি। খুব ন্যাকা ন্যাকা গলায় !

দীপক ভাবলে, সোমনাথ আর নন্দিতাও নিশ্চয়ই তার মত হতে চাইছে। অথচ ওরা দু'জনই এত লাজুক, সেটুকু পরস্পরকে ইশারা ইঙ্গিতে বোঝাবার সাহসও নেই ওদের। তার জন্যে ওদের ওপর ও একটু বিরক্তও হচ্ছিল। সময় ফুরিয়ে আসছে। সন্ধে হলেই, সাতটা বাজতে না বাজতেই ওরা সকলেই হয়তো ফিরতে চাইবে। যত দুঃসাহস তো ওদের এই সময়টুকু। তারপর আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ি ফেরার জন্যে ছটফট করবে, অন্তত রাখী আর নন্দিতা। আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরলেই যেন সব ঠিক আছে। মেয়েদের বাপ-মা'রা এত বোকা হয় কেন বুঝতে পারে না।

আসলে তো দীপক নিজেই একটু একা হতে চাইছিল রাখীর সঙ্গে।

তবু নন্দিতাকে বললে, ভাবছেন আমরা দু'জন কেন ডিস্টার্ব করছি অকারণ, এই তো ! যান, দু'জনে গিয়ে গাড়িতে বসুন।

নন্দিতা ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। বললে, ও মা, ছি ছি, ওরকম বলবেন না।

দীপক হেসে বললে, সোমনাথ হয়তো চটছে, কে জানে। না, আমরাই বরং—

বলে রাখীকে ডেকে নিজে গিয়ে গাড়িতে বসল। আর রাখী তখনো গাড়ির দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, চাপা গলায় বলে উঠল, এই দ্যাখো দ্যাখো।

দীপক ফিরে তাকিয়ে দেখলে ইতু আর অতীশ হাঁটতে হাঁটতে চলেছে ব্রীজের দিকে। দু'জনে হাত ধরাধরি করল, হাত না ছেড়েই তারা একবার পরস্পর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, দু'টি হাত একটি সরল রেখা হয়ে যাচ্ছে, আবার দু'জনে কাছে চলে আসছে। পাশাপাশি। একবার দূরে দূরে, একবার কাছে কাছে, যেন একটা ব্যালে নাচের জুড়ি। ফাঁকা ব্রীজ, ডুবন্ত সূর্যের আকাশ, নীচে ছলছল জল সেই নাচের ব্যাকগ্রাউণ্ড।

রাখী কুলকুল করে হেসে উঠল।—ওদের বোধহয় ভালবাসা হয়ে গেছে!

দীপক তাদের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে, কিন্তু আমাদের বোধহয় এখনো হয়নি।

রাখী দীপকের হাতের ওপর একটা জোর চিমটি কাটল, তারপর ফ্যামিলি গ্রুপের দিকে ছুটে গেল।—আরে, ওরা রুমাল চোর খেলছে।

ঢিলে কুর্তা, তার মা, মিষ্টি বৌটাও এসে জুটেছে, আর টমটমকেও বসিয়ে দিয়েছে ওরা। রাখী দীপককে ফেলে রেখে ছুটে গেল। গিয়ে ভিড়ে গেল ওদের দলে।

৮

সোমনাথ ঘাসে পা ছড়িয়ে বসে একটা ঘাসের শিস দাঁতে কাটছিল। সামনে নন্দিতা হাঁটু মুড়ে বসে ঘাড় কাত করে ইতু-অতীশকে দেখছিল আর ঠোঁট টিপে হাসছিল। সত্যি, মেয়েটা অদ্ভুত। সেই গাড়িতে ওঠার সময় থেকে ঠোক্কর দিয়ে দিয়ে কথা বলেছে অতীশকে, আর এখন রীতিমত প্রেমিক-প্রেমিকা। ব্রীজের রেলিঙে কনুই রেখে নিচে নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। এখান থেকে অবশ্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবু যেমন গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে, যেভাবে কথা বলছে, যেন কত গাঢ় পরিচয়। অথচ নন্দিতা আর সোমনাথ এখানে গাড়িটা থেকে দশ পনেরো হাত দূরে, যে-কোনো কথা ওরা এখন বলতেও পারে, কিন্তু নন্দিতা কথাই খুঁজে পাচ্ছে না।

—আপনি খুব কম কথা বলেন। আপনার বুঝি এই সব হৈ-হুল্লোড় একটুও ভাল লাগে না? সোমনাথ ধীরে ধীরে বললে।

নন্দিতা চোখ ফিরিয়ে সোমনাথের দিকে তাকাল, লাজুক হাসল।—ভাল না লাগলে আসতাম এখানে! একটু থেমে বললে, আপনিও তো কম কথা বলেন।

সোমনাথ বললে, মেয়েদের সামনে এলেই আমি আর কথা বলতে পারি না।

নন্দিতা মুচকি হাসল।—এই তো বেশ বলছেন। তারপর আবার ইতুদের দিকে তাকিয়ে বললে, দীপকদা কি ভাবছেন বলুন তো। আমার এত লজ্জা করছে!

—আমাদের কথা ভাবার সময় নেই দীপকের, আপনি মিথ্যে লজ্জা পাচ্ছেন। ও এখন একা একা গাড়িতে বসে রাগে ফুলছে, আপনার বন্ধুটি ওকে ছেড়ে রুমাল চোর খেলছে বলে।

নন্দিতা তা জানে। এটুকু বোঝার মত বুদ্ধি ওর আছে, তবু একা-একা পড়ে গিয়ে অস্বস্তি লাগছিল। ওর আরো খারাপ লাগছিল এই ভেবে যে, কলেজে গিয়ে রাখী আর ইতু নিশ্চয় ওর কথা, ওর এই সোমনাথের সঙ্গে বসে থাকা নিয়ে খুব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে অন্য মেয়েদের বলবে। সত্যি সত্যি সোমনাথ যদি ওর প্রেমে পড়ে যেতো তা হলে এত লজ্জা পেতো না। ও হয়তো নিজে বলতে পারতো না, কিন্তু অন্য সকলেই তো বেশ গর্ব করেই বলে।

নন্দিতার বেশ ভাল লাগছিল, কিন্তু ছেলেদের ও চেনে। আজকের এই সময়টুকুই সত্যি, আজকের এই মুহূর্তের ভাল লাগা। তার বেশি আর কিছুই ও আশা করে না। এর আগেও তো কারো কারো সঙ্গে আলাপ হয়েছে ওর। নির্জনে গিয়ে বসেছে, গল্প করেছে, তারপরই কেমন যেন ঘোর কেটে গেছে তাদের। ছেলেদের ও চেনে। ওদের যে যাবার জায়গা অনেক। প্রেম ওদের কাছে শুধু একটা ছোট্ট স্টেশন। এই সোমনাথই কোলকাতায় ফিরেই সব ভুলে যাবে। সিনেমা, পার্ক স্ট্রীট, খেলার মাঠ, আড্ডা। কে জানে, হয়তো পলিটিক্সও

করে। কিছু না হোক রাজনীতির তর্ক। নেহাত ওরা ক'টা মেয়ে রয়েছে বলেই রাজনীতি ওঠেনি। রাজনীতি তো বাড়িতেও, বাবার সঙ্গে দিনরাত তর্ক করে দাদা, সব সময়ে প্রমাণ করতে চায় বাবাদের ধারণা সব ভুল। বাবা শেষকালে সব মেনে নেয়, নন্দিতা জানে, যুক্তির জন্যে নয়, দাদাকে বাবা ভীষণ ভালবাসে বলে। দাদা তর্কে জিতে গেলে বাবা ভিতরে ভিতরে বোধহয় খুশিই হয়। আপিসে কিছু ঘটলে কিংবা রেশনে চাল খারাপ দিলে বাবা মাকে বলে, অন্তু ঠিকই বলে।

নন্দিতা সেজন্যেই মাঝখানে পলিটিক্স করতে চেয়েছিল। ওটাও তো একটা যাবার জায়গা। অনেক কিছু ভুলে থাকা যায়, নিজেকে ব্যস্ত রাখা যায়। কিন্তু বাবা মা কেউই পছন্দ করল না।

প্রেমের জন্যেও নন্দিতা খুব ব্যস্ত নয়। কিছুর জন্যেই ও বোধহয় ব্যস্ত নয়। কারণ ওর ইচ্ছের তো কোনো দামই নেই। ইচ্ছে তারই থাকে যার ইচ্ছেপূরণের সম্ভাবনা আছে। ও বিয়ের কথা ভাবে না, কারণ ওরও মনে হয় হৈ-হুল্লোড়ের ওখানেই পূর্ণচ্ছেদ। বিয়ে যেন একটা নতুন চ্যাপ্টার। ও পড়াশুনোর কথা ভাবে না, কারণ জানে, কোনোরকমে পাশ করার বেশি কিছু তো ওর ভাগ্যে নেই। পাশ করেও বিয়ে না চাকরি, না কি বেকার হয়ে বসে থাকবে, বাবা-মা'র ঘুম কাড়বে, তাও জানে না। ও এখন থেকেই মাঝে মাঝে চাকরির কথা ভাবে। একবার দীপককে বলেও ছিল হাসতে হাসতে, একটা চাকরি দিন না আমাকে আপনাদের আপিসে।

ওকে সোমনাথের একটু ভাল লাগছে, তা বুঝতে পেরেও নন্দিতা কোনো উৎসাহ পাচ্ছে না। এর আগেও দু'তিনবার সুযোগ এসেছিল। কিন্তু ছেলেগুলোর একটুও যেন ধৈর্য নেই। ওরা যেমন পাঁচ কাজে ছুটে বেড়ায়, হাঁপাতে হাঁপাতে পানের দোকানে দাঁড়িয়ে পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে সিগারেট কেনে, দুটো খদ্দের থাকলে সে-দোকান ছেড়ে অন্য দোকানে যায়, প্রেমের ব্যাপারেও এদেব তেমনি একটা তাড়াহুড়ো। তাড়াহুড়ো নন্দিতা একটুও পছন্দ করে না। সোমনাথকে অবশ্য তারই মধ্যে ভাল লাগছে, কারণ সোমনাথের মধ্যে সেই অধৈর্য ভাবটা নেই। কিন্তু নন্দিতা জানে ফিরে গিয়ে সোমনাথও বদলে যাবে। বড় জোর পাঁচ সাত দশ দিন। নন্দিতার মনে হবে 'কি পেয়েছি, কি পেয়েছি', তারপর অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের সামনে আধঘণ্টা ধরে পায়চারী করবে, আগের দিনের ভুল বোঝাবুঝির কোনো কথা ভেবে ওর কান্না পাবে, আরো আধ ঘণ্টা আশায় আশায় অপেক্ষা করবে, চ্যাংড়া কিংবা আধবুড়ো একরাশ লোক পিছনে লাগবে, কারো চোখ কারো কথা ওকে রাস্তার মেয়ে বানিয়ে দেবে, অথচ পরের দিন এই সোমনাথই হয়তো হাসতে হাসতে বলবে, আরে সে এক কাণ্ড, দীপক জোর করে সিনেমা দেখাতে নিয়ে গেল।

নন্দিতা তাই কিছু আশা করে না, কিছু পেলেও কুড়িয়ে নিতে সাহস হয় না। নিজেকে এগিয়ে দিয়েও দেখেছে, নিজেকে পিছিয়ে এনেও দেখেছে। এই ছেলেগুলো কেমন যেন। খুব অল্পেই এরা অধৈর্য হয়, খুব অল্পেই এদের সাধ মিটে যায়। মা একালের ছেলেমেয়েদের সব কিছুতেই দোষ দেখে। যেন ছেলে আর মেয়ে একই টাকার দুটো পিঠ। নন্দিতার ভাবলেও কষ্ট হয়। মা জানে না, ছেলেগুলো একেবারে অন্যরকম। এদের একটুও বোঝা যায় না। ওরা শুধু জেনেছে মেয়েরা খারাপ, মেয়েরা খারাপ। আগেকার দিনের থুত্থুরে বুড়োগুলো ঠিক তাই ভাবতো।

—আচ্ছা, আপনি নিশ্চয়ই কাউকে না কাউকে ভালবাসেন। সে ভদ্রলোককেও আনলেন না কেন। সোমনাথ হঠাৎ বললে।

নন্দিতা নিজের গভীর থেকে চমকে বেরিয়ে এল। মৃদু হেসে বললে, তিনি আসতে চাইলেন না।

—সেজন্যেই আপনাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হচ্ছে, কেমন যেন দুঃখী দুঃখী।

নন্দিতা ঈষৎ হেসে সোমনাথের দিকে তাকাল। চাপা কষ্ট আর স্পষ্ট হাসিতে মিলেমিশে ওর চোখের পাতা সদ্য উড়তে শেখা পাখির ডানার মত এলোমেলো হয়ে গেল। বাঁকা ভাবে বললে, আপনি দেখছি ভিতর অবধি সব পড়তে পারেন।

সোমনাথ আরেকটা ঘাসের শিস ছিঁড়ে নিয়ে একবার তাকাল নন্দিতার মুখের দিকে। অপ্রতিভের মত হাসল। আপনার মন তাই সারাক্ষণ সেখানেই পড়ে আছে।

নন্দিতা হাঁটুর মধ্যে থুতনি রেখে চোখ দুটো সোমনাথের চোখের দিকে তুললো। বললে, সেটাই তো স্বাভাবিক।

সোমনাথ বললে, ভদ্রলোক খুব লাকি।

নন্দিতাকে এর চেয়েও অনেক ভাল ভাল মন-ভোলানো কথা আরেকজন বলেছিল। সেজন্যই নন্দিতা ক্রমশ ভীরু হয়ে যাচ্ছে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। নন্দিতার কেমন লজ্জা-লজ্জা লাগছিল। তাই বললে, চলুন ওদের রুমাল চোর খেলা দেখি।

বলে উঠে পড়ল। সোমনাথও।

আর রাখী ওদের দেখেই বলে উঠল, বসে পড় নন্দিতা, বসে পড়।

৯

রাখীর কথা ভাবতে ভাবতে, অর্থাৎ ভিতরে জ্বলতে জ্বলতে দীপক কখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ দেখল, হাইওয়ে থেকে ঢালু রাস্তা বেয়ে অতীশ আর ইতু নেমে আসছে। পিছনে পিছনে সেই ময়লা ইজের-পরা কালোকুলো বাচ্চাটা। ডেকচিটা তার মাথায় গামছার বিঁড়েতে বসানো।

ইতুর দিকে আবার তাকাল দীপক। মনে মনে বললে, সুন্দর ফীগার মেয়েটাব। এর আগেও মাঝে মাঝে ওর ইতুকে ভাল লেগেছে।

ওদের আসতে দেখে দীপক গাড়ি থেকে নেমে এল।

কিছুক্ষণেব মধ্যেই ওরাও এসে পড়ল।

আর রাখী নন্দিতাদের ডাকতেই তারাও খেলা ছেড়ে চলে এল।

রাখী আর অতীশ খাবারগুলো নামালো একে একে। জলের ফ্লাস্কটা শুধু সোমনাথ নামালো। এসব ও ঠিক পারে না, কিন্তু নেহাত কিছু একটা না করলে খারাপ দেখায় বলেই একটু হাত ঠেকালো।

প্লেট চামচ হাতা নামিয়ে আনলো নন্দিতা আর রাখী।

দীপক চুপচাপ বসে আছে গম্ভীর মুখে। রাখী ইতুর কানে কানে বললে, রেগে ফায়ার। বলে হাসল ঠোঁট টিপে।

অতীশ চটপট বসে পড়ে বললে, মেয়েরা সব সার্ভ করবে, আমরা কেবল খেয়ে ধন্য করবো তাদের।

রাখী শুধু বললে, ঈস্।

ইতু দীপককে উদ্দেশ করে বললে, বাড়িতে তো ও-কাজ বাঁধা আমাদের, বিয়ের পরও তাই। আজ অন্তত আপনারা সার্ভ করুন, আমরা বসে বসে খাই। কি বলিস রাখী।

বলে অতীশেব পাশে গিয়ে বসে পড়লো অতীশের গায়ে হেলান দিয়ে।

রাখী তা দেখে অবাক হবার ভান কবে চোখ বড বড় কবল, ইতুর চোখে চোখ রাখলো।

বললে, এতদূর !

ইতু হেসে উঠল ।—আমার ভাই লুকোচুরি ভাল লাগে না। যা সত্যি তা লুকোবো কেন। অতীশ কি-সব বললো ফিসফিস করে, তোরা কি যে বলিস বুকের ভেতর হয়-টয়, মনে হল সে-রকম কি যেন হচ্ছে-টচ্ছে, ব্যস্। বলেই শব্দ করে তুড়ি দিল ইতু।

অতীশ প্রতিবাদ করল ।—মিথ্যে কথা, তুই তো গুন-গুন করে গান গাইলি, গানে গানে কি-সব বোঝাতে চাইলি, তারপর তো আমি···

অতীশের কাঁধের ওপর পিঠের ভর দিয়ে বসেছিল ইতু, ও ঝট্ করে সরে সামনাসামনি বসল ।--রিয়েলি ? তারপর দীপকের দিকে ফিরে বললে, জানেন, আমাকে হঠাৎ বললে, ইতু তোকে কিন্তু দারুণ দেখাচ্ছে। 'ইতু, তোকে ছাড়া আমি বাঁচবো না', ব্রীজ থেকে নীচে লাফিয়ে পড়বে বলে ভয় দেখাল···

সকলেই হেসে উঠল। রাখী বললে, তোর সবই অদ্ভুত।

আর অতীশ বুঝতে পারলো না, ইতু প্ল্যানমতো অভিনয়ের দিকেই এগোচ্ছে, না ওকে সকলের সামনে ডোবাতে চায়।

দীপকের কিন্তু ইতুর সঙ্গে অতীশের এই ঘনিষ্ঠতা ভাল লাগছিল না। মুখে উৎসাহ দিলেও দীপকের মনের মধ্যে একটু খচখচ করছিল।

নন্দিতা কোনো কথা বললো না। কেউ সার্ভ করছে না দেখে নিজেই প্লাস্টিকের প্লেটগুলো সব হাতে হাতে ধরিয়ে দিল।

রাখীর খুব ভাল লাগলো দেখে যে, দীপক সব হিসেব করে ব্যবস্থা করে এনেছে। কিন্তু প্লেটে মাংসের টুকরো পড়তেই রাখীর চোখ পডলো কালোকুলো বাচ্চা ছেলেটার দিকে। বললে, এখন যা-না, পরে আসবি।

ছেলেটা লোভের চোখ দিয়ে যেন মাংসের স্বাদ নিচ্ছিল। সে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

আর রোঁয়া-ওঠা বিচ্ছিরি একটা কুকুরকে গন্ধ শুঁকে শুঁকে এদিকে এগিয়ে আসতে দেখে দীপক একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে তাকে ছুঁড়ে মারলো। পাথরটা ওর ভেতরের রাগ। কুকরটা কেঁউ কেঁউ করে চিৎকার করে দূরে সরে গেল। তবু সেখান থেকেই ওদের দিকে তাকিয়ে রইলো জুলজুল চোখে।

১০

খাওয়া-দাওয়া তখন কমপ্লিট। ফ্রায়েড রাইসের কাগজের প্যাকেটগুলো ইতস্তত ছড়ানো, ডেকচিতে চিকেন এবং বেশ কিছু ফ্রাই বাড়তি হয়ে গেছে। ফ্রায়েড রাইসও কিছু কিছু।

রোঁয়া-ওঠা কুকুরটা মার খেয়ে দূরে দূরে ঘুরছিল, লোভে লোভে তাকাচ্ছিল। ইজের-পরা তিন-চারটে কালোকুলো ছেলেও কোত্থেকে এসে হাজির হল কে জানে। একটা ন' বছরের মেয়ে, খালি গা. কোমরে কালো সুতোয় মাদুলী ঝুলছে, কানে পিতলের মাকড়ি।

ইতু ততক্ষণে ছেলেগুলোকে ডেকে বাড়তি খাবারগুলো বিলি করতে লেগে গেছে। কাগজের প্যাকেটগুলো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছে তারা, আর ইতু চমচে করে তুলে তুলে দিচ্ছে।

অতীশ একটা সিগারেট ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলে উঠল, আহা রে, মা আমার সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।

ইতু হেসে ফেলে চামচটা তুলে তাকে মারতে যাওয়ার ভঙ্গি করল, আর খানিকটা ঝোল গিয়ে লাগলো অতীশের শার্টে।

ফ্লাস্কে যেটুকু জল ছিল, তাই ঢেলে দাগটা তুলতে তুলতে অতীশ বললে, বাঁধিয়ে রেখে দিলে হতো। রোজ সকালে উঠে একবার করে দেখতাম, আর তোর কথা মনে পড়তো।

রাখী হেসে উঠে বললে, মনে পড়ার মত আর কিছুই বুঝি জোটেনি আজ। একটু থেমে বললে, আমাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবেন না।

ইতু অতীশ কেউই জবাব দিল না।

দোকানের ছেলেটা, যে চা এনে দিয়েছিল, ডেকচিটা বয়ে এনেছিল, তাকেও ডেকেছিল ইতু খাবার নেবার জন্যে। সে ঘাড় নেড়ে 'না' বললে, দূরেই দাঁড়িয়ে রইলো।

দীপক তাকেই বললে, ডেকচি চামচ ধুয়ে আনতে পারবি?

ছেলেটা উত্তর দিল কেন পারবো না। পয়সা দেবেন তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবো।

ছেলেটা জল আনতে চলে গেল।

এদিকে ইতুর খাবার বিলি করা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ওরা সকলে উঠে পড়ে বেশ খানিকটা দূরে একটা পরিচ্ছন্ন জায়গা বেছে নিয়ে এসে বসলো।

রাখীর চোখ পড়লো টমটমের দিকে। দেখলো, টলমল টলমল পায়ে টমটম ছুটে বেড়াচ্ছে, ঢিলে কুর্তার মেয়েটা তাকে ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। বেশ মজা লাগলো রাখীর। আজকের দিনটাই ওর খুব ভাল লাগছে।

রাখী হঠাৎ উঠে টমটমের দিকে চলে গেল। বাচ্চা ছেলে ওর ভীষণ ভাল লাগে, ঐ রকম বাচ্চা দেখলে ও স্থির থাকতে পারে না।

কালোকুলো ছেলেগুলো তখনো আঙুল চাটছে।

ইতু তার ব্যাগ থেকে কমপ্যাক্ট বের করলো, ডালার আয়নায় নিজের মুখ দেখলো, তারপর পাফটা হাল্কা করে বুলিয়ে নিল গালে।

অতীশ পকেট থেকে ছোট্ট চিরুনীটা বের করে চুল আঁচড়াচ্ছিল, ইতু বললে, এই, চিরুনীটা একবার দাও···দিন তো।

দীপক চোখ গোলগোল করে বলে উঠল, অ্যাঁ, এতদূর! তা আমাদের কাছে আর চাপা রেখে কি হবে, 'তুমি'ই চলুক না।

বললো বটে। কিন্তু ও নিজেই ইতুর দিকে একবার মুগ্ধ চোখে তাকালো।

ইতু ভাব দেখালো যেন লজ্জা পেয়েছে। আসলে ও ইচ্ছে করেই বলেছে, যেন মুখ ফসকে 'দাও' বেরিয়ে গেছে।

ও আবার বললে, চিরুনীটা দিন না!

অতীশ চিরুনীটা এগিয়ে দিতে দিতে বললে. তোর মাথায় আবার উকুন নেইতো!

ইতু এবার সত্যি সত্যি রেগে গেল।—চাই না আপনার চিরুনী। বলে চিরুনীটা নিয়ে ছুঁড়ে দিল অনেকখানি দূরে।

অতীশ কিন্তু সেটা আর আনতে গেল না। আর তাকে রাগাবার জন্য ইতু অতীশের দেশলাইটা তুলে নিল ঘাসের ওপর থেকে, একটার পর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালতে শুরু করলো।

বেশ কয়েকটি কাঠি জ্বেলে নষ্ট করার পর অতীশ দেশলাইটা কেড়ে নিল।

ইতু হেসে বললে, হল না। একটা দেশলাইয়ের মায়াও ছাড়তে পারছেন না। তাহলে তো আমার জন্যে কিছুই পারবেন না।

অতীশ গম্ভীর মুখে বললে, সন্ধের পর দেশলাই জ্বেলে তোর মুখ দেখতে হবে না?

তাই।

সবাই হেসে উঠল। আর নন্দিতা ধীরে ধীরে উঠল, শাড়ির কুঁচি ঠিক করলো, ধুলো ঝাড়লো শাড়ির, তারপর ইতু যেদিকে চিরুনীটা ছুঁড়ে দিয়েছিল সেইদিকে এগিয়ে গেল।

ঠিক সেই সময়েই গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার শব্দ হল। ওরা ফিরে তাকিয়ে দেখলো নতুন ফিয়েট গাড়িটায় সেই মিষ্টি বৌটা উঠে বসেছে। স্টিয়ারিঙে সেই চার-আনা টাক ভদ্রলোক।

বিকেলের রোদ পড়ে গেছে, সন্ধে হয়-হয়। ভদ্রলোক সেজন্যেই বোধহয় চলে যাচ্ছেন।

গাড়িটা ঘাসের ওপর দিয়ে ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় এক সেকেণ্ড দাঁড়ালো। মিষ্টি বৌটি নন্দিতার দিতে তাকালো, হাত নাড়লো। নন্দিতাও। তারপর গাড়িটা স্পীডে হাইওয়ের দিকে উঠে গেল।

রাখীও ওদের চলে যেতে দেখে টমটমকে কোলে নিয়েই এগিয়ে এসেছিল, পিছনে পিছনে সেই স্ল্যাক্স্ আর ঢিলে কুর্তা। কিন্তু সুইট বৌটার সঙ্গে চোখাচোখিও হল না তার।

তারা চোখের আড়াল হয়ে যেতেই ঢিলে কুর্তা রাখীর গায়ে গা লাগিয়ে আস্তে আস্তে বললে, বলুন না রাখীদি, বলুন না।

রাখী হেসে উঠে বললে, রুমা বলছে আমাদের সঙ্গে রুমাল-চোর খেলবে।

অতীশ বললে, রুমা! বেশ নাম তো। তারপর একটু থেমে বললে, আমাদেরও খেলতে নেবে তো?

রুমা লজ্জা লজ্জা ভাব করে বললে, কেন নেব না। বরং ভালই তো, খুব বড় সার্কেল না হলে খেলা জমেই না।

রুমাকে খুশি করার জন্যেই সকলে রাজি হল। শুধু দীপক শুকনো হাসি হাসল। ও ভিতরে ভিতরে চটে যাচ্ছিল। তখন একবার ওকে একা ফেলে রাখী চলে গিয়েছিল রুমাদের কাছে খেলার নাম করে। দীপক অবশ্য জানে, সে শুধু ওকে চটাবার জন্যেই। ইতুর ব্যাপারটাও দীপকের ভাল লাগছিল না। কেন, ও নিজেও বুঝতে পারছিল না। অতীশের সঙ্গে তার একটু ঘনিষ্ঠতা হোক, সে তো দীপকও চেয়েছিল। কিন্তু এখন তার সম্ভাবনা বাড়ছে দেখে দীপকের ভাল লাগছিল না।

এদিকে রুমা, রাখী তখন সত্যি সত্যি সকলকে গোল করে বসিয়েছে। রুমা রুমাল হাতে নিয়ে ঘুরছে আর ঘুরছে। তার দিকে তাকিয়ে সক্কলেই যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। হো হো করে হাসছে সবাই, পিছনে হাত দিয়ে দেখছে রুমাল ফেলে গেছে কিনা।

নন্দিতার হাতে রুমাল ঠেকতেই ও হাসতে হাসতে উঠে পড়লো। এবার রুমা বসেছে। নন্দিতা ঘুরছে। নন্দিতার পর রাখী। নন্দিতা অত হিসেব করেনি। কিন্তু রাখীর জায়গায় বসতেই ও লক্ষ্য করলো ওর পাশেই সোমনাথ। ওর কেমন একটু লজ্জা-লজ্জা লাগলো। আবার ভালও লাগলো।

রাখী ঘুবছে ঘুরছে, তারপর টমটমের পিছনে ও রুমাল রেখে গিয়েছিল, দ্বিতীয়বার এসেই তার পিঠে মিথ্যেমিথ্যে দুটো চাপড় দিয়ে বললে, ওঠো টমটম, ওঠো। টমটম উঠল না।

পরের বার রাখী হাসতে হাসতে ইতুর পিছনে রুমাল ফেললো। আর ইতু উঠে ঘুরতে শুরু করতেই টমটমও ঘুরতে লাগলো। সব্বাই হেসে উঠল হো হো করে।

ঘন ঘন পালটে যাচ্ছিল চক্রটা। দীপকের পাশে ইতু (দীপকের ভাল লাগলো), অতীশের পাশে ইতু, রাখীর পাশে দীপক, রাখীর পাশে অতীশ (অতীশের ভাল লাগলো), নন্দিতার পাশে সোমনাথ, নন্দিতার পাশে রুমা। রুমার পাশে টমটম।

খুব মজা লাগছিল ওদের। আর রাখী লক্ষ্য করছিল, কে কাকে জব্দ করার চেষ্টা

করছে।

তারপর একসময় সব্বাই ক্লান্ত হয়ে পড়লো। রুমার মা রুমাকে ডাঁকলেন। টমটমকে নিয়ে রুমা চলে গেল। অনেকক্ষণ ওরা চুপচাপ বসে রইলো, গল্প করলো।

ইতু হঠাৎ দীপকের দিকে চোখ রেখে বললে, কি মশাই, বাড়িটাড়ি নেই নাকি আমাদের? যেতে হবে না?

দীপক হাই তুললো ক্লান্তিতে। যেন ইতুর কথা ওর কানেই যায়নি এমন ভাবে বললে, আমার ঘুম পাচ্ছে।

সারাদিন হৈ-হুল্লোড় করার পর পেট ভরে খেয়ে, রুমাল-চোর খেলে এখন সকলেরই কেমন ক্লান্ত লাগছিল। বাড়ি ফেরার কথা কারো ভাবতেই ইচ্ছে করছিল না। কেউই ইতুর কথার পিঠে কিছু বললো না। আসলে ইতুর নিজেরও হয়তো বাড়ি ফেরার তাড়া ছিল না।

মাত্র তো এক ঘণ্টা সময় লাগবে যেতে। ন'টা সাড়ে ন'টা বেজে গেলেও ক্ষতি নেই। গিয়ে বড়জোর বাড়িতে একটা থমথমে আবহাওয়া দেখবে, কিংবা দুটো বাঁকা কথা। সে তো অনেক শুনেছে ওরা! তার ভয়ে এমন সুন্দর একটা দিনকে মাটি করতে ইচ্ছে হল না কারো।

নন্দিতা চিরুনীটা খুঁজে নিয়ে এসে নিজের ব্যাগে রেখেছিল। মনে পড়তেই ইতুকে দিয়ে বললে, এই নে, রাগ করে ডাইনী সেজে থাকতে হবে না।

ইতু চিরুনীটা নিয়ে হাসলো, চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললে, তোকে আজ যা প্যারাগন প্যারাগন লাগছে না! যতই সাজি, তোর পাশে ডাইনীই লাগবে।

অতীশ বললে, আমি একমত।

সঙ্গে সঙ্গে ইতু একটা চিম্‌টি কাটলো অতীশকে। অতীশ 'উঃ' বলে চিৎকার করে উঠল।

দোকানের ছেলেটা ইতিমধ্যে ডেকচি চামচ সব ধুয়েমুছে কেরিয়ারে তুলে দিয়ে এসে দাঁড়াল দীপকের কাছে। দীপক রাগের ভান করে ইতু নন্দিতার দিকে ইশারা করলো। বললে, দিদিমণিদেব কাছে যা। প্রেম করবেন ওঁরা, পয়সা দেবো আমি?

নন্দিতা তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলতে গেল। শুধু বললে, দীপকদা, আপনি কিন্তু আজ যা-তা বলছেন।

দীপক তার আগেই হাত বাড়িয়ে নন্দিতার ব্যাগ কেড়ে নিয়ে জীপ ফাসনার টেনে ব্যাগটা বন্ধ করে দিয়েছে।

পয়সা মিটিয়ে দিতেই ছেলেটা চলে গেল। আর তখনই ছেঁড়া খাকি হাফপ্যাণ্ট পরা ভিখিরি ছেলেটা এসে দাঁড়াল হাত পেতে। বছর বারো বয়েস, কাজের কথা শুনেই সরে গিয়েছিল। দীপক ধমক দিয়ে বললে, যা ভাগ্।

ছেলেটা এর আগে একবার রাখীকে ছুঁয়ে ভিক্ষে চেয়েছিল। সেজন্যে রাখীর গা ঘিন ঘিন করে উঠেছিল।

দীপক বললে, চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে, চল্ নদীর পাড় দিয়ে ঘুরে আসি। বলে গাড়ির কেরিয়ারে চাবি লাগাতে গেল।

আর ইতু হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠল, আরেব্বাস্, কি ঢাউস চাঁদ রে এখানকার। এ একেবারে নেমন্তন্নবাড়ির গামলা।

সকলে তাকিয়ে দেখল পড়ন্ত আলোয় সারি সারি নারকোল গাছের মাথার ওপর ইয়াব্বড়ো একটা চাঁদ উঠেছে।

অতীশও থ হয়ে গেল দেখে। বললে, দারুণ! দুটো লোকও জাপটে ধরতে পাববে না মাইরি, এত্ত বড়।

রাখী বলে উঠল, লাভলি ! লাভলি !

নন্দিতা নিচু গলায় বললে, আজ বোধহয় পূর্ণিমা।

১১

ইতুর হাতে চওড়া ব্যাণ্ডের বেশ বড় সাইজের ঘড়ি। রাখীর হাতের ঘড়িটা ছোট। দীপক ঠাট্টা করে একদিন বলেছিল, ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে নাকি ওটা দেখতে হয় !

নদীর পাড়ের দিকে যেতে যেতে ইতু ঘড়ি দেখল, রাখী ঘড়ি দেখল। তারপর ইতু আস্তে আস্তে রাখীকে বললে, এখনো অনেক সময় আছে। রাখীও ফিসফিস করলে, ন'টায় কিন্তু বাড়ি পৌঁছতেই হবে। হঠাৎ বাড়ির কথা মনে পড়ে গিয়ে রাখীর মুখে কেমন একটা ভয়-ভয় ছাপ পড়লো। আর ইতু বাইরে অতটা দেখালো না বটে, কিন্তু ফিসফিস করে বললে, লেটেস্ট সাড়ে ন'টা। তারপর আর ঢুকতেই দেবে না বাড়িতে।

শুধু নন্দিতাকে দেখে মনে হল বাড়ির কথা ও ভাবছেই না। ওর মন যেন একটা মুগ্ধ প্রজাপতি হয়ে উড়ছে।

নদীর ধারে পৌঁছে বালির ওপর দিয়ে হেঁটে ওরা জলের কাছ অবধি এগিয়ে গেল দৌড়তে দৌড়তে। রাখী আগে আগে, পিছনে ইতু। দীপক, অতীশ, সোমনাথও দৌড়লো।

ওপারে বিরাট একটা চাঁদ, আলো নিভে আসছে দিনের, নদীর ওপর ছলাত ছলাত শব্দ করে একটা নৌকো আসছে এদিকেই, আর কি মোলায়েম হাওয়া। নন্দিতার মনও ফুর্তিতে নেচে উঠল। রাখী-ইতুদের দেখে নন্দিতাও দৌড়তে দৌড়তে চিৎকার করে বললে, ইতু, তুই সাঁতার জানিস না, সাবধান।

অতীশ পিছন থেকে চিৎকার করলো, ইতু, পাবিস তো জলে নেমে ডুবে যা, তোকে বাঁচানোর একটা স্কোপ দে।

ইতু মুখের সামনে দুটো হাতকে মাইক বানিয়ে চিৎকার করে বললে, আমি নিজে ডুবি না স্যার, আমি শুধু ডোবাই।

দীপক চিৎকার করলো, রাখী, জলের অত কাছে যেও না।

সোমনাথের মন থেকেও জড়তা কেটে গেল। ও চিৎকার করলো, দীপক, নৌকো চড়বি ?

রাখী চিৎকার করে বললে, আমি জলে পা ডুবিয়ে বসবো, ডুবে গেলে বাঁচাবেন তো অতীশদা !

অতীশ চিৎকার করে বললে, দীপক তাহলে চটে যাবে। আমি শুধু ইতুকে বাঁচাবো।

রাখী হেসে উঠে চিৎকার করে প্রশ্ন করলো, দীপ যখন ডোবাবে তখন বাঁচাবে কে মশাই ?

অতীশ চিৎকার করে বললে. আমি আমি।

বালির ওপর পায়ের ছাপ ফেলে ফেলে ওরা চতুর্দিকে ছুটে বেড়ালো, চিৎকার করে করে পরস্পরের সঙ্গে কথা বললো, আনন্দে ওদের মন কাশফুল হয়ে দুললো, তারপর ক্রমশ সকলেই কাছাকাছি এসে পড়লো ফেরীঘাটের দিকে যেতে যেতে। অতীশ গলা ছেড়ে গান শুরু করলো। ইতু ধীরে ধীরে রাখীকে বললে, আরে, দারুণ গায় তো ! নন্দিতা অতীশের সঙ্গে গলা মেলালো ! উছলে পড়ে আলো। ইতু যোগ দিল, ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো।

রাখী খুব আস্তে আস্তে গাইছিল, ও গান ভাল জানে না। সোমনাথ একেবারেই জানে না।

রাখীর শুধু মনে হল, সত্যিই চাঁদের হাসি বাঁধ ভেঙেছে। সেই বিরাট চাঁদটা এখন ছোট হয়ে গেছে, আর ছায়া ছায়া নদীর তট, গাছগাছালি, রাস্তা, ব্রীজ, নদীর জল জ্যোৎস্নায় ভিজে গেছে। ওরা নিজেরাও।

যেন ক্ষণিকের মধ্যে ওদের মনগুলো বদলে গেল। নরম, শান্ত, গভীর। চাঁদের আলো ওদের মন থেকে সঙ্কোচের পর্দা সরিয়ে দিল।

দীপক হঠাৎ কখন ঝপ্ করে বালির ওপর বসে পড়েছে, ওদের সঙ্গে সঙ্গে আসেনি, রাখী তা লক্ষ্য করেনি। ও হঠাৎ দীপককে দেখতে না পেয়ে ফিরে তাকালো। দূরে বালির ওপর তার ছায়াশরীর দেখা গেল। রাখী টের পেয়েছে, ওকে একা না পেয়ে মাঝে মাঝেই সারাটা বিকেল রেগে যাচ্ছিল দীপক। সে-কথা ভেবে ওর হাসি পেল। অথচ ওর নিজেরও একা হতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

ইতু হাসতে হাসতে কানে কানে বললে, যা রাখী যা, তা না হলে ফেরার সময় অ্যাকসিডেন্ট করবে।

রাখীর মনে হল অ্যাকসিডেন্ট নিয়ে ঠাট্টা না করলেই পারতো ইতু। ও ইতুর সঙ্গে একটু একটু করে পিছিয়ে পড়তে লাগলো। সামনে অতীশ, নন্দিতা, সোমনাথ।

তারপর রাখী হঠাৎ ইতুর হাতে একটু চাপ দিয়ে দীপকের দিকে হাঁটতে শুরু করলো।

দীপক নিশ্চয় খুব রেগে গেছে। দীপকের রাগ দেখতে ওর খুব মজা লাগে।

ইতুকে একদিন বলেছিল সে-কথা। দীপক রেগে গিয়ে যখন গম্ভীর হয়ে যায় তখন কিন্তু খুব কষ্ট হয় রাখীর। দীপক হয়তো ভাবে, রাখী ওকে একটুও ভালবাসে না। ধরা না দিলেই যেন সেটা আর ভালবাসা নয়। দীপক কেন বোঝে না, রাখীর কেমন ভয়-ভয় করে, কেবলই মনে হয় ওর কাছে হারলেই হারাতে হবে।

সেই টিকিট বিক্রির পর তো দীপককে ভুলেই গিয়েছিল। নিরঞ্জনকে খুশি করে নিরঞ্জনের কাছে নিজের দাম বাড়াতে চেয়েছিল। প্রেম যে অন্য কিছু ও তখন জানতোই না।

বোধহয় দু' তিনমাস পার হয়ে গিয়েছিল। ও ভাবতেই পারেনি দীপক ওকে এতদিন বাদে দেখে চিনতে পারবে।

বিকেলে সিনেমা দেখে ইতুকে বাস-স্টপে ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিল। হঠাৎ একখানা গাড়ি ওকে পার হয়ে চলে গেল, যে চালাচ্ছিল সে ওর দিকে তাকালো। রাখী প্রথমটা চটেই গিয়েছিল। গাড়িওয়ালা লোকগুলো কি যেন ভাবে, যেন পায়ে-হাঁটা যে-কোনো মেয়ে ওদের কাছে লিফ্‌ট নেবার জন্যে উৎসুক হয়ে আছে।

গাড়িটা ওকে পার হয়ে গিয়ে হঠাৎ ঘ্যাচাং করে থেমে পড়লো। হঠাৎ ব্রেক কষার শব্দ শুনে এক পলক তাকিয়েই রাখী অন্যদিকে মুখ ফেরালো। ওর ভয় হল লোকটার সঙ্গে চোখাচোখি হলেই তার চোখ ওকে সস্তা করে দেবে।

কিন্তু গাড়িটা ফুটপাথ ঘেঁষে এল রাখীর পাশে পাশে। তারপর ডাক শুনলো রাখী।—শুনছেন! রাখী ফিরে তাকালো, ওর চোখ বললো চিনতে পারেনি।

দীপক হেসে বললে, আমি কিন্তু আপনাকে চিনি।

রাখী অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো একমুহূর্ত।

দীপক বললে, রেবাদির সঙ্গে আমার আপিসে এসেছিলেন, চ্যারিটির টিকিট, মনে পড়ছে না?

ঈস, রাখীর কি খারাপ লেগেছিল দীপককে চিনতে পারেনি বলে। নিজেকে অকৃতজ্ঞ

মনে হল।

তবু আমতা আমতা করে বললে, আপনি বোধহয় রোগা হয়েছেন একটু···সেদিন অন্যরকম পোশাক পরেছিলেন···আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম।

দীপক হো হো করে হেসে উঠল।—কিচ্ছু অন্যায় করেননি ভুলে গিয়ে। আমাদের কেউই মনে রাখে না, আপনি তো তবু চিনতে পেরেছেন শেষ অবধি।

দীপক গাড়ির দরজা খুলে দিয়েছে তারপর হাত বড়িয়ে। আর রাখী একটুখানি ইতস্তত করে উঠে বসেছে।—আমি কিন্তু কাছেই নামবো।

দীপক গাড়ি চালাতে চালাতে বলেছিল, আমি আপনাকে পিছন থেকে দেখেই—মানে সন্দেহ হয়েছিল, ফিরে তাকিয়েই বুঝলাম আপনি।

রাখী সেদিন অভিভূত হয়ে গিয়েছিল—দীপক ওর নাম, ওর কলেজের নাম, সেদিন যা যা বলেছিল সব মনে রেখেছে দেখে।

ও বলেছিল, আমি কিন্তু কাছেই নামবো। কিন্তু ওর নামতে ইচ্ছে হয়নি। ওর মনে হয়েছিল, ওকে মনে রাখার প্রতিদানে, সেদিনের কৃতজ্ঞতায় একটা দিন দীপকের ইচ্ছের কাছে নিজেকে ছেড়ে দিতে। রাখী জানে না, সেটা ওর নিজেরই ইচ্ছে কিনা।

পার্ক স্ট্রীটের একটা রেস্টোরেন্টে গিয়ে ওরা বসেছিল। দীপক অনর্গল কথা বলছিল, রাখীও অনর্গল কথা বলছিল। তারপর হঠাৎ কখন ওরা দু'জনেই চুপ করে গিয়েছিল। সমস্ত কথা ওদের শেষ হয়ে গিয়েছিল। শুধু পরস্পরের উপস্থিতিটা ওদের ভাল লাগছিল।

সেদিন মাঝপথে এক জায়গায় নেমে গিয়েছিল রাখী। দীপক ওর ঠিকানা জিজ্ঞেস করেনি, আবার কবে দেখা হবে জিজ্ঞেস করেনি। শুধু বলেছিল, কারো সঙ্গে আজ অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না তো। তা হলে মনে মনে নিশ্চয় খুব গালাগাল দিয়েছেন। বলেছিল, আমার সন্ধেটা কিন্তু খুব সুন্দর কাটলো।

ব্যস্। বাড়ি ফিরে কি যেন হয়ে গেল রাখীর। অনেক রাত অবধি ঘুমোতে পারলো না। জানালায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ রাতের অন্ধকার দেখল।

তিনটে দিন ও কোনোরকমে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করেছিল। তারপর হঠাৎ একদিন টেলিফোন ডিরেক্টরীর পাতা উল্টে উল্টে দীপককে ফোন করে বসলো—কে বলছি বলুন তো?

—রাখী। দীপক একটুও দ্বিধা না করে বললে।

সেই দিনটার কথা আজ একবার মনে পড়েছিল রাখীর। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে-কথা ওর আবার মনে পড়লো।

নদীর ধারে বালির ওপর পা ছড়িয়ে বসে ছিল দীপক। রাখীকে কাছে আসতে দেখেও কোনো কথা বললো না।

রাখী হাসল।—খুব রেগে গেছ তুমি, তাই না? কিন্তু কি করে আসি বলো তো?

দীপক গাঢ় গলায় বললে, চাই না, চাই না তোমাকে, আমাকে একা থাকতে দাও।

১২

নৌকোটা ঘাটে এসে ভিড়লো। জনকয়েক গ্রাম্য লোক মালপত্তর নিয়ে নেমে অন্ধকার ঝোপ ঝাপ গ্রামটার দিকে হেঁটে গেল।

ওরা দেখল মাঝিটা নৌকোয় বসে বসেই বিড়ি টানছে। নৌকোর মধ্যে একটা হারিকেন দুলছিল, সেটা নিভিয়ে দিল সে।

ওরা বসে ছিল। হঠাৎ চমকে উঠল ইতু। ফিরে তাকিয়ে দেখলো বছর বারো বয়সের ভিখিরি ছেলেটা এসে দাঁড়িয়েছে কখন। ইতু হেসে উঠল।—এখানেও ? নন্দিতা ব্যাগ খুলে পয়সা দিল তাকে, এই ভাল লাগার সময়টুকু থেকে ওকে সরিয়ে দেবার জন্যে। আর অতীশ ছেলেটাকে দীপকদের দিকে দেখাল।—ঐখানে যা, ঐখানে।

ছেলেটা সত্যি সত্যি সেদিকে চলে গেল।

ইতু সোমনাথ অতীশ নন্দিতা গোল হয়ে বালির ওপর বসেছিল। নন্দিতা তার পায়ের ওপর ভিজে বালি চাপিয়ে সুরুত করে পা টেনে নিয়ে একটা ঘর বানালো।

ইতু ফিরে তাকিয়ে দীপকদের একবার দেখল। অন্ধকারে রুপোর জল মেখে ওদের শরীর দুটো সিল্যুট ছবির মত দেখাল। স্পষ্ট বোঝা গেল না, মনে হল রাখী দুহাত পিছনে স্ট্যাণ্ড বানিয়ে পা ছড়িয়ে বসেছে, তার কোলে মাথা দিয়ে দীপক শুয়ে আছে। দীপকের ট্রাউজার্সের একটা পা বালির ওপর ট্র্যাংগল বানিয়েছে, আরেকটা পা সরল রেখা। দৃশ্যটা ইতুব খুব মিষ্টি লাগলো। অতীশ তার পাশেই, ইতু তাকে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে দীপকদের দেখাল। নন্দিতা খিলখিল করে হেসে উঠল। সোমনাথ মৃদু হেসে বললে, কবিতা।

ইতু ন্যাকামির গলায় সুর টেনে বললে, আমরাও কবিতা হবো। বলেই হেসে ফেললো।

নন্দিতা কুলকুল করে হাসলো, বাব্বা, কত ঢং তুই জানিস।

অতীশ বললে, ভিড়ের মধ্যে কবিতা হয় না। তুই তো আমার সঙ্গে একা হতেও ভয় পাস।

ইতু একটা শব্দ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো, কথায় গভীর হতাশার সুর মাখানোর চেষ্টা করে বললে, হায় রে, কাকে শেষ পর্যন্ত হৃদয় দিয়ে বসলাম ! মুখের কথাতেও যে বুঝতে পারে না সে নাকি বুকের ভেতর পড়ে দেখবে।

অতীশ হেসে ফেলে বললে, চল্ তাহলে নৌকোয় একটু ঘুরে আসি।

—না বাবা, আপনাকে বিশ্বাস নেই। ইতু বসে রইলো।

—তোর কানে কানে ফিসফিস করে কত কি বলতে হবে যে।

সোমনাথ আর নন্দিতা প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল, আমরা যে শুধুই ভিড়।

অতীশ সত্যি সত্যি মাঝির সঙ্গে দরদাম করলো। রফা হতেই ইতুকে বললে, চল্ চল্।

—না বাবা, আপনাকে বিশ্বাস নেই। ইতু বসে রইলো।

অতীশ ওকে কাতুকুতু দিতেই ইতু হাসতে হাসতে উঠে পড়লো। এক পা এগিয়ে দিয়ে নৌকোয় উঠল টাল সামলাতে সামলাতে। বললে, ডুবে গেলে বাঁচাবেন তো !

অতীশ ইতুর পাশে গিয়ে বসলো। তারপর তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বললে, আমরা দু'জনেই বাঁচবো।

নৌকো ছেড়ে দিল। নৌকোর মুখটা ঘুরে গেল। ওরা দুজনেই নন্দিতা আর সোমনাথের হাসির শব্দ শুনতে পেল।

মাঝি একমনে দাঁড় টেনে চলেছে, ওরা দু'জনে ছইয়ের আবছা অন্ধকারে। নদীর ওপর ছোট ছোট ঢেউগুলো চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। বালির তট দুধের মত, দূরে দূরে গাছপালা কালো তুলির টান, পাতাব ফাঁকে ফাঁকে আলোর টুকরো। ব্রীজটা এখান থেকে একটা অতিকায় জন্তুর কঙ্কাল মনে হচ্ছে।

অতীশ একটু চাপা গলায় হঠাৎ বললে, ঠাট্টা নয় ইতু, আমি সত্যি সত্যি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

ইতু মৃদু হেসে বললে, কি রাফ গলা, ঐভাবে বলে নাকি, আরো মিষ্টি করে বলতে হয়।

অতীশ দমে গেল। চাপা রাগ থেকেই যেন বললে, তোমার তো অনেক অভিজ্ঞতা, তুমি

আমাকে শিখিয়ে দাও কখন কি বলতে হয়।

ইতু অতীশের চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো। তাকিয়ে রইলো এক পলক। তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমি খারাপ, সত্যি খুব খারাপ মেয়ে আমি। কিন্তু ওর গলার স্বরে অভিমান উঁকি দিল।

অতীশ ওর হাতখানা নিজের দু'হাতের মুঠোয় তুলে নিল। বললে, আমি খারাপ ভাল বুঝি না। তোমাকে খারাপও বলি না, ভালও বলি না, তুমি অন্য কিছু।

ইতু অতীশের চোখের দিকে আবার তাকালো, তাকিয়ে রইলো। আবছা অন্ধকারে ওদের দু'জনের চোখজোড়াই শুধু ওরা অস্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছিল।

ইতু সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললে, আপনার আজ কি যেন হয়েছে।

অতীশ বললে, ভালবাসা কি, তুমি একটুও বোঝো না।

ইতু বললে, ভালবাসলে কি করতে হয় ? বলেই অতীশের গালে হঠাৎ ঠোঁট ঠেকিয়ে 'চুক' করে শব্দ করলো।—এই ? ভালবাসা বলতে ছেলেরা তো এইটুকুই জানে।

অতীশ ততক্ষণে ইতুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে তার মুখের ওপর মুখ নামিয়ে এনেছে। মাঝিটা যেন মানুষই নয়।

কিন্তু মাঝিটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, টাল করবেন না বাবু, টাল করবেন না।

ওরা দেখলো নৌকোটা দুলে উঠেছে।

—ছি ছি, ও কি ভাবলো ! ইতু ফিসফিস করে বললো। ওর ঘাড়ের ওপব দিয়ে অতীশের যে হাতখানা নেমে এসেছিল সেই হাতখানাকে ও সরিয়ে দিতে গিয়েও মুঠোর মধ্যে ধরে রইলো।

তারপর অতীশ ঠোঁট টিপে হেসে বললে, আর বোধহয় আমাদের অভিনয় করতে হবে না।

ইতু হঠাৎ হেসে বললে, আচ্ছা, এবার বলুন তো আমি কত নম্বর ?

অতীশ বুঝতে পারলো না প্রথমে। পরক্ষণেই বুঝতে পেরে বললে, আমি কি গুনে রেখেছি ? সকলের কথা আমার মনেও নেই।

ইতু বললে, আহা, গোপন কবার কি দরকার। আমি ওসব কিচ্ছু মনে করি না। আমি নিজে বাঁধন মানি না, কাউকে বেঁধেও রাখি না।

অতীশ চুপ করে রইলো। কথাটা বোধহয় ওকে আঘাত দিল। ও সারাটা দিন মনে মনে অনেক কিছু ভেবেছে। ইতুর এই সপ্রতিভ হাঁটাচলা, ব্যবহার, ওর কথার ঝলক, গায়ে ঠেস দিয়ে একান্ত হয়ে সকলের সামনে বসা, কিংবা সেই মুঠো করে চুল ধরে মাথা ঝাঁকানো—প্রতিটি মুহূর্ত ওর মনের ওপর দাগ কেটে গেছে। এমন কি ব্রীজের ওপর দিয়ে ওরা যখন হাত ধরাধরি করে হাঁটছিল প্রেমিক-প্রেমিকার অভিনয় করতে করতে, তখনো অতীশের মনে হয়েছে, কোনোটাই অভিনয় নয়। তা হলে ওর এত ভাল লাগছিল কেন, যদি অভিনয়ই হবে !

তাই ইতুর কথায় ও আহত হল। 'আমি বাঁধন মানি না, কাউকে বেঁধেও রাখি না।' অথচ অতীশ এইমাত্র একটি সুগন্ধির দীঘি থেকে ডুব দিয়ে উঠেছে। ওর সমস্ত শরীর-মন কেমন বাতাসের মত হালকা হয়ে বিদ্যুতের মত মিলিয়ে যাচ্ছে। ও চাইছিল ইতু ওর একার হবে, ইতু ওকে বেঁধে রাখবে।

—ঢিলে কুর্তা স্ল্যাক্স্-পরা মেয়েটা কিন্তু হাতছাড়া হয়ে গেল, আলাপ করলে পারতেন। আমি তো ছিলামই। ইতু হেসে উঠল।—এমনি করে তুড়ি দিয়ে ডাকলেই চলে আসতাম। ও আবার শব্দ করে তুড়ি দিল।

অতীশ কোনো কথা বললো না। ওর সমস্ত আনন্দ মাটি করে দিতে চাইছে ইতু।

—এই, তুমি আমাকে আর আদর করবে না ? বলে অতীশের হাতটা ও নিজেই নিজের কাঁধের ওপর টেনে নিল। বলল, মুখ গোমড়া করে থেকো না। এই মুহূর্তটাই সত্যি, এটাকে নষ্ট করে কি হবে!

অতীশ বললে, আমি এই মুহূর্তটাকে চিরকালের করে তুলতে চাই।

ইতু হেসে উঠল।—সব মুহূর্তগুলো মিলিয়ে তবে তো চিরকাল। আমি সবগুলো কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখতে ভালবাসি। যখন আমি না···ইতু উচ্ছল হয়ে হেসে উঠল, বললে, যখন থুত্থুরি বুড়ি হয়ে যাবো, আমার লুকোনো ঝাঁপি খুলে বসবো, গুনে গুনে দেখবো কতগুলো কড়ি জমেছে, কোন্‌টা কোন্‌টা কানাকড়ি আর কোন্‌টা খুউব দামী।

বলতে বলতে হঠাৎ আদুরে ভঙ্গিতে ইতু অতীশের গায়ের ওপর ঢলে পড়লো। অতীশ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলো একদৃষ্টে। ধীরে ধীরে বললে,তুমি একটা পাগল।

ইতু পরম নিশ্চিন্তে পরম আরামে অতীশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। ইতু যেন একটা ঘোরের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। তার হাত অতীশের বুকের উপর এসে থামলো, পুট পুট করে অতীশের শার্টের বোতাম খুলে দিল ইতু তারপর তার গেঞ্জীতে ঢাকা বুকের ওপর মোলায়েম হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

অতীশের তখন ভীষণ ভাল লাগছে। একটু আগের সেই বিচিত্র নরম স্পর্শ। সেই ঘোলাটে উত্তেজনা এর কাছে কিছু না, কিছু না। অতীশের সেই মুহূর্তে মনে হল দীপক কিংবা সোমনাথকে ডেকে বলে, ইতুর এই অতীশের বুকে হাত বোলানোর স্নিগ্ধ আনন্দের কাছে আর কোনো আনন্দ নেই।

১৩

নন্দিতা আর সোমনাথ যেমন বসে ছিল ঠিক তেমনি বসে রইলো। কিন্তু নৌকোটা ইতু আর অতীশকে নিয়ে বেশ খানিকটা দূরে চলে যেতেই ওদের মনে হল ওরা অনেকটা কাছাকাছি এসে গেছে। দুধের মত নদীর তট, এখন চাঁদ কোলকাতার মত ছোট হয়ে গেছে, তার আলো ঠিকরে পড়ে বালির পাড় সাদা দুধ, তার ওপর যেখানে ব্রীজের হালকা ছায়া পড়েছে, সেই জায়গায় দীপক আর রাখীকে অনেক ছোট দেখাচ্ছে।

নন্দিতার মনে হল একটা বিশাল নির্জনতার পৃথিবীর মধ্যে ওরা দু'জন যেন স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। মনে হল কিছু একটা ঘটাবার জন্যে ওরা যেন অপেক্ষা করছে।

—আমি জানতাম না, জানলে নির্ঘাত সে ভদ্রলোককে টেনে আনতাম।

নন্দিতা হাঁটুতে থুতনি রেখে চুপচাপ বসেছিল। ঠিক তখন যেভাবে সোমনাথের হাত থেকে টগর ফুলটা নিয়ে মাথায় গুঁজেছিল, সেই ভাবেই আবার উচ্ছল হয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল ওর।

ও মৃদু হাসল সোমনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে।—আপনি বোধহয় বড্ড বেশি হতাশ হয়ে পড়েছেন।

ওর মিথ্যে গল্পটা সোমনাথ সত্যি সত্যি বিশ্বাস করে ফেলেছে দেখে ওর খুব মজা লাগছিল। ওর মনে হচ্ছিল ভিতরে ভিতরে ও যেন রাখী আর ইতু হয়ে উঠতে চাইছে।

সোমনাথ বললে, হতাশ নয়, হিংসে হচ্ছে। সে ভদ্রলোকটি কেমন, জানতে ইচ্ছে করছে।

নন্দিতা বললে, ভীষণ ভাল। খুব ভদ্র আর খুব শান্ত।

—আর নিশ্চয় খুব সুন্দর সুন্দর কথা বলেন।

নন্দিতা কৌতুকে হাসল। বললে, না না, কথা নয়, তার মনটা খুব সুন্দর। কথা তিনি একেবারেই বলেন না, ভিড়ের মধ্যে একদম চুপ করে থাকেন।

সোমনাথের তবু সন্দেহ কাটলো না। ও ভুল করে বসবে হয়তো এই ভয় পেল। তাই বললে, এই একটু আগেও আপনি আবার অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

নন্দিতা হেসে ফেললো। বললে, এটা আমার একটা রোগ। অথচ আমি তখন, বিশ্বাস করুন, সত্যিই কিছু ভাবি না।

একটু থেমে ঠোঁট টিপে হাসল।—বেশ তো আছি, কারো জন্যে ভাবি না, আমার জন্যেও কেউ ভাবে না।

সোমনাথ নন্দিতার চোখে চোখ রেখে কিছু বুঝে ফেলার চেষ্টা করলো।

নন্দিতা বললে, আপনার সব আনন্দ আজ আমিই বোধহয় মাটি করে দিলাম।

সোমনাথ বললে, আমি আনন্দের আশা নিয়ে তো আসিনি। কিন্তু আপনার নিশ্চয় একটুও ভাল লাগছে না।

—আপনার ?

সোমনাথ হাসল। বললে, আমি অল্প পুঁজির মানুষ, অল্পেই সন্তুষ্ট। আমার এটুকুই ভীষণ ভাল লাগছে।

নন্দিতার কি যে হল কে জানে, ও চোখ নামিয়ে গাঢ় গলায় বললে, যারা কেবল মুখের কথা শুনতে চায় তারা ভীষণ বোকা।

সোমনাথ হেসে ফেলে বললে, আপনার ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার বোধহয় কিছু কিছু মিল আছে।

নন্দিতা চাপা গলায় বললে, ছাই মিল। বলেই ও খিলখিল করে হেসে উঠল। বললে, সব মিথ্যে সব মিথ্যে।

সোমনাথের মন হঠাৎ একটা ফাটা হাউই হয়ে গেল।

বললে, আজ পিকনিকে আসার আগে ভাবতেই পারিনি এই দিনটা চিরকালের জন্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

নন্দিতা হাসল।—আপনাদের চিরকাল তো এক সপ্তাহ বা এক মাস।

সোমনাথ চুপ করে গিয়ে ওর অভিমান বোঝাতে চাইলো।

সোমনাথ হঠাৎ বললে, আবার আপনার সঙ্গে কবে দেখা হবে।

নন্দিতা হেসে বললে, এখানকার জিনিস এখানে রেখে যাওয়াই তো ভাল।

সোমনাথ চুপ করে থেকে আবার বললে, আপনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। বলে হাত বাড়িয়ে নন্দিতার হাতখানা ছুঁয়ে বললে, বলুন কবে!

—রাখীদের সঙ্গে দেখা হলেই তো আমার সঙ্গেও দেখা হবে। নন্দিতা হেসে বললে।

সোমনাথ বললে, ভিড়ের মধ্যে শুধু দেখা যায়, দেখা হয় না।

নন্দিতা সশব্দে হেসে উঠল। এই মুহূর্তে ওর ইতুর মত কথা বলতে ইচ্ছে করছিল।—বাঃ, এমন সুন্দর সুন্দর কথা কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন। শোনাতে পারলে ইতুর মত অমন চমৎকার মেয়ে—সে-ই আপনার···

—ইতুর মত মেয়েকে আমার একটুও ভালবাসতে ইচ্ছে করে না। ওরা শুধু বন্ধু হতে পারে।

নন্দিতা হেসে বললে, আমি তো ঐ রকমই।

সোমনাথ বললে, আপনি স্নিগ্ধ, আপনার সব কিছুতেই শ্রী আছে।

নন্দিতা বললে, সেটা এই লাল পাড় শাড়িটার জন্যে। যেদিন ইতুর মত স্লীভলেস হয়ে আসবো সেদিন আর আমাকে ভাল লাগবে না।

সোমনাথ শপথের মত করে বললে, আপনাকে কোনোদিনই কোনো সময়েই আমার খারাপ লাগতে পারে না।

শুনতে ভালই লাগলো নন্দিতার, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হল।

ও আবার কি যেন বলতে যাচ্ছিল। দেখলো নৌকোটা মুখ ঘুরিয়ে ঘাটে ভিড়বার চেষ্টা করছে। এখনি হয়তো ইতু-অতীশ নৌকো থেকে নেমে আসবে। ওদের নির্জনতা এক্ষুনি শেষ হয়ে যাবে।

যেন ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, শেষ কথাটা এখনি না বলে নিলেই নয় এমনি ভাবে সোমনাথ বলে উঠল, বলুন, বলুন, কবে দেখা হবে!

নন্দিতা বললে, আপনি কোথায় থাকেন?

সোমনাথ বললে, হস্টেলে ল' পড়ছি। অবশ্য একটা ব্যাঙ্কে চাকরিও করি।

নন্দিতা দেখতে পেল, ইতু এক পা এগিয়ে দিয়ে টাল সামলাতে সামলাতে নৌকো থেকে নামছে। তাই চাপা গলায় বললে, আমি আপনাকে ব্যাঙ্কে ফোন করবো।

সোমনাথ বললে, সেই ভাল। নম্বরটা লিখে রাখুন। একটা নম্বরেই শুধু আমাকে পাবেন।

নন্দিতা কাগজ খুঁজলো, সোমনাথ কাগজ খুঁজলো পকেট হাতড়ে। তারপর কলমটা সোমনাথের কাছ থেকে নিয়ে বললে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাঁ হাতের তালুতে নম্বরটা বড় বড় করে লিখে রাখলো নন্দিতা।

তারপর কলমটা ফেরত দিয়ে ফিসফিস করে বললে, আমাদের কথা কিন্তু কেউ জানবে না।

সোমনাথ সায় দিল।—এই দিনটাকে কেউ ছুঁতে পাবে না। এই দিনটা শুধু আমাদের কাছেই লুকোনো থাকবে।

বললো, কিন্তু ওব কেবল ভয় হতে লাগলো হাতের তালুতে লেখা ফোন নম্বরটা নন্দিতা না মুছে ফেলে। মনে মনে ভাবলো, নন্দিতা নিশ্চয় গাড়িতে উঠেই ওব ব্যাগের মধ্যে কোনো কাগজে লিখে রাখবে।

—সে কি রে, তোরা এখনো এখানে! ইতুর গলা শোনা গেল। নৌকো থেকে নেমে বালির চড়াই বেয়ে ও তখন উঠে আসছে।

অতীশ বললে, আমরা ভেবেছিলাম তোদের খুঁজেই পাব না।

নন্দিতা হঠাৎ যেন ব্যস্ত হয়ে উঠল।—তোদের কি কাণ্ড বল তো, নিশ্চয় অনেক রাত হয়ে গেছে।

ইতু তার কব্জিতে বাঁধা ঘড়ি দেখল। তারপর চমকে উঠে বললে, সর্বনাশ!

অতীশ বললে, রাখীরা কোথায়?

বালির ওপর ওরা দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করলো। এতক্ষণ ওদের সময় থেমে ছিল, এক লহমায় সমস্ত ব্যস্ততা যেন হুড়মুড় করে ওদের মাথার ওপর নেমে এল।

হাঁটতে হাঁটতে ওদের চারজনের চোখ দীপক-রাখীকে খুঁজলো।

ইতু চিৎকার করে ডাকলো, রাখী! রাখী!

কে যেন সাড়া দিল ব্রীজের ছায়ায় ভেজা অন্ধকার থেকে। অন্ধকারের গহ্বর থেকে ওরা উঠে এল। দূর থেকে দীপকের লম্বা শরীরটাকেও খুব ছোট্ট দেখালো।

ওরা তাড়াতাড়ি সবুজ দ্বীপটার দিকে পা বাড়ালো। এখন জ্যোৎস্না মেখে আকাশ নদী গাছ, সবুজ সবুজ ঘাস সবই হালকা ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটের একটা নরম ছবি হয়ে গেছে। হঠাৎ বদলে গেছে বিকেলের সেই চেনা জায়গাটা। সেই ছোট্ট সবুজ এখন একটা বিশাল প্রান্তর। দিনেব আলোর সেই কঠিন ইস্পাতের ব্রীজ এখন কালো তুলির নরম টান। গাছের

পাতার ফাঁক দিয়ে কালো কালো একটানা ঘাসের ওপর ছোপছোপ জ্যোৎস্নার পাপড়ি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে আছে।

দ্রুত পায়ে ফিরতে ফিরতে অতীশ বললে, ফ্যামিলি গ্রুপটা কখন চলে গেছে।

ইতু বললে, কেন, ঢিলে কুর্তার জন্য মন কেমন করছে ?

নন্দিতা কিছু বললো না। ওর শুধু ভয় করতে লাগলো। ও একটু আগেও দেখেছিল, হাইওয়ে থেকে নীচে নামার সরু রাস্তার বাঁকে হোগলা ছাউনীর কোন একটা দোকানে টিমটিম আলো জ্বলছিল। এখন সেটাও নিভে গেছে। শুধু মাঠেব মধ্যে সাদা গাড়িটা ফুটফুট করছে আলোয়।

রাখী আর দীপকরা ওদের কাছাকাছি এসে পড়লো।

রাখী বললে, ইতু, আজ নির্ঘাত জবাই হয়ে যাব বাড়ি ফিরে।

নন্দিতা অনুনয়ের স্বরে বললে, একটু তাড়াতাড়ি চলুন দীপকদা !

ইতু বললে, একটু স্পীডে চালাবেন, তা হলেই ঠিক পৌঁছে যাব।

দীপক চাবির রিংটা ঘোরাতে ঘোরাতে ঠাট্টার সুরে বললে, আমি তো ভাবছি, এই রাতটা এখানেই কাটিয়ে গেলে কেমন হয় ? শুধু ভয়, আর ভয়।

ইতু বললে, বাঃ রে বাঃ, সাহস তো আমাদেরই।

রাখী নন্দিতার সে-কথাই মনে হল। ছেলেরা কিচ্ছু বোঝে না। ওরা মনে করে, আমরা কেবল ভয় পাই, রাখী ভাবলো। বাধা-নিষেধের গণ্ডী থেকে ওরাই তো সাহস করে বেরিয়ে আসতে পারে। ভাবলো একবার বলে দীপককে, নিউ মার্কেটে হঠাৎ দেখা হয়ে যেতেই, কথা বলতে নিষেধ করেছিলে কেন ঠোঁটের ওপর আঙুল রেখে। না চেনাব ভান করে সরে গিয়েছিলে কেন ? সঙ্গে তোমার মা ছিলেন, এই তো। খুব সাহসী তুমি, খুব সাহসী।

কিন্তু এখন সে-কথা বলতে ইচ্ছে করলো না।

কারণ, রাখী জানে দীপকেব মন ভাল নেই। অথচ রাখী আজ ধরা দিতে চেয়েছিল, ওর মন ডুবে গিয়েছিল স্নিগ্ধ একটা ঘোরের মধ্যে। দীপক ওর বুকে-মুখে স্বীকৃতির স্বাক্ষর এঁকে দিতে চেয়েছিল। অন্তরঙ্গ হতে চেয়েছিল রাখী নিজেও। ঠিক সেই মুহূর্তে ভিখিরি ছেলেটা অন্ধকারে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। বাধা পেয়ে দীপক বোধহয় ভীষণ রেগে গিয়েছিল। দীপক ক্রুদ্ধ গলায় বলে বসলো, যা, যা। মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে ও তাকে তাড়াতে চাইলো। ছেলেটা তবু ইচ্ছে করে দাঁড়িয়ে রইলো। দীপক বললে, এক থাপ্পড় লাগাবো। যা শিগ্‌গির। ছেলেটার কি সাহস, বেঁকে দাঁড়িয়ে বললে, দিয়েই দেখুন না।

দীপক হঠাৎ রেগে গেল, চিৎকার করে বললে, চল তোকে পুলিশে দেবো।

ছেলেটা ভয় পেল, তবু পালালো না, ধীরে ধীরে বললে, পুলিশ আপনাদেরই ধরবে। বলেই ছুটে পালালো। সমস্ত মন তিক্ততায় ভরে গেল রাখীর, দীপকের। ওরা আর স্বাভাবিক হতে পারলো না। এখন দীপকের মুখেব দিকে তাকিয়ে ওর হাসি পাচ্ছিল।

অতীশ সিগারেট ধরালো একটা।

ইতু বললো, দিন না মশাই, একটা তো কেড়ে নিয়েছিলেন তখন। জোর করে একটা সিগারেট নিয়ে নিল ইতু। ধরালো। একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো।

রাখী এত দুশ্চিন্তার মধ্যেও হেসে উঠে বললে, অবাক করলি ইতু। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম, কাশতে কাশতে প্রাণ যায় আর কি।

ইতু বললে, স্কুলে একবার, মনে নেই ? থিয়েটার করতে গিয়ে ব্যারিস্টার সেজেছিলাম, স্টেজে দাঁড়িয়ে সিগারেট খেয়েছিলাম, বাবা চোখ গোল গোল করে দেখছিল।

সবাই হেসে উঠল।

ইতু আড়চোখে একবার অতীশের মুখের দিকে তাকালো। নৌকোয় একবার চেয়েছিল

ও। অতীশ দেয়নি। ফিসফিস করে বলেছিল, মাঝিটা কি ভাববে! খারাপ, খারাপ, ভীষণ খারাপ মেয়ে ভাববে ইতুকে, অতীশের সেটাই যেন আসল ভয়। ইতু জানে, অতীশের আসল ভয়, তা হলে অতীশের নিজেরই দাম কমে যাবে।

১৪

দীপক পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি। অথচ শরীরে কোথাও এতটুকু বাড়তি ভাব নেই, দিব্যি ছিপছিপে। আর তেমনি স্মার্ট। রাখী সে-তুলনায় একটু বেঁটে। একদিন ইতু-নন্দিতাকে সঙ্গে নিয়ে ওরা গড়ের মাঠে বেড়াতে এসেছিল, রাখী আর দীপক। পুলিশ আউটপোস্টের কাছে ঘাসের ওপর গাড়ি তুলে দিয়ে ওরা নেমে পড়েছিল। ইতু নন্দিতা নামেনি। ইতু বলেছিল, তোরা তো এখন কানে কানে মন্ত্র পড়বি কিংবা ঘাস চিবোবি। তোরা যা, আমরা আছি।

সেদিন রাখী আর দীপককে দূরে দূরে হেঁটে বেড়াতে দেখে খুব সুন্দর লেগেছিল ইতুর। রাখীর কাঁধের ওপর দিয়ে তার বুকের সামনে নেমে এসেছে দীপকের বাঁ হাত, আর রাখী ডান হাতে সেটাকে মুঠো করে ধরে খুব আস্তে আস্তে হাঁটছিল। ইতু সেদিন হেসে উঠে বলেছিল, দ্যাখ, দ্যাখ, ছোট হাতের টি-এর পাশে আই! রাখীকে একদিন দীপকের সামনে লিখেও দেখিয়েছিল। বলেছিল, এই দ্যাখ টি—মানে দীপকদা, পাঁচ ফুট নয়, এই মাথা কাটলাম, মানে হাতটা তোর কাঁধে…দীপক তখন হা হা করে হেসে উঠেছে। তারপর একটা আই লিখেছে ও টি-এর পাশে, মাথায় ফুটকি দিয়ে বলেছে, এটা তোর খোঁপা। রাখী রেগে গিয়ে বলেছিল, আমি ওর পাশে এমনি বেঁটে নাকি? তা অবশ্য নয়, তবু ওরা ইতুকে 'লম্বিতা' বলে ঠাট্টা করতো বলেই ইতু সুযোগ পেলেই রাখীকে বেঁটে বলতো। রাখী শেষ অবধি বলতো, তা নয়, বরং বল দীপকের বেশ ম্যানলি চেহারা।

চাবির রিংটা ঘোরাতে ঘোরাতে দীপক যখন গাড়ির কাছে গেল, তখন ওকে আরো ম্যানলি লাগলো। যত দেরিই হয়ে থাক, রাখীর মনে হলো, এই মানুষটার ওপর নির্ভর করা যায়। ইতু নন্দিতারও মনে হল, দীপক যখন আছে তখন ঠিক সময়মত বাড়ি পৌঁছে যাবো।

ওদের সকলেরই মন ভরে ছিল। সমস্ত দিনের হৈ-হুল্লোড় আনন্দ, তার পরেও হঠাৎ কিছু পেয়ে যাওয়ার, খুঁজে পাওয়ার পরিতৃপ্তিতে সব কটা মুখই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। কিছুটা বা তৃপ্তিতে ক্লান্ত।

আর চাবির রিংটা যেভাবে আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দীপক দরজার কাছে এগিয়ে গেল, যেন বলতে চাইলো, এই চাবিটাই আজকের এই পিকনিকের আনন্দের, আজকের এই তৃপ্তির ঘরের চাবি।

দরজা খুলে স্টিয়ারিঙের সামনে গিয়ে বসলো দীপক। হাত বাড়িয়ে ওদিকের দরজার লক খুলে দিল। রাখী এবার নিজের থেকেই গিয়ে বসল দীপকের পাশে। তার পাশে ইতু।

দীপক আড় চোখে চেয়ে নিয়ে হেসে উঠল। বললে, অতীশ তুইও সামনে চলে আয়।

ইতু কোনো কথা বললো না, রাখীকে চুপিচুপি একটা চিমটি কাটলো; আর নন্দিতা সোমনাথ পিছনে বসে পরস্পরের সঙ্গে চোখাচোখি করে ঠোঁট টিপে হাসল। তারপর নন্দিতা বললে, সামনে তিনজন পিছনে তিনজনই তো ভাল হতো।

ইতু হেসে উঠে বললে, ভাগের অঙ্ক তুই ভালই জানিস দেখছি। কিন্তু জীবনটা শুধু ভাগ নয়, বুঝলি।

সোমনাথ হাসল। বোধহয় নন্দিতার পক্ষ নেবার জন্যেই বললো, পিকনিকটা কি জীবন

নাকি ?

রাখী উত্তর দিল। হেসে বললে, জীবনটাই তো একটা পিননিক। পিকনিকের মত করে নিতে জানলেই হয়। রাখীর কথার মধ্যে তার উচ্ছল আনন্দটুকু প্রকাশ হয়ে পড়লো।

ইতুর হাতে তখনো সিগারেটটা জ্বলছে। আসলে ও সিগারেটটা নষ্ট করছিল। হুস্‌হুস্ করে টানছিল হুস্‌হুস্ করে ধোঁয়া ছাড়ছিল অতীশের চুলে। একবার দীপকের মুখের দিকে ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বললে, চটপট মশাই, চটপট। এর পর আর বাড়িতে ঢুকতেই দেবে না।

দীপক কোন কথা বললো না। ওর মন ভারী হয়ে ছিল। সেই ভিখিরি ছেলেটা কোথাও আছে কিনা দেখল। তারপর কাচ নামালো গাড়ির।

ওরা কেউই বুঝতে পারেনি। কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে রাখী দীপকের মুখের দিকে তাকালো। দীপক কোন কথা বললো না।

—কি হল ? রাখী হঠাৎ বলে উঠল।

অতীশ বোধহয় দরজাটা ভাল করে বন্ধ করার জন্যে আবার খুললো। সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠলো ভিতরে। আর অতীশ দীপকের মুখের দিকে তাকালো। দীপকের মুখ তখন সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে বদলে যাচ্ছে। ক্রমাগত স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছে দীপক, স্টার্ট নিচ্ছে না।

দেখতে দেখতে দীপকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, কপালে ঘাম জমতে শুরু হল ওর। একটা প্রচণ্ড ভয়ের ছাপ পড়লো দীপকের মুখে।

—স্টার্ট নিচ্ছে না রে অতীশ। একটা বিধ্বস্ত মানুষের গলায় দীপক বলে উঠল। দীপককে এতখানি অসহায় ওরা কখনো দেখেনি।

স্টার্ট নিচ্ছে না। একটি মাত্র কথা। ছ'টি মানুষ এতক্ষণ একটি আনন্দের ফোয়ারা হয়ে উঠেছিল। একটি মাত্র কথায় তারা পরস্পর থেকে ছিটকে সরে গিয়ে ছ'টি পৃথক মানুষ হয়ে গেল। ছ'ছটি ব্যক্তিগত সমস্যা, ছ'ছটি স্বার্থ।

রাখী প্রথমটা বিশ্বাস করেনি। ও ভেবেছিল, ঠাট্টা।

রাখী হতাশ ভাবে বলে উঠল, তা হলে কি হবে ?

রাখী ঘড়ি দেখলো, ইতু ঘড়ি দেখলো। নন্দিতা সোমনাথের মুখের দিকে তাকালো।

বিভ্রান্ত গলায় দীপক বলে উঠল, কি করা যায় বল তো অতীশ।

অতীশের মন তখনো তৃপ্তিতে টইটম্বুর, ব্যাপারটার গুরুত্ব তখনো ও বুঝে উঠতে পারেনি।

ও হেসে উঠে বললে, কি আর করবি, বনেট খুলে ফেল। দেখেছি গাড়ি খারাপ হলেই সকলে বনেট খুলে ফেলে।

ইতু স্তম্ভিত হয়ে গেল অতীশের রসিকতায়।

দীপক গম্ভীর গলায় বললে, না রে, হাসি নয়।

তিন তিনটি সুখী প্রেম মুহূর্তে অশুভ আতঙ্ক হয়ে গেল।

সত্যি সত্যি নেমে পড়ে দীপক বনেট খুললো। রাখী ইতু নন্দিতারা তখনো আশায় আশায় বসে রইলো। ঘন ঘন ঘড়ি দেখল।

অতীশ বললে, তোকে তখনি বলেছিলাম, মেকানিজম শিখে নে।

দীপকের সমস্ত মন তখন একটা ক্ষ্যাপা কুকুর। অতীশের কথায় ও ভিতরে ভিতরে রেগে গেল। কিন্তু কোন কথা বললো না। মেকানিজম শিখে নে। যেন ষোল-আনা মোটর মেকানিক না হয়ে গাড়ি চালানো যাবে না। ওর মনে হল রাখীর সামনে, ইতু নন্দিতার সামনে অতীশ ওকে ভীষণ ছোট করে দিল। রাখীর সামনে সেই ভিখিরি ছেলেটার কথায় ও যেমন ছোট হয়ে গিয়েছিল।

বনেট খুলে আধো আলো আধো অন্ধকারে সেই জটিল যন্ত্রপাতির মধ্যে অসহায়ের মত উঁকি দিল দীপক। ব্যাটারির কানেকশন দেখল, ডিস্ট্রিবিউটরের প্লাগগুলো ঠেলে দিল। ফিরে এসে আবার স্টার্ট দেবার চেষ্টা করলো। —বোধহয় কার্বরেটরে গোলমাল। নিজের মনেই বললো দীপক।

রাখী তখন কিছু দেখছে না, কিছু শুনতে পাচ্ছে না। ভয়ে ভাবনায় ওর তখন চোখ ঠেলে জল আসছে। বাড়ি, বাড়ি, সমস্ত মন জুড়ে ওর তখন একটাই ভাবনা। বাড়ি ফিরতে হবে।

রাখী হঠাৎ কান্নার গলায় বলে উঠল, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বিব্রত দীপক দুটো ক্রুদ্ধ চোখের দৃষ্টিতে রাখীর দিকে তাকালো, কোন কথা বললো না।

অতীশ বললে, আমরা ঠেলে দিই বরং।

সেই ভাল। দীপক গিয়ে স্টিয়ারিঙে বসলো। ক্লাচ টিপে বসে রইলো গীয়ার টেনে। রাখী ইতু নন্দিতা অতীশ সোমনাথ—সকলে মিলে প্রাণপণে ঠেলতে লাগলো গাড়িটা। আর মাঝে মাঝে ক্লাচ ছেড়ে স্টার্ট নেবার চেষ্টা করলো দীপক। একবার যেন স্টার্ট নেবার মত শব্দ হল, কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড মাত্র।

যেটুকু আশা দেখা দিয়েছিল আবার দপ্ করে তা নিভে গেল।

দীপকের মনে হল গাড়িখানা যেন জগদ্দল পাথরের মত তার মাথার ওপর চেপে বসেছে। গাড়িটা ঠেলে হাইওয়েতে তুলতে পারলেও হয়তো কারো সাহায্য পাওয়া যেত। কিন্তু অতখানি চড়াই ঠেলে তোলাও যাবে না।

সকলেই চুপ করে ছিল, কেউ কোন কথা বলছিল না। শুধু রাখী ইতু নন্দিতা পরস্পরের সঙ্গে চোখ চাওয়াচাওয়ি করে সান্ত্বনা খুঁজলো। কেউ কাউকে সান্ত্বনা দিতে পারলো না।

ভেঙেপড়া মানুষের মত দীপক গাড়ির ওপর এক হাত রেখে মাথা নোয়ালো। একটা মুষড়ে পড়া হতাশ মানুষের মত তুচ্ছ লাগলো ওকে।

বিভ্রান্তভাবে ও শুধু বললে, একটা মেকানিক পেলে হতো।

অতীশ বললে, চল্ সোমনাথ, ব্রীজের ওদিকে কোথাও যদি…

অতীশ আর সোমনাথ ব্রীজের দিকে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই নন্দিতা বললে, আমার বড় ভয় করছে রাখী।

রাখীর নিজেরও ভয় করতে লাগলো। দীপক একা, আর ওরা তিনজন—এই অন্ধকারে, নির্জনে। এখন আর দীপকের ওপর নির্ভর করতে পারছে না রাখী। রাখীর মনে হল দীপক ভীষণ স্বার্থপর. ও কেন বলছে না, 'তোমরাও ওদের সঙ্গে যাও'। ওদিকে তবু লোকজন চলাচল করছে। অলো আছে।

রাখী নিজেই হঠাৎ বলে উঠলো, আমিও ওদের সঙ্গে যাই।

ইতু বললে, আমিও।

নন্দিতা বললে, আমিও।

দীপকের হঠাৎ মনে হল, এরা সকলেই যেন ওকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে পালাতে চাইছে। এমন কি রাখীও।

অতীশ একবার ভাবলে সোমনাথকে বলে, তুই থাক। কিন্তু পরক্ষণেই ওর ভয় হল, এই অচেনা জায়গায় এত রাত্রে ও একা, সঙ্গে তিনটি মেয়ে…

—না না, আপনাদের একজনকেও আসতে হবে না। প্রায় আদেশের সুরে অতীশ বললে।

ইতু মনে মনে বললে, স্টুপিড।

নন্দিতা আবার বললে, আমার ভীষণ ভয় করছে অতীশদা।

অতীশ আর সোমনাথ কোন কথা বললো না, দ্রুত পায়ে ওরা হাইওয়েব দিকে, ব্রীজটার দিকে এগিয়ে গেল।

রাখী ইতু নন্দিতা ধীরে ধীরে গাড়িটার কাছ থেকে, দীপকের কাছ থেকে একটু দূবে সরে এসে ব্রীজটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওদের মনে হল অতীশ আর সোমনাথ অত্যন্ত ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে। ওরা দৌড়চ্ছে না কেন ? ওরা ছুটে গিয়ে একজন মেকানিক ডেকে আনছে না কেন ?

এসে ব্রীজটার দিকে তাকিয়ে রইলো। ওদের মনে হল অতীশ আর সোমনাথ অত্যন্ত ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে। ওরা দৌড়চ্ছে না কেন ? ওরা ছুটে গিয়ে একজন মেকানিক ডেকে আনছে না কেন ?

রাখী ফিসফিস করে বললে, ইতু, কি করি বল তো ?

নন্দিতা বললে, নিশ্চয় কোন বাসটাস পাওয়া যায়।

ইতু বললে, এর পর বাড়ি ফিরলে সাংঘাতিক কিছু ভেবে নেবে।

১৫

বইয়েব ভাষায় যাকে বলে মনোরম, দিনের বেলায় জায়গাটা ছিল তাই। সবুজ ঘাস, লাল টগব, নদীর ওপর নৌকো। রাত্রে চাঁদের আলোয় সুন্দর, আরো সুন্দর। অথচ এখন আর কেউই সেসব দেখছে না, কারো সেদিকে চোখ নেই।

রাখী যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে ইতুদের কাছে জায়গাটার বর্ণনা দিয়েছিল, ইতু ওর পিঠে প্যাট করার মত মৃদু চাপড় মেরে বলেছিল, থাম্ থাম্, সব সুন্দর আসলে চোখে। তোর চোখ এখন সবকিছুই সুন্দর দেখবে।

রাখীর হঠাৎ এক ঝলকে সেই কথাটা মনে পড়লো। এখন এই পিকনিকের মাঠ ওর কাছে অসহ্য লাগছে। এই সবুজ দ্বীপ সত্যি সত্যি দ্বীপ, এখান থেকে উদ্ধার পেলেই বাঁচি। আর এত যে জ্যোৎস্না উপছে পড়ছে, ঠাণ্ডা হাওয়া, অথচ রাখীর সাবা শরীর চিড়বিড় করছে। রাখীর নিজেরই মনে হল ও বোধহয় ভিতরে ভিতরে ঘেমে উঠেছে। এখন আর কোন কিছু দেখার চোখ নেই ওর।

একদৃষ্টে ব্রীজের দিকে তাকিয়ে আছে রাখী। কখন অতীশ আর সোমনাথকে দেখা যায়। কখন তাদের সঙ্গে কালিঝুলি মাখা কোন মেকানিকের মুখ দেখতে পাওয়া যায়। তার চেয়ে আনন্দেব দৃশ্য এখন আর কিছু নেই।

দীপক চুপচাপ বনেটের ওপর বসে আছে। সিগারেট টানছে একমনে। যেন মোটরকারটা'ই সব, আর কারো বিষয়ে কিছু চিন্তা করার নেই।

এখানে একটু দূরে ওরা তিনজন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাবনায় ভয়ে কারো মুখে কথা নেই। শুধু থেকে থেকে রাখী ঘড়ি দেখছে, ইতু ঘড়ি দেখছে। এর পর মিস্ত্রী পেলেও ওরা কখন পৌঁছবে কে জানে। অথচ দীপককে সে-কথা বলতেও সাহস হচ্ছে না।

ইতু ধীরে ধীরে বললে, একটা বাস-টাস পাওয়া যায় কিনা দেখলে হতো !

একথা রাখীর আগেই মনে হয়েছে। কিন্তু মুখ ফুটে দীপককে বলতে পারেনি। দীপক হয়তো ভাববে রাখী স্বার্থপব। এখন আর তা মনে হচ্ছে না। এখন দীপককেই মনে হচ্ছে—মনে হচ্ছে ঐ গাড়িটার জন্যে ওর যতখানি দুশ্চিন্তা, তার কানাকড়িও নেই রাখীর জন্যে। ও নিজে থেকেই কেন একথা ভাবছে না।

—অতীশ ফিরলে তুই বলিস ইতু। না, না, আমিই বলবো। রাখী চাপা গলায় বললে।

আর ইতু নার্ভাস হাসি হাসল।—এরপর বাড়ি ফিরলে স্রেফ কিমা করে দেবে। কুপিয়ে কুপিয়ে কাটবে ভাই। ইতু আবার হেসে উঠল, কিন্তু এটা ঠিক হাসি নয়।

তারপর একটু থেমে বললে, এখানেও হতে হবে হয়তো, গুণ্ডাদের হাতে পড়ে।

নন্দিতা বললে, আমার ভীষণ ভয় করছে রে।

সকাল বেলাকার ঘটনা মনে পড়ে রাখীর আরো ভয় হল। ভাবলে, মা পিসীমার সঙ্গে ঝগড়া না করলেই হতো। 'তোকে দেখতে আসবে।' পিসীমার গলার স্বরটাও কেমন পুরুষালি। একটুও মিষ্টি করে কথা বলতে পারে না।

রাগের মাথায় একদিন ইতুকেও বলে ফেলেছিল।—এই পিসীমাটা ভাই কোত্থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে। যদ্দিন থাকবে, না জ্বালিয়ে ছাড়বে না।

পিসীমাকে নিয়ে ওর আর এক সঙ্কোচ। কোন রুচি নেই পোশাকে-আশাকে, কথা বলে কাটা কাটা। কাকে কখন কি বলে বসে সেই এক ভয়। কলেজের মেয়েরা কেউ হঠাৎ ওকে ডাকতে গেলে তাদের বাড়িতে এনে বসাতে ইচ্ছে করে না। পাছে পিসীমাকে দেখে ফেলে। পিসীমাকে বিশ্বাসও নেই, হয়তো রাখীকে যেসব কথা বলে, ওর ব্লাউজের ছাঁট নিয়ে, ওর শাড়ি পরার ধরন দেখে, হয়তো বন্ধুদেরও তেমনি কিছু বলে বসবে। রাখীর সবচেয়ে ভয় কলেজের মেয়েরা হয়তো সেজন্যে রাখীকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। এমনিতেই তো ওরা রাখীর ওপর হিংসেয় জ্বলে। নিরঞ্জনকে জড়িয়ে অপবাদ ছড়াতেও ছাড়েনি।

ইতু হঠাৎ বললে, আমার কি ভয় হচ্ছে জানিস ? বাড়িতে হয়তো থানাপুলিশ করে বসবে, হাসপাতালে খুঁজবে। ভাববে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে।

ভয় থেকে রাখীর শেষ অবধি বাড়ির ওপরই রাগ হতে লাগলো। ও বললে, তুই আদুরি, তোর কথা অন্য। আমার জন্যে তাও ভাববে না।

বাড়ির ওপর ঐ এক অভিমান রাখীর। দাদা কিংবা ছোট ভাইটা দেরী করে ফিরলে মার ভাবনা, কোন দুর্ঘটনা না ঘটে। ফিরে এলেই মা নিশ্চিন্ত, তখন মা'র ধমক যেন পিঠে হাতে বোলানো। আর রাখী দেরী করলেই সকলের এক সন্দেহ। মেয়ে নিশ্চয় অন্যায় করছে, খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয় কোন বাজে ছেলের পাল্লায় পড়েছে। রাখীর নিজের যেন কোনই বুদ্ধিসুদ্ধি নেই। অথচ ও জানে, মা নিজেই বোকা। একবার তো রেগে গিয়ে আরেকটু হলে বলেই ফেলতো। সে-কথা মনে পড়লে ওর এখন হাসি পায়।

ইতুকে বড় হয়ে বলেছিল, সে কি ভয়, কি ভয়। বলতে গিয়ে হেসে লুটোপুটি।

মণ্টুমামা বলতো তাঁকে, মা ভাবতো খুব ভাল লোক। রাখীর তখন কতই বা বয়েস—ষোলো সতেরো। মা'র চোখের সামনেই ওকে কাঁধে হাত দিয়ে কাছে টেনে নিতো। খুব আহ্লাদী আহ্লাদী কথা বলতো। কিন্তু রাখীর বেশ মনে আছে, কণ্ঠার ওপর তিনটে আঙুল একদিন স্থির থেকেও এমন সব কথা বলতে চেয়েছিল যে, রাখীর সমস্ত শরীর থর থর করে কেঁপে উঠেছিল। ও ভীষণ ভয় করতো, ও ভিতরে ভিতরে লজ্জায় মরে যেত, অথচ কিছু বলতে পারতো না। পাছে মা বুঝতে পারে—সে যেন ওরই লজ্জা। তারপর বড় হয়ে একদিন এক ঝটকায় হাতটা নামিয়ে দিয়েছিল। মণ্টুমামা আর বেশি সাহস পায়নি।

ইতু শুনে খুব হেসেছিল। বলেছিল, আমার তো গুনে শেষ করা যাবে না। সব এক রে, সব এক। অথচ বাবা-মার যত ভয়, বাইরে কোথাও প্রেম করছি কি না।

বাড়ির ওপর রাগ সেজন্যেই আরো বেশি হয়। কিন্তু এখন আর রাগ নয়, জ্বালা নয়, এখন শুধু ভয়।

নন্দিতা ধীরে ধীরে বললে, ফিরছে না কেন বল তো!

ইতু হাসবার চেষ্টা করে বললে, বোধহয় অগস্ত্য-যাত্রা।

রাখী কিছু বললো না। ও শুধু বাড়ির দৃশ্যটা কল্পনা করার চেষ্টা করলো। 'কেন আবার, তোকে দেখতে আসবে।' পিসীমার কথাটা মনে পড়তেই রাখীর মনে হল, সমস্ত বাড়িটা এখন নিশ্চয় থমথম করছে। ফিরে গেলে হয়তো একটা কথাও বলবে না কেউ। কাল হয়তো চোখের জল মুছতে মুছতে পাত্রপক্ষের সামনে বসতে হবে। রাখী ভেবে রেখেছিল, রাগারাগি করে, কোন একটা খুঁত বের করে বলে বসবে, ওখানে আমি বিয়ে করবো না। কিন্তু এখন আর সে-উপায়ও রইলো না। আজকের এই দেরী করে বাড়ি ফেরাই হয়তো কাল হল। মেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার প্রমাণ হাতে হাতে।

অথচ সবকিছুর জন্যে দীপক দায়ী। ও বলে ফেললো, একটা ভাঙা গাড়ি এনে কি বিপদেই না ফেললে।

চোখের সামনে সেই নতুন ফিয়েটখানা ভেসে উঠল। ফ্যামিলি গ্রুপের সেই গাড়িখানাও তো দিব্যি চলে গেছে।

ইতু সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো।—ও বেচারীর কি দোষ বল্। গাড়িটা তো আর সত্যি ভাঙা নয়। একটু পুরোনো মডেল, এই যা।

রাখী এখন আর দীপকের হয়ে কারো ওকালতিও সহ্য করতে পারছে না। ও চাপা গলায় ফিসফিস করে বললে, স্বার্থপর, স্বার্থপর। কেন, ও আমাদের কথা ভাবতে পারতো না? গাড়িটা ফেলে রেখে বাসটাস পাওয়া যায় কিনা খুঁজতে যেতে পারতো না? মেকানিক, মেকানিক খোঁজো। শেষের কথাটা ও যেন ভেংচি কেটে বলে উঠল।

আর সঙ্গে সঙ্গে নন্দিতা বলে উঠল, ঐ বোধহয় আসছে।

রাখী আর ইতু ব্রীজের দিকে তাকালো ঝট্ করে। একটা মাল বোঝাই লরী গুম্ গুম্ আওয়াজ তুলে ব্রীজ পার হচ্ছে। আর পিছনে ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আসছে দুটি মানুষ। ওরা ভাল করে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করলো। জ্যোৎস্নায় ভিজে ব্রীজটাকে একটু আগেও কত সুন্দর লাগছিল। এখন নির্জন শূন্যতা। হ্যাঁ, বোধহয় অতীশ আর সোমনাথ। ওরা দুটি প্রাণী ব্রীজের শূন্যতাকে যেন আরো বাড়িয়ে দিয়েছে।

ইতু বললে, মেকানিক পায়নি।

যেটুকু আশা ছিল, তাও যেন ফুঁ দিয়ে কে নিভিয়ে দিল।

রাখী বলে উঠল, কি হবে বল তো ইতু!

মনে হল নন্দিতার চোখে জল টলমল করছে।

রাখী ইতুকে টানতে টানতে দীপকের কাছে চলে গেল।—এই, ঐ দ্যাখো, মেকানিক পায়নি। তোমরা কেউ একজন চলো, বাসটাস যদি পেয়ে যাই···

দীপক ব্রীজের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ও এতক্ষণ ওদের জন্যেই অপেক্ষা করেছে। ভেবেছে, ওরা ফিরে এলেই ঠিক এই কথাটা ও নিজেই বলবে। বলবে, সোমনাথের সঙ্গে গিয়ে দ্যাখো বাস পাওয়া কিনা। কিন্তু সেই কথাটা রাখীর মুখ থেকে শুনে ওর মনে হল ইতু নন্দিতার কাছে রাখী ওকে ছোট করে দিল। এরপর অতীশ আর সোমনাথের কাছেও ও ছোট হয়ে যাবে।

রাখীর ভালবাসা ছিল ওর গর্ব। এরপর অতীশ হয়তো ঠাট্টা করে বলবে, জানা আছে, জানা আছে, তুই আর গর্ব করিস না দীপক। তোকে ফেলে তো দিব্যি কেটে পড়লো।

অথচ দীপক নিজেই বরং মহত্ত্ব দেখানোর সুযোগ পেত। রাখী ভাবতো, কি ভাল!

রাখীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো দীপক। রূঢ় গলায় বললে, আমি তো শালা ট্যাক্সি ড্রাইভার। ব্রেকডাউন হয়েছে, অন্য ট্যাক্সির গলা জড়িয়ে ধরে চলে যাবে, তার আবার বলার কি আছে!

১৬

অতীশের মন খুব খুশি-খুশি ছিল। তাই একটু আগেই ওর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা রক্ত ছড়িয়ে লাল গোলাপ ফুটিয়েছিল।

ইতুকে প্রথম যেদিন দেখেছিল দীপকদের সঙ্গে, সেদিনই ওর মনে হয়েছিল ওই বেসুরো বাঁশিটাই আমার চাই। তারও আগে একদিন রাখী বলেছিল, 'ইতুকে তো দেখেননি, দারুণ ফীগার। তবে ওকে শায়েস্তা করা অত সহজ নয়।' যেদিন আলাপ করলো, সেদিন অতীশকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি ঠিক বলিনি ?'

'হাস্য, লাস্য, অনেকখানি প্রগলভতা, আর কিছুটা শিঙ বাগানো বাছুর', রাখীকে বলেছিল অতীশ। ইতুর আড়ালে। আর দীপককে বলেছিল, 'ভিজে সাবানের মত মেয়ে, ধরতে গেলেই পিছলে যাবে।' কিন্তু তার পরও ও ইতুকে যতবার দেখেছে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠেছে।

তাই আশা ছেড়েই দিয়েছিল। শুধু সঙ্গে থাকার আনন্দটুকুই ভেবেছিল যথেষ্ট। অভিনয় শেষ অবধি সত্যি হয়ে যাবে, এত সহজে ধরা দিয়ে অতীশকে অবাক করে দেবে, ও ভাবতেই পারেনি। আবো কিছুক্ষণ, আরো কিছুক্ষণ। অতীশ চাইছিল ফেরার সময়টা আরো খানিকটা পিছিয়ে যাক্। না-হলে বুকের মধ্যে ফুটে ওঠা লাল গোলাপ যেন স্বপ্ন হয়ে মিলিয়ে যাবে।

কিন্তু তাব আগেই কব্জিতে বাঁধা বড ঘড়িটার দিকে চট্ করে তাকিয়ে নিয়ে ইতু বলে উঠেছে—সর্বনাশ। বাড়ির চাকরি বোধহয় রইলো না।

—আর একটুক্ষণ প্লীজ। অতীশ ইতুর হাতে চাপ দিয়ে অনুরোধ করেছে।

ইতু হেসে উঠেছে।—কি ছেলেমানুষি দ্যাখো, আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি, আমি তো রইলামই। কিন্তু আজ. দেখেছো ঘড়িটা ? কব্জিটা তুলে দেখিয়েছে অতীশকে।

তখন নৌকোটা ঘাটে না ভিড়োতে বলে আর উপায় নেই। কিন্তু নৌকো যখন ঘাট ছুঁয়েছে তখন ইতু বলেছে, আমি যা একটা মজা করি না, কেউ ধরতে পারে না।

—কি মজা ?

—যেদিনই দেরী হবার ভয় থাকে, লুকিয়ে লুকিয়ে দেয়ালের ঘড়িটার কাঁটা পনেরো মিনিট পিছিয়ে রেখে আসি। বলে হেসে ফেলেছে ইতু।

অতীশও হেসেছে।—এক নম্বরের বিচ্ছু তুমি।

ইতু ওকে একটা চিমটি কেটেছে।—বিচ্ছু !

অতীশের মন তাই বেশ খুশি-খুশি ছিল। কিন্তু গাড়িটা খারাপ হয়েই ওর মেজাজও বিগড়ে গেল। না, বোধহয় শুধু সেজন্যে নয়। ওর মনে পড়লো, নৌকোতে ইতু একবার সিগারেট চেয়েছিল। অতীশ দেয়নি। মাঝি অবশ্য ওদের চেনে না, কোনদিন আর দেখাও হবে না, তবু ইতু সিগারেট খাচ্ছে দেখলে কি না কি ভেবে বসবে এই ভয়ে দেয়নি। ইতু ঠিক বুঝেছে। বলেছে, মাঝিটা খারাপ ভাববে বলে ? তারপর চাপা গলায় বলেছে, আমি তো খারাপই।

সবই বোঝে ইতু, তবু পাগলামি করতে ছাড়বে না। সেই শেষ অবধি সিগারেট ধরালো দীপকদের সামনে ; বেশ মজা লাগছিল সত্যি, কিন্তু যে-ভাবে হুসহুস করে ধোঁয়া ছাড়লো, যেন স্টেট বাসের একজস্ট পাইপ। সত্যি মাঝে মাঝে খায় কিনা সন্দেহ হয়েছে।

ব্রীজের ওপর দিয়ে মেকানিকের খোঁজে যেতে যেতে অতীশ হঠাৎ বললে, ইতুটা কিন্তু বেশ স্পোর্টিং, না ?

সোমনাথ এড়িয়ে যাবার মত উত্তর দিল, হুঁ।

অতীশ অবশ্য উত্তরটা শুনতেও চায়নি। ব্রীজের রেলিং ছুঁয়ে ছুঁয়ে ও হাঁটছিল যেন ঐ রেলিঙে ইতুর ছোঁয়া লেগে আছে। আজই বিকেলে এখানে হাত ধরাধরি করে ও আর ইতু হেঁটে বেড়িয়েছে, গা ঘেঁষাঘেঁষি করে রেলিঙে ভর দিয়ে নদী দেখেছে, নৌকো দেখেছে। আর ইতু বলেছে, ওরা কি ভাবছে বলুন তো ? ভাবছে ইতুটা দারুণ জমিয়েছে ! বলে হেসে উঠে ইচ্ছে করে অতীশের গায়ে ঢলে পড়েছে।

সেই সব কথা মনে পড়তেই অতীশ ভাবলো, ওটা অভিনয়। আসলে অতীশ হয়তো বুঝতে পারেনি, কিন্তু ইতুর নিশ্চয় তখন থেকেই ওকে ভাল লেগেছে। তা না হ'লে অত সহজে কোন মেয়ে ধরা দেয় নাকি, অমন হঠাৎ ? 'আমি তো খারাপ !' দু দুবার বলেছে ইতু, আর সেজন্যে মনের মধ্যে একটু খিচখিচ রয়েই গেছে। সত্যি বলছে কিনা কে জানে। নাঃ, সত্যি হ'লে কি আর বলতো ? অতীশ নিজের মনেই হেসে ফেললো। গোলি মারো, অন্য সব মেয়েরা যেন কত ভাল।

অতীশের হঠাৎ একবার ইচ্ছে হল, মেকানিক-টেকানিক যদি না পাওয়া যায়, বেশ হয়। আজকের রাতটা যদি ওরা আটকে পড়ে…ও যা মেয়ে, ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিয়ে বাড়ি থেকে বেরোয়, ও নির্ঘাত ম্যানেজ করে নেবে। কিন্তু পরক্ষণেই ভয় হল, শেষে সবই না যায়। বাড়িটা কেমন তা তো বোঝা যাচ্ছে না, মেয়েদের যত দুঃসাহস তো সন্ধে অবধি ; শেষে বাড়ি থেকে বেরোনোই হয়তো বন্ধ হয়ে গেল।

ও যা ভেবেছিল তাই।

ওদের ফিরতে দেখে রাখী আর ইতু যেভাবে শুকনো মুখে এগিয়ে এল, 'কি হল মিস্ত্রী ?' বলে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো, তাতেই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে আর অসুবিধে হল না।

নিজের জন্যেও চিন্তা হচ্ছিল অতীশের। বৌদি নিশ্চয় খাবে না। দেরী করে ফিরলে প্রায়ই তো খায় না। খাবার ঢেকে রেখে মাদুর বিছিয়ে ঘুমোয়। একদিন তো দাদাকে পাঠিয়েছিল খালসা হোটেল থেকে আপিসের বন্ধুদের ফোন করতে। আজ আবার তেমনি কাণ্ড করে একটা সীন ক্রিয়েট করে না বসে বৌদি।

—কি হবে তা হ'লে ? আর কিছু ব্যবস্থা করা যায় না ? একটুখানি আশা পাবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে বলে উঠল রাখী।

পাঁচজনকে জিজ্ঞেস করে অনেক খোঁজাখুজি করে একজন মেকানিকের বাড়ি পেয়েছে ওরা। কিন্তু মিস্ত্রী কাজ থেকে ফেরেনি তখনো। তার জন্যে অপেক্ষাও করতে পারেনি ; শুধু তার ছেলেকে বলে এসেছে পাঠিয়ে দিতে।

রাখী ইতু নন্দিতা তিনজনই ভিড় করে এল, যেন তিনটি ভয় পাওয়া হাঁস পুকুর থেকে উঠে পড়েছে। অতীশ তাকিয়ে দেখল ওদের মুখে চোখে কোথাও কোন প্রেম নেই। শুধু উৎকণ্ঠা।

ইতু বললো, চল্ চল্, দেখি কিছু পাওয়া যায় কিনা।

অতীশের খুব মায়া হল ইতুর মুখের দিকে তাকিয়ে। তবু বলতে হল, লাস্ট ট্রেন এইমাত্র চলে গেছে, ফিরে এসে খবর দেবার আর সময় ছিল না।

ইতু হতাশায় ভেঙে পড়ে বললে, আমরা তখনই সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম।

রাখী আগুনের চোখ নিয়ে ফিরে তাকালো দীপকের দিকে। স্বার্থপর, স্বার্থপর ! মনে মনে বললে।

নন্দিতার গলা ভিজে গেল।—তা হ'লে কি হবে ?

বাস নেই, ট্রেন নেই। এখন একমাত্র উপায় অপেক্ষা করা। মেকানিক যদি এসে হাজির

হয়। না এলে আবার একবার খোঁজ নিতে যাবে অতীশ।

দীপক অতীশ সোমনাথ গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে চুপচাপ। মাঝে মাঝে ব্রীজের দিকে আশায় আশায় তাকাচ্ছে।

দীপক প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে প্যাকেটটা ফেলে দিল।—সিগারেটও শেষ, নিয়ে এলে পারতিস।

অতীশ বললে, চারমিনার আছে। বলে নিজেই সিগারেট বের করে ধরাতে গেল। দুটো কাঠি ছিল, হাওয়ায় নিভে গেল দুটোই। শেষে দীপকের সিগারেট থেকে ধরিয়ে নিলো। কাঠি বাঁচাতে হবে। ওর হঠাৎ মনে পড়লো, বিকেলে বসে বসে ওর দেশলাই নিয়ে ইতু একটার পর একটা কাঠি জ্বেলে নষ্ট করেছিল। অকারণ দেশলাই জ্বালা কি যে খেলা অতীশ বোঝে না। এখন সে-কথা মনে পড়তেই ইতুর ওপর বিরক্তি বোধ করলো।

দীপকও তিক্তবিরক্ত হয়ে ছিল। নিজের মনেই বললে, বাজে শখ সব, পিকনিক করতে যাবো!

ইতু নন্দিতা রাখী তিনজনে তখন আরেকটা দল হয়ে গেছে। দীপকদের কাছ থেকে বেশ খানিকটা দূরে ওরা তখন ফিসফিস করে নিজেদের দুশ্চিন্তা, ভয়, হতাশার কথা বলছে। দীপক কি বিচ্ছিরি, রুড। ছোটলোক, ছোটলোকের মত কথাবার্তা। ভদ্রভাবে বলা যেত না? অন্য ট্যাক্সির গলা জড়িয়ে ধরে! যেন বাড়ি ফেরা মানে অন্য লোকের সঙ্গে প্রেম করা। এই নোংরা সন্দেহ থেকে কিছুতেই যেন বেরিয়ে আসতে পারছে না দীপক! কলেজের ছেলে-বন্ধুদের সঙ্গে যেদিন আলাপ করিয়েছিল কি বিচ্ছিরি গোমড়া মুখ করে বসে ছিল। রাখী মনে মনে ভাবলো, আর নয়, দীপকের সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক নয়। ছি ছি, ইতুদের কাছে কত গর্ব করেছে ও, বলেছে, দীপক ওর জন্যে পাগল! আর ওদের সামনেই রাখীকে একেবারে মাটিতে মিশিয়ে দিল দীপক। দিনের আলোয় ও বোধহয় ইতুর দিকে চোখ তুলে তাকাতেও পারবে না।

—আসছে বোধহয়, মেকানিকটাই বোধহয়।

দূর থেকে লোকটাকে ব্রীজের ওপর দেখতে পেয়ে দীপক নিজেই রাস্তার দিকে ছুটে গেল। পিছনে পিছনে অতীশ।

১৭

নন্দিতা সব সময়েই একটা কমপ্লেক্স থেকে ভুগছে। রাখী ইতু ওর বন্ধু ঠিকই, নন্দিতার সঙ্গে ব্যবহারে বিশেষ কোনো পার্থক্য করে না। তবু নন্দিতার নিজের মনে হয় ও যেন ওদের সমান সমান নয়। শুধু যে আর্থিক সচ্ছলতায় রাখীদের সমান নয় বলেই ও সবকথা মুখ ফুটে বলতে সাহস পায় না, তাও নয়। আসলে রাখী-ইতুদের বাড়ির পরিবেশ ওদের তুলনায় অনেক বেশি মডার্ন। ওদের মা-বাবারা যেসব ব্যাপারে কোনো দোষ দেখে না, কিংবা যে-সব রসিকতা ওরা বাড়িতে বসে করতে পারে, সে-সব কথা শুনতেও ভয় পায়। ইতু তো একদিন তার মাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে গল্প করে বলেছিল কোন্ হ্যাণ্ডসাম ছেলে ওর সঙ্গে আলাপ করার জন্যে কি করেছে। নন্দিতা ছিল সেদিন। ও দেখেশুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। আবার ইতুর মাকে হাসতে দেখে আরো অবাক হয়েছিল। আচারব্যবহারে একটু গোঁড়া হওয়া যে এতখানি লজ্জার নন্দিতা যখন ছোট ছিল তখন জানতোই না। ইতুর মত মেয়েদের ও নিজেই তখন অপবাদ দিত। এখন ওদের সামনে গুটিয়ে-সুটিয়ে থাকে।

কাঁধে একটা যন্ত্রপাতির থলে আর দু-ফালি তার লাগানো একটা বড় বাল্‌ব নিয়ে অতীশ

আর দীপকের পিছনে পিছনে মিস্ত্রীটা এল। আসতে আসতে দীপক মিস্ত্রীটার সঙ্গে তোয়াজ করার ভঙ্গিতে কথা বলছিল।

নন্দিতা রাখী আর ইতুর মুখের দিকে তাকালো। দেখে মনে হল রাখী মিস্ত্রীটার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে আছে যেন ও লোকটাই এখন হীরো হয়ে উঠেছে। সারাটা দিন নির্ভর করে ছিল দীপকের ওপর। এখন দীপকের দিকে ওরা কেউই তাকাচ্ছে না। সকলের চোখ মিস্ত্রীটার মুখের দিকে। দীপকের গাড়ির চাবিটা এখন আর সেই আশ্চর্য জাদুদণ্ড নয়, মিস্ত্রীর থলের মধ্যেই সব আশাভরসা।

কিন্তু ঐ লোকটা কখন গাড়ি সারাবে, তারপর গাড়ি স্টার্ট নেবে, ওরা বাড়ি পৌঁছবে, ভাবতেও বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল নন্দিতার। ও যে আছে, ওর ভাবনা যে রাখী ইতুর চেয়ে অনেক বেশি তা কেউ ভাবছেই না।

সোমনাথ চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আর মাঝেমাঝেই সমবেদনার চোখে তাকাচ্ছে নন্দিতার দিকে। ওকে নন্দিতার বেশ ভাল লেগেছিল, মানুষটা অতীশের মত কথার ফুলকি নয় বলে। রীতিমত ভদ্র, ঠাণ্ডা, কেমন একটা সৌম্য ভাব আছে বলে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওর মনটাও খুব নরম।

নন্দিতা তবু ফিসফিস করে বললে সোমনাথকে, সারাতে কতক্ষণ লাগবে?

সোমনাথ হতাশভাবে হাত ঘোরালো, কি জানি।

নন্দিতা রাখীকে কানে কানে বললে, এর পর বাড়ি গিয়ে কি বলবো বল তো?

সোমনাথ হঠাৎ বললে, রাস্তা দিয়ে মাঝে মাঝে লরী তো যাচ্ছে, লিফ্‌ট চাইলে দেবে না?

ইতু এত দুর্ভাবনার মধ্যেও হেসে ফেললে।—না বাবা, একেবারে লিফ্‌ট্ করে নিয়ে চলে যেতেও তো পারে।

ওরা তিনজনেই হাসল, কিন্তু সে-হাসি যেন কান্নার ভিতর থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে পারছে না।

হেসে ফেলেও ইতুর ওপর রাগ হল নন্দিতার। এ সময়ে হাসাও তো অপরাধ।

সোমনাথ আবার নন্দিতাকে বললে, অতীশের সঙ্গে আপনারা একজন কি দু'জন চলে যান না। আমি বরং থেকে যাই।

নন্দিতা অনেকখানি আশা পেল, সোমনাথকে ভাল লাগলো!

মিস্ত্রীটা ততক্ষণে বনেট খুলে ফেলেছে। ব্যাটারীর সঙ্গে তার দুটো লাগাতেই বাল্‌ব্ জ্বলে উঠলো। আর দীপক অতীশ সোমনাথ গিয়ে ভিড় করলো বনেটের সামনে, মিস্ত্রীর আশপাশ থেকে ইঞ্জিনের ওপর উঁকি মারলো।

সোমনাথকেও উঁকি মারতে দেখে নন্দিতাও ধীর পায়ে এগিয়ে গেল। রাখী ইতুও।

মিস্ত্রী তখন কি-সব খোলাখুলি করছে, পরীক্ষা করছে। আর দীপক স্টিয়ারিঙে এসে বসেছে। মিস্ত্রীর কথায় এক একবার স্টার্ট দিচ্ছে।

অতীশ আর সোমনাথের মত রাখী ইতু নন্দিতাও এদিক ওদিক থেকে ইঞ্জিনে উঁকি দিচ্ছে। মিস্ত্রী খুটখাট কি করছে তাই দেখছে।

পেট্রোলের গন্ধ কিংবা ভয়, যে জন্যেই হোক, নন্দিতার মাথাটা ঘুরে গেল। ও সরে এল ওখান থেকে।

ইতুকে বললে, গা গুলোচ্ছে রে!

ইতু বললে, ভয়ে। বলে হাসল, কিন্তু সেটাও ভয়ের হাসি।

আর সেই সময়েই অতীশ, বোধহয় স্মার্ট হবার চেষ্টা করে হঠাৎ সোমনাথকে বললে, তুই কি দেখছিস সোমনাথ? তুই এ-সবের কি জানিস?

অপদার্থ অপদার্থ ! নন্দিতা রেগে গেল অতীশের ওপর। ও চাইলো সোমনাথ বলে উঠুক, তুই বা কি জানিস ? কে কি জানে তা তো দেখতেই পাচ্ছে নন্দিতা। যে দীপক প্যাণ্টের পকেটে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে চাবি ঘোরায় আর সিগারেট টানে সেও তো এখন একটা অসহায় শিশু।

কিন্তু আর কতক্ষণ এভাবে অপেক্ষা করতে হবে নন্দিতা ভেবে পেল না। ওর চোখের সামনে বাড়িটা ভেসে উঠছে বার বার। বাবা মার মুখ, গলিটার চেহারা।

নন্দিতার ঘরে গার্জেন, বাইরে গার্জেন। একটু দেরী করে ফিরলে বাড়ির আবহাওয়া থমথমে হয়ে যায়, মা চোখের দিকে তাকিয়ে দেখে, কিছু বুঝতে চেষ্টা করে, তার পর একটাও কথা না বলে কাজ করে যায় সংসারের। বাবা মা দাদা কেউ কথা বলে না। সব চুপচাপ। কিন্তু তাও সহ্য করা যায়। সবচেয়ে অস্বস্তিকর বাড়ি ফেরার পথটুকু। গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেগুলো আড্ডা দেয়, জটলা করে। দলটার বয়েস নন্দিতার চেয়ে তিন চার বছরের ছোট। খেলাধুলো কিংবা পলিটিক্স, কে কোন সালে কোন টেস্টে ক'টা উইকেট নিয়েছিল তাব তর্ক, কিংবা পার্ক স্ট্রীটের কোন মদের দোকান কোন লিডারের বেনামী সম্পত্তি। তর্ক আলোচনা যাই করুক, চোখগুলো সব অন্ধকারেও র‍্যাডার হয়ে থাকে। কখনো মেয়েদের পোশাক নিয়ে, কখনো হাঁটাচলা নিয়ে টিপ্পনি কাটে। সময়বয়স্ক হলে এতখানি গায়ে লাগতো না। কিন্তু এদের কারো এখনো গোঁফ ওঠেনি ভাল করে।—সাপের জাত মাইরি, পেট আর গলার খোলস ছেড়েছে, দ্যাখ দ্যাখ। দিদির বয়সের একটি মেয়েকে বলেছিল একদিন। নন্দিতার হাতে বইপত্র ছিল, কে একজন বলেছিল, নাইট কলেজে পড়ে নাকি রে। আরেকজন মন্তব্য করেছিল, মিডনাইট কলেজে বল।

এই ছেলেগুলোর জন্যেই নন্দিতার আরো বিরক্তি। দাদাকে বলতে পারতো, কিন্তু উল্টে দাদাও হয়তো বলবে, দোষ কি ওদের, রাত আটটায় বাড়ি ফিরলে বলবেই তো মা জানলে বলবে, তা সত্ত্বেও তো লজ্জা নেই তোর। তখন রাগ বেড়ে যায়, মনে হয়, শুধু একটু গল্প করার যদি এত দোষ, তা হ'লে সত্যি সত্যি অন্যায় ক'রে ও শোধ তুলবে।

একটা কমবয়েসী ছেলেকে নন্দিতা চেনে, দু' একদিন কথাও বলেছে ছোট ভাইয়ের মত মনে করে। সে একদিন বললে, নন্দিতাদি, আপনি এত রাত করে ফিরবেন না।—কেন ? নন্দিতা তার গার্জেনি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটি অভিমান-অভিমান গলায় বলেছিল, ওরা সব যা-তা বলে, আমার খারাপ লাগে।

ছেলেটির ওপর বরং মায়াই হয়েছিল ওর। কিন্তু সকলে যা-তা বলবেই বা কেন ? ও কি কারো খায় না পরে !

—কার্বোরেটর ঠিকই আছে। মিস্ত্রীর কথাটা শুনতে পেল নন্দিতা।

কোথাও কোনো লোক নেই। অন্ধকারে মাঠের মধ্যে শুধু গাড়িটা, ইঞ্জিনের ওপর ঝুঁকে পড়া ক'টি উৎকণ্ঠিত মানুষ। কোনও শব্দ নেই। বাল্‌ব্ আবার জ্বলে উঠে এখন জ্যোৎস্নাও অন্ধকার মনে হচ্ছে। সকলেই চুপচাপ, কেউ কোনো কথা বলছে না। মিস্ত্রীর কথা ক'টা সেই স্তব্ধতা ভাঙলো।

মিস্ত্রী আবার বললো, ডিস্ট্রিবিউটরের পয়েন্ট খারাপ হয়েছে হয়তো, দেখছি···

অনেকক্ষণ আবার খুটখাট চললো। শেষে মিস্ত্রীর কথা শোনা গেল। লোকটা যন্ত্রপাতি তুলতে লাগল থলেতে। বললে, এ সি পাম্পের গোলমাল হতে পারে, আর কনডেনসারও দেখতে হবে। সুইচের কানেকশনও।

—হবে না ? রাখী ইতু একসঙ্গে বলে উঠল।

দীপক যেন কিছুই বুঝতে পারছে না এমন ভাবে তাকালো মিস্ত্রীর মুখের দিকে।

নন্দিতা বলে উঠল, তা হ'লে ?

রাখী ইতু নন্দিতা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। তিনটি মুখই তখন একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। দীপক অতীশ সোমনাথের দিকে ওদের আর তাকাতেও ইচ্ছে করছে না।

মিস্ত্রী বনেট বন্ধ করে বললে, ডাকবাংলো আছে, সার্কিট হাউস আছে, দেখুন না বাবু গিয়ে, রাত্রে থেকে যান। কাল সকালে ঠিক করে দোব।

মিস্ত্রীটা ধীরে ধীরে চলে গেল দীপকের কাছ থেকে দু'টো টাকা নিয়ে।

আর রাখী ইতু নন্দিতা হাইওয়ের দিকে হাঁটতে শুরু করলো। জীপ কি গাড়ি পেয়ে গেলে একটা লিফ্‌ট চেয়ে নেবে। কিংবা লরীতে।

এখানে একটা রাত্রিবাস ! বাড়িতে কোনো খবর পর্যন্ত না দিয়ে ? থরথর করে সারা শরীর কাঁপছে তখন নন্দিতার, রাখীর, ইতুর।

সমস্ত পৃথিবী তখন ওদের চোখের সামনে অন্ধকার।

১৮

কারও ওপর ভরসা নেই, কারও ওপর ভরসা নেই।

রাখী রেগে গিয়ে বললে, ওরা আমাদের কথা ভাবছে না। ভাবছেই না। রাগটা চোখের জল আর ফোঁপানি হয়ে গেল।

হাইওয়ের চড়াই বেয়ে দ্রুত হাঁটতে হাঁটতে রাখী হঠাৎ কেমন দাঁতে দাঁত চেপে নৃশংস গলায় বলে উঠল, সব ওদের পলিসি, আমাদের আটকে দেবার জন্যে।

ইতু বললো, অতীশ, অতীশও হতে পারে। আমি একজনকেও বিশ্বাস করি না।

নন্দিতা কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, আমাদের যেন বাড়িঘর নেই। আমাদের যেন জবাবদিহি করতে হবে না ফিরে গিয়ে। কি বলবো বল তো মাকে ?

হাইওয়ের ওপর উঠে এক পাশে দাঁড়িয়ে কি করবে ওরা ঠিক করতে না পেরে আবার সেই পিছন ফিরে তাকালো। এতক্ষণ রাগে জ্বলছিল বলে পিছন ফিরে তাকায়নি।

দেখলো, ওরা তিনজনই আসছে। দীপক, অতীশ, সোমনাথ।

অনেক পরে পরে এক একখানা মালবোঝাই লরী আসছে। দূর থেকে তীব্র হেডলাইটের ক্রুদ্ধ চোখ, ক্রুদ্ধ আর ভয়ঙ্কর। হাত তুলে থামাতেও ভয় হয়। থামিয়েই বা কি লাভ। প্রত্যেকটিতে তিন চারটি করে লোক ড্রাইভারের সীটে। পিছনে পাহাড়-প্রমাণ মালপত্র। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, ঐ লরীতে দু' একজনের যদি বা জায়গা হয়, কারো সাহস নেই। দীপক ? দীপক সঙ্গে থাকলে ? ফুঃ। রাখীর চোখে দীপকের লম্বা পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি চেহারা এখন চুপ্‌সে এতটুকু হয়ে গেছে। একটা মাতাল লরী-ড্রাইভারের হাতে পড়লে দীপক ওকে বাঁচাবে ? ফুঃ।

দম বন্ধ করে দাঁড়িয়েছিল ইতু। হঠাৎ বলে উঠল, কি করা যায় বল্‌ তো ?

অতীশ শুনতে পেল ইতুর কথা। বললে, কোনো গাড়ি এসে পড়লে লিফ্‌ট্‌ চাওয়া যায়। তাছাড়া আর তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না।

লিফ্‌ট্‌ চাওয়া যায় ! যেন নতুন কিছু বলছে, যেন আর কারো মাথায় আসেনি। অতীশের বোকামিতে চটে গেল ইতু। আর অতীশ তা বুঝতে না পেরে ঠাট্টা করে বললে, সামনে জায়গা না থাকলে ইতুকে পিছনে মালের ওপর বসিয়ে দিলেও চলবে।

ইতুর সমস্ত শরীর চিড়বিড় করে উঠল।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, অনেকগুলো লরী পার হতে দিয়ে শেষ অবধি একজোড়া কড়া আলোর হেডলাইট চোখে পড়লো। ঝড়ের মত এগিয়ে আসছে গাড়িটা। দোনলা বন্দুকের দুটো গুলির মত।

ওরা রাস্তার ধারে সরে এল চাপা পড়ার ভয়ে, তারপর দুহাত তুলে সকলে মিলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠল।

একখানা জীপ। ড্রাইভার প্রথমে বোধহয় ভয় পেয়েছিল, রাখী ইতুদের দেখে জোর ব্রেক কষে দাঁড়িয়ে গেল ওদের অনেকখানি পার হয়ে গিয়ে।

গাড়িটা যখন দূরে ছিল তখন ওদের সকলের ওপর হেডলাইটের আলো পড়েছিল। আর তখন এক মুহূর্তের জন্যে মনে হয়েছিল, তিনটি অসহায় ভীত সন্ত্রস্ত মেয়ে যেন তিনটি নির্লিপ্ত অহঙ্কারের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তারপরই তীব্র আলোর চাবুক তাদের প্রত্যেকের মুখের ওপর দিয়ে ছুটে গেল, নতুন অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, হঠাৎ ব্রেক কষার একটানা আওয়াজে ওরা দেখতে পেল জীপটা অনেকখানি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

সোমনাথ আর দীপক ছুটে গেল। রাখীরাও দ্রুত এগিয়ে গেল।

—আছে আছে, জায়গা আছে। সোমনাথ চিৎকার করলো।

দীপক জোর গলায় ডাকলো।—রাখী, শিগগির।

ওরা তিনজনই ছুটতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে অতীশও।

কিন্তু ততক্ষণে অতীশ আর দীপক একটা সমস্যার সামনাসামনি। জীপটার মধ্যে কে আছে, কি আছে এতক্ষণ ওরা ভাল করে দেখতেই পায়নি। চোখে গাড়ির তীব্র আলোর ঘোর কেটে যেতেই দেখলে জীপটার সামনে ভিতরে লোকে ঠাসা।

—দো আদমি, সির্ফ দো আদমি। তাদের মধ্যে থেকে একজন বললে, একজন ঘাড় ফিরিয়ে রাখীদের দিকে ফিরে তাকালো।

দীপকের মনে হল অন্ধকারে একজনের চোখে যেন হাসি খেলে গেল।

দু'জন, শুধু দু'জন।

দীপক অতীশের মুখের দিকে তাকালো। অতীশ রাখী আর নন্দিতার মুখের দিকে তাকালো। ইতু দীপকের মুখের দিকে তাকালো।

—তিনজন, তিনজনও হয়ে যেতে পারে। সোমনাথ বোধহয় বলে উঠল।

তারপর ওরা সকলেই পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। যে লোকটা ঘাড় ফিরিয়ে রাখীদের ছুটে আসা দেখছিল তাকে অতীশের খারাপ লাগলো। অন্ধকারে যে-লোকটার চোখ হেসেছিল তাকে দীপকের ভয় করলো।

রাখী ইতু নন্দিতা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো।

'তিনজন, তিনজনও হয়ে যেতে পারে,' কথাটা তখনো ওদের কানে ভাসছে। কিন্তু ওরা তিনজন, শুধু রাখী, ইতু, নন্দিতা? অসম্ভব।

—না, না, একা আমরা। আপনাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে! রাখী ফিসফিস করে অতীশকে বললে।

দীপক ভাবলে, আমি রাখী আর—না, ইতু নয়, অতীশ। দীপক নিজেই একটু ভয় পেয়েছে, কিন্তু সে-কথা মুখ ফুটে বললো না। অতীশ ভাবলো, রাখী আর নন্দিতা আর দীপক। ওর মনের মধ্যে গোপন ইচ্ছেটা একটু একটু করে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। সোমনাথ কিছু ভাবলো না, ও শুধু অসহায় তিনটি মুখের দিকে তাকালো।

অতীশ হঠাৎ বললে, ইতু তুই বরং থেকে যা। দীপক, তুই রাখী আর নন্দিতাকে নিয়ে···

ইতুর চোখে আগুনের ফুলকি। কি ভেবেছে অতীশ ওকে? ও কি সত্যি খারাপ মেয়ে? পার্ক স্ট্রীট থেকে তুলে এনেছে নাকি? ওর কি বাড়ি ফেরার প্রশ্নটা কোনো সমস্যা নয়? ওর ইচ্ছে হল অতীশের গালে ও ঠাস করে একটা চড় বসিয়ে দেয়।

দীপক ভাবলে, ছি ছি, ও এতখানি স্বার্থপর হবে কেন? তার চেয়ে অতীশ কিংবা সোমনাথই যাক্ না। ও কি রাখীকে অতীশের সঙ্গে ছেড়ে দিতে ভয় পায় নাকি।

কিন্তু সে-কথা স্পষ্ট করে বলা যায় না। ও তাই বললে, আমাকে, আমাকে তো গাড়ির জন্যে থাকতেই হবে।

সঙ্গে সঙ্গে রাখী অসীম ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালো দীপকের দিকে। কোনো কথা বললো না। নীচ, নীচ, স্বার্থপর। শুধু গাড়িটার কথাই তুমি ভাবতে পারছো। গাড়ির মায়াতেই তুমি এত দেরী করে দিলে। লাস্ট ট্রেন হাতছাড়া হয়ে গেল। যেন কাল সকালে গাড়ির জন্যে ফিরে আসা যেত না।

ইতু হঠাৎ বললে, আমাকে যেতেই হবে।

দীপক বললে, ঠিক আছে, তোমরা দু'জন, আর অতীশ তুই যা।

সোমনাথ নন্দিতার দিকে দেখিয়ে বললে, কিন্তু ইনি? বেচারীর মুখ শুকিয়ে গেছে।

নন্দিতার হঠাৎ মনে হল ও এদের সঙ্গে এসে ভুল করেছে। দীপক ওকে মানুষ বলেই ভাবে না। ও যে গরীব। ও যে রাখীদের মত স্মার্ট নয়। সুন্দরী নয়। অবাঞ্ছিত। ওদের ওপর যত রাগ সোমনাথের ওপর তা ভালবাসা হয়ে গেল। ওর মনে হল একা সোমনাথই ওর কথা ভাবছে।

রাখী ইতুর মুখের দিকে তাকালো, ইতুর চোখ যেন বললো, তুই আমাকে ফেলে যেতে চাস? নন্দিতা রাখীর মুখের দিকে তাকালো, তার চোখে অনুনয়—সব বুঝেছি, সব জেনেছি, আজকের মত আমাকে বন্ধু ভাবতে চেষ্টা কর। আমাকে বাঁচা।

—জলদি বাবু, জলদি। জীপের ভিতর থেকে কে বলে উঠলো। হয়তো ড্রাইভারই।

সঙ্গে সঙ্গে রাখী, ইতু, নন্দিতা বলে উঠলো, না, না, এভাবে যাবো না।

না, কেউই যাবে না।

জীপটা হঠাৎ একটা সমস্বরে অট্টহাস হয়ে গেল। স্পীডে বেরিয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে।

ওরা ছ'টি প্রাণী তখন দুটি দল হয়ে গেছে। সামনে দীপক, অতীশ, সোমনাথ। পিছনে রাখী, ইতু, নন্দিতা। কেউ কোনো কথা বলছে না। চুপচাপ। সকলেরই আশা, আবার কোনো গাড়ি কিংবা জীপ এসে পড়বে। ওরা আবার সেই স্বস্তির পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবে।

১৯

পায়ের নীচে পৃথিবী টলছে। পা টলছে। নীচে হু হু স্রোত নদীর দিকে তাকালে মনে হয় ব্রীজটা টালমাটাল টলছে।

শেষ আশাটুকুও নিঃশেষ হয়ে গেছে। এত রাত্রে এখন আর চেষ্টা করারও কোনো মানে হয় না।

ব্রীজ পার হয়ে একটা বাজার। রাস্তার ধরে ধারে ঝুড়িঝোড়ায় তপসে আর ইলিশ নিয়ে বসেছিল ক'জন। মেকানিক খুঁজতে এসে অতীশ আর সোমনাথ দেখে গিয়েছিল। এখন লোক নেই, মাছ নেই। শুধু ভিজে ঝুড়ি থেকে আঁশটে গন্ধ ভেসে আসছে মাছের। বাজার

হাট সব বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক দূরে দূরে কোথাও এক টুকরো আলো জ্বলছে। একটা বিড়ি সিগারেটের দোকান খোলা।

দীপক আর অতীশ সিগারেট কিনলো। লোকটা কুলো কোলে নিয়ে বিড়ি পাকাচ্ছিলো, রাখী ইতুদের দিকে অবাক চোখে তাকালো।

ডাকবাংলো, সার্কিট হাউসের পথ জেনে নিলো দীপক।

পথ চলতে চলতে অতীশ ঠাট্টা করে বললে, জায়গা না পেলে স্টেশন প্লাটফর্ম। হেসে হাল্কা করার চেষ্টা করলো ও আবহাওয়াটা। ইতুকে বললে, জীপে তুই একা চলে গেলেই পারতিস, লোকগুলোর খুব পছন্দ হয়েছিল, বার বার তাকাচ্ছিল তোর দিকে।

ইতু হাসলো না, কথা বললো না।

নদীর পাড় ধরে ধরে সরু রাস্তা, দু'পাশে দোকান। এখন বন্ধ।

দীপকও গুমোট হাওয়াটা দূর করার চেষ্টা করলো। হেসে বললে, রাখীর বাবা থানায় খবর দিয়েছে কিনা কে জানে। শেষে হাজতবাস না করতে হয়।

রাখী উত্তর দিল না। ইতু রাগত স্বরে বললে, হ'লে খুশি হবো। সেটাই আপনাদের হওয়া উচিত।

আর কেউ কোনো কথা বললো না।

অনেকখানি হেঁটে এসে একেবারে নদীর ধারে সার্কিট হাউস। সামনে বেশ খানিকটা ফুলের বাগান। জ্যোৎস্নায় ফুলের রাশি ফুটফুট করছে, রঙের ফুল এখন শুধু আলোর ফুলকি।

সার্কিট হাউসের সামনেই একখানা হলঘর। ওরা এগিয়ে গেল চৌকিদারের খোঁজে। অনুনয় বিনয় কিংবা টাকা দিয়ে লোকটাকে ভোলাতে হবে।

একটু এগিয়েই খোলা দরজা, হলঘরে পুরো কার্পেট মেঝেতে, আর তার ওপর সটান পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে—চৌকিদারটা, আব কে হবে! এক কোণে টুলের ওপর টেলিফোন। রিসিভারের তারটা দশ বারো হাত লম্বা। বোধহয় অফিসাববাবুরা ঘরে শুয়ে থাকেন বিছানায়. চৌকিদার কানের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসে।

লোকটা মড়ার মত ঘুমোচ্ছে। দীপক এগিয়ে গেল। লোকটাকে ডাকলো গায়ে হাত দিয়ে।

চৌকিদারটা ঘুম চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করলো। টলতে টলতে উঠল।

দীপক অতীশ মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল। ঘুম নয়। কাছে এসেই ওরা টের পেয়েছে লোকটা তাড়ি নযতো মদ টেনে বেহেড হয়ে পড়ে আছে।

চোখ মেলে তাকালো লোকটা, কিন্তু কিছুই বোধহয় দেখতে পেল না। ঘোলাটে চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে কথাগুলো শোনবার চেষ্টা করলো। আর ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠল। লোকটা টলতে টলতে এগিয়ে গিয়ে রিসিভারটা তুললো। 'হাঁ হুজুর', 'হাঁ হুজুর', 'হাঁ হুজুর'। টেলিফোনের লম্বা তার মেঝের ওপর পাক খেয়ে পড়ে ছিল, রিসিভার রেখে আবার টলতে টলতে আসতে গিয়ে ওর পায়ে জড়িয়ে গেল। দীপক আর অতীশ তা দেখে হেসে ফেললো, কিন্তু হাসতেও সাহস হল না। পাছে লোকটা চটে যায়।

চৌকিদার টেলিফোনে কি শুনল কে জানে, কোমর থেকে চাবির গোছা বার করে টলতে টলতে গিয়ে একখানা ঘর খুলে দিল। তারপর দীপকদের ইশারা করলো ঘরের দিকে যাবার জন্যে। আর ওরা সেদিকে পা বাড়াবার আগেই লোকটা মেঝের কার্পেটের ওপর সটান শুয়ে পড়লো।

দেয়াল হাতড়ে আলো জ্বেলেই দীপক বলে উঠল, বাঃ, চমৎকার ঘর।

অতীশ বললে, মাঝরাতে অন্য কেউ এসে না বের করে দেয়। টেলিফোনে হয়তো

কারো জন্যে বুক করলো, ও ভেবেছে আমরাই সেই লোক। বলে হাসল।

ওরা সকলেই পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলো ভয়ে ভয়ে। ওদের মোটেই প্রাপ্য নয় এমন একটা জিনিস যেন লুকিয়ে লুকিয়ে ভোগ করতে চলেছে।

ঘরখানা বেশ বড়, আর সাজানো। দরজায় জানালায় বেশ পরিচ্ছন্ন পর্দা, দু'খানা সিংগল বেড খাট দূরে দূরে, দেয়ালে রাষ্ট্রপতির ছবি, একটা আয়না বসানো টেবিল, একখানা গা-এলানোর চেয়ার।

ক্লান্তিতে সোমনাথ বিছানার ওপর ধপ্ করে বসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, আরে, ডানলোপিলো যে!

নন্দিতা নিজেও আশ্চর্য হয়েছিল বসতে গিয়ে।

কিন্তু অতীশ বলে উঠল, দেখে নে সোমনাথ, দেখে নে, আগে তো দেখিসনি।

শুনে অতীশকে নন্দিতার ভীষণ খারাপ লাগলো। মফঃস্বল শহর থেকে মামাতো বোন একবার কোলকাতায় এসে সিনেমা গিয়েছিল ওর সঙ্গে, বলে উঠেছিল, কি সুন্দর রবারের গদি রে! তখন কথাটা খুব খারাপ লেগেছিল নন্দিতার। এখন অতীশকেই খারাপ লাগলো।

কিন্তু তার চেয়েও বিশ্রী লাগছিল ওর সমস্ত ব্যাপারটা। কিছু বলা যায় না, মা-বাবা হয়তো ভেবে বসে আছে, নন্দিতা কারো সঙ্গে প্রেমট্রেম করে পালিয়েছে। ওর পড়ার টেবিল তন্ন তন্ন করে খুঁজছে হয়তো, কিছু চিঠি-ফিটি লিখে রেখে গেছে কিনা দেখার জন্যে। ভাবতেই নিজের মনেই না হেসে পারলো না ও।

অস্ফুটে বললে, বাড়িতে কি কাণ্ড হচ্ছে কে জানে।

অ্যাটাচ্‌ড বাথ, আয়না, বেসিন, সাজানো ঘর, মেঝেতে কার্পেট, কুঁজোয় জল, কাচের গেলাস। একে একে সকলে জামাকাপড়ের ধুলো ঝাড়লো, মুখ হাত ধুয়ে এল, কানে মাথায় ঠাণ্ডা জল দিল। কুঁজোসুদ্ধ উপুড় করে ঢক ঢক করে খানিকটা জল খেল দীপক।

দু'খানা খাটে সবাই তখন ছড়িয়ে ছিটিয়ে শুয়েছে, আধশোয়া, কেউ পা ঝুলিয়ে বসে। ক্লান্তিতে আর দুর্ভাবনায় কারো শরীর আর বইছে না।

দীপক নীচে কার্পেটের ওপর শুয়ে পড়লো। অতীশকে বললে, ওরা সব বড্ড রেগে আছে, ওদের খাটফাট সব ছেড়ে দে। তারপর পাশ ফিরে বললো, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে।

রাখী ইতু কানাকানি করেছে এর আগেও। এবার ফিসফিস করে পরস্পরকে কি বললে। তারপর দীপকের কথার জবাবে রাখী বললে, আমরা ঘুমোবো না।

রাখীর কেবলই সন্দেহ হচ্ছিল সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে দীপকের কোনো হাত আছে। ও ইচ্ছে করেই গাড়িটা খারাপ করে রেখেছিল কি না কে জানে। ওরা গাড়িতে ওঠার পর দীপক যখন বার বার স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছিল, কোনো কথা বলছিল না, তখন রাখী ভেবেছিল ওকে মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে দীপক। তারপর দীপক যখন বনেট খুলে কি সব নাড়াচাড়া করলো তখনই কিছু খারাপ করে রাখেনি তো। সন্দেহ হওয়ার যথেষ্ট কারণও ছিল। দীপক ওকে আজ পাগলের মত আদর করতে চেয়েছিল—ব্রীজের ছায়ামাখা বালির পাড়ে। আর সে-সময়েই ভিখিরি ছেলেটা এসে দাঁড়িয়ে রইলো, সরতে চাইলো না। 'মেরেই দেখুন না।' 'পুলিশ আপনাদেরই ধরবে।'...রাখীর নিজের তখন খুবই কুৎসিত লেগেছিল ব্যাপারটা, কিন্তু ছেলেটা ছুটে পালালেও ওর মনে হয়েছিল আসলে দীপকই যেন ছেলেটার সামনে থেকে ছুটে পালাচ্ছে। গাড়িটা খারাপ হয়ে দীপককে এখন আরো তুচ্ছ মনে হচ্ছে রাখীর। নাকি ওর নিজের চরিত্রই বদলে যাচ্ছে! এখন স্বার্থ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা। এখন সবকিছুরই চেহারা কেমন অন্যরকম লাগছে।

দীপকের কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল রাখীর ।—আজ রাতটা না হয় এখানেই থেকে গেলে । গাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে বলেছিল ঠাট্টা করে । এখন মনে হল ঠাট্টা না হতেও পারে ।

ইতুকে সে-কথা না বলে পারেনি । ইতু ফিসফিস করে বলেছিল, ট্রেন আছে কিনা, বাস আছে কিনা, ওরা কেউ সে-সব খোঁজই নিল না প্রথম দিকে ।

রাখী তাই হঠাৎ বলে উঠল, না না, আমরা কেউ ঘুমোবো না । অর্থাৎ কেউ তোমাদের আর বিশ্বাস করি না ।

দীপক প্রথমটা বুঝতেই পারেনি । রাখীর কথা শুনে ও হেসে উঠল । বললে, বাড়ির কথা ভেবে বাসর জেগে লাভটা কি হবে ? তখন যা চেহারা হবে, বাবা-মা ভাববে····

রাখী অবাক হয়ে গেল দীপককে হাসতে দেখে ।—তোমার কি হাসতে লজ্জাও করছে না ?

ওর রাগ দেখে দীপক আরো হেসে উঠল ।—ঘুমোতে ভয় পাচ্ছো কেন, তোমার ঘুমন্ত রূপ দেখে ফেলবো বলে ?

রাখীর সমস্ত ভিতরটা যেন জ্বলে উঠল । একটু আগেই ওর চোখের সামনে পিসীমার মুখটা ভেসে উঠেছিল । সমস্ত বাড়িটা । মনে হয়েছিল, ও ফেরেনি বলে হয়তো প্রচণ্ড তোলপাড় হচ্ছে সেখানে । ও ভাবতে পারছিল না কোন্ মুখে কাল গিয়ে দাঁড়াবে সকলের সামনে । দীপকের হাসিটা ঠিক সেই মুহূর্তে জ্বালা ধরিয়ে দিল ।

ও রূঢ় স্বরে চেপে চেপে বললে, তোমাকে আমি আর একটুও বিশ্বাস করি না । সব ব্যাপারটা তোমার চক্রান্ত ।

—চক্রান্ত ! মুখ কালো হয়ে গেল দীপকের । মাথা ঝিমঝিম করে উঠল । এতখানি ছোট ভাবতে পারলে রাখী ওকে ! দীপকের মুখ থেকে একটা ক্রোধের স্ফুলিঙ্গ ছিটকে বেরিয়ে এল ।—এত নীচ মন তোমার !

ছোট্ট চারটি শব্দ, কিন্তু সকলের মনে হল, একটা বজ্রপাত হল সেই মুহূর্তে ।

২০

সমস্ত ঘরখানা থমথম করতে লাগলো । সিনেমা হলে ছবি চলতে চলতে হঠাৎ সাউণ্ড ফেল করলে যেমন হয় । কেউ একটাও কথা বলছে না, কিন্তু বুকের মধ্যে একটা প্রচণ্ড কোলাহল সকলেই শুনতে পাচ্ছে ।

অতীশ বুঝতে পারলো সাংঘাতিক কিছু ঘটে গেছে । কিংবা ঘটছে । এ-সময় একটা কথাও বলা চলে না । ইতু স্তম্ভিত, রাখী বা দীপকের দিকে ও চোখ তুলে তাকাতে পারছে না । সোমনাথ ভাবলো, 'আমি এখন এখানে না থাকলেই ভাল হতো । অসহ্য, অসহ্য' ; নন্দিতার মনে হল, এ অপমান ওর নিজেরও, সব মেয়েদের ।

রাখী অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো । অপমানে লজ্জায় চোখ ঠেলে জল এল ওর । দীপক এখন আর ওর কাছে কিচ্ছু নয়, কিন্তু দুঃখ সেজন্যে নয় । রাখী নিজেও যে দীপকের কাছে মূল্যহীন হয়ে গেছে এ-কথাটাও সকলের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়লো । কি ভাবছে এখন ইতু আর নন্দিতা ? এতদিন যা-কিছু গর্ব করে বলে এসেছে, চারটি মাত্র শব্দ তার সব কিছু মিথ্যা করে দিল । ইতু হয়তো ভাবছে, রাখী একটা সস্তা মেয়ে, যেচে নিজেকে এগিয়ে দিয়েছিল । নন্দিতা কি ভাবছে কে জানে ।

রাখীর মুখ ঘরখানার মতই থমথমে । ও ধীরে ধীরে উঠল, পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালো,

কিন্তু কারো দিকে তাকালো না, ভয়—পাছে কারো সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যায়। ও ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, হল্ পার হয়ে সার্কিট হাউসের বারান্দায় এসে দাঁড়ালো। বাড়ির কথা, ফেরার জন্যে যত ভয় ছিল মনে, সব উবে গেছে। এখন ওর বুকের ভেতরটা হু হু করছে, হু হু করছে।

বারান্দায় স্থির দাঁড়িয়ে থেকে সামনের জ্যোৎস্না-ভেজা নদীর জলের দিকে তাকিয়ে ও আগুনের শিখার মত নিজের আগুনে নিজেই জ্বলতে লাগলো।

এদিকে ঘরের মধ্যে সেই আবহাওয়াটা একটুও হাল্কা হল না। দীপক অপেক্ষা করে রইলো, রাখী যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে তা যেন লক্ষ্যই করেনি ও, কিংবা এমন ভাব দেখালো, যেন লক্ষ্য করার মত বিষয়ই নয় ওটা। অথচ তখন দীপকের মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলেছে। ঐ চারটি শব্দ উচ্চারণ করে ফেলার জন্যে, হঠাৎ ওভাবে রেগে যাওয়ার জন্যে দীপকের যতই অনুশোচনা হচ্ছিল, যতই নিজেকে দোষী মনে হচ্ছিল, ও ততই নিজের মনের মধ্যে যুক্তির পর যুক্তি গড়ে রেগে উঠছিল। ওর কেবলই মনে হচ্ছিল কি করেনি ও রাখীর জন্যে ! অথচ রাখী তার প্রতিদানে কীই-বা দিয়েছে। কিছুই যে পায়নি—সে কথাটা অতীশের কাছেও গোপন রাখতে হয়েছে। কাগজের ফুল বানিয়ে ঘর সাজানোর মত রঙিন মিথ্যে কথাগুলো বুনে বুনে ও শুধু অতীশের কৌতূহল মিটিয়েছে। কিংবা নিজেই নিজের সাধ মিটিয়েছে।

দীপক একসময় দেখল অতীশ উঠে দাঁড়িয়েছে। দেখলো, অতীশ ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রাখীর খোঁজে।

রাখী সার্কিট হাউসের বারান্দায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। পিছনে হাল্কা পায়ের শব্দে ও বুঝতে পারলো কেউ আসছে। ও ভেবেছিল, দীপক নিজেই।

আর সে-কথা ভেবেই অভিমানে ওর দু'চোখ জলে ভেসে গেল।

অতীশ তখন ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

রাখী তার দিকে তাকালো না, তবু বুঝতে পারলো। ওর মনে হল ও এক্ষুনি ভেঙে পড়বে।

রাখী কোনো কথা বললো না, সিঁড়ি বেয়ে সামনের বাগানে নামলো, খুব হাল্কা পায়ে নদীর ঢালুর দিকে নামতে লাগলো। ওর বারবার সকালের কথা মনে পড়ছিল। এর আগেও মনে পড়েছে, তবু দীপককে সকালের কথা বলতে পারেনি, দীপক কি মনে করবে ! হয়তো ভাববে, বিয়ের কথা বলে নিজের দাম বাড়াচ্ছে ও, কিংবা জানতে চাইছে দীপক ওকে বিয়ে করবে কি না। ছি ছি, সেকথা ভাবলেও রাখী ছোট হয়ে যাবে। রাখী নিজেই তো এখনো বুঝতে পারছে না। রাগের মাথায় পিসীমার কথার জবাব দিয়েও কিন্তু ওর হঠাৎ মনে হয়েছিল ছেলেটি কেমন দেখতে, কি করে জানতে অর্থাৎ দীপকের সঙ্গে তুলনা করে নিতেই চেয়েছিল। ও অবশ্য জানে দীপক তার তুলনায় অনেক ভাল, অনেক ভাল ! কিন্তু এখন এই রাগের মুহূর্তে ওর হঠাৎ মনে হল মাকে জিজ্ঞেস করে সব জেনে নিল না কেন।

এইসব ভাবতে ভাবতেই নদীর ঢালুর দিকে নামতে লাগলো রাখী।

অতীশ দ্রুত পায়ে এগিয়ে এল।—ফিরে চলুন।

রাখী জলে ভাসা চোখ দুটো তুলে অতীশের দিকে তাকালো।—পারছি না অতীশদা, পারছি না।

অতীশ বললে, ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। রাখী যেন শুনতে পেল না।—আমার ভেতরটা জ্বলছে। পিকনিক করতে এসে কি হল বলুন তো ? আমার এখন আর ফেরার জায়গা নেই, যাবার জায়গা নেই।

অতীশ চুপ করে রইলো। কি আর বলবে ও। ইতু-হলে ও হয়তো ঠাট্টা করে বলতে

পারতো, এই পৃথিবীটাও একটা পিকনিক। তারপর হঠাৎ গাড়ি স্টার্ট নেয় না। সব ওলোট-পালোট হয়ে যায়। তখন আর ফেরার জায়গা থাকে না, যাবার জায়গা থাকে না।

অতীশ বললে, ফেরার জন্যে আপনি ভাবছেন কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রাখী হাসলো। রাখীর এই মুহূর্তে ইচ্ছে হচ্ছিল, সকালে রাগারাগি না করলেই ভাল হতো। পিসীর কথামত সেজেগুজে কনে হয়ে বসতো, হাঁটতো, তারা হয়তো চুলের গোছ দেখতো, কিংবা একটা গান শুনতে চাইতো। ব্যস্। তারপর ঐ সুইট বৌটার মত রাখীও হেসে খেলে বেড়াতো।

—কাল সকালে কোন মুখে ফিরে যাবো? কি বলবো গিয়ে আপনিই বলুন?

রাখী তখন নদীর পাড়ে নেমে যাওয়া ঘাটের সিঁড়িতে বসে পড়েছে।

অতীশ ধীরে ধীরে ওর পাশে বসলো। অতীশের ইচ্ছে হল রাখীকে সান্ত্বনা দিয়ে ওর সব কষ্ট সব ভাবনা মুছে নিতে। রাখীকে দেখে অতীশের নিজেরও বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল।

—দীপকের কথা ভাববেন না, সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। অতীশ বললো।

রাখী যেন দীপকের কথাই ভাবছে! বাড়ি, বাড়িটা এখন ওর মাথার ওপর চেপে বসেছে। কাউকে কিছু না বলে একটা রাত্রি বাইরে কাটিয়ে যাওয়া যে কি, ওরা কেউ বোঝে না, কেউ বোঝে না।

না, দীপকের কাছে রাখীর আর কোনো দাম নেই। সব ছেলেরাই সমান, দাম দিতে পারলে তবেই দাম থাকে।

কলেজ খোলা থাকলে একটি করে টাকা পেত ও মা'ব কাছে। তার ভেতর থেকে চল্লিশটা পয়সা বেরিয়ে যেত শুধু ট্রাম-বাসের ভাড়া দিতেই। ও যে মাঝে মাঝে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতো, মা ভাবতো মাকে খুশি কবার জন্যে। কিন্তু তা নয়। ভীষণ ক্ষিদে পেত বলে, কলেজের ক্যান্টিনে চা আর শুকনো টোস্ট খেয়ে বাকি পয়সা ফুরিয়ে যেত। মাকে বাবাকে কিছুতেই বোঝাতে পারেনি। অথচ তারই ভিতর থেকে পয়সা বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছে। দীপককে কোনোদিন বলতে পারেনি, কত কষ্ট করে ওকে টেলিফোন করতে হয়। কলেজের কাছেই একটা দোকানে গিয়ে ফোন করতো। কিন্তু সে-এক জ্বালা। কলেজের বন্ধুরা কেউ সঙ্গ ছাড়তে চাইতো না। ছেলেগুলোকে তবু ঠাট্টা করে সরানো যেতো, ইতু অনুরাধা আরো অনেকে কিছুতেই সঙ্গ ছাড়তো না। ওরা সন্দেহ করতো। যদি-বা ওদের ফাঁকি দিয়ে চলে আসতে পারতো, দোকানের বুড়োটা সরতে চাইতো না। বুড়ো বয়সেও কথাগুলো শোনার জন্যে কান পেতে থাকতো। ওতেই ওদের আনন্দ। কিন্তু টেলিফোনের জন্যে কড়কড়ে পাঁচ-আনা পয়সা দিতে বড্ড গায়ে লাগতো রাখীর। যেদিন রং-নাম্বার হয়ে যেতো কিংবা দীপককে পাওয়া যেতো না, সেদিন মনমেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে যেতো। আরেকবার ফোন করতেও পারতো না। যেদিন ওদিকে খদ্দের থাকতো রং-নাম্বার হলে বুড়োটাকে জানাতো না। এখন ইতু সবই জানে, ফোন করার সময় সঙ্গে থাকে, কিন্তু সেও এক অসুবিধে। দীপক রাগ করলে, ও আবেগের গলায় কথা বলতে পারে না। একদিন বলেছিল। শুনে ইতু উপদেশ দিয়েছিল, এত কিসের রে! সাধতে যাবি কেন। ওব না পোসায়, টুসকি দিলে কত ছেলে তোকে লুফে নেবে।

ইতুই বোধহয় ছেলেদের ঠিক বোঝে। শুধু রাখীই ভাবতো, প্রেম আছে। আজ সে-ভুলও ওর ভেঙে গেল। দীপক ওকে কি ভেবেছে কে জানে। হয়তো ভেবেছে, আর সব মেয়েদের মত রাখীকেও গাড়ি দেখিয়ে, ভাল রেস্টোরেন্টে নিয়ে গিয়ে ওর মন ভুলিয়েছে।

অথচ ঠিক সময়ে পৌঁছনোব জন্যে রাখী কোন কোনদিন ট্যাক্সি করতে বাধ্য হয়েছে।

দাদার কাছে দে না দাদা, দে না দাদা, মা'র কাছে হাত পাতা—সে-সব যেন কিছু নয়।

এত দুঃখের মধ্যেও রাখী হেসে উঠলো।—আমি সকালেই জানতাম সাংঘাতিক কিছু একটা হবে।

অতীশ সান্ত্বনা দেবার জন্যে রাখীর হাতের ওপর হাত রাখলো।—কি করে?

নার্ভাস হাসি হাসলো রাখী। একে একে সব কথা, ওকে কাল দেখতে আসার কথা বলে ফেললো।

অতীশ হেসে উঠল। বললে, তবে আর ভয় নেই।

—ভয় নেই? রাখী মুখ ফিরিয়ে অতীশের চোখের দিকে তাকালো।

অতীশ আবার হাসতে হাসতে বললে, সকালে পৌঁছেই ইতু বরং সঙ্গে যাবে আপনার। বলবে, বিয়ের কথায় রাগ করে আমাদের বাড়িতে ছিল।

রাখীর মুখ হাসি হয়ে উঠল। ও অতীশের দিকে তাকালো মুগ্ধ দৃষ্টিতে। বললে, ঠিক ঠিক, ইতুদের বাড়ি কেউ চেনে না।

অতীশ রাখীর হাতের ওপর থেকে হাতটা তুলে নিয়ে রাখীর কাঁধের ওপর রাখলো। সান্ত্বনা দেবার জন্যে।

অতীশের হাতের স্পর্শ রাখীর খুব ভাল লাগলো। অতীশ কত সহজ। অতীশের হাত কিছু বলতে চাইলো কিনা রাখী বুঝতে চেষ্টা করলো না।

ছোট্ট একটা ঘটনা, গাড়ি স্টার্ট নিলো না। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীটা বদলে গেল ওর চোখে। দেখল, জীবনটা পিকনিক নয়। দেখল দীপক দীপক নয়, মানুষগুলো সব বদলে গেছে। ও এখন শুধুই একটা সান্ত্বনার হাত চাইছিল। যে কোনো হাত।

২১

ঘরের মধ্যে এখন চারজন। চারজনই একেবারে চুপচাপ। ওদিকের খাটে সোমনাথ। এদিকের খাটে এক কোণে নন্দিতা হাঁটু মুড়ে বসে আছে, আর ধার ঘেঁষে উপুড় হয়ে শুয়ে ইতু তাকিয়েছিল দীপকের দিকে। দীপক পাশ ফিরলো, ইতুর সঙ্গে চোখাচোখি হল। সঙ্গে সঙ্গে ও চোখ সরিয়ে নিলো অস্বস্তিতে।

ইতু খুব আস্তে আস্তে হঠাৎ বললো, দোষ আপনারই।

দীপক আবার তাকালো ইতুর দিকে। আবার চোখ সরালো। এবার অস্বস্তি অন্য কারণে। ইতুর শরীরটা এখন লোভের শিশির মেখে ফুটন্ত পদ্ম হয়ে আছে।

দীপক চোখ নামিয়ে বললে, এখন সব দোষই তো আমার। আমার যেন কোনো ভাবনা থাকতে নেই, আমার বাড়ি ঘর নেই, বাড়িতে রুগ্‌ণ মা'র জন্যে কোনো চিন্তা নেই।

—আপনার মা'র অসুখ, আপনি তো বলেননি?

দীপক কোনো জবাব দিল না। ওর মন এমনিতেই বিষিয়ে ছিল, তারপর গাড়ি, গাড়ি। নিজেকে ওর তখন অত্যন্ত অসহায় আর অপমানিত লেগেছে। এই গাড়িটাই যখন ওর মাথার ওপর চেপে বসেছে, যখন বুঝতে পেরেছে ও একটা অসহায়তার জালের মধ্যে আটকা পড়ে গেছে, তখন ওই পাঁচ পাঁচটা মানুষ দীপকের চোখে মনে হয়েছে স্বার্থপর, স্বার্থপর। সবচেয়ে স্বার্থপর রাখী নিজে। দীপককে ফেলে রেখে পালাতে পারলে বাঁচে। ট্রেন কিংবা কোনো গাড়িতে লিফ্‌ট পেলে নিশ্চয়ই ওরা চলে যেতো দীপককে একা ফেলে রেখে। দীপকের মনে হল ওর চোখ খুলে গেছে। ওর মনে হল, জীবনটা ঠিক পিকনিক নয়। মা'র কথা ওর একটুক্ষণ আগে মনে পড়েছে! অ্যাপেণ্ডিসাইটিসের ব্যথা ওঠে মাঝে

মাঝে, কিছুতেই অপারেশন করাবে না। বাবা বড্ড ভালমানুষ, জানেই না হঠাৎ কিছু হলে কি করতে হবে। দীপক নিজে বাড়িতে থাকলে, আর ওর গাড়িটা—দীপক একটুও ভয় পায় না। তেমন তেমন কিছু হলে পনেরো মিনিটে ও মাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারবে, কিংবা নার্সিং হোমে। চেনাজানা সার্জেনকে ফোন করে ব্যবস্থা করতে পারবে। দীপকের ভয় হল আজই রাত্রেই না বিশেষ কিছু ঘটে যায়। অপারেশন করার আগে অ্যাপেণ্ডিসাইটিস বার্স্ট করলে আর নাকি বাঁচানো যায় না। সারাজীবন সেই অনুশোচনায় দগ্ধ হতে হবে তখন। ছোট বোন মিনু তখন বলবে, দাদা, তুই মাকে মেরে ফেললি! বাবার চোখ বলবে, অপদার্থ, অপদার্থ! দীপক নিজেও দুঃখে শোকে...ভাবতেও ভয়, দীপক ঘেমে উঠলো। রাখীর খেয়াল-খুশি রাখতে গিয়ে কি বোকামিই না করে বসেছে। রাখীর ওপর এখন দীপক তিক্ত-বিরক্ত।

—এই দীপকদা, আপনি অমন গোমড়া মুখ করে থাকবেন না। খাট থেকে হাত বাড়িয়ে ইতু দীপকের জামা ধরে টানলো।

দীপক তাকালো, হাসবার চেষ্টা করলো। বললে, তুমি বুঝবে না ইতু, আমার ভিতরটা আজ কি হয়ে গেছে তুমি বুঝবে না। কিন্তু চোখ সরিয়ে নিলো।

ইতু আবার হাত বাড়ালো।—এই তাকান, আমার দিকে তাকান, শুনুন। আমি বলছি, কিচ্ছু ভাবনা নেই আপনার, মা'র জন্যে কিচ্ছু ভাবনা নেই, দেখবেন।

কথাগুলো কেমন যেন দীপককে আশ্বস্ত করলো। কিংবা ইতুর কথাতেই নিজেকে নিজে সান্ত্বনা দিল। দীপকের মনে হল ইতুকে ও চিনতেই পারেনি। ইতু কত ভাল, কত নরম মন ওর। বাড়ির সম্পর্কে ওরও তো দুর্ভাবনা, তবু দীপককে কত স্নিগ্ধভাবে ও সান্ত্বনা দিচ্ছে। রাখী শুধু নিজের কথাই ভাবতে জানে।

রাখীর কথা মনে পড়লো দীপকের, কিন্তু ও মুখে বললো, আরে, অতীশ তো ফিরলো না।

ইতু বললে, সত্যি। রাখী কোথায় গেল তবে!

ইতু খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো, ভায়োলেট রঙের কার্ডিগানে শুধু বাঁ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, চলুন, চলুন, কি ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না।

দীপক অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে পড়লো। বললে, কোথায় আর যাবে, এখানেই আছে কোথাও।

ওরা দু'জনেই বেরিয়ে এল। সার্কিট হাউসের বারান্দায় দাঁড়ালো, এদিকে ওদিক তাকালো। সামনের হল্-এ আলো জ্বলছে, বেহুঁস চৌকিদার তেমনি পড়ে আছে মেঝের ওপর। টেলিফোনের দিকে চোখ যেতেই দীপকের মনে হল এখান থেকে হয়তো ট্রাংক কল্ করা যায়। ইতু ভাবলো, আরেকটু আগে টেলিফোনের কথা মনে পড়লে হতো। বাড়ি ফিরে কি অজুহাত দেবে মনে মনে অনেকরকম ভেবে রেখেছে ইতু। ভেবে রেখে কোনো লাভ হয় না। ফিরে গিয়ে থমথমে আবহাওয়াটা দেখে হঠাৎ যেটা মুখে এসে যায়, সেটাই দেখেছে সবচেয়ে ভাল। কিন্তু আজকের কথা অন্য। আজ যে সারা রাত্রি বাইরে কাটাতে হল। ও ভাবতেই পারছে না কি বলবে ও ফিরে গিয়ে। কি আর বলবে। 'অনুরাধাদের বাড়ি এসেছিলাম এ পাড়ায়, সন্ধে থেকে ভীষণ গোলমাল, বোমা ফাটছে, হৈ চৈ, আজ এখানেই থেকে যাচ্ছি।' ফোনে দিব্যি বলে দেওয়া যেতো। না, ট্রাংক কলে বলা অসুবিধে ছিল।

—কৈ, রাখী অতীশ কাউকেই তো দেখছি না। দীপক হঠাৎ বললে।

ইতুও চারপাশ তাকিয়ে দেখলো। ভাবলে, সামনের রাস্তা দিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখা যাক্। ইতু দু'চার পা এগিয়ে গেল। দীপকও।

সমস্ত শরীরে অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ জাগলো ইতুর। আশ্চর্য, আশ্চর্য। মধ্যরাত্রিকে ও

কোনোদিন দেখেনি, মাঝরাত্রের লোকালয় কোনোদিন না। ওর হঠাৎ মনে হল পৃথিবী ঘুরতে ভুলে গেছে, থেমে গেছে। সমস্ত পৃথিবী নিস্তব্ধ, কোথাও কোনো শব্দ নেই। নিজেদের পায়ের শব্দ ছাড়া। সামনের রাস্তাটা বাজারের ভিতর দিয়ে ব্রীজে গিয়ে উঠেছে। তখন এক চেহারা ছিল, এখন একেবারে অন্য।

দীপক হঠাৎ বললে, গাড়িটা কেন স্টার্ট নিলো না বুঝতে পারছি না।

ওর মাথার মধ্যে আবার গাড়িটা তখন ফিরে এসেছে। দিব্যি এতখানি পথ এল, কোথাও কোনো গোলমাল হল না, অথচ ফেরার সময়....কীই-বা হতে পারে।

ইতু হাসলো। বললে, যন্ত্র যন্ত্রই। কেন এত ভাবছেন। কাল সকালে মেকানিক এলেই ঠিক হয়ে যাবে।

দীপক কোনো কথা বললো না। ওর মনে হল কোনো কিছুই আর আগের মত ঠিক হয় না।

ইতু খুব ধীর পায়ে রাস্তা বেয়ে হাঁটতে হাঁটতে বললে, আপনার মা'র কি অসুখ বললেন না?

দীপক বললে, যে-কোন সময়ে বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে। মাকে ছেড়ে আমি কোথাও থাকতে পারি না। সব সময়ে ভয় হয়...

ইতু হাল্কা পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে বললে, কিচ্ছু হবে না, কোনো ভয় নেই, দেখবেন আমি বলছি কিচ্ছু হবে না। তারপর এদিক ওদিক ও তাকালো রাখীর খোঁজে, অতীশের খোঁজে। নিজের মনেই বললে, কিন্তু কোথায় গেল ওরা। রাখী বড্ড জেদী।

দীপকের মন বললো, সত্যি, রাখী বড্ড জেদী। ইতু সে জায়গায় কত নরম মনের মেয়ে। ইতুকে ও যেন এতকাল চিনতেই পারেনি, বুঝতেই পারেনি। বাইরে কঠিন, কথায় ঝকমকে, অথচ ওর ভিতরটা ঝিনুকের মত, জ্যান্ত ঝিনুকের মত নরম। আঘাত পেয়েছিল নিশ্চয়ই কখনো, একটা বালির কণা বিঁধে গিয়েছিল শরীরে। খোলস দিয়ে দিয়ে মুক্তো হয়ে গেছে।

—তোমাকে কেউ চিনতে পারে না ইতু, আমিও পারিনি। দীপক ধীরে ধীরে বললে।

ইতু হাসল।—আমি তো নিজেই নিজেকে চিনি না। আমার সত্যি এক একবার রাখীর মত ভাল হতে ইচ্ছে করে।

দীপক কোনো কথা বললো না।

কোথাও কোনো আলো জ্বলছে না। কোথাও কোনো শব্দ নেই। শুধু শ্বেতপদ্ম জ্যোৎস্না হয়ে আকাশে ফুটে আছে। ব্রীজের ওপর সেই আলো, নদীর জলে, রাস্তায়, গাছের মাথায়, বাড়ির ছাদে।

ব্রীজে ওঠার বাঁকটিতে হঠাৎ থেমে পড়লো দীপক। ইতুও। এদিক ওদিক তাকালো।

ইতু বললে, রাখী বোধ হয় এদিকে আসেইনি।

দীপক বললে, বাগানের ওদিক দিয়ে বোধ হয় রাস্তা আছে, কিংবা নদীর দিকে যাওয়া যায়।

—চলুন ফিরি।

দীপক দাঁড়িয়ে রইলো একমুহূর্ত। যেন ইতুর কথাটা ওর কানেই যায়নি। 'আমার সত্যি এক একবার ভাল হতে ইচ্ছে করে।' ইতুর সেই কথাটাই এখনো ওর কানে বাজছে। দীপকের হঠাৎ মনে হল ইতুর পাশে পাশে হাঁটতে ওর ভীষণ ভাল লাগছে। ইতুর দীর্ঘ শরীর, শরীরের ছন্দ, ইতুর কাঁধ এক একবার ওর বাহু ছুঁয়ে যাচ্ছে...ইতু কত সহজভাবে হাঁটছে। দীপকের মনে হচ্ছে ইতুর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে ও কোনো দিন ক্লান্ত হবে না।

—তুমি তোমার মতই ভাল থেকো। 'আমার সত্যি এক এক সময় রাখীর মত ভাল হতে

ইচ্ছে করে’ কথাটার জবাব হিসেবেই ও যেন এতক্ষণে বললো।

ইতু হাসলো।—কাউকে কষ্ট দিয়ে আমার ভাল থাকতে ইচ্ছে করে না। কারো কষ্ট দেখলে আমি পারি না····

দীপক আবার হাঁটতে শুরু করেছে তখন, ব্রীজের দিকে।

ইতু বললে, ফিরে চলুন। এখন অনেক রাত। রাখীরা হয়তো ফিরে গেছে।

দীপক বললে, গাড়িটা আমাকে টানছে, ইতু। গাড়িটা একবার দেখে যাই। তখন রাগের মাথায় মনে হয়েছিল, ওটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেলি।

ইতু হেসে উঠল।—আপনার ভালবাসার নিয়মই ঐরকম।

দীপক হাসল।—এখন ওটাকে ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। আমার চোখ খুলে দিয়েছে ওটা।

ইতু হাসল।—দীপকদা, সব ভুল। আমরা কেউ কাউকে চিনতে পারি না।

ব্রীজের ওপর দিয়ে তখন ওরা হাল্কা পায়ে হেঁটে চলেছে। হেঁটে যেতে যেতে ইতু একবার সার্কিট হাউসের দিকে ফিরে তাকালো। পরক্ষণেই আবার। নদীর ঘাটের সিঁড়িতে জ্যোৎস্নায় মাখা দুটি মানুষকে দেখতে পেল ও। পাশাপাশি।

ইতু হঠাৎ দীপকের হাত ধরে ফেলেছে তখন, হয়তো বলে উঠতো কিছু, কিন্তু কিছু বললো না ও।

হাতটা না ছেড়েই ও বললে, আমরা সব তাসের মত দীপকদা, শাফ্‌ল্ করলেই পরিচয় বদলে যায়। ফিরে গিয়েই দেখবেন, রাখী ঠিক সেই আগের মতই।

—ফিলজফি শুনিয়ো না। দীপক ইতুর হাতে একবারটি চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল।

ইতু হঠাৎ গাঢ় দীর্ঘশ্বাসে বললে, সত্যি, দীপকদা, বলুন তো, প্রেম বলে কিছু আছে? আমরা শুধুই বোধ হয় রুমালচোর খেলছি।

দীপক মুখোমুখি ঘুরে দাঁড়ালো। ওদের দু’জনের শরীরের ওপর তখন অঝোর ধারায় জ্যোৎস্নার রেণু ঝরে পড়ছে। কার্ডিগানটা কখন পরে নিয়েছে ইতু। ইতুর শরীরটাকে সেই মুহূর্তে আলোর ঝর্না মনে হল দীপকের। পাথরে পাথরে ধাক্কা খাওয়া অশ্রুর বন্যার মত।

দীপক ইতুর চোখের দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে বললে, আছে, এইমাত্র আমি আবিষ্কার করেছি, আছে।

২২

দুখানা সিংগল বেড খাট, মাঝখানে দেড় ফুট ফাঁক। এদিকের খাটে হাঁটুমুড়ে বসে ছিল নন্দিতা। ওদিকের খাটে সোমনাথ কনুইয়ের ভর দিয়ে আধশোয়া। ঘরের মধ্যে শুধু ওরা দু’জন। কিন্তু নন্দিতার এখন আর কোনো অস্বস্তি লাগলো না। সমস্ত হাওয়াটা এখন বদলে গেছে। নন্দিতা হাঁটুর ওপর মুখ নামিয়ে চোখ বুজে বাড়ির ছবিখানা দেখে নিচ্ছিল। বাবা চুপচাপ, মা’র মুখ থমথমে। নন্দিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মা নন্দিতার চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। একটাও কথা বলছে না। মনে হচ্ছে, এক্ষুনি একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটবে। তার আগেই দাদা এগিয়ে এল পাশের ঘর থেকে, অবাক হয়ে তাকালো নন্দিতার দিকে। ধুলোয় বাতাসে নন্দিতার রুক্ষ চুল, শাড়িতে ক্লান্তির ভাঁজ, চোখেমুখে রাত জাগার ছাপ—দাদা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো। তারপর দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, যেখান থেকে এসেছিস সেখানেই ফিরে যা। এক্ষুনি, এক্ষুনি।

—দেখি আপনার হাতটা! সোমনাথের গলা শুনতে পেল ও।

চোখ তুলে তাকালো। সোমনাথ আধশোয়া ভঙ্গিতেই ওর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, দেখতে পেল। নন্দিতা বুঝতে পারলো না, তবু বাঁ হাতখানা বাড়িয়ে দিল। মুখে বললে, কেন ?

সোমনাথ হাত বাড়িয়ে নন্দিতার হাতটা কাছে টেনে নিয়ে কি যেন দেখলো। তারপর বললে, জানতাম।

নন্দিতা তখনো বুঝতে পারলো না। ও ভাবলো সোমনাথ হাত দেখতে জানে। সাংঘাতিক কিছু হবে সেইটুকুই বলতে চায়। তাই নার্ভাস গলায় বললে, কি দেখলেন ?

—টেলিফোন নম্বর। নেই, মুছে দিয়েছেন।

এতক্ষণে নন্দিতার মনে পড়লো। ও সত্যিই ভেবেছিল ব্যাগের মধ্যে কোনো কাগজের টুকরোয় লিখে রাখবে। কিন্তু তারপর কত কি ঘটে গেল, গাড়ি স্টার্ট নিলো না, বাথরুমে গিয়ে মুখহাত ধুয়েছে সকলেই—মুছে তো যাবেই। এর পর নন্দিতা হয়তো আবার জেনে নিতো। কিন্তু সোমনাথটা কি ! ও এখনো ঐ-সব প্রেমট্রেমের কথা, দেখা করার কথাই ভাবছে ! নন্দিতার মধ্যে এখন যে কি হচ্ছে, কি দুর্ভাবনা, তা কি একটুও টের পাচ্ছে না ?

সোমনাথের খবর ও একটু একটু জেনেছে। কোন একটা ব্যাঙ্কে কাজ করে, সকালে ল' কলেজ। থাকে হোস্টেলে। ওর আর ভাবনা কি। কিন্তু তা বলে নন্দিতার কথাও ভাবছে না ?

সব ব্যাপারটা খুলে বলতে নন্দিতার ইচ্ছে হল না। ছেলেগুলো অবুঝ, ওদের কিছু বোঝাতেও ইচ্ছে করে না।

কিন্তু সোমনাথ সত্যিই অবুঝ নয়। ও ধীরে ধীরে বললে, আপনি নিশ্চয় বাড়ির কথা ভাবছেন !

নন্দিতা মুখে হাসি আনার চেষ্টা করলো।—কি করে বুঝলেন ?

—আপনি আবার অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন।

—বোধহয় সেই ভদ্রলোকের কথা ভাবছিলাম।

কথাটা মিথ্যে, জেনে গেছে সোমনাথ। তাই চুপ করে রইলো, কোনো কথা বললো না।

নন্দিতা হঠাৎ অভিমানে ফেটে পড়লো, চোখ ছাপিয়ে জল এল। বলে উঠল, আপনারা কি ভাবেন বলুন তো আমাদের !

অভিমান শুধু সোমনাথের ওপর নয়। শুধু দীপক অতীশদের ওপর নয়। এর আগেও যে দু'একজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তাদের ওপরও। ওরা কেউ বুঝতে পারে না যে, নন্দিতা নিজেও ভালবাসতে চেয়েছে, নন্দিতার মনেও রোমাঞ্চ জেগেছে। ভালবাসা দিতে গেলেই ওরা তাকে সস্তা করে দেয়। যেন বাড়ির জন্যে, বাবা-মা'র জন্যে ওদের কোনো ভয় থাকতে নেই। ছেলেদের ভালবাসা এত হিংস্র হয় কেন, নন্দিতা বুঝতে পারে না। ওরা চায় ভালবাসতে হলে সমস্ত শরীর মন জুড়ে শুধু একটাই চিন্তা থাকবে—প্রেম। শুধুই একজন তাকে সর্বগ্রাসী হয়ে ঘিরে থাকবে।

সোমনাথ এতক্ষণে সান্ত্বনার সুরে বললে, সত্যি, পিকনিকে এসে মিথ্যে আপনাকে বিপদে ফেলা হল।

—আমাদের আর বিপদ কি। নন্দিতা অভিমান চাপা দেবার জন্যে হেসে উঠল।

সোমনাথ ধীরে ধীরে বললে, আপনার বাড়ির সকলে নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে।

সোমনাথের এবার সত্যি কষ্ট হল নন্দিতার জন্যে। ও হাত বাড়িয়ে নন্দিতার হাতখানা ধরলো আবার ! মনে হল নন্দিতা থরথর করে কাঁপছে, দুঃখে অভিমানে ! কিংবা দুর্ভাবনায় !

বললে, ফিরে গিয়ে আপনাকে নিশ্চয় খুব কথা শুনতে হবে !

—জানি না। নন্দিতা চুপ করে রইলো। তারপর বললে, আমি আর ভাবতে পারছি না। আমি কিছু লুকোব না, সব বলবো। আমি তো কিছু অন্যায় করিনি, যে যা ভাবুক, আমি তো জানি আমি কোনো অন্যায় করিনি।

সোমনাথ চমকে চোখ তুলে তাকালো নন্দিতার দিকে। ওর ভীষণ ভাল লাগলো নন্দিতাকে। নন্দিতার কথা। লাল পাড় কোরা শাড়িতে ওকে একটা বিশুদ্ধ আগুনের শিখার মত মনে হল। মনে হল সেই আগুনের শিখায় ও কেবলি নিজেকে বিশুদ্ধ করছে।

সোমনাথ ধীরে ধীরে বললে, লুকোবার মত কোনো অন্যায় আমরা কেউই করিনি।

—টেলিফোন নম্বরটা মুছে ফেলেছি বলে আপনি দুঃখ পাচ্ছিলেন! অনেকক্ষণ পরে নন্দিতা বললো।

সোমনাথ বললে, এখন আর পাচ্ছি না। জানি, আপনার যদি সত্যি সত্যি কোনোদিন ইচ্ছে হয়, আপনি আর দীপকদের কাছেও লুকোতে চাইবেন না।

—আপনার দেওয়া এই টগর ফুল আমি লুকোইনি। বলে নন্দিতা হাসল। চুল থেকে টগরটা খুলে দেখালো।

সোমনাথ হাত বাড়িয়ে ফুলটা নিজের হাতে নিল। নাকের কাছে নিয়ে গিয়ে গন্ধ শুঁকলো, গালে কপালে ছোঁয়ালো। দেখল, ফুলটা তখনো দিব্যি তাজা, শুকিয়ে যায়নি।

নন্দিতা হাত বাড়িয়ে বললো, কই দিন, ফেরত দিন।

সোমনাথ দিল না। নিজের পাঞ্জাবীর পকেটে রেখে দিল। বললে, এখন তো আমার আর কিছুই নেই।

নন্দিতা মৃদু হেসে বললে, তখনো কিছুই ছিল না, তবু তো দিয়েছিলেন।

—তখন ভবিষ্যৎ ছিল। সোমনাথ হাসল। বললে, এখন অতীতটুকুই আছে। আমি এটা যত্ন করে রেখে দেব আমার ডায়েরীর পাতার ফাঁকে। এর শুকনো পাপড়িগুলো মাঝে মাঝে দেখবো। গন্ধ শুঁকবো।

নন্দিতা বললে, আমরা বোধহয় শুধুই একটা ডায়েরীর পাতা।

সোমনাথ হাসল।—আপনারও নিশ্চয় একটা ডায়েরী আছে, না-লেখা ডায়েরী। তার সব পাতাগুলোই তো আপনি।

নন্দিতা হাসল।—ঠিক বলেছেন। কিন্তু যে-পাতা যাকে নিয়ে লিখে থাকি না কেন, সে-পাতা শুধু আমিই। একা আমি।

সোমনাথ চুপ করে রইলো। ওর মনে হল, ওরা হাসতে হাসতে যেন খুব গভীর কোনো কথা বলে ফেলেছে। ওর মনে হল, খুব সত্যি কোনো কথা বলে ফেলেছে।

সোমনাথ হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসের মত করে বললে, আমরা সব-সময়েই একা। পিকনিকে আসার সময় মনে হয়েছিল, আমরা সব এক হয়ে গেছি। অথচ দেখুন, শুধু একটা গাড়ি স্টার্ট নিলো না, এখন আমরা প্রত্যেকে একা।

নন্দিতা বললে, ফুলটা আমাকে ফেরত দিন।

—কেন? ফেরত নিতে চাইছেন কেন?

ও গাঢ় গলায় বললে, এখন তো স্মৃতিই আমার একমাত্র সঙ্গী।

২৩

গাড়িটার ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল দীপকের। একটা ছোট্ট সুখ ওর জীবনটাকে সবদিক থেকে তেতো করে দিতে পারে ও জানতো না। মাঝে মাঝে ওটাকে নিয়ে ও ব্যতিব্যস্ত

হয়েছে। টুকটাক এটা-ওটা গোলমাল হলেই ও বিরক্ত হয়ে উঠতো। কখনো কখনো ভেবেছে, ওটাকে বেচে দিয়ে স্বাধীন মানুষ হয়ে উঠবে। তখন আর অতীশ বলবে না, 'অত রাখী রাখী করিস না, সব জানা আছে, ও তোর গাড়ির প্রেমে পড়েছে।' দীপকের নিজেরও এক-একবার সন্দেহ হয়েছে। অতীশ একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, 'প্রেম-ফ্রেম বাজে, আসলে আলাপ হওয়া। আমার সঙ্গে আগে আলাপ হলে আমারই প্রেমে পড়তো।' দীপকের কখনো কখনো তেমন সন্দেহও হয়েছে। তাই রাখীর জন্যে ওর যতখানি গর্ব ততখানি ভয়। রাখীর খামখেয়ালীপনার জন্যে দীপক তো ভিতরে ভিতরে অনেক সময় বিরক্তই হয়। অথচ রাখীর মতই গাড়িটার জন্যেও ওর গর্ব। কিন্তু সেটা শেষ অবধি এমন অবিশ্বাসী হয়ে উঠবে, ও ভাবতেই পারেনি। এমন তো কোনোদিনই হয়নি। গাড়িটার ওপর দীপকের প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল, অথচ গাড়িটা ওকে রহস্যের মত টানছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল, আরেকবার গিয়ে দেখি, এই রাত্রেই। দিব্যি এখান অবধি পৌঁছে দিল, কোথাও কোনো ঝামেলা বাধালো না। অথচ ফেরার সময় কেন যে স্টার্ট নিতে চাইলো না দীপক বুঝতেই পারছে না। 'সব তোমার চক্রান্ত', ভাবলেই মাথায় রক্ত উঠে যায়।

হাইওয়ে ধরে ইতুর পাশাপাশি হাঁটছিল ও। ফুটফুট করছে আলো, ব্রীজ থেকে নেমে চওড়া পীচের হাইওয়ে এখন আলোয় ধোয়া। নিশুতি রাত আলো মেখে কেমন একটা গা-ছমছম রহস্যের মত।

কোত্থেকে কি যে হয়ে গেল, দীপক এখন আর ভাবতেও পারছে না। কেন এমন হল ? রাখীকে ও তো এতদিন ভালবেসে এসেছে ; রাখীও। ব্রীজের ছায়ায় বালির ওপর ওরা দু'জনে যখন বসেছিল, তখন রাখীর চোখে ও নিজের ছায়া দেখেছে। রাখী ওর কাছে ধরা দিতে চেয়েছিল, রাখীর দুটি চোখে কপালে ঠোঁটের ওপর স্পর্শে ও স্বীকৃতি অনুভব করেছিল। ঠিক সেই সময়েই ভিখিরি ছেলেটা এসে সব বিস্বাদ করে দিয়ে গেল। তবু দীপকের ভালবাসা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়নি। অথচ গাড়িটা যেই স্টার্ট নিলো না, অমনি দীপকের মনে হল সব যেন মুহূর্তে বদলে গেল। দীপক নিজেও। রাখী আরো। দীপকের এখন মনে হচ্ছে রাখী ওর একেবারেই অচেনা। রাখীকে ও যেন একটুও চিনতো না। ইতু, ইতুও যেন হঠাৎ বদলে গেছে। ওকে কেমন রহস্য রহস্য মনে হতো, আজ এখন ইতুকে যেন অন্য আলোয় দেখছে ও। খুব আপন মনে হচ্ছে। এখন ও শুধুই রহস্য নয়।

—চারদিকে কি সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটফুট করছে, এত আলোর রাত আমি কখনো দেখিনি। ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে ইতু বললো।

দীপক হঠাৎ ভাবলো, এমনি আলোই ছিল তখন। কিন্তু মিস্ত্রীটা যখন ব্যাটারীতে তার লাগিয়ে বাল্‌ব জ্বাললো, সব উল্টে গেল। শুধু ঐ বাল্‌বের আলোকেই মনে হল একমাত্র আলো, চারদিকের ফুটফুটে জ্যোৎস্নাকে মনে হচ্ছিল গাঢ় অন্ধকার। গাড়িটা হঠাৎ খারাপ হয়ে এখন সবই যেন তেমনি পাল্টে গেছে।

ইতুর সুন্দর শরীরটার দিকে একবার স্থির হয়ে তাকালো দীপক। 'আমরা তো সব এক প্যাকেট তাসের মত।' দীপক নিজেকে প্রশ্ন করলো, সত্যি বোধহয় আমাদের নিজেদের কোনো পরিচয় নেই, কোনো চরিত্র নেই। একবার শাফ্‌ল করলেই আমরা এক একজনের পাশে এসে দাঁড়াই। তখন আমাদের সব কিছু বদলে যায়। ইতু এখন আর একটাও স্মার্ট কথা বলছে না। ও এখন যেন গভীরের মধ্যে ডুবে যাচ্ছে।

—রাখী কিন্তু আপনাকে খুব ভালবাসে। ইতু হঠাৎ বললে। যদিও দীপকের সঙ্গে এই নির্জনতার মধ্যে হাঁটতে ওর ভাল লাগছিল। সেজন্যেই সার্কিট হাউসের সামনের ঝোপের নীচে শান বাঁধানো ঘাটে দুটি ছায়ার শরীর দেখেও দীপককে কিছু বলেনি। ভেবেছিল, তা হ'লেই এই ভাল-লাগাটুকু দম বন্ধ হয়ে মরে যাবে।

কিন্তু রাখীর কথা দীপকের একটুও ভাল লাগলো না। চক্রান্ত! যেন সত্যিই শুধু একটা শরীরের লোভে দীপক এমন একটা চক্রান্ত করতে পারে।

ও চাপা গলায় বললে, ঐ গাড়িটার কাছে একবার যাব। গাড়িটা আমাকে টানছে।

ইতু হাসলো।—গাড়িটার মধ্যে আপনি বাঁধা পড়ে গেছেন।

দীপকের মন বললো, প্রেমের মধ্যে। রাখীকে ভালবেসে ওর সব কল্পনা হারিয়ে গিয়েছিল। দীপকের এক একসময় মনে হতো ও ভালবাসার খাঁচায় আটকে পড়েছে। বন্দী হয়ে গেছে। ইতুর সুন্দর শরীর, ওর বুকের ওপর লুটিয়ে পড়া পুরুষ্টু বেণী, ওর চলার ছন্দ, হাসি, এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবী দীপকের মন আলো করে দিয়েছে। অথচ এখনও ভেঙে যাওয়া একটা তিক্ত প্রেম ওকে বেঁধে রেখেছে। ঐ তিক্ততাকে বয়ে নিয়ে বেড়ালেই দীপক ভাল, ভীষণ ভাল।

ইতু, ইতু, আমার বুকের মধ্যে একটা অশান্তি জ্বলছে। ইতু, ইতু, আমার ইচ্ছে করছে তোমার কানের পাশে একটা তীব্র সত্য উচ্চারণ করতে। এখন আমরা সকলেই একা। আমরা প্রত্যেকে। আমরা একাই ছিলাম, একাই থাকবো। তবু রাখী আমাকে বন্দী করে রেখেছে, আমার সব সাহস কেড়ে নিয়েছে। আমি সেই সত্যি কথাটা বলতে ভয় পাচ্ছি।

—তোমাকে আজ একটা সুন্দর রহস্যের মত লাগছে ইতু। অথচ খুব চেনা, খুব আপন মনে হচ্ছে। হাইওয়ে থেকে নেমে যাওয়া সরু ঢালু রাস্তাটার বাঁক ঘুরতে ঘুরতে দীপক বললে।

ইতু কোনো কথা বললো না। দীপকের কথাগুলো ওকে অবাক করলো, ওর খুব ভাল লাগলো। তবু একটা দ্বিধা এসে ওর পথ আগলে দাঁড়ালো।

ইতু বললে, আপনি রাখীব কথা একটুও ভাবছেন না।

রাখীব কথা সত্যিই মনে পড়ছিল দীপকের। মনে পড়ছিল বলেই ওর মন তিক্ত হয়ে উঠছিল।—এই, কলেজের বন্ধুরা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়! রাখী বলেছিল।

দীপকের একটুও ইচ্ছে ছিল না, তবু ও রাজি হয়েছিল।

একটা অল্প খরচের রেস্টোরেণ্টে ওরা এসে বসেছিল।

নিরঞ্জন, অরূপ আর সুধাকান্ত। সুধাকান্তকে ওরা সবাই ডাকনামে 'গোরা' বলে ডাকছিল।

পরিচয় হতেই অরূপ বললে, গোকুলে বাড়ছিলেন, আমরা খবরই রাখিনি। আমরা জানতাম রাখী আমাদেরই।

রাখী হেসে উঠল, সকলেই। দীপক হাসবার চেষ্টা করেছিল। আর রাখী বলেছিল, গোরা, তোর কোনো চান্স ছিল না।

সুধাকান্ত হেসেছিল।—থাকলেও এগোতাম না। নিরঞ্জন আমাকে নক-আউট করে দিতো।

নিরঞ্জন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। দীপকের চোখ এড়ায়নি। নিরঞ্জন বলেছিল, আমি তো ভাবতাম অরূপই···

রাখী হেসে উঠেছিল।—সেই একদিন, অরূপ, তুই তো আমাকে চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলি।

অরূপ হেসে বলেছিল, বাঃ, একদিন তো ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিলি আমার সঙ্গে। আমি ইচ্ছে করলে তোকে হাত করতে পারতাম।

রাখী হেসে উঠেছিল, চেষ্টা তো করেছিলি। কেবল, জানিস গোরা, ফাঁকার দিকে নিয়ে যেতে চাইছিল। কথার মধ্যে হাসিতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল রাখী।—একদিন ট্যাক্সিতে কাঁধে হাত রাখতে চেয়েছিল।

অরূপও হাসল।—নিরঞ্জনের সঙ্গে একদিন সিনেমা গিয়েছিলি শুনেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলাম।

ওদের সমস্ত কথা ভঙ্গি ব্যবহার অসহ্য লাগছিল দীপকের। একটা বিশুদ্ধ প্রতিমাকে কল্পনা দিয়ে গড়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিল দীপক। আর ঐ ছেলেগুলো সেই প্রতিমার গায়ে যেন নোংরা জল ছিটিয়ে দিচ্ছিল। দীপকের সবচেয়ে বেশি রাগ হচ্ছিল রাখীর ওপর। ওর মনে হচ্ছিল রাখী শুধু নিজের সম্মান নয়, দীপকের সম্মানও মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে।

আজ আবার রাখীকে ঠিক তেমনি মনে হল। আজ আবার ও দীপকের সম্মানকেও মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। সেদিনের কথা মনে পড়তেই দীপকের সমস্ত মন তিক্ততায় ভরে গেল। ওর মনে পড়লো সেদিন ওরা সকলেই হেসেছিল, রাখী আরো বেশি। শুধু দীপক নিজেই হাসতে পারছিল না। রাখী আর অরূপের মধ্যে একবার যেন চোখের ইশারা দেখেছিল ও। কিংবা মনের ভুল। তবু একটা সন্দেহের কাঁটা ওর মনের মধ্যে বিঁধে গিয়েছিল।

ইতুর পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অকারণেই সেদিনের কথা মনে পড়লো দীপকের।

ইতু হঠাৎ একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা আমাকে দেখে আজ কি মনে হচ্ছে আপনার ?

ইতু বোধহয় কিছু শুনতে চাইছিল। কিন্তু দীপক ওর দিকে তাকিয়ে খুব আস্তে আস্তে বললে, দেখে মনে হচ্ছে, এ কুইন অফ মিস্ট্রি !

সশব্দে হো হো করে হেসে উঠল ইতু। বললে. আপনার আপাতত একজন মিস্ত্রীর দরকার। কাল সকালেই পাবেন।

দীপক বললে, তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ ইতু।

ইতু কোনো কথা বললো না, শুধু কব্জির ঘড়িটা দেখল। কিন্তু ক'টা বাজছে বুঝতে পারলো না।

ততক্ষণে ওরা গাড়িটার কাছে পৌঁছে গেছে। চাঁদ ঢলে পড়েছে এক কোণে, তখন আর গাড়িটা ফুটফুট করছে না, গাছের ছায়ায় ঢাকা পড়ে আছে।

চাবি লাগিয়ে গাড়ির দরজা খুললো দীপক, উঠে বসলো, ওদিকের দরজার লক্ খুলে দিয়ে ইতুকে বললে, উঠে এসো, তোমাকে আজ আমার অনেক কথা বলার আছে।

—প্রেম আছে, আপনি এইমাত্র আবিষ্কার করেছেন, শুধু এই তো ? ইতু হেসে সমস্ত গম্ভীরতাকে হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু এই পরিবেশের মধ্যে কি যেন ছিল, ওর মনে হল ও একেবারেই বদলে গেছে। ঠিক অতীশকে ও যেভাবে খুশি করে দিয়েছিল, সেভাবে দীপককে খুশি করতে ইচ্ছে হল না। ইতুর মনে হল ও লুকিয়ে লুকিয়ে কি যেন অনুভব করতে চাইছে। ওর মনের মধ্যে কি যেন একটা তোলপাড় চলছে।

দীপকের কথামত ও নিঃশব্দে উঠে বসলো, দীপকের পাশে। 'তোমাকে আজ অনেক কথা আমার বলার আছে।' সেই কথাগুলো শুনতে ইচ্ছে হল ইতুর।

—বলুন, বলুন, কি কথা, কার কথা ? ইতু উৎসুক চোখে তাকালো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দীপক গাড়িতে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করলো। ও ভাবতেই পারেনি। ওকে শুধু নেশার মত টেনে এনেছে গাড়িটা। কিংবা ইতু।

স্টার্ট নেওয়ার শব্দে ইতুও চমকে উঠেছিল।

—কি আশ্চর্য, স্টার্ট নিয়েছে ইতু, স্টার্ট নিয়েছে। আনন্দে বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল দীপক। ও ঝট্ করে ইতুকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেল।

ইতু হেসে উঠল, আরে, আমি রাখী নই, আমি রাখী নই।

গাড়িটা তখন সত্যিই প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠেছে। স্টার্ট নেওয়ার শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ, একটানা আওয়াজ শুনতে পেল ইতু।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দীপক যেন ক্লান্তিতে ভেঙে পড়লো। ক্লান্ত অবসন্ন মাথাটা ঢলে পড়লো ইতুর কাঁধের কাছে। ইতু দীপকের মাথাটা কাঁধের ওপর টেনে নিলো পরম অন্তরঙ্গতায়। তারপর ধীরে ধীরে বললে, এখন আমি রাখী, আমিই রাখী।

দীপক তখন ভাবছে, গাড়িটা হঠাৎ স্টার্ট নিয়ে যেন আরো একটা চক্রান্ত করে ফেলেছে। ও বিষণ্ণতায় শ্রান্তিতে ধীরে ধীরে বললে, ইতু, আমি ভয়ঙ্কর একা। এখন আর আমাকে বিশ্বাস করা যায় না।

সেই নির্জন নিঃশব্দতার মধ্যে তখন স্টার্ট দেওয়া গাড়িটা আইড্‌ল্ স্পীডে উদ্দীপ্ত হৃৎপিণ্ডের মত থর থর করে কাঁপছে। ইতু আর দীপকও।

২৪

গাড়িটা স্টার্ট নিতেই দীপকের মন এক পলকের জন্যে ফাটা-হাউই আনন্দে ভরে উঠেছিল। পরক্ষণেই ওকে শ্রান্ত বিষণ্ণ মনে হল। দীপক ভাবলো, এখন আর আমাকে কেউই বিশ্বাস করবে না। হয়তো ইতুও না।

গাড়িটা ব্রীজের ওপর উঠতেই ওর মনে হল, আমরা তো কেউ কারো বিশ্বাস রাখি না। আমরা নিজেরাই একটা চক্রান্তের মধ্যে পড়ে গেছি। আমরা সকলেই বোধহয় কিছু একটা খুঁজতে চাই। কি তা নিজেরাই জানি না। তাই অকারণ আমরা ভালবাসা খুঁজছি। তাও আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। দীপক ভাবলো, আমাদের সত্যিই কোথাও যাবার নেই। কোথাও যাবার নেই বলেই আমাদের একটিমাত্র যাবার জায়গা—প্রেম। কিন্তু সেখানেও আমরা পৌঁছতে পারি না। ঠোঁটের উষ্ণতায়, বুকে হাত ডুবিয়ে, রক্তের উত্তেজনায় যেটুকু সুখ তাকেই প্রেম বলে ভুল করি।

আমাদের সত্যি কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। না, প্রেমও না। আমরা কেমন যেন সব যন্ত্র হয়ে গেছি। যন্ত্রের মত হাতে হাত দিই, চুমু খাই, আদর করি। সুখের মুহূর্তে মনে হয় পৃথিবীটাই—এই জীবনটাই একটা পিকনিক। কিন্তু ভুল ভেঙে যায়। আমরা সকলেই এক একটি নিঃসঙ্গ আমি—শুধুই আমি। 'আমি রাখী, আমিই রাখী'—ইতুর কথাটা ওর কানে বাজলো। আর দীপকের মনে হল সব এক হয়ে গেছে। দীপক অতীশ রাখী ইতু। হয়তো আমিই অতীশ, আমিই সোমনাথ। হয়তো রাখী আর ইতু আর নন্দিতা সেই একটিই এবং একই। কারণ আমরা সকলেই একা। হয়তো সোমনাথ আর নন্দিতাও একদিন বদলে যাবে। শুধুই একটা যন্ত্রের শরীর হয়ে যাবে।

—কি ভাবছেন ? কার কথা ভাবছেন ? ইতু মৃদু হাসল দীপকের মুখের দিকে তাকিয়ে।

গাড়িটা তখন হেডলাইট জ্বেলে ব্রীজের ওপর উঠেছে। কেমন একটা গুমগুম আওয়াজ হচ্ছে। প্রতিধ্বনির মত। প্রেমও হয়তো শুধুই একটা প্রতিধ্বনি।

দীপক মনে মনে বললো, আমরা কেউ কারো কথা ভাবি না। প্রতি মুহূর্তে আমরা শুধুই ছোট ছোট স্বার্থ। ম্লান স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় সমস্ত জীবনটা ছড়িয়ে থাকে, একটা ছোট্ট বাল্‌ব জ্বলে উঠলে সেটুকুই আলো, সমস্ত পৃথিবী তখন চোখের আড়াল হয়ে যায়। অন্ধকার হয়ে যায়।

তবু দীপক কোনো কথা বললো না। মৃদু হেসে ওর বাঁ হাত ইতুর হাতের ওপর এক নিমেষের জন্যে রাখলো। যেন বলতে চাইলো, তুমি—তোমার কথা। নিজের সঙ্গে যেন নিজেই অভিনয় করছে দীপক। নিজের সঙ্গে যেন নিজেই কথা বলছে।

দীপক হঠাৎ বললে, এখন তো রাখী আমাকে আরো বিশ্বাস করবে না। ইতু তুমি

অন্তত....

ইতু হেসে উঠল।—বিশ্বাস-টিশ্বাস আমি বুঝি না। আমি শুধু জানি অবিশ্বাস করেও আমাদের বার বার তার কাছেই ফিরে যেতে হয়।

দীপক কথাটা বোঝবার চেষ্টা করলো। স্টিয়ারিঙ ঘোরালো সরু রাস্তাটার দিকে।

ব্রীজ থেকে গড়িয়ে নীচে নামতে নামতে বার বার হর্ন দিল ও। তারপর সার্কিট হাউসের সরু পথ ধরলো।

একটু পরেই সার্কিট হাউসের দেয়ালে হেডলাইটের আলো পড়লো। বাগানের সামনে এসে দাঁড়াল গাড়িটা। বার বার হর্ন দিল দীপক। ইতুকে বললে, শীগগির, শীগগির।

ইতু নেমে পড়েই ওদের ডেকে আনার জন্যে ছুটে গেল। কিন্তু তার আগেই হর্নের শব্দ শুনে সোমনাথ আর নন্দিতা বেরিয়ে এসেছে।

নন্দিতা বিস্ময়ে আনন্দে প্রশ্ন করলো, সে কি, ঠিক হয়ে গেছে?

ইতু চিৎকার করে ডাকলো, রাখী, রাখী!

আড়াল থেকে নদীর ঘাটের মেটে রাস্তা দিয়ে রাখী আর অতীশকে আসতে দেখা গেল। ইতু অতীশের চোখের দিকে তাকালো, অতীশ চোখ নামিয়ে নিলো। দীপক রাখীর দিকে তাকাতে পারলো না, রাখী চোখ নামিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল।

—ওঠ রাখী, ওঠ। নন্দিতা, উঠে পড়। ইতু বললে।

দীপক অতীশের দিকে তাকাতে পারলো না। শুধু বললে, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি।

ওরা ছুটে গেল ব্যাগ-ট্যাগ নিয়ে আসতে।

তাড়াহুড়ো করে ওরা সকলেই উঠে পড়লো। গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে আবার ব্রীজের দিকে, হাইওয়ের দিকে এগিয়ে চললো।

আর সোমনাথ হঠাৎ একসময় বলে উঠল, এত তাড়াহুড়ো করার কোনো মানে হয় না।

সকলেরই সেই কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরলো। এত তাড়াহুড়ো করার কোনো মানে হয় না। সোমনাথের কথাটা নন্দিতার ভীষণ ভাল লাগলো। ও সোমনাথের মুখের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো।

তখন কেউ আর কোনো কথা বলছে না। সকলেই চুপচাপ। সত্যি, এত তাড়াহুড়ো করার কীই-বা অর্থ হয়।

ব্রীজের ওপর থেকে ওরা দেখতে পেল শেষরাত্রির অন্ধকারেই নদীর বুকে জেলেদের নৌকো নামছে। চারদিক নিঃশব্দ। ওরাও সকলেই চুপ করে আছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। হয়তো ভয়ঙ্কর কোনো সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে ওরা মনে মনে মিথ্যের জাল বুনছে।

হাইওয়ে ধরে গাড়ি ছুটে চলেছে। আলোমাখা অন্ধকারের বুক চিরে হেডলাইটের তীব্র আলো ছুটে চলেছে আরো আগে আগে।

অনেকখানি রাস্তা পার হয়ে এসে ইতু হঠাৎ বলে উঠল, আরে, কি আশ্চর্য, আমরা সব আলাদা হয়ে গেছি?

ওরা সকলেই পরস্পরকে লক্ষ্য করে দেখলো। সত্যিই, ওরা সব আলাদা হয়ে গেছে। তাড়াহুড়োয় কখন অতীশ আর সোমনাথ দীপকের পাশে গিয়ে বসেছে—সামনের সীটে। পিছনে ইতু, রাখী, নন্দিতা। আলাদা হয়ে গেছি! আলাদা হয়ে গেছি মানে আমরা সবাই এখন একা।

কেউ কোনো কথা বললো না। শুধু নন্দিতা হঠাৎ বললে, এত জোরে চালাচ্ছেন কেন দীপকদা? আমাদের তো এখন আর তাড়াতাড়ি কোথাও যাওয়ার নেই, তাড়াতাড়ি কোথাও পৌঁছতে হবে না।

আমাদের কোথাও যাওয়ার নেই, মনে মনে ভাবলো ওরা, আমাদের কোথাও পৌঁছতে হবে না। না, প্রেমও না। আমাদের শেষ অবধি সেই ফিরে যেতে হয়—স্মৃতির মধ্যে—ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটি স্মৃতির মধ্যে। আমাদের কোথাও যাওয়া হয় না—ইতু রাখী নন্দিতা তিনজনই ভাবলো, হয়তো বা দীপক অতীশ সোমনাথও।



স্বজন



সন্ধ্যায় সমতলভূমিকে বিদায় দিয়ে চলন্ত ভোরের জানালা খুললেই অবাক হয়ে যাবার মতো দৃশ্য। যেন একটা উত্তাল সমুদ্র অভিশাপে স্তব্ধ হয়ে গেছে, ঢেউ ভাঙা রুক্ষ মাটি আর পাথুরে টিলায়-পাহাড়ে অহল্যা-পাষাণ হয়ে গেছে সারা অঞ্চল।

এ-তল্লাটে ছোট ছোট নানা উপবনে সুখী বাবুরা মাঝে-সাঝে চেঞ্জে আসতেন। শাল মহুয়ার দঙ্গল, এখানে ওখানে বেঁটেখাটো পাহাড়ের ঢেউ, খোলা আকাশের নিসর্গ তো আছেই। উপরন্তু কালো মেয়ে, সস্তা মুর্গী, লাক্ষার গুটি-ধরা কুল আর বাবলার বাগান, জোনায় রাঁচিতে ফলস্। শ্লেট রঙের কালচে পাহাড় আর কালো মানুষেব ফাঁকে পুঞ্জীভূত হঠাৎ সবুজ, ঘন সবুজ। অনেক দূরে কোথাও পাহাড়ের কণ্ঠদেশে উঁকি দেয় রোদ্দুরে ঝলমল রুপোর ঝরনা। চেঞ্জার বাবুরা এ-দৃশ্য দেখে দু'দশদিন স্বর্গবাস করে স্মৃতির ভুবন গুটিয়ে নিয়ে ফিরে যেতো। সারা অঞ্চল আবার তেমনি শান্ত স্থির অচঞ্চল। এত নিশ্চুপ যে গাছের গুঁড়িতে কাঠপোকার আওয়াজ শোনা যেতো।

কিন্তু এ-পথে যেতে যেতে এই ছোট্ট স্টেশন প্লাটফর্মের গায়ে লেখা রাশভারি নামটাও কারো চোখে পড়তো না। চোখে পড়লেও কেউ বড়জোর কৌতুকের গলায় বলে উঠতো, গড় কোথায় রে, একটা উঁচু উইঢিবিও তো দেখছি না। ফেবত রসিকতায় কেউ বলতো, আছে নিশ্চয় কাদামাটির দুর্গটুর্গ। রাজা আছে না একজন?

ব্যস, ঐ পর্যন্ত।

বলতে গেলে একেবারে ব্রাত্যভূমি হয়ে অবহেলায় পড়ে ছিল রামগড়। ওদিকে সিল্লি বা টোড়ি, এদিকে গোলা রোড বারলাঙ্গা মায়েল কিংবা সোনডিমরা ধরনের অসংখ্য অন্ত্যজ নামের ভিড়ে হঠাৎ রামগড় নামটা দেখে দু'একজন চমকেও উঠতো। রাজনীতির কল্যাণে একবার নামটা পরিচিত হয়েছিল, তারপর আবার যেমনকার তেমনি।

হঠাৎ একদিন, রাতারাতি, শুধু এই আধা-শহর রামগড়ই নয়, রাঁচি অবধি সারা অঞ্চলই চেহারায় চরিত্রে বদলে গেল। মানচিত্রের গায়ে খুঁজে-পাওয়া-দুষ্কর ছোট ছোট নামগুলো চঞ্চল হয়ে উঠে সব বড় হরফ হয়ে গেল। গুরুত্ব বেড়ে গেল গুরুদাসবাবুরও।

গুরুদাস প্রায় গোটা জীবনটাই কাটিয়ে দিয়েছেন এ লাইনের এক স্টেশন থেকে আরেক স্টেশনে। কালো কোটের বুকে এক সারি বড় বড় পিতলের বোতাম, এবং সাদা জীনের ঢোলা প্যান্ট পরা মাস্টারবাবুকে চেনে না এমন লোক এদিকটায় কমই আছে। এই শান্ত প্রকৃতির ছোপ লেগে বেশ ফর্সা চেহারার গুরুদাসের মুখে একটা বাদামী ছায়া পড়লেও চোখে কেমন এক ধরনের নিরাসক্ত তৃপ্তি। চাকরিতে উন্নতি করার খুব একটা ইচ্ছে বা চেষ্টা ওঁর কখনো ছিল না। দু' পয়সা বাড়তি রোজগারের জন্যে কেউ কেউ বিশেষ স্টেশন বেছে নেয়। ওঁর সেদিকেও কোন আগ্রহ ছিল না। দু'খানা হাত পাখির ডানার মতো মেলে দিয়ে আয়েসের কণ্ঠে প্রায়ই বলতেন, বেশ আছি।

তবু চুয়ান্ন বছর বয়সে মাথার অর্ধেক চুল সাদা হয়ে যাওয়ার পর গুরুদাসের হঠাৎ পদোন্নতি ঘটলো। এ. এস. এম. হিসেবে এই রামগড়েও কয়েকবার রিলিভিং করতে এসেছিলেন। এখন একেবারে খোদ স্টেশনমাস্টার।

—আরে বকশি, তোমাকে তো চিনতেই পারিনি। হেসে দু'হাতে বুকিং ক্লার্ক বকশিকে জড়িয়ে ধরলেন গুরুদাস। তার খাকি ইউনিফর্মসুদ্ধ গোটা শরীরটা।

মুরী গিয়েছিল, নতুন পোশাকে তখনই ট্রেন থেকে নামলো সে। বণ্ড সই করে ডি. এফ.

আইয়ে জয়েন করেছে। আসলে এই স্টেশনেরই বুকিং ক্লার্ক, স্টেশনের গায়ে লাগা রেল কোয়ার্টারেই থাকে। গুরুদাসের কোয়ার্টার থেকে বেশি দূরেও নয়।

বকশি হাসতে হাসতে প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইলো।—ছেলেমেয়ের খবর কি গুরুদাসদা, কবে আসছে।

গুরুদাস সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, তোমাকে বেশ মানিয়েছে কিন্তু, রীতিমত মিলিটারি মিলিটারি লাগছে।

বকশি কাঁধে আঁটা পিতলের অক্ষর দুটো দেখালো। ইংরেজি আই. ই!

হেসে বললে, ইঞ্জিনিয়ার তো কখনো হতে পারতাম না, এ ব্যাটারা কলমের এক খোঁচায় সবাইকে ইঞ্জিনিয়ার বানিয়ে দিল। ইন্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ার্স। বলে হো হো করে হাসল বকশি।

তারপর বললে, যাক, কিছু বাড়তি টাকা তো মিলবে, কিছু সুযোগসুবিধে।

একটু থেমে বললে, আসল কথা কি জানেন গুরুদাসদা। ওরা তো চতুর্দিকে শুধু ফিফথ কলম আর কুইসলিং দেখছে। কাজ তো সেই একই। আমাদের রেলও আবার খাস সাহেব কোম্পানি, তার ওপর এই মিলিটারির যুগ। জয়েন না করলে একটু দোষ পেলেই হয়তো চাকরি নট। ভবিষ্যতে প্রমোশনও বন্ধ।

হাসতে হাসতে বললে, আপনিও সই করে দিন। আর কেন।

গুরুদাস শুধু বললেন, ভাবছি।

রাঁচি তখন ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের হেডকোয়ার্টার। নিত্যদিন মিলিটারি স্পেশালের ভিড়। প্যাসেঞ্জার এক্সপ্রেসেও ব্রিটিশ কিংবা আমেরিকান সৈন্য গিজগিজ করে। ক্যাপ্টেন, মেজর, লেফটেনেন্ট কর্নেলরা এমন মেজাজ দেখায় যেন রেল কোম্পানিটা ওরাই কিনে নিয়েছে। কখনো সখনো দেখেছেন গুটিকয়েক চীনা মিলিটারি অফিসারও আমেরিকানদের সঙ্গে দোস্তি পাতিয়ে রাঁচি চলেছে।

রাঁচি এক্সপ্রেস রাঁচি যেতো না। মুরী স্টেশনে চোদ্দ আনা প্যাসেঞ্জার উগরে দিয়ে এই রামগড় বরকাকানার দিকে মুখ ফেরাতো। দু'দশটা দেহাতি প্যাসেঞ্জারের মুখ দেখা যেতো, এই অবধি।

হঠাৎ সেই ছোটামুরী জমজমাট হয়ে উঠল। চঞ্চল হয়ে উঠল এই নির্বান্ধব রামগড় বরকাকানাও।

প্রথম প্রথম সকলেই ঐ খাকি রঙ দেখলেই গা বাঁচিয়ে চলতো। কিছু ভয়ে, কিছু সম্ভ্রমে। একে সাহেব, তার ওপর মিলিটারি। ব্রিটিশ টমি অথবা অফিসার দেখলে আতঙ্কটা বেশি। কারণ এই তো কিছুদিন আগে একটা লাইন উপড়ে দেওয়া থানা জ্বালানো মুভমেন্ট হয়ে গেছে সারা দেশ জুড়ে, বড় ছোট মাঝারি সব নেতারা তখন জেলে, থমকে থিতিয়ে গেছে সব আন্দোলন, দিশি মিলিটারির গুলিতেই।

বকশি চলে যেতেই গুরুদাস প্লাটফর্মে পায়চারি করতে করতে ভাবলেন, বড় একা হয়ে যাচ্ছি।

এসে বসলেন নিজের অফিস ঘরটিতে।

শুধু গুরুদাসের নয়, স্টেশনেরও পদোন্নতি ঘটেছে। হল্টেজ বেড়েছে, প্লাটফর্ম বড় হয়েছে। কারণ, রেললাইনের একটা দিক মিলিটারির আওতায়। বিরাট এলাকা জুড়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের ছাউনি। তাছাড়া আছে তিনতলা সমান উঁচু কাঁটাতার আর জালে ঘেরা পি ও ডবলু ক্যাম্প। ইতালিয়ান সৈন্যদের বন্দীশিবির। পি ও ডবলু অর্থাৎ প্রিজনার অফ ওয়ার।

এখন চতুর্দিকে শুধু খাকি পোশাক, খাকি গ্যাবার্ডিনের সৈন্য সৈন্য সৈন্য। তার ওপর এই ডি এফ আই। বাড়তি টাকার লোভে কিংবা চাকরি খোয়াবার ভয়ে রেলের লোকরাও

দলে দলে নাম লেখাচ্ছে। বিশেষ কোন তফাত নেই, যে যার পোস্টে সেই পুরনো কাজই করে যাবে, শুধু গায়ে খাঁকি ইউনিফর্ম উঠবে, মাঝে-মধ্যে প্যারেড।

এতখানি বিশ্বস্ত করে তোলার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। মিলিটারি সাহেবদের রেলের লোকরাও একটু সমীহ করে চলে, ছুটোছুটি করে তাদের জন্যে বার্থ রিজার্ভ করে দেয়, কখনো কখনো পুরো কামরাই। তারপর ইয়াঙ্কি সুরের ধন্যবাদ শুনতে পেলে টি টি সি-র মুখ খুশিতে গদগদ। সহকর্মীদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে বলে, যাই বলো ব্যানার্জি আমেরিকানগুলো মিশুকে আছে, টমিগুলোর মতো নয়। সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের পক্ষ নিয়ে কেউ লড়ে যায়, আরে ছ্যা ছ্যা, বেলেল্লার একশেষ, ব্রিটিশ অফিসারগুলো কত রিজার্ভড, কি ডিসিপ্লিন···

গুরুদাস এসে নিজের অফিস ঘরটিতে বসলেন। তারপর খোলা দরজা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন পি ও ডবলু ক্যাম্পটার দিকে। তিনতলা বাড়ি সমান উঁচু বেড়া, কাঁটাতারের আর জাল দিয়ে ঘেরা একটা বিশাল খাঁচা যেন। তার ভিতরে ক্যামোফ্লাজ করা শ্যাওলা রঙের অসংখ্য খুপরি, দূর থেকে সারি সারি তাঁবুর মতো দেখায়। রাইফেল কাঁধে ব্রিটিশ টমির দল টহল দিচ্ছে অবিরত।

এখন কোন ট্রেন নেই। মিলিটারি স্পেশালেরও খবর নেই কোন। তাই একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলেন। চিন্তা শুধু ইন্দ্র আর নীপার জন্যে।

খবরের কাগজ আসে এখানে অনেক দেরীতে। গুজব পৌঁছে যায় অনেক আগেই। একটু আগে একখানা প্যাসেঞ্জার ট্রেন চলে গেল বরকাকানা। যাবার সময় গার্ড রামস্বামী বলে গেল জাপানীরা নাকি কোলকাতায় বোমা ফেলেছে আবার।

গুরুদাস সেজন্যেই বড় চিন্তিত।

ভজনলাল খালাসীর কাজ করে, কি একটা প্রয়োজনে এসে দাঁড়িয়েছিল রতনমণিবাবুর কাছে। রতনমণিকে এখানে সকলেই বলে 'তারবাবু', দিবারাত্র টেলিগ্রাফ যন্ত্রটার সামনে বসে টরে টক্কা করেন, জার্মান সিলভারের ডিবে খুলে পান খান, মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে বলেন, টি ডি আর বলছে ফট্টি-টু আপ নাকি···কখনো বা কাগজে মেসেজ লেখেন আর টরে টক্কায় প্রশ্ন করেন, কি বললেন?

খালাসী ভজনলালের গায়েও খাকি ইউনিফর্ম।

ও হঠাৎ তারবাবুকে প্রশ্ন করলে, লড়াইকা কুছ খবর হ্যয় বাবুজী?

যেন তারবাবু রেলের এই টেলিগ্রাফ যন্ত্রে সব গোপন খবর পেয়ে যাচ্ছেন।

রতনমণি হেসে ফেলে বললেন, লড়াই কোথায় রে বাবা, কেবল তো যাচ্ছে আসছে, ফুর্তি করছে।

তারপর গুরুদাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, হেরে পালাচ্ছে সব জায়গা থেকে, অথচ কাগজ দেখে মনে হয় সারা পৃথিবীটাই যেন জয় করে নিয়েছে ইংরেজরা। কি বলেন গুরুদাসদা।

গুরুদাস আজকাল একটু সাবধানে কথাবার্তা বলেন। উনি নির্বিবাদী মানুষ, শান্তিতে থাকতে চান। কোন্ কথা থেকে কি হয় কে জানে।

একবার ভজনলালের দিকে তাকালেন।

তারপর ধীরে ধীরে বললেন, একটা যুদ্ধ কোথাও জিতেছে ভাই চোখের সামনে তার প্রমাণ রয়েছে।

বলে রেল লাইনের ও-প্রান্তের দিকে আঙুল দেখালেন, কাঁটাতার আর জালে ঘেরা পি ও ডবলু ক্যাম্পের দিকে।

খালাসী ভজনলালও হেসে ফেলল ওঁর কথায়।

আর গুরুদাস অন্যমনস্ক ভাবে সেদিকেই তাকিয়ে রইলেন। দেখলেন, বন্দী ইটালিয়ান সৈন্যদের একটা বিরাট লাইন খাঁচাটার ভেতর। হাতে কলাই করা মগ আর থালা নিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ে ডুরে পাজামা, আর ডোরাকাটা জামা। জেলখানার কয়েদীদের মত। ডিম পাঁউরুটি কফি নিচ্ছে। খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটছে দু'একজন, কারো বা হাতে কাঁধে ব্যাণ্ডেজ।

না, জেলখানার কয়েদী নয়। ওটা স্লিপিং স্যুট; রাত্রে পরে ঘুমোয়। অন্য সময়ে দেখেছেন, ইটালিয়ানরা নিজেদের ইউনিফর্মই পরে থাকে। অন্য রকম। খাকির রঙটাও অন্য।

রতনমণিও হয়তো ওদিকেই তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, দেবতুল্য।

কথাটা খুব মনঃপূত হল গুরুদাসের।—ঠিক বলেছেন।

গুরুদাস এমনিতেই একটু জার্মানির ভক্ত। ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ইটালিয়ানরা কোন কাজের নয়। অর্থাৎ ইংরেজদের তেমন বিপর্যস্ত করতে পারেনি।

তবু এক একদিন ঐ প্রিজনারদের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে বড় মায়া হয়। আঠারো উনিশ কুড়ি বছরের তাজা তরুণ সুন্দর সুন্দর মুখ। নিজের মনেই বলেন, কেন মরতে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলি।

একদিন একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ডের সামনেই ওদের জন্যে মায়া দেখিয়ে ফেলেছিলেন। তারপর থেকে সাবধান হয়ে গেছেন। লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দুটো শব্দ উচ্চারণ করেছিল।—ড্যাম্ ফ্যাসিস্ট।

কথাটা মাঝে মাঝেই শোনেন। কেমন ধোঁয়াটে লাগে। বুঝতে পারেন না।

উনি অতশত বোঝেন না। ইংরেজরা আমাদের স্বাধীনতা দিচ্ছে না, নেতাদের জেলে ভরে রেখেছে। জার্মানি আর ইটালি তাদের শত্রু। অতএব এরা যদি ইংরেজদের একটু শিক্ষা দেয় মন্দ কি।

বকশি বলেছিল, জার্মানি-টার্মানি লাগবে না, দেখবেন জাপানই ওদের শায়েস্তা করে দেবে।

শুনে গুরুদাসের ভালই লেগেছিল। কিন্তু কোলকাতায় বোমা পড়েছে শুনেই চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। কারণ ছেলে ইন্দ্র আর মেয়ে নীপা, দু'জনেই সেখানে। হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করছে।

আদরের মেয়ে নীপা। তার বেশির ভাগ সময়ই কেটেছে জামশেদপুরের স্কুল বোর্ডিংয়ে। এখন কোলকাতার কলেজ হস্টেলে। ছেলে ইন্দ্র, সে-ও মেডিকেল পড়ছে। ছেলেমেয়েরা সেই কোন্ ছোটবেলা থেকে বাবা-মার কাছ থেকে দূরে দূরে মানুষ। তাই মায়াটাও বেশি। গরমের কিংবা পুজোর ছুটিতে যখন এসে থাকে, গুরুদাসের দিকে তাকালেই মনে হয় ওঁর মনের ভিতরটা যেন চন্দন-পিঁড়িতে ঘষা শ্বেতচন্দনের মতো নরম আর ঠাণ্ডা আর সুগন্ধে ভরা।

সারাটা জীবনই ওঁর বদলির চাকরি, তাই বোর্ডিং হস্টেলেই কেটেছে ইন্দ্র আর নীপার। এখন ভালয় ভালয় ফিরে এলে হয়।

বোমা পড়েছে গুজব রাষ্ট্র হতে না হতে একে একে সকলেই এসে বলে গেল ছেলেমেয়েদের চলে আসতে টেলিগ্রাম করে দিন। কেউ উৎকণ্ঠা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো কোন খবর পেয়েছেন গুরুদাসদা।

আসলে এই সব ছোট জায়গায় সকলে মিলে একটা পরিবার যেন। উনি স্টেশন মাস্টার তাই কোয়ার্টারটা বড়। এবং আর সকলের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। তারপর দু' সারি কোয়ার্টার—বুকিং ক্লার্ক, ব্লক ইনসপেক্টর, তারবাবু এবং আরো অনেকে। ওদিকে

পানিপাঁড়ে ব্রজকিশোর, অর্থাৎ বিরজু ছাড়াও খালাসীদের কেবিনম্যানের এক ঘরের খুপরি। দু' এক বছর বাদে বাদেই বদলি লেগে আছে। যে নতুন আসে দু'দিনেই সে-ও একই পরিবার হয়ে যায়।

ওঁরা তো এখন আরো একজোট, মিলিটারির আনাগোনা বেড়ে গেছে বলেই। নিত্যদিন ওদের স্পেশাল ট্রেন আসছে, চলে যাচ্ছে। সৈন্যরাও। কেন আসে, কোথায় যায়, তা অবশ্য জানতে পারেন না গুরুদাস।

প্রথম প্রথম তো চারুবালা একেবারে সিঁটিয়ে থাকতেন, জানালাও খুলতে চাইতেন না। এখন সবই স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

আসলে কোয়ার্টারের এদিকটায়, এমন কি ঐ শনিচারীর হাট অবধি একটা সীমারেখা টানা আছে, বোর্ড ঝুলছে। মিলিটারির লোক এদিকে আসতে পায় না। কেউ এসে পড়লে হাতে এম পি ব্যাজ লাগানো মিলিটারি পুলিস ধমক দেয়। ওদের দেখলেই সবাই তটস্থ।

ক্যাপ্টেন বেল আর মেজর হুইটলিকেও এখন আর গুরুদাসের তেমন ভয় করে না। ওরা আসে, ট্রেন থেকে সোলজারদের নামা-ওঠা তদারক করে, চলে যায়। কোন কোনদিন ওঁদের সঙ্গে একটু রসিকতাও করে। ভাঁড়ের চা, তাও খেয়েছে একদিন।

একদিন রাত্রে দূরের পাহাড়ে আগুন লেগেছে। বনের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। গরমের সময় প্রায়ই হয়। গুরুদাসের অবশ্য ধারণা, বনোয়ারীর লোকরা আগুন লাগিয়ে দেয়। কাঠকয়লার চাহিদা বেড়েছে, তাই আগুন ধরিয়ে দিয়ে কাঠকয়লা চালান দেয়।

বনোয়ারী কি যে চালান দেয় না বোঝা মুশকিল। আলাপন মেলে না, আসছে না বিলেত থেকে। তাই অফিসে অফিসে বাবলা কাঁটাও সাপ্লাই দেয়।

রাত্রের ট্রেন তখনো আসে নি।

গুরুদাস একদিন লক্ষ্য করলেন ক্যাপ্টেন বেল আর তার দলবল অবাক হয়ে দেখছে দূরের পাহাড়টার দিকে। আগুন-লাগা বনের দিকে।

গুরুদাসকে দেখতে পেয়ে খটর খট খটর খট বুটের আওয়াজ তুলে এগিয়ে এল ক্যাপ্টেন বেল। পাহাড়ের দিকে তর্জনী দেখিয়ে প্রশ্ন করলো, ওটা কি ? কোন ইণ্ডিয়ান রিচুয়াল ?

গুরুদাস হেসে ফেলে অনেক কষ্টে ওকে বোঝালেন, ওসব কিছু নয়, বনে কেউ আগুন লাগিয়েছে, ফর চারকোল।

ক্যাপ্টেন বেল যেন হতাশ হল। আর তার পর থেকে গুরুদাসদের মধ্যে একটা বাঁধা রসিকতা হয়ে দাঁড়ালো ইন্ডিয়ান রিচুয়াল কথাটা।

এরই ফাঁকে এক একদিন এক ঝাঁক মেয়ে এসে নামে। ওয়াক। আসলে ডবলু এ সি। উইমেনস অকজিলিয়ারি কোর। ছাই-নীল স্কাই ইউনিফর্ম পরা খাঁটি মেমসাহেব। ওরা কি কাজ করে কিছুই জানেন না।

একদিন দেখেন অতিকায় ট্রাকে ড্রাইভারের পাশে দুটো অফিসারের মাঝখানে ইউনিফর্ম পরা একটা মেয়ে হা হা করে হাসছে। দেখে খারাপ লেগেছিল। এক একসময় ভয় হয় দেশটাকেই বোধহয় ওরা খারাপ করে দিয়ে যাবে।

গুরুদাসের জীবনে তো কোন বৈচিত্র্য নেই। অসংখ্য মানুষ ওঁর চোখের সামনে দিয়ে নিত্যদিন আনাগোনা করে। কে কোথায় চলে যাচ্ছে। একা উনিই শুধু পড়ে আছেন। এত লোকজনের মধ্যেও কখনো কখনো নিজেকে মনে হয় বড় একা।

২

লেট করে করে শেষে বেলা বারোটায় রাঁচি এক্সপ্রেস এসে থামলো। এ-সব ট্রেনের এখন আর তেমন কদর নেই। সারা পথ সাইডিংয়ে সরিয়ে দিয়ে মিলিটারি স্পেশাল সাঁ করে বেরিয়ে যায়, মেল এক্সপ্রেসও ধিকিয়ে ধিকিয়ে লেটে এসে পৌঁছয়।

সকাল থেকে উদ্বেগ বুকে নিয়ে গুরুদাস টেলিগ্রাফ যন্ত্রটার কাছে ঘুর ঘুর করেছেন।

মাঝে মাঝে প্রশ্ন করেছেন, কি হে রতনমণি, দেরী কত ?

রতনমণি মানে তারবাবু। তিনি টরে টক্কা টরে টক্কা করে বারলাঙ্গাকে প্রশ্ন করেছেন। তারপর হাসতে হাসতে বলেছেন, শুনুন কি জবাব দিচ্ছে।

টকাটক টকাটক উত্তর এসেছে, গুরুদাস শুনেছেন। এ-সব ওঁকেও একসময় করতে হয়েছে। এখনো তারবাবু হঠাৎ অসুখে পড়লে রিলিভিং না এসে পৌঁছনো অবধি উনিই কাজ চালিয়ে নেন। কিংবা এ এস এম যে থাকে।

ইন্দ্র আর নীপা আসবে। তাই এত উৎকণ্ঠা। দিনকাল ভাল নয়, আর মিলিটারির লোক কোথায় কি ঝামেলা বাধিয়ে বসে। আগে এত দুশ্চিন্তা ছিল না, স্কুলে পড়ার সময়েই নীপা কতবার একা এসেছে। এখন আর গুরুদাস সাহস পান না। তাই ইন্দ্র আর নীপা একসঙ্গেই আসে। ফিরে যায়।

ট্রেন এসে দাঁড়াতেই সব কাজ ভুলে প্লাটফর্মে ছোটাছুটি করলেন গুরুদাস। কোন কামরায় ছেলেমেয়েরা আছে কি না।

গুরুদাস সকালে সাদামাটা পোশাকেও স্টেশনে চলে আসেন। বকশি কিন্তু কাঁধে স্ট্রাইপ খাকি পোশাকটা কখনো ছাড়ে না। ওর মধ্যে যেন বেশ একটা গর্ব বোধ করে। শেষ অবধি গুরুদাসও অবশ্য বণ্ড সই করেছেন। প্যারেডের জন্যে ঐ পোশাকে একবার যেতে হয়েছিল। সাহেব ক্যাপ্টেনের ধমক আর উপদেশ শুনে ফিরে এসে ইউনিফর্মটা পরা অভ্যাস করেছেন।

ইন্দ্র আর নীপাকে দেখতে পেয়েই এগিয়ে গেলেন। প্যাসেঞ্জার এখানে বড় একটা নামে না। কম্পার্টমেন্ট থেকে দু-একজন মিলিটারির লোক নেমে দাঁড়ায়, ট্রেন ছাড়লেই আবার উঠে পড়ে।

ক্যাপ্টেন বেল কিংবা মেজর হুইটলি যখন স্টেশনে আসেনি, সৈন্যরা কেউ এ ট্রেন থেকে নামবে না।

নীপা আর ইন্দ্রর কাছে পৌঁছনোর আগেই গুরুদাস দেখতে পেলেন পানিপাঁড়ে বিরজু ওর ড্রাম বসানো জলের ঠেলাগাড়িটা ফেলে রেখে দৌড়চ্ছে। একটা হোল্ডঅল কাঁধে নিয়ে নীপার হাত থেকে বড় চামড়ার সুটকেশটা ছিনিয়ে নিয়েছে। তারপর চেঁচাতে শুরু করেছে, আরে এ ভজনলাল !

এ-স্টেশনে লাইসেন্সড কুলি দু-চারটে ছিল। কিন্তু প্রায়ই তাদের দেখা মেলে না। যুদ্ধের বাজারে অগুন্তি ঠিকাদার আর সাপ্লায়ার। ক্যাম্পে কেউ ডিম রুটি সাপ্লাই দেয়, কেউ কোলকাতায় চালান দেয় কাঠকয়লা কিংবা বাবলার কাঁটা। তাদের হয়ে খাটাখাটনি করেই লাইসেন্সড কুলিদের দিব্যি চলে যায়। তারা থাকলেও অবশ্য বিরজু আর খালাসী ভজনলালের মতই খুশি মুখে মাল পৌঁছে দিত।

বিরজু আর ভজনলাল ওদের হোল্ডঅল সুটকেশ নিয়ে কোয়ার্টারের দিকে চলে গেল।

আর গুরুদাসকে দেখে নীপা ছুটে এল ওঁর কাছে।

—ঘুমোতে পেয়েছিলি ?

নীপা আর ইন্দ্র হাসল। নীপা বলতে যাচ্ছিল, জানো বাবা···

গুরুদাস বললেন, যা গিয়ে স্নান করে রেস্ট নিবি যা। পরে শুনবো।

আসলে বুঝতেই পারছেন, অনেক কথা জমা হয়ে আছে।

সেবার এসে, বোমা পড়ার বর্ণনা যেন ফুরোয় না। 'আমরা ছাদে উঠে দেখেছি বাবা, সত্যি দেখেছি। কি শব্দ, আর যেখানে পড়লো…' কিংবা 'জাপানী প্লেনের কেমন গুট গুট গুট গুট আওয়াজ। সবাই বলছে পীচবোর্ডের প্লেন।' বলে হেসেছে।

এবারও হয়তো তেমন কিছু।

ওরা চলে যেতেই একটা কথা মনে পড়ে গেল। নিজের মনেই হেসে ফেললেন।

ট্রেনটা তখন ছেড়ে দিয়েছে। ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে গার্ড ওঁর দিকে তাকিয়ে হাসল, উনি লক্ষ্যও করলেন না। গার্ডের গাড়িটাও ওঁকে পার হয়ে চলে গেল।

—বাবা, তুমিও মিলিটারি ? নীপা যেন হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

ডি অফ আইয়ে জয়েন করে যেদিন খাকি ইউনিফর্ম নিয়ে এলেন, চারুবালার হাসি আর থামে না। হাসতে হাসতে বলেছিলেন, শেষে বুড়ো বয়সে কপালে এও ছিল!

আর নীপা নতুন পোশাকের প্যাকেট খুলে দোকানে মাপ দেখার মতো করে খাকি বুশ কোটটার দু'কাঁধ দু'হাতে ঝুলিয়ে বলেছিল, বাবা, পরো না, কেমন দেখায় একবার দেখি।

সবাই হেসে লুটোপুটি। ইন্দ্র অতটা সাহস করে না, সে একটু লজ্জা পেল শুধু। হেসে ফেলে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

মেয়ের আদুরে বায়নার কাছে গুরুদাস বড় অসহায়। ওঁর নিজেরও যথেষ্ট লজ্জা আর সঙ্কোচ। চিরকাল বাড়িতে লুঙি আর সাদা টুইলের শার্ট পরেছেন। গরমের দিনে মেঝেতে মাদুর পেতে শুয়েছেন। এখন ইউনিফর্ম পরতে লজ্জা।

মুখে বললেন, খাকি পরলেই কি আর মিলিটারি হয় ? আমরা হলাম ভেতো বাঙালী।

নীপা কিন্তু ঐ পোশাকটা না পরিয়ে ছাড়েনি। আর তা দেখে চারুবালা শব্দ করে হেসে উঠেছিলেন।

নীপা ধমক দিয়ে বলেছিল, কেন হাসছো মা, দেখ কেমন চমৎকার দেখাচ্ছে।

ও সত্যি সত্যি মুগ্ধ চোখে বাবাকে দেখেছিল। ঝকঝকে পিতলের বোতাম, কাঁধে ব্যাজ বুকে স্ট্রাইপ, গুরুদাস তখন যেন অন্য মানুষ। কেমন রাশভারি, রাশভারি।

ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীপাও হঠাৎ হেসে উঠে বলেছিল, দ্যাখো মা, বাবাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে, তাই না ?

নিজের অফিস ঘরটিতে ফিরে এলেন গুরুদাস। তাড়াতাড়ি কাজগুলো সেরে নিয়ে একবার কোয়ার্টারে যেতে হবে। ইন্দ্র আর নীপা এখানে ফিরে এলে স্টেশনে গুরুদাসের আর মন টেঁকে না। তার ওপর আজ আবার সেই খাকি ইউনিফর্ম নিয়ে রঙ্গরসিকতার কথা মনে পড়ে গেছে।

কোয়ার্টারে যাবার জন্যে গুরুদাসের মন ছটফট করছিল।

হঠাৎ উঠে পড়ে বললেন, বকশি, একবার ঘুরে আসছি।

বকশি হেসে বললে, আপনাকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছে গুরুদাসদা।

দেখাবারই কথা।

কাজের ফাঁকে একটু অন্যমনস্ক হলেই বকশি বলে, কি, গুরুদাসদা, একটু কোলকাতা ঘুরে এলেন ?

এখন কোলকাতাই তো ওঁর ঘরে।

স্নান সেরে দুপুরে খেতে বসে নীপা আর ইন্দ্র বাবা-মার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে গল্প করলো। নীপাই বেশি। ও একেবারে অনর্গল। ইন্দ্র একটু কম কথা বলে।

গুরুদাস আবার স্টেশনে চলে যেতেই নীপা বাগানে বেরিয়ে এল।

কোয়ার্টারের সামনে অনেকখানি জায়গা মেহেদির কাঁটাবেড়া দিয়ে ঘেরা ফুলের বাগান। নীপাই এখান ওখান থেকে এনে বসিয়েছে। বাগানের মালী সেই পানিপাঁড়ে বিরজু। নীপা যখন হস্টেলে ফিরে যায় বিরজুই দেখাশোনা করে। সকালে মশলা বাটা থেকে বাগানে খুরপি দিয়ে মাটি ঢিলে করা কিংবা ঝাঁঝরিতে করে জল দেওয়া সবই তার কাজ।

নীপা বাগানের দিকে তাকিয়ে ভাবলো, যাক। বিরজুটা কাজে ফাঁকি দেয়নি।

ঘুরে ঘুরে বেলি ফুলের গাছগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, মা। পরক্ষণেই হেসে ফেললো।

দেখেছো কাণ্ড। মা ঠিক কুমড়োর বীজ বসিয়ে দিয়েছিল, একটা লাউয়ের। দুটোই ইতিমধ্যে লতিয়ে উঠেছে। রান্নাঘর ছাড়া মা আর কিচ্ছু বোঝে না।

নাকি বিরজুই এনে বসিয়েছে? কে জানে!

বিরজু আসলে পানিপাঁড়ে। স্টেশনে জলের গাড়িটা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যায় ট্রেনের কামরার সামনে দিয়ে, গরমের দিনে চতুর্দিক থেকে চিৎকার ওঠে, এই পানিপাঁড়ে, এই পানিপাঁড়ে। আর বিরজু একে একে তাদের আঁজলায় জল ঢেলে দেয়, কারো লোটাতে, কারো কুঁজোয়। মুখচোখ দেখে মনে হয় যেন পুণ্য সঞ্চয় করছে।

কিন্তু সারাদিনে তো ক'খানা মাত্র ট্রেন। বাকি সময়টা ও মাস্টারবাবুর অথবা স্টেশনের অন্য কোন বাবুর ফাইফরমাশ খেটে দেয়। নীপাদের বাড়িতেই বেশি। মশলা বাটে, হাটবাজার করে দেয়, বাগানের তদারকি করে।

প্লাটফর্মে কোথাও বিরজু আছে কিনা দেখার জন্যেই নীপা সেদিকে তাকিয়েছিল। দেখতে পেলে জিজ্ঞেস করবে লাউ আর কুমড়ো কে বসিয়েছে। দিব্যি লতানে গাছ দুটো বেল জুঁই দোপাটি আর কলাবতীর ফাঁক থেকে এঁকেবেঁকে বারান্দার কাঠের জাফরি আঁকড়ে ধরেছে। নেহাত মাধবী লতাটা জাফরির গায়ে জমজমাট হয়ে আছে তাই চোখে পড়বে না কারো।

ঐ সব বেগুন টমাটো লাউ কুমড়োয় নীপার প্রবল আপত্তি। এ যেন কলকাতার রাস্তায় সুন্দর সুন্দর বাড়ির ফাঁকে একটা নোংরা বস্তির মত। রুচিতে বাধে। বলেছিল, ও সব করতে হয় খিড়কির দিকে করো।

এতদিন পরে এসেছে, এখন আর মার সঙ্গে ঝগড়া করার ইচ্ছে নেই নীপার। ও শুধু মনে মনে হাসল।

বিরজুর খোঁজ করতে গিয়ে চোখ চলে গেল পি ও ডবলু ক্যাম্পের দিকে।

একদিন এই বাগানে দাঁড়িয়েই, গতবার যখন এসেছিল, নীপা ওদিকে তাকিয়ে বলেছিল, প্রিজনাররা এখন কি করছে কে জানে।

আর অনুপম, ও তখন কাছেই ছিল, বলে উঠেছিল, দুপুরে ওরা নিশ্চয় মাদুর বিছিয়ে মাসীমার মত ঘুমোয় না।

কথাটা মনে পড়তেই নীপা হেসে ফেললো নিজের মনেই।

না, ইটালিয়ান বন্দীদের এখন আর দেখা যাচ্ছে না। শ্যাওলা সবুজ ক্যানভাস আর কাঠের ঐ খুপরিগুলোর ভিতরেই হয়তো ঢুকে বসে আছে। এখন শুধু রাইফেল কাঁধে টমিরা টহল দিচ্ছে।

বিকেলের দিকে প্রিজনারদের একবার দেখা যায়। আগের বার এসে তো ওদের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতেই সময় কেটে যেত। নিরস্ত্র মানুষগুলো ওদের ইটালিয়ান ইউনিফর্ম পরেই সারি দিয়ে দাঁড়ায়, আর ব্রিটিশ অফিসাররা বোধহয় নাম ডাকে। রোল কল করে। এক একজন এগিয়ে আসে, আবার পিছিয়ে গিয়ে লাইনে দাঁড়ায়। তারপর সন্ধেবেলা দেখা

যায় ডোরা কাটা স্লিপিং স্যুট পরে লাইন দিয়ে কলাই করা মগে কফি নিচ্ছে। সকালেও এই একই দৃশ্য।

ওদের সম্পর্কে নীপার দারুণ কৌতূহল।

নীপা ধীরে ধীরে বাড়ির ভেতর ঢুকলো।

সামনে বাগান, বারান্দায় কাঠের জাফরি, আর তিনখানা ঘর। তারপর আবার একটা লম্বা বারান্দা পিছন দিকে, সেটা এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের জাল দিয়ে ঘেরা। একটা দরজাও। সেটা পার হয়ে চওড়া উঠোন। ছাদ নেই ওখানটায়। তাই উঠোনে কড়া রোদ্দুর। একপাশে রান্নাঘর আর ভাঁড়ার ঘর। অন্যদিকে স্নানের ঘর। আগে বিরজু কুয়ো থেকে জল এনে চৌবাচ্চা ভরে দিত। এখন উঠোনের পাঁচিলের গায়ে একটা কল বসিয়ে দিয়েছে, ঠিক খিড়কির দরজার পাশেই। স্নানের ঘরেও। কলটা সব সময়েই খোলা থাকে, ছরছর করে জল পড়ে। বন্ধ করার কথা কারো মনে থাকে না।

নীপা এসে কলটা বন্ধ করে দিল।

একবার রেলের পি ডবলু ডির এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ওভারসিয়ার ছাদ সারানো দেখতে এসে এমন হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গিয়ে কলটা বন্ধ করেছিল যে নীপা ভীষণ লজ্জা পেয়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে কল খোলা থাকলেই নীপা গিয়ে বন্ধ করে দেয়। কিন্তু অপচয় যে একটা অন্যায় আজও মাকে বোঝানো গেল না। কাউকেই বোঝানো যায় না। অপচয় বোধহয় আমাদের স্বভাব।

নীপা কলটা বন্ধ করে রান্নাঘরের পাশের একটুখানি ছায়ায় দাঁড়িয়ে দেখল মা এই চড়চড়ে রোদ্দুরে উঠোনে বসে কাচের জার বোতল বয়াম সাজিয়ে অ্যালুমিনিয়ামের থালায় কুলের আচার আমসত্ত্ব বড়ি রোদ্দুরে দিচ্ছে। ওসব মার সারা বছরের রসদ।

একটা থালায় আমের আচার দেখে নীপার মুখ হেসে উঠল। ও ছুটে গিয়ে একটা আচার তুলে নিয়ে জিভে ঠেকালো। জিভে একটা শব্দ করে বললে, দারুণ। তৃপ্তিতে সত্যি সত্যি চোখ বুঁজে এল ওর।

চারুবালা তাকালেন মেয়ের মুখের দিকে। হাসলেন। ওদের জন্যেই তো এসব করা, ওরা খেলেই সুখ।

—যাবার সময় দিয়ে দেব সঙ্গে। একটু থেমে বললেন, সেবার দিয়েছিলাম, খেয়েছিলি তো?

নীপা হেসে বললে, সে তো দুদিনেই শেষ। চারুবালাকে বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় বললে, এবার একটু বেশি করে দিও, কেমন?

চারুবালার মুখ খুশিতে ভরে উঠল, আর তা দেখে নীপা দুম করে বলে বসলো, একটু ঘুরে আসবো মা?

চারুবালা অবাক হলেন।—এই রোদ্দুরে কোথায় যাবি? ইন্দ্র ঘুমোচ্ছে, ও উঠুক।

নীপা হেসে উঠল।—মা, তুমি কি হচ্ছো বলো তো! শনিচারীর হাটের দিকে যাবো, তাও দাদাকে বডিগার্ড নিতে হবে?

চারুবালা বললেন, তা বলছি না।

এই শনিচারীর হাট থেকে তো নীপা কতদিন থলি হাতে বাজার করে এনেছে। মিলিটারির ভয়ও নেই। বড় একটা নোটিশবোর্ড টাঙানো আছে—আউট অফ বাউণ্ডস। একটা কি ঝামেলা হওয়ার পর এদিকে সৈন্যদের আসাই নিষিদ্ধ হয়ে আছে।

আর এই ছোট্ট জায়গায় সকলেই তো পরিচিত। মাস্টারবাবুকে সবাই এখানে সম্ভ্রম করে কথা বলে, মাস্টারবাবুর মেয়েকেও সমীহ করে।

নীপা এসে মার সামনে মুখ কাচুমাচু করে দাঁড়াল।—মা, প্লীজ, একটু ঘুরে আসি, কতদিন পরে এলাম বলো।

চারুবালা ওর ভাবভঙ্গি দেখে হেসে ফেললেন।—কলকাতায় তো কত ঘুরতে পাস, তবু শখ মিটলো না।

নীপা ততক্ষণে হাসতে হাসতে খিড়কির দরজা পার হয়ে গেছে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা উঠোনের ওপারে।

এসব দিকের সব কোয়ার্টার্সেই খোলা উঠোন পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

নীপা যখন খুব ছোট ছিল, তখন বোধহয় চক্রধরপুরে, মা দুপুরে বেরোতে দিত না। নীপা একটা টুল এনে পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাতো। সে-কথা মনে পড়তেই নীপা হেসে ফেললো।

তারপর একেবারে সটান উমাদের বাড়ি। এল বি এস ঘোষালবাবুর মেয়ে উমা ওর খুব বন্ধু। কুলিখালাসীরা বলে ব্লকবাবু। উনি লাল শালুর পতাকা উড়িয়ে ঠেলা ট্রলিতে এখানে ওখানে যান। মাঝপথে ট্রলি থামিয়ে পোস্ট দেখেন, কোথাও রেল-টেলিফোনের কলকব্জা বিগড়ে থাকলে মেরামত করেন। মাঝে মাঝে রাত্তিরেও বেরিয়ে যেতে হয়। জনা আষ্টেক ট্রলিম্যান আছে, তারা ফাইফরমাশ খাটে। আবার রেললাইনের ওপর ট্রলি চাপিয়ে ট্রলি ঠেলে নিয়ে যায়। একটা বড় ছাতার নীচে ঘোষালবাবু বসে থাকেন।

একদিন উমা আর নীপা ঘোষালবাবুর সঙ্গে ট্রলিতে চড়ে অনেক দূর গিয়েছিল। বেশ মজা!

আসলে এখানে এলেই নীপার চরিত্রটা বদলে যায়। কোলকাতায় তো শুধু বাধানিষেধ। হস্টেলের মেয়েরা সব দলবেঁধে বেরোয়, সিনেমা দেখে। একা বেরোলেই নানান ফিসফাস। আর পুরুষ দেখলেই লজ্জায় কুঁকড়ে থাকে, কথা বলে না।

প্রথম প্রথম দেখে নীপার খুব হাসি পেত। এখন ও নিজেও ওদের মত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এলেই অন্য রকম।

উমার মা ওকে দেখে বললেন, একটু মোটা হয়েছিস রে।

উমা বললে, ভেবো না মা, আবার রোগা হয়ে যাবে। এই তো শুরু হল টো টো করে ঘুরে বেড়ানো।

সবাই হেসে উঠল, নীপাও।

তারপর একসময় দু বন্ধুই বেরিয়ে পড়লো।

খিড়কির দিকটায় কয়েক গজ সমতল, তারপরই ঢালু হয়ে নেমে গেছে। প্রায় পাহাড় থেকে নামার মত করে ছুটতে ছুটতে ব্রেক কষে কষে নামতে হয়। ওটা ইন্দ্রর কথা। এদিকে সব উঁচু নিচু, কোথাও চড়াই, কোথাও উৎরাই। ইন্দ্র তাই বলেছিল, গড়িয়ে পড়িস না যেন, ব্রেক করে করে চল।

স্টেশন এলাকাটা অনেক উঁচুতে। ঢল নেমে এসে নীচে একটা জল-কাদার নালা, বর্ষায় দু'পার ছাপিয়ে ওঠে। সেটা লাফিয়ে পার হলেই পীচ রাস্তা। নানাদিকের বাস চলে, রাঁচি থেকে পালামৌয়ের দিকেও যায় একটা। কখনো বা সারি সারি অতিকায় মিলিটারি ট্রাক চলে; আমেরিকান ট্রাকে দৈত্যের মত নিগ্রো ড্রাইভার।

ঐ পীচের রাস্তাটা পার হয়ে গেলেই ধু ধু ভাঙাচোরা মাঠ, মাঠের শেষে শনিচারীর হাটের চারপাশে বসতি। কয়েকঘর বাঙালীর বাড়ি আছে ওখানে। চার পাঁচটি হিন্দুস্থানীদের। আর তার পাশেই ঠিকাদারপাড়া। আগে একজনই ছিল, কাছাকাছি দু-তিনটে কোলিয়ারির কন্ট্রাক্টর। এখন ঠিকাদার আর সাপ্লায়ার বেড়েছে মিলিটারির কল্যাণে, জায়গাটা প্রায় গঞ্জ মত হয়ে উঠছে।

অনুপম ফিরেছে কিনা নীপা জানে না। উমা দেখেছে কিনা তাও জিজ্ঞেস করতে পারেনি। জিজ্ঞেস করলেই তো কিছু একটা ইয়ার্কি ছুঁড়ে দেবে।

ডাক্তার হাজরার ছেলে অনুপম। রুরকিতে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে। তার হস্টেলের ঠিকানাও জানে, রুম নম্বর অবধি।

—কি মশাই, কবে চললেন ? আমার তো দিন ফুরিয়ে এল। যাবার আগে একদিন ঠাট্টার সুরে নীপা জিজ্ঞেস করেছিল অনুপমকে। অনুপমের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা এমন জায়গায় এসে থেমে থিতিয়ে আছে যে অনেক কথাই স্পষ্ট করে বলতে সঙ্কোচ হয়, জানতে বাধো বাধো ঠেকে। তাই আপনি আজ্ঞে করে কৌতূহল চাপা দিতে হয়।

অনুপমও সমান চাপা স্বভাবের। ওর কথার উত্তরে অনুপম হাল্কা ভাবে বলেছিল, আর এক সপ্তাহ। সতেরো তারিখ থেকে আমার অ্যাড্রেস আর শনিচারী রোড, রামগড় নয়।

তারপর হেসে উঠে বলেছে, এরপর আমার ঠিকানা···

হস্টেলের নাম, রুম নম্বর, রাস্তার নাম সব গড়গড় করে বলে গেছে।

যেন নীপা খাতা কলম নিয়ে লিখে নিচ্ছে।

উমার সামনেই ব্যাপারটা ঘটেছিল। তা নিয়ে উমার সঙ্গে পরে কত হাসাহাসি। নীপা নিজেও হেসেছে।

উমা বুঝিয়েছে, নির্ঘাত তোকে চিঠি দিতে বলছে।

নীপা চোখ বড় বড় করে বলেছে, সত্যি ? তারপরই হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।—যাঃ তা কখনো হয়।

নীপার একবার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়েছে, একবার ভেবেছে অনুপম তো ঐ রকমই। কখন যে কি বলে···

প্রথমবার গুরুদাস যখন এখানে রিলিভিং করতে এসেছিলেন, বাঙালী বলেই তখন আলাপ হয়ে গিয়েছিল ডাক্তার হাজরার সঙ্গে। নীপা তখন ফ্রক পরে, বেশ ছোট। অনুপমও ইস্কুলে। ইন্দ্র অনুপম নীপা খুব বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। তুই-তুই।

বছর কয়েক পরে গুরুদাস আবার এলেন। এ এস এম হয়ে।

ইন্দ্র একদিন গেল। গুরুদাস আর চারুবালাও দেখা করতে গেলেন ডাক্তার হাজরার বাড়িতে। ডাক্তার মানুষ, আলাপ রাখা ভাল। রেলের ডাক্তার, রেলের হাসপাতাল মানেই তো ঝামেলা। নীপা কিন্তু এড়িয়ে গেল।

গুরুদাস বললেন, সে কি। যাবি না কেন ? অনুপমকে মনে নেই ?

মনে ছিল নীপার, সেজন্যেই হয়তো সঙ্কোচ। নীপা তখন শাড়ি পরছে, বড় হয়েছে। সেজন্যেই কেমন একটা জড়তা আর লজ্জা।

চারুবালা বললেন, কত ক্যারম খেলেছিস, লুডো খেলেছিস···

শেষে অনুপমই একদিন এল। বাড়িসুদ্ধ সবাই হৈ হৈ করে উঠল। ডাক্তারের ছেলে বলেও একটু বিশেষ আদর।

নীপার তখন কতই বা বয়স ? ক্লাশ নাইনে পড়ে, বোর্ডিংয়ে থেকে। কিন্তু শাড়ি ওকে যেন অন্য মানুষ করে দিয়েছে।

নীপা শুনেই বুঝেছে। সেজন্যেই হয়তো আরো গুটিয়ে গেল।

আর মা চিৎকার করে হেসে হেসে ডাকলো।—নীপা, কোথায় গেলি, দেখে যা কে এসেছে।

ও সাড়া দিতে পারলো না। তবু যেতেই হল। না গেলে খারাপ দেখায়।

চোখ তুলে অনুপমের দিকে তাকিয়েই মাথা নিচু করে ফেললো নীপা। একটা জড়তা পেয়ে বসলো ওকে।

অনুপমকে দেখল এক পলকের জন্যে। মাথায় লম্বা হয়েছে, গোঁফের সবুজ সবুজ রেখা নাকের নীচে। গলার স্বরটাও কেমন বদলে গেছে।

নীপার মনে হল অনুপমও লজ্জা পাচ্ছে। কোনরকমে বললে, ভাল আছো ?

নীপাকেও বলতে হল, আপনি ভাল আছেন ?

ইন্দ্র আর মা হেসে উঠল শব্দ করে।—আপনি কি রে ? চিনতে পারছিস না ?

চিনতে ঠিকই পেরেছিল, কিন্তু আগের মত সহজ হয়ে উঠতে, তুই বা তুমি বলতে সঙ্কোচ।

নীপা পালিয়ে এসে বেঁচেছিল।

বছর কয়েক পরে আবার এলেন গুরুদাস, স্টেশন মাস্টার হয়ে স্থায়ীভাবে এসে বসলেন। তখন আর নীপার কোন জড়তা নেই। তখন নীপাও কলেজে।

সেই পুরোনো দিনের কথা মনে করে অনুপম ঠাট্টার ভঙ্গিতে বলেছিল, আপনি ভাল আছেন ?

সবাই হেসে উঠেছিল, নীপাও।

তারপর থেকে আবার সহজ স্বাভাবিক। সহজ স্বাভাবিক বলেই বুকের ভিতরে একটা তার কখনো টুং টুং করে বাজলেও সেটা ঠাট্টা আর হাসি দিয়ে চেপে রাখতে হয়।

অনুপমও হয়তো সেজন্যেই স্পষ্ট করে বলতে পারেনি, চিঠি লিখো। যেন উচ্চারণ করলেই নিজের কানেই হাস্যকর ঠেকবে।

কিন্তু এখন ডাক্তার হাজরার বাড়ি গিয়ে যদি শোনে অনুপম এখনো ফেরেনি রুরকি থেকে, তা হলে নীপার ভীষণ খারাপ লাগবে। একা মনে হবে।

একবার ইচ্ছে হয়েছিল একটা সাদামাটা চিঠি লিখে জানিয়ে দিতে। তাপর একটাই প্রশ্ন, তোমার হস্টেল কবে বন্ধ হচ্ছে, কবে ফিরছো ?

—কিরে কি ভাবছিস এত ?

উমার কথায় তন্ময়তা ভাঙলো। নীপা হাসল শুধু।

ঢালু বেয়ে নেমে এসে একটা সরু নালা। গাড়ি পার করার জন্যে দূরে একটা কালভার্ট আছে। তার ওপর দিয়ে ডাক্তার হাজরার টাঙাটা মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায় কোয়ার্টারের সামনে। কখনো সখনো কোলিয়ারির ট্যাক্সি কিংবা জীপও আসে।

অত ঘুরে যেতে রাজি নয় ও। লাফ দিয়েই নালাটা পার হল, ওর হাত ধরে উমাও। পীচ রাস্তাটা পার হয়ে তিন-চারখানা টালির ছাদের দোকানঘর। একটায় দেহাতিদের জন্যে চিঁড়ে আর ফুলুরি ভাজার দোকান। লোকটা এখন আছে, সন্ধের আগেই গাঁয়ে ফিরে যায়। একটা পড়েই আছে, দরজা খোলেই না। দোকানদারটা মারা গেছে কিনা কে জানে। তার পাশেই আরেকটা, একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ওটা ডাক্তার হাজরার ওষুধের দোকান। সকালে কম্পাউণ্ডার আসে। উনিও ঘণ্টাখানেক বসেন। এখন বন্ধ।

ঘরটায় একবার উঁকি দিয়েই শনিচারীর হাটের পথ ধরলো দুজনে। শব্দ শুনে আকাশের দিকে তাকালো। তিনটে প্লেন পাশাপাশি উড়ে চলেছে। ফাইটার প্লেন হয়তো। মেঘ কেটে কেটে চলেছে।

শনিচারীর হাট আজ নির্জন। কয়েকটা হোগলা পাতার ভাঙা ছেঁড়া ছাউনী পড়ে আছে। ঠিকাদারদের কুলিকামিনরা, কাছাকাছি দু-একটা মুণ্ডাধাওড়ার লোক, শনিবারে মাইনে পায় বলে হাট জমে ওঠে। তরিতরকারি থেকে খাটো শাড়ি, ছোট্ট আয়না, পুঁতির মালা, লাল সবুজ সুতলি, কাচের চুড়ি—কি নেই।

বাজপেয়ীজীর বাড়ির পাশ দিয়ে যেতে যেতে নীপার একটু মজা করতে ইচ্ছে হল।

গলা ছেড়ে চেঁচালো, চাচীজী, চাচীজী।

জোরে জোরে দরজার কড়া নাড়লো।

দরজা খুলতেই বাজপেয়ীর স্ত্রীর নথ পরা গোলগাল মুখে হাসি দেখা দিল—আরে বেটিয়া, তু কব এলি?

বাজপেয়ীজীও তখন বেরিয়ে এসেছেন। হাসছেন।—আওয়াজ শুনলেই মালুম হয় কি মাস্টারজীর লেড়কি।

নীপাও খিলখিল করে হাসল।—হালুয়া বানাও চাচী, খেয়ে যাবো।

বলে উঠোনের ছায়ায় পাতা খাটিয়ায় বসে পড়লো।

চাচী হাসতে হাসতে উমাকে বললে, তু ভি বৈঠরে উমা, হালুয়া জরুর বানাবে।

হালুয়া মানে সুজির পায়েসের মত, কিন্তু সুজির নয়, স্রেফ ভাজা আটা আর গুড়ের। খেতে একটুও ভাল নয়।

দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে বসে গড়াগড়ি দিয়ে চাচীর সঙ্গে গল্প করে নীপা একসময় উঠে দাঁড়াল।—ফিরতি পথে খেয়ে যাবো চাচী, বানিয়ে রাখো।

চাচী হাসল ঘাড় নেড়ে। বাজপেয়ী বললে, জরুর আসবে।

ওরা বেশ জানে গল্প করতে করতে নীপা কোথায় চলে যাবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। হয়তো এক হপ্তা বাদে এসে হাজির হবে।

এখন তো সব বাড়িতেই গুড়ের চা, চিনি পাওয়া যায় না। স্টেশনের চায়েও গুড়ের গন্ধ। শুধু রেল-কোয়ার্টারের লোকরা অঢেল র‍্যাশন পায়। প্রয়োজনের চেয়েও বেশি। তাই মাঝে মাঝে গুরুদাস বাড়তি চিনি ডাক্তার হাজরাকে দিয়ে দেন। সেজন্যেই কিনা কে জানে ওঁর বাড়িতে গেলেই চা পাওয়া যায়।

উমা হঠাৎ বললে, আজেবাজে ঘুরে কি হবে, চল ডাক্তারবাবুর বাড়িতে চিনির চা খাওয়া যাবে।

নীপা তাকালো উমার দিকে। না, ঠাট্টা নয়।

ডাক্তার হাজরার বাড়িটা বেশ বড়, তার দিয়ে ঘেরা অনেকখানি বাগান। বাগানে লোহার গেট। কিন্তু বাগানে গাছপালা কিছুই নেই। দেখে মনে হয় একসময় ছিল, অযত্নে সব নষ্ট হয়ে গেছে।

নীপার খুব গাছের শখ। তাই এতখানি জায়গা পড়ে আছে দেখে ওর খুব ইচ্ছে হয় একটা বাগান করে তোলার।

—আরে মিস তুফান মেল যে, এসো এসো নীপা, কবে এলে?

নীপাকে দেখতে পেয়েই উনি ডাকলেন। দেখে মনে হল কল-এ বেরিয়ে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। টাঙাটা দাঁড়িয়ে আছে।

নীপা হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এল।

অনুপমের মা কালো আর মোটাসোটা। একটু রাগী রাগী চেহারা। কিন্তু মোটেই রাগী নন। পানের সঙ্গে জর্দা খান, কাছে গেলে একটা ভুরভুরে সুন্দর গন্ধ পাওয়া যায়।

ওঁর কথা বলার ধরনটাই বাঁকা বাঁকা। মুখে একটু জর্দা ফেলে বললেন, ওদিকে রুগী মরছে, এই শুরু হল গল্প।

ডাক্তার হাজরা হাসলেন।—রুগীর কি শেষ আছে, বলো নীপা? একটা মরবে আবার একটা রুগী হবে। তা বলে গল্প করবো না?

গলার স্টেথিসকোপ কোটের পকেটে পুরলেন।

আর উমা বলে বসলো, মাসীমা, চা খাবো কিন্তু।

ব্যস, ডাক্তার হাজরাও বারান্দার চেয়ারে বসে পড়লেন।

গল্প পেলে উনি আর কিছু চান না। রুগীর বাড়িতে গিয়েও রোগ কি তা জিজ্ঞেস করতে

ভুলে যান, প্রেসক্রিপশন লিখতে। তার বদলে কেবল সাংসারিক কথাবার্তা, ছেলেকে ভাল ইস্কুলে দিচ্ছেন তো, মেয়ে তো বড় হল বিয়ে দিয়ে দিন, কি রে রাজুয়া, ক্লাশে লাস্টের দিক থেকে কত স্ট্যাণ্ড করলি ?

ডাক্তার হাজরাকে সকলেই চেনে এ তল্লাটে। পুরু ভুরু, ভুরুর লোম অর্ধেক পাকা, হাতে ডাক্তারি ব্যাগ, ঢিলেঢালা কোটের পকেট দুটো ফুলে ফেঁপে আছে, স্টেথিসকোপ উঁকি দেয় পকেট থেকে। কিন্তু আসল চেহারাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায় টাঙাটা না দেখলে।

ওঁর নিজস্ব একটা টাঙা আছে। ঘোড়াটাও তেমন হাড় জিরজিরে নয়। টাঙা চালাবার জন্যে একটা লোকও আছে—মাধোলাল। ডাক্তারবাবুর বাড়ির পিছন দিকে থাকে। কিন্তু দরকারের সময় তাকে পাওয়া যায় না, কিংবা শোনেন মদ খেয়ে শিউজীর মন্দিরের চাতালে বসে আছে। তাই রাতে-বিরেতে রুগী দেখতে হলে নিজেই টাঙাটা চালিয়ে নিয়ে যান।

ডাক্তার হাজরা চায়ের নাম শুনে বসে পড়লেন।—তবে একটু চা খেয়েই যাই। মিস তুফান মেল যখন এসেই পড়েছে......

এই নামকরণেরও একটা ইতিহাস আছে। এখানে একটা সিনেমা হল্ আছে, মাঝে মাঝে বাজে ছবি আসে। একবার একটা হিন্দী ছবি দেখতে গিয়েছিলেন সকলে মিলে। ডাক্তার হাজরার বাড়ির সকলে, নীপারা সবাই, আরো কে কে। ছবিটার নাম মিস তুফান মেল। নীপার মতই সুন্দর দেখতে একটা মেয়ে, জলে ঝাঁপিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে, পিস্তল ছুঁড়ে চলন্ত মেল ট্রেনের ছাদ থেকে চলন্ত লরিতে লাফিয়ে পড়ে, নিজে লরি চালিয়ে শেষ অবধি এক দুরন্ত ডাকাতকে গ্রেপ্তার করিয়ে পুলিস ইন্সপেক্টরকে বিয়ে করলো। তারই নাম মিস তুফান মেল। ছবি দেখতে দেখতে গুরুদাসও অট্টহাসে হেসেছেন। আর বেরিয়ে এসে ডাক্তার হাজরা নীপার নাম দিয়েছেন মিস তুফান মেল। ওর ডানপিটে স্বভাবের জন্যে। আর এই স্বভাবটাকে ডাক্তার হাজরার খুব ভাল লাগে।

চা খেয়ে উঠলেন ডাক্তার হাজরা। বললেন, চলো তা হলে টাঙায়, নামিয়ে দিয়ে যাবো।

আর নীপা আব্দারের গলায় বলে বসলো, আমি চালাবো কিন্তু, ডাক্তারকাকু।

ডাক্তার হাজরা হা হা করে হেসে বললেন, বেশ বেশ।

মাধোলাল বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল, ডাক্তার হাজরা বললেন, যাও দারু পিও।

উঠে বসলেন টাঙায়। টাঙাওয়ালার জায়গায় নীপা বসল। পাশে উনি। তারপর উমা। লাগামটা নীপাকে দিয়ে দিলেন, কিন্তু দরকার পড়লেই নিজের হাতে নিয়ে নেবেন। এভাবে নিজে চালিয়েই কতদিন রাত্রেও রুগী দেখতে গেছেন।

টাঙায় উঠে ডাক্তার হাজরা স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকালেন।—তুমিও চলে এসো না, লেট আস হ্যাভ এ জয়-রাইড। বলে হেসে উঠলেন।

টাঙাটা তখন চলতে শুরু করেছে, নীপা আর উমা দু'জনেই হাসছে।

৩

গুরুদাসের ঘর আর অফিস বলতে গেলে একই। কথায় কথায় বলেন, আমি তো রেল কোম্পানির চব্বিশ ঘণ্টার চাকর। এদিকের এই রেলওয়ে এখনো গভর্ণমেণ্ট নিয়ে নেয় নি। সাহেব কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর্স লণ্ডনে বসে ব্যবসা চালায়। তাই একেবারে ওপর দিকের সব অফিসারই খাস ইংরেজ। তার ফাঁকে দু'চারজন ভারতীয় উঁকি দেয়।

চব্বিশ ঘণ্টার চাকর অবশ্য গুরুদাসই নন। এই স্টেশনের প্রায় সকলেই। তারবাবু রতনমণি তাদের সকলের কাছেই একটা আতঙ্ক। 'তার' মানে টেলিগ্রাফ যন্ত্রে আসা মর্সের

কোডে জানানো খবর। রতনমণি সেটা লিখে তাঁর পিওনকে দিয়ে কোয়ার্টারে পাঠিয়ে দেন। আর পিওনটাকে কোয়ার্টারের জানালা থেকে দেখতে পেলেই সকলে উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করে।

রাত নিশুতিতেও ঘুমিয়ে নিশ্চিন্তি নেই। গলার স্বরে কোন উত্থানপতন না এনে বেশ জলদগম্ভীর গলায় পিওনটা বাগানের ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে হাঁক ছাড়ে, তার আয়া বাবুজী, তার লিজিয়ে। ব্যস্, ঘুমের মধ্যেও ধড়মড় করে উঠে এসে কাগজটা নিতে হবে, হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কারো ডাক পড়ে অন্য স্টেশনে রিলিভিং-এর জন্যে, কাউকে ট্রলি নিয়ে বেরোতে হয়।

গুরুদাস নিমের কাঠি দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে দেখলেন লাইনের ওপর ট্রলি নামানো হচ্ছে। এই সকাল বেলাতেই। না, পি ডবলু ডির নয়। ট্রলিম্যানদের দেখে চিনতে পারলেন। এল বি এস ঘোষালবাবুর ট্রলি। মাঝপথে কোথাও টেলিগ্রাফ-টেলিফোনে গলদ দেখা দিলেই ওঁকে ছুটতে হয়। লাইন-ক্লীয়ার জেনে নিয়ে চলে যান। কখনো কখনো রাত্রেই। ভুল খবরের জন্যে অ্যাকসিডেন্ট হয় শাণ্টিং করতে করতে কোন ইঞ্জিন এসে পড়লে।

গুরুদাস এসে দাঁড়ালেন বাগানের ফটকের কাছে। কোন খালাসী দেখতে পেলে বলতে হবে, কয়লা পাঠিয়ে দিতে। সকাল বেলাতেই চারুবালা মনে পড়িয়ে দিয়েছেন।

এল বি এস ঘোষালবাবুকে যেতে দেখেই গুরুদাস প্রশ্ন করলেন, কি ঘোষাল, কোথায় ডাক পড়লো ?

ঘোষাল হাসল। খাকি ইউনিফর্মের বুশ-কোটের দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে পকেট দুটো নাচাতে নাচাতে বললে, আর বলবেন না, টি ডি আর থেকে খবর পাঠিয়েছে, এই সেদিন পুরো ব্লকটা চেক করে এলাম, আজ আবার।

ঘোষালের ঐ এক মুদ্রাদোষ। বুশ-কোটের পকেট দুটো অন্য ধরনের, যেন পকেটের মাপের দুটো থলি বাইরে থেকে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘোষাল পকেটে হাত ঢুকিয়ে ও দুটোকে সদাসর্বদা পাখির ডানার মত ওপর নীচে নাড়ে। আর মিলিটারি অফিসার দেখলেই ভয়ে হাত বের করে নেয়। একবার খুব ধমক খেয়েছিল।

ঘোষাল চলে গেল, ঘোষালের ট্রলিও সাদা ছাতা আর লাল শালুর পতাকা উড়িয়ে রেললাইন ধরে গড়গড়িয়ে অদৃশ্য হল।

গুরুদাস রামভজনকে দেখতে পেয়ে বললেন, কোইলা নেই রামভজন, ইদ্রিসকে বলে দিস।

এখানে কাউকে কয়লা কিনতে হয় না। ইঞ্জিন কিংবা মালগাড়ি থেকে ঝুপ ঝুপ কিছু কয়লা ফেলে দিয়ে যায় খবর দিলেই। খালাসীরা সেগুলো এনে বাবুদের কোয়ার্টারের পিছনে স্তূপীকৃত করে আগুন ধরিয়ে দেয়। কাঁচা কয়লা, তাই প্রচুর ধোঁয়া ওঠে, এক-পোড়া হয়ে তবেই কোক হয়, রান্নায় লাগে। ওদিকের পোর্টারখুলির কুলিখালাসীরা শীতকালে কয়লার আগুন ঘিরে হাত-পা সেঁকে। সকলেরই এই দস্তুর। রেল কোম্পানিও জেনেশুনে চোখ বুজে থাকে। খালাসীরা হাসতে হাসতে বলে, কোম্পানিকা মাল দরিয়ামে ডাল।

দাঁত মেজে দাড়ি কামিয়ে সকালে একবার স্টেশনে যান গুরুদাস। কোন কোনদিন চা রুটি পাঠিয়ে দেয় চারুবালা।

স্টেশনের দিকে যেতে যেতে গত সন্ধ্যার দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

গতকাল সন্ধের ট্রেনে একদঙ্গল অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়ে কত সব বাহারী পোশাক পরে নির্লজ্জ শরীর দেখিয়ে এসে নামলো। কেউ বললে, মিলিটারি মেডিক্যালসের নার্স ওরা। কেউ বললে, ম্যাকক্ল্যাসিগঞ্জের অ্যাংলো কলোনীর মেয়ে ওরা। পার্টিতে হই হই করবে, মদ

খেয়ে ভাল হবে।

বড় বড় ট্রাকে করে তাদের নিয়ে গেল। যাবার সময় মেয়েগুলোর কি হাসি উল্লাস।

সব দেখেশুনে ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠেছিলেন গুরুদাস। অথচ উপায় নেই, মাঝে মাঝেই এসব বেলেল্লাপনা চোখ মেলে দেখতে হয়।

নীপার কথাটা হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

—মা দ্যাখো দ্যাখো, বাবাকে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে।

প্রথম যেদিন বুশ কোট, খাকি প্যান্ট পরলেন, কাঁধের স্ট্র্যাপে সাদা স্ট্রাইপ আর ভি, নীপা বলে উঠেছিল।

পোশাক বদলে গেলেই কি মানুষটাও বদলে যায়। নাকি এক একজন মানুষ দল বাঁধলেই অন্যরকম। এই ব্রিটিশ বা আমেরিকান সৈন্যদের বিরুদ্ধে ওঁর ক্ষোভের শেষ নেই। বর্বর, সব বর্বর।

অথচ ক্যাপ্টেন বেল অথবা মেজর হুইটলিকে ওঁর ভালই লাগে। দু-একটা টমিকেও। একা থাকলেই ওরা বেশ ভদ্র, মিশুকে। একজন আমেরিকান অফিসারের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল মুরীতে থাকার সময়ে। ব্যারেল ব্যারেল সিগারেট উপহার দিয়ে যেতো। গুরুদাস তো সিগারেট খান না, সকলকে বিলিয়ে দিতেন।

এরাই আবার যখন ট্রাকে বসে হই হই করতে করতে যায়, ট্রেনে হামলা করে, কিংবা মার্চ করতে করতে যায়, তখন আবার অন্য মানুষ।

মানুষের বোধ হয় দুটো চরিত্র। একা একরকম—সে শুধুই মানুষ। সে বাবা কিংবা ছেলে কিংবা ভাই কিংবা শিক্ষিত সজ্জন। একসঙ্গে হলেই আলাদা। খারাপ, খারাপ। সঙ্কীর্ণ মনের মানুষ। নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ। কিন্তু তাই বা কেন? একসঙ্গে হলে সে আবার মহৎও হয়ে যায়। একা মানুষের চেয়েও মহৎ। আদর্শের জন্যে প্রাণ দেয়। ইন্ডিয়ানরা দিয়েছে, স্বাধীনতার জন্যে। ওরাও, ঐ সৈন্যরাও তো কি সব আদর্শের কথা বলে।

গুরুদাসের হঠাৎ চোখ পড়লো রেললাইনের ওপারে। একটা জীপ এসে থামলো। মেজর হুইটলি নামলো তা থেকে। তামাটে সোনালী গোঁফ, চোখের তারা দুটো কটা, মাথার ফেল্ট হ্যাটে ঝকঝকে পিতলের ক্ষুদে রাজমুকুট, দু-কাঁধেও দুটো ক্রাউন আর হাতে চামড়ায় বাঁধানো হাতখানেক লম্বা বেতের ব্যাটন। হুইটলিকে এমনিতে বেশ রাশভারি মনে হয়, কিন্তু হাসলে গোঁফটাও হাসে।

এই এক ঝামেলা ডি অফ আইয়ে সই করে। চেয়ার ছেড়ে উঠতে হবে, স্যালুট করতে হবে। অবশ্য হুইটলিও উইশ করবে টুপিতে হাত ছুঁইয়ে, কোন কোনদিন পুরো স্যালুটই ফিরিয়ে দেবে মুচকি হেসে। ঠাট্টা কিনা বোঝাও যায় না।

বকশি একবার সাহস করে হুইটলিকে একটা প্রশ্ন করেছিল।

পি ও ডবলু ক্যাম্পটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, মেজর, স্যার হাউ মেনি প্রিজনার্স আর দেয়ার? ইন দ্যাট ক্যাম্প?

বকশির ইংরেজি। স্যার বলার অভ্যাস।

হুইটলি সেজন্যেই হয়তো হেসে ফেলেছিল। তারপর গম্ভীর হয়ে উত্তর দিয়েছিল, দ্যাটস নান অফ ইওর বীজনেস। অথবা ঐ ধরনের কিছু।

গুরুদাস তো প্রথম প্রথম ওদের উচ্চারণ কিছুই বুঝতে পারতেন না।

রেলের খাস ইংরেজ অফিসারদের সঙ্গে দিব্যি কথা বলতে পারেন, বোঝেনও তাদের কথা। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কত গার্ড তো রীতিমত বন্ধু, জমিয়ে আড্ডা দিয়েছেন। অথচ এদের বেলাতেই অসুবিধে হয়। সেজন্যে একটু অস্বস্তিও বোধ করেন।

গুরুদাস এই মাত্র খবর পেয়েছেন একটা মিলিটারি স্পেশাল ট্রেন আসছে।

তাই এগিয়ে গিয়ে হুইটলিকে বললেন, হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ, মেজর। এই একটা বাঁধা বুলি শিখে রেখেছেন।

নাট মাচ বা ঐ রকম কি একটা যেন শুনলেন।

মেজর হুইটলি তখন সঙ্গের টমি দুটোকে কি সব নির্দেশ দিচ্ছে।

তাদের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে, গুরুদাসকে বললেন, আমি প্লাটফর্মটা ব্যবহার করবো, আপত্তি নেই নিশ্চয়ই ?

এটা কথার কথা। ওরা তো অর্ডার দেবার সময়েও প্লীজ বলে। গুরুদাস জানেন আপত্তি করা চলে না। কিন্তু কি ভাবে ইউজ করবে তা কিছুই বুঝলেন না। জিজ্ঞেস করলেই বলে বসবে, ইণ্ডিয়ান কিউরিওসিটি। যেন কৌতূহল শুধু আমাদেরই।

মেজর হুইটলি চলে যাবার পরই দুটো মিলিটারি ট্রাক এল। টমিরা তা থেকে পটাপট গোটা পঞ্চাশ ফোল্ডিং চেয়ার নামিয়ে প্লাটফর্মের মাঝখানে সারি দিয়ে সাজিয়ে রাখলো।

গুরুদাস ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন না। হেসে রতনমণিকে বললেন, কি রে বাবা, যাত্রাফাত্রা নাকি ? স্টেশন প্লাটফর্ম শেষে থিয়েটারের স্টেজ না হয়ে যায়।

রতনমণি চেয়ার সরিয়ে পা বাড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুলটা টেলিগ্রাফের যন্ত্রটায় ঠেকিয়ে রেখে ডিবে থেকে পান বের করে মুখে পুরলেন। তারপর পান চিবোতে চিবোতেই বললেন, ওদের কাণ্ড।

কি হতে পারে সকলের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল।

বকশি, রতনমণি, ব্যানার্জিবাবু এমন কি খালাসী ভজনলালও এসে জড়ো হল। পানিপাঁড়ে বিরজুও দরজার আড়ালে। আর এল বি এস ঘোষালবাবুও তখনই ট্রলি করে ফিরলেন। সটান অফিসঘরে চলে এলেন। যদিও ওঁর কাজ এখানে নয়।

ট্রলিম্যানরা তখন কাঁধে করে ট্রলিটা লাইন থেকে তুলে নামাচ্ছে।

গুরুদাস ওঁকে দেখেই বললেন, যাক বাঁচালেন। একটা মিলিটারি স্পেশাল আসছে। আপনার কথাই ভাবছিলাম।

ঘোষাল হাসলেন গুরুদাসের কথা শুনে।—কি যে বলেন গুরুদাসদা, আমার বউও আর ভাবে না। কপাল ছাড়া আর কিছুতে বিশ্বাস করলে এল বি এসের কাজ করা যায় না।

ট্রলিতে অবশ্য অনেক লোককেই যাতায়াত করতে হয়। পি ডবলু ডি থেকে ডাক্তার অবধি।

ঘোষাল ভাব দেখালেন যেন কিছুতেই ওঁর ভয় নেই, মৃত্যুকেও নয়। ডাক্তার বড়ুয়ার কথাটাই ভাবুন না। বেচারি।

সবাই চুপ করে গেল। ডাক্তার বড়ুয়ার কথা মনে পড়লেই সবারই মুখে বিষাদের ছায়া পড়ে। ইয়াং ডাক্তার, সবে চাকরিতে পার্মানেন্ট হয়ে বিয়ে করেছে। খবর এল কনস্ট্রাকশনের কুলি ধাওড়ায় কলেরা হয়েছে। ট্রলি নিয়ে ছুটে এলেন, সেই মাঝরাত্তিরেই। ফেরার পথে একটা ইঞ্জিন এসে...

সেই রক্তাক্ত দেহটা সবাই দেখেছিলেন।

ট্রলিম্যানরা বলেছিল, সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে ডাক্তার বড়ুয়াও লাফ দিয়েছিলেন।

ঘোষাল সে-কথা মনে করেই বললেন, কপাল, গুরুদাসদা. কপাল। তা না হলে ডাক্তার বড়ুয়ার বেল্ট কখনো ট্রলির চেয়ারে আটকে যায় ? অথচ ইঞ্জিনটা উনিই প্রথম দেখেছেন। সবাইকে বাঁচালেন, নিজে বাঁচলেন না।

ঐ অ্যাকসিডেন্টের কথায় ডাক্তার বড়ুয়ার রক্তাক্ত মৃতদেহটা চোখের সামনে ভেসে ওঠায় সারা স্টেশনঘরটাই কেমন গুমোট হয়ে গিয়েছিল।

ঘোষালই হেসে হাল্কা করে দিলেন। বললেন, মরবো না গুরুদাসদা, এত সহজে মরবো

না। এখনো কত কি দেখা বাকি।

বকশিও হেসে উঠল। ঘরের হাওয়াটা হাল্কা করে দিয়ে বললেন, এই যেমন স্টেশন প্লাটফর্মে বাঈনাচ দেখা।

বলে চেয়ারগুলো দেখালো।

সবাই হেসে উঠল ওর কথায়।

ঘরে বসে ওরা চারজন ক্যারাম খেলছিল। নীপা আর ইন্দ্র একদিকে, অন্যদিকে অনুপম আর উমা।

অনুপম নীপাকে পার্টনার নিতে চেয়েছিল। নীপা জানে তা হলেই উমা পরে ওকে নিয়ে হাসাহাসি করবে।—তবে আর কি, পার্টনার তো হয়েই গেছিস।

ওদের সম্পর্কটা যদি সত্যি সত্যি গাঢ় হতো, এসব ইয়ার্কি ঠাট্টা খারাপ লাগতো না। কিন্তু নীপার নিজের মনেই যে এখনো সংশয়।

তাই বাধা দিয়ে ও বলে উঠেছে, না মশাই না, তোমাকে পার্টনার করে আমি হেরে যেতে রাজি নই।

অনুপম ওর দিকে চকিতে চোখ তুলে তাকিয়েছে। কথাটার অন্য কোন অর্থ আছে কিনা ভাবতে চেষ্টা করেছে। আর ওর মুখে একটা বিষণ্ণ ছায়া দেখতে পেয়ে নীপার খুব মজা লেগেছে! ঠোঁটের কোণে হাসি চেপেছে ও।

অনুপম সত্যি ভাল খেলতে পারে না।

নীপা দারুণ ভাল খেলে, অব্যর্থ নিশানা, কিন্তু খেলতে খেলতে বড় অস্থির হয়ে পড়ে :

ও মাঝে মাঝে জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরের দিকে দেখছিল। হঠাৎ আবার তাকাতেই লক্ষ্য করলে প্লাটফর্মের ওপর ফোল্ডিং চেয়ার সারি দিয়ে সাজানো হচ্ছে। দেখেই বলে উঠল, ফাংশন হবে নাকি ওখানে ; এত চেয়ার কেন ?

সকলেই উঁকি মেবে দেখল। একটা রহস্য যেন মাথার মধ্যে ঘুরে বেড়ালো। তারপর আবার কখন খেলায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

খেলার চেয়েও অনুপমের উপস্থিতিই যেন নীপার ভাল লাগে। ওর আর কিছু চাই না, কিছু না।

নীপার হঠাৎ গতকালের কথা মনে পড়তে নিজের মনেই হাসল।

গতকাল ডাক্তার হাজরা ওকে নামিয়ে দিয়ে গেছেন পীচ রাস্তার ধারে, ওঁর সেই ওষুধের দোকানটার কাছে। নীপা ওঁকে বাড়ি অবধি আসতে দেয়নি। বলেছে, এটুকু হেঁটেই চলে যাবো ডাক্তারকাকু।

উমা আর ও হেঁটে ফিরেছে। আর তখনই উমা বলেছে, অনুপম এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করলি না ?

ইচ্ছে নীপারও হয়েছিল, কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ বোধ করেছে। পারে নি। এমন কি মাকেও না। আগে এমন হতো না, ও কত সহজে প্রশ্ন করতো, অনুপমের খবর জানতে চাইতো। এখন কি জানি কেন ওর বাধো বাধো ঠেকে।

যেন একটা বিশ্ব জয় করে ফিরছে এমনি উচ্ছ্বাসে ও মাকে টাঙা চালানোর কথা বলতে বলতে ঢুকলো।

—মা, আজ একটা দারুণ মজা হয়েছে, জানো মা। বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কি।—ডাক্তারকাকুর টাঙা চালিয়েছি।

—টাঙা চালিয়েছিস! চারুবালা ভুরু কুঁচকে তাকালেন মেয়ের মুখের দিকে।

ছেলেবেলায় অনেক প্রশ্রয় দিয়েছেন, এখন আর এ-সব পছন্দ করেন না। চারুবালা শুধু

বললেন, তোর বয়েস হয়েছে।

নীপার সব ফুর্তি নিমেষে নিভে গেল।

আর সেখান থেকে সরে এসে ঘরে ঢুকতেই ও অবাক। অনুপম ! ভীষণ খুশি হয়ে ওঠার কথা।

কিন্তু নীপা শুধু একবার তাকালো অনুপমের দিকে। ইন্দ্রর সঙ্গে গল্প করতে করতে অনুপমও।

নীপা কোন কথাই বলতে পারলো না। ও যে অনুপমকে দেখে খুশি হয়েছে তাও মনে হল না।

ওর মাথার মধ্যে তখন একটা কথাই ঘুরছে। 'তোর বয়সে হয়েছে।' কথাটা কেন বললো মা। অনুপমের জন্যেই কি। ওর হাবেভাবে মা কি কিছু বুঝতে পেরেছে ? কে জানে।

নীপা যেন বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। ও ভাবতেই পারে নি অনুপম এসেছে।

মা'র কাছে একটু বকুনি খেলেই ওর মুখ থমথম করে ওঠে, চোখে জল এসে যায়। ওর তখন অভিমান মা'র ওপর। অনুপমের ওপর রাগ। কেন এসেছে ?

ইন্দ্র ক্যারমবোর্ড নামিয়ে খেলতে ডাকলো। অনুপমও।

নীপা গেল না।—আমি খেলবো না।

চারুবালা মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। কিছু বোঝার চেষ্টা করলেন। এতদিন বাদে মেয়েটা ফিরেছে, তাকে হয়তো আঘাত দিয়ে ফেলেছেন এই ভেবে কষ্ট পেলেন। মুখে স্নেহের হাসি এনে মেয়ের পিঠে হাত রাখলেন চারুবালা।—না গেলে খারাপ দেখায় ! ছেলেটা কতদূর থেকে এসেছে।

নীপার মুখ শেষ অবধি হেসে উঠল। ঘোষালবাবুর কোয়ার্টারে গিয়ে উমাকে ডেকে আনলো।

কিন্তু কয়েকটা গেম হয়ে যেতেই উমা চলে গেল। ওর ভয় মা জানতে পারবে। ঘোষালবাবুর স্ত্রী অনুপমের সঙ্গে ক্যারম খেলা, গল্প করা এ-সব পছন্দ করেন না। এমন কি একা একা কোথাও যেতে দেন না। শুধু নীপার ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রম। ওঁর ধারণা, নীপা সঙ্গে থাকলে কোন ভয় নেই।

ক্যারামবোর্ড তুলে রেখে নীপা আবার জানালা দিয়ে প্লাটফর্মের দিকে তাকালো। বোধ হয় মিলিটারি স্পেশালটা এসে দাঁড়ানোর কোলাহল শুনে।

বিস্মিত স্বরে বলে উঠল, এই ! দাদা, দ্যাখ দ্যাখ !

রোদ পড়ে এসেছে তখন।

অনুপম আর ইন্দ্রও জানালার কাছে এসে উঁকি দিল। তারপর তিনজনই বাগানে বেরিয়ে এল। ওখান থেকে ভাল করে দেখা যাবে। সাজানো চেয়ারের রহস্য জানা যাবে।

স্পেশাল ট্রেন থেমে গেল।

আর ওরা দেখল, একপাল নীল ইউনিফর্ম-পরা মেয়ে ট্রেন থেকে নেমে সারি দিয়ে এসে চেয়ারে বসল।

ইন্দ্র বললে, ওয়াক।

অর্থাৎ ডবলু এ সি।

নীপা মজা করে বলে উঠল, চব্বিশ ক্যারেট মেমসাহেব রে, দাদা।

এটা নীপার আবিষ্কার। খাস ইংরেজ হলে চব্বিশ ক্যারেট, আমেরিকানরা বাইশ, আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা ওর ভাষায় খাদ মেশানো।

কিন্তু ওরা হাসতেও ভুলে গেল। যেন সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছে। ঝকঝকে

ফর্সা চেহারা, সুন্দর সুন্দর মুখের মেয়ে, নীল ইউনিফর্ম। সারা প্লাটফর্ম যেন আলো হয়ে গেছে। তিন সারি সাজানো চেয়ারে এসে বসল সকলে। চুপচাপ ঘাড় সোজা করে বসে আছে।

নীপা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, ঠিক পরীর মত মনে হচ্ছে। নীল পরী।

সত্যি তাই। স্টেশনের সকলেও দূরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে ওদের দিকে।

ডবলু এ সি-দের এর আগেও দু-এক দলকে আসতে যেতে দেখেছে। কিন্তু সারি দিয়ে এভাবে বসে স্টেশন আলো করে তুলতে দেখে নি। প্লাটফর্মটা যেন পরীর দেশ হয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন বেল তখন ওদের তদারকি করছে। আর মেজর হুইটলি সোনালী গোঁফের ফাঁকে চুরুট চেপে এক পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নীপা ইন্দ্র অনুপম মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে ছিল।

তারপরই সেই বিচ্ছিরি ব্যাপারটা ঘটে গেল।

ট্রেন থেকে একজন ক্যাপ্টেন নেমে দাঁড়িয়েছিল। কাঁধের স্ট্র্যাপে তিনটে করে স্টার। মাথায় ফেল্ট হ্যাট। সে চিৎকার করে কি যেন নির্দেশ দিল। আর ট্রেনের বিভিন্ন কামরা থেকে একদল টমি নেমে এসে প্রায় মার্চ করার ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে নীল পরীদের থেকে একটু দূরে গিয়ে সারি দিয়ে দাঁড়াল।

নীপা ইন্দ্র অনুপম তখনো বুঝতে পারে নি। চুপচাপ দেখছিল।

দেখল কয়েকজন সৈন্য টমিদের প্রত্যেকের সামনে একটা করে এনামেলের গামলা রেখে গেল, আর প্রত্যেকের হাতে একটা করে তোয়ালে। জনকয়েক টমি গামলায় জল ঢেলে দিল।

আর তখনই সেই অভাবনীয় ব্যাপারটা ঘটে গেল।

সারি দিয়ে দাঁড়ানো টমিগুলো প্রথমে উর্ধাঙ্গ নগ্ন করলো। তখনো ওরা কিছুই বুঝতে পারে নি।

পরমুহূর্তেই স্তম্ভিত হয়ে গেল সবাই! কি করবে প্রথমটা কিছুই ঠিক করতে পারলো না।

এমন একটা কাণ্ড যে ঘটতে পারে ওদের কল্পনারও বাইরে ছিল। কিংবা ওরা বোধ হয় একটা ঘোরের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ টমিগুলো ঝটপট প্যান্ট ফ্যান্ট সব খুলে ফেলে আপাদমস্তক সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে গামলার জলে তোয়ালে ভিজিয়ে গা হাত মুছতে শুরু করলো।

নীপা তখনও বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে।

খোলা প্লাটফর্মে সকলের সামনে, বিশেষ করে ঐ নীল পরীদের পাশেই এমন একটা দৃশ্য কল্পনারও বাইরে।

সম্বিৎ ফিরতেই একটা যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো নীপা। লজ্জায় আহত অপমানে ছুটে বাড়ির মধ্যে পালিয়ে এল। প্রায় কান্নার গলায় বলে উঠল, ব্রুট, ব্রুট।

কি লজ্জা, ও কি-না বোকার মত অনুপমের পাশে দাঁড়িয়ে, ইন্দ্রর পাশে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখেছে!

আশ্চর্য! সারি দিয়ে চেয়ারে বসা নীল পরীরা দিব্যি ঘাড় সোজা করে বসেই আছে। যেন পাশে কি ঘটছে কিছুই জানে না। ধ্যানে বসেছে যেন।

ইন্দ্র আর অনুপম মাথা নিচু করে বাড়ির মধ্যে চলে এল। মুখ তুলতেও লজ্জা।

কাউকে কিছু না বলে খিড়কির দরজা দিয়ে অনুপম বেরিয়ে গেল। ও জানে, আজ আর মুখ তুলে ও নীপার সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। তার মুখের দিকে তাকাতে পারবে না।

স্টেশনের সকলেও স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। টমিগুলো কাকস্নান সেরে আবার ইউনিফর্ম পরে ট্রেনে উঠল। ট্রেন ছেড়ে দিল, আর তখন যেন সকলে নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

মিলিটারি স্পেশালটা চলে যাওয়ার পরও নীল পরীর দল তেমনি ঘাড় সোজা করে বসেই রইলো। তাদের হাতে হাতে কফির কাপ দিয়ে গেল ক্যাপ্টেন বেল আর মেজর হুইটলির লোকজন।

এমন একটা কুৎসিত দৃশ্য যেন ওদের কাউকেই স্পর্শ করেনি।

মেজর হুইটলি সোনালী গোঁফ নাচিয়ে বোধ হয় একবারই হেসেছিল নীল ইউনিফর্ম-পরা পরীর মত সুন্দর একজনের সঙ্গে কি একটা কথা বলে।

তারপর সন্ধের রাঁচি এক্সপ্রেসটা বরকাকানা থেকে এসে থামতেই নির্দিষ্ট কামরাগুলোয় সারি দিয়ে উঠল নীল পরীর দল। ট্রেন ছেড়ে দিল।

বকশি বললে, এর নাম যুদ্ধ।

গুরুদাস কিছুই বললেন না। চাকরিটার ওপরই যেন ঘেন্না ধরে গেছে। গায়ের খাকি ইউনিফর্মটার ওপরও।

শুধু রতনমণি হেসে উঠে বললে, যাঃ বাবা, যেদিক থেকে এলি সেদিকেই ফিরে গেলি, মা-মণিরা।

কেউ হাসল না।

৪

নীপার পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। আগে ওরা যেখানেই বদলি হয়েছে, স্টেশন প্লাটফর্ম তো কোয়ার্টারের কাছেই, ঐ প্লাটফর্মই ছিল ওর মুক্তির উঠোন। ছোট্ট ছোট্ট স্টেশন, লোকজন নেই, কচিৎ কদাচিৎ একটা ট্রেন। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো নীপা, রাতের ট্রেনের আলোজ্বলা জানালার চলন্ত দৃশ্যের সঙ্গে নীপাও যেন অনেক দূরে চলে যেতো।

এখানে এসেও ওর ঐ একটা নেশা ছিল। ট্রেন দেখা। চারুবালাও এসে জাফরির দরজায় দাঁড়াতেন, চলন্ত ট্রেন দেখতেন। নিঃসঙ্গ জীবনে এও যেন একটা সঙ্গী। ইঞ্জিনের ধোঁয়া, হুইসল, শেষ কামরায় গার্ডের হাতের সবুজ ফ্ল্যাগ, জানালায় জানালায় কত মুখ।

নীপা পায়চারি করতে করতে একবার প্লাটফর্মে চলে এল। তখন প্লাটফর্ম নির্জন, কেউ কোথাও নেই, ট্রেন আসারও কথা নয়। এঘর ওঘর ঘুরলো। ব্যানার্জিবাবু, বকশিকাকু, ভজনলাল, সকলের সঙ্গেই দু-চারটে কথা। ঈষৎ হাসি। তারপর এসে রতনমণিবাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়াল।

—সরুন রতনকাকু, আমি একটু টরেটক্কা করবো।

খেলার ছলেই একটু একটু শিখে নিয়েছে নীপা। যখন সত্যি কোন মেসেজ থাকে না, যন্ত্রটা শুধু টকাটক আওয়াজ করে অন্য স্টেশনের উদ্দেশে, কিংবা চুপ করে থাকে, তখনই নীপা টরে টক্কা টরে টক্কা করে। তা না হলে পাশেই পড়ে থাকা ফালতু যন্ত্রটায় আঙুল টেপে।

গুরুদাস দেখছিলেন। এতদিন কিছু মনে হয় নি। হঠাৎ বললেন, এখন আর স্টেশনটা তেমন নেই রে, হুটহাট করে আসিস না।

রতনমণির দিকে তাকিয়ে বললেন, তাই না রতনমণি?

তারবাবু রতনমণিও ঘাড় নাড়লেন। বললেন, ঠিকই বলেছেন।

নীপার মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। একটু পরেই ফিরে গেল ও। বুঝতে পারলো ওর পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। সেদিনের সেই বীভৎস দৃশ্যটার জন্যেই কি! নাকি চারপাশে সৈন্য সৈন্য সৈন্য, মিলিটারি ট্রাকের দৌরাত্ম্য···

চারুবালার অভিযোগের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পেল।—তোর বয়েস হয়েছে।

অতিকায় ঐ ট্রাকগুলোও একটা আতঙ্ক। বেলেল্লাপনার চলন্ত দৃশ্য দেখা যায় কখনো কখনো।

একদিন রাত্রে একটা তীব্র আর্তনাদ শুনেছিল, স্পীডে ট্রাক চলে গেল তখনই। আওয়াজ শুনে বুঝতে পেরেছিল, ট্রাকটা গেল পীচ রাস্তা ধরে। একটা তীব্র মেয়েলী গলার আর্তনাদ। কেন বুঝতে পারে নি।

পরের দিন ভোর থেকেই সেখানে জটলা। গিয়ে দেখে দুটো, না বোধ হয় তিনটে, দেহাতি মুণ্ডা মেয়ে রক্তমাংসের পিণ্ড হয়ে পড়ে আছে।

ঐ মেয়েগুলো গান গাইতে গাইতে যায়, কিংবা কলকল করে কথা বলতে বলতে। যেন একটা ঘোরের মধ্যে থাকে। সমস্ত ভুবন ভুলে। সেজন্যেই কি?

না, ঐ মিলিটারি ট্রাকগুলোর যেন কোন দায়দায়িত্ব নেই। সামনে যাই পড়ুক ওরা থামতেও জানে না। পদে পদে মৃত্যু বলেই হয়তো অন্যের জীবনের কোন দাম নেই ওদের কাছে।

শুধু নীপা নয়, হয়তো সকলেরই পৃথিবী ছোট হয়ে যাচ্ছে।

কোথায় আর যাবে নীপা, কোয়ার্টারের সামনে সেই ছোট্ট বাগানে এসে দাঁড়াল। ক্যাম্বিশের ডেক-চেয়ারটা নিয়ে এসে ইন্দ্র বসে আছে। তখন সন্ধে নেমেছে।

ওখানে দাঁড়িয়ে পি ও ডবলু ক্যাম্পটার দিকে তাকিয়ে সময় কেটে যায়।

শীতের সময়ে তবু কোয়ার্টার থেকে একটা বাল্‌ব টেনে এনে সামনের ফাঁকা জায়গাটায় ব্যাডমিন্টন খেলে। এখন তাও নেই।

কাঁটাতার আর অনেক উঁচু অবধি জালে ঘেরা খাঁচাটায় আলো ঝলমল করছে, রাইফেল কাঁধে টহলদার সৈন্যদের সিল্যুট ছবির মত দেখাচ্ছে এখান থেকে। প্রিজনাররা হয়তো ঐ খুপরিগুলোর মধ্যে।

অন্ধকার আকাশ। কিন্তু অনেক দূর থেকে, ঠিক মনে হচ্ছে যেন দূর পাহাড়ের আড়াল থেকে তিন চারটে আকাশ-খোঁজা তীব্র সার্চলাইট অবিরত ঘুরছে, ঘুরছে।

হঠাৎ হঠাৎ কখনো অ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান থেকে দমকে দমকে কয়েক ছড়া বিদ্যুতের বর্শা শব্দ করে আকাশে মিলিয়ে যায়। নিছকই অকারণে।

নীপা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল।

—চেয়ারটা নিয়ে এসে বোস না। ইন্দ্র বললে। ডেক-চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসে আছে। ইন্দ্রও ঐ ক্যাম্পের দিকেই তাকিয়ে ছিল।

দূরে আকাশে মাথা উঁচু করে আছে একটা র‍্যাডার টাওয়ার। কোথাও কোন শত্রুবিমান আসছে কিনা দেখার জন্যে। ঐ তীব্র সার্চলাইটগুলো আকাশ খুঁজছে তন্ন তন্ন করে। একটা সার্চলাইট ঘুরে যাচ্ছে পি ও ডবলু ক্যাম্পের ওপর দিয়ে।

ওদিকটা আলোয় উজ্জ্বল। আর এই স্টেশনে, কোয়ার্টারের দিকে আবছা অন্ধকার। কম পাওয়ারের টিমটিমে আলো। শনিচারীর হাটের দিক, পিছনের পীচ রাস্তা আরো অন্ধকার। একটু দূরের মানুষকেও দেখতে পাওয়া যায় না। দিগন্ত রেখার ধারে ধারে পাহাড় আর বন অন্ধকারে মিশে গেছে।

ইন্দ্র হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, বাবার চা পাঠিয়েছিস?

গুরুদাস স্টেশনের চা খান না। চারুবালা বাড়িতে বানিয়ে পাঠিয়ে দেন।

নীপা বললে, হ্যাঁ। তোর বুঝি চাই এক কাপ? বলে হাসল।

ইন্দ্র বললে, না, অনুপম আসুক। আজ নিশ্চয় আসবে।

নীপা চুপ করে গেল। সেই দৃশ্যটা দেখার পর থেকে অনুপম আর আসেনি। হয়তো খুবই লজ্জা পেয়েছে। নীপা নিজেও। ঐ ঘটনার কথা ওরা কেউ যেন মনে রাখতেই চায় না। ওটা স্মৃতি থেকে মুছে গেলে যেন ভাল হতো। নীপার সুন্দর বিশুদ্ধ প্রেম যেন ঐ ঘটনাটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে গেছে। কিংবা তার শুভ্রতার গায়ে মালিন্য ছিটিয়ে দিয়ে গেছে।

পি ও ডবলু ক্যাম্পের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নীপা কখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

আর তখনই ককিয়ে কেঁদে উঠল একটা সাইরেনের আওয়াজ।

ইন্দ্র চমকে গিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

নীপা বলে উঠল, ও কি, ও কি, অন্ধকার হয়ে গেল কেন?

আসলে সাইরেন বাজার আগেই বোধ হয় পি ও ডবলু ক্যাম্পের সমস্ত আলো হঠাৎ নিভে গেছে। অন্ধকার।

আর নীপা লক্ষ্য করলো, অনেক দূর থেকে একটা সার্চলাইটের তীব্র আলো ক্যাম্পের ওপর দিয়ে ঘুরছে, ঘুরছে। কি যেন খুঁজছে।

অবাক হয়ে ওরা তাকিয়েছিল।

ক্যাম্পের অন্ধকারে ডুবে যাওয়া খুপরিগুলোর ওপর দিয়ে সার্চলাইটের আলোটা ঘুরছে। অন্ধকার বলে আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

আর তখনই একটা হল্লা উঠল ক্যাম্পের দিক থেকে।

—কি ব্যাপার! ইন্দ্রও অবাক।

ঠিক তখনই পর পর রাইফেলের গুলির আওয়াজ হল। একটানা গুলি ছোঁড়ার। আর সঙ্গে সঙ্গে পর পর কয়েকটা আর্তনাদ ভেসে এল। কাদের যেন গুলি করে মারা হচ্ছে।

শব্দ শুনে চারুবালাও বেরিয়ে এলেন।—কি হচ্ছে রে ইন্দ্র? ওঁর গলার স্বরে ভয়ভয় ভাব।

নীপাও বিস্মিত, আতঙ্কিত।—কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, মা। আলো নিভিয়ে দিয়ে কাদের যেন গুলি করে মারছে। ইটালিয়ান প্রিজনারগুলোকে নয় তো?

—বিরজু কিংবা কাউকে ডাক। তোর বাবাকে বাড়ি চলে আসতে বল।

ইন্দ্র হেসে উঠল।—কোথায় ক্যাম্প, আর কোথায় বাবা। তুমি এত ভয় পাচ্ছো কেন?

দেখা গেল স্টেশনের সকলেও প্লাটফর্মে বেরিয়ে এসেছে। অবাক হয়ে দেখছে।

আর তখনই ক্যাম্পের সব আলো আবার জ্বলে উঠল। দেখা গেল রাইফেল কাঁধে টহলদার ক'জন ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে। ব্রিটিশ সৈন্যদের জটলা এক জায়গায়। অথচ কি যেন ঘটেছে কিছুই বোঝা গেল না।

গুরুদাস যথারীতি ডিউটি শেষ করে রাত্রে ফিরলেন। সব চাঞ্চল্য তখন শান্ত হয়ে গেছে।

পি ও ডবলু ক্যাম্পে আলো জ্বলে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই সব শান্ত হয়ে গিয়েছিল।

গুরুদাস সেদিকে তাকিয়ে দেখেছেন, নিত্যদিনের মতই রাইফেল কাঁধে টমি প্রহরীরা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত অবধি প্যাবেডের ভঙ্গিতে যাচ্ছে, ফিরে আসছে। দূর থেকে দেখা যায় শুধু তাদের ছায়াশরীর।

উনি ফিরে আসতেই চারুবালা প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছিল, কিছু খবর পেলে? অনুযোগ

করলেন, অত গোলমাল হল, বাড়িতে ফিরে আসবে তো!

গুরুদাস খাকি ইউনিফর্ম খুলতে খুলতে হাসলেন, আমরাও তো মিলিটারি, কি বল্ নীপা। হেসে বললেন, বণ্ড সই করেছি না, বোমা পড়লেও পালাবো না।

একটু থেমে বললেন, এটা পরলে নিজেকে বেশ সাহসী মনে হয়।

নীপা বুশ-কোটটার দিকে তাকালো। সত্যি, এই পোশাকটা পরলেই বাবাকে অন্যরকম লাগে। পোশাকটাই কি মানুষের চরিত্র, না পোশাক চরিত্র বদলে দেয়?

নীপা জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছিল কিছু জানতে পারলে?

গুরুদাস মাথা নাড়লেন। না। নিজের মনেই যেন বললেন, কাল ঐ বেল্ কিংবা হুইটলি এলে যদি জানা যায়। বলবে কিনা কে জানে, ব্যাটাদের কিছু জিজ্ঞেস করাও যায় না।

মনে পড়ল, বকশি কি একটা প্রশ্ন করাতে ইণ্ডিয়ান কিউরিওসিটি বলে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিল।

সন্ধের ঘটনা নিয়ে আর কেউ আলোচনা করলো না। কিন্তু সকলের মনের মধ্যেই একটা রহস্য রয়ে গেল।

চারুবালা রান্নাঘরে চলে গেলেন। নীপাও। ও যে-ক'টা দিন এখানে থাকে মাকে সাহায্য করে।

খিড়কির দিকে একটা বড় উঠোন, ছাদ নেই, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের গায়ে খিড়কির দরজা। নীপা গিয়ে সেটা তালা লাগিয়ে এল।

দরজার পাশেই কলতলা, ছরছর করে জল পড়ছে। নীপা কলটা বন্ধ করলো। তারপর বারান্দায় মেঝেতে আসন পেতে দিল। বাবা আর দাদা একসঙ্গে খেতে বসে, বসে গল্প করে। চারুবালা আর নীপা সামনে বসে থাকে, এটা ওটা দেয়।

ওদের খাওয়া হয়ে গেলে মা-মেয়ে মেঝেতে সিমেন্টের ওপরই বসে খায়। নীপা যদি-বা আসন পেতে দেয় মাকে, চারুবালা অভ্যাসবশে সেটা সরিয়ে দিয়ে মেঝেতেই বসে পড়েন।

মেয়েকে কলেজে পড়াচ্ছেন, এখানে ওখানে যাওয়ার স্বাধীনতা আছে, শনিচারীর হাটে একা একাই, অনুপমের সঙ্গে ক্যারম খেলে গল্প করে, কোথাও কোন আপত্তি নেই। কিন্তু ওঁর ধারণা মেয়েদের আসনে বসতে নেই, বাবা কিংবা দাদার খাওয়া হয়ে গেলে তবে খেতে বসতে হয়, অন্যের সামনে মেয়েদের চেয়ারে না বসাই ভাল। মেয়েদের জীবনটাই যেন শুধু কষ্ট পাওয়ার জন্যে, কষ্ট সহ্য করার জন্যে। কোন বিলাস কিংবা আরাম হাতের কাছে থাকলেও উপভোগ করতে নেই। ভাল খাওয়া, মাছের মুড়ো, কিংবা মাছের বড় টুকরোটা শুধু পুরুষদের জন্যে।

ছেলেবেলায় নীপা খুব ঝগড়া করতো, কখনো কখনো অভিমান।

রেগে গিয়ে বলতো, দাদাকে রোজ রোজ কেন দেবে? কিংবা, ওটা আমাকে দিলে না কেন?

চারুবালা শুধু হাসতেন।

একবার অভিমানের গলায় নীপা বলেছিল, আমি তো তোমার কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে।

চারুবালা গুরুদাস দু'জনেই শব্দ করে হেসে উঠেছিলেন।

আসলে সব মায়ের মতোই চারুবালারও ভয়, মেয়ে কোথায় গিয়ে পড়বে জানি না, এখন থেকে কষ্ট সহ্য করতে শিখুক। তুই যে মেয়ে হয়ে জন্মেছিস, এই পোড়া দেশে।

গুরুদাস তখন ঘরে বসে কি যেন বলাবলি করছেন ইন্দ্রর সঙ্গে। চারুবালা বাসনকোসন তুলে নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরের পাশে রেখে দিলেন। কাল সকালে পার্বতিয়া এসে মেজে দেবে।

এর পরও চারুবালার সংসারের কাজ ফুরোয় না। নীপাকে এটা ওটা করতে হয়।

এখন অবশ্য পার্বতিয়া এসে সকালে উনোনের ছাই ফেলে দেয়, ঘুঁটে কয়লা সাজিয়ে উনোন ধরিয়ে দেয়। শীতকালে তাও হয় না। চারুবালা রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর উনোনের নিভন্ত কয়লা আর ছাই পরিষ্কার করে ঘুঁটে সাজিয়ে রাখেন। সকালে শুধু একটু কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বেলে দেওয়া। তা না হলে গুরুদাসকে সময়মতো চা খাবার তৈরি করে দেওয়া যায় না। উনি তো সকালেই স্টেশনে ছুটবেন।

বাসনকোসন তোলা হয়ে গেছে। নীপা কলতলায় হাত ধুয়ে গামছায় হাত মুখ মুছতে বারান্দায় এল, এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের ঘেরা বারান্দায় দরজা পার হয়ে সবে সুইচ টিপে আলো নেভাতে যাবে, হঠাৎ কি একটা শব্দ হল।

ফিরে তাকালো নীপা। আর সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কের গলায় চিৎকার করে উঠলো—বাবা! বাবা!

ভয়ে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে ভিতরে চলে এল।

চারুবালাও ততক্ষণে চিৎকার করে ডাকছেন, ইন্দ্র, ও ইন্দ্র।

শব্দটা বোধ হয় ইন্দ্রর কানে গিয়েছিল। চিৎকার শুনেই গুরুদাসও বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

ধপ্ করে ওপর থেকে কি যেন পড়ার শব্দ শুনেই নীপা ফিরে তাকিয়েছিল। তাকিয়েই দেখল একটা লোক পাঁচিল থেকে উঠোনের ওপর লাফিয়ে পড়েছে।

নীপার মত চারুবালাও ভেবেছিলেন চোর হয়তো। বারান্দার আলোটা টিমটিম করে জ্বলে। কম পাওয়ারের বাল্‌ব। তা ছাড়া বারান্দাটা জালে ঘেরা বলেই উঠোনে চৌকো চৌকো ছায়া পড়ে কেমন রহস্যময় হয়ে থাকে। কিছুই তেমন স্পষ্ট দেখা যায় না। অথবা ওরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল বলেই ভাল করে তাকিয়ে দেখে নি।

গুরুদাসও বেরিয়ে এসেছেন ইন্দ্রর পিছনে পিছনে। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

সকলেই শুধু দেখছে। সমস্ত ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ঠেকছে।

চারুবালা তাড়াতাড়ি তালাচাবি এনে বারান্দার দরজাটা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিলেন। লোকটা যাতে এদিকে না এসে পড়ে।

গুরুদাস সবাইকে দেয়ালের আড়ালে সরিয়ে দিলেন।—সরে আয়, সরে আয়।

অর্থাৎ লোকটা যদি ছুরিটুরি ছুঁড়ে মারে, কিংবা পিস্তলটিস্তল থাকলে···

সবাই তবু উঁকি দিয়ে দিয়ে দেখাল লোকটাকে। বিস্মিত, স্তম্ভিত!

ফর্সা মুখের লোকটাকে দেখে প্রথমে ভেবেছিলেন মিলিটারি টমি। গৃহস্থ ঘরে হয়তো মদ খেয়ে হামলা করতে এসেছে। সেজন্যেই আতঙ্ক।

চারুবালা নীপাকে ফিসফিস করে বললেন, তুই ঘরে চলে যা।

আতঙ্ক নীপার জন্যেই। ওকে যেন দেখতে না পায়।

গুরুদাসের তখন নিজেকে বড় অসহায় লাগছে। দিনের বেলা ঐসব সৈন্যদের ভয় পান না। হাতে এম পি ব্যাজ লাগানো। মিলিটারি পুলিস ঘুরে বেড়ায়, ট্রেন আসার সময়ে স্টেশনেও টহল দেয়। নিজের চোখেই দেখেছেন টমিগুলি ওদের দেখলেই কি ভয় পায়।

—বাবা, ওর পাজামাটা দ্যাখো। নীপা বলে উঠল।

সত্যি তো। এক্সপ্যাণ্ডেড মেটালের চৌকো জালের ছায়া সারা উঠোনে, লোকটার গায়েও পড়েছে। তাই ঠিক বুঝতে পারেন নি।

ইন্দ্র সুইচ টিপে উঠোনের আলোটা জ্বেলে দিল, আর সঙ্গে সঙ্গে চৌকো ছায়াগুলো উবে গিয়ে লোকটাকে স্পষ্ট করে দেখা গেল।

ডুরে পায়জামা পরা একটা সাহেব। কিন্তু দুটো হাত অনভ্যস্ত নমস্কারের ভঙ্গিতে তুলে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, তারও মুখচোখে যেন ভয়। একটা আতঙ্কের ছাপ তার মুখে।

লোকটাও ভয় পেয়ে গেছে।

গুরুদাস ততক্ষণে বুঝতে পেরেছেন। চাপা গলায় বলে উঠলেন, প্রিজনার, ইটালিয়ান প্রিজনার মনে হচ্ছে।

ইন্দ্র বললে, হ্যাঁ, ঠিক তাই। ডুরে পায়জামা। মুখ দেখেও…

—কিন্তু ও এল কোত্থেকে। চারুবালার গলা কেঁপে গেল।

লোকটা হয়তো ভাবেই নি ভিতরে এতগুলো লোকের সামনে পড়ে যাবে। কিংবা তাড়া খেয়ে পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়েছে, বাঁচবার আশায়।

হাত জোড় করে নমস্কার করার চেষ্টা করলো লোকটা। ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখ।

এই ডুরে পায়জামার পোশাকটা সকলেরই চেনা। হয়তো রাত্রে পরে শোয়। খুব সকালে এই পোশাকেই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ওরা মগ হাতে কফি নেয় ব্রিটিশ সৈন্যদের কাছ থেকে। দেখে তখন একেবারে ভিক্ষুকের মতো মনে হয়। বড় অসহায়। আবার বিকেলে যখন ওদের ইটালিয়ান ইউনিফর্ম পরে সারি দিয়ে দাঁড়ায় তখন অন্য চেহারা।

—ও একটা ফতুয়া পরেছে রে। নীপা বলে উঠল।

হ্যাঁ, গায়ে ডুরে জামাটা নেই। তার বদলে একটা হিন্দুস্থানী ফতুয়া। বোধ হয় কারো কাছে চেয়ে নিয়েছে, বা কেড়ে নিয়েছে।

লোকটা এক পা এগিয়ে এল। এগিয়ে এসে হঠাৎ বললে, পিয়েতা। পিয়েতা।

ওরা কিছুই বুঝতে পারলো না।

লোকটা ঝট্ করে হাঁটু গেড়ে নীলডাউন হল। কেমন ভয়-ভয় চোখে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে। দুটো হাতে তেমনি অনভ্যস্ত নমস্কারের ভঙ্গি।

কোন পক্ষই কোন কথা বলছে না। চুপচাপ।

গুরুদাস এতই স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন যে বাংলায় বলে উঠলেন, কি চাই, কেন এসেছো এখানে ?

লোকটা কিছুই বুঝলো না। ভীত সন্ত্রস্ত মুখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হাতটা নিজের বুকে ঠেকালো। কি যেন বললে।

নীপা ফিসফিস করে বললে, মা চ্যাঁচাবো ? রতনকাকুরা এসে পড়বে তা হলে।

ইন্দ্র লোকটাকে ভাল করে দেখবার জন্যে এগিয়ে যাচ্ছিল। চারুবালা বললে, এই, যাস না। পিস্তলটিস্তল আছে কিনা কে জানে।

একপাশে সরে গিয়ে দেয়ালের আড়াল থেকে দেখছিল ওরা। তখনো ভয়।

—মা, চ্যাঁচাবো ?

—না না, দাঁড়া দেখি। চারুবালা বিপদের মুখেও বুদ্ধি হারান না। গুরুদাসকে বললেন, তুমি ওকে চলে যেতে বলো।

তারপর নিজের মনেই যেন বললেন, চ্যাঁচামিচি করে লাভ নেই। ওরা যদি এসে দেখে ঘরের মধ্যে একটা সাহেব ঢুকেছে, মিলিটারির…

অর্থাৎ আড়ালে অপবাদ রটাতে পারে। হয়তো ভেবে বসবে ওরা আসার আগেই কোন হামলা করেছে। বাড়িতে নীপার মত একটা মেয়ে। শেষে, ছিঃ ছিঃ, যদি কিছু বলাবলি করে ওরা।

এত সব কথা বোধ হয় ভাবেন নি চারুবালা। শুধু মনে হয়েছে লোক জানাজানির আগেই যদি চলে যায় ও।

—গো অ্যাওয়ে, গো অ্যাওয়ে। ইন্দ্র বললে।

লোকটার চোখ দুটো করুণ প্রার্থনার মতো কি যেন বলতে চাইলো।

বুকে হাত ঠেকিয়ে অনুনয়ের কণ্ঠে হঠাৎ বললে, প্রিজোনার। সেভ।

অন্তত ইন্দ্রর তাই মনে হল।

লোকটা বোধ হয় ইংরেজি জানে না। কিংবা দু'একটা শব্দই শিখেছে।

আবার বললে, পিয়েতা।

গুরুদাসের তখন বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে গেছে। কি করা যায় কিছুই বুঝতে পারছেন না। লোকটার কাছে রিভলভার আছে কিনা তাও জানেন না।

লোকটার মুখচোখ দেখে বোঝা যাচ্ছে ভীষণ ভয় পেয়েছে। ওদেরই ভয় পাচ্ছে হয়তো। অথচ ওঁরাও লোকটাকে ভয় পাচ্ছেন। দু'পক্ষই পরস্পরকে ভয় পাচ্ছে।

সন্দেহ নেই ইটালিয়ান প্রিজনার। ও তো নিজেই বলছে প্রিজোনার।

—কি করা যায় বল তো! হতাশার গলায় বললেন গুরুদাস।

চারুবালা বললেন, কি আবার করা যাবে, লোকটাকে তাড়িয়ে দাও।

আর ঠিক তখনই নীপা বলে উঠল, লোকটা নয় মা, দ্যাখো দ্যাখো, মুখটা একেবারে ছেলেমানুষের মতো।

গুরুদাসও বলে উঠলেন, সত্যি তাই। একেবারে বাচ্চা ছেলে। ইন্দ্রর মতই, কিংবা আরো কম বয়েস। চেহারাটাই যা একটু বড়সড়ো।

চারুবালার কানেও গেল না ওসব কথা। হাতে চলে যাওয়ার ইশারা করে হিন্দীতে বললেন, এই হট যাও, চলে যাও হিঁয়াসে।

এমন এটা বিমূঢ় অবস্থার মধ্যেও ইন্দ্র হেসে ফেললো।

ছেলেটা হয়তো কিছু বুঝলো। আবার হাত জোড় করলো। ঐটুকুই হয়তো কারো কাছে শিখেছে।

চারুবালা অসহায় কণ্ঠে বললেন, জ্বালালে।

আর ইন্দ্র বললে, বাগান থেকে একটা ইঁট নিয়ে এসে ধাঁই করে মারলে হয়…

গুরুদাস বললেন, না না, ওসব করতে হবে না। কি থেকে কি হয়। তা ছাড়া ইনজিওর্ড হলে…

ইন্দ্র ক্ষোভের স্বরে বলে উঠল, ব্যাটা ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসেছে। ইনজিওর্ড হলেই বা কি, ব্রিটিশ সোলজাররা পেলে তো এক্ষুনি গুলি করে মারবে।

—গুলি করে মারবে? নীপার গলার স্বর কেমন কেঁপে গেল।—কেন, মারবে কেন?

গুরুদাস কি যেন ভাবলেন। বিড়বিড় করে বললেন, না না, তা বোধ হয় করে না। হয়তো কিছু শাস্তি দেয়…

আসলে উনি তো আইনকানুন কিছু জানেন না। কেমন একটা ভাসাভাসা ধারণা শুধু। আইন থাকলেও তা ওরা মানে কিনা তাও জানেন না।

কিন্তু লোকটাকে তো তাড়াতে হবে। এত রাত্রে কি করবেন তাও ঠিক করতে পারছেন না।

ভিক্ষে চাওয়ার মত লোকটা এবার দু'হাত পেতে কি যেন চাইলো। বললে, আকুয়া।

ওরা কিছুই বুঝতে পারলো না।

—কি চাইছে রে দাদা? নীপা জিজ্ঞেস করলো।

লোকটা ভুরু কুঁচকে কি যেন মনে করার চেষ্টা করছে। আবার বললে, আকুয়া। আকুয়া। তারপরই হয়তো মনে পড়ে গেল। বললে, ওয়াতার।

—ওয়াটার? ইন্দ্র বললে।

লোকটা এমনভাবে মাথা নাড়লো যেন বলতে চাইলো, ঠিক, ঠিক!

দেখে মনে হল খুবই তৃষ্ণার্ত, হয়তো ভয়েই গলা শুকিয়ে গেছে।

ইন্দ্র এগিয়ে এসে জাল-বারান্দার এপার থেকে আঙুল দেখাল, খিড়কির দরজার পাশে কলতলার দিকে। তখন আর লোকটাকে কারোর অত ভয় নেই।

লোকটা ফিরে তাকাল পিছনদিকে, ইন্দ্রর আঙুল লক্ষ্য করে। তারপর কলটা দেখতে পেয়েই ছুটে গেল। কল খুললো।

গুরুদাস এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। লোকটার অসহায় অবস্থা দেখে বলে উঠলেন, কেন মরতে পালিয়ে এসেছিস, তুই তো ধরা পড়বিই। নীপার দিকে, ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন।—জানে না ভারতবর্ষ কত বড় বিশাল দেশ।

ইন্দ্র বললে, তাও যদি ইংরিজি জানতো।

ঠিক তখনই নীপা খিলখিল করে হেসে ফেলেছে। বলছে, কাণ্ড দেখো, কাণ্ড দেখো ওর। একেবারে আনাড়ি।

সত্যি তাই। কল খুলতেই তোড়ে জল। লোকটা দু' হাতের আঁজলায় জল ধরে খেতে চেষ্টা করছে, পারছে না। পাজামা ফতুয়া ভিজে যাচ্ছে।

নীপা বারান্দায় শেলফে রাখা অ্যালুমিনিয়মের গ্লাসটা নিয়ে এসে মাকে বললে, দেবো ?

চারুবালা মাথা নেড়ে সায় দিলেন। যত ভয়ঙ্করই হোক, এমন কি শত্রু হলেও তৃষ্ণার্ত মানুষকে জল দেবে না তা কি সম্ভব!

বারান্দার শেলফে ওগুলো পার্বতিয়ার জন্যে। থালা, গেলাস, বাটি। একটা কলাইকরা থালা এনামেল উঠে গেছে কোথাও কোথাও। বাটিটাও এনামেলের।

টোল খাওয়া অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসটা হাতে নিয়ে নীপা ডাকলো, এই!

লোকটা ফিরে তাকালো।

আর নীপা অ্যালুমিনিয়মের গ্লাসটা চৌকো জালের যেখানটা ভেঙে অনেকখানি ফাঁক হয়ে গেছে তার ভিতর দিয়ে গলিয়ে ছুঁড়ে দিল।

গ্লাসটা শব্দ করে গড়িয়ে গেল।

সেটা দেখেই লোকটা ওদের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, গ্রাৎজি, গ্রাৎজি।

ছুটে এসে গ্লাসটা তুলে নিল। সেটা কলের নীচে ধরে ধুয়ে নিল, আর পর পর দু'তিন গ্লাস জল ভরে নিয়ে এমনভাবে ঢকঢক করে খেল, যেন ওর মধ্যে একটা অনন্ত পিপাসা জমা হয়ে আছে।

লোকটা আবার গ্লাসটা জলে ধুয়ে কল বন্ধ করলো, ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, গ্লাসটা ফেরত দেবার জন্যে হাত বাড়ালো।

কিন্তু কেউই ওটা নেবার জন্যে এগোলো না।

চারুবালা হাতের ইশারায় বোঝালেন, ওখানেই থাক।

গুরুদাস বললেন, কীপ ইট দেয়ার।

নীপা হেসে বললে, হ্যাঁ, সব বুঝছে। অর্থাৎ ও কি ইংরেজি বুঝবে!

লোকটা অবাক হয়ে ওদের মুখের দিকে তাকালো। গ্লাসটা কেন ফেরত নিচ্ছে না, বুঝতে পারছে না। তাই সেটা জালের ধার ঘেঁষে নামিয়ে রেখে ক্লান্ত পা টেনে টেনে উঠোনের মাঝখানে বসে পড়ল।

গুরুদাস আবার বললেন, গো অ্যাওয়ে, প্লীজ গো অ্যাওয়ে।

লোকটা আবার জোড় হাতে নমস্কার করার ভঙ্গি করলো, আর মুখের ওপর হাত চাপা দিয়ে ইশারায় বোধ হয় বলতে চাইলো, কথা বোলো না।

গুরুদাসের মনে পড়লো লোকটা একবার বলেছিল, সেভ। অর্থাৎ সেভ মি, আমাকে বাঁচাও।

লোকটা আবার বললে, প্রিজোনার।

তবে আর কি, মাথা কিনে নিয়েছিস। গুরুদাস বিব্রত বোধ করলেন। লোকটার ওপর রাগও হল। দূর থেকে স্টেশনঘরে বসে বসে, কিংবা এই কোয়ার্টারের বাগান থেকে পি ও ডবলু ক্যাম্পের আকাশ-ছোঁয়া জালের আর কাঁটা-তারের খাঁচার মধ্যে ঐ প্রিজনারদের দেখে মায়া হতো। সেটা ইংরেজদের ওপর অক্ষম রাগ থেকেই কি না কে জানে। আমরা তো পারছি না, জার্মানী, ইটালী আর জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে যদি ইংরেজরা হেরে যায় তা হলে স্বাধীনতা এসে পড়তে পারে। কিছু না হোক, ব্রিটিশ তো জব্দ হবে!

কিন্তু এখন ব্যাপারটা সম্পূর্ণ উল্টে গেছে। যাদের জন্যে এত মায়া, এখন তাদেরই একজন প্রচণ্ড আতঙ্ক।

একজন যুদ্ধবন্দী পালিয়ে এসে আমারই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। এর চেয়ে বড় অপরাধ আর কি হতে পারে।

এখনই হয়তো খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে। মিলিটারিতে সারা রেল চত্বরই ঘিরে ফেলেছে কি না কে জানে। হয়তো এখনই দরজায় টোকা পড়বে।

গুরুদাসের বুকের মধ্যে কেমন একটা অস্বস্তি। টিপ টিপ শব্দটা যেন কানে শুনতে পাচ্ছেন। উনি তো আবার নিজেও বণ্ড সই করেছেন, লান্স নায়েকের র‍্যাঙ্ক পেয়েছেন। ইউনিফর্ম পরেন, কাঁধে র‍্যাঙ্কের চিহ্ন আঁটা—আই ভি। কে যেন বলেছিল সেকেণ্ড লেফটেনেণ্টও হয়ে যেতে পারেন। তখন কাঁধের স্ট্র্যাপে একটা স্টার বসে যাবে, টুপিতে। না ওসবের লোভ নেই গুরুদাসের। উনি তো চাকরিতেই উন্নতির চেষ্টা করেননি কখনো।

কিন্তু এখন তো চোখের সামনেই বিপদ।

লোকটা হঠাৎ দুটো হাত মাথার নীচে রেখে উঠোনে সিমেন্টের ওপরই শুয়ে পড়লো। চোখ আকাশের দিকে। উঠোনটা খোলা আকাশের নীচে, শুধু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।

গুরুদাস অস্ফুটে বললেন, কি যে করা যায়।

ঘরে টেলিফোন আছে, কিন্তু রেলের টেলিফোন। একমাত্র পাশের কোয়ার্টারের এল বি এস ঘোষালবাবুকে ফোন করে জানানো যায়। কিংবা স্টেশনে। এখন আর কেউ আছে কি না তাও জানেন না। তাছাড়া, চারুবালার কথাটা মনে পড়লো। এ তো একটা বিচ্ছিরি স্ক্যাণ্ডাল। মিলিটারি ক্যাম্পে ক্যাপ্টেন বেল কিংবা মেজর হুইটলিকে খবর দেবারও উপায় নেই। এই টেলিফোনের সঙ্গে মিলিটারির টেলিফোনের সরাসরি যোগাযোগ নেই।

তাই মনের ক্ষোভেই বললেন, মিলিটারি ক্যাম্পে একটা খবর দিতে পারলে হতো।

উনি এখন বিপদ থেকে উদ্ধার চাইছেন। শেষে ওঁকেই না ফিফথ কলম বা কুইসলিং বলে ধরে। একটা পলাতক যুদ্ধবন্দীকে আশ্রয় দিয়েছেন। এটা ওয়ার-টাইম। উনি নিজেও, হোক না আই ই, রেলের লোক, কিন্তু একজন লান্স নায়েক।

নীপা বললে, এই বয়সে কেন যে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলি···

চারুবালা সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুটে বললেন, কোন্ দুঃখী মাকে কাঁদিয়ে এসেছিস, তুইই জানিস বাবা। আমার ইন্দ্রের মত বাচ্চা শিশু···

আসলে চারুবালার এখন আর তেমন ভয় করছে না। বুঝতে পেরেছেন, লোকটাই বাঁচতে চাইছে। স্বামীর বুকের মধ্যে কি তোলপাড় চলছে তাও টের পাননি। উনি অতশত বোঝেনও না। ওঁর কাছে শুধু একটাই সমস্যা। যুদ্ধবন্দী হলেও সাহেব, একটা বাইরের লোক, হুট করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে এই রাত্তিরবেলা। এখন কত রাত্তির কে জানে। বাড়িতে নীপার মত মেয়ে। সবাই বলে সুন্দর। এই বয়েস। একটা কিছু বলে দিলেই হল।

চারুবালা বললেন, আমার ইন্দ্রের মতো বাচ্চা শিশু···

ইন্দ্র হেসে ফেললো।

নীপা বললে, শিশুই তো। দ্যাখ তুই, কি সরল মুখ, একেবারে শিশুর মতো। হয়তো

ভাল করে গোঁফই ওঠেনি।

তা হয়তো নয়। কিন্তু সত্যি বড় কচি নিষ্পাপ সদ্যযুবক মুখ, যেন একটুক্ষণ আগে কৈশোর পার হয়েছে। ইটালিয়ান বলেই চেহারা যা একটু লম্বা, একটু স্বাস্থ্যবান।

লোকটা উঠোনে শুয়ে আছে, মাঝে মাঝে ওদের দিকে আড় চোখে তাকাচ্ছে।

বারান্দার দরজায় একটা চাব্‌স-তালা লাগিয়ে দিয়েছেন চারুবালা। আলিগড়ের নয়, খোদ রেল কোম্পানির বিলিতি চাব্‌স-তালা। ওর সাধ্য নেই ভেঙে ঢোকে। তাই চারুবালা নিশ্চিন্ত।

বললেন, চলো ঘরে চলো, সারারাত কি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি এখানে ?

কিন্তু ঘরে এসেও কি শান্তি আছে। গলায় লাগা মাছের কাঁটার মতো, ঢোক গিলতে গেলেই জানান দেয়। অস্বস্তি, অশান্তি।

গুরুদাস বললেন, জি আর পিকে ফোন করে জানালে হয়···

আর তখনই নীপা বলে উঠল, না না বাবা, ধরিয়ে দিও না। ও ঠিক নিজেই চলে যাবে। ও তো আমাদেরও ভয় পাচ্ছে।

চারুবালা বললেন, রাত্রে কোন হট্টগোল করে দরকার নেই, যা করতে হয় সকালে কোরো।

—কিন্তু ও যদি পালিয়ে যায়, আর পরে জানাজানি হয় রাত্তিরে এখানে প্রোটেকশন পেয়েছিল, জানিস না এটা কত বড় অফেন্স।

ইন্দ্র বললে, পালাবে কোথায়, বেরোলেই তো এক্ষুনি ধরা পড়বে। হয়তো মিলিটারি পেট্রোল বেরিয়ে পড়েছে···

চারুবালা চুপচাপ বসে ছিলেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তোর বাবা-মা কি দোষ করলো বল তো ! তারা হয়তো কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে।

গুরুদাস তখন নিজের বিপদের কথা ভেবে বিব্রত। ঈষৎ ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, তুমি তোমার মায়াকান্না রাখো তো। আগে নিজে বাঁচি।

ইন্দ্র উঠে গিয়েছিল লোকটা এখনো শুয়ে আছে কি না দেখতে। দ্রুত পায়ে ফিরে এল।—বাবা, লোকটা জালের কাছে এসে আমাদের দিকে উঁকি দিয়ে দেখছিল।

নীপা বললে, আমরা ওকে ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করছি কি না সেই ভয়ে হয়তো।

চারুবালা বললেন, পিস্তল-টিস্তল নেই তো, দেখেছিস ?

কেউ কোন কথা বললো না।

গুরুদাস যেন বুকের মধ্যে একটা অসহ্য কষ্ট চেপে রেখেছেন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, ও এখন চলে গেলেও বিপদ। ধর, পাঁচিল থেকে লাফিয়ে নামলো, কেউ কোথাও দেখতে পেল···

নিজের মনেই বললেন, ওয়ার প্রিজনারকে প্রোটেকশন দেওয়া।

নীপাও ভয় পেয়ে গেল। বাবার বিপদের কথাটা ও এতক্ষণ ভাবেইনি। বিপদের গুরুত্ব বোঝেনি !

গুরুদাস হঠাৎ বললেন, ওকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেয়ে আটকে রাখতে পারলেই ভাল হতো। কাল সকালেই মেজর হুইটলিকে খবর দিতাম।

ইন্দ্র বললে, ঐ কোনার ঘরটায় ওকে শুতে বললে হয়। যেই যাবে তালাচাবি দিয়ে দেব।

গুরুদাস বললেন, ঠিক বলেছিস। ওকে তালাচাবি দিয়ে আটকে রেখে যদি খবর দিই, তা হলে তো আর আশ্রয় দেওয়া হল না।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। কি ভাবে তা করা সম্ভব ভেবে কূলকিনারা পেল না।

এই বাড়িটা কেমন আনন্দে ফুর্তিতে ছিল। একটা সুখী সংসার। অথচ ছোট্ট একটা ঘটনায় সমস্ত আনন্দ উবে গেছে। বুকের মধ্যে শুধু ভয়।

হঠাৎ সবাই চুপ করে গেল। কান সজাগ করে রইলো। গুরুদাস প্রথমে ভেবেছিলেন, ভেবে আঁতকে উঠেছিলেন, সদর দরজার দিক থেকে নয় তো ? মিলিটারির লোক ? খোঁজে বেরিয়েছে ?

না, ঐ লোকটাই যেন চাপা গলায় ডাকছে, সিনিওর। মিস্তার।

ওঁরা সবাই বেরিয়ে এলেন।

লোকটা ফতুয়া তুলে পেট দেখালো।—পানা, পানা !

ওরা কিছুই বুঝলো না। শুধু মনে হল কিছু খেতে চাইছে।

লোকটা হাসল, নিজের বুকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, ফ্রেন্দ্।

—কি বলছে ? গুরুদাস ইন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন।

ইন্দ্র বললে, কি জানি, বোধহয় ফ্রেণ্ড।

লোকটা আবার বললে, ইতালিয়ানো ফ্রেন্দ্। হাসল—ইন্দিয়া ফ্রেন্দ্।

ওরা হেসে ফেললো।

নীপা নিজের শরীরটাকে কপাটের আড়ালে রেখে উঁকি দিয়ে দেখছিল। বললে, ফ্রেণ্ড হয়ে কাজ নেই, মানে মানে বিদেয় হও।

গুরুদাস হঠাৎ চারুবালাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতটাত আছে কিছু ?

নীপা ইন্দ্র দুজনেই অবাক হয়ে গেল। এত বিপদের মধ্যেও বাবার মনে কি ওর জন্যে মায়া। মা'র মতো ?

চারুবালা ঘাড় নেড়ে বললেন, পার্বতিয়ার জন্যে তো রাখা থাকে। বারান্দার কোণের দিকে দেখালেন। সেখানে হাঁড়ি কড়াই জড়ো করা আছে।

গুরুদাস ইন্দ্রর দিকে ফিরে বললেন, পারবি ? ঐ ঘরে খেতে দিবি, যেই খেতে বসবে···

ইন্দ্র ঘাড় নেড়ে বললে, পারবো।

সঙ্গে সঙ্গে গুরুদাস বললেন, আর ইউ হাংরি ?

লোকটা বোকার মত তাকিয়ে রইলো, বুঝতে পারলো না, কিংবা অবাক হয়ে গেছে এতখানি সহানুভূতি পেয়ে।

ইন্দ্র প্রশ্ন করলো, ফুড ? ফুড ?

লোকটা হঠাৎ যেন বুঝতে পেরেছে, চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

সেও প্রশ্ন করলো, ফুদ ?

আসলে লোকটা সারাদিন হয়তো পালাবার ধান্দা করেছে। খাওয়া হয়নি। ক'দিন খায়নি কে জানে !

সন্ধেবেলা সেই আলো নিভে যাওয়া, গুলির আওয়াজ, আর্তনাদ, সব মনে পড়ে গেল নীপার।

গুরুদাসই বারান্দার দরজার তালাচাবি খুললেন।—কাম। কাম হিয়ার।

কোণের ঘরে নীপা খাবার নিয়ে গেল। রাত্রের উদ্বৃত্ত ভাত ডাল। পার্বতিয়ার জন্যে রাখা থাকে।

আসনও বিছিয়ে দিল নীপা। আর পার্বতিয়ার এনামেলের থালা বাটিতে ভাত ডাল তরকারি। সন্ধের সময় বানানো শুকনো দুখানা রুটি। অ্যালুমিনিয়মের গ্লাসে জল।

ইন্দ্র হাতছানি দিয়ে ডাকলো ওকে।

লোকটা খুব সঙ্কোচের সঙ্গে ঘরে ঢুকলো। আর বোকার মত যেদিকে আসন তার উল্টো দিকে মেঝেতে বসে পড়লো।

মুখচোখ দেখে বোঝা গেল বেশ ক্ষুধার্ত।

নীপা তারই মধ্যে হাত ধোবার মগে করে এক মগ জল রেখে দিয়েছে ঘরের কোনায়।

তারপর দরজার আড়াল থেকে রসিকতা করে বললে, খাও সাহেব খাও, দিশি রান্না খেয়ে নাও।

গুরুদাস নিজের মনেই বললেন, ফাঁসির খাওয়া। কাল সকালেই তো ধরা পড়বি।

লোকটা রুটি দুখানা তুলে তাকালো ওদের দিকে।—পানা। পানা।

হাসল।

শুকনো ভাতগুলো দেখে খুব খুশি। অবাক হওয়ার স্বরে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, রিৎসি?

বলে ফিরে তাকিয়েছে।

আর তখনই ওরা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। পলকের মধ্যে দরজাটা বন্ধ করে তালাচাবি লাগিয়ে দিয়েছে ইন্দ্র।

৫

একটি বাড়ির চার দেয়ালের মধ্যে উদ্বেগ, দুর্ভাবনা, বিপর্যয়। অথচ বাইরের পৃথিবীতে সেই একই দৈনন্দিনতা।

গুরুদাস নিত্যদিনের মতোই সকালে একবার স্টেশন থেকে ঘুরে আসেন। কেউ গুরুদাসের খোঁজ করলে চারুবালা রসিকতা করে বলেন, বৈঠকখানায়। কথাটা মিথ্যে নয়। এ-সময়ে কোন কোনদিন উনি একেবারে সাধারণ পোশাকে চলে আসেন। কারণ এ-সময় কোন ট্রেন নেই, কোন যাত্রীও আসে না। প্লাটফর্ম একেবারে নির্জন নিথর। মিলিটারির লোকরাও আসে না।

আজ কি মনে হতে খাকি ইউনিফর্ম পরলেন, বুশকোটের থলির মত দু'পকেটের পিতলের বোতাম আঁটলেন। দু'কাঁধে পিতলের আই ই অক্ষর দুটোয় হাত বুলিয়ে দেখে নিলেন ঠিক আছে কি না। ওঁর বোধহয় কেবলই মনে হচ্ছিল জীপে করে ক্যাপ্টেন বেল বা মেজর হুইটলি এসে পড়বে। অথবা অন্য কোন মিলিটারি অফিসার। কিংবা এমনও হতে পারে এই খাকি পোশাক পরে নিজের গুরুত্ব বাড়াবার চেষ্টা করছিলেন, সাহস সঞ্চয় করছিলেন।

রাত্রে ঘুমোতে পারেননি, কেউই ঘুমোয়নি। চারজনে মুখোমুখি বসে নানান জল্পনা কল্পনায় রাত কেটে গেছে।

ঐ ভয়ঙ্কর আগন্তুককে কোণের ঘরে তালাচাবি দিয়ে বন্দী করে রেখেও নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। কেবলই মনে হয়েছে মিলিটারি সৈন্যদের কেউ যে-কোন মুহূর্তে এসে কড়া নাড়বে। মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন কড়া নাড়লেই হাসতে হাসতে গিয়ে বলবেন, আই হ্যাভ মেড হিম এ প্রিজনার এগেন। তারপর ঘরটা দেখিয়ে দেবেন!

কিন্তু লোকটার ব্যবহার বড় অদ্ভুত লেগেছে ওঁর।

রাত্রে ওঁরা যখন দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় মুখোমুখি জেগে বসে আছেন, নীপা হঠাৎ বলেছিল, লোকটার কিন্তু খুব খিদে পেয়েছিল, না রে দাদা?

ইন্দ্র শুধু মাথা নেড়েছিল।

আর নীপা বললে, ভাত ডাল দেখে চোখমুখ এমন হল। কি গোগ্রাসে গিলছিল যদি দেখতে মা।

হ্যাঁ, গুরুদাসও দেখেছেন। যেন কতদিন খায়নি। ভাতগুলো মুঠো মুঠো করে খেল, তারপর ডালটা চুমুক দিয়ে খেল বাটি থেকে।

ভাত যে ডাল মেখে খেতে হয় জানে না। সে-কথা ওকে বলার সুযোগও ছিল না। তখন তো ওরা ওর খাওয়ার কথা ভাবছে না, ভাবছে কি ভাবে ঝট করে বেরিয়ে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দেবে।

উনি লক্ষ্যও করেননি। নীপাই বললে, খেতে পেয়ে এমনভাবে তাকালো, জানো বাবা, যেন কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। যেন আমরা ওর কত বন্ধু।

গুরুদাসের সবচেয়ে আশ্চর্য লেগেছে তালাচাবি দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দেবার পর।

ওঁরা তখন সকলেই নিশ্চিন্ত। যেন বিপদ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে গেছেন। এখন খবর দিয়ে দিতে পারলেই মেজর হুইটলি সোনালী গোঁফ নাচিয়ে ধন্যবাদ জানাবে। হয়তো পিঠ চাপড়ে বুদ্ধির প্রশংসা করবে। বলা যায় না, পুরস্কার-টুরস্কারও পেয়ে যেতে পারেন।

কথাটা মনে উঁকি দিতে নিজেরই খারাপ লাগলো। নিজেকেই যেন ধমক দিলেন, এসব লোভের কথা আমার মনে এল কেন ? না, ওসব ফাঁকা পুরস্কারে ওঁর লোভ নেই। ওটা তো পাপের পুরস্কার। একটা ভীত সন্ত্রস্ত মানুষকে বিট্রে করেছি যেন। না, গুরুদাস নিজেকে বোঝালেন, আমি তো শুধু নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছি। চাকরিতে উন্নতির চেষ্টা করিনি, ডি অফ আইয়ে জয়েন করেছি ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে। ওদের পড়ার খরচের কথা ভেবে। নিজেকে বিক্রি করেননি। মুভমেণ্টের খবর যখন কাগজে পড়তেন, রাতারাতি নেতাদের অ্যারেস্ট করার খবর, তখন উনিও উত্তেজিত হয়ে উঠতেন। মনে মনে চাইতেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হোক। অক্ষম অসহায় মানুষ, যাকে সংসার আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছে, সে এর বেশি আর কি করবে।

বকশি একদিন কানে কানে বলেছিল, খবর শুনেছেন গুরুদাসদা ? সুভাষ বোস নাকি জাপান থেকে রেডিওয় বক্তৃতা দিয়েছেন।

শুনে প্রৌঢ় বয়সেও ওঁর রক্ত চনমন করে উঠেছিল।

—বাবা।

গুরুদাস বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। লোকটাকে কোণের ঘরে চাবি দিয়ে রেখে নিশ্চিন্ত হয়েছেন বলেই অন্য কোথায় মন চলে গিয়েছিল। নীপার কথায় ঘোর কেটে গেল।

নীপা বললে, বাবা, লোকটা বোধহয় আমাদের খুব বিশ্বাস করেছে।

গুরুদাসেরও তাই মনে হল। মনে হল বলেই খারাপ লাগলো।

উনি তো অবাকই হয়েছিলেন। একটা লোককে হঠাৎ ঘরের দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে দেওয়া হল। অথচ লোকটা ছুটে এসে দরজা খোলার চেষ্টা করলো না, উঠে এসে সিনিওর বলে ডাকলো না। কোন অনুনয় করলো না।

সে-কথা ভেবেই বড় আশ্চর্য লাগছিল গুরুদাসের।

কিন্তু এখন তো ওঁর সামনে অনেক বড় একটা দায়িত্ব। খবর দিতে হবে, পলাতক বন্দীটাকে উনি ধরে রেখেছেন।

সারারাত ওঁরা ঘুমোতে পারেননি। শুধু ভোরের দিকে কেমন তন্দ্রা মত এসেছিল।

ভেবেছিলেন, সকালে উঠেই দেখবেন সমস্ত স্টেশন এলাকা টমি সৈন্য আর মিলিটারি পুলিসে ভরে গেছে!

কিন্তু বাইরে বেরিয়ে দেখলেন কোথাও কিছু নেই। প্রতিদিনের মতোই প্লাটফর্ম নির্জন, আকাশের দিগন্তসীমায় কুয়াশা মাখা পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য উঠেছে, দূরের শাল-মহুয়ার বন যেন একটু একটু করে ঘোমটা তুলছে, স্পষ্ট হয়ে উঠছে রোদ্দুর লেগে।

আর সেই পি ও ডবলু ক্যাম্প নিত্যদিনের মতোই। বিশাল উঁচু তারের জাল আর কাঁটা তারের বেড়ার ওপারে রাইফেল কাঁধে ব্রিটিশ টহলদার সৈন্য, আর শ্যাওলা রংয়ের সারি সারি খুপরি, কাঠ আর ক্যানভাসের সারি সারি তাঁবুর মতো। যেন শ্যাওলা সবুজ তাঁবু। ইটালিয়ান প্রিজনাররা তখনও সারি দিয়ে এসে দাঁড়ায়নি। আরেকটু পরেই হয় তো যথারীতি আসবে, ডোরা কাটা জামা গায়ে, ডোরা কাটা পাজামা পরে। হাতে কফির মগ নিয়ে।

গুরুদাস ইউনিফর্ম পরে এসেছেন, মেজর হুইটলি কিংবা ক্যাপ্টেন বেল সাত সকালে আজ এসে পড়বে ভেবে নিয়েই। এসে পড়লে উনিও নিশ্চিন্ত। তা না হলে ওঁকেই খবর পৌঁছে দিতে হবে। অথচ ঐ ক্যাম্পের দিকে যাওয়া নিষিদ্ধ। সিভিলিয়ানদের তো কথাই নেই, ওঁরাও যেতে পান না।

কিন্তু তার আগেই কি বকশি কিংবা রতনমণিকে বলবেন ? রাত্রের সব ঘটনা। জানতে তো পারবেই। হুইটলিকে বলার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয় রাইফেলধারী সোলজাররা এসে বাড়িটা গার্ড দেবে। লোকটাকে নিয়ে যাবে। তখন সবাই বলবে আমাকে বললেন না ? এত বড় একটা ঘটনা চেপে রাখলেন।

কিন্তু বকশি প্রচণ্ড জার্মান-ভক্ত। মুরী গেলেই সামন্ত সাহেবের বাংলোয় গিয়ে বার্লিন রেডিও শোনে। সামন্ত সাহেবের ছেলেকে পড়াতো একসময়, তা থেকেই ঘনিষ্ঠতা।

গুরুদাসেরও অবশ্য ইচ্ছে হয়। কিন্তু ডাক্তার হাজরা ছাড়া আর কারো বাড়িতে রেডিও নেই। দু-একজন ঠিকাদারের বাড়িতে আছে, কিন্তু ওদের বিশ্বাস করেন না।

বকশিকে বলবেন কি সব কথা ? কিন্তু ওর তো বড় বেশি মায়া। কথায় কথায় বলে, ইংরেজ ব্যাটারা ফর্সা, কিন্তু ইটালিয়ানদের মত সুন্দর নয়। দেখেছেন কি সুন্দর দেখতে, কখনো বলে বসে, দেবতুল্য।

বকশি যদি বলে, কি আশ্চর্য, ধরিয়ে দেবেন ? ছেড়ে দিন গুরুদাসদা ছেড়ে দিন, পালাতে পারে তো পালাক না।

তখন বড় মুশকিলে পড়ে যাবেন গুরুদাস। হুইটলিকে বলে লোকটাকে তার পরও যদি ধরিয়ে দেন, ওরা হয়তো সবাই বলবে ট্রেটর। বিশ্বাসঘাতক। সে তো সাঙ্ঘাতিক অপমান।

গুরুদাস অত রাজনীতি বোঝেন না। এই যে বিয়াল্লিশে বিদ্রোহ হয়ে গেল। কত রকম কথাই শুনলেন। কোনটা ভুল কোনটা ঠিক বুঝতে পারেন না। উনি বণ্ড সই করেছেন, ডি অফ আই-এ জয়েন করেছেন। না করলেও সেই একই কাজ করতে হতো, একই দায়িত্ব। তবু এই ইউনিফর্মটা কোথায় যেন কাঁটার মতো বেঁধে।

বিশ্বাসঘাতক।

কথাটা মিথ্যে নয়। নীপা বলেছিল, বাবা, লোকটা আমাদের খুব বিশ্বাস করেছে।

সত্যি তাই।

সারা রাত জেগে বসে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই দেখলেন ভোর হয়ে গেছে। ইন্দ্র নীপা চারুবালা যে যেখানে বসে ছিল সেখানেই ঘুমে ঢলে পডেছে।

ইন্দ্রর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলা দিলেন, ইন্দ্র ওঠ, ভোর হয়েছে।

ধড়মড় করে উঠে পড়লো ইন্দ্র। ওরাও উঠল ডাক শুনে। আর গুরুদাস ধীরে ধীরে বাগানের দিকের জানালাটা খুললেন। ওঁরা যে জেগে বসে আছেন বাইরে থেকে কেউ দেখতে পাবে বলে রাত্রে জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

জানালা খুলে উঁকি দিয়ে দেখলেন গুরুদাস। না, কেউ কোথাও নেই। প্লাটফর্ম নির্জন।

আর তখনই নীপা বলে উঠল, মা সব্বনাশ হয়েছে। পার্বতিয়ার থালা গ্লাস তো ঐ ঘরে,

ও তো এসেই খোঁজ করবে। ওকে গেলাসে চা দিতে হবে।

গুরুদাসও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একথা রাত্রে একবারও ভাবা হয়নি।

চারুবালা বললেন, পার্বতিয়া যদি ওকে দেখতে পায়...

চারুবালার ভয় লোকটার জন্যে নয়। ভয় পার্বতিয়াকেই। ও যদি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে ওঘরে তালা কেন, কিছু একটা বললেই চলবে। কিন্তু লোকটা যদি ওর সামনেই ডাকাডাকি করে বসে, কিংবা পার্বতিয়া যদি দেখতে পায়, মাস্টারবাবুর কোঠিতে এক সাহেব আদমি রাত কাটিয়েছে। ছি ছি।

ইন্দ্র বললে, লোকটা খারাপ নয়। বরং তালা খুলে ওগুলো বের করে নিই।

চারুবালা বললেন, রাত্রেই যে পালাতে চায়নি, দিনের বেলা সে কি আর পালাবে?

শুধু গুরুদাস বললেন, পালাবে না, কিন্তু খুব রেগে আছে নিশ্চয়। বুঝতেও তো পেরেছে তালাচাবি দিয়ে রেখেছি।

ইন্দ্র এসে নিঃশব্দে তালাটা খুললো। চারুবালা কাছে এসে দাঁড়ালেন। তেমন কিছু হলে, ছেলেকে বাঁচাবেন।

যে পালাতে সাহস পাবে না, সে রেগে গিয়ে কিছু ছুঁড়ে মারতে পারে।

একটাই ভরসা পিস্তল-টিস্তল নেই।

দরজাটা খোলা হল। নিঃশব্দে।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রর মুখে হাসি দেখা দিল। ইশারায় ডাকলো সবাইকে।

আশ্চর্য। এই লোকটারই জীবন নিয়ে টানাটানি। অথচ নির্ভাবনায় ঘুমোচ্ছে। ঐ মেঝেতে শুয়ে।

নীপা এসে দেখল। একপাশে ইন্দ্রর তক্তপোশ রয়েছে, তার ওপর বিছানা বালিশ গুটিয়ে রাখা। অথচ সেগুলো পেতে নেয়নি।

পায়ের শব্দ না করে একে একে থালা গ্লাস জলের মগ সব বের করে নিয়ে আবার তালা লাগানো হল।

কিন্তু ওর ঘুমন্ত চেহারার ছবিটা কেউ চোখ থেকে মুছে ফেলতে পারলো না। কি নির্ভাবনায় ঘুমোচ্ছে।

শুধু নীপা বললে, দাদা, লোকটা বোধহয় ভেবেছে ওকে লুকিয়ে রাখার জন্যেই তালা দিয়েছি। আমাদের বিশ্বাস করেছে।

বলে হাসল নীপা।

আর সেই কথাটা মনে পড়তেই গুরুদাসের মনে হল কে যেন কানের কাছে বলে উঠছে, বিশ্বাসঘাতক!

গুরুদাস ভাবলেন বকশিকে এখন সমস্ত ঘটনাটা বললে সেও হয়তো বলে উঠবে, বিশ্বাসঘাতক।

কিন্তু গুরুদাসের তো কোন উপায় নেই। কেউ বিশ্বাস করেছে বলেই কি তার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে হবে? ও তো আইনের চোখে একটা ক্রিমিনাল। কিংবা তার চেয়েও বেশি। ওকে ধরিয়ে না দিলে গুরুদাস নিজেই একজন ক্রিমিনাল হয়ে যাবেন। তার চেয়েও বেশি। এটা ওয়ার-টাইম। উনি নিজেও একজন লান্স নায়েক। হোক না আই ই। লোকটা একজন পলাতক যুদ্ধবন্দী। এর কোন ক্ষমা নেই।

ওকে প্রোটেকশন দিলে এই ইউনিফর্মটাও তো বলবে, বিশ্বাসঘাতক। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও।

অন্যদিন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ ভোরের প্রকৃতিকে দেখেন। বড় ভাল লাগে। পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য উঠে শাল গাছের মাথায় আটকে থাকে। নরম রোদ্দুরের

তির্যক বর্শার ফলা শাল মহুয়ার ফাঁক দিয়ে এসে পড়ে এখানে ওখানে। রোদ্দুরের ঝর্নার পাশাপাশি শাল গাছের ছায়া পড়ে লম্বা হয়ে। আঁকা ছবির মতোই লাগে।

আজ আর গুরুদাসের ওসব প্রাকৃতিক শোভা দেখতে ভাল লাগলো না। এখন বুকের মধ্যে একটা উদ্বেগ। কখন হুইটলি কিংবা অন্য কেউ আসবে ঐ পলাতক বন্দীটার খোঁজে। কিংবা শুধুই ওঁদের কাছে জিজ্ঞেস করতে, দেখেছেন কিনা।

নিজের অফিস ঘরের দিকে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালেন গুরুদাস।

প্লাটফর্মের ও প্রান্ত থেকে গানের সুর ভেসে আসছে।

প্রতিদিনের মতোই রেজার দল চলেছে ঠিকাদারের কুঠিতে। দল বেঁধে দেহাতি আদিবাসী মেয়েরা দূরের মুণ্ডধাওড়া থেকে প্রতিদিন এ-সময় কাজ করতে যায়। রেল লাইন টপকে টপকে এসে প্লাটফর্মের ওপর দিয়ে হেঁটে যায়।

হাঁটা নয়, যেন নাচের ছন্দে চলা। কোমর জড়াজড়ি করে এক এক সারিতে দশ পনেরো জন মেয়ে, গান গাইতে গাইতে মনের আনন্দে, একটানা সুরের গান, তারই ফাঁকে ফাঁকে হাসাহাসি, ঢলাঢলি, পথে দেখা কাউকে নিয়ে চোখের ইশারায় রসিকতা নিজেদের মধ্যে, তারপর আবার গান।

দেখতে বড় ভাল লাগে। এই পরিবেশের সঙ্গে ওরা স্বচ্ছন্দে মিশে আছে। শালফুলের মিষ্টি গন্ধের সঙ্গে, মহুয়া ফুলের মাতাল হাওয়ায়। কিন্তু অল্পে তুষ্ট মেয়েগুলো বড় বোকা। জানে না ঐসব রঙ্গরসিকতায় ওরা পুরুষের মনে লোভ জাগিয়ে দেয়। বিশেষ করে এই মিলিটারি অফিসারদের মনে।

দূর বিদেশে স্ত্রীকে ফেলে রেখে মিলিটারি ক্যাম্পে ক্যাম্পে কাটাতে হয় বলেই কি বেলেল্লাপনা করতে হবে! গুরুদাসও তো প্রথম বয়সে সংসার ছেড়ে স্টেশনে স্টেশনে কাটিয়েছেন। কই কোনদিন তো পদস্খলন হয়নি। আর এই অফিসার আর টমির দল! নিত্যদিন পার্টি লেগেই আছে। রঙচঙে পোশাক পরা অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ের দল, একবার এসেছিল একটা মিলিটারি নার্সের দল, কখনো বা ডবলু এ সির সেই নীলপরীরা। দামী দামী রঙিন গাউন পরে নাচতে যায়। কখনো ইউনিফর্ম পরেই জীপে কিংবা মিলিটারি ট্রাকে সোলজারদের মাঝখানে বসে বল্গাহীন উল্লাস, শরীরের অট্টহাস।

সে-সব তবু সহ্য করেন। কিন্তু এই কালোকুলো মেয়েগুলোকে কখনো সখনো ওদের সঙ্গে দেখলে ওঁর সারা শরীর জ্বলে ওঠে। গুরুদাস জানেন, উনি নিজেও ওদের তাচ্ছিল্য করেন, হয়তো ঘৃণাও, চারুবালা তো পার্বতিয়াকে অস্পৃশ্য ভাবেন, তবু ঐ ব্রিটিশ বা আমেরিকান সৈন্যদের সঙ্গে কোন কালোকুলো মেয়েকে দেখলেই ভীষণ অপমানিত লাগে। যেন এর চেয়ে বড় লাঞ্ছনা আর হয় না। তখনই বুঝতে পারেন ওরা আমাদেরই লোক। আমরাই।

লেফটেনেন্ট কর্নেল হামফ্রের কথা মনে পড়লো। একেবারে ওপর তলার আমেরিকান অফিসার। ইয়াঙ্কি স্বরে কথা বলতো। ব্রিটিশ আর্মির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যেই বোধহয় এখানে ছিল। মাঝে মাঝে রাঁচি যেত, ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের হেডকোয়ার্টার।

খুব মিশুকে ছিল লোকটা। ব্রিটিশ অফিসারদের মত রাশভারি নয়।

এমনি একটা কুলিকামিনের দল গান গাইতে গাইতে চলেছে, কোমর জড়াজড়ি করে, হেলেদুলে, হাসতে হাসতে।

হামফ্রে হঠাৎ একজনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ব্ল্যাক গডেস।

তারপর কোনদিন 'চার্মিং' কোনদিন ঠাট্টার সুরে হোয়ের্স মাই গার্ল ফ্রেণ্ড।

হঠাৎ একদিন শনিচারীর হাটের দিকে যাচ্ছেন, পীচ রাস্তা পার হবেন, একটা জীপে সেই ব্ল্যাক গডেসকে দেখলেন, হামফ্রের পাশে। মনে হল মদ খেয়েছে, ঢলে ঢলে পড়ছে, কি

কুৎসিত হাসি।

অবশ্য ঐ একটাই ব্যতিক্রম। এখানে। তারপর থেকে মেয়েটাকে আর রেজার দলে দেখা যেতো না। ওরাও আর মিলিটারিদের নিয়ে হাসাহাসি করতো না। যেন ভয় পেয়ে গিয়েছিল।

ব্ল্যাক গডেস। কালো প্রতিমা।

হ্যাঁ, সেই মেয়েটাই অবাক করে দিল।

একজন পাঞ্জাবী শিখ, সন্তোক সিং, একটা বিরাট ঝকঝকে দোকান খুললো ক্যান্টনমেন্টের দিকে। মিলিটারির লোকদের জন্যে।

এক পাশে মদের বার, আরেক দিকে নানান জিনিসপত্র, মেমসাহেবদের দামী দামী গাউন থেকে টুকিটাকি নানান জিনিস। সোলজাররাই কিনতো, বোধহয় যারা নাচতে আসতো তাদের উপহার দেবার জন্যে। তখন চর্তুদিকে টাকা উড়ছে। রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাচ্ছে অনেকে। আর অন্য সকলে গরীব হয়ে যাচ্ছে, জিনিসের দাম বাড়ছে চচ্চড় করে, চালের দাম।

গুরুদাসদের অবশ্য ঐসব ভাবনা নেই। চাল চিনি এগপাউডার, আরো কত কি। অঢেল সস্তার র‍্যাশন। কোথাও চিনি পাওয়া যায় না, ডাক্তার হাজরা এখনো আসেন টাঙ্গায় করে, কৌটো ভর্তি চিনি নিয়ে যান, রেলের সস্তা দরের চিনি।

ঠিকাদার লাহিড়িকেই শুধু দেওয়া বন্ধ করেছেন। রাগে, অভিমানে। লাহিড়ি ভেবেছিল উনি লাভ করছেন। বিদেশ বিভুঁই, বাঙালীকে একটু সাহায্য করা। তাও পারলেন না। কি ছোট মন। অথচ বাজপেয়ীজী কথায় কথায় কৃতজ্ঞতা জানান, দুবার মাত্র গম দিয়েছিলেন বলে।

আর ঐ সন্তোক সিং। মদের দোকান করলেও কি অমায়িক ব্যবহার।

প্রায়ই যেতে বলতো তার দোকানে।

গুরুদাস আর বকশি নেহাত ভদ্রতার খাতিরেই গিয়েছিলেন। দুপুরবেলা, একেবারে জনশূন্য।

হঠাৎ সেই সময়ে শাড়ি পরা সেই ব্ল্যাক গডেস মেয়েটা এসে ঢুকলো, একাই। সেলসম্যানরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে হাসল ওকে দেখে। দেখে বোঝা গেল ওরা কেউই মেয়েটাকে চেনে না।

তখনই একটা অবাক কাণ্ড ঘটে গেল।

দেয়ালে কয়েকটা রংবেরংয়ের সুন্দর সুন্দর গাউন ঝুলছিল।

মেয়েটা কেমন লোভী চোখে সেগুলোর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটা গাউনের দাম জিজ্ঞেস করলো।

সেলসম্যান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে হেসে বললে, বহুৎ রুপেয়া।

কালোকুলো মেয়েটা তবু জিজ্ঞেস করলো কত দাম।

—সাতশো।

সঙ্গে সঙ্গে শাড়ির কোঁচড় থেকে এক তাড়া নোট বের করে দিল সে।

গাউনের প্যাকেটটা নিয়ে সদর্পে সকলকে তুচ্ছ করে চলে গেল মেয়েটা।

আর গুরুদাসের নিজেকে বড় ছোট মনে হল। ওঁর হঠাৎ মনে হল যেন সমস্ত দেশটা ধর্ষিতার গর্ব নিয়ে সদর্পে পা ফেলে চলেছে। কোথায় কে জানে।

কালোকুলো মেয়েগুলো কোমর জড়াজড়ি করে গান গাইতে গাইতে তখন প্লাটফর্ম পার হয়ে চলে গেছে।

গুরুদাস এসে বসলেন নিজের অফিস ঘরে। রতনমণি আগেই এসেছেন, টেলিগ্রাফ

যন্ত্রটার সামনে বসে আছেন।

ওঁর দিকে তাকিয়েই বলে উঠলেন, শরীর খারাপ নাকি গুরুদাসদা।

গুরুদাস চমকে উঠেই তাড়াতাড়ি বললেন, না না, শরীর খারাপ হবে কেন! ভিতরে ভিতরে কিন্তু বিব্রত বোধ করলেন। তা হলে কি ওঁর চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ওঁর ওপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে গেছে।

জার্মান সিলভারের কৌটো থেকে পান বের করলেন রতনমণি।

তারপর চাপা গলায় বললেন, কাল রাত্রের ব্যাপারটা শুনলাম।

গুরুদাসের বুকের ভিতরটা ধক করে উঠল। কোন কথা বলতে পারলেন না।

আর রতনমণি থেমে থেমে বললেন, ঐ যে পিয়ারীলাল ডিম সাপ্লাই দেয় পি ও ডবলু ক্যাম্পে, ও বলছিল···

—কি, কি বলছিল?

কৌটো থেকে পান নিয়ে কটাস করে ডিবেটা বন্ধ করলেন। ক্ষুদে মাপের অগুন্তি সাজা পানে ঠাসা থাকে ওটা। দিবারাত্র পান চিবোচ্ছেন। সামনের একটা দাঁত উঁচু, পোকায় খাওয়া। ঠোঁটে ঠোঁট চাপলেও সেটা বেরিয়ে থাকে পানের ছোপ লেগে লাল হয়ে।

রতনমণি বললেন, পিয়ারীলাল এখান দিয়েই গেল একটু আগে।

গুরুদাসের প্রশ্ন করতেও ভয়।

রতনমণি চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিলেন গুরুদাসের মুখোমুখি। বললেন, ঐ যে সন্ধেবেলায় আলো নিভে গেল, গুলিব শব্দ হল···ক'টা মরলো কে জানে।

গুরুদাস তাকিয়ে রইলেন রতনমণির দিকে। যাক, ওঁর বাড়ির ব্যাপারটা নয়। ওদিক থেকে নিশ্চিন্ত। কিন্তু জানার আগ্রহ একদিকে, কি হয়েছিল কাল, ঐ পি ও ডবলু ক্যাম্পে? অন্যদিকে প্রসঙ্গ বদলাতে পারলেই যেন ভাল।

হুইটলিকে বলার পর যখন জানতে পারবে, তখন রতনমণি তো বলে বসতে পারেন, এত কথা হল কালকের ইনসিডেণ্ট নিয়ে, আর একবারও বললেন না, আপনার বাড়িতেই···

এ এক যন্ত্রণা।

রতনমণি নিজের মনেই বলে চললেন, কানাঘুষো শুনে এসেছে পিযারীলাল, দুটো প্রিজনারকে নাকি লাশ বানিয়ে দিয়েছে।

—কেন? কেন? গুরুদাস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

তারবাবু রতনমণির কান সজাগ থাকে গল্প করার সময়েও। টেলিগ্রাফ যন্ত্রটায় টরে টক্কা টরে টক্কা আওয়াজ উঠল। শুনলেন। না, ওঁর মেসেজ নয়।

বললেন, ঐ যা বলে আর কি ওরা। আসলে গুলি করে মারে, তারপর বলে জাল কেটে পালাতে যাচ্ছিল। অবশ্য সত্যি সত্যি পালাবার চেষ্টাও করতে পারে। হাজার হোক সাহেবের রক্ত, বুঝলেন না।

গুরুদাস একদিকে নিশ্চিন্ত হলেন, অন্যদিকে দুর্ভাবনা। মিলিটারির কেউ আসছে না কেন। হুইটলি কিংবা বেল। অথবা আর কেউ। এ-সময়ে আসে না ঠিকই। কিন্তু আজ তো ব্যতিক্রম হবার কথা। বলছে, দুজন প্রিজনার গুলি খেয়ে রক্তমাখা লাশ হয়ে গেছে। তা হলে বোধহয় কয়েকজন মিলে দল বেঁধেই পালাচ্ছিল। দুজন মরেছে। দুজন না কি আরো বেশি, কে জানে। কিন্তু পালিয়েছে ক'জন? একটা তো ওঁরই কোয়ার্টারে। তালাচাবি দিয়ে বন্দী করে রাখা আছে।

এখনই কেউ এলেই তো ধরিয়ে দেবেন। তা হলে কি ঐ লোকটাও ডেড বডি হয়ে যাবে, কোন সোলজারের গুলিতে? তা কেন হবে? ওসব মিথ্যে রটনা।

গুরুদাস অধৈর্য হয়ে উঠেছিলেন। মেজর হুইটলিকে কিংবা ক্যাপ্টেন বেলকে বলে

ফেললেই উনি মুক্ত। প্রিজনার পালিয়েছে অথচ ওদের যেন খুঁজে বের করার কোন চেষ্টাই নেই। এতক্ষণে তো এসে জিজ্ঞেস করার কথা।

রতনমণি বললেন, কাউকে বলবেন না যেন। পিয়ারীলাল বলছিল, টমি ব্যাটারা কেউ কিছু বলেনি। শুধু বলেছে ইলেকট্রিকে কোথায় শর্ট সার্কিট হয়ে আলো নিভে গিয়েছিল।

গুরুদাসের তখন আর ওসব জানার কোন আগ্রহ নেই। উনি ক্যাম্পের দিকে পীচ রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কোন জীপ বা ট্রাক আসছে কিনা।

সকালে পার্বতিয়া যখন বাসন মাজতে এল কি অস্বস্তি। হঠাৎ না বারান্দার দিকে চলে আসে। হঠাৎ না প্রশ্ন করে বসে, দাদাবাবুর দরোজায় তালা কেন।

ওটা ইন্দ্রর ঘর। ওখানেই শোয়।

পার্বতিয়া এসে যেই শুনলো রাতের ভাত রুটি ডাল তরকারি কিছু পড়ে নেই, চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

গুরুদাসের তখন ভয়, ওর চিৎকার শুনে ঘরের ভিতর থেকে প্রিজনারটা না কথা বলে ওঠে। কিংবা হয়তো দরজায় টোকা দিয়ে বসলো।

পার্বতিয়া রাগ করে চা খেল না। বাসনকোসন মেজে দিয়ে চলে গেল। গজগজ করতে করতে বলে গেল, বাচ্চা ভুখা মরবে, আর ও কি না চা খাবে।

আসলে ঐ বাড়তি পাওনা এখন ওর দাবি হয়ে গেছে। উদ্বৃত্ত খাবার ফেলে দেয়ার বদলে ওঁরা নিজেরাই ওকে দেবার কথা ভেবেছিলেন। ভাবতেন দয়া করে দিচ্ছেন।

না, ওটা দয়া নয়। এক ধরনের ঘুষ। খুশি রাখার চেষ্টা। এখানে বাসন মাজার লোক পাওয়া খুব কঠিন। মেয়েরা সবাই তো রেজার কাজ করে। কেউ বা অন্য কিছু। কিন্তু বাসন মাজতে রাজি নয়। ওঁর স্টেশনের খালাসিরা সব কাজ করে দেবে, কিন্তু এঁটো বাসনে হাত দেবে না, মেয়েদের কাপড় কাচবে না।

এ এক অদ্ভুত গোলকধাঁধা। একজন আরেকজনের কাছে অস্পৃশ্য। চারুবালার কাছে সাহেবরাও। খালাসিদের কাছে আমরা। একটা ঘৃণার বৃত্তে সমস্ত মানুষ ঘুরছে। তোমাকে কেউ যদি ঘৃণা করে, তুমি আরেকজনকে ঘৃণা করো।

সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ড দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিল, ড্যাম্ ফ্যাসিস্টস।

জার্মান-ইটালিয়ানরাও হয়তো ইংরেজদের আমেরিকানদের ঐ রকমই কিছু বলে।

আগেকার দিনেও বোধহয় এমনিই ছিল। শত্রু হলেই তাকে অসুর বলতো, রাক্ষস বলতো। গায়ে একটা ছাপ মেরে দাও, ব্যস, লোকটাকে আর মানুষ মনে হবে না।

নীপা আর ইন্দ্র কি যেন আলোচনা করছিল, পার্বতিয়া রেগে চলে যাবার পর।

নীপা বললে, যুদ্ধ তো একটা যন্ত্র, তার মধ্যে পড়ে গেলে মানুষও যন্ত্র হয়ে যায়।

ইন্দ্র বললে, সমাজ, কিংবা রাষ্ট্র, সেও তো যন্ত্র। এই বিদেশী শাসন।

নীপা বলেছিল, ঠিকই তো। আমরা কি ঐ প্রিজনারটাকে ভয় পাচ্ছি, না বিদেশী শাসনকে ? একটা মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সাহসও আমাদের নেই।

ইন্দ্র হেসে বললে, বীরত্ব মানে কি জানিস, নিজের দেশের লোকের হাতে গুলি খেয়ে মরার ভয়ে অন্য দেশের লোককে গুলি করে মারা।

কথাগুলো গুরুদাস শুনছিলেন, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। এরা এমন সব কথা বলে যা গুরুদাস কোনদিন ভাবেননি।

ঠিক তখনই কোণের ঘরের দরজায় টোকা পড়লো।

—খুলবো ? ইন্দ্র জিজ্ঞেস করলো। বললে, রাত্রেই যে পালায়নি, সে কি এখন আর পালাবে।

নীপা হেসে বললে, এক কাপ চা দেবো ওকে ? চারুবালার দিকে তাকিয়ে বললে, দেবো

মা ?

চারুবালা কোন উত্তরই দিলেন না।

তালা খুলে কপাট ঠেলতেই লোকটা সৌজন্যের হাসি হাসলো—বুয়েনো সেরা, বুয়েনো সেরা, বুয়েনো সেরা।

একবার করে এক একজনের দিকে তাকায় আর হাসতে হাসতে বলছে, বুয়েনো সেরা।

লোকটা জানেও না ঘুমন্ত অবস্থায় ওকে সকলেই ওরা দেখে গেছে।

ও নমস্কার করার চেষ্টা করলো। নিষ্পাপ সরল কৃতজ্ঞতার হাসি।

নীপা হেসে উঠে বললে, ওরকম নয়। ওরকম নয়। এই দ্যাখো। বলে নমস্কারের ভঙ্গিটা দেখালো। লোকটা ওকে অনুকরণ করার চেষ্টা করলো। হাসতে হাসতে বললে, গ্রাৎজি।

নীপা হেসে বললে, যা খুশি তুমি বলে যাও খোকা, আমরা কিছুই বুঝছি না।

লোকটা কিছু মনে করতে পারে, তাই ইন্দ্র হাসি চাপলো।

নীপা বললে, কি সাহেব চা খাবে নাকি।

লোকটা কিছুই বুঝলো না। শুধু চোখে মুখে কেমন একটা কৃতজ্ঞতা এনে গুরুদাসের হাতটা মুঠো করে ধরলে। ইন্দ্রর হাত।

তারপর চারুবালার দিকেও এগিয়ে যাচ্ছিল হয়তো। চারুবালা চমকে উঠে অস্বস্তিতে পিছিয়ে গেলেন।—নীপা সরে আয়।

লোকটা বোকার মত তাকালো। বোধহয় বুঝলো কিছু। আর নীপা ফিসফিস করে বললে, একেবারে রাজপুত্তুর, না রে দাদা ? মা দ্যাখো, কি সুন্দর দেখতে, রাত্রে অতটা বোঝা যায়নি। একেবারে ছেলেমানুষ।

চারুবালা বলে উঠলেন, দুধের ছেলে। কোন দেশ, ওরা কি মানুষ রে, এই বয়েসের ছেলেকে যুদ্ধে পাঠায়।

ইন্দ্র হাসছিল। ছেলেমানুষ, দুধের ছেলে ! অথচ ওরই সমবয়সী বোধহয়। মুখখানা সরল নিষ্পাপ শিশুর মত।

—বাবা, তুমি ঠিকই বলতে। দেবশিশু।

কথাগুলো গুরুদাসকে ভিতরে ভিতরে পীড়ন করছিল। এসব তো মায়া-মমতার কথা। ওঁর সামনে এখন প্রচণ্ড বিপদ। বাঁচতে হবে। এ যেন ঠিক ঐ রণক্ষেত্রের মতোই। জীবনটাও হয়তো তাই। নিজেকে বাঁচাতে হলে ওর বাঁচা চলবে না। ওকে বাঁচাতে গেলে নিজে বাঁচা যাবে না। যেন একদল সোলজার বেয়নেট উঁচিয়ে ট্রেঞ্চ দখল করতে চলেছে। তুমি থেমে পড়লে, ফিরে দাঁড়াতে গেলে, পিছনের লোকই তোমাকে গুলি করে মারবে। সামনের শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মারতে পারলেই তুমি বাঁচবে। না মারতে পারলে তুমিই শেষ হয়ে যাবে।

দেবশিশু। নিজেই বলেছেন একসময়। এখন আর শুনতেও ভাল লাগছে না।

ভিতরে ভিতরে অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন ঐসব কথা মনে পড়তেই। কই, কেউই তো আসছে না, খোঁজ করছে না। মেজর হুইটলি কিংবা ক্যাপ্টেন বেল-এর দেখা নেই।

বকশিও কখন এসে ওঁর অফিস ঘরের কাগজপত্র ছড়ানো প্রকাণ্ড টেবিলের একপ্রান্তে বসেছে। উনি বোধহয় অন্যমনস্ক ছিলেন।

নিজের মনেই বলে উঠলেন, কি যে করা যায় !

বকশি হেসে উঠে বললে, কি এত ভাবছেন গুরুদাসদা ? মেয়ের বিয়ে ?

রতনমণিও হেসে উঠল টরে টক্কা থামিয়ে।

গুরুদাস অস্বস্তিতে বললেন, কিছু না, কিছু না।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বিমর্ষ মুখ নিয়ে আবার স্টেশনে ফিরে এলেন গুরুদাস। যতই দেরী হয়ে যাচ্ছে চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। কি দুর্ভাবনা। শুধু নিজের কথা ভাবছেন না। ইন্দ্র নীপা চারুবালা, একটা গোটা সংসার। কাল বিকেলেও কত সুখী ওঁরা। গুরুদাসের ওপরই তো সংসারটা নির্ভর করে আছে।

যত দেরী হচ্ছে ততই অপরাধ বাড়ছে। বিশ্বাস করানো কঠিন হবে।

মুখে হাল্কা ভাব আনার চেষ্টা করে গুরুদাস পি ও ডবলু ক্যাম্পের সামনে দিয়ে যে মেটাল রোড চলে গেছে ব্রিটিশ ক্যান্টনমেন্টের দিকে, সেদিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, আচ্ছা বকশি, আমরাও তো মিলিটারি····

বকশি নিজের খাকি ইউনিফর্মের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো।—আলবৎ মিলিটারি।

গুরুদাস বললেন, আমরা যদি, মানে আমি, যদি ঐ ব্রিটিশ ক্যাম্পের ওদিকে যাই···

কথা শেষ করার আগেই বকশি বললে, তা হলে জেনে রাখুন এস এমের পোস্ট খালি হয়ে যাবে। বলে হাসল। বললে, আর্মড গার্ড সারা এলাকায়, চেঁচিয়ে কি বলবে আপনি বুঝতেও পারবেন না, তোৎলামি করবেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা বুলেট এসে···

বকশি হো হো করে হেসে উঠল।—যাওয়ার দরকার কি গুরুদাসদা। ও শালাদের কোন বিশ্বাস আছে।

বকশি আরো কি বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তারবাবু রতনমণি বলে উঠলেন, পাঁচটা আটাশ, মিলিটারি স্পেশাল।

গুরুদাস নিশ্চিন্ত হলেন। যাক, তা হলে ঐ সময়ে অন্তত মেজর হুইটলি তার সোনালী গোঁফ নাচাতে নাচাতে এসে হাজির হবে। ক্যাপ্টেন বেলও।

কিন্তু গুরুদাস অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। ক্রমশ দেরী হয়ে যাচ্ছে। যত দেরী হচ্ছে ততই দুশ্চিন্তা।

আর ওরাই বা সমস্ত ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছে কেন। রাত্রে না হোক, সকালেই তো ওদের এসে পড়ার কথা। বাড়ি বাড়ি সার্চ না করুক, ওঁদের তো এসে জিজ্ঞেস করবে, কোন প্রিজনারকে পালাতে দেখেছে কিনা। কিংবা বলবে, যদি দেখতে পাও, সঙ্গে সঙ্গে যেন ক্যাম্পে খবর দিও।

দেখেশুনে মনে হচ্ছে ওদের কোন চেষ্টাই নেই তাকে ধরার। আসলে একজনও প্রিজনার পালিয়েছে এই খবরটা হয়তো জানাতে চায় না। হয়তো গোপন রাখতে চায়। এত পাহারা, এত টহলদারি সত্ত্বেও কেউ পালিয়েছে, সেটা বোধহয় ওদের কাছে চরম অপমান। কিংবা নেটিভ ইণ্ডিয়ানদের কাছে সে-কথা বলতেও লজ্জা।

কিন্তু গুরুদাস কোন রকমে খবরটা ওদের জানিয়ে দিতে পারলেই ওঁর বুকের ওপর থেকে ভারি পাথরটা সরে যেতো।

এ এক অসহ্য কষ্ট।

চাপা দুর্ভাবনার ফলে ওঁর কাছে সবই বিরক্তিকর লাগছিল।

ব্যানার্জিবাবু তারস্বরে টেলিফোন করছেন সোনডিমরা স্টেশনে। চিৎকার করে না বললে শুনতে পায় না। এ এস এম যখন কেবিনম্যানকে নির্দেশ দেয়, তখনও এমনি চিৎকার করে বলতে হয়। দিনরাত ট্রেনের আওয়াজ, গুডস ট্রেনের শান্টিংয়ের ঠং ঠঙা ঠং, ইঞ্জিনের হুইসল, কিংবা প্যাসেঞ্জারদের হট্টগোলে সব চাপা পড়ে যায়। সবই জানেন গুরুদাস, তবু ব্যানার্জিবাবুর চিৎকারে বিরক্ত হচ্ছিলেন।

মায়েল গোলারোড সোনডিমরা বারলাঙ্গা মুরী।

রতনমণি বললেন, মুরী ছেড়েছে।

ব্যানার্জিবাবু তখনো চিৎকার করে চলেছেন।

একদিন ক্যাপ্টেন বেল-এর সামনেই এভাবে তারস্বরে ফোন করছিলেন গুরুদাস।

ক্যাপ্টেন বেল ঠাট্টা করে বলেছিল, ইউ নীড নো গ্যাজেটস, যা চিৎকার করছো এমনিতেই শুনতে পাবে।

খুব লজ্জা পেয়েছিলেন গুরুদাস। ওরা কি বুঝবে কতখানি হট্টগোলের মধ্যে কাজ করতে হয়। হট্টগোল এখানে না থাকলেও ও প্রান্তে আছে।

অপেক্ষা করতে করতে কখন পাঁচটা বেজে গেছে। পাঁচটা আঠাশে মিলিটারি স্পেশাল। অথচ বেল বা হুইটলির দেখা নেই।

রতনমণি টরে টক্কা টরে টক্কা করতে করতে বললে, মায়েল ছাড়লো।

আর মাত্র কয়েক মিনিট।

গুরুদাস দেখলেন চার চারটে অতিকায় মিলিটারি ট্রাক সেই পি ও ডবলু ক্যাম্পের খাঁচার দরজা পার হয়ে মেটাল রোড ধরে প্রচণ্ড স্পীডে আসছে, স্টেশনের দিকেই।

গুরুদাসের ভিতরটা দুরুদুরু করে উঠল। হঠাৎ ভাবলেন, আচ্ছা, বকশিকে রতনমণিকে ব্যাপারটা বলে রাখলেই কি ভাল হতো? যদি মেজর হুইটলি তার সোনালী গোঁফ নাচিয়ে প্রশ্ন করে বসে, সিক্রেট রেখেছো কেন ব্যাপারটা? হয়তো বকশিকে জিজ্ঞেস করে বসলো, তুমি দেখেছো? বকশি তো আকাশ থেকে পড়বে। আর তখন গুরুদাসকে জেরা করবে, ওদের বলোনি কেন? ক্যাম্পে খবর পাঠাওনি কেন?

ভিতরে ভিতরে ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেলেন গুরুদাস।

আমার যা হয় হোক, আমার বোকামির জন্যে ছেলেমেয়েকেও বিপদে পড়তে হবে না তো! স্ত্রীকে?

গুরুদাসের হঠাৎ মনে হল উনি ভীত সন্ত্রস্ত মুখে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। একটা ফায়ারিং স্কোয়াড যেন গোল হয়ে ঘিরে রাইফেল উঁচিয়ে প্রস্তুত। এখনই কেউ চিৎকার করে অর্ডার দেবে, ফায়ার।

—আচ্ছা বকশি, মিলিটারির আইনে বোধহয় ক্ষমা বলে কিছু নেই, তাই না?

বকশি ওঁর কথাটার প্রসঙ্গ খুঁজে পেল না। হেসে বললে, হঠাৎ এ কথা কেন?

—না, এমনি বলছি। গুরুদাস হাসার চেষ্টা করলেন।

বকশি হয়তো আরো কিছু বলতো, তার আগেই পানিপাঁড়ে বিরজু দরজার সামনে এসে বললে, দেখিয়ে মাস্টারসাব, দেখিয়ে।

গুরুদাস তার আগেই লক্ষ্য করেছেন।

চারখানা ট্রাক এসে থেমেছে। দূরে আরো কয়েকটা আসছে।

ততক্ষণে দুটো ট্রাক থেকে রাইফেল হাতে সৈন্যের একটা দল নেমে পড়েই দৌড়তে দৌড়তে প্লাটফর্মে এল। যেখানে ট্রেন দাঁড়াবে সেখানে তিন চার গজ অন্তর দাঁড়িয়ে পড়লো। আর ওদিকে লাইনের ওপাশে আরেক দল টমি। তারাও রাইফেল হাতে তিন চার গজ অন্তর দাঁড়িয়ে গেল। যেন পুরো ট্রেনটাকে দুদিক থেকে পাহারা দেবে।

কি ব্যাপার। মিলিটারি স্পেশালে কারা আছে? খুব উঁচুদরের অফিসাররা কি! কর্নেল, জেনারেল, ফীল্ড মার্শাল—এরাও কখনো কখনো রাঁচির ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের হেড কোয়ার্টারে যায়। কিন্তু সে তো প্লেনে। এখানে এলেও ক্যাম্পের ওদিকে ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডে নামে। কেউ দেখতেই পায় না। অনেক পরে কানাঘুষো শোনে, এসেছিল।

গুরুদাস চেয়ার ছেড়ে প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন। ওঁর চোখ তখন মেটাল রোডটার দিকে। মেজর হুইটলির জীপটা কখন আসে। উদগ্রীব হয়ে মনে মনে ইংরেজিতে কথাগুলো সাজিয়ে নিচ্ছিলেন। কি বলবেন। মেজর, আই হ্যাভ কেপট এ প্রিজনার আণ্ডার লক অ্যাণ্ড কী।

ওদিকে ভজনলাল ঘণ্টি বাজিয়ে দিয়েছে, উঁকি মেরে দেখলেন সিগন্যাল পড়ে গেছে, দূরে ইঞ্জিনের মাথায় কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী। এসে পড়লো বলে।

আর ঠিক তখনই, একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলেন, ওদিকে আরো কয়েকটা ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে, তা থেকে ইটালিয়ান ইউনিফর্ম পরা এক দল যুদ্ধবন্দী নামলো। জনা পঞ্চাশ হবে। নিরস্ত্র অথচ ইউনিফর্ম পরা প্রিজনাররা সারি দিয়ে হেঁটে এল, তাদের দু'পাশে রাইফেল হাতে আর্মড গার্ডের সারি।

প্লাটফর্মে উঠে এল ওরা। আর তখনই মিলিটারি স্পেশাল ট্রেনটা এসে থামলো।

গুরুদাস দেখলেন একেবারে ফাঁকা ট্রেন।

চটপট সেই প্রিজনারদের কামরায় কামরায় তুলে দিল ওরা। তারপর চারজন চারজন করে টমি রাইফেল নিয়ে এক এক কামরায় উঠে পড়লো। দু'দিকের দরজা আটকে দাঁড়ালো তারা।

আর একজন অফিসার, হ্যাঁ কাঁধে তিনটে স্টার, ক্যাপ্টেনই। সে কি অর্ডার দিতেই লাইনের দু'পাশে যারা পাহারা দিচ্ছিল, মার্চ করে ফিরে গেল। ট্রাকগুলোর দিকে।

গার্ড সবুজ পতাকা নাড়ছে।

গুরুদাসের চোখ তখন চর্তুদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে কোথাও মেজর হুইটলি, কিংবা ক্যাপ্টেন বেল, কিংবা চেনা কোন মিলিটারি অফিসার এসেছে কি না।

হঠাৎ দেখতে পেলেন প্রায় বিদ্যুৎগতিতে একটা জীপ এসে থামলো।

আর তা থেকে নেমেই মেজর হুইটলি এবং ক্যাপ্টেন বেল ছুটতে ছুটতে আসছে। নিশ্চিন্ত হলেন গুরুদাস।

ট্রেনটা চলে গেলেই বলবেন ওদের।

কিংবা ওরাই হয়তো এসে প্রশ্ন করবে। বলবে চতুর্দিকে একটু চোখ রাখতে। যদি কোন প্রিজনার…

কিন্তু এই জন পঞ্চাশ মাত্র ইটালিয়ান প্রিজনারকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এখন? কেন নিয়ে যাচ্ছে? তা অবশ্য জানতে পারবেন না। জিজ্ঞেস করলেই বলবে, ইণ্ডিয়ান কিউরিওসিটি। হেসে উঠবে। কিংবা ধমক দিয়ে বলবে, দ্যাটস নান অফ ইয়োর বীজনেস।

গুরুদাস শুধু জানেন, ট্রেনটা বরকাকানা অবধি যাবে। আর সেখানে পৌঁছনোর কিছুক্ষণ আগে তাকে জানানো হবে ইঞ্জিনের মুখ কোনদিকে ঘুরবে। আরিগাড়া রাঁচি রোড, কার্মাহাটের দিকে যাবে, নাকি ভুরকুণ্ডা পাতরাতু টোরি বারোয়াড়ি হয়ে ডাল্টনগঞ্জ ডেরি-অন-শোনের দিকে। কিন্তু শেষ অবধি কোথায় যাবে কেউ জানে না।

গুরুদাস হুইটলি আর বেলকে আসতে দেখেই ভাবলেন ঐ অচেনা ক্যাপ্টেনকে কিছু নির্দেশ দিতে এসেছে। তাই দু'পা এগিয়ে একটু অপেক্ষা করলেন। 'মেজর, লাস্ট নাইট এ প্রিজনার জাম্পড ইনটু মাই কোর্টইয়ার্ড….

গুরুদাস হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন। উনি ভাবতেই পারেননি। হুইটলি হাত নেড়ে গার্ডকে ট্রেন ছেড়ে দেয়ার ইশারা করলো।

গার্ডের হুইসল বেজে উঠল। গুরুদাস ঘড়িটা দেখলেন। আশ্চর্য, এদের সব কিছুই ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে। একেবারে অঙ্কের মত।

কিন্তু ট্রেন নড়ে উঠতেই হুইটলি আর বেল গুরুদাসকে অবাক করে দিয়ে প্রথম ফার্স্ট ক্লাশ কামরাটাতে উঠে পড়লো। গুরুদাস এতক্ষণে বুঝলেন ঐ কম্পার্টমেণ্ট কেন খালি ছিল।

ট্রেন তখন ধীরে ধীরে স্পীড নিচ্ছে।

নিজের অগোচরেই গুরুদাসও কিছুটা এগিয়ে গিয়েছিলেন, দ্রুত পায়ে। তারপর থেমে

পড়লেন। নির্বোধের মত দাঁড়িয়ে রইলেন। একটা প্রকাণ্ড সুযোগ যেন এইমাত্র হাতছাড়া হয়ে গেল।

গুরুদাস তখন একেবারে বিভ্রান্ত, অসহায়। উদ্বেগে ভেঙে পড়া একটা বিমূঢ় মানুষ!

৬

এ পথে ডাইনিং কার আসে না। মুরীতে কেটে দেওয়া হয়। ওখানে একটা বড় রিফ্রেশমেণ্ট রুমও আছে। খাওয়াদাওয়া করে নিয়ে ন্যারো গেজ লাইনের ছোট ট্রেনে পাহাড় কেটে কেটে রাঁচি যেতে হয়। নাম রাঁচি এক্সপ্রেস, কিন্তু মুরী হয়ে রামগড় হয়ে চলে যায় বরকাকানা অবধি।

এদিকে তাই ডাইনিং কারের লোকজনরা আসে না। আসে শুধু দু-একজন ভেণ্ডার, রেল কোম্পানির ছাপ মারা সোডা লেমনেড জিঞ্জার বিক্রি করতে। তাদেরই একজনের হাতে রিফ্রেশমেণ্ট রুমের ম্যানেজার বন্ধু রতনমণির জন্যে তাড়া তাড়া পান কিনে পাঠান। অন্য টুকিটাকি কিছু প্রয়োজন হলে ভেণ্ডারদের বলে দিলেই চলে। কিংবা তারবাবু রতনমণি টেলিগ্রাফ যন্ত্রে মুরীকে জানান, তার কাছ থেকে মৌখিক মেসেজ চলে যায় রিফ্রেশমেণ্ট রুমের ম্যানেজারের কাছে। সকলেই পরস্পরের চেনাজানা, কেউ কেউ ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেছে।

নীপা সকালে চা তৈরি করতে করতে বললে, মা ছাঁকনি কিনে পাঠানোর কথা বলবে না?

এখন ওসব কথা চারুবালার মাথায় নেই। এখন ঘরের মধ্যে একটা দুশমন ওঁদের সকলকে ভাবিয়ে তুলেছে।

নীপা ইন্দ্রকে বললে, ট্রেন এলে একবার গিয়ে ভেণ্ডারকে বলে আসিস।

নীপা এখানে না থাকলে এসব দিকে মা'র চোখ পড়ে না। তারের ছাঁকনিটার জাল ছিঁড়ে গেছে, মা তার ওপর এক টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে কাজ চালাচ্ছিল। ন্যাকড়াটাও লিকার লেগে লেগে লাল হয়ে গিয়েছিল। নীপা সেটা ফেলে দিয়ে এক টুকরো পরিষ্কার কাপড় নিয়ে এল।

ইন্দ্র ঠাট্টা করে বললে, বুঝেছি, ইটালিয়ান সাহেবের খাতিরে।

নীপা হাসলো।

কিন্তু ওর খুব খারাপ লাগছিল লোকটার কথা ভেবে। ওরা তাকে তালা-চাবি বন্ধ করে রেখেছিল সারারাত, মিলিটারির হাতে ধরিয়ে দেবে বলেই। অথচ প্রিজনারটা সে-কথা একেবারেই সন্দেহ করেনি।

গ্রাৎজি কথাটা বোধহয় ধন্যবাদ ধরনের কিছু। কিন্তু বুয়েনো সেরা বুয়েনো সেরা করলো সকলকে। গুড মর্নিংয়ের মত কিছু কিনা কে জানে।

কিন্তু চোখেমুখে কি কৃতজ্ঞতা। যেন ওকে লুকিয়ে রাখার জন্যেই তালাচাবি দিয়ে রাখা হয়েছিল। ও যেন সেকথাই ভেবেছে।

যার সর্বনাশ করতে চাইছি, সে যদি ভেবে বসে আমি তার হিতাকাঙ্ক্ষী, তার উপকার করতে চাইছি, আর তার জন্যে যদি কৃতজ্ঞতা জানায়, তখন নিজের কাছেই নিজেকে ছোট হয়ে যেতে হয়।

নীপার দুঃখ হচ্ছিল, নিজের ওপর নিজেই বিরক্ত হচ্ছিল। আমরা তো ঐ অসহায় মানুষটার সঙ্গে প্রবঞ্চনা করছি। নিজেদের বাঁচাবার জন্যে। অথচ উপায়ও নেই। বাবাকে

বিপদ থেকে বাঁচতে হবে।

লোকটা নিজেই পালিয়ে গেলে নীপা নিশ্চিন্ত হতো। নিজেদের নিরপরাধ মনে হতো। তার পর ধরা পড়লে বা গুলি খেয়ে মরলে জানতেই পারতো না। জানলেও ততখানি আফসোস হতো না।

আর তো কিছুক্ষণ। বাবা গিয়েই ওদের খবর দিয়ে দেবে।

নীপা সেজন্যেই হাসতে হাসতে ইন্দ্রকে বললে, যতক্ষণ অতিথি ততক্ষণ আপ্যায়ন। বুঝলি দাদা, বলির পাঁঠাকে খাইয়ে দাইয়ে রাখে, আদর করে স্নান করায়। আমরাও তো তাই করছি।

নীপার ঠোঁটের কোনায় দুঃখের হাসিটা মিলিয়ে গেল।

পার্বতিয়া চলে যাওয়ার পর আরেক ঝামেলা পানিপাঁড়ে বিরজু। যে লোকগুলো না এলে চোখে অন্ধকার দেখেন, এখন তারাই অসহ্য ঠেকছে চারুবালার কাছে। শিলনোড়া নিয়ে মশলা বাটছে বিরজু। ওকে তাড়াতাড়ি বিদেয় করার জন্যে নামমাত্র মশলা দিয়েছেন। ও চলে গেলে নিজেই বেটে নেবেন। ওকে এখন তাড়াতে পারলেই বাঁচেন।

বিরজু জিজ্ঞেস করলো, মাঈজী আউর কুছ কাম আছে?

—না, তুই যা।

খালাসীদের জন্যে একজোড়া কাপডিস রাখা আছে। ওরা কোন কোনদিন কিছু কাজ করে দিলে চারুবালা ডেকে চা দেন।

সেই কাপ ডিসেই চা নিয়ে নীপা দিতে গেল লোকটাকে। আরেক হাতে দু'পীস পাঁউরুটি। সেঁকে নিয়ে নীপা সকলের অলক্ষ্যে একটু মাখনও লাগিয়ে দিয়েছে। আর সেজন্যে ওর হাসিও পাচ্ছিল।

দরজা ঠেলে ঢুকতেই লোকটা যেন সম্মান জানানোর কায়দায় উঠে দাঁড়ালো।

তারপর নীপার হাতের চা টোস্ট দেখেই নীপার মুখের দিকে তাকালো। হাসলো। আবার বললে, গ্রাৎজি।

নীপা ওগুলো মেঝেতে নামিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বললে, গ্রাৎজি রিৎসি ওসব বুঝি না।

লোকটা দুটো ইটালিয়ান শব্দ ওর মুখের উচ্চারণ শুনেও বোধহয় বুঝতে পারলো।

হাসতে হাসতে ঘাড় নেড়ে জানালো, না।

পাঁউরুটি তুলে দেখিয়ে বললে, পানা।

নীপা হেসে ফেললে। এখন বুঝতে পারছে, রাত্রে ভাত দেখে বলেছিল রিৎসি। আর রুটি হল পানা। সেটাই বোঝাতে চাইছে।

ইন্দ্র পাশেই দাঁড়িয়ে। নীপা হেসে বললে, পানা না কচুরিপানা তুমিই জানো, এখন লক্ষ্মী ছেলের মত খেয়ে নাও। তোমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে।

লোকটা ভুরু কুঁচকে কি যেন খুঁজছিল। কি যেন মনে করার চেষ্টা।

মনে পড়ে যেতেই দুম করে বললে, নাইস, ইউ নাইস। সরিসো।

নীপা লজ্জা পেয়ে অস্বস্তিতে চোখ নামিয়ে নিল। শেষ কথাটা বুঝলোও না।

লোকটা ওর লজ্জা দেখেই হেসে উঠল কিনা কে জানে। নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বললে, আই রোবের্তো। রোবের্তো পিয়েরোনি।

তারপর একবার নীপার, একবার ইন্দ্রর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ইউ?

—নাম জিজ্ঞেস করছে রে দাদা, বলিস না। ইন্দ্রকে নীপা সাবধান করে দিল, তারপর কৌতুকের স্বরে বললে, আমাদের নাম জেনে তোমার কি হবে সাহেব?

রোবের্তো কথা তো বুঝছে না, শুধু নীপার হাসি দেখে নিজেও হাসলো।

টোস্ট চিবোতে চিবোতে রোবের্তো চায়ের কাপে চুমুক দিল। এমন মুখ করলো যেন বিস্বাদ ঠেকেছে।

মাথা নেড়ে বোঝালো, ভাল না।

নীপা অখুশি আহত মুখে ঠাট্টার স্বরে বললে, চাঁদু! পেয়েছিস এই বেশি।

রোবের্তো চায়ের কাপটার দিকে আঙুল দেখিয়ে চোখে প্রশ্ন এনে বললে, কাপি?

—ওরে কফি ভেবেছে। চা চেনে না। নীপা হেসে উঠল কৌতুকে। বললে, চা খেয়েছিস কখনো হনুমান?

ইন্দ্র বেরিয়ে এসে দরজার বাইরে মাকে দেখে বললে, এতক্ষণ সুন্দর সুন্দর বলে এসে, দ্যাখো তোমার মেয়ের কাণ্ড, বলছে হনুমান।

চারুবালাও হাসলেন। সরে এলেন।

নীপা অসন্তোষ মুখে তাকালো, হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা ফেরত নিতে চাইলো।

ওর চোখের দৃষ্টি, কোঁচকানো ভুরু, চিবুকের বিরক্তি দেখে রোবের্তো বোধহয় অনুমান করলো, অন্যায় হয়েছে।

মাথা নেড়ে জানালো ফেরত দেবে না। মৃদু হেসে চুমুক দিয়ে দিয়ে চা-টা নিঃশেষ করলো।

কাপটা নামিয়ে রেখে কপাটের ওদিকে চারুবালাকে দেখতে পেয়ে দু'পা এগিয়ে আবার সেই নমস্কার। বললে, অনোরাতা। অনোরাতা।

—কি বলছে রে? চারুবালা প্রশ্ন করলেন।

ইন্দ্র নিজেও বোঝেনি। জিজ্ঞেস করলো, হোয়াট ইজ অনোরাতা।

রোবের্তো বোকার মত হাসলে শুধু।

ইন্দ্র আর নীপা যেই বেরিয়ে আসার জন্যে ফিরে দাঁড়ালো, রোবের্তো এসে কপাটে হাত দিয়ে বললে, পোর্তা।

বলে নিজেই ইশারায় বন্ধ করতে বললে।

দরজায় আবার তালা লাগালেও ইন্দ্র আর নীপা দুজনেরই মন খারাপ হয়ে গেল। লোকটা কি বিশ্বাস করে বসে আছে। ভাবছে, আমরা ওকে লুকিয়ে রেখেছি, ওকে বাঁচাতে চাই। এ এক অসহ্য যন্ত্রণা।

ইন্দ্র অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিল। কোন কথা বলতে পারছিল না। ছেলেবেলার একটা কথা ওর মনে পড়ে গেছে।

ধীরে ধীরে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বললে, মা ইস্কুলে পড়ার সময় আমি একবার মাংস খাওয়া ছেড়েছিলাম মনে আছে?

চারুবালা ইন্দ্রর মুখের দিকে তাকালেন।—সে আব মনে থাকবে না! কি ভয় যে পেতাম। সবাই বলতো সন্নেসী হয়ে যাবে ছেলে। কত চেষ্টা করে আবার মাংস ধরিয়েছিলাম।

ইন্দ্র একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো।—তোমাদের কখনো বলিনি।

একটু থেমে বললে, তখন আমরা চক্রধরপুরে। তুমি মাংস কিনতে পাঠাতে। দোকানটায় খদ্দেরের সামনেই পাঁঠা কাটতো। একটার পর একটা কাটছে, আর গোটাকয়েক তার পাশেই বাঁধা আছে। ফ্যালফ্যাল করে দেখছে।

একটু চুপ করে রইলো ইন্দ্র। যেন দৃশ্যটা চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে।

—তোর পাগলামির কি আর শেষ আছে? নীপা বলে উঠল।

ইন্দ্র বললে, পাগলামি নয়। জানো মা, যেই কাটা ছাগলটা সরিয়ে নিয়ে গে'ল, দেখি কি, পিছনে দড়িতে বাঁধা আরেকটা ছাগল গলা বাড়িয়ে দিচ্ছে, নিজের থেকেই।

সঙ্গে সঙ্গে নীপা চেঁচিয়ে উঠল, আঃ দাদা, বলিস না, বলিস না। দু হাতে চোখ ঢাকলো

নীপা, যেন দৃশ্যটা ওর সামনেই ঘটছে।

চারুবালা বিশ্বাস করলেন না।—দূর তাই কখনো হয়। তোর মনে হয়েছে।

আর ইন্দ্র বললে, ঐ রোবের্তো, তোমার ছেলে গো···

ঠাট্টার স্বর হঠাৎ গাঢ় হয়ে গেল। ইন্দ্র বললে, রোবের্তো নিজেই দরজায় তালা লাগাতে বললো দেখে ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল।

সবাই চুপচাপ। কেউ কথা বললো না। ছেলেবেলার একটা তুচ্ছ ঘটনা, হঠাৎ যেন একটা বিরাট তত্ত্বকথা হয়ে ওদের অভিভূত স্তব্ধ করে দিয়েছে।

সারাটা দিন বাড়ির কাজকর্ম করেছেন চারুবালা, কিন্তু মুখ দেখে মনে হয়েছে অন্যমনস্ক।

ইন্দ্র আর নীপা প্রতি মুহূর্তেই ভেবেছে, মিলিটারি পুলিস চলে আসবে। কিংবা হুইটলি বা বেল। ওদের দূর থেকে দেখেছে, চেনে। বেল-এর ফেল্ট হ্যাটে স্টার, কাঁধের স্ট্র্যাপেও তিনটে করে। হুইটলির একটা ক্ষুদে মুকুট, আর মজার দেখতে সোনালী গোঁফ।

এক একবার নীপা জানালায় উঁকি দিয়ে গেছে। বাইরে একটু কিছু শব্দ হলেই।

ইতিমধ্যে বাথরুম থেকে ঘুরে এসেছে রোবের্তো। স্নানও করেছে, কিন্তু সেই ডোরাকাটা পাজামা আর হিন্দুস্থানী ফতুয়া।

দুপুরে খেতে এসে গুরুদাস বলে গেছেন, না না, জামাকাপড় দেওয়া যাবে না। পোশাক দেওয়া মানেই আশ্রয় দেওয়া।

চারুবালা বললেন, জমাদারকে দেখলে একবার ডাকিস যেন। অর্থাৎ সব ধোয়ামোছা করতে হবে।

ইন্দ্র মাকে ঠিক বুঝতে পারে না।

মা কত যত্ন করে রোবের্তোকে খেতে দিল। ভাত তরকারি মাছের ঝোল।

কিন্তু সেই পার্বতিয়ার বাসনে। তাতে অবশ্য ইন্দ্রর আপত্তি নেই। কিন্তু অস্পৃশ্য লোকটা ব্যবহার করেছে বলে বাথরুমও ধোয়ামোছা করতে হবে।

ঘৃণা, ঘৃণা, ঘৃণা। মানুষ কত রকমের ঘৃণা জানে। এই উদ্বেগ অশান্তির মধ্যেও মা ভুলতে পারছে না। মার চোখে ওঁরাও মুণ্ডা আর সাহেব একই।

ইন্দ্র বলেছিল, বাঙালীই তো সবচেয়ে নোংরা জাত মা, সাঁওতালরাও অনেক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাঙালীর ঘরে কোন রুচি নেই, নিজের দরজায় নিজেই নোংরা ফেলে।

চারুবালা শুধু হেসেছেন ওর কথায়।

ইন্দ্রর মনে হয়েছে মানুষের চরিত্রের মধ্যেই হয়তো একটা সঙ্কীর্ণতা আছে। গুটিয়ে আনতে আনতে ছোট ছোট দল বা গোষ্ঠী করে ফেলে। ভাবে তারাই শ্রেষ্ঠ। তাদের দেশ, তাদের ভাষা, তাদের ধর্ম সবই যেন উৎকৃষ্ট। কাউকে রীতিনীতির পার্থক্যের জন্যে ঘৃণা করে, কারো অন্যরকম আচারবিচার দেখলে। সংখ্যায় বেশি হলেই আর টাকার জোর থাকলে তারাই বড়। কিংবা রাষ্ট্রশক্তি হাতে থাকলে। যেমন সাহেবরা নেটিভদের ঘৃণা করে।

এই সব একদিন অনুপম বলেছিল। বলেছিল, আমরা একদিকে মানুষকে ভালবাসি, আরেকদিকে তাকেই ঘৃণা করি।

চারুবালাকে দেখেও তাই মনে হয়।

দুপুরে নিজেই রোবের্তোর ভাতের থালা নিয়ে গিয়ে দিয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে দেখেছেন।

রোবের্তো মাছের টুকরোটা নিয়ে কাঁটা ছাড়াতে গিয়ে তখন হিমসিম খাচ্ছে।

চারুবালা হেসে ফেলে বলেছেন, ছেলের কাণ্ড দ্যাখো।

ঐ সব কথা মনে পড়ছে বলেই নীপার খারাপ লাগছে। দুপুরটাও কেটে গেল দেখে

নীপার মনেও অনেকখানি শান্তি এসেছিল। কিন্তু আর কতক্ষণ।

—জমাদারকে দেখতে পেলে একবার ডাকিস।

যে-কেউ বাড়িতে এসে পড়তে পারে এই আতঙ্কে সকলেই তটস্থ হয়ে আছে। পার্বতিয়া আর বিরজুকে তাড়াতাড়ি চলে যেতে বলেছে মা। অথচ…

কিন্তু রোবের্তোকে মিলিটারির হাতে তুলে দেওয়ার পর সেও তো ঘৃণা করবে আমাদের। নীপা ভাবলো।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যানার্জিবাবুর ঘটনাটা মনে পড়ে গেল।

অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান গার্ড হিল্ সাহেব একবার ব্যানার্জিবাবুকে কানে পৈতে জড়িয়ে ইউরিনালে যেতে দেখে কি একটা বিচ্ছিরি রসিকতা করেছিল, উমার কাছে শুনেছে। তারপর সে কি ঘুষোঘুষি। ব্যানার্জিবাবুই মার খেয়েছিলেন। রোগা টিংটিঙে ব্যানার্জিবাবু ঐ দানবের মত লোকটার সঙ্গে পারবে কেন।

এও এক ধরনের ঘৃণা।

—সর্বনাশ হয়ে গেছে রে, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

গুরুদাসের কথায় নীপা ইন্দ্র সবাই চমকে উঠল। চারুবালার মুখেও উদ্বেগ।

—আবার কি হল ? চারুবালা বলে উঠলেন।

মিলিটারি স্পেশালটা জন পঞ্চাশেক ইটালিয়ান পি ও ডবলুকে নিয়ে চলে যাওয়ার পরই ফিরে এলেন গুরুদাস। একটা বিধ্বস্ত মানুষ।

বুশ কোটের বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, আমি আর ভাবতে পারছি না। হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, সেই কালসাপটা কোথায় ?

ওরা প্রথমটা বুঝতেই পারেনি। তাই একটু থমকে গিয়ে ইন্দ্র বললে, কালসাপ বলছো কেন, ও তো আমাদের কোন ক্ষতি করেনি।

চারুবালা ইন্দ্রর কথাটা চাপা দেবার চেষ্টা করলেন।—কি হয়েছে, আগে বলবে তো।

গুরুদাস পোশাক বদলালেন না। নীপা ওঁর লুঙি আর গেঞ্জি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল।

তা দেখে বললেন, পোশাক ছাড়বো কি রে, আবার স্টেশনে যেতে হবে না ?

তারপর ধপ করে চেয়ারটায় বসে পড়লেন।—চব্বিশ ঘণ্টা, ভাবতে পারছিস, টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স হতে চললো। অথচ এখনো ওদের খবর দিতে পারলাম না।

চেয়ারের হাতলে কনুই রেখে হাতে মাথা রাখলেন গুরুদাস। বোঝা গেল গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছেন।

একে একে সমস্ত ঘটনাটা বললেন। চোখের সামনে দিয়ে কিভাবে সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে, হুইটলি আর বেল শেষ মুহূর্তে এসেও হঠাৎ ট্রেনে উঠে পড়েছে।

—কোথায় গেল, কবে ফিরবে কিছুই জানি না। এখন আর কাকে বলা যায় তাও বুঝতে পারছি না।

একটু চুপ করে থেকে বললেন, পুলিস, পুলিসকেই বলতে হবে। কিন্তু তারাও বলবে, এত দেরীতে কেন ! তারপর হঠাৎ যেন মনে পড়েছে, বলে উঠলেন, ডাক্তার হাজরাই একমাত্র ভরসা। থানার লোকদের সঙ্গে ওঁর বেশ চেনাজানা আছে। ইন্দ্র, তুই কি বলিস ?

দেখে বোঝা গেল খুবই নার্ভাস হয়ে পড়েছেন। খুবই চিন্তিত।

ইন্দ্র ধীরে ধীরে বললে, ডাক্তার হাজরা খুবই ভাল মানুষ। কিন্তু এ ব্যাপারে কি নিজেকে জড়াতে চাইবেন ? এমন একটা রিস্কি ব্যাপার। তা ছাড়া, উনি তো বাইরের লোক, যদি বলে বসেন এসবের মধ্যে আমি নেই, আপনিই থানায় যান…

গুরুদাসকে দেখে মনে হল চোখের আড়ালে আতঙ্ক চুপ করে আছে। বললেন, ঠিকই তো, তখন আবার সব কথা বলে ফেলার জন্যে নতুন ঝামেলা না বেধে যায়। সেই ভয়েই

তো বকশিদের কাউকে বলিনি।

একটু থেমে বললেন, যে লোকগুলোকে এত বিশ্বাস করতাম, এই বিপদে পড়ে কাউকেই আর বিশ্বাস করতে পারছি না।

নীপা বিমর্ষ হাসি হাসলো বাবার দুর্ভাবনা দেখে। বললে, আর ঐ রোবের্তোকে দ্যাখো, আমাদের বিশ্বাস করে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোলো রাত্রে। এখনো ভাবছে আমরা ওকে বাঁচাবো।

—আমরাই যদি থানায় যাই, নিজেরাই গিয়ে বলি। ইন্দ্র বললে।

আর গুরুদাস বললেন, সেখানেই তো একটা মুশকিল হয়ে আছে। ইন্সপেক্টরটার সঙ্গে একবার কথা কাটাকাটি হয়েছিল। আমি অবশ্য ধরিনি, টি টি সি দুটো ডবলু টি ধরেছিল, উইদাউট টিকেট, লোকটার কেউ হয়, এসে খুব চোটপাট করছিল, আমি রেগে গিয়ে লোক দুটোকে জি আর পি-তে হ্যাণ্ডওভার করে দিয়েছিলাম।

চারুবালা বলে উঠলেন, পাগল হয়েছো, তার কাছে যায় কখনো। ও তো এখন সুযোগ পাবে, শোধ নেবে। তোমারও এমন কাণ্ড, দুটো লোক টিকিট কাটেনি, সে তো রেলের ক্ষতি, তোমার অত মাথাব্যথাই বা কেন। সব লোককে এভাবে চটিয়ে রাখো…

গুরুদাস হতাশ গলায় বলে উঠলেন, সকলকে কি করে যে খুশি রাখতে হয় তাই যে জানি না।

মনে হল গুরুদাস যেন কান্নায় ভেঙে পড়বেন।—পুলিসের কথা আমি তো ভাবিনি সেজন্যেই।

গুরুদাস স্টেশনে চলে গেলেন। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরামর্শ করে কোন সুরাহা করতে পারলেন না। এদিকে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বরকাকানা থেকে ট্রেন এসে পড়বে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন।

বাবার দুশ্চিন্তা দেখে নীপার মনেও উদ্বেগ উঁকি দিল। স্বগত উক্তির মত বললে. বাবা ঠিকই বলেছে, কালসাপ।

নীপার মনে একটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব ক্ষণেক্ষণে রঙ পাল্টাচ্ছে। রোবের্তোকে দেখলে, ওর দেবশিশুর মত সরল মুখের কৃতজ্ঞতা, ওর নির্ভরতা, বিশ্বাস দেখলে মায়া হয়। ইচ্ছে করে ওকে বাঁচাতে। পালিয়ে যাবার সুযোগ করে দিতে। কিন্তু যখনই বাবার দুশ্চিন্তা দেখছে, নিজেদের বিপদের কথা বুঝতে পারছে, তখনই নির্মম হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে।

নীপার মনে পড়লো দুপুরে খেতে বসে বাবা জিজ্ঞেস করেছিল, ওকে খেতেটেতে দিচ্ছিস তো!

চারুবালা উত্তর দিয়েছেন, ও মা, কি কথাই বলছো। একটা বাচ্চা ছেলে, আমাব ইন্দ্রর বয়সী, কোন তেপান্তর থেকে এসেছে, বাড়িতে উপোস করে থাকবে ? জেলখানায় ফাঁসির আসামীকেও তো খেতে দেয়।

নীপা বেশ টের পেয়েছে রোবের্তোর জন্যে সকলের মনের মধ্যেই একটা গোপন মমতা লুকিয়ে আছে। বাইরের ভয়ে, মানুষগুলো বদলে যাচ্ছে। আমি নিজেও।

গুরুদাস চলে গেলেন।

দুঃখের হাসি হেসে নীপা বললে, দাদা, এই যুদ্ধ একদিন তো থেমে যাবে। কে ফ্যাসিস্ট কে ইমপিরিয়েলিস্ট এসব ছেঁদো কথা কারো মনেও থাকবে না। আবার হয়তো সকলে সকলের বন্ধু হয়ে যাবে।

ইন্দ্র সায় দিল।—ঠিক,বলেছিস। তখন আর কারো পিঠে কোন ছাপ থাকবে না, সবাই মানুষ। দল হলেই মানুষ খারাপ হয়ে যায়, অথচ রোবের্তো একা, কত ভাল। ঐ ব্রিটিশ সোলজাররা, ইউনিফর্ম পরলেই অন্য মানুষ। কিন্তু একা একা…

চারুবালা শুনছিলেন। ধীরে ধীরে বললেন, তোদের কথা সব বুঝি না। ঐ ক্যাম্পে জালের ওপারে বন্দীগুলোকে দেখেও বুঝতে পারিনি। কিন্তু এই ছেলেটাকে দেখে কি মনে হচ্ছে জানিস, মানুষ মানে কারো ছেলে কিংবা মেয়ে, কারো বাবা কিংবা মা, কারো স্বামী কিংবা স্ত্রী। কিংবা কারো বন্ধু।

একটু থেমে বললেন, ঐ যে দুটো ওঁরাও মেয়েকে মিলিটারি ট্রাক চাপা দিয়ে গেল সেদিন, সারা রাত ঘুমোতে পারিনি। মানুষ বলেই তো।

নীপা অবাক হয়ে যাচ্ছিল মা'র কথা শুনে। মা এমনভাবে ভাবতে পারে, এত সুন্দর করে বলতে পারে ওর ধারণাই ছিল না। ওর বুকের মধ্যে মা'র জন্যে কেমন একটা গর্ব হল। মা যেন অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে ওর চোখে।

ইন্দ্রও হয়তো অবাক হয়েছিল। ও হেসে উঠে নাটক করার ভঙ্গিতে মাকে জড়িয়ে ধরলো।—মা, তুমি, কি বলবো, ইউ হ্যাভ এ গোল্ডেন হার্ট।

ইন্দ্রর চোখে জল এসে গেল।—তবু, তোমার কেন এত ছোঁয়াছুঁয়ির বাতিক। সাহেব অস্পৃশ্য, পার্বতিয়া অস্পৃশ্য, মানুষকে তুমি এত ছোট করো কেন? নিজে এত বড় হয়েও।

চারুবালা হাসলেন।—সে রোগ আমার যাবে না রে। তোরা তখন বলছিলি যুদ্ধ নাকি মানুষকে একটা যন্ত্র বানিয়ে দেয়। আমাদের এই সমাজটাও তাই, মানুষকে মানুষ থাকতে দেয় না। যন্ত্র বানিয়ে দেয়। আমি মুক্তি চাইলেও যে মুক্তি পেতে দেবে না।

ইন্দ্র ধীরে ধীরে বললে, মা, একদিন তোমার এই সমাজ তো বদলে যাবে, সেদিনের লোকরা আমাদের কত ছোট ভাববে। যারা সতীদাহ করতো, কন্যা বিসর্জন দিতো, অসুস্থ বুড়োদের অন্তর্জলি করতো, আশি বছরের বুড়োর সঙ্গে একশো ষাটটা মেয়ের বিয়ে দিত, তাদের আমরা তো অশিক্ষিত নীচ বর্বর ভাবি। যদিও তারা আমাদের পূর্বপুরুষ। শাস্ত্র মুখস্থ বলতে পারতো বলেই তাদের শিক্ষিত বলি না। তারা তো বর্বর।

নীপা কি ভাবছিল কে জানে। হঠাৎ বললে, দাদা, সমাজ বদলেছে বলেই তুই তাদের বর্বর বলছিস, অশিক্ষিত বলতে পারছিস। এই রোবের্তোর কথাই ভেবে দ্যাখ, ওকে যদি আমরা ধরিয়ে দিই কিংবা তাড়িয়ে দিই, আর ও গুলি খেয়ে মরে, যখন সব বদলে যাবে, যুদ্ধ থেমে যাবে, তখন অনুশোচনায় আমাদের কি খারাপ লাগবে। তখন মনে হবে একটা লোক আশ্রয় চেয়েছিল···

চারুবালা হঠাৎ বললেন, ওসব তত্ত্বকথা রাখ, কে কখন এসে পড়বে, এই বেলা ছেলেটাকে খেতে দে।

বললেন, কিন্তু নিজেও উঠলেন। নীপাও গেল মাকে সাহায্য করতে।

চারুবালা রান্নাঘরে এসে চাকি বেলনা নামালেন। বললেন, দাঁড়া, রুটিগুলো বেলে দিই।

নীপা অবাক হয়ে বললে, রুটি?

ও এর আগেই দেখেছে, মা থালায় আটা মাখছে। ভেবেছিল, বিকেলের জলখাবার হবে।

চারুবালা হেসে বললেন, ওর মুখে ভাতডাল কি আর রুচবে? ওরা তো রুটি খায়। ডিমের ডালনা করেছি।

শেষে চারুবালা থালা সাজিয়ে নিজেই নিয়ে গেছেন। আর তা দেখে রোবের্তো দারুণ খুশি। কি করে সম্মান জানাবে যেন ঠিক করতে পারছে না। মুখে সেই অনোরাতা, অনোরাতা।

নীপা একটা আসন পেতে দিল থালাটার সামনে। ইন্দ্র বললে, সীট হিয়ার।

আর সারাদিন ওকে মেঝেতে বসে থাকতে হচ্ছে বলে পাশের ঘর থেকে একটা চেয়ার এনে রাখলো।

রোবের্তো সকলের মুখের দিকে তাকালো। হাসলো। আর আসনটা সরিয়ে দিয়ে বসে পড়লো।

চারুবালা ওর জন্যে ডিমের ডালনা করেছিলেন, তবু সকলের জন্যে করা মাছের ঝোলের এক টুকরো মাছও না দিয়ে পারেননি।

নীপা তখন হেসে লুটোপুটি।—মা দেখে যাও, ওকে আবার মাছ দিয়েছো, কাণ্ড দ্যাখো।

চারুবালা কপাটের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কাছে গিয়ে বললেন, খেতে হবে না, খেতে হবে না।

ইন্দ্র হাত নেড়ে ওকে মাছ খেতে নিষেধ করলো।

মেঝেতে বসে খেতে অসুবিধে হচ্ছিল ওর। একটা পা মেলে রেখে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসেছিল।

রোবের্তো থালাটা হঠাৎ হাতে তুলে নিল।

বললে, সিস্তেমা ?

বুঝতে পারেনি দেখে নীপার দিকে তাকিয়ে ইশারায় কি যেন প্রশ্ন করলো। চেয়ারটা দেখালো, আর মেঝেটা দেখিয়ে বললে, সিস্তেমা ? কসতিউমে ?

ইন্দ্র হেসে ফেলে বললে, ইয়েস ইয়েস, ইউ মে···

হাসতে হাসতে বললে, নো সিস্তেমা।

রোবের্তো কথা বুঝলো না, কিন্তু এটুকু বুঝলো চেয়ারে বসে খাওয়ায় কোন আপত্তি নেই।

ইন্দ্র চারুবালার দিকে, নীপার দিকে তাকিয়ে বললে, ও বোধহয় ভেবেছে মেঝেতে না বসলে অন্যায় হবে।

রোবের্তো তখন চেয়ারে গিয়ে বসেছে, ওর দু উরুর ওপর থালাটা রেখে খেতে শুরু করেছে।

চারুবালা চলে গেলেন। আর খাওয়াদাওয়া হয়ে যেতেই নীপা থালাবাসন নিয়ে গেল। একটু পরে আবার ফিরে এল।

আর রোবের্তো উঠে দাঁড়িয়ে নীপাকে চেয়ারটা দেখিয়ে ইঙ্গিতে বসতে বললে।

নীপা অস্বস্তি বোধ করলো, তাই ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, আহা রে, আমার আর কাজ নেই, ওর সঙ্গে বসে গল্প করবো।

রোবের্তো কথা বুঝলো না, বোকা বোকা হাসলো।

তারপর ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললে, ফুমারারে ? কি যেন চাইলো।

ইন্দ্র প্রশ্ন করলো, হোয়াট ?

—সিগারেত্তি। দুটো আঙুল ঠোঁটের কাছে ধবলো।

নীপা হেসে বলে উঠলো, ওমা সিগারেট চাইছেরে। আব্দার কম নয়।

ইন্দ্র উঁকি মেরে দেখলো মা আসছে কি-না। তারপর পাশের ঘরে গিয়ে লুকোনো জায়গা থেকে সিগারেট আর দেশলাই এনে দিল।

নীপা রোবের্তোকে সিগারেট ধরাতে বারণ করলো।—নট নাও।

রোবের্তো বুঝতে না পেরে ভুরু কুঁচকে তাকালো।

আর নীপা ঠোঁটে আঙুল রেখে বললে, অনোরাতা। বলে দরজার দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল।

রোবের্তো বুঝলো না কিছু। তবু ধরালো না।

তারপর নিজের বুকে আঙুল ঠুকে বললে, আই রোবের্তো পিয়েরোনি।

নীপার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ইউ ?

—বলিস না দাদা । নীপা বললে । রসিকতার স্বরে বললে, তোমার এত নাম জানার শখ কেন সাহেব । আগে প্রাণে বাঁচো ?

নাম বলবে না বুঝতে পেরে রোবের্তো হেসে ইন্দ্রকে বললে, ইউ মিকেলে ।

রোবের্তো নীপার দিকে তাকিয়ে বললে, ইউ জুলিয়েত্তা ।

ইন্দ্র হো হো করে হেসে উঠে বললে, তোকে জুলিয়েট বলছে নাকি ?

কিন্তু নীপা হাসতে পারলো না, ও দারুণ লজ্জা পেয়ে গেল । ও লজ্জা লুকোবার জন্যে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ।

রোবের্তোর মুখ দেখে মনে হল ও যেন একটা অন্যায় করে ফেলেছে । কিন্তু অন্যায়টা কি বুঝতে পারছে না ।

সারাদিনটাই ওদের আরেক ধরনের আতঙ্কে কেটেছে । কেউ এসে পড়তে পারে । খিড়কির দরজায় কেউ কড়া নাড়লেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে । একবার একজন খালাসী এসেছিল । কালো কুচকুচে ছাতার কাপড়ের হাফ-হাতা শার্ট গায়ে । কাপড়টাই কালো, না ইঞ্জিনের তেল কয়লা লেগে কালো হয়েছে জানবার উপায় নেই । কয়েক ঝুড়ি কাঁচা কয়লা খিড়কির বাইরে ফাঁকা জায়গাটায় ফেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেছে । ধোঁয়ার দৈত্যটা হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে আকাশে উঠছে । তার পাশেই একটা কুয়ো, এখন পতিত হয়ে পড়ে আছে । দেহাতি ঝি-চাকররা দড়ি টেনে টেনে বালতি করে জল তোলে কখনো সখনো, হাত পা ধোয় । যখন কল ছিল না, তখন ওটাই ব্যবহার হতো । চারপাশ শানবাঁধানো । ঐ খিড়কির দরজা দিয়ে সেই যে অনুপম চলে গিয়েছিল, প্লাটফর্মে টমিগুলোকে উলঙ্গ হয়ে স্নান করতে দেখে, কাকস্নান, তারপর আর আসেনি ।

নীপার ইচ্ছে করছিল একবার গিয়ে দেখা করতে । যাকে ভালবাসা যায়, তাকে বারবার দেখতে ইচ্ছে করে । বুকের মধ্যে চাপা গোপন ভালবাসায় আরো । আর সেই সব সময়ে, যখন ভিতরে ভিতরে বন্ধন নিবিড় হয়ে চলেছে, কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠেনি, দ্বিধার মধ্যে অস্ফুট হয়ে আছে, তখন পৃথিবীটা খুব সুন্দর হয়ে থাকে । আর সেই সময়ে দুজনের সামনে কোথাও কোন কদর্যতা দেখা দিলে সুন্দর পৃথিবীটা হারিয়ে যায় । রাস্তার ছেলের নোংরা টিপ্পনি, অভিভাবকের সন্দেহ, পুলিসের প্রশ্ন । কিন্তু প্লাটফর্মের ঘটনাটা যেন আরো কুৎসিত । নীলপরী মেয়েগুলোর থেকে একটু দূরে এই বীভৎসতা । এর নাম যুদ্ধ !

নীপার ভালবাসার মন চাইছিল অনুপম আসুক । ওদের সম্পর্কটা আবার সহজ হয়ে যাক ।

রোবের্তোকে নিয়ে যা-কিছু মজা, বোকা লোকটা কখন কি বলেছে, কখন কি করেছে, অনুপমকে বলার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে ও । ওকে সব বলতে বলতে নীপা নিশ্চয় কৌতুকে হেসে লুটিয়ে পড়বে । জানো মশাই, আমাকে জুলিয়েত্তা বলেছে । নিজেকে রোমিও ভাবছে কিনা কে জানে । ওকে নমস্কার করতে শিখিয়েছি স্যার, তা জানো । গ্রাৎজি গ্রাৎজি বলেছে, বোধহয় ধন্যবাদ ।

ভিতরে এ-সব বলার ইচ্ছে থাকলে কি হবে, বাবা কাউকে বলতে নিষেধ করেছে । ‘বাইরের কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে ।’ কি আশ্চর্য, অনুপমকেও বাইরের লোক ভাবতে হচ্ছে । বাবার বিপদের কথা ভেবে ।

মনের গভীরে যাই থাক্, অনুপম এখন ওর কাছে একটা আতঙ্ক ।

চারুবালা বললেন, কয়লাগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে যাচ্ছে কিনা দেখে আয় । তখনো ধোঁয়া দেখা যায়নি ।

খিড়কির দরজা খুলে নীপা দেখলো কুয়োর ওপারে খালাসীটা কয়লায় আগুন ধরাচ্ছে।

তারপর পীচ রাস্তার দিকে, বাসটা এসে যেখানে থামে, কখনো দু'একটা ট্যাক্সি দূর দূর কোলিয়ারিতে যায়, আর শনিচারীর হাটের দিকে তাকালো নীপা। যেন অনেকদিন পরে উন্মুক্ত প্রকৃতি দেখছে। একটা প্রিজনার, ওদের ঘরের মধ্যে এসে আবার বন্দী হয়ে আছে বলেই ওরা সবাই বন্দী হয়ে গেছে। সমস্ত চিন্তাভাবনা এই ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ। একটা আতঙ্কের বেড়ায়।

পীচ রাস্তার দিকে চোখ যেতেই হঠাৎ থমকে গেল নীপা। অনুপম না ? সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। প্রচণ্ড একটা ভয়। ও ছুটতে ছুটতে এসে বললে, দাদা, কি করবি এখন ! অনুপম আসছে। চারুবালাও শুনলেন।

অনুপম এলে সবাই খুশি হয়। ইন্দ্র তো একেবারে মশগুল হয়ে থাকে। নীপার বুকের ভিতর ফুলঝুরি তারা ফোটায়।

আর এখন। বাবা বলেছে, 'বাইরের কেউ যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পারে।'

ইন্দ্র বললে, আমি আগেই ভয় পেয়েছিলাম। অনেক আগে যদি আমিই চলে যেতাম ওর কাছে, আসবার কথাই উঠতো না।

নীপা বললে, গেলি না কেন ?

চারুবালাও শুনলেন, কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। শুধু বললেন, কখন মিলিটারির লোক এসে পড়ে, তখন তো ইন্দ্রকে থাকতে হবে। আমরা তো কথাই বলতে পারবো না। তোর বাবা একা সামলাতেও পারবে না। ও তো এমনিতেই খুব ভীতু, কিছু একটা ঘটলেই···

নীপা বললে, এক্ষুনি যদি মিলিটারি এসে যেতো, তা হলে আর ভয় ছিল না। তখন তো সকলেই জানবে। কিন্তু বাবা বোধহয় এখনো ওদের খবর দিতে পারেনি।

নীপা হঠাৎ বললে, দাদা, তুই ওকে সরিয়ে নিয়ে যা। বাড়ি ঢুকতে দিস না।

মাকে বললে, এলেও চা-টা খাওয়ার কথা বলো না। দেরী হবে। ওকে যত তাড়াতাড়ি পারো···

অনুপম এল। তার আগেই ইন্দ্র পোশাক বদলে তৈরি হয়ে আছে।

ইন্দ্রর সঙ্গে কি কথা হল কে জানে। অনুপম বাড়ির ভেতর চলে এল।

হাসতে হাসতে চারুবালাকে বললে, মাসীমা, একটা মজার ছবি এসেছে, টিকিট কেটে আনলাম, এখন দেখুন···

নীপাকে দেখেই বললে, কোন অজুহাত শুনছি না, চলো যেতেই হবে···দারুণ হাসির ছবি।

নীপা বললে, আমার এ-সব বাজে সিনেমা ভাল লাগে না। আর এখানকার যা হল্···।

ইন্দ্র বললে, চল চল, আমার কাজ আছে। ও যাবে না।

অনুপম কখনো এ-রকম ব্যবহার পায়নি। নীপার দিকে তাকিয়ে কেমন ক্ষোভের স্বরে বললে, তুমি তো এখন কলকাতার মেয়ে।

এই কথাটা অনুপম প্রায়ই বলে। ও তো রাঁচি থেকে পাশ করে রুরকিতে পড়ছে। কোলকাতা সম্পর্কে ওর একটা বিস্ময়, মুগ্ধতা, আর চাপা তাচ্ছিল্য আছে।

নীপা কি বলবে কিছু ঠিক করতে পারলো না। শুধু বললে, এখন যাও, আমার ওসব ভাল লাগছে না।

অনুপমের মুখটা যেন অপমানে আহত। ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললে, তুইও যাবি না ? বেশ।

সব দেখেশুনে চারুবালাকে বলতেই হল, একটু চা খেয়ে যাও।

অনুপম তার দিকে একবার তাকালো, নীপার দিকে। তারপর বললো, নাঃ। বলেই গটগট করে বেরিয়ে গেল। হয়তো রাগে, হয়তো অপমানে।

নীপা কেমন বিমর্ষ হয়ে পড়লো। আর রোবের্তোর ওপর ওর প্রচণ্ড রাগ হল।

অথচ একটু আগে ও রোবের্তোর কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হেসেছে। 'জুলিয়েত্তা' 'জুলিয়েত্তা'। নামটা বুকের মধ্যে রিনরিন করে বাজে।

না, রোমিও জুলিয়েটের কথা ভাবেনি হয়তো রোবের্তো। ইন্দ্রকে বলেছে মিকেলে ওকে জুলিয়েত্তা। এমনি সাধারণ নামই হয়তো। ওদের দেশের নাম।

নীপার মনে হল ও যেন রোবের্তো আর অনুপমের মাঝখানে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

আর তার কিছুক্ষণ পরেই মিলিটারি স্পেশালটা এল। জানলা থেকে ইটালিয়ান প্রিজনারের একটা দল চলে যেতে দেখলো। ওদের হয়তো ছোট ছোট দলে নানা ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

ট্রেনটা চলে যেতেই গুরুদাস ফিরে এলেন। আর ইন্দ্রও।

নীপা একবার ইন্দ্রর মুখের দিকে তাকালো। যেন সেই মুখে অনুপমকে খুঁজতে চাইলো। অনুপম কি ওকে ভুল বুঝবে?

তার আগেই গুরুদাস বলে উঠেছেন, সর্বনাশ হয়েছে রে, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

হুইটলি বা বেলকে কিছুই বলা হয়নি।

গুরুদাসকে সমূহ বিপদের সামনা-সামনি দাঁড় করিয়ে দিয়ে তারা চলে গেছে।

৭

শেষ অবধি আর কোন উপায় খুঁজে পাওয়া গেল না। রাত্রে গুরুদাস স্টেশন থেকে ফিরে এলে তাঁর ঘরে বসে চার মাথা এক হয়েছিল। যদি কোন পথ কেউ বের করতে পারে।

সময়টা খারাপ বলেই গুরুদাসের আরো ভয়। একটা বছরও যায়নি, কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেন্ট হয়ে গেছে। সে কি প্রচণ্ড আলোড়ন। করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে চিৎকার যেন এখনো কানে লেগে আছে। গুলির শব্দ এখন স্তিমিত। তবু হঠাৎ হঠাৎ কোথাও থানায় আগুন জ্বলে, বোমা ফাটে। ওদিকে গুজব শোনা যায় সুভাষ বসু নাকি সৈন্য নিয়ে, ভারতীয় সৈন্য নিয়ে, বর্মার দিক থেকে এগিয়ে আসছেন। ব্রিটিশ বর্মা ছেড়ে পালিয়ে এসেছে। সেজন্যে ইণ্ডিয়ানদের ওরা একটুও বিশ্বাস করে না। আর সেই সময়েই কিনা ওঁর বাড়িতে একটা ইটালিয়ান প্রিজনার আশ্রয় পেয়েছে!

গুরুদাস বললেন, ডাক্তার হাজরা ছাড়া আমি আর কারো কথা ভাবতে পারছি না। এখন একমাত্র উনিই হয়তো কিছু একটা বুদ্ধি দিতে পারেন।

কিন্তু এত রাত্রে কি যাওয়া ঠিক হবে। অস্বাভাবিক কিছু ঘটলেই লোকের চোখে পড়বে। কোথাও কোন স্পাইটাই আছে কিনা কে জানে। কে যে স্পাই তা বোঝাও মুশকিল। আরগাডা কোলিয়ারি থেকে একটা ছেলেকে তো এই সেদিন কোমরে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে গেল। মুভমেন্টের সময় নাকি টেলিগ্রাফের তার কেটে বেড়াতো। এসে কোলিয়ারিতে চাকরি করছিল নাম ভাঁড়িয়ে। জানলো কি করে, স্পাই যদি না থাকবে।

শেষ অবধি ঠিক হল, না রাতটা কাটাতেই হবে। পরের দিন ইন্দ্র আর নীপা যাবে ডাক্তার হাজরার কাছে, সব বলবে। গুরুদাসের যাওয়ার কোন উপায় নেই। স্টেশন ছেড়ে যেতে পারবেন না। যদি বা কিছু একটা অজুহাত দিয়ে ঘণ্টা কয়েক ছুটি নেন, বকশিদের

ওপর ভার দিয়ে, তা হলেও ওদের সন্দেহ হতে পারে। অসুখ-বিসুখ নেই, ডাক্তাব হাজরার কাছে যাচ্ছেন কেন!

—সব গুছিয়ে বলতে পারবি তো?

ইন্দ্র ঘাড় নাড়লো।

কিন্তু নীপা একটা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেছে তখন। এই কথাটা যদি বাবা আগেই বলতো। আজই অনুপমকে একরকম তাড়িয়ে দিয়েছে ওরা। অনুপমের লাঞ্ছিত আহত মুখখানা যেন দেখতে পাচ্ছে নীপা।

তার আড়ালে একটা প্রচণ্ড রাগ।

সিনেমার টিকিট কাটার কথা তো ইন্দ্রই বলেছিল। আসলে সিনেমা দেখা তো নয়, একটা হৈ হৈ করা। এই নিঃসঙ্গ জায়গায় একটু বৈচিত্র্য উপভোগ করা।

কিন্তু নীপা কথাগুলো এমন ভাবে বলে ফেললো, যেন অনুপমের রুচিকেই ও ঠাট্টা করছে। যেন অনুপমের উপস্থিতি ওর ভাল লাগছে না। কেন কবলো? শুধুই ঐ কাল-সাপটাকে গোপন করার জন্যে? নাকি ভিতরে ভিতরে রোবের্তোকে ওর ভাল লেগে গেছে? নীপা নিজের মনেই হেসে ফেললো। অসম্ভব। কিন্তু অনুপম পরে যখন জানবে ওর কথা, কিছু ভেবে বসবে না তো?

নীপার সেজন্যেই বড় অসহায় লাগছিল। ও তো অনুপমকে বিশ্বাস করে। জানে, ওদের কোন ক্ষতি হয় এমন কিছু করা ওর দ্বারা সম্ভব নয়। ওকে বললে ববং ও কিছু সাহায্য করতো, বুদ্ধি দিতে পারতো। শুধু বাবাব নিষেধের জন্যেই বলতে পারেনি।

এখন গিয়ে সেই অনুপমের বাবার কাছেই সব কথা বলতে হবে।

—বলবি, ব্যাপারটা গোপন রাখতে। বাড়ির কাউকে যেন না বলেন।

গুরুদাস বলেছিলেন।

নীপার কান্না এসে গিয়েছিল। যেন অনুপমের সঙ্গে ও একটা প্রচণ্ড প্রবঞ্চনাব খেলা খেলছে। বাবা ঠিকই বলেছিল, কালসাপ। ঐ রোবের্তো।

পরের দিন ইন্দ্রর সঙ্গে যখন বের হল, নীপার বুক কাঁপছে। নীপার নিজেকে ছোট মনে হচ্ছে। বাবা কি করে আশা করছে, ডাক্তাব হাজবা তাঁর স্ত্রী কিংবা ছেলেকে কিচ্ছু বলবেন না। তখন অনুপম কি ভাববে! নীপা আমাকেও বিশ্বাস করে না।

অনুপম রাজনীতি করে না, রাজনীতিতে ওর কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু জার্মানদের একেবারে পছন্দ করে না। ওরা ইহুদীদের নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিল। কত বড় বড় বিজ্ঞানীকে দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছে। ইটালিয়ানদের সেজন্যে হয়তো ঘৃণাও করে। ওরাও তো অ্যাক্সিস পাওয়ার। জার্মানদের বন্ধু। অন্যের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চায়। জাপানও।

এসব কথা শুনে ইন্দ্র বলেছিল, এ তোর আত্মবিশ্বাসের অভাব। দুশো বছরের ইংরেজ শাসন যদি আন্দোলন করে সরিয়ে দেওয়া কোনদিন সম্ভব হবে বিশ্বাস করিস অনুপম, তাহলে একটা নতুন শক্তি, যে ভারতবর্ষের কিছুই জানে না, তাকে ঠেকিয়ে বাখা অসম্ভব হবে কেন? আত্মবিশ্বাস না থাকলে তো ধরে নিতে হবে দেশ কোনদিনই স্বাধীন হবে না।

নীপার এই সব কূটতর্কে কোন আগ্রহ নেই। কিন্তু অনুপম যখন সব কথা জানতে পারবে তখন ভেবে বসবে, আমিও ওর পিঠে একটা ছাপ দিয়ে দল বানিয়ে দিয়েছি। ওকে বিশ্বাস করিনি। আর তাই সবকিছু ওর কাছে গোপন রেখেছি।

শনিচারীর হাটের দিকে, ডাক্তার হাজরার বাড়ির দিকে যেতে যেতে সেজন্যেই ওর এত অস্বস্তি হচ্ছিল।

খিড়কির দিকের ঢল বেয়ে তরতর করে নালাটার কাছে নেমে এল দুজনে। নীপা ইন্দ্র।

লাফ দিয়ে নালা পার হল। কংক্রিটের কালভার্ট অনেকখানি দূরে। ওটার ওপর দিয়ে জীপ যায়, গাড়িটাড়ি। ডাক্তার হাজরা কোথাও এ পথে রুগী দেখে ফেরার সময় টাঙ্গা চালিয়ে একেবারে কোয়ার্টারের সামনে এসে থামেন।

পীচের রাস্তার ধারে খানকয়েক দোকান। একটায় তেলেভাজা বিক্রি করে, দেহাতি মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে। লোকটা অনেক দূরের কোন গ্রাম থেকে আসে, সন্ধের আগেই দোকান বন্ধ করে চলে যায়। ডাক্তার হাজরার ওষুধের ছোট্ট দোকান একটা, বুড়ো কম্পাউণ্ডারই কেনাবেচার সেলসম্যান। সেও সন্ধের আগেই চলে যায়। তখন ভুতুড়ে শূন্যতা নিয়ে দোকানগুলো পড়ে থাকে।

পীচ রাস্তা ছেড়ে মাঠ ধরে এগিয়ে গেল নীপা আর ইন্দ্র। শনিচারীর হাটের দিকে। আজ আর বাজপেয়ীজীর বাড়ি যাবে না, চাচীকে বলবে না, হালুয়া বানাও। আজ এ সবের অবকাশ নেই।

উদ্বেগের চোখে প্রকৃতির রূপ বদলে যায়। হয়তো মানুষও।

এঁকেবেঁকে যতখানি সম্ভব গাছের ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে চলেছিল ওরা। আগে প্রচুর গাছ ছিল, ছায়ায় ছায়ায় যাওয়া যেতো। ঠিকাদাররা ক্রমাগত সেগুলো কিনে নিয়ে কেটে ফেলেছে। শালবল্লীর লোভে। পি ও ডবলু ক্যাম্প তো পুরো শালবন ছিল একসময়। এখন একেবারে ন্যাড়া।

এখানে দুপুরের একটা সুন্দর রূপ আছে। সূর্য এখানে রুদ্র, আর মাটি-পাথর রুক্ষতায় ঢাকা। সমতল বলে কিছুই প্রায় নেই। যতদূর চোখ যায় পায়ের তলার মাটি কোথাও ঢলে নেমে গেছে, কোথাও আবার ঢেউয়ের মত মাথা তুলেছে। সমস্ত আকাশই যেন সূর্য। মাটির ঢেউ সবুজহীন প্রান্তর রোদ্দুর মেখে হলুদ হয়ে আছে। মাটির ওপর একটা পুরো বাতাসের আস্তরণ যেন উষ্ণতায় ফুটছে, তিরতির তিরতির করে জলের স্রোতের মত কাঁপছে। দূরে কাছে দু-একটা তিতির ডেকে ওঠে। আর এই হলুদ রোদ্দুরে প্রান্তর জুড়ে হঠাৎ হঠাৎ ছোপ ছোপ কুঞ্জ হয়ে ওঠা গাছের ছায়ায় কালো কালো ছাপ। যেন একটা হলুদ শাড়ির ওপর কালচে সবুজ নকশা। ঐ ছায়ার দিকে তাকালেও যেন রোদ্দুর ঝলসানো চোখে ঠাণ্ডা প্রলেপ অনুভব করা যায়। ঐ মাঠ পেরিয়ে অনেক দূরে দূরে দু-এক টুকরো ক্ষেতিজমি। সবুজের দ্বীপ। জনার বজরার ক্ষেত হয়তো। গাছের নীচে ছায়ায় দড়ির খাটিয়ায় বসে একটা বাচ্চা ছেলে, কোমরে ঘুনসি, পোড়া ভুট্টা খাচ্ছে।

কিন্তু নীপার এখন ঐ ছেলেটাকে আদর করার সময় নেই। যতই ডাক্তার হাজরার বাড়ির কাছে এসে পড়ছে ততই উদ্বেগ।

চারুবালা বলেছেন, ডাক্তার হাজরা আবার রাজভক্ত নন তো?

গুরুদাস হেসে উঠেছেন।—হলেই বা। আমরা তো লোকটাকে ধরিয়েই দিতে চাই।

চারুবালাকে কেমন বিমর্ষ দেখিয়েছে।—না, বলছি যদি ওর বাঁচার কোন রাস্তা থাকতো। খেতে দেবার সময় এমন মুখ করে তাকাচ্ছিল।

গুরুদাস বলেছেন, এই দুটো দিনে সব পাল্টে গেছে। তখন আমরা এমন জায়গায় ছিলাম যে হয় ও বাঁচবে কিংবা আমি, আমরা বাঁচবো। এখন আর ওর বাঁচার কোন রাস্তা নেই, আমরা বাঁচবো কিনা সেটাই সন্দেহ। ঐ প্রিজনারটাকে, এবং আমাদের হয়তো একই দলে মনে করবে।

সেই দল। গোষ্ঠী। জাত, ধর্ম, ভাষা, রাজনীতি, দেশ।

ইন্দ্র তো মেডিকেল পড়ছে, সে কথাই বোঝাতে চেয়েছিল একদিন।

—জানিস নীপা, মাইক্রোসকোপে যখন মোটাইল অর্গানিজম্‌স, মানে জীবাণু দেখি, ব্যাসিলাই, অনেকগুলো স্পট, দল বেঁধে এক একটা স্পট, কিন্তু অনবরত তারা সরে সরে

যাচ্ছে, এক দল ছেড়ে আরেক দলে মিশে যাচ্ছে। মানুষও ঠিক তাই। কখনো সে ধর্মের দলে, কখনো রাজনীতির, কখনো অর্থের কিংবা স্ট্যাটাসের, কখনো শিক্ষার বা দলাদলির, কখনো জাতপাতের, কখনো বাঙালী অবাঙালী। আরো ছোট ছোট পরিচয়ের গণ্ডীতে। সর্বক্ষণ সে কোন না কোন দলে। ধর্মের দলে থাকার সময় যে বন্ধু, ভাষার দলে গিয়ে সে শত্রু। অনবরত সে একজনের বন্ধু হচ্ছে, আবার অন্য দিক থেকে শত্রু।

নীপা মন্তব্য করেছে, কারণ কোন সময়েই সে মানুষ হচ্ছে না।

ইন্দ্র হেসে বলেছে, আমাদের সেই সব ঋষিটিষিরাও তোর মতো দার্শনিক হয়ে উঠতে পারেনি। তারাও ব্রহ্মা ব্রহ্মা করেছে, যজ্ঞ করেছে, কিন্তু যারা ওসবে বিশ্বাস করেনি তাদের মানুষ ভাবতে পারেনি।

ডাক্তার হাজরার বাড়ির দিকে যেতে যেতে কথাগুলো মনে পড়ছিল।

সব মানুষই কত অসহায়। আমরা দেখতে পাই না, বুঝতে পারি না। সব মানুষই তো একা। সকলেই রোবের্তো। বাবাও। দাদা, আমি, মা। মনের ভেতরটা কেউ দেখতে পায় না। তারের জাল আর কাঁটা তারের খাঁচায় আবদ্ধ প্রতিটা মানুষ। অসহ্য বন্দিত্ব থেকে, যন্ত্রণা থেকে পালাতে চাইছে। নিজেই নিজের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে। সকলেই মুক্তি চাইছে, সেই মুক্তির মধ্যে যদি মৃত্যু থাকে তবু।

হঠাৎ রোবের্তোর মুখখানা নীপার চোখের সামনে ভেসে উঠল। একেবারে ছেলেমানুষ। মা ঠিকই বলে, বাচ্চা ছেলে।

ওর মনে পড়লো গতকাল বিকেলে মিলিটারি স্পেশালটা চলে যাওয়ার পর বাবা ফিরে এসে বিভ্রান্তের মতো বলেছিল, সর্বনাশ হয়ে গেছে, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

শুনে নীপাও ভয় পেয়ে গিয়েছিল। হুইটলি আর বেল ছিল বাবার শেষ আশ্রয়। যাদের কাছে খবরটা জানিয়ে দিতে পারলেই বাবা নিশ্চিন্ত হতে পারতো। কিন্তু ইটালিয়ান প্রিজনারদের একটা দলকে ঐ ট্রেনে সরিয়ে অন্য কোথাও নিয়ে গেল, আর তার সঙ্গে হুইটলি আর বেলও চলে গেল।

বাবা বলেছিল, এখন আর কোন উপায় নেই।

সঙ্গে সঙ্গে, নীপা, বুঝতে পারেনি কেন, ওর বুকের ভেতর একটা আনন্দের ফোয়ারা খুশির জলোচ্ছ্বাস হয়ে গেছে। আসলে ঐ অসহায় মানুষটা আরো কিছু পরমায়ু পেল বলেই হয়তো। কিংবা একটা ক্ষীণ আশা।

গুরুদাস চলে যাওয়ার পর ইন্দ্র বললে, চল নীপা, ওর সঙ্গে একটু গল্প করে আসি। তবু তো আরেকটা রাত ওকে আমরা বাঁচতে দিলাম। তারপর হেসে উঠে বলেছে, মজা দেখ নীপা, ভাগ্যের কি পরিহাস, লোকটা ঐ ক্যাম্পে দিব্যি ছিল, একটু ঘোরাফেরা করতে পেতো, ভাল খাওয়াদাওয়া। মুক্তি চাইতে গিয়ে এই ঘরটার মধ্যে বন্দী হয়ে গেল। এখন ও আমাদের দয়ার ওপর নির্ভর করছে।

—দয়া বলিস না। দয়া দেখাবার সাহসও আমাদের নেই। বরং ও আসার পর আমরাই বন্দী হয়ে গিয়েছি। নীপা বলেছে।

ইন্দ্রর সঙ্গে নীপাও এসে ঢুকেছে রোবের্তোর ঘরে।

চেয়ারে বসে ছিল রোবের্তো। ওদের দেখে, নীপাকে দেখেই হয়তো উঠে দাঁড়াল।

নীপা ইন্দ্রকে বললে, ওরা মেয়েদের কত সম্মান করে দেখেছিস। আর তোরা তো দিব্যি বসে থাকিস, এমন ভাব দেখাস যেন মেয়েদের দাঁড়িয়ে থাকারই কথা। বলে হাসল।

রোবের্তো ওর কথা বুঝলো না। হেসে চেয়ারটা দেখিয়ে বললে, সীত জুলিয়েত্তা সীত।

নীপা ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালো, ওর ঠোঁটের ফাঁকে কৌতুকের হাসি।

রোবের্তো আবার ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলো, সিস্তেমা ?

ইন্দ্র হেসে প্রশ্ন করলো, হোয়াট ইজ সিস্তেমা ?

হাতে অদৃশ্য দুটো মোয়া ধরে ঘোরানোর মতো করে এমন ভঙ্গি করলো রোবের্তো, ওরা বুঝলো ও কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

তারপর হঠাৎ ভুরু কুঁচকে দুম করে বলে বসলো, কস্তুম ? কাস্তম ?

—ওরে ও ভেবেছে, মেয়েরা বসে না। আমাদের দেশের রীতি ওটা। নীপা হেসে উঠে বলেছে, ঠিক ধরেছো সাহেব, আমাদের পুরুষরাই শুধু আরাম করে আর হুকুম করে। আমরা বাবা-মার কাছেও খেটে মরি, শ্বশুর বাড়িতে গিয়েও।

রোবের্তোর অস্বস্তি লাগছিল। বললে, মিকেলে, ইউ সীত।

ইন্দ্র গিয়ে ওর তক্তপোশে বসল। নীপাও।

ওদের বসতে দেখে রোবের্তো আবার চেয়ারে বসল।

তারপর নীপার দিকে হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজের চুলের কাছে আঙুল দিয়ে সিঁথি বোঝালো। বললে, সিনোরিনা, বলে দরজার দিকে আঙুল দেখালো অর্থাৎ মা, তারপর বললে, রসসো। আবার নীপার সিঁথি দেখিয়ে বললে, নো রসসো। একটু ভেবে বললে, রেদ। রেদ।

ইন্দ্র আর নীপা হো হো করে হেসে উঠল। ইন্দ্র বললে, সী'জ নট ম্যারেড।

নীপা লজ্জা পেল, অস্বস্তি বোধ করলো।

কিন্তু ইন্দ্রর কথা রোবের্তো বোধহয় বুঝতে পারলো না।

ওর হয়তো মনে হয়েছে চারুবালার সিঁথিতে সিঁদুর আছে, নীপার নেই কেন ? কিংবা সিঁথিতে সিঁদুর দেখে ওর হয়তো ভাল লেগেছে।

ও আবার মাথার ঘোমটা বোঝালো ইশারায়। চারুবালা মাথায় ঘোমটা দেন।

ইন্দ্র হেসে উঠল।

তারপরই কেমন চুপচাপ হয়ে গেছে রোবের্তো। মুখে কেমন একটা বিষণ্ণ ছাপ। নীপার মনে হযেছে ও যেন ভয় পাচ্ছে।

ইন্দ্র প্রশ্ন করেছে, হোয়াট আর ইউ থিঙ্কিং ?

রোবের্তো বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে থেকে বলেছে, থিঙ্ক ? মাথা নেড়ে হেসে ওঠার চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ, না কিছু ভাবছি না। তারপর থমথমে মুখে বলেছে, ওমের্ত্য।

ইন্দ্র বলেছে, চাঁদু, তোমাকে নিয়ে বড় ঝামেলায় পড়েছি। তুমি না বোঝো আমাদের কথা, আমরা না বুঝি তোমার কথা।

নীপা হেসে ফেলেই হাসি চেপেছে। তারপর ধীরে ধীরে বলেছে, দাদা, আসল কথাটা কিন্তু আমরা সকলেই বুঝতে পারছি। ও বাঁচতে চায়। ও আমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। ও আমাদের বিশ্বাস করেছে।

তারপর আবার বলেছে, ভীষণ খারাপ লাগছে রে। ও ভাবছে আমরা ওকে আশ্রয় দিয়েছি, ওকে আমরা বাঁচাবো। অথচ আমরা সকলেই রাস্তা খুঁজছি কি করে আমরা নিজেরা বাঁচবো।

চারুবালা সেই সময়ে দরজার আড়াল থেকে নীপাকে ডাকলেন।

নীপা বেরিয়ে এসে মা'র হাতের দিকে তাকিয়েই স্তম্ভিত। বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠল, মা !

বিস্মিত হবারই কথা।

চারুবালা লজ্জা পেলেন। যেন ধরা পড়ে গেছেন। আমতা আমতা করে বললেন, তুই তো বললি, চা খায় না, চিরতা খাওয়ার মতো মুখ করেছিল। তাই ভজনলালকে দিয়ে আনালাম।

—তুমি ওকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছো নাকি ? নীপা বললে।

—না রে না। দিয়ে আয় এটা।

নীপা কফির কাপটা মার হাত থেকে নিল! হাসতে হাসতে বললে, আর জন্মে তুমি বোধহয় ওর মা ছিলে।

—আর জন্মে কেন রে, মনে হচ্ছে এ জন্মেই। দুদিনেই ছেলেটার ওপর এত মায়া পড়ে গেছে। অথচ কখন হুট করে এসে ধরে নিয়ে যাবে…

নীপা কফির কাপটা নিয়ে গিয়ে রোবের্তোকে দিল।—খেয়ে দেখো সাহেব, এবার পছন্দ হয় কিনা।

ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললে, মা'র কাণ্ড দেখেছিস। কফি আনিয়েছে।

আর তখনই কফির কাপটা নিতে নিতে রোবের্তো বলেছে, গ্রাৎজি, গ্রাৎজি।

তারপর হঠাৎ নীপার হাতের কফির কাপ থেকে সোনার বালায় চোখ পড়েছে, একটা হাত বাড়িয়ে নীপার হাতের বালাটা ধরে বলেছে, নাইস।

আর নীপা সঙ্কোচে লজ্জায় ছিটকে সরে এসে নার্ভাস হাসি হেসে ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বললে, ওর কাছে সবই নাইস রে দাদা!

পরক্ষণেই রোবের্তোর দিকে তাকিয়ে বুঝলো ওভাবে সরে এসে ভুল করেছে। রোবের্তো তখন বোকা বোকা চোখে তাকিয়ে আছে। ও হয়তো সরল ভাবেই কথাটা বলতে চেয়েছে, নীপাই ভুল বুঝেছে। ও তো জানেই না মেয়েদের থেকে দূরত্ব রেখে চলতে হয়। মেয়েদের পুরুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলতে হয়। আর সেজন্যেই ক্ষণিকের স্পর্শও আমাদের মনের মধ্যে তোলপাড় ঘটিয়ে দেয়। রোমাঞ্চ আনে।

—নীপা, যা বলবার তুই গুছিয়ে বলবি। আমি বলতে পারবো না। ডাক্তার হাজরার বাগানের গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে ইন্দ্র বললে।

একটু থেমে বললে, আমার কেমন নার্ভাস লাগছে নীপা।

গেট থেকে বাগানের মাঝখান দিয়ে মোরম ছড়ানো সিঁথির মতো রাস্তা বিরাট চওড়া খোলা বারান্দা অবধি, অনেকগুলো প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে হয়। ঐ বারান্দাতেই বেতের চেয়ার ছড়ানো, ডাক্তার হাজরা কখনো কখনো এসে বসেন। প্রতিবেশী কেউ এলে এখানে বসেই গল্পসল্প করেন।

তারের জাল দিয়ে ঘেরা বিশাল বাগান, লোহার গেট, কিন্তু মাঠের মতো রুক্ষ পড়ে আছে। দু একটা গাছ এখানে ওখানে। কোন এককালে হয়তো সুন্দর বাগান ছিল, অযত্নে নষ্ট হয়ে গেছে।

টানাটানা লম্বা সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠেও কাউকে দেখতে পেল না নীপা।

ওর তখন প্রবল অস্বস্তি। কি ভাবে গুছিয়ে বলবে। আর অনুপম যদি থাকে, চোখ তুলে তাকাতেও ভয়। হয়তো প্রচণ্ড রেগে আছে, কিংবা অভিমান। হয়তো ভেবেছে নীপা ইচ্ছে করেই ওকে অপমান করেছে। অপমানই তো। অনুপম যখন বিমর্ষ মুখে চলে আসছে, তখন ওর মুখ দেখে তাই মনে হয়েছিল।

অনুপমকে ও কি করে বোঝাবে ওর কোন উপায় ছিল না।

পাশের ঘরটায় ঢুকে পড়তেই অনুপম চোখ তুলে তাকালো। চোখ নামিয়ে নিল ওদের দেখেও।

খাটের ওপর বিছানায় বসে অনুপম, সামনে তাস বিছিয়ে রাখছে। দেখেই বোঝা গেল একা-একা পেশেন্স খেলছে তাস নিয়ে। কখনো বই পড়া, পুরোনো ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টানো, নীপাদের বাড়ি গেলে ক্যারম, কিংবা এখানে ওখানে বেড়াতে যাওয়া।

সহজ হবার জন্যে নীপা হাসল। বললে, শেষে পেশেন্স খেলছো বুড়োদের মত।

অনুপম একটু চুপ করে থেকে বললে, জীবনটাই তো পেশেন্সের খেলা।

নীপা শব্দ করে হাসল, কৃত্রিম হাসি।

অনুপমকে দেখে ওর ভালও লাগছে, অথচ ভিতরে ভিতরে একটা বিরক্তি। ও না থাকলেই যেন ভাল হতো। অনুপমকে সমস্ত কথা বলে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে, ওদের সমস্যার কথা, বিপদের কথা, অথচ বলার উপায় নেই। ওকে বলার ফলে যদি জানাজানি হয়ে যায়, এখন তো ও আরো রেগে আছে, তা ছাড়া ওর মতামতগুলোও···

নীপা ভাবলে, এই তো আমিও ওর পিঠে একটা ছাপ দিয়ে দিচ্ছি, দল ভাবছি। কে কাকে বন্ধু মনে করে, কাকে শত্রু ভাবে, কার কি নীতি বিশ্বাস, এ-সব তো বাইরের পোশাক। ভিতরে ভিতরে সে তো একজন মানুষ। একা মানুষ।

—ডাক্তারকাকু কোথায় রে? ইন্দ্র বললে।

অনুপম ইশারায় দেখিয়ে দিল, চেম্বারে। কিন্তু তাস থেকে চোখ তুললো না।

ইন্দ্র নীপাকে বললে, আয়।

সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই ওদের। মা বাড়িতে একা। তালাচাবি দেওয়া ঘরে রোবের্তো। এখন আর পালাবে সে-ভয়ে নয়, যদি কেউ এসে পড়ে, দেখতে পাবে বলে। বাবা তো স্টেশনে। কেউ বেড়াতে এলে মা সামলাতে পারবে না।

চেম্বারের দরজা খুলে ঢুকলো দু জনে।

—আরে এসো এসো। কারো অসুখ নয় তো?

নীপা তখন ভয়ে জড়োসড়ো। সমস্ত শরীর যেন শিথিল হয়ে গেছে। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল ওঁর টেবিলের দিকে।

আর ডাক্তার হাজরা বলে উঠলেন, মিস তুফান মেল তো সব সময় ঝড়ের মতো চলবে। সেজন্যেই ট্রেনটাকে কেউ তুফান মেল নাম দিয়েছিল। হয়তো কোন কুলিটুলি। আর তুমি দেখছি একেবারে গুডস ট্রেনের মতো হাঁটছো। কি ব্যাপার, হাঁটুতে চোট লেগেছে নাকি?

নীপা হাসতেও পারলো না। বুক দুর-দুর করে উঠল। কোনরকমে চেয়ার টেনে নিয়েও বসল। পাশে ইন্দ্র।

নীপা হঠাৎ ভেঙে পড়া গলায় বললে, ডাক্তারকাকু, আপনি আমাদের বাঁচান।

ছেলেবেলা থেকেই ওঁকে ডাক্তারকাকু বলে এসেছে নীপা। ওঁর চুলগুলো কুচকুচে কালো বলেই। কোথাও পাক ধরেনি।

ডাক্তার হাজরা ওর গলার স্বরে বিস্মিত হলেন। তাকালেন ওর মুখের দিকে।

বাইরে কল না থাকলে এ-সময়ে চেম্বারেই বসে থাকেন উনি। এখানে কোন সময়েই ভিড় করে রোগী আসে না। সারাদিনই টুকটাক দু একজন আসে যায়। বেশির ভাগই দেহাতি লোক। মিলিটারির কল্যাণে আজকাল অগুনতি ঠিকাদার। কন্ট্রাক্টর। কেউ কেউ ক্যাম্পে মিলিটারিতে ডিম মাংস চিনি, আরো কত কি সাপ্লাই দেয়। ঠিক সময়ে হেডকোয়ার্টার থেকে সাপ্লাই না এসে পৌঁছলে। তার ফলে লোক বেড়েছে এদিকটায়, তারাও কখনো কখনো আসে, কিংবা কল দেয়। দূর দূর গ্রামেও যেতে হয়।

এক সময়ে কোলিয়ারির ডাক্তার ছিলেন। সাহেব ম্যানেজারের সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দিয়ে এখানেই প্রাকটিস শুরু করেন।

একটু আগেই দিব্যি রসিকতার সুরে নীপাকে মিস তুফান মেল বলেছেন, কিন্তু নীপার কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল ডাক্তার হাজরাও বিভ্রান্ত মুখে তাকালেন। বোধহয় নীপা খুব চাপা গলায় কথাটা বললো বলে।

ডাক্তার হাজরার মুখে আর মিস তুফান মেল নামটা শোনা গেল না! নীপার কথা শুনেই বুঝলেন গুরুতর কিছু।

ইন্দ্র বললে, নীপা তুই বল। আমি আসছি।

ইন্দ্র হয়তো অনুপমকে সরিয়ে নিয়ে যাবে নীপা ভাবলো।

একটু একটু করে কাঁপা কাঁপা গলায় সব কথা বললে নীপা। বললে, ডাক্তারকাকু আপনিই বাবাকে বাঁচাতে পারেন। আপনি ছাড়া আমরা আর কারো কথা ভাবতেই পারছি না।

ডাক্তার হাজরাও যেন নার্ভাস হয়ে পড়লেন।—ইটস এ ফুলিশ অ্যাক্ট অন হিজ পার্ট। তোমার বাবা। এ কি বোকামি করেছেন ? মুভমেন্টে লাইন উপড়ে দেওয়া, তার তবু একটা জাস্টিফিকেশন আছে। কিন্তু প্রোটেকশন টু এ প্রিজনার অফ ওয়ার ! দু দিন হয়ে গেল। তোমরা চুপ করে থাকলে কি করে ?

নীপা যেন একেবারে ধসে পড়লো।—কি হবে ডাক্তারকাকু। কোন উপায় নেই ?

ডাক্তার হাজরা চিন্তিত হলেন।—ভাবতে দাও। লেট মি থিঙ্ক।

ওঁকে খুব বিব্রত দেখালো।—এখানে কেউ জানে না তো ? ওঁর কলীগরা ?

—না। বাবা কাউকেই সাহস করে বলতে পারেনি।

—প্রথম দিনই তাড়িয়ে দিলেই তো চুকে যেতো। এসেছিল, তাড়িয়ে দিয়েছি। আমরা জানবো কি করে যে ও প্রিজনার। ডাক্তার হাজরা বললেন।

আর নীপার মনে হল, সে তো আমরাও জানি। কিন্তু ঐ অবস্থায় পড়লে তা যে সম্ভব ছিল না বোঝাবে কি করে। একটা সাহেব বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে, অত রাত্রে, তখন চিৎকার হট্টগোল হলে পাড়াপড়শি এসে পড়তো ঠিকই, কিন্তু কি ভাবতো কে জানে। হয়তো একটা অপবাদ রটে যেত।

নীপা ধীরে ধীরে বললে, ওতো প্রিজনারদের সেই ডোরা কাটা পাজামা পরে আছে, দেখলেই তো বোঝা যায়। তাছাড়া ও ইংরিজিও জানে না। দু একটা শব্দ হঠাৎ হঠাৎ বলতে পারে।

ডাক্তার হাজরার কপালে চিন্তার রেখা পড়লো।—ইটস অলরেডি ট্যু লেট। দেরী হয়ে গেছে, অসম্ভব দেরী হয়ে গেছে।

নীপা প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, তখন ভেবেছি, লোকটাকে তাড়িয়ে দিলে পালাতে গিয়ে গুলি খেয়ে মরবে ! গলার স্বরে ঈষৎ মমতার ছাপ।

ডাক্তার হাজরা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, তা হলে তো, নীপা, প্রবলেম সল্‌ভড হয়ে যেতো। কথাটা ওর লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ নিয়ে নয়, তোমাদের, তোমার বাবার লাইফ অ্যাণ্ড ডেথ নিয়ে। আরে, ঐ ব্যাপার নিয়েই তো কোলিয়ারির ম্যাকফার্সন সাহেবের সঙ্গে ঝগড়া। দিলাম চাকরি ছেড়ে। বলেছিলাম, আই হ্যাভ ওয়ান অ্যাণ্ড ওনলি ওয়ান ইন্টাররেস্ট। আমার পেশেন্টদের সুস্থ করতে হবে, বাঁচাতে হবে। তোমার কোম্পানির কত টাকার ওষুধ খরচ বাড়ছে, আমার জানার দরকার নেই।

এসব কথা নীপা জানে, কিন্তু এখন বিরক্তিকর। মনে হল যেন আত্মপ্রচার করছেন ডাক্তার হাজরা।

আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন।—সেই যে পাগলা সাহেব একটা ছেঁড়া কোটপ্যাণ্ট পরে ঘুরে বেড়াতো, ভিক্ষে করতো, বিড়ি চেয়ে খেতো, মনে আছে···সে একবার অসুখে পড়লো···

নীপা বললে, জানি, সে তো মারা গেছে।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন ডাক্তার হাজরা। উল্লসিত হয়ে বলে উঠলেন, দাঁড়াও। ইয়েস, দাঁড়াও।

উঠে গেলেন ডাক্তার হাজরা। দেরাজ থেকে চাবি বের করলেন, দেয়ালের এক কোণে

রাখা আলমারি খুললেন।

এই ঘরটায় শেলফে আলমারিতে টেবিলে নানান কোম্পানির ওষুধের স্যাম্পল রাখা আছে। সেজন্যেই হয়তো ঘরটায় ওষুধ-ওষুধ গন্ধ। আর ঐ আলমারির একটা তাকে ডাক্তার হাজরার কোট প্যাণ্ট পোশাক। এক জোড়া ধোপদুরস্ত। রাত্রে কল এলে কাউকে জাগাতে হয় না, নিজেই এসে চাবি খুলে পোশাক বদলে বেরিয়ে যান।

সেই পোশাকগুলোর নীচে কি যেন খুঁজলেন।—পেয়েছি, পেয়েছি।

ফিরে এসে চেয়ারে বসলেন।—ছেঁড়া তাপ্পিমারা পুরোনো প্যাণ্ট আর শার্ট। রেখে দিয়েছিলাম, সুস্থ হয়ে উঠলেই পাগলা সাহেবটাকে দেবো বলে। ব্যাটা বাঁচলো না।

নীপাকে দিলেন। বললেন, ডোরা কাটা পাজামা পরে থাকলে ইটস রিস্কি। ঐ প্রিজনারটাকে পাগলা সাহেব বানিয়ে দাও গিয়ে। এই যে শার্টটা, কেটে দিয়ে একটা তাপ্পি মেরে দিও।

নীপা বিস্মিত হয়ে বললে, তাতে কি লাভ?

ডাক্তার হাজরা বললেন, একটা অজুহাত তো হবে। এখনই যদি ওরা খবর পেয়ে চলে আসে, আমরা পাগল ভেবেছিলাম, কি সব আবোল-তাবোল বলছিল, ইটালিয়ান না পাগলামি বুঝবো কি করে! ব্যস, আজ রাতটা কাটুক। তারপর দেখি কি করা যায়। আই মাস্ট ডু সামথিং। তোমার বাবাকে বাঁচাতেই হবে। টু সেভ এ লাইফ ইজ আওয়ার মিশন। এও তো এক ধরনের জীবন বাঁচানো।

ডাক্তার হাজরা চেষ্টা করে হেসে উঠলেন।—ভয় পেয়ে গেলে নাকি? আরে দূর, তুমি তো মিস তুফান মেল, নার্ভাস হওয়া তোমায় সাজে না। এর জন্যে কি সত্যি সত্যি তোমার বাবার ক্যাপিটেল পানিশমেণ্ট হবে নাকি? কিচ্ছু না, কিচ্ছু না। বড়জোর চাকরিতে···আরে ধুস, ওসব কিচ্ছু না।

নীপা বাণ্ডিলটা নিয়ে বেরিয়ে এল বিভ্রান্তের মতো। অনুপমের সামনে পড়ে গেলে কি বলবে সে অস্বস্তিও নেই। ও কিছু ভাবতেই পারছে না।

বেরিয়ে এসে দেখল অনুপম নেই। ইন্দ্র একাই দাঁড়িয়ে আছে।

ইন্দ্র বললে, অনুপমটা কোথায় যে গেল···

তারপর আস্তে আস্তে বললে, আমি পারলাম না রে। মাথাটা এমন ঘুরে গেল। আঃ কোন রকমে যদি পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কি ঝামেলা।

নীপার মাথায় তখন ডাক্তার হাজরার কথাগুলো অস্পষ্ট ভাবে ঘুরছে। তখন শুনতে ভাল লাগে নি। বলছিলেন, রোগীকে বাঁচানো তো সহজ। জীবনের অন্য ক্ষেত্রে একটাই সমস্যা। একজনকে বাঁচানো মানে অন্যের মৃত্যু। একজনের উপকার মানে অন্যের ক্ষতি। একজনের লাভ মানে অন্যের লোকসান। জাস্টিস মানে সেইসব আইন, নিয়ম, যা সমাজটাকে এ-ভাবেই চলতে দেয়। নিয়মটা একটু বদলে দিতে পারলে দুজনেই বেঁচে যেতে পারে। কিন্তু কেউ বদলাতে দেবে না।

৮

গুরুদাস সারা দুপুর স্টেশন আর ঘর, ঘর আর স্টেশন করেছেন, বার বার কোয়ার্টারে এসে খোঁজ নিয়েছেন নীপা আর ইন্দ্র ফিরলো কিনা। ক্রমশ অধৈর্য হয়ে উঠেছেন। তা দেখে চারুবালা বলেছেন, তুমি নিজেই গেলে পারতে। ওরা কি অত বুঝিয়ে বলতে পারবে।

গুরুদাস বিচলিতভাবে বলেছেন, ডাক্তার হাজরাকে বোধহয় না বললেই ভাল ছিল। কাজের কাজ কিছুই হবে না, উল্টে রোগী দেখতে গিয়ে হয়তো গল্প করে বসবেন। কেন যে এ দুর্বুদ্ধি হল।

চারুবালা সান্ত্বনা দিয়েছেন, ওরা আসুক না ফিরে, তুমি আগেই কেন মাথা খারাপ করছো। আমরা তো কোন পাপ করিনি, শুধু শুধু ভগবান কেন আমাদের বিপদে ফেলবে।

গুরুদাস হেসে উঠেছেন।—তুমি তোমার বিশ্বাস নিয়েই থাকো। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে তোমার ভগবানও ভয় পায়।

একটু থেমে বলেছেন, ভগবান বোধহয় সব মানুষকেই ভয় পায়। সেকালেও রাজা উজীর, বড়লোক, গেঁয়ো পণ্ডিত সবাইকে ভয় পেতো, একালে গভর্নমেণ্টকে। সেজন্যেই এ জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এ জন্মেই হয় না, পুণ্যের ফল পেতে পরজন্মের অপেক্ষা করতে হয়। আর লোকটা জানতেও পারে না গতজন্মে কি পাপ করেছিল, কতটা পুণ্য জমে ছিল।

চারুবালা বললেন, এত বিপদের মধ্যেও ভগবান নিয়ে রসিকতা করতে তোমার ভয় করছে না? ওসব বলো না তুমি, আমার বুক কাঁপছে।

গুরুদাস ক্ষোভের সঙ্গে কথাগুলো বলে ফেলেই কিন্তু ভয় পেয়ে গেলেন। বলা উচিত হয়নি। সামনে যার এত বড় বিপদ···

স্টেশনে ফিরে এলেন। বরকাকানা থেকে ফিরতি ট্রেনখানা এখনো এসে পৌঁছয়নি।

রামভজন অফিস-ঘরের দরজার কাছে একটা টুলে বসে বসে খৈনি টিপছে।

—রতনমণি, দাও হে একটা পান দাও, আজ খেতে ইচ্ছে করছে।

তারবাবু রতনমণি খুশি হলেন। কেউ পান চাইলেই উনি খুশি। জার্মান সিলভারের ডিবেটা খুলে দুটো ক্ষুদে ক্ষুদে পান এগিয়ে দিয়ে বললেন, আজ আপনাকে বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে গুরুদাসদা।

গুরুদাস যেন চমকে উঠলেন। বলে উঠলেন, না না, অন্যমনস্ক কেন।

বকশি বসে ছিল এক কোণে। হেসে উঠে বললে, তবে কি পেট খারাপ। বারবার কোয়ার্টারে যাচ্ছেন।

গুরুদাস ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। সত্যি তো, অধৈর্য হয়ে উঠে বারবার নীপা আর ইন্দ্র ফিরেছে কিনা জানতে গেছেন। বিরজু কিংবা ভজনলালকে পাঠাতে সাহস পাননি। নীপা তো ধমক দিয়ে বিরজুর বাগানে জল দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ওর অযত্নে নাকি গাছ মরে গেছে। এখন নিজেই ঝারি হাতে জল দেয়।

গুরুদাস জানেন সমস্ত ব্যাপারটা সাজানো। বাইরে থেকে কোণের ঘরের জানালা দেখা যায় না, মাধবীলতার ঝোপ জাফরির গা বেয়ে উঠে ঐ জানালা আড়াল করে নেমেছে। কিন্তু বাগানে জল দিতে এলেই হয়তো বিরজুর সন্দেহ হবে, সব সময়েই জানালা দুটো বন্ধ কেন।

গুরুদাস পি ও ডবলু ক্যাম্পের দিকেও তাকাতে পারেন না, যেন ওদিকে তাকালেই কেউ বুঝতে পারবে ওঁর কোয়ার্টারে একজন প্রিজনার লুকিয়ে আছে।

—জানেন গুরুদাসদা, এ ব্যাটাদের সব বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।

—কেন? কেন একথা বলছো? গুরুদাস ফিরে তাকালেন।

বকশি দাঁতে দেশলাইয়ের কাঠি খোঁচাতে খোঁচাতে বললে, প্রেস্টিজ পাংচারড হবে বলে কাউকে কিছু জানতে দেয় না। ঐ দেখুন না···

বকশি আঙুল দেখালো, একটা বড় পোস্টার সাঁটা আছে দেওয়ালে। 'গুজবে কান দেবেন না।' তার পাশেই আরেকটা লেট আস টু দি টাস্ক···চার্চিলের বক্তৃতা।

—গুজবে কান দিলেই যে খবর জেনে ফেলবে সকলে। বকশি হাসতে হাসতে বললে।

আর রতনমণি টেলিগ্রাফ টরে টক্কা করতে করতে বললেন, আঃ কি হচ্ছে? দেওয়ালেরও কান আছে।

তারপর রতনমণি ভজনলালকে ধমক দিলে, এই, তুই এখান থেকে যা। বসে আছিস কেন?

বকশি একটু গলা নামালো। বললে, এত রাইফেল নিয়ে গার্ড দিচ্ছে, কিন্তু প্রিজনার পালাচ্ছে মাঝে মাঝেই। সেদিনও পালিয়েছে। শুনলাম, তার আগেও নাকি একবার জনকয়েক পালিয়েছিল…

গুরুদাস রীতিমত অভিনয় করলেন, দূর, তাও কি সম্ভব।

বকশি হেসে বললে, রিয়েল ফ্যাক্ট, গুরুদাসদা, রিয়েল ফ্যাক্ট।

রিয়েল ফ্যাক্ট কথাটা গুরুদাস নিজেও বলতেন, গার্ড হিল সাহেব সংশোধন করে দিয়েছিল একবার।

কিন্তু এই মুহূর্তে ভুল ধরার মতো মন ছিল না। প্রিজনার পালিয়েছে এই কথাটা শুনেই হৃৎকম্প।

আগেও কয়েকজন পালিয়েছিল? কিন্তু পালিয়ে কোথায় গিয়েছে তারা? মেশিন গান কিংবা রাইফেলের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছে হয়তো। তা হারাক, তাদের জন্যে ওঁর কোন দুঃখ নেই। শুধু এই রোবের্তো ছোকরার জন্যে কোথায় যেন একটু মায়া রয়েছে। ও যেন গুলি খেয়ে না মরে। প্রিজনার হয়ে ঐ ক্যাম্পে আবার ফিরে যাক। সে বরং ভাল।

রাত্রের ট্রেন চলে যাওয়ার পর গুরুদাস ফিরে এলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র বললে, বাবা দেখবে এসো, লোকটাকে একেবারে পাগল সাজিয়ে দিয়েছি। একটা পাগলা সাহেব।

একে একে সব শুনলেন ইন্দ্র আর নীপার কাছে।

তারপর নিজেই দেখতে এলেন। কিন্তু আসল সমস্যার তো কোন সুরাহা হল না। আজ রাতটাও যদি ওকে রাখতে হয়, কি যে বিপদ।

গুরুদাস ইউনিফর্ম ছেড়ে ওর ঘরে আসতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রোবের্তো। সেই আগের মতোই হাতজোড় করে নমস্কার করলো। নীপা শিখিয়ে দেওয়ার পর এখন নিখুঁত নমস্কার করতে পারে।

নমস্কার করে বললে, অনোরাতো।

নীপা তখন ওর পোশাক দেখে হাসছে।—দ্যাখো বাবা, একেবারে বদ্ধ পাগল মনে হচ্ছে।

ট্রাউজার্সে এক জায়গায় বড় একটা তাপ্পি লাগানো। বেঢপ মাপ। পায়ের বেড় এত বড় যে দেখে হাসি পায়।

ইন্দ্র হেসে বললে, ওর এখন বাঁচার একটাই রাস্তা, পাগলা গারদ।

নীপাও হাসল।

যেন পাগল সাজিয়েছে বলেই বিপদ কেটে গেছে।

গুরুদাস বললেন, ও তো এভাবেই চলে যেতে পারে।

নীপা বলে উঠল, না না বাবা, ডাক্তারকাকু কাল আসুন আগে। উনি নিশ্চয় কিছু একটা উপায় বাতলে দিতে পারবেন।

—যা ভাল বুঝিস্। আবার একটা রাত। গুরুদাস একটু থেমে বললেন, বকশি জেনে গেছে।

—জেনে গেছে? ইন্দ্র চমকে উঠল।

আর গুরুদাস বললেন, প্রিজনার পালিয়েছে ক্যাম্প থেকে সে কথা জেনে গেছে। কিছু

দেখে, যদি ওর সন্দেহ হয়।

রোবের্তো কিছুই বুঝছে না ওদের কথা। বোকা বোকা হাসি ওর মুখে।

হঠাৎ এগিয়ে এল, গুরুদাসের একটা হাত দুহাতে মুঠো করে ধরে বললে, বাব্বো। গ্রেতফুল।

—বাবা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে তোমাকে। বলছে, গ্রেটফুল। বাব্বোটা কি রে দাদা? নীপা বললে।

গুরুদাস হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন। যেন প্রচণ্ড একটা অস্বস্তি। রোবের্তোর কাঁধে এমন ভাবে চাপড় দিলেন যেন সান্ত্বনা দিচ্ছেন। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ইন্দ্রর দিকে নীপার দিকে তাকিয়ে চোখ নামালেন।—ওর মুখের দিকে তাকাতেও আমার কষ্ট হচ্ছে। তাকালেই মায়া। কি করে বাঁচাবো বল।

যেন নিজের কাছ থেকেই নিজে পালাতে চাইছেন। ধীরে ধীরে চলে গেলেন।

নীপা ইন্দ্রকে চাপা গলায় বললে, বাবারই সবচেয়ে কষ্ট।

ইন্দ্র বললে, মুখে যাই বলুক বাবা, ওঁকে ধরিয়ে দিতে হবে ভেবে বাবার বুকেই সবচেয়ে বেশি কষ্ট। আমি দেখতে পেয়েছি।

আর নীপা বললে. সত্যি, ও যদি কোনরকমে বেঁচে যেতে পারতো, জানিস দাদা, আমার মনে হচ্ছে আমরা সবাই বেঁচে যেতাম।

তখনই ইন্দ্র বলে উঠল, আরে প্রিজনারের পোশাকটা যে এখানেই পড়ে আছে। দেখেছিস, ভুলেই গিয়েছিলাম।

ডোরা কাটা পাজামাটা তুলে নিল ইন্দ্র। হেসে বললে, দেখেছিস গোয়েন্দা গল্পের ক্লু পড়ে থাকছিল। কিন্তু কি করি বলতো এটা নিয়ে?

রোবের্তো তখন দু আঙুলে চিমটের মত ধরে একবার নিজের প্যান্ট একবার শার্টটা দেখালো নীপাকে।—গ্রাৎজি।

প্রথম দিন থেকে কথাটা ওর মুখে লেগেই আছে। হয়তো ধন্যবাদ ধরনের কিছু।

নীপার সত্যি অবাক লাগছে। ভয় তো রোবের্তোরই হবার কথা। প্রথম যেদিন এল মুখ চোখে আতঙ্ক। আর এখন নীপারাই ভয়ে অন্ধকার দেখছে। লোকটা নিশ্চিন্ত। কারো ওপর নির্ভর করলে, কাউকে বিশ্বাস করলেই বোধহয় নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

রোবের্তো চেয়ারটা এগিয়ে এনে দিল. নীপাকে বসতে বললো।

ইন্দ্র বললে, বোস না, বলছে যখন।

এখন বসতে অবশ্য নীপারও আপত্তি নেই। লজ্জা সঙ্কোচ ক্রমশ কেটে যাচ্ছে. কেমন আপন আপন লাগছে লোকটাকে।

নীপা চেয়ারে বসতেই রোবের্তোকে খুব খুশি খুশি দেখালো। এক মুখ হেসে লম্বা চেহারাটা গুটিয়ে সুটিয়ে মেঝেতে বসে পড়লো ও, প্রায় নীপার পায়ের কাছে।

নীপা অস্বস্তিতে পা দুটো পিছিয়ে নিল।

ইন্দ্র তখন ওর হাবভাব দেখে হাসছে।

রোবের্তো হঠাৎ বললে, স্তুদেন্ত? ইন্দ্রর দিকে নীপার দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ইউ স্তুদেন্ত?

নীপা ঝটপট মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ। মুখে কৌতুকের হাসি।

রোবের্তোও তখন নিজের বুকে আঙুল ছুঁইয়ে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলছে, আই স্তুদেন্ত, কলেজিও স্তুদেন্ত।

একটা কথায় ও যেন সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দিতে চাইল। যেন বলতে চাইছে ও সৈন্য নয়, গুলিবন্দুক ওর পছন্দ নয়. ও যুদ্ধ করতে চায়নি। ওর একটাই পরিচয়, ও স্টুডেন্ট। পি ও

ডবলু ক্যাম্পে ফেলে আসা খাকি গ্যাবার্ডিনের ইউনিফর্ম ওর পরিচয় নয়। লেফটেনেন্ট কি ক্যাপ্টেন কিংবা মেজরের সমতুল্য কোন পদমর্যাদা নিয়ে ওর কোন মাথাব্যথা নেই। এমন কি ও নিজেকে শুধু একজন প্রিজনারও ভাবতে পারছে না। ও ছাত্র, শুধুই স্টুডেন্ট।

ইন্দ্র আর নীপার ভাল লাগলো। যেন আমাদেরই একজন।

রোবের্তো হাসল।—গুয়েরা ? নো। পাচে পাচে।

তারপরই মনে পড়ে যেতে বলেছে, গুয়েরা। ওয়ার। নো ওয়ার।

নীপা হেসে উঠল।—হোয়াট ইজ পাচে ? ইন্দ্রও হেসে বললে, তোমার কথা বুঝতে পারছি না চাঁদ।

ইন্দ্রর কথায় নীপা আবার হাসল। বললে, সোনামুখ করে খুব তো হাসছো, কথা বলছো। আমাদের যে কি বিপদ, তা তো জানো না।

নীপা আবার বললে, হোয়াট ইজ পাচে ?

সঙ্গে সঙ্গে রোবের্তো প্রায় গানের সুরে বলে গেল, ইন লা সুয়া ভোলেনতাতে এ নোস্ত্রা পাচে।

গানের কিংবা কথাটার মানে কি বোঝাতে চাইলো রোবের্তো। উর্ধ্ববাহু হয়ে তর্জনী দেখালো মাথার ওপরে, ছাদ কিংবা আকাশ কিংবা তারও ওপরে ঈশ্বর হয়তো। তারপর দুহাত দুপাশে শান্ত ভাবে ছড়ালো। সমস্ত চরাচর ? নীপাকে, ইন্দ্রকে, নিজেকে দেখালো।

ওরা কিছুই বুঝতে পারলো না। কি বলতে চাইছে ? ঈশ্বরই আমাদের রেখেছেন, রাখবেন। নাকি তার ইচ্ছায় সব চরাচর আছে। সব ঠিকঠাক আছে, চলছে।

রোবের্তো আবার দুটো হাত দুপাশে শান্তভাবে ছড়ালো। বললে, পাচে।

নীপা হেসে উঠে বললে, সাহেব কিছু বুঝছি না। পাখির ডানা না শান্তি ?

এ এক অসহ্য অস্বস্তি। দারুণ কষ্ট। একজন আরেকজনকে বুঝতে পারছে না। বুঝতে চায় তবু বুঝতে পারছে না। নীপাও তো ওকে কত কথাই বলতে চায়, বলতে পারছে না। কেউ কারো ভাষা জানে না। অথচ বুকের ভেতরটা মুখর হয়ে আছে।

নীপার তো বলতে ইচ্ছে করছে, আমরা সবাই তোমাকে বাঁচাতে চাই। বাবারও তোমার জন্যে কত মায়া, এই তো এক্ষুনি ধরা পড়ে গেছে আমাদের সামনেই। কিন্তু আমরাও যে একটা যন্ত্রের মধ্যে পড়ে আছি। তোমাকে বাঁচাতে গেলে আমরা বাঁচবো না। কিন্তু কখনো রাস্তায়, পালাতে গিয়ে যদি একটা উড়ন্ত গুলি এসে তোমার বুকে লাগে, আমাদের হৃৎপিণ্ডও ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সারা জীবন ধরে একটা অনুতাপ বয়ে যেতে হবে, একজন মানুষকে আমরা বাঁচাতে চাইনি, বাঁচাতে পারিনি।

নীপার হঠাৎ মনে হল, সত্যি আমরা তো কেউ কারো ভাষা বুঝি না। বোঝাতে পারি না। অনুপমকেই কি আমি কিছু বলতে পেরেছি ? বোঝাতে চেয়েছি ? অনুপমও তো আমাকে বোঝেনি।

—জীবনটাই তো পেশেন্সের খেলা। কেন বললো এ-কথা ?

সমস্ত মানুষই বোধহয় এই রকম। স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারে না, মনের ভিতরের কথা বাইরে প্রকাশ করতে পারে না। ভাষা কি কিছু বলতে পারে নাকি ? যত কথাই বলি না কেন, সবই ঐ রোবের্তোর সঙ্গে কথা বলার মত অস্পষ্ট। ইঙ্গিতসর্বস্ব। পৃথিবীর সব মানুষ।

রোবের্তো হঠাৎ যেন জিজ্ঞেস করলো, ভিয়া ?

ইন্দ্র নীপা দুজনেই মাথা নাড়লো, না, বুঝতে পারছে না।

রোবের্তো ভুরু কুঁচকে কি যেন মনে করার চেষ্টা করছে। কপালে আঙুল ঠুকলো, যেন মনে পড়ছে না।

তারপর হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল সারা মুখ। বলে উঠল, স্ত্রীত, স্ত্রীত।

—স্ট্রীট ? ইন্দ্র বললে।

আর রোবের্তো খুশি হয়ে মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

—ওরে, রাস্তা খুঁজছে, পালাবে। ইন্দ্র হেসে বললে, বেরোলেই তো মরবি, ধরা পড়বি।

কিন্তু নীপা হাসতে পারলো না। ওর বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল। ওরা তো কত কি ভেবেছে, ওকে তাড়ানো, ধরিয়ে দেওয়া, মৃত্যু। কিন্তু রোবের্তো চলে যেতে চাইছে নিজেই, এ-কথাটা একবারও ভাবেনি। ভাবেনি বলেই হয়তো ওর বুকের ভিতর কেমন একটা কষ্ট হল। চলে যাবে ?

নীপা মনে মনে বলে উঠল, অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ।

নীপার মনে হল ওর চোখে জল এসে যাবে। ও চেয়ার ছেড়ে ঝট করে উঠেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চারুবালা বারান্দায়। হাসতে হাসতে বললেন, কি এত গল্প করছিস ?

নীপা বললে, কিছু না কিছু না।

নীপার বুকের ওপর যেন একটা ভারি পাথর নেমে এসেছে।

ডাক্তার হাজরার বাড়ি থেকে ফিরে এসে ওকে পাগলা সাহেব বানানোর দৃশ্যটা মনে পড়লো।

ট্রাউজারের তাপ্পি লাগানোই ছিল, শার্টে লাগাতে ভুলে গিয়েছিল নীপা।

ট্রাঙ্ক বাকস খুঁজে পেতে এক টুকরো লাল কাপড় বের করলো। ছুঁচসুতো কাঁচি নিয়ে এল ওর ঘরে।

ইন্দ্র ওকে শার্টটা খুলতে বললে। রোবের্তো কেবল মাথা নাড়ছে, কিছুতেই না। শেষে নীপাকে ইশারায় সরে যেতে বললে।

ইন্দ্র হেসে উঠে বললে, ওরে তোর সামনে শার্ট খুলবে না।

নীপা ফিরে এসে দেখল, হিন্দুস্থানী ফতুয়াটা আবার পরে নিয়েছে ও।

রোবের্তোর সামনেই শার্টের বুকের কাছে খানিকটা কাপড় কাঁচি দিয়ে কেটে লাল টুকরোটা বসিয়ে দিল। এবার বদ্ধ পাগলের মতো লাগছে।

ছুঁচসুতো দিয়ে সেলাই শেষ করে নীপা সুতোটা গালের কাছে টেনে নিয়ে এসে দাঁত দিয়ে কুটুস করে কাটলো। ছুঁচসুতো রেখে দিল কৌটোয়।

আর রোবের্তো তখন মুগ্ধ হয়ে ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ কৌটোটা টেনে নিয়ে রোবের্তো ছুঁচ আর সুতো বের করে দিল নীপাকে। দাঁতে সুতো কাটার ভঙ্গি করে দেখালো।

ইন্দ্র হেসে উঠল।—আবার করতে বলছে নীপা।

নীপা লজ্জা পেয়ে গেল।—সত্যি পাগল রে !

ওর ঐ সুতো কাটার ভঙ্গিটা ভাল লেগে গেছে রোবের্তোর।

সেই সব কথা ভেবে নীপার মন খারাপ হয়ে গেল। ভিয়া, স্ত্রীত। এখন ও রাস্তার খোঁজ চাইছে। চলে যাবে। চলে যাবে ভাবতেই নীপার মন বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিল।

হঠাৎ ইন্দ্র ডাকলো, নীপা শোন।

নীপার নিজেরও আবার ওর ঘরে যেতে ইচ্ছে করছিল। চলেই তো যাবে। বাবা শুনলেই হয়তো বলবে, তাই যাক।

নীপা ফিরে এল ওর ঘরে। এসে দেখে ছোট্ট একটা ম্যাপ মেঝেতে মেলে ধরে রোবের্তো কি দেখাচ্ছে ইন্দ্রকে।

ম্যাপ ? সেই ভাঁজ করা কাগজটা। প্যাণ্টের পকেটে লুকিয়ে ফেলেছিল নীপার সামনে। তখন বুঝতে পারেনি।

নীপাও কৌতূহলে ঝুঁকে পড়লো।

রোবের্তো ম্যাপের একটা জায়গা দেখাচ্ছে আঙুল দিয়ে। বলছে ভিয়া, স্ত্রীত?

—আরে, এ তো এখানকারই ম্যাপ। কোথাও যেতে চাইছে।

ম্যাপটার এক জায়গায় আঙুল দিয়ে দেখালো রোবের্তো। একটা ক্রশ চিহ্ন দেওয়া রয়েছে। নামগুলো সবই চেনা, ছোট ছোট জায়গা, ছোট্ট স্টেশন।

রোবের্তো আবার বললে, ভিয়া?

ক্লান্ত শরীর টেনে টেনে গুরুদাস স্টেশন থেকে ফিরে এলেন। ক্লান্তি শরীরের নয়, দুশ্চিন্তার। ওসব কাজের কথা নয়। একটা সুস্থ লোককে কি পাগল বলে চালানো যায়! পাগল হলেও সাহেব দেখলেই তো যে কোন মিলিটারির লোক কথা বলবে। কথা বললেই ধরা পড়ে যাবে। তাছাড়া চেহারা দেখেও তো চিনতে পারবে।

লাস্ট ট্রেনের অপেক্ষায় ছিলেন গুরুদাস।

ট্রেন এল। কামরায় দু চারজন মিলিটারির লোক ছিল। তারা কেউ নামলো না। হয়তো মুরী যাবে, কিংবা ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের হেড কোয়ার্টার্সে, রাঁচিতে। প্যাসেঞ্জার সবই দেহাতি লোক।

প্লাটফর্মে পায়চারি করছিলেন গুরুদাস, আসলে ওঁর ভিতরের অস্থিরতায়।

আর তখনই একটা কামরা থেকে নামলো টি টি সি রাধেশ্যাম, সঙ্গে একটা গরীব দুঃস্থ দেহাতি লোক।

রাধেশ্যাম এগিয়ে এসে বললে, গুর্দাসজী, আপনার কি বুখারউখার কুছ হয়েছে?

গুরুদাস বিব্রত হয়ে বলে উঠলেন, না না কিছু হয়নি। ভালই আছি। কি খবর বলুন।

রাধেশ্যাম হাসতে হাসতে দেহাতি লোকটাকে দেখালো।—ইসকো গেট পার কর দিজিয়ে, টিকট নহি।

গুরুদাস ঠাট্টা করে বললেন, কত পেলে রাধেশ্যাম।

এ-রকম অনুরোধ দু'একটা শুনতে হয়। পুলিস ইনসপেক্টরটা সেবারে এসে যদি এভাবে বলতো, ছেড়ে দিতেন। লোকটা পাওয়ার দেখাতে গিয়েছিল বলেই রাগ। জি আর পি-তে লোক দুটোকে হ্যাণ্ডওভার করে দিয়েছিলেন।

—কত নিয়েছো ওর কাছে বলবে তো? গুরুদাস হাসতে হাসতে বললেন।

আর টি টি সি রাধেশ্যাম বললে, রামজীর কসম, কুছ নেহি। গুর্দাসজী, পয়সা জরুর নিই, লেকিন ডব্লু টি-র কাছে। এ গরীব বেচারী ট্রেনে ওঠার আগেই বললে, টিকটের পয়সা নেই, লেকিন লেড়কির বিমার।

গুরুদাস বললেন, হুঁ।

রাধেশ্যাম বললেন, আদমি যখন ভারোসা রাখে, গুর্দাসজী ও কাহানী শোনেননি? শিবি রাজা তো পক্ষীর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। এই উর্দি তো ডিউটি, লেকিন আন্দারমে আমিও ছোটাসে শিবিরাজা। বলে টি টি সি রাধেশ্যাম হো হো করে হেসে উঠল।

গার্ডের হুইস্‌ল বেজে গেছে, সবুজ আলো নড়ছে।

ট্রেন ছেড়ে দিল, আর রাধেশ্যাম দৌড়ে গিয়ে ট্রেনে উঠে পড়লো।

গুরুদাস ট্রেনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, ট্রেনের দিকে, নাকি টি টি সি রাধেশ্যামের দিকে।

ট্রেন মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। সিগন্যাল পড়ে ছিল, ঝটাং করে উঠে পড়লো, বুঝতে পারলেন সবুজ আলোটা লাল হয়ে গেছে আবার।

পি ও ডবলু ক্যাম্প অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সারা আকাশ জুড়ে তিন তিনটে সার্চলাইটের তীব্র আলো পরস্পরকে কাটাকুটি করে অন্ধকারে ঘুরছে। তন্ন তন্ন করে কি যেন খুঁজছে।

গুরুদাস নিজেও যেন গভীর অন্ধকারের মধ্যে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

রাধেশ্যামের কথাগুলো ঘুরছে ওঁর মাথার মধ্যে। আদমি যখন ভরোসা রাখে···শিবিরাজা তো পক্ষীর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। এই উর্দি তো ডিউটি, গুরুদাস নিজের বুশ কোটের বুকে হাত দিলেন, লেকিন আন্দারমে আমিও ছোটাসে শিবিরাজা।

—বাবা, লোকটা আমাদের বিশ্বাস করেছে, ভাবছে আমরা ওকে বাঁচাবো।

নীপার কথাগুলো মনে পড়লো।

গুরুদাস দেখতে পাচ্ছেন। লোকটা নীলডাউন হয়ে ওঁর সামনে জোড়হাত করে কি যেন বলছে। করুণ প্রার্থনার মত।—অনোরাতা। আঙুল তুলে আকাশের দিকে দেখাচ্ছে। হয়তো ঈশ্বরকে।

গুরুদাস ভাবলেন, ন্যায় অন্যায়ের বিচারক তো আমরা নই। কোন অপরাধ কত বড় সে বিচার করার শক্তি কি আছে আমাদের ? আমরা শুধু জানি একটা মানুষ বাঁচতে চাইছে। নির্ভর করে আছে।

ওকে বাঁচানো ছাড়া এখন আর কোনও উপায়ও নেই।

৯

ভোর সকালেই টাঙার আওয়াজ শুনতে পেলেন গুরুদাস। ঘোড়ার খুরের শব্দ। নীপাও শুনতে পেয়েছিল। ও জানালায় উঁকি দিয়ে দেখেই বলে উঠল, বাবা, ডাক্তারকাকু।

ওর গলার স্বরে উচ্ছ্বাস। যেন উনি এলেই সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এরই নাম নির্ভরতা। রোবের্তো হয়তো ঠিক এভাবেই ওদের ওপর নির্ভর করে আছে।

টাঙাটা এসে দাঁড়াল বাগানের ফটকের সামনে। মাধোলাল নেমে দাঁড়াল।

আর নীপা ততক্ষণে ফটকের সামনে। কিন্তু একটাও কথা বললো না।

ডাক্তার হাজরা এলেন। ওষুধের বাক্সোটা নামিয়ে রাখলেন। গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলছে। মুখে একটা থমথমে ভাব।

এক গ্লাস জল চাইলেন। নীপা দৌড়ে গিয়ে নিয়ে এল। যেন ওঁকে খুশি করতে পারলেই সব সুরাহা হয়ে যাবে।

গুরুদাস ডেকচেয়ারটা এগিয়ে দিলেন।—আরাম করে বসুন এখানে।

চারুবালাও এসে কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়েছেন।

সকলের মুখেচোখেই কেমন একটা বিনীত তোষামোদের ভাব।

এই ডাক্তার হাজরার সঙ্গে বহু দিনের ঘনিষ্ঠতা। একেবারে যেন একই পরিবারের লোক। প্রায়ই আসা-যাওয়া। একজনের বিপদে আরেকজনের উদ্বেগ। দীর্ঘদিন ধরে একটা আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

তবু একটা বিপদে পড়লেই মানুষ কেমন বদলে যায়। ডাক্তার হাজরা কিংবা তাঁর স্ত্রী যখনই বেড়াতে এসেছেন, একটা স্বাভাবিক আন্তরিকতার স্পর্শ পেয়েছেন। কিন্তু এখন ব্যবহারটা আর স্বাভাবিক নেই। কোথায় যেন একটা খুশি করার চেষ্টা।

ডাক্তার হাজরা অবশ্য তা লক্ষ্যও করলেন না। ঢকঢক করে জলটা খেলেন।

তারপর একটু চুপ করে থেকে বললেন, গুরুদাসবাবু, অনেক ভাবলাম কাল রাত্রে। একজনকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে আরেকজন বাঁচতে পারে না। সে বাঁচা মৃত্যুর সামিল। ইফ ইউ লীড ওয়ান টু ডেথ···

গুরুদাস বিব্রত গলায় বলে উঠলেন, আমি অতশত ভাবতে পারছি না, ডাক্তার হাজরা। শুধু বুঝতে পারছি ওকে না বাঁচাতে পারলে আমরাও বাঁচবো না।

সঙ্গে সঙ্গে নীপার মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল।—ওকেও বাঁচান ডাক্তারকাকু।

চারুবালার মুখেও হাসি।—ক'টা দিনে ছেলেটার ওপর এত মায়া পড়ে গেছে।

ডাক্তার হাজরা ধীরে ধীরে বললেন, বাঁচতে হলে এখন একটাই পথ। বাঁচাতে হবে।

—কিন্তু কি করে বাঁচাবেন ডাক্তারকাকু। নীপার গলার স্বর যেন চাপা কান্না।

ডাক্তার হাজরা বললেন, বোধহয় উপায় আছে।

গুরুদাস সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন, আছে? উপায় আছে? আমি তো শুধুই নিজের বাঁচার কথাই ভেবেছি। ওকে বাঁচাতে পারলে তবেই যে আমরা বেঁচে যাবো, একবারও মনে হয়নি।

ডাক্তার হাজরা বললেন, হ্যাঁ এখন একটাই উপায়। ওকে বাঁচাতে পারলেই সকলে বাঁচবে।

আর তখনই ইন্দ্র বললে, ও কোথায় যেন পৌঁছতে চায়, একটা ম্যাপ দেখাচ্ছিল। সেখানে পৌঁছতে পারলেই ও বোধহয় বেঁচে যাবে।

ডাক্তার হাজরা এলেন রোবের্তোর কাছে। নতুন লোক দেখে প্রথমটা ও হকচকিয়ে গিয়েছিল, ভয় পেয়েছিল। সপ্রশ্ন চোখে সকলকে ছেড়ে নীপার দিকে তাকিয়েছিল।

নীপার মনে হল রোবের্তো যেন ওকেই বিশ্বাস করেছে। ওর বোধহয় ধারণা হয়েছে নীপা থাকতে ওর কেউ ক্ষতি করবে না।

নীপা ওকে সান্ত্বনা দিল।—ডকটর, ডকটর। স্টেথিসকোপটা দেখালো। তারপর বললে, ফ্রেণ্ড।

রোবের্তো হেসে উঠল, সরল বালকের হাসি। হাতজোড় করে নমস্কার করলো।

আর ইন্দ্র ওর পকেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, ম্যাপ। ভিয়া, স্ত্রীত।

ম্যাপটার ওপর ডাক্তার হাজরাও ঝুঁকে পড়লেন।

আর ক্রশ চিহ্ন দেওয়া জায়গাটা দেখালো রোবের্তো। ডাক্তার হাজরা বলে উঠলেন, আবে এ তো ভুরকুণ্ডা। খুব ছোট্ট স্টেশন, ডাল্টনগঞ্জের দিকে।

রোবের্তো তাঁর মুখের দিকে তাকালো। বললে, ত্রেন্তি।

ওরা কিছুই বুঝলো না।

রোবের্তো ভুরু কুঁচকে কি যেন মনে করার চেষ্টা করলো। তারপর উল্লাসের সঙ্গে বলে উঠল ত্রেন, ত্রেন।

—ট্রেন বলছে।

হয়তো ঐ স্টেশনে ট্রেনে উঠবে, কোথাও নেমে যাবে। সেখানে গেলেই ও হয়তো মুক্ত। হয়তো আশ্রয় পাবে। বেঁচে যাবে।

আসলে এদিকের ট্রেনে তো উঠতে পারবে না, উঠলেই ধরা পড়ে যাবে। ওদিকটা একেবারে জঙ্গল। খনিটনি এখনো হয়নি, কয়লা খাদ নেই। শুধু দেহাতি লোকজন। প্যাসেঞ্জার বড় একটা থাকেই না। আশেপাশে এখনো গভীর বন। হয়তো ওখানেই কোন আশ্রয় আছে। তা না হলে ম্যাপ কেন।

গুরুদাস বললেন, ভাষা জানে না, ইংরেজ কিংবা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলে চালাতেও পারবে না নিজেকে।

আর ডাক্তার হাজরা বললেন, আমি সে কথা ভেবেছি। একটা উপায় আছে, তারপর ওর ভাগ্য।

গুরুদাস বলে উঠলেন, আমাদের চোখের আড়ালে যা হয় হোক, জানতেও পারবো না।

চোখের সামনে কিছু হলে তো বুকের মধ্যে একটা কাঁটা বিঁধে থাকবে।

বকশির কথাটা মনে পড়লো।—শুনেছেন গুরুদাসদা। প্রিজনার ক'টা কেন পালাতে গিয়েছিল? ব্রিটিশ টমি একজন, কি একটা অপমান করেছিল, প্রতিবাদ করতে গেছে ওরা। তার আবার বিচার হয়েছিল, শাস্তি কিছু হতো। কে জানে গুলি করে মেরেই দিত কিনা। চার্জ এনেছিল, রাইফেল কেড়ে নিতে যায়।

কে জানে সত্যি না মিথ্যে।

ডাক্তার হাজরা এতক্ষণ খবরটা চেপে রেখেছিলেন, কেন ভোর সকালেই ছুটে এসেছেন, তাও বলেননি। শুনলেই ওরা ভয় পাবে। তবু না বলে পারলেন না। হঠাৎ বলে উঠলেন, গুরুদাসবাবু, কাল রাত্রে বাজপেয়ীজীর বাড়ি সার্চ হয়েছে। ঠিকাদার লাহিড়ির বাড়ি। কিন্তু কেন তা কেউ জানে না।

সবারই মুখ হঠাৎ যেন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

রোবের্তো সপ্রশ্ন চোখে তাকালো ওদের সকলের মুখের দিকে। নীপার মুখের দিকে। তারপর আবার বললে, ভিয়া।

—ডাক্তারকাকু, ও রাস্তা জানতে চাইছে।

রোবের্তো ততক্ষণে ম্যাপের একটা জায়গা দেখালো। সেখানেও একটা চিহ্ন দেওয়া। বললে, স্ত্রীত।

ডাক্তার হাজরা বলে উঠলেন, আরে এ তো বুরাণ্ডি। বাস যায়। ঠিকই তো, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা চলে গেছে।

ইন্দ্র বলে উঠল, হ্যাঁ, হ্যাঁ ওঁরাও গাঁয়ের পাশ দিয়ে। ভুরকুণ্ডার দিকেই। ঘণ্টা কয়েকের হাঁটা পথ। আমরা একবার গিয়েছিলাম।

—কিন্তু এখান থেকে ও যাবে কি করে? গুরুদাস বললেন।

আর নীপা কাঁপা কাঁপা গলায় বলে উঠল, যুদ্ধটা যদি এক্ষুনি থেমে যেতো, সব এক নিমেষেই পাল্টে যেতো। না ডাক্তারকাকু? তখন তো শাস্তি হয়ে যেতো। ছাড়া পেয়ে যেতো সবাই।

একটু থেমে বললে, কি অদ্ভুত এই পৃথিবীটা, কি অদ্ভুত সব নিয়ম। একটা বানানো যুদ্ধ ব্যস, মানুষকে মানুষ ভাবা যাবে না। অথচ আজই যদি যুদ্ধ থেমে যায়, শত্রুও বন্ধু হয়ে যাবে। এখন আমাদের এত দুশ্চিন্তা, তখন ভাবতেও ভাল লাগবে একটা লোকের প্রাণ বাঁচিয়েছি।

নীপা সে কথাই ভাবছিল। সবই পোশাক, এক এক ধরনের ইউনিফর্ম। এখন মেজর হুইটলি ঘৃণার সঙ্গে বলে, ব্লাডি ফ্যাসিস্টস। তখন আর এসব কথা বলবে না। ঐ পিঠের ওপর ছাপটা তো মানুষের পরিচয় নয়। ওটা একটা যন্ত্র, অদৃশ্য, কিন্তু এক এক সময় তার প্রচণ্ড শক্তি। আমাদের সমাজটাও। মানুষকে কেবল দল বানিয়ে দিচ্ছে. ভাষার, ধর্মের, দেশের, আচারবিচারের, রাজনীতির। আরো কত কি। মানুষকে মানুষ থাকতে দিচ্ছে না। সব সময়েই যন্ত্রটা মানুষের পিঠে একটা ছাপ দিয়ে দিচ্ছে। একটা পোশাক পরিয়ে দিচ্ছে। যাতে তাকে মানুষ বলে কেউ চিনতে না পারে।

ডাক্তার হাজরা বললেন, ওকে বুরাণ্ডি পৌঁছে দিতে হবে। রাস্তাটা দেখিয়ে দিতে হবে। তা হলেই নিশ্চিন্ত।

ডাক্তার হাজরা বললেন, নীপা, ডোণ্ট গেট্ নার্ভাস। তোমার ওপরেই সব নির্ভর করছে।

—আমার ওপর? নীপা চমকে উঠল। ওর গলা কেঁপে গেল।

রোবের্তো কি ভাবছিল কে জানে। নিজের মনেই বিড়বিড় করে বললে. ইন লা সুয়া

ভোলেনতাতে এ নোস্ত্রা পাচে।

আজই। আজই রাত্রে চলে যাবে রোবের্তো। মুক্তির পথে। তারপরই গুরুদাসও মুক্ত। নীপা, ইন্দ্র, চারুবালা। সকলেই।

সব শুনে চারুবালার মুখ থমথম করছে।

ডাক্তার হাজরা ওঁকে শুনিয়ে শুনিয়েই সান্ত্বনা দিলেন।—আমি গিয়েই অনুপমকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ভাববেন না, শুধু আপনার ছেলেমেয়েকেই বিপদের মুখে ঠেলে দিলাম।

বিপদ ভাবলেই বিপদ। ও তো আমাদের ছেলেও হতে পারতো, তখন কি বিপদ মনে হতো? বলুন আপনি।

নীপার দু'চোখে জল এসে গেল।—ডাক্তারকাকু, আপনি কি ভাল।

ডাক্তার হাজরা ওর ছেলেমানুষি আবেগে হেসে উঠলেন।

আর নীপা দৃঢ়স্বরে বললে, আমি পারবো, হ্যাঁ পারবো।

তারপর বললে, না না ডাক্তার কাকু, আমিই অনুপমকে গিয়ে বলছি।

আপনি বলবেন না, আমি, আমি বলবো।

ডাক্তার হাজরা, গুরুদাস, চারুবালা, নীপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ইন্দ্র বললে, আমি চললাম, রাঁচি, এই বাসেই। বিকেলের বাসেই ফিরবো। যা যা আনতে বলছেন!

ইন্দ্র চলে গেল।

নীপা এসে ঢুকলো রোবের্তোর ঘরে। এই প্রথম একা।

এসে দেখল তাপ্পি মারা সেই শার্ট-প্যান্ট পরে রোবের্তোচেয়ারে বসে দু'উরুর ওপর ম্যাপটা মেলে ধরে দেখছে।

ম্যাপ, ম্যাপ, ম্যাপ। মুহূর্তের জন্যে নীপার সমস্ত শরীর যেন জ্বলে উঠল। অকৃতজ্ঞ।

নীপা ভেবেছিল, ওকে দেখেই রোবের্তোর মুখ উৎফুল্ল হাসিতে ভরে যাবে। ওর নীল তারা চোখের মধ্যে একটা প্রতীক্ষার ছায়া দেখতে চেয়েছিল।

নীপার মনে হল, বোবের্তোর মন থেকে ও মুছে গেছে। এখন ও শুধু মুক্তির স্বপ্ন দেখছে। জীবনের স্বপ্ন।

রোবের্তো ম্যাপটা ভাঁজ করে উঠে দাঁড়াল। চেয়ারটা দেখিয়ে বললে, সীত।

—কি আব্দার। নীপা বললে নিজের মনেই। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

রোবের্তো আজই চলে যাবে। চিরদিনের জন্যে। আর কখনো দেখা হবে না। নীপার বুকের মধ্যে একটা চাপা ব্যথা যেন গুমরে উঠছে। বেঁচে আছে কিনা জানতে পারবে না। নিরুদ্দেশের অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। কিংবা হঠাৎ যদি যুদ্ধ থেমে যায় নিজের দেশেই ফিরে যেতে পারবে। তখন শুধু ক্ষমা।

এই কটা দিন, নীপা বেশ বুঝতে পারছে, ওর জীবনে শুধু একটা স্মৃতি হয়ে থাকবে। দেবশিশু বাবা বলেছিল। নীল চোখ, সোনালী চুল, সরল নিষ্পাপ হাসি।

নীপার হঠাৎ মনে হল, এর সঙ্গে কথা বলার আর কোন মূল্য নেই। ও এখন শুধু একটা ম্যাপের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। পথ-ঘাট, ছোট্ট স্টেশন, গুপ্ত আশ্রয় কোন।

নীপা চলে আসছিল। রোবের্তো ডাকলো, জুলিয়েত্তা।

ফিরে দাঁড়াল ও।

রোবের্তো মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো ওর দিকে। ওর লুটিয়ে পড়া চুলের দিকে। এগিয়ে এসে ওর চুলের গুচ্ছ হাত দিয়ে স্পর্শ করলো।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমার্কর।

কৌতুকের হাসি ঠোঁটে দুলিয়ে সপ্রশ্ন চোখে তাকালো নীপা।

—আমার্কর ? হোয়াট ইজ আমার্কর ? নীপা কৌতুকে হাসল।

আর রোবের্তো ভুরু কুঁচকে শব্দটা খুঁজছে, খুঁজছে। তারপর বলে উঠল, রিমেম···রিমেমবার।

রিমেমবার ?

কি বলতে চাইলো ও। আমি মনে রাখবো। নাকি জিজ্ঞেস করছে, তুমি মনে রাখবে কি ? কে জানে কি অর্থ।

শুধু আমার্কর কথাটা নীপার মনের মধ্যে রয়ে গেল। আমার্কর, আমার্কর।

নীপার মনের মধ্যে এখন একটা দুরন্ত সাহস এসে স্থির হয়ে আছে। এখন আর ওর কোন ভয় নেই।

গুরুদাস কিন্তু অস্থির হয়ে পড়েছেন। ভয় পাচ্ছেন।

বারবার জিজ্ঞেস করেছেন, পারবি তো নীপা।

তারপর নিজের মনেই বলেছেন, আমিই তো যেতে পারতাম।

নীপা বুঝতে পেরেছে, বাবা ওদের এই বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাইছে না। হয়তো ভাবছে, আমি নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ছেলে মেয়েকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছি।

কিন্তু নীপার তো ভয় করছে না। ওর বুকের ভিতরটা কি করে যেন ভয়ঙ্কর বিশুদ্ধ হয়ে উঠেছে। যেন একটা দুঃসাহসিক কাজের মধ্যে নিজেকে পবিত্র করে তুলছে।

চারুবালার মুখ থমথম করছে। সংসারের কাজে ব্যস্ত থাকতে থাকতে হঠাৎ এক একটা কথা বলে উঠছেন।

বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। কি যে করছিস তোরা।

নীপা হেসে উঠল, কেন মিথ্যে ভয় পাচ্ছো মা। কিচ্ছু হবে না।

একটু থেমে বললে, তোমার ছেলে তো আজ চলে যাবে।

চারুবালা কোন কথা বললেন না। ওঁর মনের মধ্যে এখন ইন্দ্র আর নীপা। এত মায়া মমতা রোবের্তোর জন্যে, ওকে বাঁচানোর গোপন ইচ্ছে, সব চাপা পড়ে গেছে দুর্ভাবনার নীচে।

হঠাৎ বললেন, খুব সাবধানে যাবি মা।

একটু থেমে বললেন, ভাবতেও আমার বুক কাঁপছে।

দুটো হাত কপালে ঠেকালেন।

গুরুদাস চিন্তিত মুখে খাকি ইউনিফর্মটা পরলেন। নীপার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর স্টেশনে চলে এলেন।

গুরুদাসের মনের মধ্যে তখন তোলপাড় চলছে।

গুরুদাস প্লাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন। চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন।

মনে মনে ভাবলেন আমি কেন এত ভয় পাচ্ছি। কই, নীপা কিংবা ইন্দ্র তো ভয় পাচ্ছে না। ওরা তো আরো অনেক বেশি ঝুঁকি নিচ্ছে। আমাকে বাঁচানোর জন্যে। ঐ প্রিজনারটাকে না বাঁচালে আমি বাঁচবো না বলে।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নিজের ইউনিফর্মটা দুহাতে খামচে ধরলেন। যেন ওটাই দায়ী।

হ্যাঁ, এই ইউনিফর্মটাই। ওটাই আমাদের ভয় পাওয়ায়।

গুরুদাসের মনে পড়ছে, প্রথম যেদিন বণ্ড সই করে ডি অফ আইয়ে জয়েন করলেন, এই খাকি বুশকোট আর প্যাণ্ট নিয়ে এলেন, নীপা বলছে, বাবা পরো না একবার, কেমন দেখায় দেখবো একবার।

নীপা হাসছে। চারুবালা হেসে লুটিয়ে পড়ছেন।

আর নীপা বলছে, মা দ্যাখো, বাবাকে কেমন অন্যরকম দেখাচ্ছে।

অন্যরকম। ঠিকই তো।

এটাই আমাদের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। আইনের মধ্যে, নিয়মকানুনের মধ্যে বেঁধে ফেলে। তখন আর তা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় থাকে না।

ইন্দ্র আর নীপা বলেছিল, সমাজ রাষ্ট্র রাজনীতি যুদ্ধ সবাইকে এক একটা ইউনিফর্ম পরিয়ে দেয়। তখন আর কেউ মানুষ থাকে না। মানুষকে মানুষ বলে চিনতে পারে না। কেবল ভয় দিয়ে শাসন করে। মানুষকে সঙ্কীর্ণ একটা গণ্ডীর মধ্যে আটকে রাখে। ঐ তিনতলা সমান উঁচু জাল আর কাঁটাতারে ঘেরা খাঁচাটার মতো। চোখ মেলে সব কিছু দেখতে পায়, কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারে না! সে নিজেই নিজের মধ্যে বন্দী হয়ে যায়।

সকলের গায়েই একটা করে পোশাক। ধর্মের, ভাষার, জাতির, দেশের।

ওটা না থাকলেই আমরা মুক্ত। আমরা একই পরিবারের লোক। ঐ রোবের্তোর মতোই। তখন আর কেউ ঘৃণার স্বরে বলে ওঠে না, ড্যাম্‌নড ফ্যাসিস্ট। তখন কারো পিঠে কোন ছাপ থাকে না। কারো মনে কোন ভয় থাকে না।

এই তো সেদিন দেশ জুড়ে আন্দোলন হয়ে গেল। করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে। ডু অর ডাই। 'গুরুদাসদা, শুনেছেন, আই এন এ নাকি ইণ্ডিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে!' 'আরে রাখুন মশাই, ওরা দেশের শত্রু।'

পোশাক, রাজনীতির পোশাক।

ঐ ইউনিফর্ম পরলেই পরস্পরকে অবিশ্বাস। পরস্পরকে ভয়। সন্দেহ।

—বাবা, একদিন তো যুদ্ধ মিটে যাবে। সব বন্ধু হয়ে যাবে। তখন কি মানুষের অনুশোচনা হবে না।

রাজনীতির ছাপটাও মুছে যাবে একদিন। পোশাকের ভিতর থেকে মানুষগুলোই তো বেরিয়ে আসবে।

গুরুদাস ভাবতে ভাবতে কোথায় যেন চলে গিয়েছিলেন।

হঠাৎ তন্ময়তা ভাঙলো। সেই দেহাতি কুলিকামিনের দল কোমর জড়াজাড়ি করে গান গাইতে গাইতে রেল লাইন টপকে টপকে আসছে। উদ্দাম হাসি, গান।

ধীরে ধীরে ওরা প্লাটফর্মে উঠল। হাসাহাসি করতে করতে গান গাইতে গাইতে পার হয়ে গেল।

তাকিয়ে রইলেন গুরুদাস। তাকিয়ে থাকতে থাকতে অস্ফুটে বলে উঠলেন, ব্ল্যাক গডেস।

মনে মনে বললেন, ওরা সুখী, ওদের কোন ইউনিফর্ম নেই। ওরা শুধুই মানুষ।

ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গুরুদাসের চোখ অনেক দূরে চলে গেল। একেবারে আকাশের কোলে কুয়াশায় ঢাকা পাহাড়ের ঢেউ, নীলাভ সবুজ বনের আভাস, দূর পাহাড়ের নির্ঝরে রোদ্দুর ঠিকরে পড়া রুপোর ঝরনা। আর খোলা আকাশ।

ধীরে ধীরে অফিস-ঘরের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন গুরুদাস।

১০

সন্ধ্যা ঘন হয়ে নামলেই এদিকটা একেবারে অন্ধকার। কোথাও কোন আলো নেই। পীচের রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায় না। রুক্ষ মাঠ, শাল মহুয়ার কুণ্ডলী, দূরের শনিচারীর হাট,

কিংবা শিউজীর মন্দির—কিছুই দেখা যায় না। বড়জোর দূরের কোন ঠিকাদারের বাড়িতে পেট্রোম্যাকস জ্বলে। এদিকটায় কোন ইলেকট্রিকের আলো নেই।

রেল কোয়ার্টারের সারিও আবছা-অন্ধকারে ঢাকা। দু' একটা কোয়ার্টার থেকে খোলা জানালার ভেতর দিয়ে যেটুকু কম পাওয়ারের বাল্ব থেকে আলো ছিটকে আসে, কিংবা প্লাটফর্ম থেকে ছড়িয়ে পড়ে।

পাশাপাশি মিলিটারি ক্যাম্প কিংবা জাল আর কাঁটাতারে ঘেরা পি ও ডবলুদের খাঁচার দিকটা আলোয় উজ্জ্বল। যতটা না আলো পড়ে, কালো ঠুলি পরানো আলো, কিন্তু দূর থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ আলোর বিন্দুগুলো দেখা যায়। আর তিনটে তীব্র সার্চ লাইট সারা আকাশ চক্র দিয়ে ঘোরে। পরস্পর পরস্পরকে কাটাকুটি করে কি যেন তন্ন তন্ন করে খোঁজে। কখনো কখনো এল এম জির অকারণ গুলিবর্ষণ, কখনো অ্যান্টি-এয়ারক্র্যাফট গান থেকে এক ছড়া বিদ্যুতের বর্শা অকারণেই আকাশকে ছিন্ন ভিন্ন করে।

নীপা সেই ফেলে আসা আলোর দিকেই তাকিয়ে আছে।

পীচের রাস্তা এখন নির্জন, নিঃশব্দ। অনেক পরে পরে হঠাৎ ঠিকাদারদের এক একটা লরি গর্জন করতে করতে হেড-লাইটের বিদ্যুৎ ছড়িয়ে নিমেষের মধ্যে ওদের পার হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

হেড-লাইটের আলো পড়লেই নীপার ভয়।

পীচের রাস্তায় ক্লপ-ক্লপ, ক্লপ-ক্লপ ধ্বনি তুলে টাঙাটা ছুটে চলেছে। ঘোড়ার খুরের শব্দ। নীপার বুকের মধ্যেও। কিসের শব্দ নীপা বুঝতে পারে না। ভয়, না অন্য কিছু।

কি সাংঘাতিক একটা ঝুঁকি নিয়ে বসেছে ওরা। রোবের্তো বাঁচবে, বাবা বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে। সে জন্যে ভয়ের সঙ্গে একটা অদ্ভুত আনন্দও যেন জড়িয়ে রয়েছে।

ডাক্তার হাজরা হঠাৎ বললেন, ডোণ্ট গেট নার্ভাস, নীপা। ভয়ের কিছু নেই। ভয় ভাবলেই ভয়।

অনুপম বললে, তুমি তো ওর নাম দিয়েছো মিস তুফান মেল। ওর আবার ভয় কি। আমরা তো আছি।

নীপার মনে হল অনুপম যেন ওর হাতখানা ছুঁয়ে বলছে, আমি তো আছি।

না, অনুপম নয়। রোবের্তোর হাত। ওর হাতের ওপর রোবের্তো হাল্কা করে তার হাতটা রাখলো। নীপা কি হাতটা সরিয়ে নেবে ? রোবের্তোর হাত কি কিছু বলতে চাইছে ? ভয়ে আশ্বাস, নাকি নিজেই ভয় পাচ্ছে।

নীপা বুঝতে পারছে ওর বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ, আর অদ্ভুত বিষাদ জড়িয়ে আছে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজটা যেন ওর বুকের মধ্যে। আনন্দ, বিষাদ আর ভয় একসঙ্গে মিশে আছে।

টাঙার পিছনের আসনে বসে আছে নীপা। শক্ত হাতে হাতল ধরে আছে। আর ওর পাশেই রোবের্তো।

টাঙাটা ছুটে চলেছে অন্ধকারের মধ্যে। পীচ রাস্তা ধরে।

স্টেশন, স্টেশন প্লাটফর্ম আলোয় ছায়ায় যেটুকু দেখা যায়, পিছিয়ে যেতে যেতে ক্রমশ ছোট হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। কোয়ার্টারের সারি এখন আর দেখা যাচ্ছে না।

মা হয়তো এখনো দাঁড়িয়ে আছে খিড়কির দরজায়। কিছুই দেখা যাবে না, তবু। বাবা হয়তো প্লাটফর্মে অস্থির হয়ে পায়চারি করছে।

সামনের রাস্তা অন্ধকার। ইন্দ্র মাঝে মাঝে টর্চ জ্বেলে আলো ফেলছে। টাঙার আলোয় সামনের পথ স্পষ্ট দেখা যায় না।

সকলেই আবার চুপচাপ।

হেডলাইটের তীব্র আলো জ্বেলে একটা লরি বিদ্যুৎগতিতে ওদের পার হয়ে গেল।

লরিকে ভয় নেই, শুধু মিলিটারি ট্রাককেই ভয়। যদি রোবের্তোর মুখে আলো পড়ে। আলো পড়লেই কি মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারবে, বুঝতে পারবে। তবু আলো পড়লেই ভয় পাচ্ছে নীপা।

লজ্জা আর অস্বস্তি, আনন্দ আর ভয়—সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

রাগে অভিমানে অনুপম যেন তখন একটা আগ্নেয়গিরি।

—শোন অনুপম, মানুষকে বুঝতে চেষ্টা করো। বাইরের ব্যবহার কিংবা মুখের কথাটাই সব নয়। সে যখন হাসে, কথা বলে, তখন তার মনের মধ্যে কি চলছে তুমি জানো?

শিউজীর মন্দিরের ছায়ামাখা সিঁড়িতে বসেছিল অনুপম।

ওকে দেখেই যেন রাগে ছিটকে বেরিয়ে যেতে চাইলো। ও খপ করে অনুপমের হাতটা ধরলো।—অনুপম, আমি, আমরা ভীষণ বিপদে পড়ে গেছি।

নীপার গলার স্বরে এমন কিছু ছিল, অনুপম উৎসুক হয়ে তাকালো। বিপদ?

—হ্যাঁ। তোমাকেও বলতে পারিনি, বলতে পাইনি।

সব শুনে অনুপম স্থির হয়ে গেছে।

নীপা বোঝাতে চেয়েছে, রোবের্তোকে বাঁচালে তবেই ওরা বাঁচবে।

আর অনুপম বলছে, আমি ওসব কিছুই জানি না নীপা, আমি শুধু তোমাকে জানি।

নীপার মুখ তখন খুশিতে ভরে উঠেছে। ধীরে ধীরে বলেছে, এ তো আমাকেই বাঁচানো। অনুপম, পারবে না তুমি?

তারপর ওরা ছুটতে ছুটতে ডাক্তার হাজরার কাছে গেছে। কুয়ো তলাটার পাশ দিয়ে। দড়ি টেনে টেনে তখন দেহাতি মেয়েরা কুয়ো থেকে জল তুলছে, শিউজীর মাথায় চড়াবে বলে।

ডাক্তারকাকু নিজেই টাঙা চালিয়ে চলেছেন। পাশে বসে আছে ইন্দ্র আর অনুপম।

নীপা ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিল, অস্বস্তি। বিশেষ করে অনুপমের সামনে।

আর অনুপম হাসতে হাসতে বলেছে, এ তো অভিনয়।

নীপা নিজেও তাই ভেবেছিল। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে শুধু অভিনয় নয়। এই মুহূর্তে রোবের্তোর পাশে বসে ওর মন এত খুশি হয়ে উঠছে কেন? রোবের্তো একটু পরেই চলে যাবে সে-কথা ভেবে ওর মন বিষাদে ভরে যাচ্ছে কেন। শুধুই কি অভিনয়।

টাঙার পিছনে বসে আছে নীপা, নীপার পাশে রোবের্তো।

নীপা তাকিয়ে আছে পিছনের ফেলে আসা রাস্তার দিকে, স্মৃতির দিকে।

সব, সব মনে পড়ছে একে একে।

ঐ তো পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়লো লোকটা। উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে বিভ্রান্তের মতো। ওদের দেখে ভয় পেয়ে গেছে।

হাতজোড় করে নমস্কারের ভঙ্গি করছে।

আর কিছুক্ষণ। তারপর রোবের্তো চলে যাবে চিরদিনের জন্যে। আর কোনদিন দেখা হবে না। জানতেও পারবে না ও কোথায় কোন প্রান্তে আছে। বেঁচে আছে কিনা। আর যদি যুদ্ধ থেমে যায়, যুদ্ধ থেমে গেলে ও পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মধ্যে মিশে যাবে। পৃথিবীর যে-কোন মানুষ তখন নীপার কাছে একজনই—রোবের্তো।

ক্লপ-ক্লপ ক্লপ-ক্লপ ঘোড়ার খুরের শব্দ। টাঙাটা এগিয়ে চলেছে। সকলেই চুপচাপ। কারো মুখে কোন কথা নেই। যেন আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে আছে সকলে।

যে-কোন মুহূর্তে একটা অঘটন ঘটে যেতে পারে। যে-কোন মুহূর্তে একটা মিলিটারি জীপ কিংবা একটা অতিকায় ট্রাক এসে ওদের পথরোধ করে দাঁড়াতে পারে।

ক্রমশই অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। নীপার কাছ থেকে ঐ ফেলে আসা পি ও ডব্লু ক্যাম্প অনেক দূরে সরে গেছে। শুধু অন্ধকারের মধ্যে আলোর পুষ্পগুচ্ছ হয়ে জ্বলছে। আর সেই তিনটে তীব্র সার্চলাইটের আলো আকাশের গায়ে পরস্পরকে কাটাকুটি করছে। শত্রুপক্ষের প্লেন যদি হঠাৎ এসে পড়ে সেজন্যেই।

নীপার মনের মধ্যেও একটা তীব্র সার্চলাইট কি যেন তন্ন তন্ন করে খুঁজছে।

ঐ তো লোকটা অনুনয়ের স্বরে বলছে, সেভ। মার দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে হাসছে। বলছে, অনোরাতা। অনোরাতা।

নীপার ভাবতে ভাল লাগছে একটা মানুষকে বাঁচাতে পারছে ও। মানুষ, মানুষই তো, তার বেশি কিছু নয়।

ডাক্তার হাজরার স্বগতোক্তি শোনা গেল, তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। বাসটা না আগেই এসে পড়ে। সুরলিং পৌঁছলে তবেই থামবে। এখানে হাত দেখালেও থামবে না।

একটু থেমে বললেন, বাস যদি চলে যায়, তা হলেই সর্বনাশ।...

বাসটা পিছন থেকেই আসবে। কিন্তু রামগড় থেকে উঠতে সাহস পায়নি ওরা। কেউ যদি দেখে ফেলে, কেউ যদি চিনতে পারে।

অনুপম টর্চের আলোয় ঘড়ি দেখে বললে, এখনো সময় আছে।

রোবের্তো বুকে আঙুল ঠুকে বলছে, ফ্রেন্দ ফ্রেন্দ। নীপার দিকে, ইন্দ্রর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলছে, ইউ ফ্রেন্দ। নীপা যেন দেখতে পাচ্ছে।

ফ্রেণ্ড। বন্ধু। সমস্ত মানুষই হয়তো পরস্পরের বন্ধু। তা না হলে রোবের্তোর জন্যে ওদের এত মায়া কেন। ও গুলি খেয়ে মরবে এই ভয়ে ওদের এত কষ্ট কেন।

মানুষ যতক্ষণ দূরে, অপরিচিত, একটা দল, ততক্ষণই তার পিঠে একটা ছাপ, গায়ে একটা ইউনিফর্ম। বিদেশী। বিধর্মী। ওদের ভাষা অন্য। কোন্ বাংলা ? কোন্ জেলা ? আরো কত রকমের পোশাক। ঘরের কোণে ছুটে এলেই, আশ্রয় নিলেই, সে মানুষ।

গুরুদাস বলেছিলেন, মেজর হুইটলিকে কথাটা বলার সুযোগই পেলাম না।

সত্যি কি তাই ? না, বাবারও ভিতরে ভিতরে ছেলেটার জন্যে মায়া। যদি কোন রকমে বেঁচে যায় সেই ইচ্ছে। —একেবারে বাচ্চা ছেলের, ইন্দ্রর মতোই। কি কচি মুখ। একেবারে দেবশিশু।

নীপার মনে হচ্ছে, আসলে বাবা ওকে বাঁচাতেই চেয়েছিল। ভীতু দুর্বল মানষের অসহায় বাসনা। তাই ওকে ধরিয়ে দেবার, খবর পৌঁছে দেবার সুযোগ তৈরি করে নিতে পারেনি। সব অজুহাত, অজুহাত। নিজের সঙ্গে নিজের প্রবঞ্চনা।

—মা দ্যাখো দ্যাখো, ওর চোখের তারা কি সুন্দর নীল। আমাদের মত কালো নয়। নীপা বলে উঠেছিল।

চারুবালা হেসেছেন।—সত্যি রে। ওদের কি করে যে অমন নীল হয়।

সুন্দর আর নীল। নীপা সুযোগ পেলেই মুগ্ধ হয়ে আড়চোখে তাকিয়ে দেখতো। এখন সেটাই সবচেয়ে বড় ভয়। যদি কারো চোখে পড়ে।

এ সময়ে বাসে বেশি যাত্রী থাকে না। বেশির ভাগই দেহাতি ওঁরাও মুণ্ডা কুলিকামিন, কিছু গেঁয়ো চাষী। কিন্তু ভদ্রলোক কেউ থাকতেও তো পারে। আর রোবের্তো হঠাৎ যদি কোন কথা বলে ওঠে।

—লুত্তো, লুত্তো। রোবের্তো বলছে। নীপার চোখের দিকে ইশারা করে। চুল দেখিয়ে ইন্দ্র হাসছে।—ওর কালো চুল ভাল লাগে রে। কালো চোখ।

রোবের্তো হাতটা নীচের মুদ্রার মত ঢেউ খেলিয়ে বুঝিয়েছে, ঢেউ খেলানো লম্বা চুল ওর খুব সুন্দর লাগছে।

নীপার তখন অসীম লজ্জা। রূপের প্রশংসা করছে। তাও দাদার সামনে। কি বোকা। কি [illegible]হায়া।

এখন মনে পড়তেই ভাল লাগলো।

—না না আমি পারবো না। ডাক্তার হাজরার কথা শুনেই নীপা বলে উঠেছিল। এত আতঙ্কের মধ্যেও ব্যাপারটা মনে হয়েছিল কি অসম্ভব, কি লজ্জার।

অনুপমের চোখের সামনে এই অভিনয়। এখন অনুপম কি ভাবছে কে জানে। ওর বুকের কোথাও কি একটা কাঁটা বিঁধছে!

—ঐ তো সুরলিং দেখা যাচ্ছে। এসে গেছি আমরা। ডাক্তার হাজরা বলে উঠলেন।

ইন্দ্র বললে, ঐ তো দূরে আলো। লাইম ফ্যাক্টরির আলো।

ডাক্তার হাজরা টাঙা চালাতে চালাতে জিজ্ঞেস করলেন, বাসের হেড-লাইট দেখতে পাচ্ছো?

না। নীপা পিছনের অন্ধকার রাস্তার দিকে তাকিয়ে দুটো উজ্জ্বল আলোর বিন্দু খুঁজলো। পেলো না।

ক্লপ-ক্লপ-ক্লপ-ক্লপ। টাঙা এসে থামল। সুরলিং বাস দাঁড়াবার জায়গায়। না, কোথাও কোন লোকজন নেই। এই সময়ে কমই থাকে।

একটা হেডলাইট দেখা গেল। হেডলাইট দেখলেই ভয়। জীপ কিংবা মিলিটারি ট্রাকও হতে পারে।

এখন আরো ভয়।

চলন্ত টাঙায় হেডলাইটের আলো পড়লেও হয়তো চিনতে পারতো না। এখন তো রাস্তার ধারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নীপার বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন করে উঠল। একটা ছোট্ট আলোর বিন্দু দ্রুত বড় হয়ে উঠছে, বড় তীব্র আর উজ্জ্বল।

—ডাক্তারকাকু, মিলিটারি ট্রাক। নীপার গলা কেঁপে গেল।

কেউ কোন কথা বললো না। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। কোথায় পালাবে? ডাক্তার হাজরা দূরে, টাঙায় উঠে বসেছেন। যেন টাঙা চালাচ্ছেন।

ওরা নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। হেডলাইটের তীব্র আলো ক্রমশই ওদের যেন গ্রাস করছে। অন্ধকারের মধ্যে স্পষ্ট করে তুলছে ওদের।

অতিকায় ট্রাকটা এগিয়ে আসছে।

ওরা রাস্তার ধার ঘেঁষে সরে দাঁড়াল। এই ট্রাকগুলো মানুষকে মানুষ বলে মনে করে না। হয়তো চাপা দিয়ে চলে যাবে। কিংবা তার চেয়েও ভয়ঙ্কর। অন্ধকারে নির্জনতায় মেয়েদের কাছে ওরা তো আরো ভয়ঙ্কর। নানা জায়গা থেকে ছুটকো দু'-একটা খবর ভেসে আসে। খবর না গুজব কে জানে!

কিন্তু এখন নীপার সে ভয়ও নেই; এখন একটাই ভয়।

নীপার হঠাৎ মনে হল ট্রাকটা যেন স্পীড কমিয়ে দিয়েছে। ক্রমশই ধীরে ধীরে এগোচ্ছে।

—নীপা, তুমি আড়ালে থাকো। ওদের কোন বিশ্বাস নেই। অনুপমের গলার স্বর বিভ্রান্ত।

থরথর করে কাঁপছে নীপা। ওরা কি রোবের্তোকেই খুঁজতে বেরিয়েছে, নাকি রাঁচির দিক থেকে সৈন্য নিয়ে চলেছে।

হঠাৎ মিলিটারি ট্রাক থেকে সৈন্যদের একটা বিকট উল্লাস ভেসে এল।

সঙ্গে সঙ্গে নীপা যেন নিজের জন্যেও ভয় পেল।

ট্রাকটা ওদের সামনে এসে পড়লো, এক্ষুনি যেন থেমে পড়বে। না, আমেরিকান সৈন্য বোধ হয়।

ওরা অশ্লীলভাবে নীপার দিকে তাকিয়ে চুমু ছুঁড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করে অট্টহাস হেসে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্রাকের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নীপার বুকের ভেতরটা তখনো টিপ টিপ করছে। কারো মুখে কোন কথা নেই।

নীপা তাকিয়ে দেখল ট্রাকের পিছনে লাল আলোটা আর দেখা যাচ্ছে না।

নিশ্চিন্ত।

অন্য সময়ে হলে—ইন্দ্র, ডাক্তারকাকু, অনুপমের সামনে এই নোংরামির দৃশ্যে ও লজ্জায় মরে যেতো। এখন শুধু পরিত্রাণ পেয়েছি ভেবেই নিশ্চিন্ত।

—বাস আসছে বাস। নীপা হঠাৎ বলে উঠল।

দেখলেই চেনা যায়, জীপ বা ট্রাকের মতো অতখানি তীব্র সাদা আলো নয়। হলুদ হলুদ।

লাইট পোস্টের আলোর আড়ালে অন্ধকার মেখে ওরা দাঁড়াল। শুধু ইন্দ্র একা, আলোর নীচে।

ডাক্তার হাজরাকে দেখলে বাসের দেহাতিগুলোও চিনে ফেলতে পারে। সেজন্যেই উনি টাঙা নিয়ে পিছিয়ে গেলেন।

একজোড়া ক্রুদ্ধ চোখের মত হেডলাইট এগিয়ে আসছে, ক্রমশ বড় হচ্ছে. নীপা শ্বাস রোধ করে তাকিয়ে রইলো।

না, শুধুই একটা ঠিকাদারের লরি। মালপত্র নেই, অনেকগুলো কুলিকামিন তার পিছনে হল্লা করতে করতে পার হয়ে গেল।

নীপার এখন অবশ্য নিজের জন্যে ভয় নেই। এখন শুধু রোবের্তো.

রোবের্তো একটাও কথা বলছে না। ওকে বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছে। অদ্ভুত সুন্দর। কেমন যেন অন্যমনস্ক। নীপা আড়চোখ তাকিযে দেখল।

—নীপা, ভয় পেয়ো না। হাসবে। কেউ যেন সন্দেহ করতে না পারে। ডাক্তার হাজরা সাবধান করে দিলেন।

অনুপম হাসতে হাসতে বলেছিল, এ তো শুধু অভিনয়।

শুধু অভিনয় ? নীপার বুকেব ভিতরটা ক্রমশই যেন বিষাদে ভবে যাচ্ছে। রোবের্তো চলে যাবে, হারিয়ে যাবে, আর একটু পরেই।

বাস এল। বাস থামলো।

ভিতরে দেহাতিদের কিচিরমিচিব।

ইন্দ্র প্রথমেই উঠে ভিতরটা দেখে নিল। সে-রকমই কথা ছিল। যদি কোন চেনালোক থাকে. কিংবা কোন ভদ্রলোক।

—উঠে আয়।

একে একে সকলেই উঠে পডলো। সামনের দবজা দিয়ে। যাক্. নিশ্চিন্ত। সামনের সীটগুলো খালি। ঠিক ড্রাইভারের পিছনের সীট।

রোবের্তো আর নীপা পাশাপাশি বসল। ঠিক পিছনের সীটে ইন্দ্র আর অনুপম।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেহাতি যাত্রী জনকয়েক। বেশিব ভাগই মেয়ে। পিছনের সীটে চাষী গোছের হিন্দুস্থানী মেয়েপুরুষ। ইন্দ্র ভাল করে দেখে নিল।

তাদের মধ্যে থেকে কে যেন বলে উঠল, দুলহন। দেহাতি মেয়েগুলো হেসে উঠল।

নীপা নিশ্চিন্ত হল। কণ্ডাক্টরও বুঝতে পারেনি। আপ্যায়ন করে সামনেব সীটে বসিয়েছে।

ইন্দ্র টিকিটের পয়সা দিয়ে বললো, বুরাণ্ডি।

কণ্ডাক্টর এত দেরী করছে কেন টিকিট দিতে। নীপার বুক দুরদুর করলো।

না, কণ্ডাক্টর টিকিট দেবার অছিলায় নীপাকেই দেখছিল। রোবের্তোকে নয়। রোবের্তো মুখ ফিরিয়ে জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে।

আর তো মাত্র মিনিট পনেরোর পথ। পৌঁছলেই মুক্তি।

নীপা বলেছিল, ওর চুল দেখলেই তো চিনে ফেলবে, ডাক্তারকাকু।

ডাক্তার হাজরা হেসেছেন। নিজের মাথাটা এগিয়ে দিয়ে বলেছেন, লুক হিয়ার, কোনদিন জানতে পেরেছো?

বলে গুরুদাসের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, অল ব্ল্যাক। কিন্তু আসলে, বুঝলেন গুরুদাসবাবু, অল হোয়াইট।

সবাই অবাক হয়ে গেছে, হেসে উঠেছে।

নীপা দেখতে পাচ্ছে, দাদার দাড়ি কামানোর আয়নায় নিজের চুল দেখছে রোবের্তো। কালো চুল। হাসছে।

সদ্য দাড়ি কামিয়ে রোবের্তোকে তখন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। সত্যি দেবশিশু।

তারপরই হেসে লুটোপুটি সবাই।

ডাক্তারকাকু বলেছিলেন, একেবারে বর সাজিয়ে নিয়ে গেলে হয়। বর-কনে। কপালে চন্দনের টিপ, মাথায় টোপর। কি বলো নীপা।

নীপা অস্বস্তিতে, ভয় পেয়ে বলে উঠেছে, না না, আমি পারবো না। সমস্ত ব্যাপারটাকে কল্পনায় ভেবে নিয়ে হেসে ফেলেছে। —অসম্ভব।

ডাক্তার হাজরা আশ্বস্ত করেছেন, আরে না না। অতসব দরকার নেই।

ইন্দ্র ওকে ধুতি পরিয়েছে। আর তার ওপর বেল্ট বেঁধে দিয়েছে। তা না হলে ধুতি রাখতে পারবে না।

সেজন্যেই তো ইন্দ্রর রাঁচি যাওয়া।

নীপা দেখছে আর হাসছে। ধুতি পরিয়ে ওকে হাঁটা শেখাচ্ছে অনুপম। ঘরের মধ্যেই। এক একবার বারান্দায়। দু পাশের দরজায় খিল আঁটা, কেউ না হঠাৎ এসে পড়ে। প্যান্ট পরা লোকদের হাঁটার ছন্দই অন্যরকম, সেজন্যেই ইন্দ্রর ভয়।

রোবের্তো আদ্দির পাঞ্জাবিটা পরতেই চারুবালা দেখে বলে উঠলেন, রাজপুত্তুর রে।

নীপা মুখফুটে কিছু বলতে পারে নি। ওকে তখন অসীম লজ্জা এসে ঘিরে ধরেছে।

বাস চলেছে হু হু করে। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল নীপা। রোবের্তোর চুল উড়ছে। মুখটা জানালার দিকে রাখা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করছিল নীপার।

কিন্তু এদিকে তাকালেই ওর নীল চোখ। ঐ সুন্দর নীল চোখই এখন আতঙ্ক।

বাসটা স্পীডে ছুটে চলেছে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে।

ইন্দ্র কণ্ডাক্টরকে বললে, বুরাণ্ডিতে নামিয়ে দেবে আমাদের।

—হ্যাঁ বাবুজী।

নীপার মনে পড়ছে। কি যত্ন করে রোবের্তোকে আজ খেতে দিয়েছে মা।

মার মুখ থমথম করছিল। নীপাদের জন্যে ভয়। কখন কি ঘটে যায়। আর রোবের্তোর জন্যে চাপা কষ্ট। নীপা বেশ টের পেয়েছে।

—ছেলেটা আজই চলে যাবে। মা বলেছিল।—আগে থেকে জানলে একটু ভালমন্দ কিছু রান্না করতাম।

থেমে গিয়ে বলেছেন, একটু মাংস আনালে হয় না?

ইন্দ্র রেগে গেছে। —এখন কত কাজ। ডিম আছে তাই দাও না, ডিমের কালিয়া করে খাওয়াও তোমার ছেলেকে। বলে রেগে যাওয়ার অনুতাপে হেসে উঠেছে।

আর চারুবালা বলেছেন, কি যে বলিস। ডিম হল অযাত্রা। ছেলেটা বিদেশ বিভুঁয়ে শেষে কিনা···

চারুবালা আর কথা শেষ করতে পারেন নি।

নীপার মনে পড়ছে। সব সব। ঐ তো রোবের্তো বলছে, স্তুদেন্ত। আই স্তুদেন্ত।

হঠাৎ নীপার তন্ময়তা ভেঙে গেল। বাসের পিছনের সীটের দেহাতি মেয়েগুলো হয়তো ওদের নিয়েই হাসাহাসি করছিল এতক্ষণ। হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে। কেউ হো হো করে হাসছে। কিন্তু গানটা যেন চেনা চেনা, সুর করে করে গাইছে।

ওরা যখন বাসে উঠল, কে একজন বলে উঠেছিল, বরাত।

আরেকজন, দুলহান।

নীপা গানটা চিনতে পারলো। আরে এটা তো বাজপেয়ীজীর মেয়ের বিয়ের সময় মেয়েরা গাইছিল। চাচীজী নথ নেড়ে নেড়ে হাসছিল গান শুনে। সেই গান। চলহে চৌপাই দুলহান বৈঠে···।

তা হলে ওরা কিছু সন্দেহ করেনি। নতুন বিয়ে হওয়া স্বামী-স্ত্রী ভেবেছে।

নীপা জানে এটা অভিনয়, নিছক অভিনয়! তবু ভাল লাগছে গানটা।

এখন আর নীপার মনে ভয় নেই। শুধু একটা কাঁটা বিঁধে থাকা ব্যথা।

অথচ, তখন কি ভয়।

ডাক্তার হাজরা বলেছিলেন, টাঙা নিয়ে আসবো, সব রেডি থাকবে। স্পীডে বেরিয়ে গিয়ে অন্ধকারে পীচ রাস্তায়।

ইন্দ্র অনুপমও সেই ধুতি পাঞ্জাবি পরেছে।

গুরুদাসকে ডাক্তার হাজরা বলেছেন, স্টেশনের কেউ যদি দেখতেও পায়, জিজ্ঞেস করে, বলে দেবেন অনুপমের বন্ধু, সিনেমা দেখতে গেল সবাই।

সে সময় কি ভয় নীপার। সঙ্কোচ আর লজ্জা। কিন্তু মানুষটাকে তো বাঁচাতে হবে। তার চেয়ে বড় কথা, বাবাকে বাঁচাতে হবে, নিজেদের বাঁচতে হবে।

ভয়ে বুক কাঁপছে তখন। অথচ অস্বস্তি, লজ্জা। অনুপমের চোখের সামনে আরো।

পীচ রাস্তায় এসে পৌঁছতেই ডাক্তার হাজরা বললেন, এবার মাথায় ঘোমটা তুলে দাও নীপা। আর তো তোমার রেল কোয়ার্টারের লোক নেই।

যেন ওটাই একমাত্র বাধা।

নীপার কেন এই অস্বস্তি! অনুপমের চোখের সামনে বলেই কি! না কি সংস্কার।

—মা তোমার এত পদে পদে কুসংস্কার।

নীপা বলতো চারুবালাকে। ছোঁয়াছুঁয়ি, শিক্ষিত পরিচ্ছন্ন সাহেবও অস্পৃশ্য। এই রোবের্তোও। ডিম খেলে অযাত্রা। চারুবালার শুধু বন্ধন চারদিকে। সংস্কারের।

অথচ রোবের্তোকে আজ ইন্দ্রর থালা-বাসনে খেতে দিয়েছেন। তার এঁটো থালা তুলে নিয়ে মায়ার চোখে তাকিয়েছেন রোবের্তোর দিকে। নীপা বুঝতে পারছে, আসলে সংস্কারটাই মানুষটাকে আড়াল করে রেখেছিল। আজ মানুষটা বেরিয়ে এসেছে।

রোবের্তোর কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়েছেন চারুবালা। তখন আর ওটাকে নীপার কুসংস্কার বলে মনে হয়নি।

কিন্তু ডাক্তার হাজরা যেই বললেন, ঘোমটা তুলে দাও মাথায়, কেউ যেন সন্দেহ না করতে পারে, নীপার হাত সঙ্কোচে আটকে গেল।

শব্দ করে হেসে উঠে বললে, পারবো না, পারবো না।

—আঃ, অমন করো না। ইটস নাথিং বাট অ্যাকটিং। কলেজে থিয়েটার করোনি কখনো ?

ডাক্তার হাজরা নার্ভাস গলায় বলে উঠেছেন, তাড়াতাড়ি, তাড়াতাড়ি। এক্ষুনি কোন ট্রাকের হেডলাইট পড়বে টাঙার ওপর।

শেষ অবধি ঘোমটা টানতে হয়েছিল।

আর নীপা ভেবেছে, দ্যাখো, আমিও তো সেই কুসংস্কারেই বাঁধা পড়ে আছি। ওর থেকে বোধহয় মুক্তি নেই।

চারুবালার মতই।

বেরোবার আগে ডাক্তার হাজরা বলেছেন, সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে নাও নীপা। লাইক এ বেঙ্গলি ব্রাইড।

সবাই হেসে উঠেছে।

নীপা বলে উঠেছে, না না।

চারুবালা বলেছেন, না না।

কিন্তু শেষ অবধি ঠাকুর ঘরে গিয়ে দোলের সময় তুলে রাখা লাল আবির নিয়ে এসেছেন। পাগল, সিঁদুর কি দেওয়া যায় নাকি। নীপারও মনে হয়েছে।

—বুরাণ্ডি বুরাণ্ডি।

কণ্ডাক্টর চিৎকার করে উঠল।

ওরা সবাই চমকে উঠেছিল।

নীপা হাত বাড়িয়ে রোবের্তোর হাত ছুঁয়ে ইশারা করলো। ও তো বোকার মতো বসেই থাকবে। বুঝতেই পাবছে না এখানেই নামতে হবে।

বাস থামলো।

একে একে সবাই নেমে পড়লো।

মুক্তি। এবার সব ভয় থেকে মুক্তি। কারো মনে এখন আর কোন আতঙ্ক নেই। কি প্রচণ্ড আনন্দ।

বাস চলে গেল।

ইন্দ্র বলে উঠল, আঃ, কতদিন পরে যেন ছাড়া পেলাম।

নীপা কোন কথাই বললো না।

অন্ধকার। লাইট পোস্টের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অনুপম টর্চ ফেলে ফেলে পায়ে চলা সরু রাস্তাটা দেখতে পেল

—ঐ তো রাস্তা। ভুরকুণ্ডা যাবার রাস্তা।

পীচ রাস্তা থেকে নেমে পায়ে চলা মেঠো রাস্তাটা চলে গেছে। এই রাস্তা ধরে চলে গেলেই রোবের্তোর সেই নির্দিষ্ট স্টেশন।

অনুপম টর্চটা এগিয়ে দিল রোবের্তোকে।—টেক ইট।

আব ইন্দ্র বললে, ভিয়া।

—গ্রাৎজি, গ্রাৎজি।

রোবের্তো যেন আনন্দে আত্মহারা। ইন্দ্রকে জড়িয়ে ধরলো, অনুপমকে।

তারপর নীপার কাছে এসে ওর হাত ধরলো, ধরেই রইলো।

নীপার চোখে জল। ভাগ্যিস অন্ধকার, কেউ দেখতে পাবে না। দেখলেও কেউ বুঝবে না। অনুপম তো নয়ই।

রোবের্তো ওর হাতটা ছেড়ে মেঠো পথের দিকে দু'পা এগোলো। অন্ধকারে।

সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলে উঠলো, মিকেলে, আই গো।

ইন্দ্র হাত তুললো।

তারপর রোবের্তো আবার হাত তুলে বললো, জুলিয়েত্তা।

এবার আর 'আই গো' বললো না।

একটু অপেক্ষা করে রোবের্তো আবার বললে, আরিভেদের্চি।

তারপরই হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেছে, বলে উঠলো, আগেন।

কি বলতে চইছে ? এগেন ? আবার ! আবার দেখা হবে ? নীপা বুঝতে পারলো না।

আর রোবের্তো দু'পা এগিয়ে এসে বললে, আমার্কর।

নীপার মনে আছে। রিমেম্বর। কথাটা রোবের্তোই বলেছিল। কি মানে ? আমি মনে রাখবো, নাকি তুমি মনে রাখবে তো ! নীপা জানে না। কথাটা কাকে বললো ? হয়তো সবাইকে।

তবু নীপাও এতক্ষণে চিৎকার করে বলে উঠল, আমার্কর।

সঙ্গে সঙ্গে রোবের্তো ছুটে মেঠো রাস্তায় নেমে গেল। দৌড়তে লাগলো।

ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। অন্ধকারে টর্চের আলোটা নাচতে নাচতে ছুটে যাচ্ছে। শুধু আলোটা।

আর নীপা কখন নিজেরই অজান্তে দু' হাত তুলে ওকে নিঃশব্দে বিদায় জানাচ্ছে। এমন ভাবেই হাত দুটো তোলা, যেন এই মাত্র একটা পায়রা উড়িয়ে দিল।

সবাই চুপচাপ। অনেকক্ষণ। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে।

—এবার ফেরার বাস। অনুপম হঠাৎ বললে।

নীপার কানেও গেল না অনুপমের কথা।

ঘোমটা খসে পড়েছে। ও যেন কেমন একটা ঘোরের মধ্যে।

ঘোর কেটে যেতেই রুমাল ঘষে সিঁথির আবিরটা তুলতে গিয়ে আঙুলটা থেমে গেল নীপার। সিঁদুর নয়। লাল আবির। তবু।

এই উপন্যাসে বর্ণিত সময়কালে, যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছে, পালামৌযেব বাগোযাডি স্টেশনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালীর বেশে একজন পলাতক ইটালিযান যুদ্ধবন্দীকে ধরা পডতে দেখেছিলাম। অপ্রকৃত চবিত্র ও কাহিনীর এই উপন্যাসের মূল সূত্র সেটুকুই।—লেখক



অ্যালবামে কয়েকটি ছবি



অ্যালবামে পর পর তিনখানাই নিরুপমের ছবি। প্রথম ছবিখানা দেখে অলকা একদিন বলেছিল, তখন তুমি দেখতে বেশ ভালই ছিলে, বেশ ইনোসেন্ট ইনোসেন্ট।

ঐ ছবিখানার সঙ্গে অলকার কোন সম্পর্ক নেই, ওটা বিয়ের অনেক আগেকার ছবি। পরে ছবিতে অলকাও আছে, বিয়ের সময়ে তোলা ফোটোগুলো তো তেমন সুন্দর হয়নি ; তাই বিয়ের মাসখানেক পরে একটা স্টুডিওতে গিয়ে ওরা তুলিয়ে এসেছিল। এর পরের ছবিটা খুব বেশি দিনের নয়। নিরুপমের এক সহকর্মী বন্ধু পাসপোর্ট করানোর প্রয়োজনে ফোটো তোলাতে গিয়েছিল অফিস থেকে ফেরার পথে, নিরুপম সঙ্গে ছিল। বন্ধুটি জোর করে একটা ফোটো তুলিয়ে দিয়েছিল। গরম কোট, গলায় টাই বাঁধা, চোখে মোটা ফ্রেমের শ্যেলের চশমা। একেবারে পাক্কা সাহেব।

ও যে একটা মার্কেন্টাইল ফার্মের একজন অফিসার, ছবিটা দেখলেই বোঝা যায়। যে দেখেছে সেই বলেছে, খুব সুন্দর। অলকার এক মাসতুতো বোন এই কিছুদিন আগে এসেছিল, ছবিটা দেখে বলেছিল, যাই বল্ মেজদিভাই, তোর বরটা কিন্তু দারুণ হ্যাণ্ডসাম ; অথচ এই ছবিটা অলকার পছন্দ নয়।

হাসতে হাসতে একবার বলেছিল, এটা দেখলেই মনে হয় তোমার মধ্যে তুমি নেই।

প্রায় দার্শনিক কথা। কিন্তু অ্যালবামের পাতাগুলো ওল্টাতে ওল্টাতে পর পর তিনখানা ছবিই দেখল নিরুপম, তারপর নিজের মনেই যেন বললে, কোনটিতেই আমার মধ্যে আমি নেই।

ও প্রথম দিকের পাতা উল্টে আরেকবার গ্রুপ ফোটোগ্রাফখানা দেখল।

নিরুপমের কাছে ছেলেবেলার কিংবা বিয়ের আগে যত ছবি ওর দেরাজে পড়েছিল একটা বাণ্ডিলের মধ্যে, বউভাতে উপহার পাওয়া বড় অ্যালবামটায় সেগুলো যত্ন করে এঁটে রেখেছিল অলকা। পরে তোলা ছবি দিয়ে পরের পাতাগুলো ভর্তি হয়ে গেছে। কেউ না থাকলে একা একা সময় কাটাতে ওর জুড়ি নেই।

এখন অলকা নেই, বুবুন নেই, ইলু নেই। নিরুপমের কিছু করারও নেই। তাই চুপচাপ বসে বসে অ্যালবামটা দেখছিল। গলায় টাই-বাঁধা ছবিটা আরেকবার দেখে নিরুপমের মনে হল অলকা ঠিকই বলেছে, আমার মধ্যে আমি নেই।

অলকাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসার পর থেকে তা যেন বেশি করে বুঝতে পারছে।

নিরুপমের এক এক সময় মনে হয় ও কেমন যেন অভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছে। এই অভ্যস্ত জীবনের মধ্যে চমৎকার একটা আয়েশের ভাব আছে। কয়েক বছর আগেও ওর মধ্যে একটা যুবক-যুবক ছটফটে বিলাস ছিল, কাজে না হলেও, চিন্তা ভাবনায়। নিরুপম তখন অনেক কিছু কল্পনা করতে পারতো, মনের কোন কোন সাধ পূরণ করার ইচ্ছে হত। এখন কিছুই আর ইচ্ছে করে না। কানের দুপাশে, জুলফিতে, কয়েকটা সাদা চুল ওকে বিব্রত করার বদলে বরং ওর মনে কিছুটা উপভোগ্য কৌতুক জাগিয়ে তোলে। ছুটির পর নিরুপমের যে ব্রিজ খেলার আড্ডা ছিল, তার আকর্ষণ অনেক কাল আগেই হারিয়ে গেছে, ক্লাবে গিয়ে রোয়িং করতে কিংবা টেবল-টেনিস খেলতেও মন রাজি হয় না, বন্ধুবান্ধবদের মুখগুলো কেমন বিরস লাগে। অথচ এক একদিন এই গণ্ডীর ভেতর থেকে জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার অদম্য আগ্রহটুকু চাপা দেবার জন্যে ও চেন-স্মোকারের মত একটা সিগারেট শেষ হতে-না-হতেই তা থেকে আরেকটা ধরায়, ধরাবার সময় ওর হাত, হাতের আঙুল

কাঁপতে থাকে।

তাই অলকার ছোট্ট বাসনাটুকু ও যদিও মোমবাতি নিভোনোর ভঙ্গিতে ফুঁ দিয়ে এবারকার মত চাপা দিতে পারতো, তবু খেয়ালের বশে উৎসাহ দিয়ে বসল। পর পর কয়েক বছর ধরেই অলকা বাপের বাড়ি যাবার কথা তুলেছিল। নিরুপমকে কিন্তু কোন বারই বাদ সাধতে হয়নি। বুবুন ও ইলুর ইস্কুল আছে, পরীক্ষার পড়া আছে, গরমের সময় জামসেদপুর একেবারে ফার্নেস, যেতে ইচ্ছা হয় না, পুজোর সময়ে ট্রেনে যাচ্ছেতাই ভিড়ভাট্টা, ইস্কুল খুললেই ছেলে-মেয়ের পরীক্ষা। শীতের সময়ে নিরুপমের একটা-না-একটা অসুখ বাধে, কিংবা অলকার বা বুবুনের বা ইলুর। তিন-চার বছরের মধ্যে বাপের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠেনি অলকার।

অলকা একদিন তার বাবার সম্পর্কে কি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছিল, দেখে এক সপ্তাহ ধরে ওর মন খারাপ, চিঠি লিখে খবর জেনেও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি, কেবলই ভয় পেতো কিছু না ঘটে যায়। তাই বুবুনদের পরীক্ষা হয়ে যেতেই বললে, দিন পনেরো জামসেদপুর থেকে ঘুরে আসি, কি বলো ? তুমিও ছুটি নাও না।

এ-সময়ে নিরুপমের ছুটি পাওয়া একেবারেই সম্ভব নয়, তার ওপর হোম বোর্ডের একজন ডিরেক্টর আসছে রেসিডেন্ট ডিরেক্টরের সঙ্গে দেখা করতে। নানা ধরনের ইনফরমেশন হাতে হাতে জুগিয়ে দিতে হয় নিরুপমদের ডিপার্টমেণ্টকে। অসহায়ের মত নিরুপম তাই বললে, কি করে যাই বলো। বরং পারি তো দু-তিন দিন ছুটি নিয়ে শেষের দিকে যাবো। দেখা করে আসাও হবে ওদের সঙ্গে, তোমাদের নিয়ে আসাও যাবে।

আগের দিনে অলকা একা একাই যেতে পারতো, ওর দাদারা ট্রেনে তুলে দিয়ে গেলে ও একাই চলে আসতো। এখন ছেলেটা বড় হয়েছে, ইলুও ছোট নেই, তাই লটবহর বেড়েছে। তাছাড়া আজকাল দূরের পথে যাতায়াতে, বিশেষ করে রাতের ট্রেনে, তেমন নির্ভয় হতে পারে না। কারণ রাস্তাঘাট আজকাল নিরুপদ্রব নেই।

অলকা তাই শেষ অবধি ওর মাকে চিঠি লিখেছিল, মা চিঠি পেয়েই ওর রাঙাদাকে পাঠিয়ে দিল অলকাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

রাঙাদা বললেন, নিরুপম তুমিও গেলে পারতে, বাবা-মা দুঃখ করছিলেন, কতদিন তোমাকে দেখেনি।

অলকা একটু রাগত ভাব দেখিয়ে বললে, ওর কথা বাদ দাও রাঙাদা, ও বিলিতি কোম্পানির বড় অফিসার। তোমাদের মত কি লোহার কারখানা ? ওর কি ছুটি নেওয়া চলে, সূর্য-চন্দ্র নিভে যাবে, পৃথিবী ঘুরবে না।

মুখে এ-কথা বললেও বেশ বোঝা যাচ্ছিল অলকা খুব একটা নিশ্চিন্ত মনে যেতে পারছে না, নিরুপমের জন্যে ওর দুর্ভাবনার অন্ত নেই, বাপের বাড়ি গিয়েও ওর মন ছুটি পাবে না।

অলকার ট্রাঙ্ক সুটকেশ গোছগাছ করতে যত না সময় লাগলো, তার চেয়ে বেশি সময় লাগলো নিরুপমের জন্যে নিখুঁত এবং পরিপাটি ভাবে সব ব্যবস্থা করতে। বিপিন অবশ্য বহুদিন থেকে আছে, তা প্রায় আট বছর হল, বয়সেও বুড়ো থুত্থুরে, তবু তাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারছিল না অলকা। সকালে কখন কি এগিয়ে দিতে হবে, রান্নায় তেলঝাল যেন বেশি না দেয়, ধোপার বাড়িতে কি কি আছে ফর্দ মিলিয়ে ফেরত নেওয়া, বিকেলের খাবার, রাতে মশারি টাঙানো, হাজার রকম নির্দেশ আর উপদেশ। নিরুপমকে ঘরের তালা, ওয়ার্ডরোবের চাবি, একটা নতুন টুথপেস্ট আর দাড়ি কামানোর ক্রীম, কোথায় কি আছে সব বারবার বুঝিয়ে দিল অলকা।

কিন্তু নিরুপমের তখন মনে হচ্ছে সব কেমন ওলোটপালট হয়ে যাচ্ছে। এক একবার মনে হচ্ছে অলকা না থাকলে তার যেন একটা দিনও চলবে না। নিরুপমের তখন ভাবতে

ভাল লাগছে যে, ও অভ্যাসের গণ্ডীর মধ্যে বাঁধা পড়ে গেছে। বুঝতে পারছে এই অভ্যস্ত জীবনের আয়েশটুকুর মধ্যেই অলকার প্রতি ওর ভালবাসা অস্পষ্ট ভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

ওদের যাবার সময় যত ঘনিয়ে আসতে লাগলো, ততই নিরুপমের মনের মধ্যে কেমন একটা বিষাদ উঁকি দিতে শুরু করলো। কিন্তু নিরুপম অলকার ঠাট্টা শুনতে হবে এই ভয়ে তার মনের ভাব লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করলো।

অলকার সাবধানের অন্ত নেই। একবার বললে, এই শোনো, যখন বাথরুমে যাবে ঘরে তালা দিয়ে যেয়ো, বিপিনকে অত বিশ্বাস করো না। একবার তোশকের এক প্রান্ত একটুখানি তুলে দেখিয়ে বললে, ভিক্সের শিশিটা এইখানে রইলো, রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে না। অর্থাৎ স্থাবর অস্থাবর সব সম্পত্তির ওপরই ওর কড়া দৃষ্টি। নিরুপমের যে হঠাৎ এক একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় প্রচণ্ড মাথাধরার ফলে, তখন যেন ওকে শেলফ্ আলমারী ড্রয়ার খুঁজে বেড়াতে না হয়।

বিপিনকে বললে, তোমার হাতেই সংসার ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছি বিপিন, তুমি অ্যাদ্দিনের বিশ্বাসী লোক, দাদাবাবুর কাছে বাজারের টাকা নিয়ে রোজ হিসেব বুঝিয়ে দিয়ো, ঘরটা ঝাঁট দিয়ে দেবে, সকালে দেখো দাদাবাবুর যেন কোন অসুবিধে না হয়।

অলকার কাণ্ডকারখানা দেখে ওর রাঙাদা হেসেই ফেললেন। বাব্বা, যাচ্ছিস তো টুনু মাত্র দিন পনেরোর জন্যে, ছোটমামা বিলেত যাবার সময়েও মা এত উপদেশ দেয়নি।

'তুমি থামো তো', বলে অলকা তাকে থামিয়ে দিয়েছে। তারপর নিরুপমের সঙ্গে আড়ালে এক চিলতে চোখাচোখি করে হেসেও নিয়েছে।

ওদিকে বুবুন ও ইলু মামাবাড়ি যাওয়ার আনন্দে অধৈর্য হয়ে উঠছে, সকাল থেকে কেবল হিসেব করছে ট্রেনের আর কতটা সময় বাকি। বছর দুই আগে ওদের ছোটমামী যখন ডাক্তার দেখাতে এসেছিল, সে-সময় দিন তিনেকের জন্যে মামাবাড়ি ঘুরে এসেছে ওরা। অলকার তখন খুব শরীর খারাপ, তা না হলে অলকাও ঘুরে আসতে পারতো।

ট্রেনে উঠে হ্যাফ-প্যান্টের পকেটে হাত গুঁজে বুবুন এমন একটা ভাব করছিল যেন পিছনে কলকাতাটা পড়ে রইলো আগের দিনের খবরের কাগজ হয়ে, আকর্ষণ হারানো জঞ্জাল হয়ে। ইলু তাকিয়ে রইলো, কিছু বললো না, কিন্তু বেশ বোঝা গেল বাবার জন্যে ওর মন কেমন করবে। তা দেখে নিরুপমের একটু কষ্ট হল, একটু ভালও লাগলো।

গাড়ি ছাড়ার আগের মুহূর্তে অলকা বললে, সাবধানে থেকো, অসুখ বাধিয়ে বসো না। কিছু শরীর খারাপ-টারাপ হলেই কিন্তু ট্রাঙ্ক-কলে খবর দিয়ো।

বিনীত ছাত্রের মত সমস্ত কথায় ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো নিরুপম, ফ্ল্যাগ নেড়ে নেড়ে গার্ড হুইস্‌ল্ বাজালো। আর ট্রেন বেশ কিছুটা সরে যাবার পর উল্টোমুখে হাঁটতে হাঁটতে গেটের বাইরে এসে পৌঁছেই নিরুপমের কেমন হাল্কা আর ফাঁকা লাগলো। আপিস থেকে বাড়ি ফিরে রিস্ট ওয়াচটা খুলে ফেলার পর যেমন লাগে। চোখে দেখে মনে হয় খুলে ফেলেছি, কিন্তু কব্জিতে অনুভূতিটা তখন সমানই।

স্টেশনের বাইরে এসে কিউয়ে দাঁড়িয়ে ভিখিরি বাচ্চাদের মত পিছন পিছন খানিকটা ছুটে এসে ট্যাক্সি ধরে রেড রোড ল্যান্সডাউন সাদার্ন অ্যাভেনিউয়ের হু হু হাওয়ায় বাড়ি ফিরলো নিরুপম। রাস্তাঘাট অন্ধকার, সব তখন অশান্ত আলো হয়ে গেছে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে চারতলা বাড়িটার দিকে তাকাতেই নিরুপম হঠাৎ একা হয়ে গেল। চারতলা বাড়িতে আটখানা ফ্ল্যাট সব আলোয় ঝলমল করছে। শুধু নিরুপমদের তিনতলার দক্ষিণের ফ্ল্যাটের ঘরে আলো নেই, গোল-বারান্দাটাও অন্ধকার।

সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে উঠল নিরুপম। দুবার বেল বাজাতেই তিনতলার ফ্ল্যাটের শূন্যতার

দরজা হাট করে খুলে দিল বিপিন। আর তখনই ওদিকের ফ্ল্যাটের অবনীবাবু বোধহয় বেরুচ্ছিলেন সিঁড়িতে এক ধাপ পা ফেলে। দাঁড়িয়ে পড়লেন। মিহি গলার রসিকতা শোনা গেল, কি নিরুপমবাবু, মিসেস চলে গেলেন আজ ? মিসিং দি মিসেস, কি বলেন, অ্যাঁ ?

লোকটিকে নিরুপমের একটুও ভাল লাগে না। তাই এক টুকরো ভদ্রতার হাসি দিয়ে ভিতরে ঢুকেই দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর চোখের সামনে চোখেচোখ রেখে ক্যাট ক্যাট করে তাকিয়ে রইলো একরাশ বড় বড় পিতলের তালা। সব ঘরের দরজায় ইয়াব্বড়ো একটা করে পিতলের তালা।

পকেট থেকে অলকার দেওয়া চাবির গোছাটা বের করে শোবার ঘরের তালাটা খুললো নিরুপম। খুলতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গেল শব্দ করে। আর নিরুপমের সমস্ত মন বিরক্তিতে ভরে গেল।

না এ ক'দিন আর-কোন ঘর খুলবে না। বরবার তালা খোলা, তালা লাগানো, এসব নিরুপম একদম পারে না। ওদের ঘর আর বুবুনের ঘর একেবারে পাশাপাশি। মাঝখানে একটা দরজা আছে। দু পাশ থেকেই খিল দেওয়া যায়। টুকিটাকি ওর যা কিছু দরকার হতে পারে ও-ঘরে রেখে গেছে অলকা। বারান্দার দিকেও বুবুনের ঘরের একটা দরজা আছে। সেটা না খুললে ঘরখানা একটু অন্ধকার অন্ধকার থাকে।

চুপচাপ একটা মানুষ একা-একা বাড়িতে থাকতে পারে নাকি ! বই-টই কোথাও কিছু আছে কিনা খুঁজে দেখার জন্যে মাঝের দরজাটা খুলতে গিয়ে দেখলে ওপাশ থেকে খিল দেওয়া। বিরক্তিতে মন ভরে গেল। বারান্দার দিকের দরজা খুলতে হবে, দরজায় তালা !

শেষ অবধি ঘরটা খুলে বুবুনের খাটের ওপর অ্যালবামটা দেখতে পেয়েছিল। হয়তো অ্যালবামটা নিয়ে যাবে ভেবেছিল অলকা, ট্রাঙ্কে ধরেনি। কিংবা বুবুন হয়তো মামা-মামীমাদের দাদু দিদিমার ছবি দেখার জন্যে দুপুরে বের করেছিল। তুলে রাখতে ভুলে গেছে।

ওটা দেখতে দেখতে কিন্তু দিব্যি সময় কেটে গেছে নিরুপমের। একবার ঘড়ির দিকে তাকালো, একবার রেডিওটা খুলেই বন্ধ করে দিল। বুবুনের একসেট ইংরেজি বুক অব নলেজের ছবিওয়ালা বই আছে। নিয়ে এসে পাতা ওল্টাবে কিনা একবার ভাবলো। তারপর বেতের চেয়ারটা গোল-বারান্দায় নিয়ে গিয়ে চুপচাপ বসে রইলো।

আর তখনই বিপিন এসে বললে, দাদাবাবু আপনার ডাক আছে। বলে একখানা খামের চিঠি এগিয়ে দিল।

বিপিন চিঠিকে ডাক বলে, তাই প্রথম প্রথম ওরা হাসতো, এখন আর হাসি পায় না।

নিরুপম চিঠিখানা নিয়ে এপিঠ-ওপিঠ দেখল, খুলে পড়লো। প্রথমটা ও চমকে উঠেছিল। তারপর কেমন একটু বিচলিত বোধ করলো। অস্ফুটে বলে উঠল, দ্যাখো কাণ্ড !

২

চিঠিখানা পড়ে নিরুপম রীতিমত বিব্রত বোধ করেছিল। এমনিতেই আজকাল কোন আত্মীয়স্বজন হঠাৎ এসে হাজির হলে ও বিরক্তি বোধ করে। ওর নিয়মে বাঁধা জীবনের কোথায় যেন কি একটা ছন্দপতন ঘটে যায়, তিক্ততা জমা হয় মনের মধ্যে ; তাছাড়া কিছু-না-কিছু বাড়তি খরচ তো আছেই। সাজানো-গোছানো হিসেবের খাতাটা কেমন যেন ওলোটপালট হয়ে যায়, কেউ তো বোঝে না যে অফিসের মিত্তিরসাহেব আর বিপিনের দাদাবাবুর মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। অলকা এ সময় থাকলে তার মেজাজ সপ্তমে চড়ে

যেত। বলেতো, আমি জামসেদপুর চললাম, তুমি সামলাও এসব। সামলাতে হয় অবশ্য অনেক কিছু। উপরি ঝঞ্ঝাট, খরচ-পত্তর এবং বিপিনকে। ওর কাজ বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষ। বিপিন তবু টিঁকে গেছে। আগে যখনই কেউ এসে উঠতো, তারপর দিনকয়েক থেকে চলে যেতো, তখন সঙ্গে সঙ্গে কাজের লোকটাও দু'একদিনের মধ্যে বিদায় নিতো। আবার একটা লোক যোগাড় করা যে কি দুঃসাধ্য, নিরুপম জানে।

চিঠিখানা পেয়েই ওর লালচকের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। তখন বাবা-মা, ওরা ক' ভাইবোন, বেশ বড় সংসার। তবু লোকজন কেউ এলে মা কি খুশিই না হতো। বাজার থেকে গোটা রুই মাছ আনতো বাবা, বঁটি নিয়ে মা যখন মাছ কুটতে বসতো, মা'র মুখচোখ দেখে মনে হতো যেন বাড়িতে কারো আশীর্বাদ কিংবা ছেলে পাশ করেছে।

তখন সস্তাগণ্ডার দিন ছিল, ওসব পোসাতো। এ-কথা নিরুপম অনেক সময় ওর বন্ধুদের কাছেও শুনেছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে পড়লো, অলকাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ফেরার সময় ও বাসে না চড়ে কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সি ধরেছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে এরকম এক-আধটা বিলাস না থাকলে জীবনের কোন মানেই থাকে না।

চিঠিখানা পাওয়ার পর থেকে নিরুপম কিন্তু বিব্রত বোধ করছে অন্য কারণে। তা না হলে ওর একটু কৌতূহলই বা হচ্ছে কেন। এক একবার একটু ভালও লাগছে।

প্রথমে অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে একটা উত্তর দিয়ে ঝামেলা থেকে রেহাই পাবার ইচ্ছে হয়েছিল। একবার ভেবেছিল, একটা টেলিগ্রাম করে দিই। কিন্তু চিঠিখানা উল্টেপাল্টে তারিখ দেখে ভিতরের লাইন ক'টা আরেকবার পড়ে বুঝতে পেরেছিল এখন আর উপায় নেই।

রাত্তিরে বিপিন যখন মশারি টাঙিয়ে দিতে এল, তখনো ওর মনের ওপর একটা ভারী পাথর, দুশ্চিন্তার শেষ নেই। প্রায় মরীয়া হয়েই তাই অস্ফুটে বলে উঠেছিল,—দুত্তোর যা হয় হবে।

বিপিন, চমকে ফিরে তাকিয়েছিল মশারি টাঙাতে টাঙাতে। হেসে ফেলে বলেছিল, আজ্ঞে বৌদির মতন হলনি ?

নিরুপম কোন উত্তর দেয়নি।

বিপিন সন্ধে থেকেই চেষ্টা করছে দাদাবাবুকে তোয়াজ করার। দাদাবাবু যেন তার কাজে কোন খুঁত ধরতে না পারে। কিন্তু মশারি-টাঙানো কিংবা বিছানার চাদর পাতা কোনই কিছুই যেন ঠিক-ঠিক হচ্ছিল না। খেতে বসেও সব কিছু বিস্বাদ লেগেছিল নিরুপমের। সত্যি, অলকা না থাকলে ঘরদোরের চেহারাই যেন অন্যরকম হয়ে যায়।

নিরুপমের একবার মনে হল, এসব কিছুই না, আসল অতৃপ্তি বোধহয় চিঠিটার জন্যে। রূপা যে কোনদিন ওকে চিঠি লিখতে পারে, সেটুকুই নিরুপম ভাবতে পারেনি। অনেকদিন আগে একটা বিয়েবাড়িতে রূপাকে ও দেখেছিল। দেখতে পেয়েই ওর বুকেব মধ্যে ধক্ করে উঠেছিল। আর চোখাচোখি হতেই ঝট করে মাথা নামিয়ে নিয়ে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গিয়েছিল। খেতে বসার সময়েও এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিয়েছিল কাছেপিঠে কোথাও রূপা বসেছে কিনা ; ওকে দেখে রূপার ভুরু কুঁচকে উঠেছিল কিনা নিরুপম জানতে পারেনি। কিন্তু যতক্ষণ না সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এসে নিমন্ত্রিতের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে দিতে পেরেছিল, ততক্ষণ ওর পিঠের শিরদাঁড়া শিরশির করেছে। মনে হয়েছে, রূপা ওর পলাতক ভঙ্গিটার দিকে তাকিয়ে আছে তাচ্ছিল্যের বা ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে।

এরপর আর দেখা হয়নি। কিন্তু আত্মীয়স্বজনদের মারফত দু'একটা টুকরো খবর ওর কানে এসেছে। রূপারা যখন কানপুর বদলি হয়ে গেল, তখন সে খবরও কিভাবে যেন এসে পৌঁছেছিল।

সেই রূপা কিনা নিরুপমকে চিঠি লিখেছে, জানিয়েছে ওর বাড়িতে এসে উঠবে, থাকবে দিন কয়েক। লিখেছে উপায় থাকলে তোমাদের বিব্রত করতাম না।

ওর স্বামীর নামটা নিরুপমের মনে পড়ে গেল। হৃষীকেশ।

ওরা কে কে আসছে তা স্পষ্ট করে লেখেনি রূপা। কিন্তু একটা ব্যাপার নিরুপমের কাছে কিছুতেই স্বচ্ছ হল না। জরুরী কোন কাজ থাকতে পারে, হয়তো হৃষীকেশেরই, হয়তো এসে উঠতে পারে এমন আত্মীয় নেই বা আত্মীয়ের বাড়িতে স্থানাভাব। কিন্তু হোটেল তো ছিল। হঠাৎ কি যেন ভাবলো নিরুপম, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর সমস্ত মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, পরক্ষণেই ও হেসে ফেললে! তাও কি সম্ভব নাকি!

নিরুপম অস্বস্তি বোধ করছিল অন্য কারণে। ওর কেমন ভয়-ভয় করছিল, ও আর কোনদিন বোধহয় রূপার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে না। চোখ তুলে তাকাতে পারবে না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে রূপার মুখখানা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠল। বুকের ভেতর কেমন একটা ব্যথা-ব্যথা, কেমন এক ধরনের শূন্যতা বোধ করলো। আবার তখনই মনে হল রূপার মুখোমুখি ও দাঁড়াতে পারবে না, কথা বলতে পারবে না।

শেষে হৃষীকেশের চোখে ধরা না পড়ে যায়। নিরুপম তো চেষ্টা করলেও স্বাভাবিক হতে পারবে না, স্বাভাবিক হওয়ার জন্যে সারাক্ষণ অভিনয় করতে পারবে না।

রিস্টওয়াচটা টেবিলের ওপর নামানো ছিল, বিছানা ছেড়ে উঠে দেখল সাড়ে ছটা বেজে গেছে। ঘড়িতে দম দিয়ে রেখে দিল ; দরজা খুলে কলঘরে চোখ মুখ ধুতে যাবার সময় চিৎকার করে বললে, বিপিন, তোমার চা হল না এখনো ?

এই প্রথম বোধ হয় ওকে সকালে উঠে চায়ের কথা বলতে হল। অলকা থাকলে ছটার সময়েই ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, কলঘর থেকে ফিরে এসে দেখে চা হাজির।

দূর দূর. এভাবে একটা মানুষ থাকতে পারে নাকি। একা থাকা মানে যে এতখানি নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া, নিরুপম ভাবতেই পারেনি । আসলে বুবুন আর ইলু নেই বলেই হয়তো বাড়িটা রাতারাতি এক টুকরো নিঃশব্দতা হয়ে গেছে!

রূপার চিঠিখানা ওর চোখের সামনে টেবিলের ওপর পড়েছিল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রথম যৌবনের দু' একটা ছোট ছোট ঘটনা বুদ্বুদের মতো ভেসে উঠে মিলিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে সেগুলোকে ধরতে যাবার আগেই বিপিন এসে বললে, বাজার যাবো তো দাদাবাবু ?

বাজারের নাম শুনেই নিরুপমের সমস্ত শরীর জ্বলে উঠল। অলকা নেই, বুবুন নেই, ইলু নেই, কার জন্যে বাজারে যাবে ও ! শুধু একটা মানুষের জন্যে ? শুধু নিজের জন্যে কিছু করতেই ইচ্ছে করে না ওর।

পকেট থেকে ব্যাগ বের করে, ব্যাগ থেকে দশ টাকার একখানা নোট বিপিনের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিরুপম বললে, নিয়ে যাও।

—মাছ কত আনবো দাদাবাবু, কি কি হবে ই-বেলা ?

নিরুপম তীব্রস্বরে বলে উঠল, কিচ্ছু জানি না, যা ইচ্ছে করবে, যাও, আমাকে বিরক্ত করো না।

একটু পরেই হঠাৎ নরম হয়ে গিয়ে বললে, না বিপিন, সবই একটু বেশি বেশি করে আনতে হবে।

নিরুপম নিজেও বুঝতে পারলো না, ও কেন সবকিছুতে এত অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

আপিস যাওয়ার আগে স্নান করে এসে চিরুনি খুঁজে পেল না নিরুপম, চিৎকার করে উঠল, এই বিপিন, চিরুনি কোথায় গেল ?

পরক্ষণেই নিজের বোকামি নিজেই বুঝতে পারলো। এ-সব তো বিপিনের জানার কথা

নয়, বিপিনের খোঁজ রাখার কথা নয়। প্রত্যেকটা ঘরে তো বড় বড় পিতলের তালা ঝুলিয়ে দিয়ে গেছে অলকা। তার চাবি নিরুপমের কাছেই।

শুধু একটা খবরই নিরুপম জানতো না, তার ছকে-বাঁধা জীবনের চাবিটা নিয়ে গেছে অলকা। ছকে বাঁধা, ছকে বাঁধা। এই আজ পাঁচ তারিখ, মনে আছে তো ? আজ পার্ক স্ট্রীটে···সিনেমার টিকিটটা কেটে রেখো, পরশু শনিবার···কবে কবে সিনেমা যাবে ওরা, মাসের শুরুতে ভাল রেস্তরাঁয় একদিন চীনে খাবার খাওয়া, ছুটির বিকেলে আউটরাম, সমস্ত আনন্দগুলো যেন ঘর-কাটা রুটিনের মত, সেই বুবুন ওর ইস্কুলের খাতার পিছনে যে-ভাবে লিখে রাখে!

চিরুনিটা শেষ অবধি খুঁজে পেল নিরুপম। যেখানে থাকার কথা সেখানেই ছিল। নিজেই ভুল করে অন্য জায়গায় খুঁজতে গেছে।

আপিসের পোশাক পরে খেতে বসে মনে হল কোনটাতেই স্বাদ নেই। একটা দিনেই ব্যাটা বিপিন যেন গেঁয়ো নভিস হয়ে গেছে। থালাটা ঠেলে দিয়ে বললে, মুখে দেওয়া যায় না, যাচ্ছেতাই।

বিপিন মুখ কাচুমাচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ট্রাম-স্টপে অপেক্ষা করতে করতে মনে হল, না, বিপিনটার দোষ নেই। বাড়িটা ফাঁকা, ওরই বা কাজে মন বসবে কেন ?

হঠাৎ এক সময় ওর মনে হল, আচ্ছা অলকাকে একখানা চিঠি লিখলে কেমন হয়। বেশ মিষ্টি করে একখানা ভালবাসার চিঠি। কত দিন কত বছর কেটে গেছে, অলকাকে কোন চিঠি লেখার সুযোগ পায়নি। একই সঙ্গে এত কাছে কাছে পাশে পাশে সর্বক্ষণ থাকলে চিঠি লেখার সুযোগ পাবে কি করে। কিন্তু খুব কাছের মানুষকে সব কথা বলা যায়, কি যেন বলা হয়ে ওঠে না। চিঠিতেও বোধ হয় সে-কথা ও লিখতে পারবে না, নিজেরই হাসি পাবে। অলকাও হেসে ফেলবে, ফিরে এসে বলবে, তোমার হল কি। জানো, মেজবৌদি চিঠি খুলে পড়েছে, সব্বাইকে দেখিয়েছে, হেসে গড়াগড়ি দিয়েছে ওরা। কি লজ্জা, কি লজ্জা! অলকার ছোট বোন নীলাও নিশ্চয় ওকে ঠাট্টা করবে। নীলা তো গত বছর সল্ট লেকে একজিবিশন দেখতে এসেছিল, ভিড়ের মধ্যে নিরুপম একবার পিঠে হাত দিয়ে অলকাকে ভিড় থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেছিল। আর নীলা এত ফাজিল ! সারাক্ষণ হেসেছিল ঐ পিঠে হাত-দেওয়া নিয়ে।

সত্যি, মানুষে মানুষে সম্পর্কটা কি অদ্ভুত ! বেশি আপন হয়ে গেলেই আপনা-আপনি একটা দূরত্ব গড়ে ওঠে। সকলের অলক্ষ্যে।

আর রূপা কত দূরের মানুষ হয়ে গেছে, অথচ এখন যেন কত কাছে। শুধু একখানা চিঠি ওকে একেবারে কাছে এনে দিয়েছে।

ওর হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে গেল। কে যেন বলেছিল। মানুষ যখন অন্ধকারে হাঁটে টর্চের আলোটা ফেলে অনেক দূরে, পা ফেলে সেই অন্ধকারেই। কথাটা হঠাৎ কেন মনে এল বুঝতে পারলো না। অলকা কিংবা রূপা কিংবা আজকের দিনটার সঙ্গে এ-কথার কোন যোগাযোগ খুঁজে পেল না।

ও স্টেশনে যাবে কিনা, নিরুপম সারাদিন একটা দ্বিধার মধ্যে ছিল। রূপা অবশ্য তেমনভাবে লেখেনি। সে হয়তো জানে নিরুপম ব্যস্ত মানুষ, ছুটিছাটা ইচ্ছে থাকলেও পায় না। আর বড় রাস্তার ওপরেই নিরুপমের বাড়ি, খুঁজে নিতেও নিশ্চয় অসুবিধে হবে না। কিন্তু কোন্ ট্রেনে আসছে, কোন্ সময় পৌঁছবে, রূপা জানাতে ভোলেনি এবং সেজন্যই নিরুপমের মনে হয়েছে রূপা আশা করছে ও স্টেশনে যাবে। যেন চিঠির ও-দুটি লাইনের মাঝখানে অদৃশ্য কালিতে লেখা আছে, তুমি স্টেশনে এসো কিন্তু। স্টেশনে যেতে প্রচণ্ড

ইচ্ছে হচ্ছে ওর, শুধু একটাই অস্বস্তি, চোখ তুলে তাকাতে পারবে কিনা, কথা বলতে পারবে কিনা !

শেষ অবধি আপিস থেকে সোজা স্টেশনে গিয়ে হাজির হল নিরুপম।

ট্রেন এসে দাঁড়াতেই ভিড় ঠেলে ঠেলে ধাক্কাধাক্কি এড়িয়ে এক কামরা থেকে আরেক কামরায় উঁকি দিয়ে এগিয়ে চলেছিল ও।

মালপত্র প্লাটফর্মে নামিয়ে রূপা বোধ হয় বিভ্রান্তের মত ভিড়ের মধ্যে থেকে চেনা মুখটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিল। চকিতে নিরুপমের চোখে চোখ পড়তেই রূপা কৃষ্ণচূড়ার উল্লাস হয়ে গেল।

—নির্পমদা, এই যে এখানে। চিৎকার করে উঠল রূপা।

মাঝখানে ভিড়, কুলি, ঠেলা-ট্রলী সব বিলুপ্ত হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। নিরুপম হাত তুলে ইশারা করলো। এত অস্বস্তি, এত দুর্ভাবনা নিমেষে মিলিয়ে গেল।

নিরুপম ততক্ষণে কাছে এগিয়ে গেছে। রূপা হাসি-হাসি মুখে তার পাশের লোকটিকে বললে, এই তো এসে গেছে, কি, বলেছিলাম না ? আপনি তো ভেবেছিলেন, আপনার ঘাড়ে পড়বো।

রূপা হেসে উঠে বললে, যান, এবার আপনার ছুটি।

ভদ্রলোক নমস্কার জানালেন, তারপর হেসে বললেন, আপনার জিম্মায় দিয়ে গেলাম.। তারপর রূপার দিকে ফিরে বললেন, ঠিক ঠিক লোকের কাছে পৌঁছে দিয়েছি, মিস্টার বোসকে জানিয়ে দেবেন।

রূপার দিকে ফিরেও আরেকবার নমস্কার করলেন ভদ্রলোক। রূপাও।

কিন্তু নিরুপমের হঠাৎ মনে হল, রূপা যখন তাঁকে নমস্কার করতে গেল দু' হাত জোড় করে, তখন রূপার বাঁ হাতটা···

নিরুপম ভাবলো ওটা ওর মনের ভুল কিংবা আরেক ধরনের ফ্যাশান।

রতনবাবুর মালপত্র ততক্ষণে কুলির মাথায় উঠেছে। একবার নিরুপমের দিকে তাকিয়ে বললেন, চলি। একবার রূপার দিকে তাকিয়ে বলেলন, চলি।

কুলির মাথায় রূপার ট্রাঙ্ক সুটকেশ তুলে দিয়ে এতক্ষণে নিরুপম অবাক হবার সুযোগ পেল। বললে, তুমি একা—

দু'টো কাঁধ ঝাঁকিয়ে রূপা হেসে উঠল। বললে একা, এক্কেবারে একা।

গেটের দিকে কুলির পিছনে পিছনে যেতে যেতে রূপা এবার বললে, তুমি না এলে বেচারী রতনবাবু কি বিপদেই না পড়তেন। বাড়ি খুঁজে আমাকে পৌঁছে দিয়ে তবে। ওকে যেতে হবে ব্যারাকপুর।

নিরুপমের কানে এ-সব কোন কথাই যাচ্ছিল না। ও আবার বললে, তুমি একা ? এক্কেবারে একা ?

নিরুপমের মাথার মধ্যে সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। গোপন একটা হীনতা বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এতকাল ধরে ও হেঁটে বেড়িয়েছে। কোনদিন মুখ ফুটে কাউকে বলতে পারেনি। কারো কাঁধে মাথা রেখে অনুশোচনায় কাঁদতে পারেনি। নিরুপম তো একটা জুয়েল, রূপার বাবা বলতেন। 'নিরুপম এবার অফিসার্স গ্রেড পেয়েছে,' নিরুপমের বাবা গর্ব করে কার কাছে যেন বলেছিলেন। মেজদিভাই, তোর বরটা কিন্তু দারুণ হ্যান্ডসাম, অলকার মাসতুতো বোন বলেছিল। নিরুপম নিজেও এক একসময় অহংকারে মাথা তুলতে গিয়ে দেখেছে ওর বুকের গভীরে কোথায় ভিতরের মানুষটা হীনতায় মাথা নিচু করে আছে।

ও ভেবেছিল রূপার সামনে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু ও আশ্চর্য হয়ে গেল

রূপার সপ্রতিভ ভাবটুকু দেখে। যেন কোথাও কিছু ঘটেনি, সব ঠিকঠাক, তেমনি আগের দিনের মতোই আছে।

অনর্গল কথা বলছিল রূপা। হাসছিল। হঠাৎ বলে উঠল, চিঠি পেয়ে তুমি খুব অবাক হয়ে গিয়েছিলে, তাই না?

তারপরই আবার একটু বিষণ্ণ সুরে বললে, আশ্চর্য মানুষ তুমি নিরুপমদা, একটা চিঠি লিখেও কোনদিন খোঁজ নিলে না।

রূপার এই সপ্রতিভ ভাবটুকু, ওর গলার স্বরের গাঢ়তা, নিরুপম উপভোগ করছিল। ওর ভাল লাগছিল। কিন্তু তারই মধ্যে একটা এক পলকের অস্বস্তি উঁকি দিয়ে গেল। কথাটা বলতে গিয়ে রূপার এই প্রগলভ মুহূর্তটুকু ভেঙে দিতে ইচ্ছে হ'ল না। 'আমি একা, এক্কেবারে একা', কথাটা এতক্ষণে যেন স্পষ্ট হয়ে ধরা দিচ্ছে। অলকা, অলকাকে নিয়ে এখন ওর দুশ্চিন্তা। ওর মনে পড়লো, বিয়ের পর প্রথম প্রথম ও যখন অলকাকে নিয়ে বিভোর, একদিন রাত্রে অলকা ওর আদরের মধ্যে ডুবে গিয়েও হঠাৎ প্রশ্ন করেছিল, এই রূপা কে বলো তো! নিরুপম চমকে উঠেছিল, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারেনি। শেষে ধীরে ধীরে বলেছিল, তুমি চিনবে না, ছোটবেলায় ওর মাকে আমরা বুলাপিসি বলতাম। আরো তো অনেকের নাম ছিল রূপা, কিন্তু তাদের কথা ওর মনে হয়নি। ও বুঝতে পেরেছিল, ওদের দু'জনের, বিশেষ করে অলকার এই সুখী-সুখী ভাবটা ভেঙে দেবার জন্যে নিরুপমের বোন সুধা নিশ্চয় কিছু বলেছে। সেই সব লালচকের দিনগুলোর কথা।

সেদিন সুধার ওপর ও ভিতরে ভিতরে রাগে জ্বলে উঠেছিল। ওর গোপন জ্বালাটাকে হঠাৎ মনে পড়িয়ে দিয়েছে বলে। সুধা বোকা, বোকা.ও বোধ হয় ভেবে বসে আছে নিরুপম একজন ব্যর্থ প্রেমিক, কিংবা ভাবে নিরুপম রূপার প্রেমের জন্যে এখনো কাঙাল হয়ে আছে। কিংবা নিরুপমের সঙ্গে রূপার কোনদিন প্রেম ছিল। বোকা, বোকা।

সুধা অলকাকে কি বলেছিল নিরুপম কোনদিনই জানতে পারেনি। শুধু একদিন ঠাণ্ডা গলায় বলেছিল, সুধা আমাকে সব বলেছে।

কি বলেছে তা নিরুপম আজো জানে না। শুধু জানে, সুধা কিছুই জানে না।

'সুধাটা, নির্পমদা কি গিন্নী হয়ে গেছে, একবার দেখা হয়েছিল ' রূপা হাসতে হাসতে বলে উঠল, ওরা তখন ব্রিজে উঠছে, ট্যাক্সি ছুটছে, আর সঙ্গে সঙ্গে হাওড়া ব্রিজের ত্রিভুজের মাথায় জ্বলা লাল আলোটার দিকে আঙুল দেখিয়ে রূপা বললে, দ্যাখো দ্যাখো নির্পমদা, বাত্তিটা—নিজের ভুল ধরে ফেলে হেসে বললে, আলোটা, কি সুন্দর লাগছে। ঠিক আকাশপ্রদীপের মতো।

নিরুপম দেখল। সত্যি কতবার তো দেখেছে, কিন্তু কোনদিন সুন্দব মনে হয়নি। হাওড়া ব্রিজটা তো শুধু উদ্বেগ কিংবা ক্লান্তির সাক্ষী। যখনই এসেছে, ঘড়িটা কাঁটার দিকে চোখ রেখে ট্রেন না ফেল হয়। যখনই ফিরেছে, অসীম ক্লান্তি, কথা শুধু প্রয়োজনে। এই প্রথম নিরুপম অনুভব করছে প্রয়োজনের বাইরে অনেক সুন্দর দৃশ্য আছে, অনেক অকারণ হাসি আছে।

তবু কাঁটার মতো খিচখিচ করে লাগছিল। রতনবাবুর সামনেই কথাটা বলে ফেললে অস্বস্তি কেটে যেতো। কে জানে, হয়তো রতনবাবুর সঙ্গেই চলে যেতে চাইতো রূপা। তখন ওর হয়তো নিজেকে আরো ছোট মনে হতো। কিন্তু এই দোটানার মধ্যে নিরুপমকে দুলতে হতো না। স্টেশনে ভিড়েব মধ্যে ব্যস্ততার মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ওঠার আগেই যে তাকে ছুটি দিয়ে দিল রূপা। এখন অলকা নেই একথা বলতে পারছে না। তার চেয়ে বড় দুশ্চিন্তা অলকাকে নিয়েই। 'এই, রূপা কে বলো তো?' অনেকদিন আগের কথা। অলকা প্রশ্ন করেছিল। তারপর এতদিনের অভ্যস্ত জীবন একটা বিশ্বাস এনে দিয়েছে

ঠিকই। কিন্তু রূপার এই একা, একেবারে একা চলে আসা, অলকা কি ভাবে নেবে ও বুঝতে পারছে না। 'জানি, জানি, তাই এবার কোন বাধা দিলে না, আগে থেকেই তোমার প্ল্যান ছিল', এমন কথাও অলকা বলে বসতে পারে। কিংবা কোন কথাই বলবে না, অলকার মুখ হয়তো একটা থমথমে ঝড় হয়ে থাকবে। নিরুপমের মনের মধ্যে ডুব দেবার মত অবসর রূপার তো কোনদিনই ছিল না। ও তখন নিজেকে নিয়েই মশগুল। একটা পাখি যেন নতুন আকাশে মাতাল হয়ে উড়ে বেড়াতে চাইছে।

রেড রোড দিয়ে যেতে যেতে ছটফটে চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে রূপা একবার বলে উঠল, আরেব্বাস, কি আলো দিয়েছে। একেবারে ছেলেমানুষের মত কথা বলছিল ও।

নিরুপমের সমস্ত ক্লান্তি মুছে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল ও যেন আবার হারানো রঙগুলো ফিরে পাচ্ছে।

রূপা হঠাৎ আবার বলে উঠল, ও মা, ভিক্টোরিয়া কোথায় গেল!

নিরুপম ভাবলে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কথা বলছে রূপা। ও তাই ওর বোকামিতে হেসে ফেলেছিল। কিন্তু না, রূপার ভুল হয়নি। রূপা বললে, না না, ভিক্টোরিয়ার সেই স্ট্যাচুটা।

আঙুল দেখিয়ে বোঝাতে চাইছিল রূপা, আর নিরুপম লক্ষ্য করলো গেটের সামনে চতুষ্কোণ মার্বেলের উঁচু বেদীটা ফাঁকা পড়ে আছে, তার ওপর কোন মূর্তি নেই। একটা মূর্তি কখন সরে গেছে, হয়তো কাগজে খবর হয়ে বেরিয়েও ছিল, তারপর নিস্পৃহ ভাবে ভুলে গেছে নিরুপম। আজ তাই নতুন নতুন ঠেকলো। একটু চিন্তা করে নিয়ে বললে, না না, অন্য কার মূর্তি ছিল যেন।

—তাই বুঝি! নিজের বোকামিতে নিজেই হাসল রূপা। তারপর বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক। ভিক্টোরিয়া তো গেটের ভেতরে।

একটা মূর্তি ছিল, মূর্তিটা সরে গেছে। নিরুপম এতদিন ভেবে এসেছে ওর নিজের মূর্তিটি সরে গেছে, কিংবা মূর্তিটা বদলে গেছে। এখন ওর পুরোনো মূর্তিটা ফিরিয়ে আনার ইচ্ছে করছে। কিন্তু একবার বদলে গেলে সেটা বোধহয় আর ফিরিয়ে আনা যায় না। একটা গোলাপের পাপড়িগুলো টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেললে তখন আবার সেই পাপড়িগুলো জুড়ে দিলেই কি সেটা গোলাপ হয়ে উঠবে?

এদিকে রূপার দু'চোখ যেন সবকিছু গ্রাস করতে চাইছিল। প্রকৃতির আলোবাতাস, আকাশ অন্ধকার, গাছের আলোকস্নিগ্ধ ছায়া। একটা আকাশছোঁয়া বাড়ি দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, ওটা কি। তারপর নিজেই বলে উঠল, বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি।

নিরুপম মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল রূপার চঞ্চল ভাবটুকু দেখে। তখনই নুয়ে পড়ে ও ট্যাক্সির এ জানালায় উঁকি দিচ্ছিল, তখনই শরীরটা টান টান করে ও জানালায় গলা বাড়াতে চাইছিল। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে মাঝে মাঝে নিওনের ঠাণ্ডা আলো পড়ছিল ওর মুখে। সব সুন্দর লাগছিল।

ট্যাক্সির হুড়ুমদুড়ুম জার্ক সামলাবার জন্যে সামনের সীটটা একটা হাত বাড়িয়ে ধরে ছিল রূপা, আলো পড়ে ওর ফর্সা হাত, হাতের আঙুল স্বচ্ছ মোমের মত লাগছিল। একটা লোক বোধ হয় আরেকটু হলে চাপা পড়তো, জোর ব্রেক কষলো ট্যাক্সি। আর দু'হাত বাড়িয়ে ধাক্কা সামলাতে গিয়ে রূপা যেন যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল! নিরুপম রূপার দিকে অবাক হয়ে তাকালো ওর মনে হল রূপা যেন একটা অসহ্য কষ্ট দম বন্ধ করে সহ্য করার চেষ্টা করছে।

নিরুপম বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি হল, তোমার কি কিছু হয়েছে?

অনেকক্ষণ কোন জবাব দিতে পারলো না রূপা। অনেকক্ষণ পরে হেসে ওঠার চেষ্টা করলো। বললে, বলবো বলবো, এখন শুনলে মিছিমিছি মন খারাপ করবে। বলে বাঁ হাতখানা শাড়ির আঁচলে ঢেকে দিল।

কৌতূহলে কোন একটা আতঙ্কের খবর শুনবে এমন একটা আশঙ্কায় সারা রাস্তা নিরুপম চুপ করে রইলো। কিন্তু রূপা তখন আবার অনর্গল কথা বলছে, অপ্রয়োজনে হাসছে।

বাড়ির সামনে এসে ট্যাক্সিটা থামতেই ড্রাইভার যখন মীটারের ফ্লাগটা তুলে দিল, একটা টুং করে আওয়াজ হল, রূপা ওর ব্যাগ খুলে বলে উঠল, আমি দিচ্ছি, আমি দিচ্ছি, তখন নিরুপম ভাড়া মিটিয়ে দিতে দিতে হাসবার চেষ্টা করে বললে, তোমাকে অবাক করে দেবার মতো একটা খবর আছে। অলকা নেই, অলকা জামসেদপুরে।

এক মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকিয়েছিল রূপা। একটু ম্লান দেখালো যেন ওকে। তারপর বললে, সত্যি বলছো ?

অপরাধীর মত নিরুপম বললে, ওরা চলে যাবার পর তোমার চিঠি এল।…

রূপা এবার শব্দ করে হেসে উঠল। বললে, এত কিন্তু কিন্তু করছো কেন, আমি কি বলেছি নাকি তোমার বউয়ের যত্ন-আত্তি না পেলে আমার খুব অসুবিধে হবে। একটু থেমে হাসতে হাসতে বললে, আমার তো ঠিক ছিল, তোমারা কেউ না থাকলে ঐ রতনবাবুর সঙ্গেই চলে যেতাম, ব্যারাকপুর।

রাস্তার ধারে একটা রিকশাওয়ালা বসেছিল, চেনা রিকশাওয়ালা, তাকে তখন খোশামোদ করছে নিরুপম। অনেক কষ্টে তাকে রাজি করালো, সে মাল তুলতে তুলতে গজরালো, আমি কি মুটে নাকি! সে-কথা শুনে রূপা বিশুদ্ধ হিন্দী উচ্চারণে কি একটা রসিকতা করলো, লোকটা হেসে ফেললো।

রূপা ততক্ষণে নতুন ডিজাইনের গ্রীল দিয়ে সাজানো চারতলা বাড়িটা দেখছে, খুব অবাক হয়ে। যেতে যেতে বলে উঠল, বাঃ! খুব সুন্দর বাড়িটা তো তোমার।

নিরুপম হেসে উঠে চাপা গলায় বললে, আরে আস্তে বলো, লোকে শুনে হাসবে। চারতলা এই বাড়িটার আটখানা ফ্ল্যাট, তিনতলার এদিকটা আমাদের।

লোকে শুনে হাসবে! কথাটা খট্ করে লাগলো রূপার কানে। বললে, নির্পমদা, তোমরা কি করে থাকো গো এখানে, দিনরাত প্রেস্টিজ বাঁচিয়ে চলতে হয় মনে হচ্ছে। আমি বাবা দুদিনেই হাঁপিয়ে উঠবো।

সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে উঠতে বললে, মানুষের যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুর মধ্যে থাকায় লজ্জা কিসের আমি তো বুঝি না।

নিরুপমের সমস্ত শরীর তখন শজারুর কাঁটা। এক্ষুনি হয়তো সুহাসবাবুর বাড়ির কেউ দেখবে, কিংবা অবনীবাবু মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করবেন। কিংবা কেউ কিছু জিজ্ঞেস করবে না, কিন্তু সবারই চোখের ভুরু প্রশ্নচিহ্ন হয়ে যাবে। নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করবে।

মানুষ নাকি সামাজিক জীব। তার মানে কেন কেন কেন-র উত্তর দাও, তার মানে রুলটানা রাস্তায় হাঁটো। এই যে অলকা বাপের বাড়ি চলে গেল, এ-সময় দুম করে রূপার একা-একা চলে আসা চলে না। এলেই একটা গুঞ্জন উঠবে।

কিন্তু এসময়ে রূপাকে কেউ ঢুকতে দেখলে বরং ভালই হত। ট্রাঙ্ক সুটকেশ রয়েছে, রূপার কুঁচকে-যাওয়া শাড়িতে ট্রেন-জার্নির ছাপ, শরীরে মলিন ক্লান্তি। সুহাসবাবুর মেয়েদের সঙ্গে, ঝুমার সঙ্গে অলকার খুব বন্ধুত্ব। ফিরে এলে তাকে কি বলবে কে জানে। মানুষের চরিত্রের এই একটা দিক নিয়ে কারো কৌতূহলের শেষ নেই। কিছু একটা বলে দিলেই হল, চোরকাঁটার মত লেগে থাকবে, তুমি একটু সতর্ক হয়ে ছাড়াতে যাও, দেখবে তোমার অসতর্ক মুহূর্তে অন্যদিকে সেগুলো লেগে গেছে।

বেল্ বাজাতেই বিপিন এসে দরজা খুলে দিল ; দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। এতদিন এ বাড়িতে কাজ করছে—এমন অদ্ভুত ঘটনা আগে কখনো দেখেনি।

নিরুপমের একবার মনে হল বিপিনকে সকালে জানিয়ে গেলেই হতো। পরক্ষণেই ওর রাগ চেপে গেল। যা ভাবে ভাবুক, এমন কি কথা আছে যে ও-ব্যাটাকে সব কথা আগে থেকে জানিয়ে যেতে হবে। রাগটা অলকার ওপরেও। ওর সমস্ত ইচ্ছেগুলো যেন বন্দী হয়ে আছে।

পাশাপাশি দু'খানা ঘর। বুবুনের ঘরের তালা খুলে দিয়ে নিরুপম রেগে গিয়ে বিপিনকে বললে, কি দেখছো কি, ওগুলো নিয়ে এসে রাখো এ-ঘরে।

বলে নিজের ঘরের দরজার তালা খুলতে গেল।

৩

সেদিন দশেরা। দশেরার দিনে লালচকের চেহারা যেন রাতারাতি বদলে যায়। চকবাজারের দু'পাশে রাস্তার ধারে ধারে দোকান পসরা বসতে শুরু করে। থাকে থাকে সাজানো থাকে মিঠাইমণ্ডা। রাংতায় মোড়া পেঁড়া, মুগের লাড্ডু, বরফি বালুসাই। কত তার রঙের বাহার, গোলাপী সবুজ হলুদ লাল। সীতারামের মন্দিরের চূড়ায় সেদিন তেকোনা একটা নতুন লাল পতাকা উড়ছে পত্‌পত্ করে। হিন্দুস্থানী মেয়েপুরুষের ভিড়, মন্দিরের চত্বর থেকে মাঝে মাঝে 'জয় সিয়ারাম, জয় সিয়ারাম' ধ্বনি ভেসে আসছে। কখনো বা 'বজরংবালী কি জয়।'

মন্দিরের সঙ্গে পাঁচিল-ঘেরা একটা কুস্তির আখড়ায় এ ক'দিন দঙ্গল বসেছিল। দশেরার দিন তাদের মেডেল দেওয়া হয়। তারপর সব মরদ আর জেনানার দল শোভাযাত্রা করে রামলীলাব ময়দানের দিকে চলতে শুরু করে।

বাঙালীটোলার লোকেরাও রাবণ-পোড়ানো দেখতে চলেছে। অনেকদিন ধরে যারা এখানে আছে, তাদের কথাবার্তায় যেমন হিন্দী ঢুকে যায় অজান্তেই, তেমনি দঙ্গলের আখড়া ঘিরে দাঁড়িয়ে কুস্তি দেখা কিংবা রাবণবধ দেখতে যাওয়ায় তাদেরও সমান উৎসাহ।

রূপা, নিরুপম, নিরুপমের দু'বোন, একজন রূপার সমবয়স্ক সুধা, আরো অনেক ছেলেমেয়ে দলবেঁধে চলেছে সেদিন। ওরা ভিড়ের মধ্যে যাবে না, লাইনের পার থেকে দাঁড়িয়ে রাবণ-পোড়ানো দেখবে। বয়স্কদের মধ্যেও দু'একজন ছিল।

রামলীলার ময়দানটা বিরাট। একদিকে পরিত্যক্ত কোয়ারেন্টাইন, কেউ বলে যখন প্লেগ হয়েছিল, কেউ বলে বসন্ত মহামারীর সময় সরকার থেকে ওটা করে দিয়েছিল। চারপাশে তার পাঁচিল দিয়ে ঘেরা, ভেতরে জঙ্গল, ওটা কোনদিন কোন কাজেই লাগেনি। আরেক দিকে খৃস্টানদের কবরখানা, দেবদারু গাছ, সব সময় মার্বেলের মত ঠাণ্ডা। কবরখানার মধ্যে ওরা একদিন বেড়াতে গিয়েছিল।

কবরখানা আর কোয়ারেন্টাইনের সামনে বিরাট একখানা মাঠ। লোকে বলতো, রামলীলার ময়দান। সেই মাঠে একটা অতিকায় রাবণ বানানো হয়েছে। দৈত্যের মত দশমুণ্ড রাবণ দাঁড়িয়ে আছে যেন মাথাগুলো আকাশে ঠেকবে। পাশাপাশি দশটা মুখ, ইয়া ইয়া গোঁফ, ভাটার মত দশ দু'গুণে কুড়িটা চোখ, হাতে একটা প্রকাণ্ড তরোয়াল।

রূপার তখন কতই বা বয়স, সতেরো আঠারো। না, বোধহয় আরেকটু বেশি। মেয়েদের কলেজ ছিল একটু দূরে, রূপাদের একটা বাঁধা টমটম ছিল, সেই টমটম করে ও কলেজ

থেকে ফিরতো। সুধাটা পাশ করতেই পারেনি।

ওরা তখন রেললাইন পার হচ্ছে। পার হয়েই ঢল নেমে গেছে অনেক নিচে। সেখান থেকে বিশাল চেহারার রাবণকে অদ্ভুত দেখাচ্ছিল, তার চেয়েও অদ্ভুত লাগছিল মাঠে জড়ো হওয়া মানুষগুলোকে। কারো কারো হাতে লম্বা বাঁশে তেকোনা লালপতাকা। দূর থেকে, বিশেষ করে ময়দানটা অনেক নিচে নেমে গেছে বলে মানুষগুলোকে খুব ছোট দেখাচ্ছিল।

রূপা হঠাৎ কি ভেবে হেসে উঠে বলল, নির্পমদা, দ্যাখো দ্যাখো···

ওরা সবাই হাসছিল, শুধু সুধা বলে উঠেছিল, নির্পমদা বলিস কেন রে, নিরুপমদা বলতে পারিস না ?

নিরুপম ওদের দিকে তাকিয়ে হেসেছিল, আর রূপা রাগের ভান করে বলেছিল, আমার যা ইচ্ছে বলবো, নির্পমদা কি তোর একার ?

তারপর একটু দূরে কালো সাহেবের মেয়ে গঙ্গা আর যমুনাকে দেখতে পেয়ে হাত নেড়েছিল রূপা, চিৎকার করে ডেকে বলেছিল, যমুনা, চলে আও ইধর, রাবণসে পাকড়া যাওগী, কিংবা ঐ রকম কিছু একটা। এতকাল পরে নিরুপমের হিন্দী-টিন্দি এখন আর মনে নেই।

শুধু মনে আছে গঙ্গা চোখে চোখে কি যেন বলেছিল, রূপাকে, আর যমুনার দিকে ইশারা করে রূপা হেসেছিল। যমুনা মেয়েটা খুব লাজুক ছিল, ও রেগে গিয়ে আর এদিকে তাকায়নি।

আসলে নিরুপম কিছু ভেবে বলেনি, একদিন শুধু গল্প করতে করতে বলেছিল, মারাঠী মেয়েরা দেখতে খুব সুন্দর। এই কথাটা নিয়ে রূপা নিশ্চয় যমুনাকে রাগাতো। নিরুপমের সেজন্যে ওদের হাসি-হাসি ইশারা খারাপ লাগলো।

নিরুপম অসন্তুষ্ট হয়েছে বুঝতে পেরেই রূপা ভালমানুষের মত আরো কাছে এসে দাঁড়াল নিরুপমের। বললে, দ্যাখো দ্যাখো নির্পমদা, গ্যালিভার্স ট্র্যাভেলসের বইয়ের সেই ছবিটার মত। ক্ষুদে মানুষগুলো যেন গ্যালিভারকে ঘিরে আছে।

নিরুপমের নিজেরও ঠিক সেইরকমই মনে হচ্ছিল। মানুষগুলো যেন তুচ্ছ।

সেই সময় ভিড়ের মধ্যে থেকে আকাশ ফাটিয়ে বজরংবলী মহাবীরজী-র জয়ধ্বনি উঠল। মনে হল, ওরা সকলেই যেন সমবেতভাবে রাবণ নিধনে অংশ নিতে চাইছে। যেন যত অন্যায় অবিচার তার প্রতীক ঐ অতিকায় রাবণের মূর্তিটা। ওটাকে বধ করতে পারলেই মুক্তি।

তখন ও আদর্শবাদী সদ্য যুবক। জানতো না প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে একটা করে রাবণ বাসা বেঁধে আছে। সমাজের চোখে যে রাবণ, তাকে বাণবিদ্ধ করতে পারলেই যেন সব সমস্যার সুরাহা হবে। কিন্তু বুকের মধ্যে যে রাবণ লুকিয়ে থাকে, তাকে যে পোড়ানো যায় না, অনুশোচনার আগুনে শুধু নিজেকেই পুড়তে হয়।

রাত্তিরে খেতে বসে রূপাই কথাটা তুলেছিল।—আচ্ছা, এখনো রাবণ পোড়ানো হয় নির্পমদা ? ইস্, এত ইচ্ছে করে না একবার গিয়ে দেখে আসতে। যাবে একবার, সবাই দলবেঁধে যাবো।

নিরুপম হ্যাঁ না কিছুই উত্তর দেয়নি, কারণ সেদিনের সেই দৃশ্যগুলো চোখের সামনে ভেসে-ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ওর বুকের ভেতরে লুকিয়ে থাকা রাবণটাকে ও দেখতে পেয়েছিল। ও চোখ তুলে তাকাতে পারছিল না।

খাবার টেবিলে মুখোমুখি বসে গল্প করতে করতে এক-একবার খাওয়া বন্ধ করে ফেলছিল রূপা। নিরুপম ধমক দিল—খাওয়া শেষ করো তো আগে, গল্প করতে গেলে তোমার আর আর কিছু মনে থাকে না।

রূপা হেসে উঠল।—নীল রঙমাখা রামকে মনে আছে ? পাঙ্কীর ধারে বাতাসা বিক্রি করতো।

সব মনে আছে নিরুপমের। আছে বলেই ওর কোন পরিত্রাণ নেই, কোন মুক্তি নেই।

রূপা সেদিন ওর গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, দেখছিল নীল রঙমাখা রাম হাতে তীর ধনুক নিয়ে অনেক দূর থেকে বাণ মারবার চেষ্টা করছে।

দেখে ওরা সবাই হেসেছিল। রূপা বলেছিল, রামকে একেবারে লিলিপুটের মত দেখাচ্ছে।

সুধা বলেছিল, ওর হাতের তীর অদ্দূরে যাবে নাকি !

সবাই খুব হাসাহাসি করছিল, আর পাশে দাঁড়ানো একজন ভক্ত গোছের লোক খুব রেগে গিয়েছিল ওদের হাসতে দেখে।

খাবার টেবিলে বসে ওরা কখন দু'জনেই সেই সব স্মৃতিতে ডুবে গিয়েছিল।

নিরুপম খাওয়া থামিয়ে বললে, সত্যি সব যেন এই সেদিনের কথা।

—তীরটা ক'হাত গিয়েই পড়ে গেল, মনে আছে ? বলে হেসে উঠল রূপা। বললে, কিন্তু রাবণ যখন পুড়তে লাগলো, গ্র্যাণ্ড লাগছিল, না নির্পমদা।

নিরুপম হেসে ফেললে। আসলে তীরটা কিছুই না, রাবণের অতিকায় মূর্তিটা ছিল কাগজ আর কার্ডবোর্ডে তৈরি। ভিতরে বোমাটোমা রাখা ছিল। কেরোসিন ভেজানো একটা অগ্নিবাণ ছুঁড়ে দিল কেউ। সঙ্গে সঙ্গে দুমদাম করে বোমা ফাটতে আরম্ভ হ'ল। মূর্তিটা দাউদাউ করে আগুনে জ্বলে গেল, সারা আকাশ আগুন। এদিক-ওদিক হাউই ছুটলো, তুবড়ি পড়লো আর আকাশ কাঁপিয়ে জয়ধ্বনি দিল হিন্দুস্থানীরা।

ওদেব দু'জনেরই খাওয়া হয়ে গেছে তখন, তবু খাবার টেবিল থেকে উঠতে ইচ্ছে হল না। বসে বসে স্মৃতি মন্থন করতে ভাল লাগছিল।

হঠাৎ কি মনে পড়তে নিরুপম নিজের মনেই হাসল।

রূপা তাকালো ওর দিকে। বললে, হাসলে যে !

—তুমি কি বলেছিলে জানো, রাবণ পোড়ানো দেখে ফেরার পথে ? বলেছিলে, রাবণকে তোমার খুব ভাল লাগে। বলেছিলে, হরধনু-ভঙ্গের চেয়ে তরোয়াল উচিয়ে জটায়ু বধ করে সীতাকে নিয়ে যাওয়া···

রূপা! শব্দ করে উঠল। বললে, তখন খুব বোকা ছিলাম, না নির্পমদা। একটু চুপ করে থেকে বললে, আমি তো চিরকাল বোকাই রয়ে গেলাম।

রূপার কথার মধ্যে আরো কোন অর্থ আছে কিনা খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো নিরুপম। কথাটা ঈষৎ একটা ধাক্কা দিয়ে গেল ওকে। ওর মনের মধ্যে একটা পাপবোধ আছে। সেটাকে মনে আছে। সেটাকে মনে পড়িয়ে দিল। মনে পড়িয়ে দিল একটা সুন্দর সম্পর্ককে, বা সুন্দর প্রেমকে, যা ও একদিন হত্যা করে ফেলেছিল। তারপর থেকে অন্য স্মৃতিগুলো ম্লান হয়ে গিয়েছিল, আর সেই পাপবোধ ওকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়িয়েছে।

এখন সেই সুন্দর সম্পর্কটা ফিরে পেতে ইচ্ছে করছে।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পর নিরুপম একসময় হঠাৎ বললে, তোমার হাতে কি কিছু হয়েছে ? খুলে বললে না এখনো।

সঙ্গে সঙ্গে রূপার স্মৃতিতে উজ্জ্বল মুখখানা বিষণ্ণ দেখালো।

৪

নিরুপমের অ্যালবামে রূপার কোন ছবি নেই। অ্যালবামে নিরুপমের নিজেরই কোন ছবি নেই। যেগুলো আছে, তার কোনটার মধ্যেই তো আমি নেই, নিরুপম ভাবলো। অলকা কি জানে, এক এক সময় নিরুপম ঋষির মত পবিত্র হয়ে উঠতে চায়। আবার কখনো কখনো ওর ভেতরটা জন্তু, জন্তুর মত হয়ে যায়। আপিসের পোশাকে ও একরকম, বাড়িতে ডেকচেয়ারে শুয়ে অন্য মানুষ। এ-সব কেউ বুঝতে পারে না, অলকাতো আরো বুঝতে পারে না।

অলকার কথা মনে পড়তেই অস্বস্তি বোধ করলো নিরুপম। রূপা আসার পর থেকে নিরুপম যেন অন্য মানুষ হয়ে উঠতে চাইছে। হারানো রঙগুলো আবার যেন ফিরে পাচ্ছে। কিন্তু বুকের মধ্যে খিচখিচ। এই যে রূপা হঠাৎ এসে পড়েছে একা একা, অলকাকে একটা চিঠি লিখে জানানো দরকার। কে জানে, সুধার কাছ থেকে শোনার পর থেকে, ভিতরে ভিতরে রূপা সম্পর্কেকোন সন্দেহ পুষে রেখেছে কিনা। কিন্তু তার চেয়ে বড় সংকোচ সামনের ফ্ল্যাটের অবনীবাবুকে, সুহাসবাবুর বাড়ির মেয়েদের। ওরা কেউ কিছু ভেবে বসবে কিনা নিরুপম বুঝতে পারছে না।

আসলে ওর সবচেয়ে বড় ভয়, অভ্যস্ত জীবনের নিয়ম থেকে ও বেরিয়ে আসছে; অলকা ফিরে আসার পর কথায় কথায় বিপিন হয়তো বলে বসবে, দাদাবাবু খেতে বসে রাত বারোটা অবধি গল্প করতো। অলকার মুখ গম্ভীর হয়ে যাবে, তুমি তো বাড়িতে কারো অসুখ হলেও দশটার পর জেগে থাকতে পারো না।

ঝুমাদের কিংবা অবনীবাবুকে কিছু একটা বলা দরকার। ওদের তো কৌতূহলের শেষ নেই। কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও যে নিরুপমের বুকের মধ্যে কাঁটা বিঁধছে তার কারণ, ওর নিজের মনের মধ্যে যে একটা পাপবোধ রয়ে গেছে। এইতো সামনাসামনি বসে এত হেসেছে, গল্প করেছে রূপার সঙ্গে, কিন্তু মাঝে মাঝেই ওর মনে হয়েছে, ওরা দু'জনেই যেন ভুলে যাওয়ার অভিনয় করছে। ভুলে যেতে পারলে বেঁচে যেতো নিরুপম। সুন্দর সম্পর্কটা আবার নতুন করে গড়ে তুলতে পারতো।

নিরুপম ভেবেছিল, ট্রেন জার্নির ক্লান্তি, তার ওপর অনেক রাত অবধি গল্প করেছে রূপা, ও নিশ্চয় অনেক বেলায় ঘুম থেকে উঠবে।

বিছানা থেকে উঠে কলঘরে যাবার সময় দেখল, বারান্দার দিকের বুবুনের ঘরের দরজা হাট করে খোলা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়লো জানালার পাটিতে চুপ করে বসে আছে রূপা, বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। সাদার ওপর কমলা রঙের ডুরে শাড়ি পরেছে। এলো চুল ছড়িয়ে নেমেছে পিঠ বেয়ে। বেশ বোঝা গেল রূপা স্নান করে নিয়েছে এই সকালেই। খুব স্নিগ্ধ আর সুন্দর লাগছিল তাকে।

পায়ের শব্দে এক পলকের জন্যে ফিরে তাকালো, একটা চাপা খুশির অঙ্কুর রূপার ঠোঁটের কোনায় চোখের কোনায় উঁকি দিয়েই ম্লান হয়ে গেল।

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ও আবার উদাস দৃষ্টি মেলে তন্ময়তার মধ্যে ডুবে গেল।

এমনি একটা উদাস বিষণ্ণতা মাঝে মাঝেই ওকে পেয়ে বসে। কখনো কখনো একটা আতঙ্ক। সে-সময় ওর কান্না পায়।

একটু আগেই রূপা ওর বাঁ-হাতটার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল। যখনই একা থাকে, মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখে। কিন্তু এই দুর্বোধ্য রোগটা, ওকে ক্রমেই আতঙ্কিত করে তুলছে। কবে কোথায় যেন কব্জিতে একটা ছোট্ট আঘাত লেগেছিল। ক্রমশ একদিন বুঝতে পারলো ওর আঙুলগুলো অবশ হয়ে যাচ্ছে। ডাক্তার প্রথম বলেছিল, বোন টিবি।

একটু একটু করে কব্জির ওপর উঠল যন্ত্রণা, কনুই অবধি। এক এক সময় সে কি অসহ্য যন্ত্রণা! তখন ওর মনে হয়েছে একটু একটু করে সমস্ত হাতখানাই অবশ হয়ে যাবে। তারপর হয়তো সমস্ত শরীর। ছোটবেলায় একজন প্যারালিসিসের রোগীকে দেখেছিল রূপা। একদিন স্বপ্ন দেখেছিল, ওর সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে প্যারালিসিসে। সঙ্গে সঙ্গে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল ও। হৃষীকেশের ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সে চিৎকারে, সব শুনে, হেসে বলেছিল, তোমার যত পাগলামি। শুনে সেদিন ওর খুব কষ্ট হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওর কেন জানি মনে হয়েছিল নির্পমদা ওর রোগটাকে এভাবে অবহেলা করতো না।

চোখ মুখ ধুয়ে এসে নিরুপম তখন জানালার ধারে পাশটিতে দাঁড়িয়েছে।

রূপা কোন কথা বললো না।

নিরুপমের লোভ হচ্ছিল রূপার পিঠ বেয়ে ছড়িয়ে পড়া হাল্কা চুলের ঢেউয়ে হাত ছোঁয়াতে। কিন্তু পারলো না, কি জানি রূপা কি ভেবে বসবে।

রূপা জানালার পাটিতে তেমনি নিঃশব্দে বসে রইলো, একবার শুধু মুখ ফিরিয়ে চোখ তুলে তাকালো। ধীরে ধীরে বললে, আজকের এই ভোরবেলাটা খুব সুন্দর লাগছে।

একটু থেমে বললে, ঠিক এমনি ভোরে আমরা একবাব শিউলি ফুল কুড়োতে গিয়েছিলুম সরস্বতী পুজোর সময়।....সেই সব দিনগুলোই ভাল ছিল।

নিরুপম চুপ করে রইলো। আর রূপা হঠাৎ বিষণ্ণ গলায় বললে, জানো নির্পমদা, এরপর বাঁ হাতে আমি হয়তো একটা ফুলের সাজিও ধরতে পারবো না।

ওর গলার স্বরে কেমন একটা করুণ সুরের রেশ বাজলো। নিরুপম অনুভব করলো সেই মুহূর্তে ও যেন রূপার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। দুটি মন যেন আবার সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে ঘন হয়ে বসেছে পাশাপাশি। রূপা, আমরা দুজনেই জানি এই মনে পড়ে মনে পড়ে খেলার মধ্যে আমবা দুজনেই বলতে চাইছি, ভুলে গেছি ভুলে গেছি। আমি দুহাতে অনুশোচনার অর্ঘ্য নিযে এসেছি, তোমার দু চোখে স্বর্গীয় ক্ষমা। রূপা, সেই পাপবোধ আমাকে সারাজীবন তাড়া করে বেড়িয়েছে। রূপা, তুমি আরেকবার আমাকে সুযোগ দাও, আমি প্রেমের মত পবিত্র হয়ে উঠবো।

নিরুপম ভাবলো, আমাদের সমস্ত জীবনটা হয়তো এইরকম একটা প্রার্থনা। আমরা কেবলই নতুন করে শুরু করতে চাই। জীবনের বাঁকে বাঁকে আমি তো কত ছোট ছোট অপরাধ করে গেছি, কত অন্যায় নীচতা। কিন্তু তার একটাও তুচ্ছ হয়ে যায়নি, ভুলতে পারিনি, আজো তারা তাড়া করে বেড়ায়। ওর তো এক এক সময় মনে হয়েছে নিশীথ আর ব্রিজলালের সঙ্গে আবার যদি দেখা হতো, ও তাদের কাছে একবার ক্ষমা চেয়ে নিতো। অফিসের স্টেনো মেয়েটি, কিংবা যাকে ডিঙিয়ে ও প্রোমোশন পেল, পেয়েও দেখলো পাওয়ার মতো কিছু নয়, সকলের কাছেই ক্ষমা চেয়ে নিয়ে জীবনটাকে যদি আবার নির্ভুলভাবে গড়ে নিতে পারতো। রূপা, রূপা, আমি জানতাম না তুমি আমাকে আবার সেই সুযোগ দেবে।

এই সামান্য কয়েক মুহূর্তের মধ্যে নিরুপম একেবারে অন্য একটা নিষ্পাপ জগতে চলে গিয়েছিল, রূপাব কথায় ওর চমক ভাঙলো। গাঢ় শান্ত গলায় রূপা বললে, ভাগ্যিস রোগটা বাধিয়ে বসেছি নির্পমদা, তা না হলে তোমার সঙ্গে দেখাই হতো না।

নিরুপম কোন জবাব দিতে পারলো না, রূপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। এখন ওর মনে হচ্ছে, মাঝখানে যে বয়সগুলো চলে গেছে, সেগুলো যেন অপ্রাসঙ্গিক একটা অধ্যায়ের মতো। একজন হৃদয়ের সঙ্গে এমন আত্মীয়তা গড়ে নেয়, অনেক বছর বাদেও দেখা হলে মনে হয় এই তো উঠে গিয়েছিল কথা বলতে বলতে, আবার ফিরে এসে কথা শুরু করেছে। রূপাকে ঠিক তেমনি মনে হচ্ছে।

নিরুপম হাত বাড়িয়ে বললে, দেখি তোমার হাতখানা।

রূপা হেসে উঠল, তুমি কি হাত দেখাও শিখেছো নাকি ? ভবিষ্যৎ-টবিষ্যৎ বলতে পারো ?

নিরুপম দার্শনিকের মত বললে, আমাদের কারো কোন ভবিষ্যৎ নেই।

আসলে ও বলতে চাইলো, আমাদের শুধু অতীতের জন্যে অনুশোচনা।

রূপা ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে, ওর অসুখের কথা জানতে চাইছে নিরুপম। ও থমথমে গলায় বললে, ওখানে কতবার এক্স-রে করলাম, কত ডাক্তার দেখালাম। প্রথমে ভেবেছিলাম বোন টি বি, একজন বললে ক্যান্সার হতে পারে। অসুখ অসুখ শুনে আমার নিজেরই এখন নিজেকে ঘেন্না করে। চিঠি লিখে ব্যবস্থা করলাম। স্পেশালিস্ট দেখাবো, ডাক্তার সেন চিঠি দিলেন, সব ঠিকঠাক, কিন্তু ওর নাকি এখন অনেক কাজ। রেগে গিয়ে বললাম, রতনবাবুর সঙ্গে আমি একাই যাবো। কেউ না থাক, নির্পমদা আছে।

বলে নিরুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে ও হাসল।

তারপর ঝট করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ও মা, তোমার এখনো চা খাওয়া হয়নি।

নিরুপম বাধা দিয়ে বললে, আরে না না, বিপিন আছে।

রূপা যেতে যেতে হাসিমুখে ফিরে দাঁড়াল। বললে, তখন সময় নেই অসময় নেই, চা খেতে চেয়ে কত জ্বালিয়েছো, এখন নয় আমিই একটু জ্বালালাম।

রূপা চলে গেল, আর নিরুপমের মনে হল, বয়স সবচেয়ে বড় ক্ষমা। তখন, তখন, তখন। কিন্তু সেই একটা ঘটনার কথা ওরা কেউই তুলছে না। ভান করছে, যেন ভুলে গেছে।

ঠিক তখনই দরজায় বেল বাজলো। সচকিত হয়ে উঠল নিরুপম। এ সময়ে কারো আসার কথা নয়। তবু ওর কেমন যেন ভয়-ভয় করলো। অলকা নেই, অথচ....কোন আত্মীয়স্বজন এসে পড়লে ওর আর দুর্নামের শেষ থাকবে না।

না, অবনীবাবু। সামনের ফ্ল্যাটের অবনীবাবু। বললেন, বিপিন আছে ? গোটা কয়েক দেশলাইয়ের কাঠি চাই, দেশলাই ফুরিয়ে গেছে। কি ঝঞ্ঝাট বলুন, তিনতলা থেকে নেমে এতখানি হাঁটতে হবে, এই সব ফ্যাসানের পাড়ায় মশাই আমার একদম পোসায় না। অবনীবাবু কথা বাড়াবার চেষ্টা করলেন।

নিরুপম বিরক্ত হল, কিন্তু দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থেকেই বিপিনকে দেশলাইটা দিয়ে যেতে বললে। ও সরে এলেই অবনীবাবু পিছন পিছন ঢুকে পড়তে পারেন। রূপা হয়তো চায়ের পেয়ালা নিয়ে সামনে পড়ে যাবে। তারপর শুরু হয়ে যাবে ফ্ল্যাটে ফিসফাস। ছি ছি, বউকে জামসেদপুরে পাঠিয়ে দিয়ে একটা মেয়েকে নিয়ে এসে ...অলকা সব শুনে হয়তো ঠোঁট উল্টে বলবে, তোমার সেই বুলাপিসি না কি বলতে যেন, তার মেয়ে। যেন মানুষে মানুষে সম্পর্কগুলো সব ওদের জানা হয়ে গেছে। যেন রূপার মুখের ওপর বলা যায়, না না, এ বাড়িতে তোমার থাকা চলবে না।

বিপিন দেশলাই দিয়ে যেতেই অবনীবাবু চলে গেলেন। আর নিরুপম ভাবলে, এ সময়ে একটা লোককে বলা যায় না, ও মশাই শুনুন, আমরা যখন লালচকে থাকতাম, শাখায়-প্রশাখায় ওদের সঙ্গে আমাদের একটা আত্মীয়তাও আছে, ওর একটা কঠিন রোগ হয়েছে, ডাক্তার দেখাবার জন্যে এসেছে।

দরজা বন্ধ করার একটু পরেই চায়ের পেয়ালা হাতে রূপা এল। জিজ্ঞেস করলে, কে এসেছিল ? শুনে হেসে ফেলে বললে, আমি কে জিজ্ঞেস করেনি ? কি বললে তুমি ?

নিরুপম বললে, ওরা এখনো কেউ জানেই না তুমি এসেছ।

রূপা শব্দ করে হেসে উঠল।—এই ! তুমি কি আমাকে লুকিয়ে রেখেছো নাকি ?

কথাগুলো ওর কাছে রহস্যের মত লাগলো। তারপরই মনে হল রূপা বোধ হয় জানতে চাইছে, ওদের মধ্যে সেই সুন্দর সম্পর্কটা আছে কি না, কিংবা নিরুপমের মধ্যে সেই নিষ্পাপ মানুষটা।

৫

রূপাদের বাড়ি থেকে খানিকটা গিয়ে পাঁচিল-ঘেরা একটা প্রকাণ্ড মাঠ, পাঁচিলের ইঁট খসে খসে পড়ছে, তার ফাঁকে শ্যাওলা জমছে, অশ্বত্থের চারা গজিয়ে উঠেছে, নতুন পাতা চিক-চিক করছে রোদ্দুরে। আবার এক জায়গায় পাঁচিল ভেঙে রাস্তা করে নিয়েছে ওপারে খালাসিখোলির লোকেরা, সেখান দিয়ে সবাই যাতায়াত করে। এই মাঠের আগে হয়তো কোন নাম ছিল, তবু হিন্দুস্থানীরা বলতো কবুতরবাগ।

সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো বড় নালাটা লাফিয়ে পার হলেই কবুতরবাগের বাগান। কিন্তু বাগান বলতে তখন আর বিশেষ কিছুই ছিল না। কয়েকটা গাছ এখানে সেখানে, আর ঝাঁকঝাঁক পায়রা উড়তো, উড়ে এসে বসতো পাঁচিলে, মিশিরজীর মন্দিরে, রূপাদের বাড়িতেও। সেজন্যেই হয়তো নাম হয়েছিল কবুতরবাগ। খুব উঁচু একটা বাঁশ পুঁতে দিয়েছিলেন মিশিরজী। বাঁশের মাথায় বাতা দিয়ে তৈরি পায়রা বসার খুপরি। ওটাকে কি বলে নিরুপম জানতো না।

কবুতরবাগের সর্টকাট রাস্তা ধরে হাসপাতাল যাবার সময় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল নিরুপম। নরম রোদ্দুরে ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা ঘুরে ঘুরে উড়ছিল, তাদের সাদা আর রঙিন পালকগুলো আলোয় ছায়ায় পলকে পলকে রঙ পাল্টাচ্ছিল, উড়তে উড়তে নেমে এসে পাঁচিলে বসছিল, বাঁশের ডগার ঐ চৌখুপিতে। ওটাকে কি বলে নিরুপম জানতো না।

হাতে টিফিন কেরিয়ার, পাঁচিল ডিঙিয়ে লাফ দিয়ে ওপারে যাবার সময় রূপা হেসে উঠেছিল প্রশ্ন শুনে। বলেছিল, এই নাকি জুয়েল ছেলে, তুমি তো কিছুই জানো না, ওটাকে ব্যোম বলে।

নিরুপমের খুব ভাল লাগছিল, ও দাঁড়িয়ে পড়ে একটুক্ষণ পায়রাদের খেলা দেখল। ঝকঝকে ঠাণ্ডা রোদ্দুরে নানা রঙের পালক মেলে পায়রার দল উড়ছিল, ঘুরছিল, নেমে এসে বসছিল।

রূপা তাড়া দিয়ে বললে, এই, খাবার দিয়ে আসার সময় পার হয়ে যাবে, চলো চলো, মা বসে আছে।

রূপার মা তখন দিনকয়েকের জন্যে হাসপাতালে ছিলেন, অসুখটা কি নিরুপমের ঠিক মনে নেই। রূপা টিফিন কেরিয়ারে রোগীর পথ্য নিয়ে যেতো, রূপার মা হাসপাতালের খাবার খেতে পারতেন না।

হাসপাতালে যেতে হতো খালাসিখোলির ভিতর দিয়ে, রেলের ইয়ার্ড পার হয়ে, তাই রূপার বাবা বলেছিলেন, তাঁর আপিসের পিওন গিয়ে খাবার দিয়ে আসবে।

রূপা রাজি হয়নি। ও নিজে বসে থেকে মাকে না খাইয়ে এলে তৃপ্তি হতো না। বাবা মাকে রূপা ভীষণ ভালবাসতো। মা ছিল ওর বন্ধুর মতো। মাকে কোন কথা না বলে থাকতে পারতো না।

তাই রূপার বাবা বলেছিলেন, ও রাস্তায় একা যাসনে, বরং নিরুপমের তো এখন কলেজের ছুটি....

কবুতরবাগানের পাশ ঘেঁষে ছিল ধান-চালের গোডাউন, ওয়াগন থেকে নামিয়ে রাখা

হতো ওখানে, তারপর লরী করে, ঠেলায় করে চালান হয়ে যেতো চকবাজারে। মাল নামানো-ওঠানোর সময় যে-সব শস্যকণা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তো, তারই লোভে পায়রার ঝাঁক উড়ে আসতো, খুঁটে খুঁটে দানা খেতো তারা, উড়ে গিয়ে বসতো কবুতরবাগে।

কবুতরবাগের জং-ধরা লোহার ফটকের দু'পাশে দু'খানা শ্যাওলা-ধরা ঘর ছিল। একখানা ঘরে মহাবীরজীর মূর্তি বসিয়ে পুজো-আর্চা করতেন মিশিরজী। পাথরের হনুমান মূর্তিটায় তেল সিঁদুর লেপে লেপে টকটকে লাল হয়ে থাকতো তার সর্বাঙ্গ। চকবাজার থেকে হিন্দুস্থানী মেয়েরা ভিড় করে এসে পুজো দিয়ে যেতো। মিশিরজীর মেয়ে ছিল রূপার সমবয়সী, সে ধূপধুনো জ্বালাতে জ্বালাতে রূপাকে দেখতে পেলেই উঠে এসে চিৎকার করে ডাকতো, সহেলী।

সহেলী মানে সই। ওরা দু'জনে খুব বন্ধু ছিল। ও ডেকে জিজ্ঞেস করতো মাতাজী কেমন আছে, কবে ফিরবে হাসপাতাল থেকে। বলতো, মাতাজীর জন্যে আমি পূজা চড়িয়েছি, দেখো, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবেন।

হাতের টিফিন কেরিয়ার দেখিয়ে রূপা বলতো, এখন সময় নেই সহেলী, দেরি হয়ে যাবে। ভাল হিন্দী জানতো, ওদের মেয়েদের কলেজে সবাই হিন্দী বলতো।

সহেলীর কথা শুনতে শুনতে রূপা নিজেই একদিন বললে, মিশিরজীর মন্দিরে মার জন্যে পূজা দেবো, চকবাজারে গিয়ে ফুলবাতাসা কিনতে হবে, যাবে নির্পমদা।

নিরুপম হেসে ফেলে বলেছিল, হিন্দুস্থানী মেয়েগুলোর সঙ্গে মিশে মিশে তুমি হিন্দুস্থানী হয়ে যাচ্ছো। হনুমানকে আবার কি পূজা করবে?

রূপা রেগে গিয়েছিল।—ঠাকুর ঠাকুর, তার আবার বাঙালী হিন্দুস্থানী কি! তারপর হেসে উঠে বলেছিল, গঙ্গা যমুনা কি হিন্দুস্থানী, ওরা তো মারাঠী। বলো তো ওদের সঙ্গে আর মিশবো না।—বলে কেমন যেন হেসেছিল।

নিরুপম বুঝতে পেরেছিল রূপা ওকে রাগাতে চাইছে। যমুনা সম্পর্কে ওর কোন দুর্বলতাই ছিল না। কোনদিন তার কথা ভাবেওনি।

—না যাবে না যাবে, আমি একাই যেতে পারবো। রূপা কপট অভিমানে বলেছিল।

নিরুপম বুঝতে পেরেছিল, ওর মার অসুখের সময় ঠাকুর নিয়ে ঠাট্টা করা উচিত হয়নি। ও যেতে রাজি হয়েছিল।

দু'জনে চকবাজার ঘুরে ঘুরে ফুল-বাতাসা মিষ্টি কিনেছিল। তারপর মিশিরজীর মন্দিরে এসে ফুল-বাতাসার চাঙারি নামিয়ে খুব ভক্তিভরে রূপা হনুমানজীর মূর্তিটাকে প্রণাম করেছিল। দেখাদেখি নিরুপমের মনে হয়েছিল তারও প্রণাম করা উচিত।

প্রণাম করে উঠতেই মিশিরজী রূপাকে বলেছিলেন, আও বেটি।

নিরুপমকেও বলেছিলেন, আও বেটা।

ফর্সা ধবধবে লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান চেহারা ছিল মিশিরজীর, গলায় পৈতে, মোম দিয়ে মাজতেন মাঝে-মাঝে। দেখলে, সত্যি সত্যি ভক্তি হতো। মধ্যমা আঙুলে হনুমানজীর পায়ের সিঁদুর তুলে নিয়ে মিশিরজী বললেন, আও বেটা, আও বেটি। তারপর একবার রূপার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিলেন, একবার নিরুপমের কপালে।

রূপাকে সেদিন অন্যরকম লাগছিল। সাজলে ও তো বিন্দির টিপ পরতো শাড়ির রঙ মিলিয়ে। সেদিন ওর মার লালপাড় গরদের শাড়ি পরেছিল। ওর ফর্সা কপালে ডগডগে সিঁদুরের ফোঁটায় ওকে উজ্জ্বল পবিত্র একটা ঘৃত-প্রদীপের শিখার মত লাগছিল।

কথা বলার অছিলায় নিরুপম বার বার ওর দিকে ফিরে ফিরে তাকাচ্ছিল। আর বার বার ওর মাথার মধ্যে ঘুরছিল মিশিরজীর কথা—আও বেটা ও আও বেটি।

ডাক্তার সেনের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসার সময় সেদিনকার দৃশ্যগুলো নিরুপমের চোখের সামনে ফুটে উঠল। বৃদ্ধ ডাক্তার সেনের সঙ্গে মিশিরজীর চেহারায় কোথায় যেন একটা মিল আছে। তেমনি সৌম্যদর্শন, শান্ত, স্থির। প্রথমে তিনিও একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। রূপার কব্জিতে, আঙুলের গিটে গিটে ঠুকে ঠুকে পরীক্ষা করলেন, এক্স-রে রিপোর্ট দেখলেন, তারপর একটু একটু করে তাঁর মুখে হাসি ফুটলো।

প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে সব বুঝিয়ে দিলেন, বললেন, কিছু ভয় নেই মা, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি। সময় লাগবে, কিন্তু সেরে যাবে।

বললেন, ও একটা নার্ভের অসুখ, অনেক আগেই আসতে হতো।

তারপর ওদের বিদায় জানাবার সময় চেম্বারের দরজা পর্যন্ত উঠে এসে নিরুপমের কাঁধে হাত রেখে বললেন, ইয়ং ম্যান, ভাবনার কিচ্ছু নেই।

সে সময় নিরুপম লক্ষ্য করেছে রূপার মুখ ঈষৎ অপ্রতিভ হয়েই এক ঝলক উল্লাসে ঢাকা পড়ে গেল।

বেরিয়ে এসেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত রূপার ঠোঁটের কোণে একটা চাপা কৌতুকের হাসি দেখতে পেয়েছে।

ডাক্তার সেন বোধ হয় ওকে রূপার স্বামী ভেবে নিয়েছেন।

রূপার চাপা হাসিটা দেখে, কিংবা ডাক্তার সেনের কাঁধে হাত রাখা সান্ত্বনা শুনে ওর সেই মিশিরজীর কথা মনে পড়ে গেল। আও বেটি, আও বেটা। সে-সময় মিশিরজীর মেয়ে, রূপার সহেলী, সেও ঠোঁট চেপে ফিক্ ফিক্ করে হেসেছিল।

ও বোধহয় স্মৃতির মধ্যে ডুবে গিয়েছিল।

রূপা নিজের মনেই বললে, আবার এক সপ্তাহ পর আসতে বললেন।

নিরুপম হাসল।—তুমি কি তাড়াতাড়ি পালাতে চাও নাকি।

ঠিক তখনই একটা ফাঁকা ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে নিরুপম চিৎকার করলো, ট্যাক্-সি !

সেটা দাঁড়াল না, হুস্ করে বেরিয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে রূপা বললে, আমি এখন ঐ খাঁচায় ফিরবো না। একটু থেমে বললে, ঐ খাঁচার মধ্যে কি করে থাকো গো নির্পমদা !

নিরুপমের মনে হল সত্যি, এতদিন ও একটা খাঁচার মধ্যেই কাটিয়ে এসেছে। অথচ কোনদিন বুঝতে পারেনি। রূপা এসে সেই খাঁচার দরজা খুলে দিয়েছে। এমন একটা খুশির দরজা যার স্বাদ ও অনেককাল পায়নি।

রূপা বললে, আমি এখন হাঁটবো। যতক্ষণ খুশি। তারপর ডাক্তারের কথা টেনে এনে বললে, তুমি তো ইয়ং ম্যান, তোমার এত হাঁটতে ভয় কিসের ?—বলে শব্দ করে হেসে উঠল।

নিরুপম বুঝতে পারলো, ওর রোগ সেরে যাবে এই আশা পেয়ে রূপা আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠতে চাইছে।

ফুটপাত ধরে ওরা হাঁটতে শুরু করলো। এলোমেলো বাতাস আসছিল, কখনো টাটকা বাতাস, কখনো পেট্রোলের গন্ধ-মাখা।

কতদিন কতদিন, ও রূপার পাশে পাশে হাঁটেনি। হাঁটতে হাঁটতে এক একবার রূপার হাতে হাত ঠেকেছিল। এক একবার ইচ্ছে হচ্ছিল রূপার হাতখানা ছুঁতে। আঙুলে আঙুল জড়িয়ে পাশাপাশি হেঁটে যেতে। ভালবাসায় ডুবে যাওয়া একজোড়া যুবক-যুবতীকে একটু আগে সেভাবে হাঁটতে দেখেছে ওরা দু'জনেই ; এমনই পরস্পরে মুগ্ধ হয়ে হাঁটছিল যেন ফুটপাথের ভিড় কুয়াশা হয়ে মিলিয়ে গেছে, কোলাহল নিশ্চুপ হয়ে গেছে, আর ওরা দুজনেই একটা মহাশূন্য রচনা করে নিয়েছে। তাদের লক্ষ্য করে নিরুপমের দিকে তাকিয়ে রূপা মৃদু হাসল।

সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমের মনে হল, ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা উড়ছে ঠাণ্ডা রোদ্দুরে, তাদের পাখাগুলো রোদ্দুর লেগে ঝিকমিক করছে, তাদের পাখনায় রুপোর পালক, পায়রার ঝাঁক সারা আকাশ তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।

৬

এই খাঁচার মধ্যে তুমি কি করে থাকো গো নির্পমদা। প্রথম যখন শুনেছিল, আহত বোধ করেছিলো নিরুপম। এখন বুঝতে পারছে, এই ফ্ল্যাট বাড়িটার কথা বলতে চায়নি রূপা। আসলে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, যত বড় বাড়িই হোক্, যত খোলামেলাই হোক, শেষ অবধি সেই একটা খাঁচার মধ্যেই চলে ফিরে বেড়াতে হয়।

ওর অসুখ সেরে যাবে—কথাটা বিশ্বাস করে ফেলেছে রূপা। তাই ওর মুখচোখে একটা আনন্দের উদ্ভাস। সকালে উঠে ওকে দেখে অন্য মানুষ মনে হল।

নিরুপম খবরের কাগজ পড়ার ফাঁকে ফাঁকে রূপার সঙ্গে টুকরো টুকরো দু'একটা কথা বলছিল। খাটের বাজুতে ঠেস দিয়ে পা গুটিয়ে বসেছিল রূপা। দু'একবার চোখ তুলে তাকালো নিরুপম, রূপাকে দেখল। বড় সুন্দর লাগছে রূপাকে। এই রূপা যেন বয়সে আর অভিজ্ঞতায় আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে।

রূপা চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ খবরের কাগজটায় টান দিল।—এই, শোন না।

চোখ তুলে তাকালো নিরুপম।

—একটা কথা রাখবে? আব্দারের ভঙ্গিতে রূপা বললে।

নিরুপমের মনে হল রূপা যেন পুরানো দিনের মত হঠাৎ হঠাৎ ছেলেমানুষ হতে চাইছে। ও তাই মৃদু হেসে বললে, কি বলো?

ধীরে ধীরে বললে, আজকে অপিসে যেও না নির্পমদা। সারাদিন বসে বসে গল্প করবো। একটা দিন।

আর সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমের মনে হল হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়ায় ও স্নান করে নিলো। কিন্তু মুখে বললে, না না, আজ আমার অনেক কাজ, রূপা।

রূপা অনুযোগের স্বরে বললে, তোমার ইচ্ছে নেই, আমি জানি। কাজ, কাজ, তোমার হঠাৎ একদিন শরীর খারাপ হতে পারতো না, মানুষের তো কত কি ঝামেলা হয়, আপিস যেতে পারে না। তখন কি করে?

নিরুপম কোন উত্তর দিল না। ও যে খাঁচায় বন্দী। এমনিতেই পাড়াপড়শীরা কি ভাবছে কে জানে। কারণ অলকা নেই। ও এখন নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগে ফিরতে পারবে না আপিস থেকে, একদিন ছুটি নিতে পারবে না। কারণ রূপা নামের একটি মেয়ে বাড়িতে একা আছে, এক্কেবারে একা। যেন নিরুপমের প্রতিটি রোমকূপে শুধু একটাই বাসনা থাকতে পারে, অথচ কেউ জানে না, রূপার কাছে ও এখন নিজেকে বিশুদ্ধ করে নিতে চায়। একটি নিহত সম্পর্ককে ও আবার পবিত্র করে তুলতে চায়।

সেই ছোট্ট শহরে রূপাদের বাড়িটা তখন ওকে নেশার মত টানতো। রূপার মা খুব স্নেহ করতেন ওকে। রূপার বাবা যেদিন ওর সামনেই বললেন, নিরুপম একটা জুয়েল ছেলে, তারপর থেকে রূপা ওকে ঠাট্টা করে 'জুয়েল' বলে ডাকতো মাঝে মাঝে।

একদিন নিশীথ আর ও সাইকেল চালিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছিল, রূপা টাঙায় চড়ে কলেজ যাওয়ার পথে নিরুপমকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ডাকলো 'জুয়েল' বলে। রূপা

হয়ত নিশীথকে দেখতে পায়নি। কিংবা দেখলেও লালচকের কাউকে ও পরোয়া করতো না। কিন্তু নিরুপম খুব লজ্জা পেয়েছিল।

রূপার মা যত রাগ করতেন, ধমক দিতেন, রূপা ততই হাসতো। বলতো, বা রে, জুয়েলকে জুয়েল বলবো না।

তারপর রূপা রেগে গিয়ে বলেছিল, তোমাদের ঐ জুয়েল ছেলে নিশীথের সঙ্গে মেশে কেন ? নিশীথটা খারাপ, খারাপ।

নিরুপমের সেদিন নিজেরও ভাল লাগেনি, নিশীথ ওর জুয়েল নামটা কলেজে ছড়িয়ে দিয়েছিল বলে। আসলে ওদের কলেজটা ছিল মাইল দুই দূরে, সাইকেল করে যাবার সময় নিশীথ ছিল সঙ্গী। তাছাড়া নিশীথ সেই বয়সেই অনেক কিছু জানতো। নিরুপমের অনেক কিছু জানতে ইচ্ছে করতো। তাই নিশীথ সম্পর্কে ওর একটা নেশা ছিল।

জুয়েল ছেলে ! কথাটা এখন মনে পড়লে পরিহাসের মত শোনায়। আর নিশীথের ওপর একটা প্রচণ্ড রাগ জমে আছে নিরুপমের মনে।

রূপাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত করে নিরুপম বললে, আজ আপিসে অনেক কাজ, বরং তাড়াতাড়ি ফিরবো।

রূপাকে একটুখানি ম্লান দেখালো। যেন ওর ইচ্ছের আর কোন দাম নেই।

আপিসে বের হওয়ার জন্যে নিরুপম যখন পোশাক পরে তৈরি হয়েছে, তখন রূপা হঠাৎ প্রশ্ন করলে, তুমি বুঝি আজকাল টাই বাঁধো না ? তোমার অ্যালবামে একটা ছবি দেখছিলাম....

অ্যালবামটা দেখেছে রূপা। সারা দুপুর তো কোন কাজ থাকে না। তাই সব কিছু হাতড়ে বেড়ায়। অ্যালবামটা নিরুপমের টেবিলেই পড়ে ছিল।

বললে, টাই পরে দিব্যি স্মার্ট লাগে তোমাকে, ছবিতে দেখলাম, হাসল রূপা।

নিরুপমও হাসল।—তুমি টাই বাঁধতে শিখিয়ে দিয়েছিলে মনে আছে ?

একটু থেমে বললে, ঠিক আছে, তুমি যখন বললেই....

ওয়ার্ডরোব খুলে একটা টাই বের করে বললে, দাও বেঁধে দাও।

রূপা হাসিমুখে এগিয়ে এল। টাই বেঁধে দেবার চেষ্টা করলো। নিরুপম বুঝতে পারলো ওর বাঁ-হাতের অবশ আঙুলগুলো স্বাভাবিকভাবে নড়ছে না, কিংবা ওর কোন যন্ত্রণা হচ্ছে।

রূপার দু' চোখে দু' ফোঁটা জল চিকচিক করলো, ও হতাশ কান্নার গলায় বলে উঠল, তুমি বেঁধে নাও, তুমি বেঁধে নাও।

রূপার গলার স্বর কান্না হয়ে গেল।—পারবো না নির্পমদা, আমি আর কিছুই পারবো না।

নিরুপম অস্বস্তি বোধ করলো, না-জেনে রূপাকে আঘাত দিয়ে ফেলেছে বলে। ও ভরসা দিতে চাইলো, ডাক্তার সেন বলছেন, সেরে যাবে।

তারপর বললে, আমি বেঁধে নিচ্ছি, আমি বেঁধে নিচ্ছি।

আসলে ও আজকাল আর টাই পরে না। আপিসের দত্তসাহেবও পারেন না। একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আর কেন নিরুপম, গ্রেড তো পেয়ে গেছ। দত্তসাহেব খুব সিনিক টাইপের লোক। বলেছিলেন, এফিসিয়ান্সি, টাই, ইংরাজী বুকনি—ও-সব হল সিঁড়ির ধাপ। ওগুলো ওপরে ওঠার জন্যে দরকার, উঠে গেলে আর লাগে না। তখন একটা একটা করে ছাড়তে হয়। দত্তসাহেব অবশ্য অনেক ওপরে উঠে গেছেন, নিরুপম কোনদিন অত ওপরে উঠতে পারবে না।

তবু রূপাকে খুশি করার জন্যেই ও টাই পরলো। নট দিতে দিতে বললে, তোমার মনে আছে, আমি বাঁধতে জানতাম না, তোমার বাবার একটা টাই এনে তুমি বাঁধতে শিখিয়ে

দিলে।

—সত্যি, এত কথা তুমি কি করে মনে রেখেছো ? মনে রেখেছে বলে রূপার ভাল লাগলো। বললে, আমি তো তখন বাবাকে রোজ বেঁধে দিতাম। হেসে ফেলে বললো, জানো, আমার একবার অসুখ হয়েছিল, মা বেঁধে দিয়েছিল একদিন, আর আমার খুব রাগ হয়েছিল। কি বোকাই না ছিলাম!

ওসব কথা নিরুপমের কানে গেল না; ও তখন সেই মধুর স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেছে।

রূপার মা খুব হাসছিলেন। বলেছিলেন, পাগল ছেলে, ও আর এমন কি কাজ, রূপা, শিখিয়ে দে না ওকে।

বাবার একটা টাই এনে নট দেওয়া দেখিয়ে দিচ্ছিল রূপা, তারপর ওর গলায় বেঁধে দিল। রূপার সরু সরু আঙুলগুলো নিরুপমের গলায় ঠেকছিল। তার মধ্যে কি একটা বিচিত্র অনুভূতি। রূপার নিঃশ্বাস পড়ছিল ওর চিবুকে। এত কাছাকাছি সামনাসামনি দাঁড়ালে নিরুপমের বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে উঠতো। রূপার মার চোখে, বুলাপিসির চোখে ধরা পড়ে যাবে এই ভয়ে ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। তার চেয়ে বেশি ভয় ছিল রূপার কাছে ধরা পড়ে যাবার। ও কিছুতেই জানাতে সাহস পেতো না, এমনি দু'একটা মুহূর্তে ওর বুকের মধ্যে লুকানো একটা চারাগাছ হঠাৎ হঠাৎ কৃষ্ণচূড়া হয়ে উঠতো।

নিরুপম নিজের অজান্তেই আপিসে বসে তার কণ্ঠার হাড়ে হাত ঠেকিয়েছে, রূপার নরম আঙুলের স্পর্শটুকু তখনো যেন লেগে আছে। ও যখন টাই বেঁধে দিতে এসেছিল, পারেনি, কিন্তু আঙুলের স্পর্শের স্বাদটুকু হারিয়ে যায়নি।

একবার সহকর্মী বসু মল্লিক এলেন। বললেন, আপনাকে আজ ব্রাইট লাগছে নিরুপম।

নিরুপম হাসল। নিজের মনেই দু' আঙুলে টাইটা নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলো।

সঙ্গে সঙ্গে ওর নিজের ওপর একটা প্রচণ্ড ঘৃণা পাক দিয়ে বুক ঠেলে উঠতে চাইল। আমি তো একটা স্বপ্নের রাজ্যে বাস করতাম। সেখানে রূপা কেবলই বলতো, দ্যাখো দ্যাখো, আমার হৃৎপিণ্ড ঠিক যেন লাল টুকটুকে গোলাপ ফুলটির মতো। তার সুগন্ধে ডুব দিয়ে তুমি অনেক দূর চলে যেতে পারবে, অনেক গভীরে। রূপা বলতো, আমিও তোমার হৃৎপিণ্ড দেখতে পাচ্ছি, আমার নিজেরই বুকের মধ্যে সে আছে। তার উত্তাপে কনকনে শীতের রাতকেও আমি পার হয়ে যেতে পারবো। এই ভাল, এই ভাল। তুমি আর কিছু চেয়ো না। তুমি তোমার চোখ সরিয়ে নাও, তুমি আমার হৃৎপিণ্ড দেখতে পাও না, দেখতে চাও না। নির্পমদা, সাবধান সাবধান, তোমার চোখ অন্য সকলের চোখ হয়ে যাচ্ছে।

সত্যি সেদিন ডাক্তারের কাছ থেকে ফেরার সময় নিরুপমের চোখ অন্য সকলের চোখ হয়ে যাচ্ছিল। ও মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছিল রূপার দিকে। রূপার শরীরের দিকে। রূপার শরীর যেন পাহাড় থেকে ঢলে পড়া ঝরনা। রূপার হাসিতে ঝরনা।

হঠাৎ রাস্তার মোড়ে রূপা দাঁড়িয়ে পড়লো।—আরে এখানেও গোলগাপ্পা বিক্রি হয় ? ছোটবেলায় কত খেয়েছি, না নির্পমদা ? একদিন কি কাণ্ড, মনে আছে ? বেঙ্গলি ক্লাবের ঘাসে বসে বসে মোমফালি খেতে খেতে রাত হয়ে গিয়েছিল, সুধা ছিল সেদিন....বাবা খুঁজতে এসে কি বকুনি।

নিরুপম হেসেছিল।—গোলগাপ্পা, মোমফালি, তুমি কি হিন্দুস্থানী হয়ে গেছ নাকি ?

সামনে সামনে এক ভদ্রলোক সমান তালে হাঁটছিলেন, ফিরে তাকিয়ে হেসে ফেলেই অন্যায় হয়েছে ভেবে দ্রুত এগিয়ে গেলেন। তার তখনই ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে এল বাতাসে। দেখলো, ফুটপাথের ওপর সারি সারি ফুলের পসরা সাজিয়ে বসেছে কয়েকজন। বেলফুলের মালা, জুঁই ফুলের মালা, দু' মুঠো চাঁপা কলাপাতার ওপর, রজনীগন্ধার ঝাড়।

রূপা থমকে দাঁড়াল একজনের সামনে। রজনীগন্ধার দাম জিজ্ঞেস করলো।

একটা পুরোনো ফ্লাওয়ার ভাস ধুলো মেখে খাটের তলায় পড়েছিল, দুপুরে সেটা আবিষ্কার করে ধুয়ে পরিষ্কার করে রেখেছিল রূপা, নিরুপম জানতো না।

নিরুপমের টেবিলের ওপর সেটা এনে রেখেছিল। এবার রজনীগন্ধার স্টিকগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দিল রূপা।

নিরুপমের মনে পড়লো, ইলুর জন্মদিনে ভাসটা কে যেন উপহার দিয়েছিল। তারপর থেকে উপেক্ষায় পড়েছিল ওটা। অলকা শুধু সব কিছু গুছিয়ে রাখতে জানে, সাজাতে জানে না। শুধু প্রয়োজনের খাঁচায় ও বন্দী হয়ে আছে।

মৃগাঙ্কবাবু হঠাৎ বদলি হয়ে যাওয়ায় সন্দীপকে গিয়ে কলেজ হোস্টেলে উঠতে হয়েছিল। সন্দীপ আর নিশীথ দু'জনেই ছিল নিরুপমের বন্ধু।

কবুতরবাগের লোহার ফটকের দু'পাশে দু'খানা ঘর ছিল। বাঁ দিকের ঘরখানা সারিয়ে নিয়ে মিশিরজী হনুমানের মূর্তি প্রতিষ্ঠা কবেছিলেন। চকবাজারের দোকানীরা, হিন্দুস্থানী মেয়েরা ভেট আনতো, মানত করতো। আব ফটকের ডানদিকের ঘরখানা বছরের পর বছর পড়ে থাকতো তালাবন্ধ।

নিরুপম, নিশীথ প্রায়ই সন্দীপকে বলতো, চাবিটা আনিয়ে নে তোর বাবার কাছ থেকে. মালপত্র পাঠিয়ে দিয়ে ঘরখানা সাফসুফ করে ওখানে আমরা ক্যারাম খেলবো। বিশেষ করে বর্ষাকালে ওদের কোন আড্ডা দেবার জায়গা ছিল না। বেঙ্গলি ক্লাবে বুড়োরা তাস খেলতো, বড়রা ক্যারম খেলতো। ওদেরই কোন জায়গা ছিল না।

সন্দীপ বলতো, আনবো আনবো। অথচ চাবিটা আনতো না।

মার কাছে নিরুপম ঐ ঘরখানার রহস্য জেনেছিল একদিন। মা প্রায়ই বলতো, সন্দীপেব সঙ্গে মিশিস না। কোনদিন লালচকের কেউ এসে যদি জানিয়ে যেতো নিরুপমকে সন্দীপের সঙ্গে কোন চায়ের দোকানে দেখা গেছে, কিংবা স্টেশনে, তাহলে নিরুপমের মা খুব রাগারাগি করতেন।

আসলে ব্যাপারটা ও তখন জানতো না। সন্দীপেব বাবা মৃগাঙ্কবাবু ছিলেন পি ডবলু ডি-র ওভারসীয়ার। ঠিকাদারদের কাছ থেকে তিনি ঘুষ খেতেন, সবাই জানতো, তাঁর চালচলনেই তা ধরা পড়তো। তারপর কি নিয়ে যেন হঠাৎ একদিন তোলপাড় হল, মৃগাঙ্কবাবুকে রাতারাতি ট্র্যান্সফার করে দেওয়া হল। নতুন জায়গায় কোথায় থাকবেন, জিনিসপত্র কোথায় রাখবেন, ঠিক করতে না পেরে সামান্য কিছু জিনিস নিয়ে গেলেন সঙ্গে, আর তাড়াহুড়োর মধ্যে টেবিল আলমারী বাক্স-প্যাঁটরা কবুতরবাগের ঐ ঘরখানায় ভরে দিয়ে তালা বন্ধ করে গেলেন। কথা ছিল, সময়মত একবার এসে নিয়ে যাবেন।

সন্দীপের পড়াশুনোর অসুবিধে হবে বলে ও কলেজ হোস্টেলে রয়ে গেল।

তারপর কি হয়েছিল কে জানে, মৃগাঙ্কবাবু অনেকদিন আর লালচকে আসেননি।

সবাই জানতো মৃগাঙ্কবাবু ঘুষ খান। ঘুষ না খেলে কেউ অত খরচখরচা করতে পারে না। তবু সকলের সঙ্গে তাঁর বেশ সদ্ভাব ছিল, অনেকে সমীহ করতো। কিন্তু যেই ধরা পড়লেন, বদলির নোটিস এল, অমনি রাতারাতি লোকে ওঁর দুর্নাম করে বেড়াতে লাগলো। যেন ওঁর মত ঘৃণার পাত্র আর কেউ নেই।

নিরুপমের বাবা বলেছিল, বাঙালীর নাম ডোবালো লোকটা।

মা বলেছিল, ঐ লোকের ছেলে আর কত ভাল হবে, তুই মিশিস না ওর সঙ্গে।

সেই সন্দীপ হঠাৎ একবার সত্যি সত্যি চাবি নিয়ে এল। বললে, চল, ঘরটা খুলে দেখে আসি একবার। সবই তো নতুন করানো হয়েছে, বাবা বলেছে বিক্রি করে দিতে।

ঘরখানা সম্পর্কেই নিরুপমের কৌতূহল হতো মাঝে মাঝে। কি আছে ওর ভিতরে

জানতে ইচ্ছে হতো। নিরুপমের পড়ার টেবিলটা নড়বড় করতো, তাই সস্তায় কিনে নেবে ভেবে ওর আরো কৌতূহল বাড়লো।

তালাটায় জং ধরে গিয়েছিল, অনেক কষ্টে খোলা গেল। কিন্তু দরজা খুলে আর ভিতরে ঢুকতে ইচ্ছে হল না। ভ্যাপসা একটা বিচ্ছিরি গন্ধ, এক পা এগিয়েই পেছিয়ে এল সন্দীপ। টেবিল চেয়ার আলমারি কোন্‌টা কি, তখন আর বোঝার উপায় নেই। সমস্ত ঘরখানা এক বিশাল উইটিবি হয়ে গেছে। সন্দীপ মুখ কাচুমাচু করে বললে, মহারাজদের ডেকে সাফ করে দিতে বললেই হবে। ওখানে মেথরদের মহারাজ বলতো।

নিরুপমেরও মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তবু হঠাৎ কি মনে করে একটা লোহার শিক এনে ও উইটিবি ভাঙতে শুরু করলো। লক্ষ লক্ষ উই কিলবিল করে বেরিয়ে আসছে, ছড়িয়ে পড়ছে।

উইটিবি ভাঙতে ভাঙতে উইয়ে-খাওয়া আলমারীর পাল্লাটা দড়াম করে পড়ে গেল। ভিতরে যা কিছু ছিল সব নষ্ট হয়ে গেছে। ওরা তখন দুজনেই খুব হাসছে।

লোহার শিক দিয়ে টেবিলটা খোঁচাতে খোঁচাতে আধখাওয়া দেরাজটা টানলো। সেটা ভেঙে বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে ঠং করে কি যেন পড়লো নিচে, পা দিয়ে ঘষে দিতেই ওরা দুজনেই অবাক। দুজনেই ঝুঁকে পড়লো। ঝকঝকে হলুদ রঙা....আরে আরে কি এটা ?

নিরুপম চিৎকার করে উঠল উল্লাসে, মোহর পেয়েছি, মোহর !

হাতে নিয়ে দেখলো, পড়লো। চকচকে সোনার একটা হাফ-গিনি। একেই নাকি গিনি বলে ! নিরুপম তখন আনন্দে উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে। সন্দীপও চিৎকার করে উঠল, গিনি, গিনি !

দেরাজের সব উইটিবি ভেঙে গুঁড়িয়ে গুনে গুনে আটচল্লিশটা হাফ-গিনি পাওয়া গেল।

ফিরে এসে নিরুপম বকুনি খাবে জেনেও বাবাকে মাকে বলেছিল সে-কথা।

মা বলল, কেউ ঘুষ দিয়েছিল, তাড়াতাড়িতে রেখে ভুলে গিয়েছিল।

নিরুপমের বাবা বললেন, গেলি কেন ? শেষে বলবে আরো ছিল, তুই নিয়ে নিয়েছিস।

তা হবে হয়তো। কিন্তু নিরুপমের প্রায়ই মনে হতো, এখনো মনে হয়, ঐ গিনিগুলো না পাওয়া গেলে ওর জীবন হয়তো অন্যভাবে গড়ে উঠতো। ওকে নিজের কাছে সারাজীবন মাথা নিচু করে থাকতে হতো না।

ভাবতে ভাবতে ওর হঠাৎ মনে হল, সব পাওয়ার মধ্যেই কোথায় যেন একটা মাথা নিচু করার ব্যাপার থেকেই যায়। যে যত মাথা তুলে দাঁড়ায়, ভিতরে ভিতরে সে ততই মাথা হেঁট করে থাকে।

কারণ প্রত্যেকটি পাওয়ার দাম দিতে হয়। কড়ায় গণ্ডায় নিক্তির ওজনে। নিরুপম জেনে রাখো, বাইরে তুমি যতই বড় হবে, অন্তরে তুমি ততই ছোট হয়ে যাচ্ছো। পাপকে পায়ে মাড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু পাপবোধ থেকে মুক্তি নেই। এই তো এত এত সময় পার হয়ে গেছে, টেবিলের ফ্লাওয়ার ভাসে রজনীগন্ধার স্টিকগুলো সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছে রূপা, হাসছে, কথা বলছে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নিরুপমকে অভিনয় করতে হচ্ছে, যেন সেই দিনটির কথা ও ভুলে গেছে। এ আরেক অসহ্য যন্ত্রণা। অসহ্য, অসহ্য। রূপার ক্রমশ অবশ হয়ে যাওয়া হাতে, হাতের আঙুলে এত যন্ত্রণা নেই। ওকে তিলে তিলে পুড়তে হয় না, একা একা এভাবে কাঁদতে হয় না।

এই তো সেদিন, আপিসে কিছু নতুন লোক নেওয়া হল। নিরুপম ভেবেছিল ও কোন অন্যায় করবে না। ওদের তিনজন অফিসারের ওপর ভার ছিল ইন্টারভিউ নেবার। ও ভেবেছিল যোগ্য প্রার্থীকেই বেছে নেবে। দত্তসাহেব নিজে ব্যস্ত ছিলেন, তাই শুধু একটা চিরকূট ধরিয়ে দিলেন ওর হাতে। বললেন, আমার ক্যাণ্ডিডেট। অন্য দু'জন অফিসারকেও

নিশ্চয় দিয়েছিলেন।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছেলেগুলো বসে রইলো, ঘামলো, এল, চলে গেল ! আর নিরুপম শুধু অভিনয় করে গেল। অক্ষম রাগে ও দত্তসাহেবের ওপর জ্বলে উঠছিল। কিন্তু কিছুই করতে ইচ্ছে হল না।

একটি ছেলের চোখে জল দেখেছিল নিরুপম। একজন নাকি বাইরে বেরিয়ে ফেণ্ট হয়ে গিয়েছিল। ছেলেটা জানে না, ঘৃণায় নিজের টাইটা টেনে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে হয়েছিল নিরুপমের।

বৃদ্ধ দাসবাবু একবার বলতে এসেছিলেন, স্যার, আরো তো অনেক ভাল ক্যাণ্ডিডেট ছিল।

নিরুপম তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলেছে, যাকে ভাল মনে করেছি সিলেক্ট করেছি।

যেন সত্যি ও যোগ্যতা দেখে বিচার করেছে। যেন নিরুপম নিজেই বিচার করেছে। তা না হলে যে দাসবাবুর কাছে মান থাকে না। কিন্তু ও জানে দত্তসাহেবের কাছে এবং নিজের কাছে ও অনেক ছোট হয়ে গেছে।

নিরুপমের কেমন মনে হয় সেই প্রথম যৌবনে একবার যে ও মাথা নিচু করেছিল, সেই পাপবোধ ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে, সেটাকে চাপা দেবার জন্যেই ও বারবার মাথা তুলতে চাইছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা পাপবোধ ওকে নিচে নামিয়ে দিচ্ছে।

এই সব ভাবনা যখন ওর মাথায় আসে, তখন সব তালগোল পাকিয়ে যায়। কল্পনায় একদিন একটা ছবি আঁকতে চেষ্টা করেছিল ও। কাঠগড়ায় নিরুপম দাঁড়িয়ে আছে বিবর্ণ মুখে, ও বলছে, হুজুর, আমি তো জীবনে একটা অন্যায় করেছি, একটি নিষ্পাপ প্রেমকে হত্যা করেছিলাম। বিচারকের আসনেও নিরুপম বসেছিল, নিরুপম নিজেই। থমথমে গম্ভীর মুখে নিরুপম বলছে, তোমার বিরুদ্ধে এতগুলো অভিযোগ, আমি একটাই উত্তর চাই, গিল্টি অর নট গিল্টি ? প্রসিকিউশনের উকিল নিরুপম কালো জোব্বা গায়ে দিয়ে জজের সামনে দাঁড়িয়ে কাঠগড়ার নিরুপমের দিকে আঙুল দেখিয়ে নির্মম উল্লাসে হাসছে, বলছে, মিলর্ড, ঐ লোকটির বিরুদ্ধে সতেরো দফা অভিযোগ, ও জীবনের পদে পদে অন্যায় করে গেছে, এবং ওর বিবেক বলে কোন বস্তু নেই। আর তখনই কাঠগড়া থেকে নিরুপম আর্তনাদ করে উঠল, হুজুর, ওঁকে বিশ্বাস করবেন না, বিশ্বাস করবেন না।

পাপবোধ আছে বলেই হয়তো বারবার পাপের দিকে ফিরে যেতে হয়। এই তো নিরুপম এত স্বপ্ন দেখছে, রূপার সঙ্গে সুন্দর সম্পর্কটা আবার ফিরিয়ে আনার। কিন্তু পারছে না। এক এক সময় ওর মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড লোভ জাগছে। রূপা কাছে এসে দাঁড়ালেই ওর হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে যাচ্ছে। রূপাকে ঘিরে এত অস্বস্তি এত দুশ্চিন্তা ঐ পাপবোধের জন্যেই। অলকা ফিরে এসে কি ভাববে ! বিপিন কি মনে করছে, অবনীবাবু কিংবা সুহাসবাবুর মেয়েরা !

সেদিন সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুহাসবাবুর মেয়ে ঝুমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ঝুমার চোখে হঠাৎ একটা আতঙ্ক দেখেছিল নিরুপম। নিমেষের মধ্যে সে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তাদের ফ্ল্যাটের দরজার আড়ালে। অথচ আগে কতদিন ঝুমা ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করেছে, দেখা হলেই কথা বলেছে। এখন ওদের সকলের চোখে নিরুপম একটা ক্রিমিনাল। ওর এতদিনের তিলে তিলে গড়ে তোলা ভদ্র শিক্ষিত চরিত্রবান মানুষের ছবিটা হয়তো রাতারাতি নষ্ট হয়ে গেছে। কিংবা কিছুই হয়নি, ওর পাপবোধই শুধু ওকে ভাবিয়ে তুলছে।

৭

ছি ছি ছি। তিনটি মাত্র শব্দ, একটা প্রচণ্ড ধিক্কার।

একটা সুখের গুনগুনুনি এইমাত্র ওর শরীরে দোলা দিয়ে গেছে। আরেকটু হলে ও হয়তো শিস দিতে দিতেই নামতো। এইমাত্র রূপা অভিমানের চোখে ওর পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। নিরুপমের কাছে রূপার ঐ দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা খুব ভাল লেগেছিল, ওর মুগ্ধ দৃষ্টি রূপার সর্বাঙ্গ ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেল, ও হেসে ফেলে হাতের কব্জিতে ঘড়ি দেখল। রূপা ওর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, চোখ নামিয়ে নিরুপমের শার্টের বোতামে হাত রেখে বললে, তুমি যতক্ষণ না ফিরে আসো, ভীষণ ফাঁকা-ফাঁকা লাগে, নির্পমদা। নিরুপম রূপার দু কাঁধে দুটো হাত রেখে ঝাঁকানি দিয়ে হেসে ফেলে বললে, তাড়াতাড়ি ফিরবো। রূপা তখনো ওর বুকের বোতাম নিয়ে দু' আঙুলে খেলা করছে। নিরুপমের কথা শুনে রূপা লাজুক লাজুক চোখ তুলে বললে, সত্যি বলছো!

আপিস বেরোনোর সময় নিরুপমের মনে হচ্ছিল, রূপা যেন তখনো ওর বুকের বোতামটা ছুঁয়ে আছে। খুশিতে ওর ছোটবেলার মত শিস দিয়ে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল।

কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নামতে নামতে চুনকাম করা সাদা ধবধবে দেয়ালে চোখ পড়ে গেল নিরুপমের। কাঠকয়লার কালির দাগটায়। কালির দাগটা দেয়ালের গায়ে নয়, যেন নিরুপমেরই ধোপদুরস্ত পোশাকে। কিংবা এতদিনের যত্নে গড়া ওর পরিচ্ছন্ন চরিত্রের গায়ে।

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে পায়ের গতি আপনা থেকেই থেমে পড়েছিল। দেখলে সিঁড়ির পাশের দেয়ালে কে কাঠকয়লা দিয়ে লিখে রেখেছে 'ছি ছি ছি'। সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমের মুখ ছাই হয়ে গেল। এইমাত্র একটা সুখের তুবড়ি থেকে আলোর ফুলকি উঠছিল আকাশ ছুঁয়ে, ঐ তিনটি শব্দ মুহূর্তের মধ্যে ওকে মাটিতে মিশিয়ে দিল।

নিরুপম চকিতে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিল কেউ ওকে দেখেছে কিনা, দেখছে কিনা। মেয়েলি হাতের ঐ লেখাটা ওর যেন চোখেই পড়েনি এমনি ভাব করে ও দ্রুত নেমে গেল সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে। যেন ওর পায়ের শব্দ হলে এখনই কেউ দরজা খুলে উঁকি দেবে। যেন ঐ লেখাটা ও দেখেছে ওরা জানতে পারলেই ওর গায়ে কলঙ্ক লাগবে, যেন না দেখতে পেলেই ও নির্দোষ।

রাগে লজ্জায় অপমানে ওর তখন কান ঝাঁঝাঁ করছে। নিমেষের জন্যে রূপার ওপরেই ওর অসন্তোষ গিয়ে পড়লো। যেন রূপা এসেই ওর সমস্ত স্বস্তি কেড়ে নিয়েছে। মুহূর্তের জন্যে অলকার ওপরও মনটা বিষিয়ে উঠল। এই যে ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে কৌতূহল, অবিশ্বাস, আলোচনা, এদের কোন একজনকে নিয়েও নিরুপমের কোন দুশ্চিন্তা ছিল না। দুশ্চিন্তা তো অলকার জন্যেই। একটু সচ্ছলতা, একটু পদমর্যাদার বিনিময়ে দাসখত লিখে দিয়েছে ও দত্তসাহেবকে। তেমনি একটা অভ্যস্ত জীবনের স্বস্তির বিনিময়ে ও কি অলকাকেও একটা দাসখত লিখে দিয়েছে নাকি।

এক এক সময় ওর তাই বিদ্রোহ করে উঠতে ইচ্ছে করে।

নিরুপম ভেবে দেখবার চেষ্টা করলো এর আগেও ঐ 'ছি ছি ছি' লেখাটা ওখানেই ছিল কিনা। হয়তো চোখে পড়েনি। হয়তো নিরুপমের সঙ্গে ঐ ধিক্কারটুকুর কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু না, সাদা ধবধবে দেয়ালে অত বড় অক্ষরে লেখা কাঠকয়লার দাগটা আগে ছিল না। থাকলে ওর চোখে পড়তোই। ওর হঠাৎ মনে পড়ে গেল রূপাকে সঙ্গে নিয়ে একদিন বের হওয়ার সময় অবনীবাবুর স্ত্রী দেখেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মনে পড়ে গেল, সুহাসবাবুর মেয়েরা গোল বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওকে একদিন তাড়াতাড়ি ফিরতে দেখে চোখে

চোখে কি যেন বলাবলি করেছিল। সিঁড়িতে দেখতে পেয়ে ঝুমার চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিল।

—আপনাকে খুব ওয়ারিড মনে হচ্ছে নিরুপম, কি ব্যাপার বলুন তো। বসুমল্লিক হঠাৎ ওর টেবিলের সামনে এসে বললেন।

আপিসে কাজের ফাঁকেও বারবার ঐ তিনটি শব্দ ওর মাথার মধ্যে ঘুরছিল। প্রশ্ন শুনে ও তাই বিব্রত বোধ করলো। হেসে উঠে দুর্ভাবনা চাপা দেবার চেষ্টা করলে।

না, প্রতিবেশীদের কিংবা অলকাকে ওর ভয় নেই। ও হয়তো নিজেকেই ভয় পাচ্ছে, নিরুপম ভাবলো। আমরা তো সকলেই অহঙ্কারের ঘরে বন্দী। শত শত ইচ্ছের টুঁটি টিপে নিজের সম্পর্কে যে ধারণা গড়ে তুলেছি, সেই ধারণাটাকে, সেই ছবিটাকেই আমরা ভালবাসি। নিজেকে নয়। অ্যালবামের ছবির মত।

আপিসের বন্ধুর সঙ্গে সেই যে পাসপোর্টের ছবি করাতে গিয়েছিল একদিন, মনে পড়লো। যেদিন আনতে গিয়েছিল, স্টুডিওর লোকটি তখন একটি নেগেটিভের ওপর তুলির আঁচড় দিচ্ছিল। প্রশ্ন শুনে বলেছিল, এর নাম ফ্ল্যাটারি। হেসে বলেছিল, কেউ নিজের ছবি চায় না স্যার! সবাই একটা বানানো ছবি চায়। কোন্ অ্যাংগল থেকে তাকে ভাল দেখাবে, কোথায় আলো ফেললে, সব শেষে এই ফ্ল্যাটারি। এ তো স্যার একটা অন্য লোক হয়ে গেল, কিন্তু সেটাই চায় সকলে।

ঠিকই। নিরুপম ভাবলো, মানুষ নিজেকে ভালবাসে না, একটা তৈরি করা ইমেজকে ভালবাসে। আমি চাইছি একটা ভদ্র শিক্ষিত সজ্জন মানুষের ছবি, তাতে যেন কলঙ্কের দাগ না পড়ে। একটা গুণ্ডা কিংবা খুনী হয়তো চায় তাকে লোকে যেন ভয় পায়। তার সেই ইমেজটাকেই সে ভালবাসে। সেটাকেই বাঁচিয়ে রাখতে চায়, তার জন্যে সত্যিকারের মানুষটা যদি দমবন্ধ হয়ে মরে যায়, মরুক।

অস্বস্তি থেকে রেহাই পাবার জন্যেই ও অলকাকে চিঠি লিখে জানিয়েছে, কিন্তু এখনো উত্তর দিল না কেন অলকা?

দোতলায় ঝুমাদের সামনের ফ্ল্যাটে থাকেন মিস্টার সেন, একটা বড় ওষুধ কোম্পানির কেমিস্ট। এখন তো আর সুহাসবাবুকে বলা যায় না রূপার কথা। ঝুমারা ভাববে, সকলে সন্দেহ করছে বলে অজুহাত দিতে এসেছে, অবনীবাবু সেই যে দেশলাই চাইতে এসেছিলেন, তারপর থেকে একেবারে চুপচাপ। নিরুপম ভাবলো বাড়ি ফেরার সময় বরং মিস্টার সেনের দরজায় গিয়ে দাঁড়াবে, বেল বাজাবে।

—মিস্টার সেন বাড়ি আছেন?

সমস্ত ব্যাপারটা মনে মনে রিহর্সাল দিয়ে নেবার চেষ্টা করলো নিরুপম।

মিস্টার সেন যেন বেরিয়ে এলেন, আসুন, আসুন, নিরুপম ভিতরে ঢুকবে না, আপনার কাছে একটা পরামর্শ নিতে এলাম, আপনারা তো ডাক্তার-টাক্তার হাসপাতাল সবকিছুর খবর রাখেন, সাংঘাতিক একটা বিপদে পড়ে গেছি, স্ত্রী তো জামসেদপুর গেছে কয়েকদিনের জন্যে। এদিকে একটা ঝামেলা এসে পড়েছে কাঁধে, কানপুর থেকে মানে আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা দূরেরই, কিন্তু, এসে পড়েছে, কি করব বলুন।

নিরুপম ভেবে নিলো কিভাবে রূপার অবশ হয়ে যাওয়া হাত, হাতের আঙুল ইত্যাদির কথা বলে কোন্ ডাক্তারকে দিয়ে চিকিৎসা করাবে, তার পরামর্শ চাইবে। ব্যস, তা হলেই খবরটা সব ফ্ল্যাটগুলোয় ছড়িয়ে পড়বে। মিস্টার সেনের স্ত্রীর কাছ থেকে ঝুমাদের কাছে, সেখান থেকে অবনীবাবুর ফ্ল্যাটে।

নিরুপম মনঃস্থির করেই ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠছিল অফিস থেকে ফেরার সময়। ছি ছি ছি লেখাটির দিকে তাকালো না। জ্বলন্ত সিগারেট ধরা ওর হাতের আঙুল কাঁপছিল।

মিস্টার সেনের দরজায় বেল টেপার জন্যে হাত বাড়াতে গিয়েই থেমে পড়লো ও। মিস্টার সেন নেই। কপাটে একটা তালা ঝুলছে।

সারাদিন ধরে বানিয়ে রাখা প্ল্যানটা ভেস্তে যেতেই নিরুপম কেমন মুষড়ে পড়লো। রূপার প্রতি একটা বিতৃষ্ণার কাঁটা বুকের মধ্যে খিচখিচ করলো।

বিপিন পাজামা আর পাঞ্জাবি দিয়ে গেল। পোশাক বদলে পাখাটা জোরে চালিয়ে দিয়ে ডেকচেয়ারে গা এলিয়ে দিল নিরুপম। কিন্তু একটা অভিমান গুমরে উঠল ওর বুকে। রূপা আসছে না কেন। ও তো আশা করেছিল পাঞ্জাবি আর পাজামা নিয়ে রূপাই এসে দাঁড়াবে। সকালের মত ওর বুকের বোতামে হাত দিয়ে কথা বলবে। তখন ওর সমস্ত দুশ্চিন্তা সমস্ত ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। রূপাকে হঠাৎ মনে হল অকৃতজ্ঞ, অকৃতজ্ঞ। ও হয়তো শুধু নিজের অসুখের কথাটাই ভাবছে। প্রতিদিন ইনজেকশন নিতে যাবার কথা, ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়া। স্মিতহাস মুখে একবার কাছে এসে দাঁড়ানোর কথা ভুলে গেছে। অথচ নিরুপম কতকগুলো অকারণ ঝঞ্ঝাট মাথায় নিচ্ছে।

নিজের মনেই হেসে ফেললো নিরুপম। ও তো একেবারে ব্যবসাদারদের মত কথা বলছে। অকারণ রিস্ক নেবো কেন, যদি না মুনাফা ওঠাতে পারি, শেঠজীরা বলে। ওরা চায় শুধু লিডাররা অকারণ রিস্ক নেবে, কিংবা তাও চায় না। কিন্তু জীবনের রিস্ক নিয়ে সাধারণ মানুষ মুনাফা ওঠাতে গেলেই ওদের ঘোর আপত্তি। নিরুপম কি ঐ ব্যবসাদারদের মত হয়ে গেল নাকি!

ডেকচেয়ারটায় গা এলিয়ে পড়ে থেকেও ওর বুকের মধ্যে একটা কষ্ট গুমরে উঠতে চাইলো।

কলঘরে যাবে বলে নিরুপম উঠে দাঁড়াল। খুটখাট কি একটা শব্দ হল পাশের ঘরে। বুবুনের ঘরে। মাঝখানের দরজাটার দিকে তাকালো ও। না, দরজাটা বন্ধ। টার্কিশ তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে কলঘরে যেতে যেতে বারান্দার দিকের দরজাটা দিয়ে বুবুনের ঘরের ভিতর তাকালো একবার।

ভিতরে ঢুকতে গিয়েই চমকে উঠল। সমস্ত শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল। অলকা, অলকা বসে আছে! একটা দুর্বোধ্য বিস্ময় আর দুরন্ত ভয় ওকে নাড়া দিয়ে গেল মুহূর্তের জন্যে।

একটি মুহূর্ত শুধু। অস্ফুটে নিরুপম কি যেন বলে উঠেই চুপ করে গেল। রূপা পিছন ফিরে বসেছিল, তার আগেই মুখ ফিরিয়ে শব্দ করে হেসে উঠেছে।

হাসতে হাসতে বললে, একেবারে চমকে গিয়েছিলে, না নির্পমদা?

নিরুপম নিজেও হাসছে তখন। সত্যি, চমকে গিয়েছিল নিরুপম।

রূপা হাসতে হাসতে বললে, চাবির গোছা তো হাতে তুলে দিয়ে গেছ। ভাবলাম, কি করি, কি করি। আলমারী খুলে অলকা বৌদির শাড়িখানা পরতে ইচ্ছে হল। ভাবলাম, তুমি ফিরলে একেবারে অবাক করে দেব।

ও যে হঠাৎ অলকা মনে করে চমকে গিয়েছিল, সে-কথা ভেবে স্নান করতে করতে নিরুপম নিজের মনেই হাসছিল। প্রথম দিনই আপিস বেরিয়ে যাওয়ার আগে ও একটা দ্বিধার মধ্যে পড়েছিল ঐ চাবির গোছাটা নিয়ে। অলকা ওকে বারবার সাবধান করে দিয়ে গেছে, চাবির গোছাটা যেন কাছছাড়া না করে।

কি করবে ওটা নিয়ে, নিরুপম সেদিন ভেবে পায়নি। রূপার জন্যে শুধু বুবুনের ঘরটা খোলা রেখে যাবে? নিজেকে ভীষণ ছোট মনে হয়েছিল। নিরুপম কিনা রূপাকে বিশ্বাস করে চাবির গোছাটা দিতে পারবে না। একবার নিরুপমের মনে হয়েছিল, প্রেম, ভালবাসা, সুন্দর সম্পর্ক এ-সব ফাঁকা বুলি, কোন সত্যি নেই তার মধ্যে। তা না হলে, রূপা, সেই

রূপাকে ও চাবির গোছাটা দিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারছে না। না না, রূপাকে অবিশ্বাস করছি না, নিজের মনকে বোঝাতে চাইল। আসলে ও হয়তো সাবধানে রাখবে না, আর বিপিনকে তো বিশ্বাস নেই। অলকা যদি জানতে পারে রূপার কাছে চাবির গোছাটা ও রেখে যেতো। তখন কি মনে করবে কে জানে।

স্নান করতে করতে নিজের মনেই হাসল নিরুপম। ও যে শেষ অবধি চাবির গোছা ওর হাতে তুলে দিতে পেরেছিল, তার জন্যে মনে মনে খুশি হল।

কিন্তু হঠাৎ অলকার শাড়িটায় রূপা ওকে চমকে দিতে চাইলো কেন? শুধুই একটা ছেলেমানুষি খেলা? নাকি ভিতরে ভিতরে ও বদলে গেছে, অলকার ভূমিকায় নিজেকে মানায় কিনা দেখে নিচ্ছে? ভাবতেই নিরুপমের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে অলকা বুবুন ইলুর কথা ওর মনকে তোলপাড় করে তুললো।

৮

রূপার বাবাকে লালচকের সবাই সমীহ করতো। খানিকটা ওর চেহারার জন্যে, খানিকটা ওর পদমর্যাদার জন্যে। ফর্সা রঙ, স্বাস্থ্যবান খাটো চেহারা, হাবভাব, হাঁটা-চলা সব ছিল যুবকদের মত। শুধু ব্রাকেটের মত ওঁর পুরুষ্টু সাদা গোঁফজোড়া আর মাথাব ফিকে হয়ে যাওয়া সাদা চুলেই ওর বয়স ধরা যেতো। এই বয়সেও সাদা হাফপ্যান্ট আর হাফ-হাতা সাদা সার্ট পরে টেনিস র‍্যাকেট নিয়ে বিকেলে যখন সিভিল লাইনসের দিকে টেনিস খেলতে যেতেন, তখন মনে হতো ওর চেহারার সঙ্গে গোঁফজোড়া যেন বেমানান। আসলে বয়সও নাকি ওঁর এত বেশি ছিল না। নিরুপমের বাবা বলেছিলেন, ওদের বংশের ধারাই নাকি ঐরকম, কম বয়সেই চুলদাড়ি পেকে যায়।

সরকারী অফিসারদের মধ্যে ওঁর প্রতিপত্তি ছিল অগাধ। হিন্দুস্থানীরা বিপদে আপদে ওঁর কাছেই ছুটে আসতো। বলতো, সরকার, আপ হি খুদ মালিক। আপনি রাখলে আছি, আপনিই ভরসা। ওরা সমীহ করে বলতো, সরকার। বাঙালীদের কাছে ছিলেন গুপ্তসাহেব।

রূপার বাবার ব্যবহারে কিন্তু কোন রাসভারী ভাব ছিল না। রূপার সঙ্গে যেমন, রূপার মা'র সঙ্গেও তেমনি কথা বলতেন হাসিঠাট্টা ইয়ার্কির ঢঙে। যেন বন্ধু সবাই।

রূপার মা ছিলেন খুব সুন্দরী, একটু রোগা, মাঝে মাঝে অসুখে ভুগতেন। হাসিখুশি মানুষটির মধ্যে রোগের জন্যেই হয়তো মাঝে মাঝে একটা বিষণ্ণতা ছিল। নিরুপমরা বলতো, বুলাপিসি। কেন বলতো নিরুপম, কোনদিনই ভাল করে বুঝতে পারেনি। কারণ সম্পর্কটা ছিল যেমন দূরের, তেমনি জটিল।

রূপার মা যেমন সুন্দরী ছিলেন, তেমনি আবার সাজগোজ ভালবাসতেন। নিরুপম যখনই গেছে রূপাদের বাড়ি, পরিপাটি ছিমছাম চেহারাটা দেখেছে। একদিন প্রচণ্ড গরমে গিয়ে হাজির হয়েছিল নিরুপম। রূপার মা স্নেহের স্বরে ধমক দিয়েছিলেন, লু বইছে বাইরে, এই গরমে কেউ বেরোয় বোকা ছেলে! আদর করে তরমুজের শরবত বানিয়ে খাইয়েছিলেন নিরুপমকে।

নিরুপম রূপাকে বলেছিল, তুমি খাবে না?

তরমুজের শরবত যেন কি এক বিস্বাদ এমন মুখচোখের ভাব করে রূপা বলেছিল, না বাবা, ওসব আমার ভাল লাগে না।

রূপার বাবা হাসতে হাসতে বলেছিলেন, খা খা, তরমুজ খেলে তরমুজের মত রঙ হবে।

সবাই হেসে উঠেছিল।

আরেকবার, তখন শীত পড়েছে, এক ছুটির সকালে রূপাদের বাড়ি গিয়ে তাজ্জব হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে রূপার বাবা বাড়ির সামনে মাঠে সাদা হাফপ্যাণ্ট পরে কোদাল নিয়ে মাটি কোপাচ্ছেন, আর সবাই হাসছে। রূপার মাও।

কি ব্যাপার, কি ব্যাপার! না, ওদের ব্যাডমিণ্টন খেলার কোর্ট তৈরি হবে।

ওদের বাড়ির একপাশে ফুলের বাগান ছিল, বাগানের যত্ন নেবার জন্যে মালী ছিল। নিরুপম দেখল, একপাশে মালীটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে, আরেক পাশে রূপা আর কালেসাহেবের দুই মেয়ে গঙ্গা যমুনা।

ওরাও খুব হাসছিল, নিরুপমকে দেখেই কেমন লজ্জায় গুটিয়ে গেল। রূপা বোধহয় সে-সময়ে যমুনার হাতে একটা চিমটি কেটেছিল।

রূপার বাবা আসলে বাগান-পাগল মানুষ ছিলেন। কখনো ট্রিমিং করার বিরাট কাঁচিটা নিয়ে, মেহেদির বেড়ার ডালপালা ছেঁটে সমান করতেন নিজের হাতেই; কখনো ফুলের চারা বসানোর সময় মালীকে দেখিয়ে দিতেন।

নিরুপম, রূপা আর মালীটা ফিতে ধরে মাপ করেছিল, রূপার বাবা আর মালীটা কোদালে কুপিয়ে দাগ টেনে দিয়েছিল। তার ওপর চুনের গুঁড়ো দিয়ে দিব্যি একটা কোর্ট তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

তারপর থেকে প্রতিদিন বিকেলে রূপারা ওখানে ব্যাডমিণ্টন খেলতো। গঙ্গা, যমুনা, কবুতরবাগের মিশিরজীর মেয়ে সর্সতী।

কবুতরবাগের ফটকের ডানদিকের ঘরখানা সাফসুফ করে তখন নিরুপমদের আড্ডা বসে গেছে। সন্দীপ, নিশীথ, ব্রিজলাল, আরো অনেকে এসে ক্যারাম খেলতো, আড্ডা দিত, নিরুপমরা লুকিয়ে নিশ্চিন্তে সিগারেট খেতো। ওদের সঙ্গে হৈ-হল্লা করে আড্ডা দিয়ে এক একদিন নিরুপম ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরতো, মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তি নিয়ে। রূপার সঙ্গে দেখা না হলেই ওর খুব কষ্ট হতো, যেন দিনটা পরিপূর্ণ হল না, কি যেন বাকি রয়ে গেছে।

নিরুপমের মা একদিন বলেছিলেন, হ্যাঁ রে, তুই অত বুলাদের বাড়ি যাস কেন? বুলার মেয়ে বড় হয়েছে, লোকে খারাপ বলবে।

মা'র সামনে মুখ তুলে তাকাতে ওর সেদিন ভীষণ লজ্জা করছিল। রাগ হয়েছিল মা'র ওপর। চোখ ঠেলে জল এসে গিয়েছিল।

তারপর থেকে ও চেষ্টা করতো নিজেকে বেঁধে রাখার। রূপাদের বাড়ি না যাওয়ার। তাছাড়া রূপারা তো বিকেলে ব্যাডমিণ্টন খেলতো। রূপা আর মিশিরজীর মেয়ে সর্সতী। গঙ্গা আর যমুনা। রূপার মা একটা চেয়ারে বসে খেলা দেখতেন। নিরুপম একদিন গিয়ে পড়েছিল, একটুখানি খেলেই সেদিন গঙ্গা আর যমুনা র‍্যাকেট নামিয়ে রেখে বলেছিল, মাস্টারসাব আসবে, জলদি জলদি ফিরতে বলেছেন পিতাজী। নিরুপমকে ওরা লজ্জা পেতো, কিংবা ওদের বাড়িতে হয়তো নিষেধ ছিল।

মিশিরজীর মেয়ে সর্সতীও চোখ নামিয়ে রূপার মা'র পাশে গিয়ে বসলো; রূপাকে বললে, তুম দোনো খেলো।

নিরুপম তাই পর পর কয়েকদিন গেল না। নিজেকে আটকে রাখলো। ওর কেবলই মা'র কথাটা মনে পড়ছিল।—হ্যাঁ রে তুই বুলাদের বাড়ি যাস কেন? বুলার মেয়ে বড় হয়েছে, লোকে খারাপ বলবে।

শেষে একদিন নিজেরই অজান্তে কখন ওদের বাড়ির রাস্তা ধরেছে। তখন সন্ধে নামছে, নিরুপমের মনে হল এতক্ষণে নিশ্চয় ওদের খেলা শেষ হয়ে গেছে। ও গেলেই ওদের খেলা নষ্ট হয়ে যাবে বলে ভয় ছিল।

ও গিয়ে পৌঁছতেই সর্সতী চলে গেল আরতির সময় হয়ে গেছে বলে। সন্ধেবেলায় মিশিরজীর মন্দিরে ওকে ধূপধুনো জ্বেলে দিতে হতো, পুজোর থালা সাজিয়ে দিতে হতো। যমুনাকে আটকে রাখার চেষ্টা করলো রূপা, সে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে ছুটে পালালো, গঙ্গা পিছনে পিছনে। রূপা নিশ্চয় যমুনাকে কিছু বলেছিল।

তখন সন্ধে হয়ে আসছে, পায়রা ওড়া বন্ধ হয়ে গেছে, দু' একটা দলছুট পায়রা শুধু রূপাদের বাড়ির আনাচে কানাচে বসে আছে। ব্যাডমিন্টন খেলার নেট টাঙানো ছিল, মালীটা এসে খুলে নিয়ে গেল। আর রূপা যমুনার পিছনে পিছনে খানিকটা ছুটে গিয়ে ফিরে এল, এসে ঘাসের ওপরই বসে পড়লো।

নিরুপম একটুখানি দাঁড়িয়ে থেকে ওর মুখোমুখি বসলো।

রূপা ওর দু' হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে মৃদু মৃদু হাসছিল নিরুপমের দিকে তাকিয়ে। নিরুপম কোন কথা বলছিল না। সর্সতী কিংবা গঙ্গা যমুনাকে নিয়ে মেতে থাকলে রূপার ওপর ওর খুব অভিমান হতো। ওর ইচ্ছে হতো, ও যেমন সর্বক্ষণ রূপার কথা ভাবে. রূপাও তেমনি ওর কথা ভাববে।

রূপা তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ গাঢ় গলায় বললে, তুমি আজকাল আর আসো না কেন বলো তো!

নিরুপম অভিমানী গলায় বললে, তোমার তো আজকাল অনেক বন্ধু। একটু থেমে বললে, আমি এলে তো তোমাদের খেলা নষ্ট হয়ে যায়।

রূপা হেসে উঠল শব্দ করে।—তাই বুঝি। একটু থেমে বললে, তা ঠিক, যমুনার সেদিন খেলা নষ্ট হল। হাসতে হাসতে বললে, তুমি এলেই ও এত লজ্জা পায় কেন গো নির্পমদা।

নিরুপম বিরক্ত হল। বললে, তার আমি কি জানি। আসলে যমুনাটমুনা ওর কাছে কিচ্ছু নয়। ওর ইচ্ছে করছিল রূপা শুধু ওদের দুজনেরই কথা বলুক। ওর ইচ্ছে করছিল বুকের গভীরে লুকিয়ে রাখা কথাগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে রূপার সামনে মেলে ধরতে। ওর সাহস হচ্ছিল না। রূপাকে ও যে কিছুতেই বুঝতে পারছে না। তখনই মনে হয় ও যেন বুকের কাছে বসে কথা বলছে, তখনই অনন্ত দূরত্বে।

রূপা চুপ করে বসেছিল, কি যেন ভাবছিল, আস্তে করে ডাকলো,—এই।

নিরুপম চোখ তুললো, কি বলো।

রূপার গলাটা কেমন কেঁপে গেল।—একটা সত্যি কথা বলবে? বলো না, এই, সত্যি তুমি কাউকে ভালবাসো?

রূপা কি এটুকুও বুঝতে পারে না। নিরুপমের বুক ঠেলে কত কি বলার কথা বেরিয়ে আসতে চাইলো। আনন্দে ওর চোখের কোনা চিকচিক করে উঠল।

ও ফিস ফিস করে বললে, তুমি কি বোঝো না! তুমি কি কিচ্ছু বোঝো না!

শব্দ করে হেসে উঠল রূপা।—জানি, জানি। যমুনা তো? বলেই হাসতে হাসতে ও উঠে দাঁড়াল, বাড়ির দিকে পা বাড়াতে চাইলো।

নিরুপমের গলার স্বর গাঢ় হয়ে গেল। উত্তেজিতভাবে ও বলে উঠল, না না, যমুনা নয়, যমুনা নয়। ওর গলার স্বর চাপা কান্না হয়ে গেল।

র‍্যাকেট হাতে নিয়ে তখন ঝট্ করে উঠে দাঁড়িয়েছে চলে যাওয়ার ভঙ্গিতে, রূপা ওর কথা শুনে মুখে একটা অস্ফুট হতাশার শব্দ করলো। তারপর হেসে উঠে বললে, বেচারী। মেয়েটা ভীষণ আনলাকি। বলেই বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলো, র‍্যাকেট ঘুরিয়ে কাল্পনিক একটা শাট্‌ল কককে একবার এদিক, একবার ওদিক পাঠাতে পাঠাতে।

নিরুপম কি করবে, অসহায়ের মত তীব্র যন্ত্রণাটা বুকের মধ্যে চেপে রেখে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। অভিমানের গলায় বললে, আমি চললাম রূপা, আমার কাজ আছে।

রূপা এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল, অন্ধকারে বোঝা গেল না, হয়তো অবাক হল, কিংবা ওর ভুরু কুঁচকে উঠল, তারপরই বাঁ হাতখানা নেড়ে বলে উঠল, গুড্ নাইট নির্পমদা, গুড্ নাইট।

সেই বাঁ হাতখানা ক্রমশ অবশ হয়ে যাচ্ছিল। রূপা ভেবেছিল অসহ্য যন্ত্রণাটা কনুই ছেড়ে কাঁধ অবধি উঠবে, তারপর কোনদিন ওর সারা শরীর হয়তো অবশ হয়ে যাবে। প্যারালিসিস। আতঙ্কে ঘুম ভেঙে যেতো ওর কোন কোনদিন।

কিন্তু এই ক'দিনের চিকিৎসাতেই বোধ হয় একটু উন্নতি দেখা দিয়েছে। সাতটা দিন পুরো হলেই ডাক্তার সেন আরেকবার দেখাতে বলেছেন।

খাবার টেবিলের ওপর বাঁ হাতখানা বিছিয়ে রেখে রূপা আঙুলগুলো নেড়ে নেড়ে কি যেন দেখছিল। ও আনন্দে চিৎকার করে উঠল, দ্যাখো নির্পমদা, দ্যাখো দ্যাখো। আমি পারছি, আমি পারছি।

রূপার চোখেমুখে একটা উল্লাস ফুটে উঠল। আর রূপার আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওর অনামিকায় নিরুপমের চোখ পড়লো।

সুন্দর একটা মুক্তো বসানো আংটি পরেছে রূপা। আংটিটার দিকে তাকিয়ে রইল নিরুপম।

আর তখনই রূপা ওর মুখের দিকে তাকালো। মৃদু হেসে বললে, সেই আংটিটাই, বলেছিলাম না, ফেরত দেবো না, কক্ষনো ফেরত দেবো না?

নিরুপম পলকের মধ্যে একটা আনন্দের ফোয়ারা হয়ে গেল।

৯

নিরুপমের সবচেয়ে বড় ভয়, সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সেই বিশ্রী ধিক্কারটুকু রূপার চোখে না পড়ে যায়। তা হলেই ছন্দ ভেঙে যাবে, তাল কেটে যাবে। দেয়ালের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে লেখা তিনটি শব্দ—ছি ছি ছি। অপমানে লজ্জায় রূপার মুখ হয়তো বিবর্ণ হয়ে যাবে। হয়তো তারপর দু'জনের মাঝখানে একটা ভয়ঙ্কর ব্যবধান গড়ে উঠবে। কিংবা দু'জনেই অপমানিত মুখ নিয়ে তাকাবে পরস্পরের দিকে, আর ভয়ঙ্কর রকম ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়ে দু'জনে দু'জনের বুকে মুখ ঢেকে সব বলা-কওয়ার ঊর্ধ্বে চলে যেতে চাইবে।

'শোন রূপা, কাল ফিরে এসে ক্লান্ত শরীর নিয়ে আমি যখন বিছানায় শুয়ে ছিলাম, তুমি আমার শিয়রের কাছটিতে এসে বসলে। তুমি অনর্গল কথা বলছিলে, লালচকের দিনগুলির কথা, যমুনার কথা, আর আমি তখন নির্দোষ সুগন্ধে স্নান করছিলাম, তোমার চুল আমার মুখের সামনে লুটিয়ে পড়েছিল, আমি তোমার রেশমের মত হালকা চুল মুঠো করে ধরেছিলাম, তুমি এমন কথার মধ্যে ডুবে ছিলে যে সেটুকু তুমি অনুভব্ করনি, কিন্তু বিশ্বাস করো রূপা, আমি আমার এই একঘেয়ে জীবনে কোনদিন এমন রামধনুর মধ্যে সাঁতার কাটিনি। তুমি কখনো আবার আমার এত সান্নিধ্যে এসে বসবে আমি কল্পনাও করিনি। শোন রূপা, আমি যা ভেঙে ফেলেছিলাম, তুমি তা আবার গড়ে তুলছো। সেজন্যেই আমার এত ভয়। তুমি ঐ তিনটি শব্দের নির্লজ্জ ধিক্কারের দিকে যেন চোখ ফেলো না।'

নিরুপম যেন একটা অসহায় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। কারণ রূপা সেই আগের মতোই এমন একটা রহস্যময় কুয়াশার মধ্যে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে, যেখান থেকে নিরুপম একেবারে তার হৃদয়ের কাছটিতে কিংবা সূর্য-আড়াল পাহাড়ের ওপারে। রূপা যেন সত্যি

একটা অনন্ত রহস্য। ওকে যেন কোন কথাই বলা যায় না, বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত সৌন্দর্যের রেশটুকু কুৎসিত আর নোংরা হয়ে যাবে।

আর তো মাত্র কয়েকটা দিন, তারপরই রূপা চলে যাবে। কিন্তু কয়েকটা দিনের জন্যে ও নিরুপমের জীবনকে রাঙিয়ে দিয়েছে, নিরুপম সে জন্যে কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ। রূপার কাছে ও আর কিছু চায় না। ওর মনে হচ্ছে কতকাল যেন ওর শিয়রের কাছে কোন হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি শোনেনি, ওর ঘরের ফুলদানি কোন আন্তরিকতার স্পর্শে এমন পুষ্পিত হয়ে ওঠেনি, কেউ ওকে এভাবে স্বপ্নের আকাশে উড়তে দেয়নি। না, নিরুপম আর কিছু চায় না। ও শুধু সেই নিহত দিনগুলিকে আবার বাঁচিয়ে তুলে সুখী খাঁচাটার মধ্যেই ফিরে যাবে।

নিরুপম ভাবলো, আমি তো একটা নিষ্পাপ প্রার্থনা জানাচ্ছি, অথচ কেউই আমার ভিতরটা দেখতে পায় না, বুঝতে পারে না।

আজ সেই পাপবোধ থেকে হয়তো নিরুপম মুক্তি পাবে, তবু ওকে অভিনয় করে যেতে হচ্ছে। ঠিক যেভাবে দাসবাবুর কাছে বলেছিল, যাকে যোগ্য মনে হয়েছে, তাকেই সিলেক্ট করেছি। অলকার কাছে ও যদি সমস্ত কথা খুলে বলতে পারতো। কিন্তু না, ওর ভয়, সুখের খাঁচাটা তা হলে হয়তো ভেঙে পড়বে। অলকাকে লেখা চিঠির ভাষাটা ওর মনে পড়লো। 'ভেবেছিলাম একা-একা এ ক'টা দিন একটু বেলা পর্যন্ত ঘুমোবো, রেডিওর গান শুনবো, কিন্তু ঘাড়ের ওপর একটা বিশ্রী ঝামেলা এসে পড়েছে—রূপা, সেই যে লালচকের, যাকে বুলাপিসি বলতাম, তাঁর মেয়ে, কি একটা প্যারালিসিসের মত রোগ নিয়ে ডাক্তার দেখাতে এসে উঠেছে। দিনরাত তার ডাক্তার, ওষুধ, ইনজেকশন, নানান বায়নাক্কা। বলছে তো দু' একদিনের মধ্যেই চলে যাবে।' কথাগুলো মনে পড়তেই নিরুপমের ভীষণ খারাপ লাগল। অলকার কথা মনে পড়ল, বুবুনের কথা, ইলুর কথা।

সঙ্গে সঙ্গে ওর মন বলে উঠল, নিরুপম, তুই একটা স্কাউনড্রেল। আর তখনই বিচারকের আসনে যে নিরুপম বসে ছিল গম্ভীর রাশভারী মুখে, সে একবার ফিরে তাকালো নির্দয় প্রসিকিউটরের তর্জনী তোলা ক্রুদ্ধ নিরুপমের দিকে, আরেকবার কাঠগড়ায় দাঁড়ানো ম্লানমুখ নিরুপমের দিকে, তারপর হাসতে হাসতে বললে, অতীতের নিরুপম যে একটি প্রেমকে হত্যা করেছিল, সে স্কাউনড্রেল ছিল, নাকি আজকের নিরুপম, যে পাপবোধের জের টানতে টানতে অভিনয় করে চলেছে, এই লোকটিই স্কাউনড্রেল?

নিরুপম ভাবলো, আমি তো শুধু প্রথম যৌবনের লালচক, কবুতরবাগ আর রামলীলার মাঠে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য টুকরো টুকরো নানা রঙের পাথরগুলো তুলে আনতে চাইছি, চারপাশের মানুষ, ঝুমারা, ঐ বিপিন, কিংবা অলকা আমার সেই স্বপ্নটা ভেঙে দিতে চাইছে। আমি তাই অভিমানে নিজের চেহারাটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছি। কোন ফোটোগ্রাফার ফ্ল্যাটারির তুলিতে এঁকেও আর সেই গোটা মানুষটাকে পাবে না। অ্যালবামে যে ছবিই এনে রাখা হোক না, নিরুপম ভাবলো, মনে হবে আমার মধ্যে যেন আমি নেই।

ভাবতে ভাবতে কখন অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল নিরুপম। রূপার কথায় তন্ময়তা ভেঙে গেল।

রূপা হাসতে হাসতে বললে, এই, কি এত ভাবছো তুমি? যাবে না?

সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে নামছিল ওরা দু'জনে। নিরুপমের তখন কেবলই ভয় করছিল। আর তখনই অঘটন ঘটে গেল।

কাঠকয়লা দিয়ে সিঁড়ির দেয়ালে লেখা ধিক্কারটুকুর সামনে এসেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রূপা, হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে দেখলো, তারপর সুর টেনে টেনে জোরে জোরে উচ্চারণ করলো, ছি ছি ছি!

নিরুপমের তখন লজ্জায় সঙ্কোচে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে।

আশেপাশের ফ্ল্যাটের কেউ হয়তো শুনতে পেয়েছে রূপার কথা। জেনে গেছে, যাদের লক্ষ্য করে লেখা, তারা দেখেছে, দেখেছে।

নিরুপম কোন কথা না বলে তরতর করে নেমে যাচ্ছিল, আর তখনই শব্দ করে হেসে উঠল রূপা। বললে, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, বলেই সুর টেনে টেনে ছড়া আবৃত্তির মত করে বললে,—ছি ছি ছি, পরমান্ন রেঁধে বলে ফ্যান ঢালবো কি।

পরমান্ন শব্দটা নিরুপমের মনে একটা স্নিগ্ধভাব এনে দিল। পরক্ষণেই মনে হল ছড়াটার মধ্যে কি যেন একটা গূঢ় অর্থ আছে। কিন্তু সেই অর্থটা কিছুতেই যেন স্পষ্ট হয়ে ধরা দিচ্ছে না।

ওরা তখন গঙ্গার ধারে জেটির গ্যাংওয়ে ধরে নেমে চলেছে। পরমান্ন শব্দটা তখনো নিরুপমের মনে একটা পবিত্র সৌরভ ছড়িয়ে দিচ্ছে। নিচে নেমে এসে জেটির রেলিং ধরে দাঁড়াল ওরা। দূরে একটা জাহাজের বাঁশি বাজালা। গঙ্গার অন্ধকার জলে কোন ঢেউ নেই। ছায়া-ছায়া নৌকোর সারি নিথর।

দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে রূপা হঠাৎ বললে, আমাদের লালচকের বাড়ির সামনে সেই বড় নালাটা, বর্ষার দিনে টইটুম্বর হয়ে থকতো, আমরা কাগজের নৌকো ভাসাতাম। মনে আছে নির্পমদা, তুমি কাগজ কেটে নৌকো বানিয়ে দিয়েছিলে…

কাগজের নৌকো ভাসাতাম! কাগজের নৌকো ভাসানোর দিনগুলোই তো সুন্দর ছিল। পবিত্র আর সুন্দর।

নৌকো ভাসিয়ে দিতেই সেটা জলের তোড়ে হেলেদুলে ছুটে যাচ্ছিল. আর রূপা হাততালি দিয়ে হেসে উঠেছিল।

মিশিরজীর মেয়ে সর্সতী, সেও দু'একটা নৌকো ভাসিয়েছিল।

আর তখনই নিশীথ কোথায় যেন যাচ্ছিল, সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ওদের খেলা দেখার অজুহাতে নিশীথ আসলে রূপাকে দেখছিল।

নিশীথ কিংবা ব্রিজলাল কিংবা সন্দীপ, যে কেউ রূপার দিকে তাকালে একটা প্রচণ্ড রাগ নিরুপমের মনে গুমরে উঠতো। ওদের চেখের চাউনি নিরুপমের ভাল লাগতো না। ওদের কেউ রূপার কথা উচ্চারণ করলে ওর মনে হত রূপার বিশুদ্ধতা নষ্ট হয়ে যাবে। ওদের দৃষ্টির আড়ালে ও রূপাকে পবিত্র আর সুন্দর রাখতে চাইতো।

রূপা একবার আড়চোখে বোধহয় নিশীথের দিকে তাকিয়েছিল, আর রূপার ওপর নিরুপমের খুব রাগ হয়েছিল। ও চাইতো না রূপা কারো দিকে তাকায়, কারো সঙ্গে কথা বলে। ও ভয় পাচ্ছিল, নিশীথ হয়তো রূপার সঙ্গে কথা বলে বসবে।

ও তাই নিশীথকে নিয়ে ওখান থেকে সরে গিয়েছিল।

নিশীথ সেই বয়সেই মেয়েদের বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। রূপার সম্পর্কে নিশীথের তাই কৌতূহলের শেষ ছিল না। কিন্তু ওদের কাছে রূপার কথা বলতে ওর একটুও ইচ্ছে হতো না।

ওকে রূপাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে আসার জন্যে নিশীথ খুব চটে গিয়েছিল। ব্রিজলাল আর সন্দীপের কাছে এসে ও একটা বিচ্ছিরি ঠাট্টা করলো নিরুপম আর রূপাকে নিয়ে। তখনো নিরুপম মুখ বুজে সহ্য করেছে।

তারপরই নিশীথ কুৎসিত ভাবে হেসে উঠে বলেছে, তুই তো কিছুই পারবি না নিরুপম, কবুতরওয়ালীর সঙ্গে বরং আমার আলাপ করিয়ে দে। তারপরেও একটা জঘন্য কথা উচ্চারণ করেছে নিশীথ। আর তা শুনে ব্রিজলাল হেসে উঠেছে।

নিরুপমের মনে তখন কোন পাপ ছিল না। পরে মনে হয়েছিল নিশীথ যেন রূপাকে একটা নোংরা নর্দমার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। ও তাই কুৎসিত ঠাট্টাটা সহ্য করতে পারলো

না। ও পাগলের মত ছুটে গিয়ে নিশীথের সার্টের কলার ধরলো, ঘুঁষির পর ঘুঁষি বসিয়ে দিল তার মুখে। রাগে থরথর করে কাঁপছিল ও। ওর দু' চোখ জলে ভরে গিয়েছিল। আর তখনই কি যে হয়ে গেল, ব্রিজলাল আর নিশীথ দু'জনে মিলে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। নখের আঁচড়ে, প্রতিহিংসার ঘুঁষিতে ওকে বিপর্যস্ত করে দিল ওরা।

নিরুপমের জামা ছিঁড়ে গিয়েছিল, মনও।

অনেকদিন রূপাদের বাড়িতে যায়নি ও। অকারণ একটা অভিমান হয়েছিল রূপার ওপর। হঠাৎ একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। টমটমে করে প্রতিদিনের মতো কলেজে যাচ্ছিল রূপা, নিরুপমকে দেখতে পেয়ে টমটম থামাতে বললো।

কি যেন বলতে যাচ্ছিল রূপা, তার আগেই নিরুপমের গলায় চিবুকে কালসিটে দাগগুলো দেখে আঁতকে উঠল রূপা।—কি হয়েছে তোমার, নির্পমদা!

নিরুপমের চোখ ঠেলে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু সব কথা ও বলতে পারেনি। শুধু বলেছিল, ওরা তোমার সম্পর্কে একটা বিশ্রী ঠাট্টা করলো, আমি সহ্য করতে পারলাম না। ওরা আমার জামা ছিঁড়ে দিয়েছে রূপা, আমাকে হারিয়ে দিয়েছে। ওর গলার স্বর কান্না হয়ে যেতে চেয়েছিল।

অবাক হয়ে নিরুপমের মুখের দিকে তাকিয়ে রূপা সমবেদনার গলায় বলেছিল, তুমি ওদের সঙ্গে মিশো না, নির্পমদা, ওরা খারাপ, খারাপ।

নিরুপম বুঝতে পারে না, ও নিজেই কি করে একদিন নিশীথ হয়ে গিয়েছিল। কিংবা কে জানে, নিরুপমের শরীরের মধ্যেও হয়তো নিশীথরা ঘুমিয়ে থাকে। সাপের মত সেই শয়তানটা হয়তো সব সময়েই আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে।

সে জন্যেই রূপা আসার পর থেকে নিরুপমের কেবলই নিজেকে ভয়-ভয় করছে। অথচ রূপা এখন ওকে আর একটুও ভয় পাচ্ছে না।

১০

উইটিবি খুঁড়ে খুঁড়ে সোনা পেয়েছিল নিরুপম।

গুনে গুনে আটচল্লিশটা হাফ-গিনি কবুতরবাগের টিউবওয়েলের জলে ধুয়ে পকেটে পুরেছিল সন্দীপ। নিরুপম সাবধান করে দিয়ে বলেছিল, তোর বাবাকে নিয়ে গিয়ে দিবি কিন্তু, তোকে কোন বিশ্বাস নেই। সন্দীপ মুচকি মুচকি হেসেছিল, ও তখন উত্তেজনায় অস্থির। উত্তেজনা কি নিরুপমেরই কম ছিল, ও এসে বাড়িতে না বলে পারেনি। মা বলেছিল, কারো কাছে ঘুষ পেয়েছিল, তাড়াতাড়িতে রেখে ভুলে গিয়েছে বদলির নোটিস পেয়ে। একদিন রূপাকেও বলেছিল, জানো রূপা, আমি উইটিবির ভেতর থেকে সোনা বের করেছি। শুনে রূপা হেসে উঠেছিল। তারপর সব ঘটনাটা জেনে ঠাট্টা করে বলেছিল, কি বন্ধু তোমার, তোমাকে একটাও দিল না। ওর মনে হয়েছিল, রূপা হয়তো ওর কথা বিশ্বাসই করেনি।

সন্দীপ গিনিগুলো নিয়ে গিয়ে ওর বাবাকে দিয়েছিল কিনা ও কোনদিনই জানতে পারেনি। কারণ মৃগাঙ্কবাবু আর লালচকে আসেননি।

তাই হঠাৎ একদিন ও বাড়ি ফিরে মৃগাঙ্কবাবুকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল। মৃগাঙ্কবাবু তখন বারান্দায় বসে নিরুপমের বাবার সঙ্গে গল্প করছিলেন। সেদিন বাড়িতে মাংস রান্না হয়েছিল, নিরুপম দেখলে মৃগাঙ্কবাবুর হাতে এক বাটি মাংস, উনি পরম পরিতৃপ্তিতে খেতে খেতে গল্প করছিলেন, মাঝে মাঝে রান্নার প্রশংসা করছিলেন। নিরুপমকে প্রথমটা ওরা

কেউই লক্ষ করেনি।

নিরুপমের সেদিন খুব খারাপ লেগেছিল। এই লোকটা তো ঘুষখোর, সবাই জানে। ওঁর ছেলে সন্দীপ নিরুপমের বন্ধু বলে মার কত আপত্তি। মিশতে বারণ করতো। তা হলে এই লোকটার সঙ্গে বাবা কেন এমনভাবে গল্প করছেন। কেন এক বাটি মাংস খাইয়ে আপ্যায়ন করছেন। শুধু নিরুপম সন্দীপের সঙ্গে মিশলেই যত অভিযোগ। মা-বাবার কথার সঙ্গে ব্যবহারের কোন মিল খুঁজে পায়নি সেদিন।

মৃগাঙ্কবাবু খাওয়া হয়ে যেতেই কলতলায় হাত ধুয়ে এলেন আর নিরুপমের বাবা নিরুপমকে ডাকলেন। বললেন, এই যে এসেছে। এই নিরুপম।

নিরুপম মৃগাঙ্কবাবুকে প্রণাম করলো। আর মৃগাঙ্কবাবু ওর মাথায় হাত দিলেন আশীর্বাদ করার ঢঙে। বললেন, সন্দীপ তোমার বন্ধু ? তুমি অতগুলো গিনি উদ্ধার করে দিলে। তোমাকে কিচ্ছু দিল না ?—বলে হো হো করে হাসলেন।

বললেন, হাত পাতো, দেখি। বলে পকেট থেকে কাগজ মোড়ানো কি একটা ওর হাতে দিয়ে হাতটা মুঠো করে দিয়ে বললেন, যাও, গিয়ে দ্যাখো।

ও সঙ্গে সঙ্গে খুলে দেখলো। একটা আংটি, খুব সুন্দর একটা আংটি, বড় একটা মুক্তো বসানো।

মৃগাঙ্কবাবু চলে যাওয়ার পর নিরুপমের বাবা আবার ভাল করে দেখলেন আংটিটা। বললেন, খুব সুন্দর। চার আনা সোনা আছে বোধহয়। মা বললো, মুক্তোটা কি ঝকঝকে দ্যাখো।

নিরুপম ভাবতেই পারেনি মৃগাঙ্কবাবু ওকে একটা আংটি দেবেন। ওর তো সন্দেহ ছিল, সন্দীপ ওর বাবাকে কিছু বলেইনি।

নিরুপমের বাবার মুখ তখন খুশি খুশি। বললেন, মৃগাঙ্কবাবু লোক কিন্তু সত্যি খুব ভাল।

মা বললে, অন্য কেউ হলে কিছুই দিত না।

সুধা দেখে শুধু ঠোঁট উল্টেছিল।

শুধু নিরুপমের মনে হয়েছিল, বাঃ বাঃ, একটা আংটি দিলো, চার আনা সোনার, আর অমনি লোকটা ভাল হয়ে গেল তোমাদের কাছে। কিন্তু ও নিজেও খুব খুশি হয়েছিল। আঙুলে পরে আংটিটা বারবার দেখছিল।

মা বললেন, দে, রেখে দিই, তুই তো কোথায় হারাবি। কিন্তু নিরুপম দেয়নি। ওর তখন কেবলই ইচ্ছে হচ্ছে রূপাকে দেখিয়ে আসতে। দেখো রূপা, তুমি তো বিশ্বাস করনি। ঠাট্টা করেছিলে, সন্দীপ আমাকে একটাও গিনি দেয়নি বলে।

এখন ওর অনুশোচনা হয়, আংটিটা না পেলেই যেন ভাল ছিল। উইঢিবি খুঁড়ে খুঁড়ে ও সোনা পেয়েছিল। সোনার বদলে মুক্তোর আংটি, তারপর মুক্তোটা গলে গিয়ে রূপার দু' চোখে দু' ফোঁটা জল হয়ে গিয়েছিল। সঞ্চয় মনে করে ও যা কিছু জমিয়ে রেখেছিল, ওর তালাবন্ধ ঘরখানায়, একদিন দেখলো তার সর্বত্র উই ধরে গেছে। কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

কেমন একটা অভিমান তখন নিরুপমকে পেয়ে বসেছে। ওর এক এক সময় সন্দেহ হতো রূপা হয়তো ওর মনের ভেতরটা দেখতে পেয়েছে, ও যে রূপার প্রেমের জন্যে কাঙাল হয়ে আছে জানতে পেরেছে, আর তাই কেবলই ওকে এড়িয়ে যাচ্ছে। ওর সবচেয়ে রাগ হতো রূপা ওর সুন্দর বিকেলটা কেড়ে নিয়েছিল বলে। রূপার বিকেলটা তখন গঙ্গা আর যমুনা, মিশিরজীর মেয়ে সর্সতীর সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলায় কেটে যেতো। তাছাড়া ও-সময়ে গেলেই তো রূপা মনে করবে যমুনার জন্যেই ও গিয়েছে। যাবো না, যাবো না, ও মনে মনে

ভাবলো, আমি রূপা আর যমুনার মধ্যে শাট্‌ল কক হতে পারবো না।

কিন্তু ও যতই নিজেকে আটকে রাখার চেষ্টা করছিল, ততই রূপার ছবিটা ওর চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সেই একই রূপা, কিন্তু সে তখন অ্যালবামে একটা অন্য ছবি হয়ে গেছে। একটা শরীরের ছবি। মা বলেছিল, তুই অত বুলাদের বাড়ি যাস্ কেন, ওর মেয়ে বড় হয়েছে, লোকে খারাপ বলবে। ও লজ্জা পেয়েছিল শুনে। নিশীথ বলেছিল, তুই তো কিছুই পারবি না নিরুপম, তার চেয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দে। ব'লে রূপার শরীরের সুন্দরতার একটা স্থূল বর্ণনা দিয়েছিল। ও রেগে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, তারপর থেকে রূপা ওর কাছে একটা সুন্দর শরীর হয়ে গিয়েছিল। ও রূপার দিকে আর আগেকার মতো নিষ্পাপ চোখ নিয়ে তাকাতে পারতো না। ওর চোখ নিশীথের চোখ হয়ে গিয়েছিল। কিংবা শুধুই বয়স নিরুপমকেও একটা শরীর করে দিয়েছিল।

এক একদিন রাত্তিরে যখন ঘুম আসতো না, ও কল্পনায় রূপার চুল চোখ, মসৃণ, বাহু, কোমল স্তনের স্পর্শ অনুভব করতো। ও এতকাল শুধু একটা সুন্দর সম্পর্কের নেশায় ছুটে যেতো। জানতো না, আরো একটা তীব্র আকর্ষণ রূপার শরীরে লুকিয়ে আছে।

শেষ অবধি দুপুর বেলাতেই গিয়ে হাজির হল ও। আংটিটা রূপাকে দেখালে ও বিশ্বাস করবে, সত্যি সত্যি সোনা পেয়েছিল নিরুপম। এক পলকের জন্যে ওর ইচ্ছে হয়েছিল ওটা রূপার আঙুলে পরিয়ে দেবার। কিন্তু তখনই মনে পড়লো, মা বলবে, কি করলি তুই আংটিটা। তখনই বললাম, হারিয়ে ফেলবি। বাবা আধ ঘণ্টা ধরে জেরা করবে, খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে নিরুপম ওটা বেচে দিয়েছে কিনা। তারপর ওর মনে হল, না, আমি তো কখনো কারো কাছে কিচ্ছু পাই নি। রূপার কাছেও না। প্রাণ গেলেও আমি ওটা কাউকে দিতে পারবো না।

দুপুর বেলায় গিয়ে দেখলে, মালী বাগানে ফুলগাছের ভেলী বানাচ্ছে। ওকে দেখে কাজ থামিয়ে চোখ তুলে তাকালো। বললে, বহেনজী কোঠীতে আছে। মেমসাব নেই, হাসপাতাল।

নিরুপম ওর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে জানলে, রূপার বাবা মেমসাহেবকে হাসপাতালে দেখাতে নিয়ে গেছেন। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরও রূপার মাকে মাঝে মাঝে দেখাতে নিয়ে যেতেন।

নিরুপম ভেবেছিল, রূপাকে ও অবাক করে দেবে। তাই ও নিঃশব্দে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো। এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে দেখল। না, কোথাও পেল না। তখন পা টিপে টিপে রূপার শোবার ঘরে ঢুকতেই দরজায় আলো আড়াল হতেই চমকে চোখ তুললো রূপা। হেসে বললে, উঃ কি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম নির্পমদা।

খাটের পাশে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে বসেছিল রূপা, একটা টেবল ক্লথ না কি, রঙিন সুতো দিয়ে তার কোনায় নক্সা তুলছিল। ছুঁচ সুতো দিয়ে তেমনি নক্সা তুলতে তুলতেই বললে, ব'সো।

নিরুপম বসল না। রূপার কাছটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল, মাথা নিচু করে একটু ঝুঁকে পড়ে রূপা একমনে নক্সা তুলছে কাপড়ের গায়ে। আর তখনই ও যেন রূপাকে নতুন করে আবিষ্কার করলো।

ও দাঁড়িয়ে রইলো। একটা অজানা দেশের দরজা যেন ওর চোখের সামনে হঠাৎ খুলে গেছে। ওর শরীরের রক্ত যেন মাতাল হয়ে উঠতে চাইলো।

এক মুহূর্ত আগে শিল্পীর আঁকা সুন্দর একটা ছবির মতো লাগছিল রূপকে। ওর সুন্দর মুখশ্রী, ওর চোখ, চিবুকের গড়ন, বাহুর বঙ্কিম রেখা, ওর বসার ভঙ্গিটি নিমেষের মধ্যে চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। নিরুপমের দৃষ্টি তখন পিছলে গিয়ে রূপার গলার

উজ্জ্বল সানুদেশ বেয়ে নিরাবরণ সেই অজানা পৃথিবীতে আটকে গেছে।

ওর নিজেরই হৃৎপিণ্ডের ধ্বনি ও তখন শুনতে পাচ্ছে। ওর সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত।

নিজেকে সংযত করার জন্যে নিরুপম গিয়ে খাটের ধারে বসলো। দুটি হাঁটুর ওপর দুটি হাত রেখে। নিরুপমের মনে হল ওর সমস্ত শরীর যেন থরথর করে কাঁপছে।

আর তখনই চোখ তুলে কি বলতে গিয়ে ওর আঙুলে মুক্তোর আংটিটা দেখতে পেল রূপা। বলে উঠল, দেখি, দেখি, মুক্তো ?—বলে হাত বাড়িয়ে নিরুপমের আঙুল ছুঁলো।

নিরুপম আংটিটা খুলে রূপার হাতে দিল, কোন কথা বললো না।

আংটিটা নিল রূপা, ওকে তখন খুব উজ্জ্বল দেখালো, মুখে তৃপ্তির হাসি। বললে, খুব সুন্দর তো। তারপর কৌতুকে হেসে উঠল।—যমুনাকে দেবে, তাই না ?

নিরুপম কোন উত্তর দিল না। ও বুঝতে পারলো রূপা ওকে রাগাতে চাইছে।

কিন্তু পরক্ষণেই রূপা বলে উঠল, দেবো না, কক্ষনো দেবো না, এ আংটি আমার ! এমন জোরের সঙ্গেই বললো, নিরুপমের মনে হল সত্যিই যেন ফেরত দেবে না।

কি হল কে জানে, নিরুপম বললো, না না, এ আংটি কাউকে দেবার জন্যে না। দিয়ে দাও তুমি, দিয়ে দাও।

নিরুপম হাত বাড়িয়ে আংটিটা ছিনিয়ে নিতে গেল, আর তখনই রূপা হাসতে হাসতে বললে, কক্ষনো না,কক্ষনো ফেরত দেব না আংটি।—বলেই টুপ করে আংটিটা ব্লাউজের বুকে ফেলে দিল।

নিরুপমের শরীরের মধ্যে সেই মুহূর্তে একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। ওর মাতাল হাতখানা ছুটে গেল আংটিটার, ঝকঝকে সুন্দর মুক্তোর আংটিটার পিছনে পিছনে।

পলকের মধ্যে রূপার ফর্সা মুখখানা লজ্জায় কেমন যেন হয়ে গেল। নিরুপম দেখলো, রূপার ফর্সা কান, কানের নিচে অনেকখানি অবধি একেবারে রক্ত-জমা লাল হয়ে গেছে। যেন আবীরের ছোপ লেগেছে।

সঙ্গে সঙ্গে রূপার হাত মুঠো করা ছিল, ও আংটিটা সত্যি সত্যি ব্লাউজের মধ্যে লুকোয়নি, লজ্জায় রাগে ঘৃণায় তীব্র বেগে মুঠোটা ছুঁড়ে দিল রূপা। আর আংটিটা মেঝেতে ছিটকে গিয়ে খাটের পায়ার কাছে পড়ে রইলো।

কিন্তু নিরুপমের তখন আর আংটিটার জন্যে কোন আগ্রহ নেই। ওর শরীরের রক্ত তখন অন্য একটা জগতের ঠিকানা জেনে গেছে।

রূপা বোধহয় ভয় পেল। কিংবা লজ্জা। কিন্তু নিরুপম তখন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। ওর সমস্ত শরীর তখন একটা ক্ষমাহীন পাপ।

তারপর, তারপর আর ভাবতে পারে না নিরুপম।

সেই দিনটির কথা মনে পড়লেই আজো নিরুপমের মুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। সেদিনের সেই নিরুপমকে ও চিনতে পারে না। বুঝতে পারে না। একটা পাপবোধ ওকে গ্রাস করে বসে। আত্মধিক্কারে আর অনুশোচনায় ওর মাথা ঝুলে পড়ে।

স্পর্শের মধ্যে এমন একটা বিষাক্ত নেশা আছে, নিরুপম জানতো না। ওর মন বারবার কেবলই ছুটে যেতে চাইতো রূপার শরীরের কাছে। অথচ একটা আত্মগ্লানি আর লজ্জা ওকে বাধা দিয়েছে। এক একদিন ওর ইচ্ছে হয়েছে আংটিটা ফিরে আনার অজুহাতে ও আবার গিয়ে হাজির হবে রূপার সামনে।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর দিনটা এল, সব ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল নিরুপমের জীবনে। রূপার মা'র স্নেহের ডাক—পাগল ছেলে ! রূপার বাবা বলতেন, নিরুপম তো একটা জুয়েল ! কিন্তু কোনকিছুই ওর মনে পড়লো না, মনে পড়লো না।

ও চোখ বুজলেই আজো দেখতে পায়, রূপার দু'চোখ অবাক হতে হতে প্রচণ্ড একটা

আতঙ্ক হয়ে গিয়ে রাগ আর কান্না হয়ে যাচ্ছে। ঘৃণা হয়ে যাচ্ছে।

একা একা যখনই ও সেই দিনটির কথা স্মরণ করে, ও দেখতে পায় রূপা অপমানে স্নান করে উঠে ওকে দুটি সবল হাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত দুটো জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে আছে, সে চোখের দৃষ্টিতে সীমাহীন ঘৃণা। নিরুপম শুনতে পায়, রূপা চিৎকার করে বলছে, তুমি একটা জন্তু, জন্তু, তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা করে। নিরুপম দেখতে পায়, রূপার দু'চোখ ভাসিয়ে দু'গাল বেয়ে ঝরঝর করে অশ্রু নেমেছে।

নিহত চরিত্রের ভাঙা মেরুদণ্ড আর পাপবোধের অসীম আত্মধিক্কার নিয়ে নিরুপম বিবর্ণ মুখে সেদিন মাথা নিচু করে বেরিয়ে এসেছিল।

নিরুপম আর কোনদিন ফিরে যেতে পারেনি। কোনদিন নিজের কাছে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। সারা জীবন ধরে ওকে তাড়া করে বেড়িয়েছে ইস্পাতের ফলার মত সেই ঘৃণার ধিক্কার। তুমি একটা জন্তু, জন্তু, তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা করে।

১১

রূপা তুমি ঠিকই বলেছো, আমিতো একটা জন্তু। আমি সেই প্রাচীন ব্যাধের মত প্রেমকে তীরবিদ্ধ করেছিলাম, কারণ প্রেম কি তা আমি জানতাম না। তাকে নিহত করার পর সে আমার কাছে ধরা দিল, অসীম শূন্যতা আর অনন্ত অতৃপ্তির মধ্যে শ্লোকোচ্চারণের মতো আমার হৃদয়ের গভীরে প্রেমকে আমি অনুভব করলাম। কিন্তু সেই ক্ষমাহীন পাপ সারাজীবন ধরে আমাকে তাড়া করে বেড়ালো, তাড়া করে বেড়াচ্ছে এই আজও। আমিই সেই ব্যাধ, আমিই সেই বল্মীকাবৃত কবি।

রূপা বলে উঠেছিল, দ্যাখো দ্যাখো নির্পমদা, আমি আঙুল নাড়তে পারছি। ওর সমস্ত মুখ তখন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

প্রতিদিন রূপা যখনই একা একা, ও তখন ওর অসুখের দুর্ভাবনার মধ্যে ডুবে যেতো। নির্জনে বারবার আঙুলগুলো নাড়বার চেষ্টা করতো।

ডাক্তার সেন হেসে হেসে বলছিলেন, বোন্ টি-বি, ক্যান্সার, আর কি কি ভেবেছিলে ?

রূপা লজ্জায় কোন উত্তর দিতে পারেনি। কিন্তু ও তো সত্যিই আরো কিছু ভেবেছিল। আতঙ্কে ওর ঘুম ভেঙে যেতো। ওর ধারণা হয়েছিল, আঙুল কব্জি কনুই বেয়ে রোগটা ওর সমস্ত শরীর অবশ করে দেবে। সেই ছোটবেলায় দেখা বিকলাঙ্গ বৃদ্ধটির মতো ওর সমস্ত দেহ প্যারালিসিসে গ্রাস করবে। একটা জড়পিণ্ডের মতো পড়ে থাকবে ও, কারো কোন করুণা হবে না ওকে দেখে।

প্যারালিসিস, প্যারালিসিস। ওর এই আতঙ্কের কথাটা প্রথম যেদিন শুনেছিল নিরুপম, হঠাৎ ঐ 'জড়পিণ্ড' শব্দটা ওর মনের মধ্যে একবার উঁকি দিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়েছিল নিরুপম নিজেই যেন তার জন্যে দায়ী। এই রূপা মেয়েটির মনে স্বপ্ন ছিল, প্রেম ছিল, হয়তো কোনদিন কামনায় রঙিন হয়ে উঠতো ওর মন, কিন্তু তার আগেই নিরুপম তার স্বপ্ন প্রেমকামনা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে একটা জড়পিণ্ডে পরিণত করে দিয়েছিল।

রূপার কথা ভাবতে ভাবতে তাই নিরুপমের একবার মনে হয়েছিল ওর এই অবশ হয়ে যাওয়া রোগটা আসলে একটা প্রতীকের মতো। নিরুপম তো শুধু ওর নিজের পাপবোধের যন্ত্রণায় জ্বলেছে, অপমানে নিজের কাছে মাথা নিচু করে থেকেছে সারাজীবন, কিন্তু রূপার সেই সজীব উজ্জ্বল মনকে চিরকালের জন্যে প্যারালিসিসের মতো নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছে।

সে-কথা ভেবে নিরুপম নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি।

ডাক্তার সেন বলেছিলেন, ভয় নেই ইয়াংম্যান, নিরুপমের কাঁধে হাত দিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, এ একটা নার্ভের অসুখ, কথা দিচ্ছি সেরে যাবে।

সত্যিই সেরে যাচ্ছে বুঝতে পারছিল রূপা। আনন্দে অধীর হয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, দ্যাখো দ্যাখো নির্পমদা, আমি আঙুল নাড়তে পারছি, আমার একটুও ব্যথা লাগছে না।

তাকিয়ে দেখেছিল নিরুপম। আর তখনই মুক্তো বসানো আংটিটার দিকে ওর চোখ পড়েছিল।

সলজ্জ হেসে রূপা বলেছিল, আমি বলেছিলাম না, ফেরত দেবো না, কক্ষনো ফেরত দেবো না।

সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমের শরীর মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল : ও হাত বাড়িয়ে পরম আদরে রূপার আঙুল, আঙুলের আংটিটা স্পর্শ করেছিল।

রূপার মুখে তখন কৌতুকের হাসি। ওর চোখ হাসছে। বললে, আমি জানতাম, আংটিটা তো তুমি আমাকই দিতে গিয়েছিলে।

নিরুপম কোন কথা বললো না। মাথার মধ্যে তখন একটা শব্দই বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছে। জন্তু, জন্তু। তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা হয়।

সঙ্গে সঙ্গে নিরুপম মনে মনে বললে, নিরুপম, রূপা তোকে আরো নিচে নামিয়ে দিল : তুই নিজেকে ঘৃণা কর। তুই তো আংটিটা রূপাকে দিতে চাসনি। তুই তো তোব মাকে বলেছিলি, হারিয়ে গেছে। কারণ, বিবর্ণ মুখে মাথা নিচু করে তুই যখন বেরিয়ে এসেছিলি, তখন আর আংটির কথা তোর মনে ছিল না অথচ রূপা তোকে ক্ষমা করে দিয়ে সেটাকেই আঁকড়ে ধরে আছে অনেক সুন্দর আর পরিচ্ছন্ন দিনেব স্মৃতি হিসেবে।

নিরুপম রূপার কথাগুলো শুনল, কোন উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বললে, সত্যি, তোমার অসুখ সেরে যাচ্ছে। দেখো তুমি, ঠিক সেরে যাবে।

মনে মনে বললে, কি অদ্ভুত একটা অভিনয় করছি আমরা দু'জনে। আমরা দু'জনেই স্মৃতির উইঢিবি খুঁড়ে চলেছি, অথচ দুজনেই ভান করছি যেন ভুলে গেছি।

ভুলে গেছি, ভুলে গেছি। কিছুই ভোলেনি ও। আসলে নিরুপমের অস্তিত্ব যেন দু'টুকরো হয়ে দুটো মানুষ হয়ে গেছে। একটা অন্যটার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারছে না। ওর অভ্যস্ত জীবনের সুখের খাঁচাটা একদিকে, আরেকদিকে হলুদ জ্যোৎস্নার আকাশে স্মৃতির ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা উড়ছে, রুপোলি পালক খসে পড়ছে তাদের পাখনা থেকে।

প্রিন্সেপ ঘাটের জেটির রেলিংয়ে ভর দিয়ে তখন রূপা কাগজের নৌকো ভাসিয়ে চলেছে। কাগজের নৌকোগুলো কবুতরবাগের বড় নালাটার বর্ষায় টইটম্বুর স্রোত বেয়ে ভেসে চলেছে। গঙ্গার অন্ধকার নিথর জলের সারি সারি ছায়া ছায়া নৌকোর সারিও যেন কল্পনায় ভেসে চলেছে।

সেই সময় দূরে কোথায় একটা জাহাজের বাঁশি বাজলো। সেদিকে তাকিয়ে রূপা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে। তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমরা একদিন ভেবেছিলাম জাহাজে করে কোথাও যাবো, অনেক দূরে কোথাও, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস।

হঠাৎ হেসে উঠে বললে, ডিঙিতে করেও কোথাও যাওয়া হল না।

নিরুপম নিজেই যে সে ডিঙিটা উল্টে দিয়েছিল। তাই নিরুপম কোন কথা বললো না।

আর তখনই অলকাব কথা মনে পড়ে গেল নিরুপমের। অলকার চিঠিখানার কথা। চিঠির কটা লাইন কাঁটার মত খিচখিচ করে লাগছে। 'রূপাকে বলো ওব বরকে নিয়ে একবার জামসেদপুর ঘুরে যেতে। কিংবা একুশ তারিখ অবধি ওদের থাকতে বলো, আমি ফিরবো। রূপাদের তো কখনো দেখিনি।'

নিরুপমের মনে হল রূপা একা এসেছে এ-কথা স্পষ্ট করে না লিখে ও ভুল করেছে।

ভাবতে ভাবতে ওর নিজের ওপরই মনটা বিষিয়ে উঠল। মনে হল একটা বেহিসেবী মানুষ, এখন হিসেব করে করে সারাজীবন তাকে চলতে হবে। একা, একেবারে একা এসেছে রূপা। হৃষীকেশ আসেনি, সে-কথা অলকাকে জানাতে তখন সাহস হয়নি। এখন সে-কথা লিখলে অলকা কি ভাববে কে জানে। অথচ অলকা তো জানবেই।

নিজের জীবনটাকে নিরুপম একবার চোখের সামনে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলো। একটা রঙ হারানো বিবর্ণ মানুষ। খবরের কাগজ পড়ে, দাড়ি কামায়, ঘাড়ে পাউডারের পাফ বোলায়, যন্ত্রের মত অফিস করে, অকারণ অহঙ্কার দেখায় সাবর্ডিনেটদের কাছে, দাসবাবুর কাছে, দত্তসাহেবকে হেসে হেসে কথা বলতে দেখলে খুশি হয়, তারপর ক্লান্ত হয়ে খাঁচায় ফিরে আসে। যতক্ষণ বিশ্রাম, ততক্ষণ শুধু হিসেব। সংসারের কিংবা আত্মীয়-স্বজনের টুকিটাকি খবর শোনে, অলকার কাছে অভাবের কথা। অফিস ক্লাবে গিয়ে এখন আর তাস খেলতে ভাল লাগে না, আজ শনিবার সিনেমা দেখার দিন, আজ সাত তারিখ ওয়ালডর্ফে গিয়ে চীনে খাবার খাবো সবাই মিলে, ক্লান্ত ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়া কিংবা অভ্যস্ত ভালবাসা। নিরুপম মানুষটাকে দেখতে পাচ্ছে। সে শুধু হিসেব করে, এই দিন, এই সপ্তাহ, উদ্বৃত্ত কিংবা ঘাটতি, আরো একটা প্রোমোশনের আশা, যা আছে এটুকু থাকবে তো, বুবুনের কলেজ অ্যাডমিশন কত দূরে, তার চাকরির দরখাস্ত কত দূরে, দাসবাবুর রিটায়ারমেন্টের দেরি নেই, নিরুপমের অনেক দেরি। কিন্তু প্রায় একই ধরনের কথা দুজনেরই। শুধু কতগুলো সংখ্যা, টাকার পরিমাণ। নিরুপম কিংবা দাসবাবুই না, সব মানুষই। একজন ব্যবসাদের সঙ্গে দাসবাবু তাঁর মেয়ের বিয়ে দিতে চাননি। বলেছিলেন, দিনরাত সে তো খেরোর খাতায় ডুবে থাকবে। জানতেন না, যে-কোন মানুষের জীবনই একটা হিসেবের খাতা। সারা জীবন সে কি করেছে? শুধু তো দিনের পর দিন, মাথার মধ্যে কিংবা খাতার পাতায় কেবল কতকগুলো সংখ্যা পর পর সাজিয়ে যোগ করেছে, কিংবা একটা সংখ্যা থেকে আরেকটা সংখ্যা বিয়োগ করেছে। হিসেব করেছে উদ্বৃত্ত কিংবা ঘাটতির। শুধু টাকায় কেন, সব ব্যাপারে। অথচ কোনদিনই তার উত্তর মেলেনি, সমস্ত হিসেব শেষ অবধি ভুল হয়ে যাবে জেনেও তার হিসেবের বিরাম নেই।

সেই হিসেবের জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে রূপাকে মনে হচ্ছে এক ঝলক মুক্তির হাওয়া। জেটি থেকে উঠে এসে গঙ্গার ধারে ধারে গাছ-পাত-ফুলের ওপর দিয়ে রূপা ওর হাতখানা বুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, হাসছে, নিরুপমের মনে একটা স্বপ্নের রেশ।

রূপা হঠাৎ আব্দারের ভঙ্গিতে বললে, এই, আমি নৌকোয় চড়বো। আমি কখনো নৌকোয় চড়িনি।

রূপার কোন সাধ অপূর্ণ রাখতে ইচ্ছে হচ্ছে না নিরুপমের। কারণ সেগুলোর মধ্যেই তো নিরুপম বেঁচে উঠতে চাইছে। ও সেই সুন্দর সম্পর্কটা ফিরে পেতে চাইছে।

দরদস্তুর করে একটা নৌকোয় উঠল ওরা। ছইয়ের ভিতরে গিয়ে বসল।

আর তখনই মাঝি হেসে বললে, আরাম করে বসুন বাবু। হাসিটার মধ্যে কিছু একটা ইঙ্গিত ছিল, 'আরাম' কথাটার ওপর একটু জোর দিয়েছিল।

নিরুপমের ভাল লাগেনি। ও তখন বলতে চাইছে, রূপা, দ্যাখো তুমি, আরেকবার আমাকে বিশ্বাস করো। জুঁই ফুলের মতো অসংখ্য তারাদের আকাশ থেকে তুলে এনে আমি আবার, একটা মালা গেঁথে তুলবো, সেটা কোনদিনই আর ছিঁড়ে দেব না।

নিরুপম কান্নায় ভেঙে পড়ে, বিনিদ্র রাতে প্রার্থনা করেছিল, রূপা কিংবা কোন··· ! আমাকে আরেকবার সুযোগ দাও। এই পাপ বোধ থেকে আমাকে মুক্তি পাবার সুযোগ দাও। আমি আর কোনদিন ভুল করবো না। রূপা, তুমি আর কোনদিন আমার হাতে নিহত

হবে না।

নৌকো দুলছিল, রূপার শরীর, শরীরের কোমলতা নিরুপমকে স্পর্শ করছিল, নিরুপমের বাহু, দূরে দূরে অসংখ্য আলোর জোনাকি, জেটিতে দাঁড়ানো ছোট্ট জাহাজের আলোকসজ্জা, চলন্ত লঞ্চের তীব্র আওয়াজ, ওরা দু'জনে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছিল, রূপার অন্ধকার শরীর, টুকরো টুকরো কথা, সব।

ফেরার পথে জেটির গেটের সামনে একরাশ ফুল, ফুলের মালা নিয়ে একজন বসেছিল, একবার থমকে দাঁড়িয়ে নিরুপম কি যেন ভাবলো। কিন্তু, রূপা তখন প্রগলভ আনন্দ হয়ে এগিয়ে চলেছে। নিরুপম যেতে যেতে একবার বললো, একটা জুঁইফুলের মালা কিনবো ভেবেছিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে রূপা শব্দ করে হেসে উঠল।—কি হবে নির্পমদা, মালা কি করবে ? অলকা বৌদি তো এখানে নেই।

যমুনা এখন অলকা হয়ে গেছে। কিন্তু রূপা যেন ঠিক তেমনি আছে। কিন্তু একটা সূক্ষ্ম সন্দেহ নিরুপমের মনে উঁকি দিয়ে গেল। নিরুপমের মতো রূপাও দুটো টুকরো মানুষ হয়ে যায়নি তো!

১২

প্রিন্সেপ ঘাটের উজ্জ্বল আলোয় সুবেশ সৌন্দর্যের ভিড়। স্নিগ্ধ কলরব। গাছ পাতা ফুলের মায়াজাল ছিন্ন করে প্রখর শ্বেতাভ আলোর উদ্ভাস। তারই মধ্যে মুহূর্তের জন্য ওরা দুটি প্রাণী নির্জনতা হয়ে গেল।

নিরুপমের কথা শুনে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল রূপা, একেবারে নিরুপমের মুখের কাছটিতে। হেসে উঠে বললে, কি হবে নির্পমদা, মালা কি করবে ?

নিরুপমের নিঃশ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেল। রূপার মুখ হাসছে, চোখ হাসছে, রূপার সমস্ত শরীর, ওর সুতনুদেহ, কোমল স্তনের লুব্ধতা একটা রহস্যের হাসি হয়ে এখনই যেন নিরুপমের শরীর স্পর্শ করবে।

নিরুপমের মাথার মধ্যে সমস্ত চিন্তাগুলো আবার জট পাকিয়ে যাচ্ছে। জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

নিরুপমের মনে হল এক্ষুনি বুঝি ওর সব প্রতিজ্ঞা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। নিরুপম নিজেও।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে ও রূপার শরীরের হাসি দেখল, রূপার শরীরের ঘ্রাণ নিলো, রূপার নিশ্বাসের স্পর্শ। ওর ভয় করতে লাগলো, প্রচণ্ড একটা ভয়, নিজেকে।

ঠিক সেই পুরোনো দিনের মতোই হঠাৎ এক এক সময়ে রূপাকে ওর রহস্যের মতো মনে হয়। ওর হাসিতে, ওর কথায়, ওর শরীরে কি যেন একটা রহস্য আছে।

ডাক্তার সেন ওকে আবার পরীক্ষা করে দেখলেন। ওর আঙুলে গিঁটে গিঁটে, ওর কব্জিতে কইনুয়ে স্টীলের পাতটা ঠুকে ঠুকে রি-অ্যাকশন পরীক্ষা করলেন। একটু একটু করে তাঁর গম্ভীব মুখ সাফল্যের স্বস্তি হয়ে গেল। অ্যাসিস্টেন্টকে ডেকে দেখালেন, বললেন, মাত্র এক সপ্তাহেই এতখানি উন্নতি আমি আশা করিনি। বললেন, এবার আপনার ছুটি। প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে বললেন, ইনজেকশন চলবে, ওষুধও। কানপুর ? তাই না ? চিঠি লিখে জানাবেন দু'মাস পরে, কিংবা দরকার হলে আরো আগে।

ব্যস্। ছুটি, ছুটি।

সঙ্গে সঙ্গে রূপা একটা অফুরন্ত সুখ হয়ে গেল।

নিরুপমের মনে হল ঐ রোগটা, প্যারালিসিসের ভয়, একটা জড়পিণ্ড হয়ে যাওয়া, এ-সব থেকে রূপা মুক্তি পেয়ে গেছে। ওর আবার মনে হল রোগটা আসলে একটা প্রতীকের মতো।

কিন্তু একটা সূক্ষ্ম সন্দেহ ওর মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াল। এই কটা দিনের প্রতিটি তুচ্ছ ঘটনা প্রতিটি কথার মধ্যে ও যেন অন্য কিছু দেখতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে। নিরুপম তো ওর গোপন পাপবোধের মধ্যে নিজেকে পুড়িয়ে সেই সুন্দর সম্পর্কটা ফিরে পেতে চাইছিল। আর রূপা একেবারে বুকের কাছটিতে দাঁড়িয়ে, রূপার শরীর হাসছিল, যেন নিরুপম এখনই বিদ্যুৎ-স্পর্শ করে ফেলবে, রূপা কি এতদিন ধরে সেই পাপকে ক্ষমা করে স্নেহ দিয়ে পরম আদরে মুক্তোর আংটিটার মত যত্নের ঘরে তুলে রাখতে রাখতে সেটার ওপরই প্রেমকে প্রস্ফুটিত করে তুলেছে। নিরুপম জানে না।

নিরুপমের হাতে একখানা চিঠি তুলে দিয়েছিল রূপা। হৃষিকেশকে লেখা।

বলেছিল, ডাক্তার সেন ছুটি দিয়ে দিলেন, এত আনন্দ হল, ওকে, এক্ষুনি এক্ষুনি না জানিয়ে পারা যায়, বলো।

তারপর ওর ব্যাগ থেকে একটা ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর বের করে বলেছিল, রতনবাবুকে একটা ফোন করে দাও না।

নিরুপম আশ্চর্য হয়ে বলেছে, কেন ? রতনবাবুকে কেন ?

রূপা হেসে উঠেছে আবার সেই শরীর কাঁপিয়ে।—আমাকে তো ফিরতে হবে, না কি ?

ফিরতে হবে, ফিরতে হবে। নিরুপমের সমস্ত মন একটা বিষণ্ণতা হয়ে গেছে পলকের মধ্যে। ও যেন ভেবেছিল অনন্ত কাল ওরা পাশাপাশি কাছাকাছি থাকবে। এই তো নিরুপমের ঘর, ওপাশে বুবুনের ঘরে রূপা। মাঝখানে সেই ইচ্ছের দরজাটা।

হতাশ গলায় নিরুপম বলে উঠল, তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে রূপা ? অলকা তো এসে পড়ছে, আজ উনিশ···

রূপা আবার রহস্য হয়ে গেল, উচ্ছল শরীর কাঁপানো হাসি—তাড়াতাড়ি চলে না গেলে অনেক সময় আর যাওয়াই হয়ে ওঠে না যে।

নিরুপম মনে মনে বললে, রূপা তুমি ওভাবে কথা বলো না। রূপা, তুমি ওভাবে তোমার সুতনু যৌবনের উচ্ছলতা আমার সামনে মেলে ধরো না। তুমি শরীর কাঁপিয়ে হেসো না রূপা। তাহলে আমি আর সেই কবুতরবাগের, লালচকের নিষ্পাপ পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারবো না। তুমি আর পাপের উইঢিবিগুলো খুঁড়ে খুঁড়ে হলুদ আর চকচকে সোনায় গাঁথা মুক্তোটা আবিষ্কার করতে দিয়ো না।

অ্যালবামে আমার ছবিগুলোর দিকে আমি এখন আর তাকাতে পারছি না। ওর একটাও আমার ছবি নয়। অলকা যেটাকে নিষ্পাপ ভেবেছিল, কিংবা অফিসের পোশাকে যেটাকে বলেছিল আমার মধ্যে আমি নেই, সব অন্য মানুষের ছবি। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া অনেক মানুষের। অ্যালবামে রূপার কোন ছবি নেই, তাই রূপার ছবিটা একটুও বদলায়নি, বুকের মধ্যে ঠিক তেমনি আছে। রূপা, তুমি সে ছবিটা বদলে দিও না।

তুমি তো চলে যাবে। তোমাকে ফিরতেই হবে। নিরুপম মনে মনে বললো, আমি ভেবেছিলাম তুমি টুকরোগুলো জোড়া দিয়ে দিয়ে আমাকে আবার গোটা মানুষ বানিয়ে দেবে। জানতাম না, পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে আবার জোড়া দিলে সেটা গোলাপ হয়ে ওঠে না।

আমি তো আবার এই সুখের খাঁচাটার মধ্যেই ফিরে আসবো। ঐ অ্যালবামের পাতা

উল্টে উল্টে একটি ছবিতে নিজেকে চিনতে পারবো। ঐ গ্রুপ ফোটোখানায়, যার মধ্যে আমি আছি, অলকা আছে, বুবুন, ইলু, বাবার গম্ভীর মুখ, মার সাবধানী, 'তুই, বুলাদের বাড়ি অত যাস কেন', সুধা, সুধা, আংটিটা ভাল করে দেখেইনি যখন মৃগাঙ্কবাবু দিয়ে গেলেন, ঐ ছবিটার মধ্যেই আমাকে থাকতে হবে, ঐ ছবিটাই সকলে চিনতে পারবে।

টেলিফোনটা করে দাও নির্পমদা, রতনবাবু, তো আজ কালই ফিরবেন, ওঁর সঙ্গে চলে যাবো। তুমি তো আর আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে না।

না, নিরুপম এখন আর রূপাকে কোথাও পৌঁছে দিতে পারবে না। নিজেই যে আর কোথাও পৌঁছবে না। বাকি জীবনটা ও তো শুধু একটা অভ্যস্ত জীবনের খাঁচার মধ্যে থাকার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করবে। সেটুকুও না হারিয়ে যায়। বাকি জীবনটা ও তো শুধু একটা হিসেবের খাতার মধ্যে থাকবে।

অফিসের দাসবাবু বলেছিলেন, আর তো মাত্র দুটো বছর, তারপরই রিটায়ারমেন্ট, অনন্ত অন্ধকার। দাসবাবু আজকাল কেমন যেন হয়ে গেছেন। কথা বলেন না, চুপচাপ থাকেন, হিসেব মেলাতে পারেন না। বলেছিলেন, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডে কিই বা জমেছে, কিছু অপবাদ, অনেক শত্রু। অনেস্ট থাকতে চেয়েছিলাম, কেউ বিশ্বাস করেনি, ক্যাপিটাল ভাঙতে ভাঙতে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাক' কটা দু'চার বছরেই শেষ হয়ে যাবে, তারপর ছেঁড়া পাঞ্জাবি, আধ-পেটা খেয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে মৃত্যু পর্যন্ত আমাকে প্রমাণ করে যেতে হবে, দেখুন মশাই দেখুন, তখন আপনারা কেউ বিশ্বাস করেননি, কিন্তু আমি অনেস্ট ছিলাম কিনা দেখুন।

দাসবাবুর কথাগুলো শুনে সেদিন নিরুপম মুষড়ে পড়েছিল, একটা আতঙ্ক ছুঁয়ে গিয়েছিল। তারপর এক সময় ও নিজের মনেই হেসে ফেলেছিল। মনে হয়েছিল দত্তসাহেব সেদিন যদি তাঁর গাড়ি থেকে ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে দাসবাবুকে দেখতে পান, নির্ঘাত অফিসে এসে হাসতে হাসতে বলবেন, বুড়োটা একেবারে বেহিসেবী। কিংবা বলবেন, ও তো চিরকালই বোকা ছিল।

ও চোখ বুজে নানা রকমের কল্পনার পায়রা ওড়া দেখছিল। কবুতরবাগের পায়রাগুলো উড়ছে, ঝাঁক ঝাঁক পায়রা, আকাশ থেকে ঝকঝকে রুপোলি পালক খসে পড়ছে।

তারপর কখন ও যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ওর ঘুম ভেঙে গেল। নিরুপম দেখল ওর সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। আতঙ্কে ও চিৎকার করে উঠেছিল কিনা বুঝতে পারলো না। ঘুম ভেঙে যেতেই ওর মনে হল, আঃ, পরম নিশ্চিন্তি। জীবনে ও কখনো বোধহয় এত ভয় পায়নি। এমন একটা দুঃস্বপ্ন কখনো দেখেছে কিনা ওর মনে পড়ল না।

অন্ধকারের মধ্যে ও নিথর নিঃস্পন্দ বসে রইলো। ও নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করলো। নিজেরই অজান্তে একবার বোধ হয় ও হাত বাড়িয়ে অলকাকে স্পর্শ করতে চাইলো। কিংবা ইলুকে। খাটের পাশেই বেবি-কটে ইলু ঘুমিয়ে থাকে। পরক্ষণেই মনের ভুল বুঝতে পেরে ও বিছানা থেকে নেমে আলোটা জ্বালবে কিনা ভাবলো। আর তখনই ওর নিজেকে ভীষণ একা আর নিঃসঙ্গ লাগলো। একা, একেবারে একা। নিরুপমের মনে হল, আমার তো সবই আছে, অলকা বুবুন ইলু, একটা সুখী সংসার, তারা চারপাশে আমাকে সব সময়ে ঘিরে থাকে, কিন্তু জানে না, আমার মত নিঃসঙ্গ কেউ নেই। আমার মত দুঃখী মানুষ কেউ কখনো দেখেনি। কারণ, আমি শুধু যন্ত্রণায় জ্বলি, আমি কাঁদতে ভুলে গেছি। কোন দুঃখই এখন আর আমাকে স্পর্শ করে না, কারণ সমস্ত দুঃখ আমি পাপবোধের আগুনে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছি।

খোলা জানলার বাইরে মধ্যনিশীথের নিস্তব্ধতার দিকে তাকিয়ে রইলো নিরুপম। অন্ধকার, অন্ধকার। জানালার চৌকো আকাশে কয়েকটা তারা জ্বলছে, অনেক দূরের কোন

একটা বাড়ির চিলেকোঠার ঘরে কেউ আলো নেভাতে ভুলে গেছে, হঠাৎ একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল, দূরে কোথায় যেন একটা রিকশার ঠুং ঠুং আওয়াজ হল, অন্ধকার ঘরখানায় বাতাসে কাঁপা নীলাভ নেটের মশারি ছায়া-ছায়া রহস্য-শরীরের মতো বাতাসে কাঁপছে ; নিরুপম নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করলো।

দুঃস্বপ্নটা তখনো যেন ওর সর্বাঙ্গে লেগে রয়েছে। ওর চোখের মধ্যে।

স্বপ্নের মধ্যে ও দেখেছে আরো গভীর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের একটা পৃথিবী। কোথাও কোন আলো নেই। নিরুপম নিজেকে দেখতে পাচ্ছে না, ওর নিজের হাত নিজের কাছেই হারিয়ে গেছে। আর সেই অন্ধকারের দীর্ঘ দীর্ঘ সুড়ঙ্গের অনন্ত দূরত্বের শেষ সীমায় হঠাৎ এক বিন্দু আলো ঝকঝকে একটা সাদা মুক্তোর মত ফুটে উঠল।

আমি জানতাম, তুমি আংটিটা আমাকেই দিতে গিয়েছিলে।

'বলেছিলাম না, ফেরত দেবো না, কক্ষনো ফেরত দেব না।'

মুক্তোর বিন্দুটা ফুটে উঠেই নিরুপমের দিকে তীব্রবেগে ছুটে আসতে শুরু করেছে, ছুটে আসছে। নিরুপম দেখতে পাচ্ছে সীমাহীন তমসাবৃত টানেলের ওপার থেকে দৃষ্টির দূরত্ব ক্ষুদ্র হয়ে যাওয়া একটা ইঞ্জিনের হেড-লাইটের মত এক বিন্দু তীব্র আলো কিংবা একটা ঝকঝকে মুক্তো বিদ্যুতের বেগে ছুটে আসছে। আরে আরে, নিরুপমের মতোই হঠাৎ সেটা দু-ভাগ হয়ে গিয়ে দুটো মুক্তো হয়ে গেল। কিন্তু তার গতি থামলো না। দুটো মুক্তো পাশাপাশি ছুটে আসতে লাগলো। যত কাছে আসছে মুক্তো দুটো ক্রমশ বড় হয়ে উঠছে, বড় হতে হতে সেই পাশাপাশি সুন্দর স্নিগ্ধ মুক্তো দুটি দুটো জ্বলন্ত চোখ হয়ে উঠল। অসীম ঘৃণা আর তীব্র ক্রোধের দুটি বিস্ফারিত চোখ হয়ে গেল। নিরুপম তাকিয়ে থাকতে পারছে না। চোখ ঝলসে যাচ্ছে ওর। উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো দুটি চোখ আরো বড় হতে হতে ছুটে আসছে তখনো একেবারে নিরুপমকে লক্ষ্য করে। দুটো উল্কাপিণ্ড তীব্রবেগে এসে এখনই যেন নিরুপমকে আঘাত করবে। ভয়ে চোখ বুজে ফেলে বোধহয় আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিল নিরুপম। ঘুম ভেঙে গিয়েছিল।

এখন ও একা, নিঃসঙ্গ !

বিছানা থেকে নেমে ঢক ঢক করে এক গ্লাস জল খেল ও।

তারপর শান্ত হতে হতে এক সময় রূপার কথা মনে পড়ে গেল ওর। রূপার সেই সুন্দর শরীর চোখের সামনে ভেসে উঠল। একেবারে ওর বুকের কাছটিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসছে রূপা। ওর বাহুর উজ্জ্বল ত্বক, উন্মুক্ত কণ্ঠতটের লুব্ধ তরঙ্গের আভাস, শরীর দুলছে উচ্ছল হাসির ছন্দে, রূপার চোখ হাসছে।

'আমাকে তো ফিরতে হবে নির্পমদা।'

ফিরতে হবে, ফিরতে হবে। না, সুন্দর স্মৃতির মধ্যে আর বোধহয় ফেবা যায় না।

ঐ তো পাশাপাশি দুখানা ঘর, বুবুনের ঘর। মাঝখানে একটা দরজা। এই দরজার ওপারে রূপা ঘুমিয়ে আছে। নিরুপমের মন বলছে, একা, সেও নিরুপমের মতই একা এবং নিঃসঙ্গ।

নিরুপম কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ওকে এখন নিশিতে পাওয়া মানুষের মতো কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

নিরুপম অন্ধকারে নিঃশব্দে মাঝখানের দরজাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইলো ও অন্ধকারে। কি করবে ও ভাবতে পারছে না। নিজেকে বেঁধে রাখতে পারছে না। নিরুপমের সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে। ওর মন বলে উঠল, আমি সেই সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে ফিরে যেতে চাই না। ওর মন বলে উঠল, আমি আরো সুন্দর সেই পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাই।

নিরুপম দরজায় হাত রেখে দাঁড়াল। ওর ইচ্ছের দরজায় হাত রেখে একটু ঠেলে দেখতে যেতেই দরজাটা খুলে গেল নিঃশব্দে. নিঃশব্দ অন্ধকার ঘরের দরজা।

সঙ্গে সঙ্গে নিরুপমের মনে হল, দুটো মুক্তো ক্রমশ বড় হয়ে হয়ে ছুটে আসতে আসতে দুটো জ্বলন্ত চোখ হয়ে গিয়ে তীব্র ঘৃণায় বলে উঠল, তুমি একটা জন্তু, জন্তু, তোমার মুখের দিকে তাকাতেও আমার ঘৃণা করে।

নিরুপম নিঃশব্দে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে নিজের বিছানায় ফিরে এল।

১৩

আর একটা দিন, একটাই তো দিন। তারপর রূপা চলে যাবে। আমি চলে যাচ্ছি নির্পমদা। রতনবাবু ফোন করেছিলেন, কাল সকালেই এসে নিয়ে যাবেন আমাকে।

রূপা চলে যাবে, চলে যাবে। কোন কথাই আর নিরুপমের কানে যাচ্ছে না।

খুব ছোটবেলায় ও একটা পাখি পুষেছিল, নিরুপমের বাবা চকবাজার থেকে একটা খাঁচা কিনে এনেছিলেন। পাখিটা ওর প্রাণের চেয়েও আপন হয়ে গিয়েছিল। তারপর সুধা কবে যেন খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়েছিল। কিন্তু পাখিটা উড়ে যাওয়ার পরও শূন্য খাঁচাটা বহুদিন ওদের লালচকের বাড়ির বারান্দায় ঝুলতো, বাতাসে দুলে দুলে উঠতো, আর সেদিকে তাকিয়ে নিরুপমের মনে হতো পাখিটা আবার কোনদিন ফিরে আসবে, আবার কোনদিন হয়তো শিস দিয়ে উঠবে।

কিন্তু রূপা চলে যাবার পর এখন তো নিরুপমকেই খাঁচাটার মধ্যে ফিরে আসতে হবে।

জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে ছিল নিরুপম। হঠাৎ দেখলে, রাস্তার মোড়ের যে গুলমোহর গাছটা ফুলে ফুলে আলো হয়ে গিয়েছিল, এখন তা থেকে ফুলগুলো টুপটাপ বৃষ্টির মতো ঝরে ঝরে পড়ছে, নীচে রাস্তার ওপর, গুলমোহরের পায়ের কাছের চারপাশের আঙিনায়, রাস্তাটা আলো হয়ে গেছে, কিন্তু গাছের শাখা-প্রশাখায় একটাও ফুল নেই।

সকাল থেকেই বিষণ্ণ মুখে রূপা এক-একবার এসে দাঁড়াচ্ছে। এই তো এইমাত্র খাটের বাজুতে ডান হাতটাকে একটা পাক দিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ও ম্লান হেসেছিল।—একবার যেও নির্পমদা, একবারটি।

নিরুপম কি উত্তর দেবে ভেবে পায়নি। শুধু দুঃসহ ব্যথার মধ্যেও নিরুপম মুক্তির রেশ অনুভব করেছিল। মুক্তি, মুক্তি! ওর সেই পাপবোধ থেকে রূপা ওকে চিরকালের জন্যে মুক্তি দিয়ে যাচ্ছে। অনুশোচনার আগুনে পুড়ে পুড়ে সেই পুরনো পাপ এখন বিশুদ্ধ প্রেম হয়ে গেছে।

এখন রূপা ওর কাছে রহস্য নয়। নিরুপম মনে মনে বললে, রূপা আমি জেনে গেছি, তুমি এতকাল স্মৃতির উইঢিবি খুঁড়ে খুঁড়ে সেই পাপকে কবে যেন প্রেমে পরিণত করে দিয়েছো। তোমার ঘৃণার মুঠো থেকে ছিটকে পড়া মুক্তোর আংটিটাই তো আমার সেই অবাক সুন্দর পৃথিবীর প্রথম সাক্ষী ছিল, তুমি তাকে পরম আদরে তুলে নিয়েছিলে। ভেবেছিলে, ওটা আমি তোমাকেই দিতে গিয়েছিলাম।'আমি জানতাম, ওটা তুমি আমাকেই দিতে গিয়েছিলে, তাই না?'

নিরুপম ভাবলো, রূপা ঐ ইচ্ছের দরজাটাকে খুলে রেখে বলতে চেয়েছে নিরুপমের জন্যে ওর মনের দরজা ও চিরকালই খুলে রেখেছে, নিরুপমকে ও কোন দিনই ফিরিয়ে দিতে পারবে না। তবু গতরাত্রির কথা মনে করে নিরুপম কিছুতেই রূপার চোখে চোখ

রাখতে পারছিল না।

ওর কেবলই মনে হচ্ছিল, রূপাকে ওর যে কত কি বলার কথা ছিল, কিছুই বলা হল না।

অফিসের পোশাক পরে টাই হাতে নিয়ে ও নিজে থেকেই বললে, আজ তাড়াতাড়ি ফিরবো রূপা, তাড়াতাড়ি ফিরবো। ওর কেমন মনে হল রূপা সেদিনের মতো মুখ ফুটে বলতে পারছে না।—আর একটাই তো দিন, আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে তো।

না, তার বদলে রূপা ম্লানমুখে এগিয়ে এল নিরুপমের সামনে, একেবারে সামনে। ওর হাত থেকে টাইটা কেড়ে নিয়ে বললে, পারবো নির্পমদা, এবার নিশ্চয় পারবো। ও হাসবার চেষ্টা করলো।

ওর হাত থেকে টাইটা কেড়ে নিয়ে সেটা নিরুপমের কাঁধের ওপার থেকে ঘুরিয়ে এনে রূপা একটা হ্যাঁচকা টান দিল।—একটু তো ঘাড়টা নোয়াবে, আমি কি তোমার সমান নাকি ?—বলে হাসবার চেষ্টা করলো। আর নিরুপম বুঝতে পারলো, রূপা ওর ভেতরটা লুকোবার চেষ্টা করছে।

ঠিক তখনই রূপার কথাটা ওর মাথার মধ্যে ঘুরতে শুরু করলো। 'একটু তো ঘাড়টা নোয়াবে, আমি কি তোমার সমান নাকি।' কথাটার মধ্যে আরো কোন অর্থ আছে কি না ভাববার চেষ্টা করলো নিরুপম। কি বলতে চাইছে রূপা ? নাকি এ কথাটাই সেদিন রূপাদের বাড়ি থেকে চলে আসার পর থেকে ও গোপনে গোপনে উচ্চারণ করেছে। ক্ষমা দিয়ে, স্নেহ দিয়ে, গভীর গভীরতম ভালবাসায়।

ধীরে ধীরে হয়তো একটু বেশি সময় নিয়েই টাই বেঁধে দিল রূপা, তারপর একটা অবাক কাণ্ড করে বসল। হঠাৎ দু' পা পিছিয়ে এসে পরম কৌতুকে দু' কোমরে দুটি হাত রেখে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস মুখে বললে, এই, দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমাকে একটু দেখে নিই।

ওর দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটি দেখে, ওর তাকিয়ে থাকার ভঙ্গিটি দেখে নিরুপম না হেসে পারলো না। কিন্তু নিরুপমের ভীষণ ভাল লাগলো।

সারাটা দিন ওর কেবলই মনে হচ্ছিল রূপা চলে যাবে, চলে যাবে। ও আশ্চর্য হয়ে হঠাৎ এক সময় ভাবলো, দ্যাখো, দ্যাখো, এ কটা দিন কি অস্বস্তির মধ্যে আমি কাটিয়েছি। অবনীবাবু, ঝুমারা, চারপাশের ফ্ল্যাটের লোকের কাছে নিজের চেহারাটা নিখুঁত পরিপাটি রাখার জন্যে কত কি দুর্ভাবনা ছিল। অলকাকে ভয়, কি জানি কি বলে বসে। কিন্তু এখন আর নিরুপম কারো কথা ভাবছে না, ভয় সরে গেছে। আসলে ওর পাপবোধ ওকে ভয় দেখাচ্ছিল। যে মুহূর্তে সেটা সরে গেছে, দুর্ভাবনা আর অস্বস্তিও কেটে গেছে তখন থেকেই।

সত্যি সত্যি তাড়াতাড়ি অফিস থেকে ফিরে এল নিরুপম।

ডেক-চেয়ারে শরীর এলিয়ে বসেছিল ও। বেতের মোড়াটা টেনে এনে একপাশে বসল রূপা। নিরুপম দেখল, রূপা খুব সুন্দর করে সেজেছে। চুলে দুটি সবুজ পাতা, একটি রক্তিম ফুল। সামনে ছড়িয়ে দেওয়া দুটি সুন্দর পা, শ্বেতশুভ্র দুখানি কোমল স্ফটিকের হাত কোলের ওপর অলস পড়ে আছে।—তুমি তো আমাকে একবারও থাকতে বলছো না।

নিরুপম কোন উত্তর না দিয়ে হাসল। খেলা, খেলা। ও বুঝতে পারছে রূপা আজ খেলার নেশায় মেতে উঠেছে। রূপা আজ শাড়ির পাকে পাকে ওর সুছন্দ শরীরকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলেছে। যেন তুলে ধরতে চাইছে আরতির সুগন্ধি ধূপদানির মত, পরমান্নভোগ আতপের অর্ঘ্যের মত।

তুমি তো আমাকে একবারও থাকতে বলছো না।

রূপা হঠাৎ হেসে উঠে বললে, আমি বোধহয় ফুরিয়ে গেছি, না নির্পমদা ?

কিন্তু কিছুই তো ফুরিয়ে যায় না, কেউই ফুরোয় না। ধূপের গন্ধের মত তা ঘ্রাণের মধ্যে

বেঁচে থাকে।

—আজ আমরা কিন্তু অনেকক্ষণ বেড়াবো, অনেকক্ষণ। রূপা বলেছিল।

সারাক্ষণ, সারা সন্ধ্যা ওরা বিস্মৃত কোলাহল নির্জনতার মধ্যে দুজনে পাশাপাশি, কখনো হাতে হাত, একবার আলতো ভাবে নিরুপম ওর পিঠে হাত দিয়েছিল, দুজনে মুখোমুখি ঘাসের ওপর বসে নিশ্চুপ, দুজনেই হাঁটুতে থুতনি রেখে উদাস অন্যমনস্কতায়, অন্ধকারে ভাঙা আলাপ, উচ্চকিত হাসি, উদ্ধত ট্রানজিস্টার ম্লান নিঃশব্দ হয়ে গেছে ওদের তন্ময়তার কাছে, নিরিবিলি গাছের অন্ধকার ছায়ার আড়ালে আলোর জোনাকিরা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে, কালো কালো জলের ওপর সাদা ডুরে আলোর ছায়ারা চোখ থেকে নিভে গেছে, কি এক নির্বাক অতলতায় ডুবে গেছে দুজনে। কি যেন চাওয়ার ছিল, এই আলো-আড়াল অন্ধকারের পবিত্রতায় কি যেন বলার ছিল, দুজনেই ভুলে গেছে।

নিরুপম ভাবলো, সময় নেই, সময় ওর করতলে ধৃত জলের মত আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। রূপা কাল চলে যাবে, একটা অসীম শূন্যতা ফেলে রেখে, কিংবা ধূপের গন্ধ।

পাশাপাশি ঘন হয়ে বসা ঘাসের আসনে দুজনে দুটি অতলান্ত দীর্ঘশ্বাস সযত্নে রেখে দিয়ে এক সময় উঠে দাঁড়াল। একটি নিঃসঙ্গ গাছের অন্ধকার ছায়ায় দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

নিরুপমের মন বলতে চাইলে, রূপা, আজ তোমার কাছে আমার একটি সামান্য প্রার্থনা। আমি ভেবেছিলাম সেই সুন্দর পবিত্রতার মধ্যে ফিরে যাবো। কিন্তু ফেরা যায় না, ফেরা যায় না। শরীরের দরজায় পৌঁছে আর কেউ ফিরে আসতে পারে না। রূপা, ক্ষমার স্নিগ্ধ ছায়ায় তুমি আমার পাপকে প্রেমে পরিণত করে দিয়েছো, আজ একবার ওষ্ঠের উত্তাপে তাকে স্মৃতির অগ্নিশিখা করে নিতে দাও।

আর একটা দিন, একটাই তো দিন। তারপর রূপা চলে যাবে।

রাস্তার মোড়ের গুলমোহর গাছটার দিকে আর কারো চোখ পড়বে না। গাছটার শেষ কুসুমের দিন পার হয়ে গেল, পায়ের তলায় ছড়িয়ে থাকা আলো হয়ে যাওয়া ফুলের বিছানা সরে যাবে। তারপর আর কেউ গাছটার দিকে তাকাবে না। কারণ, তখন ঐ গুলমোহর একা এবং নিঃসঙ্গ, কিংবা রাস্তার ধারের সারি সারি বিবর্ণ গাছের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে শুধুই একটা গ্রুপ ফোটোগ্রাফ হয়ে যাবে একটা নিসর্গ দৃশ্যের মত।

এখন রাত্রি, এখন অন্ধকার।

খাবার টেবিল থেকে এক সময় ধীরে ধীরে উঠেছে দুজনেই খাবার ঘর থেকে, বেরিয়ে দুজনেরই তখন মনে হচ্ছে এখন তো শুধুই একটা রাত্রির দেয়াল কয়েকটা ঘণ্টা, তারপরই ওরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। কি যেন বলার ছিল, বলা হয়ে উঠল না।

নিরুপমের ঘর, বুবুনের ঘর। পাশাপাশি। বারান্দায় ওরা দাঁড়াল কয়েক পলকের জন্যে। নিরুপমের ঘরের দরজায় নিরুপম, বুবুনের ঘরের দরজায় হাত রেখে রূপা দাঁড়িয়ে আছে। ওরা পরস্পর পরস্পরের দিকে নিমেষের জন্যে তাকালো। মনে হল, রূপার বিষাদের দৃষ্টিতে কি যেন এক মায়াময় রহস্য, বিষণ্ণ হাসিতে বেদনার সুর। ওরা কেউই বোধ হয় কারো দৃষ্টিকে সহ্য করতে পারলো না। দরজা খুলে দুজনেই ভিতরে ঢুকে গেল। মনের সবচেয়ে কাছাকাছি থাকা দুটি মানুষ পরস্পরের কাছ থেকে অসীম দূরত্বে চলে গেল, দৃষ্টির নাগালের বাইরে।

এখন রাত্রি, এখন অন্ধকার।

নিরুপমের চোখে ঘুম নামছে না। ওর মন ঘুরে বেড়াচ্ছে, উড়ে বেড়াচ্ছে লালচকের আকাশে আকাশে, কবুতরবাগে রামলীলার মাঠে, চকবাজারে মিঠাইয়ের দোকানে।

মিশিরজীর মন্দিরে মা'র নামে পুজো দেবো, মা হাসপাতালে সেরে উঠুক, নিরুপম উইঢিবি খুঁড়ছে, ঝাঁক-ঝাঁক পায়রা....

মাথা নিচু করে সেদিন বেরিয়ে এসেছিল নিরুপম। জন্তু, জন্তু তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা হয়।

হঠাৎ সেই চিঠিটার কথা মনে পড়ে গেল নিরুপমের।

ও তো আর কোনদিন রূপার কাছে ফিরে যেতে পারেনি। গ্লানির অপমানের মুখ নিয়ে কি করে ফিরে যাবে ও রূপার কাছে। যায়নি, যেতে পারেনি।

শুধু সুধার কাছ থেকে, মার কাছ থেকে, অনেক দিন পরে একবার জানতে পেরেছিল, রূপার বিয়ে রে, এই তো এই সপ্তাহে। তুই তখন কত যেতিস বুলাদের বাড়ি, এখন তো ভুলেই গেছিস, ওদের রূপার বিয়ে এই সপ্তাহে।

নিরুপম মার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারেনি।

সুধা বলেছিল, আমরা সবাই যাবো, তুই যাবি তো দাদা।

নিরুপম কোন উত্তর দেয়নি, ও জানতো, ও যেতে পারবে না।

তারপর একদিন কবুতরবাগের পাশ দিয়ে ও হেঁটে চলেছে, হঠাৎ মিশিরজীর মেয়ে সর্সতী চিৎকার করে ডাকলে, ভাইয়া, নির্পম ভাইয়া। ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল। ওর হাতে একখানা চিঠি দিল তাকালো একবার ওর চোখের দিকে, তারপর নিঃশব্দে চলে গেল।

'জন্তু,

আমি তো চলে যাচ্ছি। হয়তো আর কোনদিনই দেখা হবে না। যাবার আগে একবারটি অন্তত আসবে। জন্তুর মুখটা কতদিন আমি দেখিনি।'

চিঠিটার কথা আজ এখন মনে পড়তেই নিরুপমের সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। বোকা, বোকা, নিরুপম নির্বোধ, অহঙ্কারী। কিম্বা আত্মগ্লানিতে জর্জর সেই প্রথম যৌবনের নিরুপম কিছুই জানতো না, বুঝতো না। তাই অসীম লজ্জায় ওর ডাকে সাড়া দিতে পারেনি। আজ এখন সেই চিঠিটা অন্য অর্থ নিয়ে এসেছে। জন্তু, জন্তু,নিজের মনে মনে শব্দটা আওড়ালো নিরুপম। মনে হল এমন স্নেহ প্রেম আদরের অন্তরঙ্গ ডাক ও কোনদিন শোনেনি।

এখন রাত্রি, এখন অন্ধকার।

ঘুম আসছে না নিরুপমের। ঘুম আসবে না।

আর তো কয়েক ঘণ্টা মাত্র। ওই তো রূপা ওর পাশের ঘরেই, বুবুনের ঘরে। রূপা কি এখনো ঘুমোয়নি। হঠাৎ একবার মনে হল যেন রূপার পায়ের শব্দ শুনতে পেল ও। রূপা কি আলো নিভিয়ে দিয়েছে! নিরুপম মনে করার চেষ্টা করলো, ও ঘরের সুইচ টিপে আলো নেভানোর শব্দ ওর কানে এসেছিল কিনা।

জন্তু, জন্তু, জন্তুর মুখটা কতদিন আমি দেখিনি।

নিরুপমের শরীরের মধ্যে একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা খেলে বেড়াচ্ছে। রূপা, তোমার কাছে আমার একটা সামান্য প্রার্থনা। ওষ্ঠের উত্তাপে আমার স্মৃতিকে তুমি অগ্নিশিখা করে নিতে দাও।

পাশাপাশি দুখানা ঘরের মাঝের দরজাটার দিকে তাকালো নিরুপম। তাকিয়ে রইলো। আর তখনই লক্ষ্য করলো বিপিন কখন দরজাটায় এদিক থেকে খিল তুলে দিয়ে গেছে।

নিরুপমের সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে।

অনেক দিন আগে ট্রামে যেতে যেতে কলকাতার রাস্তায় একটা সুন্দর অথচ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখেছিল নিরুপম। গ্রীষ্মের দুপুরে চলন্ত ট্রামে বসে চকিতে দেখা এক টুকরো ছবি। এক

পলকের।

হঠাৎ সেই নগ্নিকা মূর্তির দিকে চোখ পড়েছিল ওর। রাস্তার কলের সামনে দাঁড়িয়ে শনের মত পাকা চুল এক বুড়ি ভিখিরি মা তার পাগল হয়ে যাওয়া যুবতী মেয়েকে জোর করে স্নান করাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিবসনা একটি ঋজু নারীদেহ উন্মাদের চোখে তাকিয়ে আছে, দাঁড়িয়ে আছে, আর ভিখিরি মা পরম স্নেহে পরম আদরে পাগল মেয়ের কাদামাখা নোংরা শরীরে তার পিঠে কাঁধে স্তনে ত্রিবলীতে সাবান ঘষতে ঘষতে জল ঢেলে দিচ্ছে। সেই নগ্নিকা নিরুপমের চোখে সেদিন একটি ভাস্কর্য মূর্তি হয়ে উঠেছিল।

মাঝে মাঝেই সেই ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। একই সঙ্গে কুৎসিত আর সুন্দব মনে হয়। একদিন ছবিটা ও স্বপ্নে দেখেছিল ; স্বপ্নের চোখে সেই পাগল ভিখিরি মেয়েটা হঠাৎ কিভাবে যেন একটু একটু করে বদলে যেতে লাগলো, বদলে গিয়ে প্রথম যৌবনের চোখে দেখা আরেকজনের মুখ হয়ে গিয়েছিল। রূপার। আজো সেই ছবিটা যেন একটু একটু করে বদলে যেতে চাইছে।

এখন রাত্রি, এখন অন্ধকার। আর তো কয়েক ঘণ্টা মাত্র, তারপরই কাল সকালে রতনবাবু এসে ওকে নিয়ে যাবেন।

দূরে কোথায় একটা ট্রাম যেন ঘণ্টি বাজাতে বাজাতে তীব্রবেগে ছুটে গেল।

নিরুপম কি করবে বুঝতে পারছে না। বোধহয় ফেরা যায় না।

মাঝের দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কতক্ষণ সময় কেটে গেছে, নিরুপম বুঝতে পারল না।

রূপা কি আলো নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে? জানে না, নিরুপম জানে না।

ধীরে ধীরে উঠল নিরুপম। নিঃশব্দ পায়ে দরজাটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

দরজায় হাত রাখলো। নিরুপমের সমস্ত শরীর তখন থর থর করে কাঁপছে। ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, দাঁড়াও দাঁড়াও তোমাকে একবার ভাল করে দেখি, 'জন্তু, জন্তু', সমস্ত চিন্তাগুলো ওর মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেল।

পাশাপাশি দুখানা ঘর। দ্যাখো দ্যাখো, ঠিক আমাদের জীবনের মতোই, প্রেম ভালবাসার মতোই। একটার নাম দাও শরীর, আরেকটা তোমার মন। মাঝখানে একটা দরজা আছে, আছেই। তুমি যতই সেটা খিল দিয়ে আটকে রাখো, তোমার চোখ বার বার সেদিকে যাবেই। আনাগোনার জন্যেই তো ওই মাঝের দরজাটা। তুমি কোন্ ঘরে আছো, তাতে কিছু যায় আসে না। তোমাকে ওই দরজাটার অন্য ঘরে পৌঁছে দিতে চাইছে।

দরজায় হাত রেখে নিরুপম ভাবলো ধীরে ধীরে দরজায় টোকা দিয়ে ও ডাকবে কিনা, রূপা রূপা!

ভাবতে ভাবতে, ভাবতে ভাবতে সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

গলার টাই ধরে টান দিয়েছিল রূপা।—এই, ঘাড়টা তো নোয়াবে একটু, আমি কি তোমার সমান নাকি?

নিরুপমের মনে হচ্ছে, রূপা যেন ওকে টানছে।

দরজায় হাত রেখে ভাবতে ভাবতে নিরুপম হঠাৎ হাত বাড়িয়ে একটা ঝটকা টানে খিলটা খুলে ফেললো, নিস্তব্ধতার মধ্যে খিল খোলার আওয়াজ নির্লজ্জেব মত ফেটে পড়লো।

নিরুপমের সমস্ত শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। বেশ কিছুক্ষণ, বেশ কিছুক্ষণ ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো নিঃশব্দতার মধ্যে।

তারপব হঠাৎ একসময নিরুপম ধাক্কা দিয়ে দরজাটা খুলতে গেল। তার তখনই সঙ্গে সঙ্গে কে যেন ওদিক থেকে শব্দ করে দ্রুত হাতে খিলটা তুলে দিল।

কে আবার। রূপা।

একটা মুহূর্তের জন্যে নিরুপমের সমস্ত মুখ লজ্জায় বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পরক্ষণেই ধীরে ধীরে সেটা উল্লাস হয়ে গেল। মনে মনে বললে, রূপা, আমি কৃতজ্ঞ, কৃতজ্ঞ।

আমি জানি, তুমি ঘুমোওনি। তুমিও আমার মতো অস্থির হয়েছিলে। দরজার এপারে দাঁড়িয়ে থরথর করে যখন আমার শরীর কাঁপছিল, তখন দরজার ওপারে তুমিও নিশ্চয় আমার মতোই বুকের মধ্যে গভীর গভীরতম প্রার্থনা নিয়ে দাঁড়িয়েছিলে। তীব্র কোন লজ্জাবোধ এসে তোমাকে সেই সুন্দর সম্পর্কের মধ্যে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এখন আমরা দুজনেই স্মৃতিতে ফিরে যেতে পারবো।

রূপা, আমি কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ।

১৪

নিরুপম এখন আবার সেই গ্রুপ ফোটোগ্রাফ হয়ে যাবে।

রূপা চলে গেছে। রতনবাবু এসে রূপাকে নিয়ে গেছেন। ওঁর ছুটি ফুরিয়ে গেছে। রূপার ছুটি হয়ে গেছে। এখন কানপুরে ফিরে গিয়ে রূপাও একখানা গ্রুপে ফোটোগ্রাফ হয়ে যাবে।

নিরুপম এখন একটা মুক্তির স্বাদ অনুভব করছে। ওর বুকের ওপর থেকে সেই ভারী পাথরখানা সরে গেছে, যেটা ওকে সারাজীবন ধরে বয়ে বেড়াতে হয়েছে। বাইরে থেকে কেউ দেখতে পেতো না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই পাথরের ভারে নুয়ে পড়তো, মাথা তুলে দাঁড়াতে পারতো না। এখন ও মুক্তি পেয়ে গেছে, এখন ও আবার অ্যালবামে ওই গ্রুপ ফোটোগ্রাফের মধ্যে ফিরে যাবে।

অ্যালবামের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ওই একখানা ছবিতেই ও নিজেকে খুঁজে পাবে। আর সব ছবিগুলো মিথ্যে হয়ে যাবে। এই ছবিটায় তোমাকে খুব ইনোসেন্ট ইনোসেন্ট দেখায়। মিথ্যে কথা। এই ছবিটায় টাই-বাঁধা একজন রাশভারী মানুষ। মিথ্যে কথা। ওগুলোর কোনটাই নিরুপমের ছবি নয়। শুধু এই, এইখানে, অলকা হাসছে, বুবুন বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে, বুকের ওপর হাত দু'খানা আড়াআড়ি, ইলুর চোখ লাজুক লাজুক, শুধু এই, এই ছবিতে, নিরুপমের বাবা আর মা ঠিক ছবি তোলানোর ভঙ্গিতে ওই তো সুধা, ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে, আরো কে কে যেন, আরো অনেক, দ্যাখো দ্যাখো এই ছবিটিতেই শুধু মনে হচ্ছে তোমার মধ্যে তুমি আছো।

রূপা চলে গেছে। রতনবাবু এসে ওকে নিয়ে গেছেন। কানপুরে ফিরে গিয়ে সকলের মধ্যে রূপাও একখানা গ্রুপ ফোটোগ্রাফ হয়ে যাবে।

এখন এই তিনতলার ফ্ল্যাটখানা নিরুপমের চোখে যেন আরো সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই তো সেই বেতের মোড়াটায় রূপা পা ছড়িয়ে বসেছিল, দুটি সাদা হাত কোলের ওপর মেলে রেখে।

কাঁধের ওপর রূপার হাতের স্পর্শটা যেন এখনো অনুভব করছে।—ভেবেছিলাম সেই জাহাজে করে কোথাও যাবো অনেক দূরে, দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। কবুতরবাগের বর্ষার জল উপচে পড়া খরস্রোত নালাটায় কাগজের নৌকো ভাসাতে ভাসাতে রূপা বলছে।

এই তো এখানে, খাটের একপাশে, খাটের বাজুতে পিঠ দিয়ে বসেছিল রূপা। কিংবা ওই খাবারের টেবিলে হাত মেলে রেখে বলছে, আমি বলেছিলাম না, ফেরত দেবো না, তোমাকে

কক্ষনো ফেরত দেবো না।

অ্যালবামের পাতাগুলো উল্টে যাবে নিরুপম। একটার পর একটা। না, অ্যালবামে রূপার কোন ছবি খুঁজে পাবে না। এই তো অলকার ছবি, ও একা, কপালে গালে চন্দনের ফোঁটা, লাল বেনারসী, বিয়ের সময়ে তোলা, ওটার মধ্যে আছে কি না নিরুপম জানে না। বাবার ছবি, মার ছবি, এক এক পাতায় এক একজনের ছবি রয়েছে ; কিন্তু এগুলো কোনটাই বোধহয় কারো ছবি নয়। কারণ একা একা একটা মানুষের কোন ছবি তোলা যায় না।

নিরুপম মানে শুধু নিরুপম নয়। ওর চারপাশের আরো অনেকে। ক্যামেরার মধ্যে যাদের ধরা গেছে, শুধু গ্রুপ ফোটোগ্রাফের তারাই নয়, যারা বাদ পড়ে গেছে, সেই উইঢিবি, নিশীথের কুৎসিত হাসি, সর্বতী ভাইয়া ভাইয়া বলে ডাকছে, মৃগাঙ্কবাবুর হাতে এক বাটি মাংস, দত্তসাহেব চিরকুটটা দিয়ে বলছেন, আমার ক্যাণ্ডিডেট, দাসবাবু শুকনো মুখে হাসছেন, দু'দিন বাদে ছেঁড়া পাঞ্জাবিতে দেখলে চিনতে চাইবেন তো ? এরা সকলেই ঠেলাঠেলি করে অ্যালবামের গ্রুপ ফোটোগ্রাফখানার মধ্যে জায়গা চাইছে, ওই ছবিটা দিনে দিনে যত ম্লান হলুদ হয়ে যাবে, ততই ওরা ঠেলাঠেলি করে ওর মধ্যে জায়গা করে নেবে।

এখন, এইমাত্র রূপা ছুটে এসে টাইটা কেড়ে নিলো।

ব্যাডমিন্টন খেলার মাঠে বসে সন্ধ্যার ছায়ায় রূপা বলছে, এই, সত্যি বলবে, তুমি কাউকে ভালবাসো ? যমুনা তো, জানি জানি। এখন আবার রূপা বলে উঠেছে, নির্পমদা, এই খাঁচার মধ্যে কি করে থাকো গো।

কিন্তু এই সুখের খাঁচাটাতেই তো মানুষ বার বার ফিরে যেতে চায়। নিরুপম নিজেও। শুধু মাঝে মাঝে কি যেন বলে উঠতে ইচ্ছে করে, তখন ও দক্ষিণের জানালাটায় এসে দাঁড়ায়। অ্যালবামের পাতা উল্টে যায় মনে মনে।

তারপর হঠাৎ মনে পড়ে, নিরুপম দাসবাবুকে যেন বলছে, যাকে যোগ্য মনে করেছি, সিলেক্ট করেছি।

হঠাৎ নিরুপমের মনে হল, ও একটা সচ্ছল সুখী মানুষকে দেখতে পাচ্ছে, যে কেবলই মাথা তুলতে চাইছে, কিন্তু পাথরের ভারে মাথা তুলতে পারছে না। মানুষটা কেবলই একটার পর একটা বিশাল পাথরের ভারে নুয়ে পড়তে পড়তে হঠাৎ পাথরগুলো রঙ বদলে বদলে, মাটি হয়ে গেল। আর তখন মানুষটাকে চেনাই যায় না। দেখে মনে হয় যেন একটা উইঢিবি।

উইঢিবিই তো। তার মধ্যে একা নিরুপম নয়, নিরুপমের চারপাশের সবাই, যারা ঐ গ্রুপ ফোটোগ্রাফখানায় আছে, যারা ঠেলাঠেলি করে ঢুকতে চাইছে কিংবা ক্যামেরার রেঞ্জের মধ্যে যদি আরো অনেক, অনেক মানুষ ধরা যেতো, তা হলে দেখা যেতো, কারো ছবিই চেনা যায় না, কারণ তখন একটা উইঢিবি হয়ে যেতো।

এখন ও খাঁচাটার মধ্যেই অভ্যস্ত জীবন ফিরে পেতে চাইছে। অলকা, বুবুন, ইলু—ওদের জন্যে উৎকণ্ঠা বোধ করছে। নিরুপমের ইচ্ছে করছে এখুনি স্টেশনে ছুটে যেতে। ঘন ঘন হাতের কব্জিতে সময় দেখছে।

ঐ তো ট্রেন আসার সময় হয়ে গেছে। ঘড়ির কাঁটা, প্লাটফর্মের ঘড়ির কাঁটা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। মাইকে বিস্ফারিত কণ্ঠের দুর্বোধ্য ঘোষণা শোনা যাচ্ছে।

আসছে, ট্রেন আসছে।

ভিড় ঠেলে ঠেলে এগিয়ে চলেছে নিরুপম। মেল ট্রেনখানা প্লাটফর্মে ঢুকছে, দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে জানালাগুলো। নিরুপমের চোখ অলকাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বুবুন ইলু অলকার মুখ। আর কে কে ওর মনে পড়ছে না।

নিরুপম অ্যালবামের পাতাগুলো উল্টে উল্টে সেই মুখগুলো খুঁজছে।

প্রথম প্রহর প্রথম সংস্করণ : পৌষ ১৩৬১ । প্রকাশক : গোপালদাস মজুমদার, ডি এম লাইব্রেরি, ৪২ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিক্যতা । প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন সমীর সরকার । দাম ছিল চার টাকা ।

'প্রথম প্রহর' আমার প্রথম উপন্যাস । বলা যেতে পারে উপন্যাস লেখার হাতেখড়ি । বেশ কিছু গল্প লিখে সীমিত সংখ্যক পাঠকের কাছে স্বীকৃতি মিলেছে, পরপর তিনখানি গল্পগ্রন্থ বের করেছি নিজের কষ্টার্জিত অর্থের বিনিময়ে, কোনটিই পাঠকের মুখ দেখেনি । চতুর্থ বই—গল্পগ্রন্থ : দরবারী । কিন্তু এবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হ'ল, সেকালে সেই প্রথম একটি গল্পের বই আশাতীত জনপ্রিয় হ'ল । শুধু জনপ্রিয়ই নয়, উঁচুতলার বুদ্ধিজীবী মহলেও পেল সুখ্যাতি । তারাশঙ্করও বইটি পড়ে স্বতঃপ্রণোদিত একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখেছিলেন । সে বয়সে সেটুকুই পরম পুরস্কার । আর এই সময়েই ডাক এলো ডি এম লাইব্রেরির গোপালদাস মজুমদার নামক কিম্বদন্তীপুরুষটির কাছ থেকে—লেখক মহলে সেকালে যাঁর খ্যাতি ও অখ্যাতি ছিল প্রায় সমান সমান । বড় দ্বিধা নিয়ে গিয়েছিলাম, সুহৃদপ্রতিম ইন্দুভূষণ রায়ের সঙ্গে । তিনিই ঘটক । পরিচয় পেতেই কেমন অবাক অবাক চোখে মুখের দিকে তাকালেন, চেক বই বের করলেন । ভাবলাম, সামনে দাঁড়ানো দপ্তরীকে চেক দেবেন বলেই ব্যস্ত, আমি লেখকটা যেন উপেক্ষার বস্তু । পরমুহূর্তেই প্রশ্ন, চৌধুরী বানান কি লেখেন ? বানান ? হ্যাঁ হ্যাঁ, ইংরেজিতে কি লেখেন ? জানাতেই ফস ফস করে চেক লিখে হাতে ধরিয়ে দিলেন । বিশ্বাসই হয় না, পাঁচশো টাকা, পাঁচের পিঠে দুটো শূন্য । বললেন, উপন্যাস লিখুন । যখন খুশি দেবেন, কিন্তু প্রথম উপন্যাস যেন আমি পাই । আর রয়ালটির টাকা হিসেব করে পুরোপুরি দিয়ে দেব যেদিন বই বেরোবে সেদিনই । অভিভূত হয়ে বললাম, অবশ্যই । শুধু ভাঙলাম না, উপন্যাস লেখাই আছে, শুধু পুনর্লিখন বাকি ।

বই ছাপা হয়েছিল ব্রাহ্মমিশন প্রেসে । এবং ইতিহাসের প্রয়োজনে জানিয়ে রাখি ঐ প্রেসে তখন বেশ কয়েকজন তরুণী কম্পোজিটর ছিলেন । তাঁরাই এ বই কম্পোজ করেছিলেন । একদিন একজন এসে বললেন, সব তো পড়িনি, মাঝে মাঝে যেটুকু কম্পোজ করেছি সেটুকুই পড়েছি । দারুণ ।

বই বের হওয়ার পরও কিছু কিছু প্রশংসা পেয়েছিলাম । উৎসর্গ পৃষ্ঠায় ছিল 'বিমল মিত্র বন্ধুবরেষু', কারণ, তার মাস কয়েক কি এক বছর আগে বেরোনো তাঁর 'সাহেব বিবি গোলাম' উপন্যাসটি কি জন্য জানি না আমাকেই উৎসর্গ করেছিলেন । সম্ভবত কালীঘাট ট্রাম ডিপোর সামনের স্যাঙ্গুভেলিতে আমাদের আড্ডায় আসতে আসতে দশ বারো বছরের অগ্রজ সেই লেখক আমাকে কোন কারণে পছন্দ করে ফেলেছিলেন, এমন কি তাঁর উপন্যাসের শেষ কিস্তি নিয়ে আলোচনাও করেছিলেন কালীঘাট পার্কের বেঞ্চিতে বসে । সেই সুবাদেই 'বন্ধুবরেষু' লিখেছিলাম ।'

'প্রথম প্রহর' ছবি করার ইচ্ছে ছিল তপন সিংহের, তাঁর প্রযোজক কিছু টাকাও দিয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত কি গোলযোগে জানি না, ছবিটি হয়নি । তার বদলে আমার 'বিবিকবজ' গল্প নিয়ে তপন সিংহ ছবি করলেন 'কালামাটি' । পরে 'প্রথম প্রহর' ছবি করার আবার বাসনা হয় তাঁর, কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা মেলেনি । এ উপন্যাসের প্রথমেই তুলসীদাসের একটি চৌপাই উদ্ধৃত হয়েছে । তখন তুলসীদাস পড়ছি, হিন্দির সঙ্গে বাংলা অনুবাদ । পড়তে পড়তে এই চারটি পদ মনের মধ্যে গেঁথে গেল । ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা রকম ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলাম । আর মনে হল মানুষের জীবনও তো চারটি প্রহর । প্রথম প্রহর নিশ্চয় শৈশব, যখন মানুষ জাগতে শুরু করে, বিস্ফারিত চোখ মেলে সবকিছু দেখতে চায়,জানতে চায় । প্রথম উপন্যাস তো শুরু হয়

নিজেকে নিয়েই, অনেকেই করেছেন সে-কাজ, কিন্তু শুধু একটা শৈশবস্মৃতি ? তা হ'লে আর আমি পৃথক হলাম কোথায় ।

আমার জন্ম এক রেলশহরে, শৈশব কেটেছে সেখানেই । সে এক তৃতীয় জগৎ, না-কোলকাতা, না-গ্রাম । আর সেই রেলশহরও তখন সদ্য জন্মে উঠছে, বলতে গেলে শৈশব কাটিয়ে বয়ঃসন্ধির বয়েসে পৌঁছেছে। বাঃ রে, তা হ'লে তো রেলশহরটাকেও আমার জীবনের প্রথম প্রহরের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া যায় । ভাবতে ভাবতে আরেকটা সত্য উদ্ঘাটিত হল । রেল-লাইন, লেভেল ক্রশিং, ইঞ্জিনের শান্টিং, কয়লার ধোঁয়া, রেল কারখানা, শ্রমিক আন্দোলন, রেলকুঠি—এ-সবই তো অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে ছিল আমাদের প্রত্যূষের জীবনের সঙ্গে । কিছু শুনে, কিছু পড়ে, জেনেছিলাম পিছিয়ে পড়া পিছিয়ে থাকা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষে আধুনিক সভ্যতার তথা আধুনিক শিল্পোদ্যোগেরও শুরু রেলকে কেন্দ্র করেই । সেদিন ভারতবর্ষ নিশ্চয় রাতারাতি বদলে যাচ্ছিল । পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়িতে বা নৌকোয় মানুষ আগে তীর্থযাত্রায় গিয়ে দেশ দেখতো, কিন্তু রেল দূরের মানুষকে কাছে নিয়ে এল, ভারতের নানা প্রদেশ পরস্পরকে চিনলো, কর্মজীবনে একত্রিত হ'ল, পরস্পরকে বুঝতে শিখলো । রেল তো বিপ্লবও, সামাজিক বিপ্লব । আজ আমরা বুঝতে পারি না । অস্পৃশ্যতা আজও আছে, কিন্তু এক ধাক্কায় এই যন্ত্রদানব তার ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল । ব্রাহ্মণ আর হরিজন রেলের কামরায় গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসতে বাধ্য হ'লো । সঙ্গে সঙ্গে এলো স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, খাঁটি সাহেব আর অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সে কি দাপট । বাঃ রে, রেলের জীবনেও তো সে এক প্রথম প্রহর ।

ইচ্ছে ছিল এমন সমস্ত বিষয়গুলিকে নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এমন একটা উপন্যাস লেখার । পারিনি জানি, কিন্তু একেবারেই কি পারিনি ?

দ্বীপের নাম টিয়ারঙ

প্রথম সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৬৪ । প্রকাশক . অমলেন্দু চক্রবর্তী, আভেনিব, ২৩৮ বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৯ । দাম ৩·৫০, প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন শিল্পী খালেদ চৌধুরী । উৎসর্গ · 'শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র শ্রদ্ধাস্পদেষু'। পরবর্তীকালে প্রকাশক ডি এম লাইব্রেরি ।

এ উপন্যাসের মূল ঘটনাটি পেয়েছিলাম খুবই পুরোনো দিনের একটি ইংরেজি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় । মেয়েটির বোবা হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিও ।

ছবি হয়েছিল । চিত্রনাট্য করেছিলেন ঋত্বিক ঘটক । পরিচালনা · গুরু বাগচী ।

কোন পত্রপত্রিকায় এ বই ছাপা হয়নি । সরাসরি বই হয়ে বেরিয়েছিল ।

পিকনিক

প্রথম প্রকাশ . শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৭৭ । প্রথম সংস্করণ . নভেম্বর ১৯৭০ । প্রকাশক · আনন্দ পাবলিশার্স (প্রাঃ) লিমিটেড । উৎসর্গ তুলতুলকে এবং জলিকে । প্রচ্ছদ : সমীর সরকার । দাম : ৫·০০।

এর আগে লিখেছি 'এখনই' । তরুণ-তরুণীদের কাছে, বিশেষ করে কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে সে বই এত প্রিয় হয়ে উঠেছিল যে আমি নিজেও একটু অবাক হয়েছিলাম । তার কারণ ঠিক এই সময়ই—ধরা যাক ১৯৬৬ থেকে ১৯৭০ সাল একটি বিস্ফোরণের যুগ—সামাজিক বিস্ফোরণ । সেই প্রথম কলেজের মেয়েরা রাতারাতি বদলে যেতে শুরু করেছে । ছেলেরাও। ভীরু লাজুক মেয়েরা হঠাৎ যেন এক ঝলক আলোয় বেরিয়ে এসে জানান দিল ছেলেদের সঙ্গেও সমান পাল্লায় আড্ডা দেওয়া যায়, বন্ধু হওয়া যায় । পুরুষ মানেই প্রেম নয় । যাদের নামে এ বইয়ের উৎসর্গ তারা এবং তাদের বন্ধুরা একটা নতুন দিনের খবর এনে দিয়েছিল । আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই

'এখনই' এবং 'পিকনিক' লেখা হয়।

ইচ্ছে ছিল, ঘটনা ঘটবে না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে যাবে। কারণ আমরা সুখে অসুখে আনন্দে বেদনায় সচরাচর যে মানুষগুলিকে দেখি তারাই কিন্তু চরিত্র নয়। আসল চরিত্রই শুধু নয়, মানুষে মানুষে একাত্মতা, ভাব-ভালবাসা, হৈ-হল্লার জীবনে একটা সামান্য ঘটনা যদি ঘটে যায় তা হলে সমস্ত পৃথিবীটা হয়ে যায় অন্যরকম। একটা গাড়ি, স্টার্ট দিলেই চলতে শুরু করে, মানুষের জীবনের মত ছুটতে শুরু করে। কি আনন্দ, কি আনন্দ। প্রেম ভালবাসা, অহঙ্কার, সজীবতা নিয়ে সে যখন দৌড়য় তখন সেও যান্ত্রিক শক্তিতে উন্মত্ত। মানুষের জীবনও তো একটা পিকনিক বলেই মনে হয়। কিন্তু চাবি ঘোরালেও যখন হঠাৎ কি কারণে স্টার্ট নেয় না! সব ওলোটপালোট হয়ে যায়। মুহূর্তে উবে যায় প্রেম ভালবাসা, অহঙ্কার ও সাফল্যের হাসি। তখন শুধু পৌঁছনোই একটা দুশ্চিন্তা। একটা গাড়ির চাবি আঙুলে ঘোরাতে ঘোরাতে যে-জীবন চলছে, সেই চাবিটা যখন শক্তিহীন হয়ে পড়ে তখন রাতারাতি জীবনের রঙ বদলে যায়। নিজের নিজের দুশ্চিন্তা নিয়ে তখন সেই যুবক-যুবতীরা এক একটি পৃথক মানুষ, আত্মকেন্দ্রিক মানুষ। এর বেশি কিছু বলার দুঃসাহস এ-উপন্যাসে ছিল না।

স্বজন প্রথম প্রকাশ : 'দেশ' শারদীয় ১৩৮৭। প্রথম সংস্করণ · বৈশাখ ১৩৮৮। প্রকাশক সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং. ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ দাম ১২ টাকা। প্রচ্ছদ শিল্পী সুধীর মৈত্র। উৎসর্গ · শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রিয়বরেষু।

এ উপন্যাসটি হয়তো অনেককাল আগেই লেখা উচিত ছিল। বেশ কিছুটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও এর মধ্যে আছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বারবার গিয়েছি, থেকেছি রাঁচি হাজারিবাগ পালামৌ অঞ্চলে। ঐ সব অঞ্চলের কয়লাখনি নিয়ে গল্পও লিখেছি। কিন্তু যুদ্ধের যে প্রভাব পড়েছিল ঐ-সব এলাকায় তা নিয়ে গল্প ভারতবর্ষ। লিখেছি অনেক পরে। আরো পরে এই উপন্যাস। কেন লিখলাম তাও বলা দরকার। আসলে রাঁচি ছিল তখন ইস্টার্ন কম্যাণ্ডের হেড কোয়ার্টার্স। আমেরিকান সৈন্যদের ঘাঁটি। তার সঙ্গে ব্রিটিশ, এমন কি চৈনিক সৈন্যও নিত্যদিন রেলে যাতায়াত করতো ঐ তল্লাটে। পৈতৃক পদমর্যাদার সুবাদে ফার্স্ট ক্লাসে যাতায়াত করার সুবিধে পাই, অসুবিধেও। তখন তো খুব কম ভারতীয়ই প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন। সবই সাহেবসুবো। তার ওপর এলো সৈন্যদের দাপট।

চুরির ভয় তখন তেমন ছিল না বলেই রিজার্ভ করা বার্থে বিছানা এবং জিনিসপত্র রেখে খেতে গেছি ছোটামুরীর রিফ্রেশমেন্ট রুমে, ফিরে দেখি সে-কামরা বেদখল করেছে ঝকঝকে পিতলের তারা লাগানো সৈন্যের দল। স্টেশন মাস্টার ছুটে এলেন, আমাকে অন্য বার্থে নিয়ে গেলেন—দেখুন সব ঠিক আছে কিনা। স্বগতোক্তি করলেন, শালারা কবে যে বিদেয় হবে। অর্থাৎ তিনিও অক্ষম। সাধারণ মানুষের চেয়ে সৈন্যসামন্তই বেশি। রামগড়েও ছিলাম কিছুদিন। ওখানে একটা সৈন্যশিবির তো ছিলই, তার ওপর পি ও ডবলু ক্যাম্প। একালের তরুণ পাঠকদের সে-সব খবর জানা নেই হয়তো, তাই বিশদ করে বলি পি ও ডবলু মানে প্রিজনার অব ওয়ার। সেই ক্যাম্পে কিছু ইটালিয়ান বন্দীও দেখেছি, দূর থেকে, মগ হাতে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে কফি আর রুটি নিচ্ছে।

যখন বারোয়াড়িতে থাকি এক ইতালীয় বন্দীকে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা পোশাকে ধরা পড়তেও দেখেছি। তার কচি মুখখানা দেখে বলে উঠেছিলাম, আহা। এক বন্ধু বললে, ওরা তো ফ্যাসিস্ট। মন সায় দেয়নি। নেতা কিংবা সরকার যাই হোক না, ঐ কচি মুখ আসলে একটি মানুষ। যুদ্ধ তো মিটে যাবে। আবার সব এক হয়ে যাবে, তখন? স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারিনি বলেই বহুকাল পরে লিখে ফেলেছিলাম, এবং নাম

দিয়েছিলাম—স্বজন। ধুতি-পাঞ্জাবি পরেছিল বলেই কল্পনা করে নিয়েছিলাম কোন বাঙালীর গোপন সহায়তা ছিল। যুদ্ধের সময়ের ঐ তল্লাট সম্পর্কে যাঁদের কোন ধারণাই নেই তাঁরা মনে করেন এ উপন্যাস নিছক কল্পনা। কি আর করা যায়!

অ্যালবামে কয়েকটি ছবি প্রথম প্রকাশ : শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৮০। প্রথম সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৭৩। দাম ৮·০০। প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী।

প্রথম পৃষ্ঠায় ছিল জাঁ ক্রিস্তফ থেকে এক লাইন উদ্ধৃতি :

"They did not know that they were there,
and yet they did know"

এই উদ্ধৃতির কারণ এ উপন্যাসের ছোট্ট একটি জায়গায় জাঁ ক্রিস্তফের একটি পরিস্থিতির কিঞ্চিৎ মিল আছে। কিন্তু মূল প্রেরণাও তাকে বলা যায়।

